বনফুল রচনাবলী

ষোড়শ খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭০০০৭৩

সম্পাদনা :

ডঃ সরোজমোহন মিত্র
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬২

প্রকাশক :

আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

মুদ্রাকর :

শ্রীদুলাল চন্দ্র ভূঞ্যা
সুদীপ প্রিন্টার্স
৪/১এ, সনাতন শীল লেন
কলকাতা-১২

ও

জুবিলী প্রিন্টার্স
১১৮ অখিল মিস্ত্রী লেন
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ শিল্পী :

আনন্দরূপ চক্রবর্তী
শৈলেন শীল
সমরেশ বসু

সূচীপত্র

পশ্চাৎপট

(আত্মচরিত)

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া কেয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণীয় অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়, কল্যাণীয় চিরন্তন মুখোপাধ্যায়, কল্যাণীয়া করবী বন্দ্যোপাধ্যায়—
আমার এই চারটি সন্তানের করকমলে, আশীর্বাদ সহ—

বাল্যজীবন

মণিহারী

যাহা নাই তাহার কথা লিখিতে বসিয়াছি।

অনেকে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি যেন এইবার আমার জীবনচরিত লিখি। লিখিতে বসিয়া কিন্তু প্রথমেই একটি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি। আমার জীবন-চরিতে 'আমার' কতটুকু? আমি তো আমার পিতামাতার সৃষ্ট জীব। তাঁহারাই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, লালন-পালন করিয়াছেন, লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, মেডিকেল কলেজে পড়াইয়া ডাক্তার করিয়া দিয়াছেন এবং বিবাহ দিয়া আমাকে আমার জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া সংসারে স্থাপন করিয়াছেন। এ-সবের মধ্যে 'আমার' কৃতিত্ব কতটুকু? আমার প্রতিভা? আমার প্রতিভা যদি কিছু থাকিয়াই থাকে (যদি বলিতেছি এই জন্য যে, অনেক সমালোচক আমার মধ্যে প্রতিভার লক্ষণ দেখিতে পান না), তাহা হইলে সে-প্রতিভার জন্যও আমি এমন একটা অদৃশ্য শক্তির কাছে ঋণী যাহার দিব্য প্রভাবের বর্ণনা আমার সাধ্যাতীত হইলেও তাহার অস্তিত্বের নিকট আমাকে ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং আমার জীবন-চরিত লিখিতে গিয়া দেখিতেছি আমাব জীবন-চরিতে 'আমার' বলিয়া আস্ফালন করিবার মতো কিছুই নাই। আমি সংসারেব আবর্তে পড়িয়া 'আঁকুপাঁকু' করিয়াছি মাত্র। তাহার ইতিহাসই হয়তো আমার জীবন-চরিত। আমার এই আঁকুপাঁকু করার ইতিহাসও আমার অনেক গল্প-কাহিনীতে বিবৃত হইয়া আছে। তাহা ছাড়া সব কথা এখন মনেও নাই। আগামী ৪ঠা শ্রাবণ, সালে আমি আটাত্তর বৎসরে পা দিব। এতদিনের সব স্মৃতি মনে থাকা সম্ভব নয়। যেটুকু মনে আছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিব। সন-তারিখও খুব সম্ভব নির্ভুল হইবে না। তাহা ছাড়া আমার জীবন সম্বন্ধে কেহ কেহ কিছু কিছু লিখিয়াছেন ইতিপূর্বে, সুতরাং সে-সবের পুনরুক্তি হওয়াও সম্ভব। পাঠক-পাঠিকাদের এই সব কথা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিয়া আমি এইবার শুরু হইতে আমার জীবন-কাহিনী আরম্ভ করি।

আমার পিতার নাম স্বর্গীয় ডাক্তার সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, আমার মাতা স্বর্গীয়া মৃণালিনী দেবী। আমাদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জিলার শিয়াখালা গ্রামে। সম্ভবত কোন সময় আমাদের বাস্তুভিটার কাছে কাঁটাবন ছিল। তাই বোধহয় আমাদের পরিবার 'কাঁটাবুনে' মুখুজ্যে নামে খ্যাত। আমার পিতামহ কেদারনাথ ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ তান্ত্রিক কালীসাধক। আমার প্রপিতামহ মহেশচন্দ্র ছিলেন সেকেলে পণ্ডিত। তাঁহার সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী শুনিয়াছি। জানি না ইহা কতদূর সত্য। তিনি নাকি কাহাকেও গলায় মালা দিতে অনুমতি দিতেন না। বলিতেন, আমার

গলায় একজনই মালা দিয়াছে, অন্ত কাহারও মালা আমি লইব না। তাঁহার একটি পায়ে গোদ ছিল। পীড়াপীড়ি করিলে বলিতেন—নিতান্তই যদি দিতে চাও, এই গোদের উপরই পরাইয়া দাও।

আমার পিতা বাল্যকালেই মাতৃহীন হইয়াছিলেন। তিনি মামার বাড়িতে মানুষ হন। তাঁহার মামার কর্মস্থল ছিল সাহেবগঞ্জ। বাবা সেখানে পড়াশোনা করিয়া পরে ক্যামবেল মেডিকেল স্কুল হইতে ডাক্তারি পাশ করেন। তাহার পর সাহেবগঞ্জের ওপারে মণিহারী গ্রামে গিয়া প্রথমে জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসাবে, পরে সেখানে দাতব্য চিকিৎসালয়ের মেডিক্যাল অফিসাররূপে ডাক্তারি জীবন আরম্ভ করেন। মণিহারী গ্রাম পূর্ণিয়া জেলায়। প্রথমে তাহা বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত ছিল, পরে বিহারের অন্তর্ভুক্ত হয়। ওই মণিহাবী গ্রামে ১৩০৬ সালে ৪ঠা শ্রাবণ (ইংরাজি ১৮৯৯ খৃঃ অঃ ১৯শে জুলাই) সন্ধ্যাকালে আমি জন্মগ্রহণ কবি।

আমার জন্ম-সময়ের দুই-তিনটি কাহিনী আমার মা-বাবার মুখে শুনিয়াছি। আমার জন্মের কয়েকদিন আগে হইতে এবং জন্মের কয়েকদিন পর পর্যন্ত এমন প্রবল বারিপাত হইয়াছিল যে, গঙ্গার জল, কোশীব জল এবং বৃষ্টির জল মিশিয়া আমাদের বাড়ির চারিদিকে এত জল জমিয়াছিল যে, আমাদের বাড়িটি দ্বীপের মতো হইয়া গিয়াছিল। আমাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবগণ নৌকাযোগে আসিয়া নবজাতকের মুখদর্শন করিয়াছিলেন। মণিহারী গ্রাম গঙ্গা নদী ও কোশী নদেব সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। গঙ্গার জল গৈরিক, কোশীর জল কালো। কোশী নদের এই শাখাটি মণিহারী অঞ্চলে 'কারি' কোশী (কালো কোশী) নামে পরিচিত। বড় হইয়া কৃষ্ণ-গৈরিকের অপরূপ সমন্বয় বহুবার উপভোগ করিয়াছি।

আমার জন্ম-সময়ের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সেই সময় আমাদের বাড়িতে 'চা' প্রথম প্রবেশ করে। আমাব জন্মের খবর পাইয়া আমার পিতৃবন্ধু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় সাহেবগঞ্জ হইতে নৌকাযোগে আসিয়া হাজিব হইলেন। তিনি শুধু সুগায়ক ও সু-অভিনেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সে যুগের আধুনিক। তিনি চা খাইতেন। তাঁহার জামার 'কাট', তাঁহার কার্পেটের 'পামশু' তাঁহার হাতের ছড়ি ও শৌখীন আংটি সকলের মনে ঈর্ষা উদ্রিক্ত করিত। তিনি আসিয়া দেখিলেন মায়ের একটু জ্বর-ভাব হইয়াছে, শরীর ম্যাজম্যাজ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিধান দিলেন, এক কাপ চা খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বাড়িতে চা ছিল না। মণিহারী ঘাটে লোক পাঠানো হইল। মণিহারী ঘাটের জাহাজে সেকালে 'কেলনার' কোম্পানীর রেষ্টুরেন্ট থাকিত। সেখানে চা পাওয়া যাইত। তৈরী চা এবং চায়ের পাতাও। প্রমথনাথ সম্ভবত ঘটিতে চা ভিজাইয়া গ্লাসে করিয়া চা পরিবেশন করিয়াছিলেন। কারণ বাড়িতে চায়ের বাসনপত্রও ছিল না।

আমার শৈশবকালের আর একটি ভয়াবহ ঘটনা মায়ের মুখে শুনিয়াছি। আমি যখন নিতান্ত শিশু তখন আমার বালিশের নীচে একটি সর্প-শিশু আবিষ্কার করিয়া

মা নাকি শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। সাপটিকে কিন্তু মারা যায় নাই। বালিশ সরাইবামাত্র সে দ্রুতবেগে অন্তর্ধান করিয়াছিল।

আমাদের বাড়িটা গ্রামের বাহিরে একটি 'বুনো' জায়গায় অবস্থিত ছিল। কাছে ছিল পীরবাবার পাহাড। পীরবাবার পাহাডের চারিদিকে বেশ জঙ্গল ছিল। শুনিয়াছি, আমাদের বাড়ির উঠানের ভিতর দিয়া বন্য খরগোস, সাপ, এমন কি বন্য শূকর পর্যন্ত যাতায়াত করিত। একবার একটি নেকড়ে বাঘও নাকি বাহির হইয়াছিল।

খুব ছেলেবেলার কথা আমার মনে নাই। একটা ঘটনা কেবল আবছাভাবে স্মরণ হইতেছে। আমাদের বাডির পশ্চিম দিকে খানিকটা জায়গা ছিল। সেখানে পরে কয়েকটা পেয়ারা গাছ লাগানো হইয়াছিল। আমাদের বাড়িটা ছিল বেশ উঁচু জায়গার উপর। বেশ খানিকটা ঢালু দিয়া নামিয়া সেই সরু পায়ে চলা রাস্তাটির উপর নামিতে হইত যে রাস্তাটি বন জঙ্গলের ভিতর দিয়া গিয়া অবশেষে পীরবাবাব পাহাডের দিকে চলিয়া গিয়াছে। বাড়িব কেহ আমাকে সে রাস্তায় নামিতে দিত না। আমার মনে হইত সে রাস্তাটি বাঁকিযা পীরপাহাড়ের ওধারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, না জানি সেখানে কি আছে। মনে পড়িতেছে একটা রহস্যময় স্বপ্ন ঘনাইয়া উঠিয়াছিল আমার কল্পনায়, রূপকথালোকের না জানি কি ঐশ্বর্য ওখানে মূর্ত হইয়া আছে। তখন আমার বয়স পাঁচ ছয় বছর ছিল। একদিন লুকাইয়া সেই পথে বাহির হইয়া পডিয়াছিলাম। দুপুরবেলা। চাকরেরা কেহ কাছে পিঠে ছিল না, মা ঘুমাইতেছিলেন। বাবা 'কলে' বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। আমার ছোট ভাই ভোলাও তখন মায়ের কাছে শুইয়া ঘুমাইতেছিল। আমি চুপি চুপি সেই পথে নামিয়া গেলাম। পথের ওপারে চাষের জমি, তাহার ওপারে কোশী। আশেপাশের দৃশ্যের কথা তেমন মনে নাই। একটুকুই শুধু মনে আছে, রাস্তাটি যেখানে বাঁকিয়া পীরপাহাড়ের নিকট গিয়াছে সেখানে গিয়া বড়ই হতাশ হইলাম। দেখিলাম ঘেঁটুবনের মাঝখানে একটা বাঁকা বাবলা গাছ দাঁড়াইয়া আছে। রূপকথালোকের কোনও আশ্চর্যজনক অলৌকিকত্ব কিছুই নাই। এরূপ স্বপ্নভঙ্গ আমার জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে, কিন্তু এই বোধহয় প্রথম।

আমার জীবনের আর একটি কথা এখানেই লিপিবদ্ধ করা উচিত। অতি শৈশবেই আমি খোলা মাঠে এবং খোলা আকাশের নীচে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমার ভাই ভোলানাথ আমার চেয়ে দেড় বছরের ছোট। সে যখন মাতৃগর্ভে ছিল তখনই আমি মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। মাতৃদুগ্ধের পরিবর্তে আমাকে মেলিন্স ফুড খাওয়ানো হইত। কিন্তু তাহা আমার পেটে সহ্য হইতেছিল না। এমন সময় এ সমস্যার একটি সমাধান মিলিল। আমাদের তখন অনেক চাষ-বাস ছিল, জমিতে প্রায় দশ বারোজন কৃষাণ খাটিত। তাহাদের মধ্যে একটি মুসলমান মজুর ছিল। তাহার নাম ছিল চামরু। তাহার তখন একটি মেয়ে হইয়াছিল। চামরুর বউ নাকি একদিন আসিয়া মাকে বলিয়াছিল—'আমার মেয়ে

আমার একটা থন-এর (স্তনের) দুধই খেয়ে উঠতে পারে না। আর একটা থন থেকে দুধ এমনি পড়ে যায়। আপনার যদি আপত্তি না থাকে আমি খোকাবাবুর জন্তে একটা থন আলাদা করে রেখে দিতে পারি।' বলিয়াছিল অবশ্য ছেকাছেনি ভাষায় হিন্দীতে। মা প্রথমটা নাকি রাজি হন নাই, কিন্তু শেষে আমার পেটে যখন 'মেলিন্স ফুড' কিছুতেই সহিল না তখন রাজি হইয়াছিলেন। চামরুর বউয়ের দুধ খাইয়া আমার শরীরের খুব উন্নতি হইয়াছিল নাকি। মা বলিতেন আমি নাকি এত মোটা হইয়াছিলাম যে, তিনি আমাকে কোলে তুলিতে পারিতেন না। এসব কথা অবশ্য আমার কিছুই মনে নাই, সবই মায়ের মুখে শুনিয়াছি। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়িতেছে। পরবর্তী কলেজ-জীবনে যখন আমি 'লিবারেল' হইয়াছিলাম, অর্থাৎ মুর্গি খাইতে শিখিয়াছিলাম তখন মা বলিতেন—ও ম্লেচ্ছ, হবেই তো! ছেলেবেলায় মুসলমানীর দুধ খেয়েছে যে! মা সেকেলে হিন্দু রমণী ছিলেন। নানা-রকম বাছ-বিচার ছিল তাঁহার। মুসলমান, খ্রীষ্টান এমনকি ব্রাহ্মদের স্পর্শ করিলেও তিনি মাথায় গঙ্গাজল ছিটাইয়া শুদ্ধ হইতেন। অবশ্য ইহা তাঁহাকে কর্তব্যবিমুখ করে নাই এ প্রমাণও আছে। আমি যখন মেডিকেল কলেজের সিক্সথ ইয়ারে পড়ি তখন আমার ডবল নিউমোনিয়া হইয়াছিল। ভালো হইয়া যাইবার পরও রোজ বিকালে একটু একটু জ্বর হইতে লাগিল। তখন আমার চিকিৎসক (ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়) আমাকে কিছুদিনের জন্য কলিকাতা ত্যাগের পরামর্শ দিলেন। বলিলেন—'তুমি তোমাদের মণিহারী গ্রামে ফিরে যাও। সকালে উঠে তোমাদের আমবাগানে চলে যেও। সেখানেই সমস্ত দিন থেকো। রোজ একটি করে মুর্গি খেও আর তিন চার চামচ কড লিভার অয়েল। আর কোন ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই।' আমাদের মৈথিল ঠাকুর ছিল, সে মুর্গি রাঁধিয়া দিতে সম্মত হইল না। মা নিজেই মুর্গি রাঁধিয়া দিতেন, তাহার পর স্নান করিতেন।

খুব ছেলেবেলায় আমাদের চাকরেরা আমাকে জংলিবাবু বলিয়া ডাকিত। নামটি সম্ভবত চামরুর বউই আমাকে দিয়াছিল। চামরুর বউ প্রায় প্রতিদিনই আমাকে জমিতে লইয়া যাইত। কখনও বাহিতলায়, কখনও কাটাহায়, কখনও কসিয়াতলায়, কখনও বা রঘুনাথ দিয়াড়ায়। খুব অস্পষ্টভাবে মনে পড়িতেছে, আমি একটি ছোট লাঠি হাতে লইয়া বনে জঙ্গলে শস্যক্ষেত্রে যদৃচ্ছ বিচরণ করিয়া বেড়াইতাম। কেহ আপত্তি করিলে আমি নাকি লাঠি উঁচাইয়া প্রতিবাদ জানাইতাম। মায়ের মুখে শুনিয়াছি আমাদের বৃদ্ধা রাঁধুনি 'বামুন দিদির' পিঠে আমার লাঠির বাড়ি প্রায়ই নাকি পড়িত। মোটেই সুবোধ বালক ছিলাম না। বাবার নিকট অনেক রোগী দেশী টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া আসিত। আমাদের সহিস পচনা আমাকে রোজ একটা না একটা ঘোড়ার উপর চড়াইয়া হাটের উপর টহল দিত। না দিলে আমি নাকি খুব কান্নাকাটি করিতাম। আমাদেরও দুইটা ঘোড়া ছিল, বাবা দূরে যাইতে হইলে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেন। কিন্তু সে ঘোড়া দুইটি বেশ বড় জাতের ঘোড়া, পাহাড়ী ঘোড়া। পচনা

তাহাদের পিঠে আমায় চড়াইতে সাহস করিত না। বাবা যখন কোথাও বাহিরে যাইতেন, তখন তাঁহার সহিত যাইবার জন্ত আমি খুব বায়না করিতাম। বাবা মাঝে মাঝে আমাকে তাঁহার কোলের কাছে সামনে বসাইয়া কিছুদূর লইয়া গিয়া আবার নামাইয়া দিতেন, ইহার একটা অস্পষ্ট ছবি মনে জাগিতেছে। তখন আমার বয়স কত ছিল মনে নাই, সম্ভবত ছয় সাত বৎসর। এই সময়কার আরও কয়েকটি আবছা ছবি মনে আছে। কয়েকটি কুকুরছানা, কয়েকটি খরগোস (দেশী এবং বিলাতী), একঝাঁক পায়রা, শালিক পাখী, টিয়া পাখী আর এক খাঁচা শাদা বিলাতী ইঁদুর। জীবজন্তু পোষার খুব ঝোঁক ছিল ছেলেবেলায়। ইহাদের কেন্দ্র করিয়াই ছেলেবেলায় অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা অনেক হর্ষ বিষাদ আমার চিত্তকে আবর্তিত করিয়াছে। কুকুরগুলি অবশ্য সবই প্রায় দেশী কুকুর ছিল। গ্রামে কোথাও কুকুরের বাচ্চা হইয়াছে শুনিলেই সেখানে যাইতাম এবং একটি বাচ্চাকে মনোনীত করিয়া আসিতাম। তাহার পর প্রত্যহ গিয়া দেখিতাম বাচ্চাটিকে। প্রায় মাস খানেক পরে দুধ ছাড়িবার পর তাহাকে বগলদাবা করিয়া বাড়ি লইয়া আসিতাম একদিন। তাহার পর তাহাকে তেজী করিবার জন্য তাহার গলায় একটি দড়ি বাঁধিয়া উঠানের একধারে বাঁধিয়া রাখিয়া দিতাম। সে তারস্বরে নানা গ্রামে চিৎকার করিতে থাকিত। তাহাকে লইয়াই সারাদিন ব্যস্ত থাকিতাম। তাহার পর ক্রমশঃ তাহার সহিত ভাব হইয়া যাইত। মা সাধারণত কুকুরকে ঘরে বা বারান্দায় ঢুকিতে দিতেন না। রাত্রে অবশ্য বারান্দার একধারে একটা কেরোসিন কাঠের বাকসে তাহাকে শুইতে দিতাম, মা তাহাতে আপত্তি করিতেন না। ছেলেবেলার কয়েকটি কুকুরের নাম এখনও মনে আছে। বাবা, কার্লো, টম। বাঘা ছিল হলদে রঙের কুকুর, গায়ে মাঝে মাঝে কালোর ছিটেফোঁটা ছিল। বাঘার কথা খুব স্পষ্ট মনে পরিতেছে না। মা নাকি বাঘাকে একটু সমীহ করিয়া চলিতেন। সে একাদশীর দিন উপবাস করিত। মায়ের ধারণা ছিল বাঘা কোন অভিশাপগ্রস্ত মহাপুরুষ। কার্লোর কথা খুব মনে আছে। কালো রঙের বেশ বলিষ্ঠ কুকুর ছিল সে। মুখটা খুব স্থচালো, কান দুটি খাড়া খাড়া। পচনা সহিস তাহাকে বুনো শুয়োরের চর্বি খাওয়াইয়াছিল। পচনার ধারণা ছিল কার্লোর বলিষ্ঠতা, সাহসিকতা ও তেজস্বিতা সবই নাকি ওই বুনো শুয়োরের চর্বি হইতে উদ্ভূত। কার্লো সত্যই খুব তেজী কুকুর ছিল। দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে পাড়ার সব কুকুরকে পরাজিত করিয়া 'চ্যাম্পিয়ন' হইয়াছিল। পাড়ার কোন কুকুর পারতপক্ষে তাহার সম্মুখীন হইত না। দৈবাৎ হইয়া পড়িলে মাথা নীচু করিয়া পিছনের পা দুটির ভিতর লেজ ঢুকাইয়া অত্যন্ত করুণভাবে বশ্যতা স্বীকার করিত। কার্লোর বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রধানত দেখা যাইত ছাগলদের বিরুদ্ধে। আমাদের বাড়ীর হাতায় সে কোন ছাগলকে ঢুকিতে দিত না। তাহাকে বড় বড় খাসীকে কাৎ করিয়া ফেলিতে দেখিয়াছি। সে ছুটিয়া গিয়া একেবারে ঘাড় কামড়াইয়া ধরিত। একবার একটা ছোট পাঁঠাকে মারিয়াই ফেলিয়াছিল। আমের সময় কার্লো আমাদের বাগানের

বিশ্বাসযোগ্য প্রহরীও ছিল। বাহিরের কোন লোককে সে বাগানে ঢুকিতে দিত না। আমাদের গর্বের বস্তু ছিল কার্লো। মা কিন্তু কার্লোর উপর তেমন প্রসন্ন ছিলেন না। মাঝে মাঝে সে উবু হইয়া বসিয়া উর্ধ্বমুখ হইয়া একটানা হু-উ হু-উ শব্দ করিত। মা বলিতেন, ইহা বড় কুলক্ষণ। মামাবাবু বলিতেন ও বোধহয় পূর্বজন্মে ওস্তাদ গায়ক ছিল। পূর্বজন্মের স্মৃতি মাঝে মাঝে মনে পড়িয়া যায়। তাই ওরকম করে।

টম দেশী কুকুর ছিল না। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছিল সে। বাবার বন্ধু প্রমথনাথ কুকুরটি সাহেবগঞ্জ হইতে আনিয়া আমাদের উপহার দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, টমের মা নাকি আসল ফক্স্ টেরিয়ার (Fox Terrier)। একটি নির্ভেজাল সাহেব গার্ডের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সাহেব বছরখানেক আগে বদলি হইয়া যাইবার সময় কুকুরীটিকে তাঁহাব এক বাঙালী বন্ধুকে দান করিয়া যান। সেই বাঙালীব গৃহে টমের জন্ম। প্রমথনাথ শুধু টমকেই আনেন নাই, সঙ্গে একটি ছবিও আনিয়াছিলেন। ছবিটিতে একটি ল্যাজকাটা বিলাতি কুকুর সবিস্ময়ে এবং সকৌতুকে একটি মার্জার শিশুকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। প্রমথনাথ বলিলেন, 'টমের ল্যাজ কাটতে হবে। সত্যচরণ তো বলে বেবিয়ে গেল, দুযোধন, তুমিই কাট।'

দুর্যোধন মণ্ডল—আমাদের দুর্যোধন কাকা—কম্পাউণ্ডার ছিলেন। তিনি সোৎসাহে রাজী হইয়া গেলেন। একটি ধারাল কাঁচি জলে ফুটাইয়া ফেলিলেন অবিলম্বে। ছবির মাপ অনুসারে প্রমথনাথ টমের ল্যাজের দুই স্থানে শক্ত সুতা বাঁধিয়া দিলেন। বলিলেন, এই দুটো বাঁধনের মাঝখানে কাটো। কচ করিয়া ল্যাজটা কাটিয়া ফেলিলেন দুর্যোধন কাকা, টম কেঁউ কেঁউ করিয়া উঠিল, কাটা লেজটা মাটিতে পরিয়া লাফাইতে লাগিল। আমরা তো বিস্ময়ে অবাক। টম বেশ ভাল কুকুর হইয়াছিল। যদিও আকারে ছোট ছিল, কিন্তু প্রতাপ ছিল খুব। বাবার কাছে যে সব বোগী আসত তাহারা এই বিলাতি কুত্তাকে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। আমাদের এই ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল অনেকে, প্রলুব্ধও হইয়াছিল। ইহার প্রমাণও পাওয়া গেল। টম চুরি গেল একদিন। খোঁজ খোঁজ রব পড়িয়া গেল চারিদিকে। কিন্তু টমকে আর পাওয়া গেল না। আমি আর একটা দেশী কুকুরের বাচ্চা পুষিয়া দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, মা কিন্তু সে চেষ্টায় বাধা দিলেন। বলিলেন, আর কুকুর পুষব না। কয়েকদিন পর দেখা গেল আমাদের উঠানে একটি ডাগড়া কুকুর আসিয়া বেশ সপ্রতিভভাবে দাঁড়াইয়া আছে এবং আমাদের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু ল্যাজ নাড়িতেছে। আঃ আঃ বলিয়া আহ্বান করিতেই সে গট গট করিয়া আগাইয়া আসিল। শুধু তাহাই নয়, আমাদের নিকট হইতে একটু দূরত্ব রক্ষা করিয়া বসিয়াও পড়িল এবং সামনের থাবা দুটির উপর মুখ রাখিয়া সোৎসুকে চাহিয়া রহিল আমাদের দিকে। ল্যাজ সমানে নড়িতেছে। আমি তখন বিস্কুট খাইতেছিলাম। এক টুকরো বিস্কুট তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিলাম। টুকরোটাকে মাটিতে পড়িতে দিল না সে, শূন্য হইতে গপ্ করিয়া খাইয়া ফেলিল। তাহার এই সার্কাস-সুলভ দক্ষতা দেখিয়া

মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মা-ও মুগ্ধ হইলেন এবং বলিলেন—এ মুখপোড়া নড়বে না দেখছি। মা-ই তাহার নামকরণ করিলেন 'উটকো'। দুই তিন দিন পরে উট্‌কোর একটি বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। সে ঠিক খাইবার সময় আমাদের বাড়িতে আসে। আমাদেব চাকর খাওয়া-দাওয়াব পর আমাদের পাত হইতে উদ্বৃত্ত ভাত প্রভৃতি লইয়া যেখানে ফেলিত —উট্‌কো সেইখানে ঠিক সময়ে রোজ আসিয়া বসিয়া থাকিত। যাহা পাইত খাইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইত। পরে জানা গেল, কয়েকটি বাড়িতেই সে এই ব্যবস্থা করিয়াছে। ঠিক খাওয়ার সময়ে যায়, যতটুকু পায় উদরস্থ করিয়া চলিয়া আসে। কাহারও বাড়িতে থাকে না। তাহার আস্তানা হাটতলায়। সেইখানে মাড়োয়ারীদের যে আটচালাটা ছিল সেইখানেই রাত্রে সে শয়ন করে। এবকম কুকুর আমি আর দেখি নাই। ছেলেবেলায় আরো কুকুর মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসিয়াছে, থাকিয়াছে, মাবা গিয়াছে। কিন্তু কেন জানি না আব কাহাবও কথা আমার মনে নাই। হয়তো তাহাদের কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। মনে দাগ কাটে নাই। তবে একটা না একটা কুকুর আমার জীবনে বরাবর আছে। সেদিন রকেট্‌, টিম্‌ ছিল। জুলু, ভুটান ছিল। জাম্বু ছিল। এখন কলিকাতা শহরে একটা বাড়িতে আছি। এখানে কুকুর পোষা সম্ভব নয়।

ছোটবেলায় আমার আরও সঙ্গী ছিল। শালিকেব বাচ্চা চাকরেরা আমাকে আনিয়া দিত। আমাদের বাড়িব আশেপাশেই তাহাদের পাওয়া যাইত। আমাদের বাডির দেয়ালের ফাঁকেই বাসা বাঁধিত শালিক পাখিরা। একবার টিয়া পাখির বাচ্চা এবং বুলবুল পাখির বাচ্চাও তাহারা আমাকে আনিয়া দিয়াছিল। কিন্তু একটিও আমি বাঁচাইতে পারি নাই। তাহাদের ছাতুগোলা, ফলের টুকরা প্রভৃতি খাওয়াইতাম। আমাদের চাকর ভাগিয়া বলিয়াছিল, ফড়িং ধরিয়া উহাদেব খাওয়াইলে উহারা বাঁচিবে। ফড়িং ধরিবার চেষ্টাও করিতাম। কিন্তু ফড়িং ধরা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়া একদিন দুইটা মাত্র ফড়িং ধরিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাও পাখিদের খাওয়াইতে পারি নাই। মোটকথা ছেলেবেলায় আমি পাখি পুষিতে পারি নাই। একটু বড় হইলে মা আমার সে সাধ মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন আমি স্কুলে পড়ি। মা কলিকাতা হইতে মামাবাবুকে দিয়া একবার একটি বড টিয়াপাখি কিনিয়া আনাইলেন। চমৎকার টিয়া। মা তাহার নাম রাখিলেন দুর্গাদাস। মা রোজ তাহাকে রাধাকৃষ্ণ নাম শিখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি তাহাকে নিজের হাতে ছোলা দিতাম। পাকা লঙ্কা দিতাম। আমার সহিত খুব ভাব হইয়া গেল। খাঁচার মধ্যে আঙুল পুরিলে প্রথম প্রথম সে কামড়াইয়া দিত। কিন্তু পরে আর কামড়াইত না। বরং গলাটা বাড়াইয়া দিত। আমি তাহার গলায় সুড়সুড়ি দিতাম। সে আরামে চোখ বুজিয়া থাকিত। এইভাবে বেশ চলিতেছিল। কিন্তু একদিন আমার দুর্বুদ্ধি হইল। আমার বইয়ের শেলফে ও পড়িবার টেবিলে রং করিবার জন্য স্টীমারের সারেং আমাকে কিছু

লাল রং দিয়া গেল একদিন। আমার শেল্‌ফে এবং টেবিলে লাগাইবার পরও কিছুটা রং বাঁচিয়া গেল। আমার মনে হইল পাখির খাঁচাটাতেও যদি রং লাগাইয়া দিই কেমন হয়? লাল খাঁচায় সবুজ পাখি তো চমৎকার দেখাইবে। আমি সমস্ত খাঁচাটায় লাল রং মাখাইয়া দিলাম। তাহার পর স্কুলে চলিয়া গেলাম। স্কুল হইতে ফিরিয়া দেখি দুর্গাদাস খাঁচার মধ্যে মরিয়া পড়িয়া আছে। মা বলিলেন—কি করেছ দেখ। খাঁচায় রং লাগাতে কে বলেছিল তোমায়? সমস্ত দুপুর পাখিটা ওই রং চেটে খেয়েছে। বিকেলে দেখি মরে পড়ে আছে। নিশ্চয় বিষ ছিল ওই রঙে। তোমার ঐ শেল্‌ফ আর টেবিলও ফেলে দাও। নতুন শেল্‌ফ আর টেবিল করে দেব তোমাকে। আমার শেল্‌ফ আর টেবিলও মা পুড়াইয়া ফেলিলেন। ইহার পর আর কোনও পাখি আমি পুষি নাই। মা আর পুষিতে দেন নাই।

ছেলেবেলার আর একটি পোষা প্রাণীর কথা মনে পড়িতেছে। সেটি একটি কালো খরগোস। কুচকুচে কালো খরগোস প্রায় দেখা যায় না। সর্বাঙ্গ কুচকুচে কালো, চোখ দুটি টকটকে লাল। নীলকুঠির এক সাহেব জমিদার বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যান। তিনি যাইবার সময় তাঁহার পোষ্য জীবগুলি বন্ধুবান্ধবদের দান করিয়া যান। তিনি বাবাকে একটি কাকাতুয়া এবং এই খরগোসটি দিয়া গিয়াছিলেন। মা কিছুতেই আর পাখি পুষিতে রাজি হইলেন না। মায়ের আরও আপত্তি হইল, কাকাতুয়াটি ইংরেজী ভাষায় 'ড্যাম' 'নিগার' প্রভৃতি কথা বারবার বলে। তিনি পাখিটিকে বিদায় করিয়া দিলেন। বাবাই আর কাহাকে যেন দান করিলেন সেটি। সম্ভবত জোন্‌স সাহেব গার্ডকে। স্টেশনের একটা কুলি আসিয়া পাখিটিকে লইয়া গেল। খরগোসটি আমাদের বাড়িতে রহিল। আমি সেটিকে লইয়া মাতিয়া উঠিলাম। নিজ হাতে তাহার জন্য দুর্বাঘাস সংগ্রহ করিয়া তাহার খাঁচায় ঢুকাইয়া দিতাম। সাহেব যে খাঁচাটি দিয়াছিলেন সেটিও চমৎকার। দরজা না খুলিয়া উপর হইতে খাঁচায় খাবার দেওয়া যায়। আমি স্কুল হইতে আসিয়াই প্রথমে খরগোসটির তদারক করিতাম। মা আমাকে যে খাবার দিতেন—লুচি, রুটি বা পরোটা—তাহার অংশ তাহাকে দিতাম। কোনদিন খাইত, কোনদিন খাইত না। আমাদের বাড়ির মেথর প্রতিদিন আসিয়া তাহার খাঁচাটা পরিষ্কার করিয়া দিত। তখন সে খরগোসটাকে খাঁচা হইতে বাহির করিত এবং আমি তাহাকে ধরিয়া থাকিতাম। একবার সে আমার হাত ফসকাইয়া পলাইয়া গিয়া বাড়ির পিছনের জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়াছিল। অনেক কষ্টে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা হয়। ইহার পর হইতে খাঁচা পরিষ্কার করিবার সময় বেশ শক্ত করিয়া তাহাকে ধরিয়া থাকিতাম। প্রতিদিন রাত্রে শুইতে যাইবার পূর্বেও খাঁচার দরজাটা খুলিয়া দেখিতাম খরগোসটা ঠিক আছে কিনা। তাহার গায়ে মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া খাঁচার দরজাটি ভালো করিয়া বন্ধ করিয়া তবে শুইতে যাইতাম। ইহা আমার দৈনন্দিন কর্ম ছিল। একদিন কিন্তু একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। আমাদের জমিতে নানারকম ফসল ফলিত। তখন পাটের সময়।

পাট শুকাইয়া সেগুলি বড় বড় বাণ্ডিল করিয়া আমাদের পূর্বদিকের বারান্দায় চাল পর্যন্ত স্তূপীকৃত করা ছিল। প্রতি বছরই থাকিত। আমাদের বাড়ি পাকাবাড়ি ছিল না, মাটির চওড়া দেওয়ালের উপর প্রকাণ্ড খড়ের চাল। একদিন রাত্রে যেই খরগোসের খাঁচাটি খুলিয়াছি অমনি খরগোসটি বাহির হইয়া গেল এবং ছুটিয়া গিয়া সেই পাটের গাদার মধ্যে লুকাইয়া পড়িল। মা তখন রান্নাঘরে। আমি ঘরের কোণে পিলসুজের উপর যে প্রদীপটি ছিল তাহা লইয়াই খরগোসটির অনুসরণ করিয়া সেই স্তূপীকৃত পাটের বস্তার পাশে যে সরু গলি মতো রাস্তা ছিল তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। বুঝিতে পারি নাই প্রদীপের শিখায় কখন পাটে আগুন ধরিয়া গিয়াছে। একটু পরেই দেখিলাম আমার চারিদিকে আগুন জ্বলিতেছে। আমাদের চুলুহা নামক ষণ্ডা চাকরটা ছুটিয়া সেই অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং আমাকে টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল। বাবা আমাব গালে ঠাস করিয়া একটা চড় মারিলেন। চাকরের দল জ্বলন্ত পাটের বস্তাগুলোকে ছুঁড়িয়া উঠোনে ফেলিতে লাগিল। কারু নামক চাকরটি ইঁদারা হইতে জল তুলিয়া জ্বলন্ত বাণ্ডিলগুলির উপর জল ঢালিতে লাগিল ক্রমাগত। একটা হৈ হৈ তুলকালাম কাণ্ড পড়িয়া গেল চতুর্দিকে। সকলেই বলিতে লাগিল, ভাগ্যে ঘরের চালে আগুন ধরিয়া যায় নাই। আমি ভাবিলাম, খরগোসটা বোধহয় পুড়িয়া মরিয়াছে। কিন্তু একটু পরে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখিলাম সে নিজের খাঁচার ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। গোলমাল দেখিয়া নিরাপদ স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে। মা তাহার পরদিনই খরগোসটাকে বিদায় করিয়া দিতে চাহিলেন। বাবা কিন্তু বলিলেন, না থাক, একজন বন্ধু উপহার দিয়ে গেছে, যতদিন থাকে থাক। বেশীদিন কিন্তু তাহাকে রাখিতে পারি নাই। সুযোগ পাইলেই খরগোসটা খাঁচার বাহিরে চলিয়া যাইত। একদিন আবার সে পশ্চিমদিকের ঘন জঙ্গলের মধ্যে পলাইয়া গেল। কিছুতেই আর তাহার খোঁজ পাওয়া গেল না। কয়েকদিন পরে পাওয়া গেল তাহার মৃতদেহটা। ভাগিয়া নামক চাকরটি বলিল, শৃগাল বা বিড়াল উহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

ইহার পর আর কোন পশু বা পাখি পুষিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ইহার পর আমি মাছ লইয়া মাতিয়া ছিলাম। বড় বড় ফাঁক-মুখো শিশিতে মাছ পুষিয়াছি অনেক। পাড়াগাঁয়ে থাকিতাম—লাল নীল রঙীন মাছ পাওয়ার সুযোগ ছিল না। কিন্তু হাটে একপ্রকার খল্‌সে মাছের মতো জীবন্ত মাছ পাওয়া যাইত, তাহার গায়ে অস্পষ্ট লাল নীল রং। সেই মাছই পুষিতাম। ভোলা মাছ বলিয়া পরিচিত আর একরকম ছোট মাছ পুষিবারও সখ ছিল খুব। ভোলা মাছের পেটটা বেলুনের মতো ফুলিয়া উঠিত। পেটের উপরটা ছিল কালো। দেখিতে অদ্ভুত ধরনের। মাছেদের মুড়ি খাইতে দিতাম। শিশির ভিতর মুড়ি ফেলিয়া দিলে মাছেরা উপরে ভাসিয়া উঠিয়া টপটপ করিয়া মুড়িগুলি খাইয়া ফেলিত। অন্যান্য খাবারও তাহাদের দিতাম। সব খাবার তাহারা খাইত না। প্রতিদিন জল বদলাইয়া দিতাম। শিশির ভিতর

কিছু মাটি ও শ্যাওলাও ঢুকাইয়া দিতাম। কিন্তু তবু তাহাদের বাঁচাইতে পারি নাই। কিছুদিন পরেই তাহারা মরিয়া ভাসিয়া উঠিত। যেদিন উঠিত সেদিন গভীর শোকের ছায়া নামিত মনে। মনে হইত কোন পরমাত্মীয় চিরদিনের মতো চলিয়া গেল। তাহাদের অকাল মৃত্যুর জন্য আমিই যে দায়ী একথা কিন্তু কখনও মনে হইত না।

আমরা স্কুলে গিয়াছিলাম একটু বড বয়সে। আমাদের প্রথম পড়াশুনা আরম্ভ হয় বাড়িতে। তারাপদ পণ্ডিত মহাশয় একবার সরস্বতী পূজার দিন আমাদের হাতে খড়ি দিয়াছিলেন। তারাপদ পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন সতীশবাবুর ভাই। সতীশবাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহের জমিদারি কাছারির গোমস্তা ছিলেন। একটি চাকরি জুটাইয়া দিবার জন্যই তিনি ভাইকে মণিহারিতে লইয়া আসিয়াছিলেন। জমিদারি কাছারিতে তাঁহার একটি কাজও নাকি জুটিয়াছিল। কিন্তু সে কাজ তাঁহার ভালো লাগে নাই। আমাদের বাড়ি তখন অনেক লোকেব আশ্রয়স্থল ছিল। বাবার অনেক রোগীদের আত্মীয়-স্বজন মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসিয়া থাকিতেন। অনেক চাকুরীপ্রার্থী আসিয়া জুটিতেন। বাবাদের একটা থিয়েটার পার্টি ছিল। সে পার্টির অনেক লোকেব আস্তানা ছিল আমাদের বাড়িতে। তাছাড়া আমাদের বাড়ির কাছে রেলওয়ে স্টেশন থাকাতে অনেক লোক আমাদের বাড়িতে আসিয়া একবেলা খাইয়া তাহার পর ট্রেন ধরিতেন। ও অঞ্চলের জমিদারদের আমলা গোমস্তারা প্রায়ই মোকর্দমা উপলক্ষে কাটিহার কিংবা পূর্ণিয়া যাইতেন। বাবা সকলেরই ডাক্তার ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা অসঙ্কোচে আমাদের বাড়িতে বিশ্রাম করিয়া যাইতেন এক আধবেলা। গঙ্গার ঘাটও ছিল আমাদের বাড়ির নিকটে। সুতরাং গঙ্গাস্নান উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে বেশ জনসমাগম হইত। ও অঞ্চলে কোনও হোটেল ছিল না, ডাকবাংলো তখনও হয় নাই, সুতরাং অনেক গভর্ণমেণ্ট অফিসাররা আসিয়াও আমাদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। শিকার করিবার জন্য অনেক পক্ষীলোলুপ শিকারীও মাঝে মাঝে পদার্পণ করিতেন আমাদেব বাড়িতে। আমাদের বাড়িতে প্রত্যহ দশ বারোজন বাহিরের লোক আহারাদি করিতেন তখন। বামুনদিদি ছিলেন রাঁধুনী। তারাপদ পণ্ডিত মহাশয়ও এই ভীড়ে ভিড়িয়া গেলেন। বাবা তাঁহাকে বলিলেন—যতদিন কোন ভালো চাকরি না পান, ততদিন আমার ছেলে দুটির দেখাশোনা করুন আপনি। তারাপদ পণ্ডিত মহাশয়ই হাতে-খড়ি দিয়াছিলেন আমাদের। তাঁহার বিদ্যা কতদূর ছিল তাহা আমার জানা নাই, কিন্তু তাঁহার স্নেহময় স্বভাব, তাঁহার সরলতা, আমাদের শিখাইবার জন্য তাঁহার আগ্রহ যে নিখাদ নির্মল ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি। কখনও মিথ্যা ভাষণ করিতেন না, কখনও অধীর হইতেন না। আজও তাঁহাকে ভক্তি করি আমি। বাবার চেষ্টাতেই মণিহারি গ্রামে একটি লোয়ার প্রাইমারি স্কুল স্থাপিত হয়। গ্রামের দুর্গা মণ্ডপে—যেখানে প্রতি বছর দুর্গাপূজা হইত—সেইখানেই স্কুলটি প্রথমে বসিয়াছিল। গ্রামের কয়েকটি ছোট ছেলে লইয়া স্কুলটি আরম্ভ হয়। তারাপদ পণ্ডিত স্কুল শেষ হইলে প্রত্যেক ছেলেকে নিজে গিয়া

তাহাদের বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতেন। তাহার পর আমাদের বাড়িতে একজন বাঙালী ডিভিশনাল ইনসপেক্টর আসেন, তিনি স্কুলটিতে গভর্ণমেণ্ট সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আসিয়া আমার পড়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি যখন আসিয়াছিলেন তখন বাবা বাড়িতে ছিলেন না। আমি বাহিরের ঘরে চেয়ারে বসিয়া একটি মোটা বই হইতে উচ্চৈঃস্বরে কবিতা পাঠ করিতেছিলাম। এতটুকু ছেলে এত মোটা বই হইতে গড় গড় করিয়া কবিতা আবৃত্তি করিতেছে দেখিয়া তিনি বেশ বিস্মিত হইয়াছিলেন। কাছে আসিয়া দেখিলেন, বইটি আমি উল্টা করিয়া ধরিয়া আছি। আমাদের বাড়িতে একজন রামায়ণ পাঠ কবিতেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ। শুনিয়া শুনিয়া আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। তখনও আমি পড়িতে শিখি নাই। বাবার সহিত ইন্‌সপেক্‌টার মহাশয়ের যখন সাক্ষাৎ হইল তিনি বলিলেন—ইহাকে এখন স্কুলে ভর্তি করিবেন না। বেশী পড়ার চাপ দিলে পাগল হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং দুই বছর আমাকে স্কুলে যাইতে হয় নাই। তারাপদ পণ্ডিত মহাশয় বাড়িতে আমাকে যৎসামান্য পড়াইতেন। এই সময় আমাদের বাড়িতে আর একটি অদ্ভুত লোকও ছিলেন। তাঁহার নাম কেশ মশাই। তিনি গান করিতে পারিতেন, বেহালা চমৎকার বাজাইতেন, পায়ে ঘুঙুর পরিয়া নৃত্যও করিতেন মাঝে মাঝে। সাধারণ থেলো হুঁকায় লম্বা লাল রংয়ের একটি নল লাগাইয়া তিনি তামাক খাইতেন। হুঁকায় মুখ লাগাইয়া খাইতেন না। সেকালের এণ্ট্রান্স পাশ ছিলেন শুনিয়াছি। চাকরি করিবার ইচ্ছা থাকিলে ভালো চাকরি পাইতেন। কিন্তু তিনি ভবঘুরে প্রকৃতির লোক ছিলেন। এক জায়গায় বেশীদিন থাকিতে পারিতেন না। গুণী লোকের সন্ধান পাইলে আমার বাবা তাঁহাদের আপ্যায়িত করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। অনেকে আমাদের বাড়িতে কিছুদিন থাকিয়াও যাইতেন। কেশ মশাই আমাদের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। তিনিই আমাকে প্রথম ইংরেজী অক্ষর পরিচয় করাইয়া দেন। সকালের দিকে মেজাজ খুশি থাকিলে আমাকে লইয়া বসিতেন। আমি সুবোধ বালক ছিলাম না। নানারকম দুষ্টামি করিতাম। তখন তিনি তাঁহার হুঁকার নলটি লইয়া আস্ফালন করিতেন—'মারব কিন্তু'—কিন্তু মারিতেন না। হাসিতেন। সন্ধ্যার দিকে কেশ মশাই গুম হইয়া বসিয়া থাকিতেন। আফিং খাওয়া অভ্যাস ছিল। কোন-কোনদিন খেয়াল হইলে বেহালা বাজাইতেন। আমাদের বাড়িতে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই গান-বাজনার একটা আসর বসিত। আমিও সে আসরে বসিতাম। মাঝে মাঝে দুই একটা গানও গাহিয়াছি মনে পড়িতেছে। কাটিহার হইতে এবং সাহেবগঞ্জ হইতে অনেকে আসিতেন। বাবার খুব বন্ধু ছিলেন তিনি। খুব ভালো গান গাহিতে পারিতেন। অনেক সময় থিয়েটারের রিহার্সালও হইত। আলিবাবা রিহার্সালের কথা আমার মনে আছে। তাহাতে মর্জিনা যিনি ছিলেন তিনি কাটিহার হইতে আসিতেন। রেলের কর্মচারী ছিলেন। খুব ভালো নাচিতে পারিতেন। রোগা রোগা কালো রং, নামটি ভুলিয়া গিয়াছি। বাবা বৈকালেই 'কলে' বাহির হইয়া

যাইতেন। 'কল' হইতে ফিরিয়াই যোগ দিতেন সেই মজলিশে। সে মজলিশে স্টেশনের বাবুরা, থানার দারোগা সাহেব, জমিদার কুঠির আমলারা, পোস্টমাস্টার, মণিহারী ঘাটের বাঙালী কর্মচারীরা, সকলেই উপস্থিত থাকিতেন। রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত গান বাজনা হইত। আমি যতক্ষণ পারিতাম ঐ আসরে বসিয়া থাকিতাম। কিন্তু রাত্রি নয়টার সময় মা আমাকে চাকর পাঠাইয়া লইয়া যাইতেন। আমার তো পড়াশোনার বালাই ছিল না, সুতরাং সন্ধ্যাবেলা পড়িবার জন্য কেহ ডাকাডাকি করিত না। যাহা খুশি করিয়া বেড়াইতাম। বেশীর ভাগ সময় কাটিত মাঠে মাঠে। চাষের চাকরদের নাম এখনও মনে আছে। চামরু ফরিদ পাচ্ছা চুলুহা বির্জা ভাগিয়া জগন্নাথ মধুয়া। মধুয়া আমাদের বাড়ির চাকর ছিল। খুব হুড়ো গোছের ছিল সে। প্রায়ই তাহার সহিত উঠানে ছুটাছুটি করিতাম। ধরিয়া ফেলিলেই সে আমাকে কাইকুতু দিত। মা খুব বকাবকি করিতেন। কিন্তু আমরা গ্রাহ্য করিতাম না।

যে লোয়ার প্রাইমারি স্কুলের উল্লেখ করিয়াছি, সে স্কুলে আমি বেশী দিন যাই নাই। ওই লোয়ার প্রাইমারি স্কুল পরে প্রাইমারি হইল। সে স্কুলেও বাবা আমাকে পাঠান নাই। সেই স্কুল শেষে যখন মাইনর স্কুলে পরিণত হইল তখন সেই স্কুলে আমি ভর্তি হইলাম। তখন আমাব বয়স প্রায় নয় বৎসর। যখন মাইনর স্কুল হইল তখন আমার কাকাবাবু স্বর্গীয় চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্কুলের হেডমাস্টাররূপে নিযুক্ত হইলেন। বাহির হইতে একজন হেড-পণ্ডিত আসিলেন। যতদূর মনে পড়িতেছে তাঁহার নাম যতীন দত্ত। ডুবরাজপুরে বাড়ি, নর্মাল ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তিনি আমাদের বাড়িতেই থাকিতেন এবং আমাদের (আমাকে এবং আমার ভাই ভোলাকে) পড়াইতেন। ভোলা আমার অপেক্ষা মাত্র দেড বছরের ছোট ছিল। আমরা দুইজনে একই ক্লাশে ভর্তি হইলাম। আমার সেই বাল্যকালে কাকাবাবুই কিন্তু আমাদের প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন। যতীন পণ্ডিতের নিকট আমরা স্কুলের পড়া পড়িতাম, কিন্তু কাকাবাবু আমাদের অন্যরকম শিক্ষা দিতেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে প্রত্যহ সকালে উঠিয়া বাড়ির গুরুজনদের প্রণাম করিতে হইত। তাহার পর হাতমুখ ধুইয়া বারান্দায় হাত জোড় করিয়া চোখ বুজিয়া ভগবদ বিষয়ক কবিতা পাঠ করিতে হইত। 'জয় ভগবান সর্ব শক্তিমান'—এই কবিতাটি আমাদের মুখস্থ করিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়া একটি সংস্কৃত শ্লোকও মুখস্থ করিয়াছিলাম আমরা—'ত্বমেব মাতা, পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বিদ্যা, দ্রবিণং ত্বমেব'—এইটি তাহার প্রথম লাইন। সকালে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল—আদা, ছোলা, গুড় এবং দুধ। কাকাবাবুর সামনে বসিয়া সেগুলি খাইতে হইত। কি করিয়া কাপড় পরিতে হয়, কাছা ও কোঁচার সামঞ্জস্য কি করিয়া রক্ষা করিতে হয়, কি করিয়া দাঁত মাজিতে হয় তাহা তিনিই শিখাইয়াছিলেন। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন এবং তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা ছিল যে আমরাও নিরামিষাশী হই। কিন্তু আমরা মাছ মাংসের লোভ ছাড়িতে পারি নাই। কাকাবাবু অবশ্য ইহা লইয়া জোর জবরদস্তি করেন নাই কখনও। তবে আমরা বুঝিতে পারিতাম

মাছ মাংসের সম্বন্ধে জুগুপ্সা প্রকাশ করিলে তিনি খুশি হইবেন। কিন্তু আমরা তাহা কোনদিনই করি নাই। আমার বাবা এসব বিষয়ে খুব উদার মতাবলম্বী ছিলেন। খাদ্যবিলাসীও ছিলেন তিনি। খাইতেও পারিতেন খুব। মাছও প্রচুর পাওয়া যাইত। বড় পাকা রুই মাছের সের ছিল চার আনা। প্রকাণ্ড বড় চিতল মাছ বারো আনা বা এক টাকায় পাওয়া যাইত। ছোট মাছের দর ছিল দু আনা সের। আমাদের বাড়িতে তরিতরকারি প্রচুর হইত। প্রকাণ্ড একটা সবজির বাগানই ছিল আমাদের। কপি বেগুন আলু মূলা নানারকম শাক বিলাতী বেগুন এত ফলিত যে পাড়ার লোকেদের বিতরণ করা হইত। হাটেও বিক্রি হইত কিছু কিছু। আমাদের বাড়ির সামনেই হাট ছিল। তখন মাংস খাওয়া তেমন প্রচলিত হয় নাই। গোঁড়া হিন্দুরা বৃথা মাংস খাইতেন না। গ্রামে কসাই-এর দোকানও ছিল না। আমাদের বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় এবং কালিপূজার সময় অনেক 'মুণ্ডহীন' পাঠার সমাগম হইত। বাবার রোগীরা সেগুলি ডাক্তারবাবুকে উপহার স্বরূপ পাঠাইত। দুধের অভাব ছিল না। আমাদের বাড়িতেই প্রচুর গাই এবং একটি মহিষী ছিল। ঘি দুধ ক্ষীর ছানা পায়সের অভাব কখনও অনুভব করি নাই। মা ঘরে সন্দেশও করিতেন। বাবা সকালে অশ্বারোহণে রোগী দেখিতে বাহির হইতেন কিছু লুচি ও তরকারি খাইয়া। তাঁহার ঔষধের বাক্স বহিয়া তাঁহার পিছু পিছু যাইত পচনা সহিস। সেই ঔষধের বাক্সে একটি কৌটায় মা কিছু খাবার দিয়া দিতেন। বাবা ফিরিতেন বৈকালে। তাঁহার বৈকালিক আহার ছিল দশ-বারোখানা মোটা আটার রুটি বা পরোটা। সঙ্গে একবাটি বুটের ডাল এবং প্রচুর আলুর দম। ইহার পর আবার তিনি কলে বাহির হইয়া যাইতেন। ফিরিতেন রাত্রি আটটা নটা নাগাদ। তখন আমাদের বাড়িতে গানের আসর জমিয়া উঠিয়াছে। সেখানে তিনি যোগদান করিতেন। রাত্রি এগারোটা, সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত গানের জলসা বা থিয়েটারের রিহার্সাল চলিত। তাহার পর রাত্রের খাওয়া দাওয়া। বাবার সহিত রাত্রে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া তাঁহার অনেক বন্ধু আহার করিতেন। সে আহারও ভূরিভোজন।

আমার কাকাবাবু তাঁহার দাদার ম্লেচ্ছ আচরণ যদিও পছন্দ করিতেন না, কিন্তু কখনও তাঁহাকে প্রতিবাদ করিতে শুনি নাই। বাবাকে দেখিলে তিনি ভয়ে জড়সড় হইয়া যাইতেন। বাবা কোন কারণে রাগিয়া গেলে ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। দাদার মুখের উপর কখনও একটি কথাও তিনি বলেন নাই। যদিও দাদার বিজাতীয় আচরণ (যথা, পেঁয়াজ খাওয়া, যার তার হাতে খাওয়া, সন্ধ্যাহ্নিক না করা, ব্রাহ্মদের সহিত বন্ধুত্ব করা) তিনি অপছন্দ করিতেন, কিন্তু দাদাকে প্রকৃতই ভক্তি করিতেন তিনি। আমার জীবনে এরূপ ভ্রাতৃভক্ত লোক বড় একটা দেখি নাই। আমি যখন ডাক্তার হইয়াছি, বাবা এবং কাকাবাবু যখন বৃদ্ধ তখনও দেখিতাম কাকাবাবু বাবাকে ঠিক আগেকার মতই সমীহ করিয়া চলেন। বাবা রাগিয়া গেলে ভয়ে অস্থির হইয়া যান। সেই ছেলেবেলায় কাকাবাবুর নিকট হইতে আমরা অনেক কিছু শিখিয়াছিলাম।

ইংরেজী উচ্চারণ যাহাতে বিশুদ্ধ হয়, সে বিষয়ে তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। ভালো ভালো ইংরেজী কবিতা তিনি আমাদের মুখস্থ করাইতেন। বাংলা কবিতাও। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা রে দূত', নবীন সেনের 'কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ', হেমচন্দ্রের 'বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে, সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে', তাঁহার 'জীবন সঙ্গীত', রবীন্দ্রনাথের 'আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে',—এবং আরও অনেক কবিতা তিনি আমাদের মুখস্থ করাইয়াছিলেন। সেগুলি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আবৃত্তির ভঙ্গিতে তাঁহাকে শুনাইতে হইত। আমরা যখন মাইনর স্কুলে পড়িতাম তখন আবৃত্তিও একটা পরীক্ষণীয় বিষয় ছিল। আবৃত্তিতে একশ' নম্বর থাকিত। আরও অনেক রকম বিষয় ছিল। ফ্রি হ্যাণ্ড ড্রইং, মডেল ড্রইং। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ। আশপাশের গাছপালা, আকাশের নক্ষত্র, মেঘ প্রভৃতি বিষয়েও জ্ঞানলাভ করিতে হইত। এই বিষয়টিতে কাকাবাবুর সাহায্য পাইতাম। তিনিই আমাদের প্রথম সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডলী চিনাইয়া দিয়াছিলেন। আর একটি জিনিসও তিনি প্রত্যহ আমাদের মুখস্থ করাইতেন। ঊর্ধ্বতন সাতপুরুষের নাম—কেদারনাথ, মহেশচন্দ্র, রামকানাই, অনন্তরাম, নারায়ণ ওঝা, বিবর্তন, উদ্ধব প্রত্যহ তাঁহার নিকট বলিতে হইত। আমাদের যখন উপনয়ন হইল (অল্প বয়সেই হইয়াছিল) তখন উপবীতে গ্রন্থি দিবার মন্ত্রটিও তিনি আমাদের শিখাইয়াছিলেন—ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পর্ত্য, প্রবরস্য। বলিতেন আমাদের বংশে এই তিনজনই প্রবর—ভরদ্বাজ, অঙ্গিরা এবং বৃহস্পতি। আমার কাকাবাবুর মতো শিক্ষক দুর্লভ। তাঁহার হাতের লেখাও ছিল চমৎকার। তিনি গোঁড়া ছিলেন। ব্রাহ্ম, ক্রিশ্চান এবং মুসলমানদের সহিত তিনি অভদ্র ব্যবহার করিতেন না বটে, কিন্তু তাহাদের সহিত বিশেষ মাখামাখিটা তিনি পছন্দ করিতেন না। অন্তঃপুরিকাদের সম্বন্ধেও তিনি আধুনিকতার বিরোধী ছিলেন। মেয়েদের অনাবৃত-মুখে যেখানে-সেখানে যাওয়া, জুতা-পরা, আধুনিকতার নামে বেহায়াপনা করা—এসব তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। বাড়ি হইতে কোথাও যাইবার সময় পাঁজি খুলিয়া দিন-ক্ষণ বিচার করিতেন। একবার মনে আছে কাকীমাকে তিনি পুরুলিয়া হইতে আনিতে গিয়াছেন, আমরা যথাসময়ে তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য স্টেশনে গিয়াছি। ট্রেন আসিল, কিন্তু কাকীমা আসিলেন না। খানিকক্ষণ পরে কাকাবাবুর একটি টেলিগ্রাম আসিল—

Could not start. Seven pundites object starting on an inauspicious day.

কাকাবাবু গোঁড়া ছিলেন বলিয়া হিন্দু বিহারীরা তাঁহাকে খুব সম্মান করিতেন। আমাদের সংসারের নানা জাতের লোকের মধ্যে বাস করিয়া এবং বাবার জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে আঁকড়াইয়া ধরা মনোবৃত্তি সত্ত্বেও যে তিনি তাঁহার সনাতনী ছুঁৎমার্গে চলিতে পারিয়াছিলেন এজন্য বিহারীরা তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিত। অনেক

মিশিরজী পাড়েজী এবং ওঝাজী তাঁহার ভক্ত ছিল। মণিহারী গ্রামে দুর্গা ওঝা তখন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কাকাবাবুকে খুব ভক্তি করিতেন। তাঁহার ছেলে বৈজনাথ আমাদের দুই ক্লাশ নীচে পড়িত। দুর্গা ওঝা কাকাবাবুকে বৈজনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কাকাবাবুকে দিয়া কিছু ইংরেজী চিঠিপত্রও তিনি লিখাইয়া লইতেন। এজন্য মাসে তাঁহাকে কুড়ি টাকা বেতন দিতেন। এ যুগে কুড়ি টাকা দুই শত টাকার সমান। কাকাবাবুকে ওঝাজী শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়াই তিনি আমাদের মাইনর স্কুলের জন্য একটি গৃহনির্মাণ করাইয়া দেন। এ সম্বন্ধে বাবাও তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মাটির দেওয়াল এবং খড়ের চাল দিয়া বেশ বড় একটি স্কুল-গৃহ করাইয়া দিয়াছিলেন। এই স্কুল স্থাপন ব্যাপারে বাবার খুব উৎসাহ ছিল। আমাদের বাড়িতে সে সময় বেশ বড় বড় গভর্নমেণ্ট অফিসার আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। আমাদের মাইনর স্কুলটি তাঁহাদের সুপারিশে কিছুদিনের মধ্যেই গভর্নমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের মধ্যে গণ্য হইল। কাকাবাবু বেশীদিন মণিহারী স্কুলে ছিলেন না। মনোমত চাকরী পাইয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পর হইতে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া হেডমাষ্টার সংগৃহীত হইত। এক একজন হেডমাষ্টার কিছুদিন থাকিতেন আবার চলিয়া যাইতেন। যে সব হেডমাষ্টার এবং হেডপণ্ডিত বাহির হইতে আসিতেন তাঁহারা প্রায় আমাদের বাড়িরই পরিজন হইয়া যাইতেন সকলে। আমাদেরই বাড়িতে তাঁহাদেব বাসস্থান হইত এবং আমাদের দুই ভাইকে তাঁহারা পড়াইতেন। সব মাষ্টার পণ্ডিতের কথা স্পষ্ট মনে নাই। হরেবামবাবুর চেহারাটা মনে পড়িতেছে। দীর্ঘকায় লোক ছিলেন তিনি। রাশভারিও ছিলেন। আমরা তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতাম। আর মনে আছে 'বুড়ো মাষ্টার' মহাশয়কে। তিনি বেশ প্রবীণ লোক ছিলেন। পাকা দাড়ি ছিল। মাথার সামনের দিকে বেশ বড় একটা গর্ত ছিল। বাল্যকালে আঘাত পাইয়া ওই স্থানটা বসিয়া গিয়াছিল। অস্ত্রোপচার করিয়া অনেক কষ্টে নাকি রক্ষা পান। কিন্তু তিনি ওই মাথার সামনের গর্তটাকে কৌশলে ঢাকিয়া রাখিতেন। তাঁহার পিছন দিকে চুল ছিল, সেই চুলগুলি লম্বা করিয়াছিলেন এবং সেগুলিকে বুনিয়া কুলার মতো ঢাকনা বানাইয়াছিলেন একটা। সেই ঢাকনা দিয়া তিনি মাথার সম্মুখভাগটা ঢাকিয়া রাখিতেন। মনে হইত একটা চুলের টুপি পরিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার দুইটি পুত্র (এবং যতদূর মনে পড়িতেছে একটি কন্যাও) আসিয়াছিলেন। বুড়ো মাষ্টার আমাদের বাড়ি আহার করিতেন না। নিজেরাই রাঁধিয়া বাড়িয়া খাইতেন। বাবা তাঁহাদের জন্য এ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। 'বুড়ো মাষ্টার' অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিতেন। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। একটু তোতলাও ছিলেন। উত্তেজিত হইলে তাঁহার তোতলামি বাড়িয়া যাইত। যতদূর মনে পড়িতেছে আত্মপ্রশংসা করিবার একটু প্রবণতা ছিল তাঁহার। কোন কোন সাহেব কখন কি উপলক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে কি প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা তিনি সুযোগ পাইলেই গড় গড় করিয়া

বলিয়া যাইতেন। কথা বলিবার সময় ডান হাত দিয়া ডান হাঁটুটা চাপড়াইতেন। কিন্তু একটা গুণ ছিল। আমাদের খুব যত্ন করিয়া পড়াইতেন। আমরা যমের মতো ভয় করিতাম তাঁহাকে। তাঁহার পড়াইবার একটি কায়দাই ছিল। বোঝ আর না বোঝ, সব মুখস্থ কর। প্যারীচরণ সরকারের ফাষ্টবুক গড় গড় করিয়া আবৃত্তি না করিতে পারিলে শাস্তি পাইতাম। ইহা ছাড়া ছিল 'লেনি'র কঠিন গ্রামার এবং একটা মোটা ওয়ার্ড বুক (Word Book)। সব মুখস্থ করিতে হইয়াছিল। গন্ত পন্ত কমা ফুলষ্টপ শুদ্ধ মুখস্থ না করিলে আমাদের নিস্তার ছিল না। ঝাড়া মুখস্থ করার ফলে বুঝি আর নাই বুঝি—অনেকগুলি ইংরেজী শব্দ আমরা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু বুড়ো মাষ্টার বেশী দিন আমাদের নিকট রহিলেন না। আগেই বলিয়াছি, অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিতেন তিনি। বোধহয়, প্রাণায়াম কুম্ভক প্রভৃতি করিতেন। একদিন পূজার আসনেই তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন। দেখা গেল পক্ষাঘাত হইয়াছে। শেষে তিনি মারাই গেলেন।

আমাদের স্কুলের কয়েকজন হেড-পণ্ডিতের কথা মনে আছে। যতীনবাবুর কথা আগেই বলিয়াছি। তিনি আমাদের বাড়িতে থাকিতেন। খুব হাসিখুশি মানুষ ছিলেন। আমরা যেন তাঁর সমবয়সী সঙ্গী ছিলাম। একবার মনে আছে পূজার সময় তিনি বাড়ি যান নাই। বিজয়ার দিন একটু অধিক মাত্রায় সিদ্ধিপান করিয়া বাড়ির সামনের হাটের উপর হাসিতে হাসিতে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন। তাঁহাকে একজন প্রশ্ন করিয়াছিল, পণ্ডিতমশাই আপনি বারবার থুতু ফেলছেন কেন। এই শুনিয়া পণ্ডিত মশাই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—বলছ কি, থুতু? আমার থুতু? হা হা করিয়া হাসিয়া হাটের উপর ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

আর একজনের কথা মনে পড়িতেছে। ভূতনাথ পণ্ডিত। তিনি কালো বেঁটে ঈষৎ স্থূলকায় ব্যক্তি ছিলেন। মাথায় কদমছাঁট চুল। পণ্ডিত হিসাবে অতুলনীয় ছিলেন তিনি। সমস্ত বিষয় নিপুণতায় বুঝাইয়া দিতেন, সামনে বসিয়া পড়া অভ্যাস করাইতেন। আমাদের মুখ দিয়া সব বলাইয়া লইতেন। ফাঁকি দিবার উপায় ছিল না। সমস্তই তাঁহার সামনে বসিয়া করিতে হইত। আমি যে মাইনর পরীক্ষায় ভালো ফল করিয়াছিলাম তাহার কৃতিত্ব ভূতনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের। যেদিন মাইনর পরীক্ষার ফল বাহির হইল এবং জানা গেল যে আমি জেলার মধ্যে প্রথম হইয়া বৃত্তি পাইয়াছি তখন ভূতনাথ পণ্ডিত মহাশয় আবেগভরে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহার চোখ দিয়া জল পরিতেছিল।

আর একজন পণ্ডিতের কথা মনে পরিতেছে। তিনি সম্ভবত ভূতনাথ পণ্ডিতের আগে আসিয়াছিলেন। ঠিক মনে পরিতেছে না। তাঁহার নাম ছিল হরসুন্দরবাবু। লোকে তাঁহাকে বাঙাল পণ্ডিত বলিয়া ডাকিত। তিনি বরিশাল জেলার লোক ছিলেন। তাঁহার মুখে খাপছা খাপছা গোঁফ দাড়ি ছিল। লুঙ্গি পরিতেন। যদিও হিন্দু ছিলেন কিন্তু চেহারা দেখিয়া অনেক সময় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইত। প্রকৃতিটাও

একটু উগ্ররকমের ছিল। তাঁহার ভাষা আমরা বুঝিতে পারিতাম না। আমাদের তিনি 'ছ্যামড়া' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। রাগিয়া গেলে হঠাৎ চুলের মুঠি খামচাইয়া ধরিতেন। তাঁহার মুখের ভাবও তখন ভীষণ হইয়া উঠিত। তাঁহার এসব আচরণ মা পছন্দ করিতেন না। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। আমাদের যখনই কোন পণ্ডিত বা মাষ্টার পড়াইতেন, মা সেই বারান্দায় একটু দূরে মাথায় আধ ঘোমটা টানিয়া হয় কুটনা কুটিতেন বা সুপারি কুচাইতেন। তিনি নিজে লেখাপড়া তেমন কিছু জানিতেন না, পণ্ডিত মহাশয় বা মাষ্টার মহাশয় আমাদের কি পড়াইতেছেন তাহা তাঁহার বোধগম্য হইত না। তবু তিনি নীরব প্রহরীর মতো একটু দূরে বসিয়া থাকিতেন। বাবা রোগী দেখিতে বাহির হইয়া যাইতেন। তিনি আমাদের দেখাশোনা করিবার অবসর পাইতেন না। মা কিন্তু আমাদের লেখাপড়াব সময় রোজ আসিয়া বসিতেন। তাঁহার এই বসাটাই আমাদেব মনে এবং সম্ভবত আমাদের শিক্ষকদের মনেও লাগামের মতো কাজ করিত। মা হবসুন্দর পণ্ডিত মহাশয়েব উগ্র ছবিটা পছন্দ করিতেন না, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কখনও প্রতিবাদ করেন নাই। বরং বাড়িতে আসিয়া আমাদেরই বকিতেন—'তোমরা মন দিয়ে পড না, তাইতো পণ্ডিত মশায় শাস্তি দেন তোমাদের।' একদিন কেবল আড়াল হইতে শুনিয়াছিলাম, বাবাকে মা বলিতেছেন—'এই পণ্ডিত মশাইটি একটু বুনো গোছেব। বড্ড বেশী রাগী। আর ওর কথাও তো বুঝতে পারা যায় না।' বাবা এ সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেন নাই। হরসুন্দর পণ্ডিত মহাশয়ও নিজে আলাদা রাঁধিয়া খাইতেন। মা তাহাকে রোজই কিছু না কিছু তরকারি পাঠাইয়া দিতেন। নিরামিষ তরকাবি, মাছেব তরকারি প্রায় রোজই আমাদের বাড়ি হইতে যাইত। আমরাই গিয়া দিয়া আসিতাম। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয় একটু বেশী আমিষপ্রিয় ছিলেন। একদিন আবিষ্কার করিলাম তিনি আমাদের বাঁশঝাড় হইতে একটা ছোট কাছিম (কাঠুয়া) সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেটি রান্নাঘরে চিৎ করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। নিজে সেটি সহস্তে বধ করিয়া আহার করিয়াছিলেন তিনি। হবসুন্দর পণ্ডিত শুধু স্কুলের পণ্ডিতই ছিলেন না, তিনি আইনজ্ঞ লোক ছিলেন। মুখুজ্যে মশাই ইহা লইয়া অনেক মজা করিতেন তাঁহার সঙ্গে। মুখুজ্যে মশাইও একটি অদ্ভুত লোক ছিলেন। ইহার চরিত্র আমি আমার 'জঙ্গম' পুস্তকে আঁকিয়াছি। আমরা যখন খুব ছেলেমানুষ তখন হঠাৎ তিনি আমাদের বাড়িতে আসিয়াছিলেন একদিন। কবে ঠিক জানি না। জ্ঞান হইয়া অবধি তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, সর্বদা ফিক ফিক করিয়া হাসিতেন। মুখে দাড়ি ছিল, মাথায় চুলও বড় বড় ছিল। খালি পায়ে থাকিতেন। তাঁহার সম্বলের মধ্যে ছিল একটি পুঁটুলি। তাহাতে থাকিত দুইখানা কাপড়, একটা গামছা, একটা মোটা চাদর আর ছোট একটি হুঁকা ও কলিকা। জামা ছিল না। জামা গায়ে দিতেন না। ছোট ছেলেরাই তাঁহার বন্ধু ছিল। তিনি আসিলে আমাদের বড় আনন্দ হইত। পড়ার চাপটা লাঘব করিয়া দিতেন তিনি। বলিতেন, স্কুলে পাঁচ ছয় ঘণ্টা তো পড়িয়া আসিল, বাড়িতে আবার

পড়া কেন। আমাদের বাঘ-বকরি খেলা শিখাইয়াছিলেন। নানারকম গল্প বলিতেন। ইতিহাসের গল্প, শেক্‌সপীয়ারের গল্প, নানারকম রূপকথা, ভ্রমণ কাহিনী—তাঁহার গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত ছিল। নিজের প্রকৃত পরিচয় কখনও কাহাকেও দেন নাই। তাঁহার নাম ছিল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এ নাম প্রকৃত নাম, না ছদ্মনাম তাহা নির্ণীত হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলে হাসিতেন, কোন উত্তর দিতেন না। মুখুজ্যে মশাই নামেই পরিচিত ছিল তাঁহার। সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বেড়াইতেন। নানাস্থান হইতে বাবাকে চিঠি লিখিতেন। যখন কাশী হইতে লিখিতেন—তখন পত্রের গোড়াতেই থাকিত, বাবা বিশ্বেশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। যখন কামাখ্যা হইতে লিখিতেন তখন লিখিতেন—কামাখ্যা দেবী তোমাদের মঙ্গল করুন। এইরূপ প্রতি চিঠিতে নানা দেবদেবীর নাম থাকিত। তাহার পর হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়িতে আসিতেন। আর একটা আশ্চর্যের বিষয়, যখনই আমাদের বাড়িতে কোন বিপদ উপস্থিত হইত তিনি আসিয়া হাজির হইতেন। একবার মায়ের খুব জ্বর, বাবা কলে বাহির হইয়া গিয়াছেন, আমাদের বাড়ির মৈথীল ঠাকুরটি পলাতক। দুর্যোধন কম্পাউণ্ডার মাকে কুইনিন মিকশ্চার দিয়া গিয়াছে। আমরা না খাইয়াই স্কুলে গিয়াছি। মধুয়া চাকর হঠাৎ স্কুলে গিয়া খবর দিল সাধুবাবাজী আসিয়াছেন, আমাদের বাড়িতে ডাকিতেছেন। দ্বিপ্রহরে তিনি কোথা হইতে আসিলেন? ঘাট ট্রেন তো সকালে একটা সন্ধ্যায় একটা। বাড়িতে আসিয়া দেখিলাম মুখুজ্যে মশাই রান্নাঘরে ঢুকিয়াছেন। শুনিলাম নৌকায় পার হইয়া আসিয়াছেন। আমাদের বলিলেন—তোমাদের আমি আজ রেঁধে খাওয়াব। ভাজা মাছ আছে দেখছি, মাছের ঝোল করা যাবে। আগে মায়ের জন্য দুধ সাবুটা করি। আমাদের সমস্ত সমস্যার যেন সমাধান হইয়া গেল। মায়েরও একটু পরে ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল, বাবাও ফিরিয়া আসিলেন। বাবার রান্নাও মুখুজ্যে মশাই করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিজেও তিনি নিজের জন্য আলাদা হাঁড়িতে ভাতে ভাত ফুটাইয়া লইলেন। বাড়িতে দুধ-ঘির অভাব ছিল না। খানিকটা ঘি এবং একবাটি দুধ খাইয়া তিনি বলিলেন—আজ আমার ভূরিভোজন হয়ে গেল। মুখুজ্যে মশাই-এর চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল তিনি বড়লোকদের সহিত বড একটা মিশিতেন না। তাঁহার প্রিয় ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের বালক বালিকারা। তাঁহার যাতায়াতও ছিল নিম্নমধ্যবিত্তদের ঘরে। তিনি ধনীর বাড়িতে কদাচিৎ আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। আমাদের নানা উপদ্রব তিনি সহ্য করিতেন। কেবল সহ্য করিতেন না মিথ্যাভাষণ এবং ভণ্ডামি। আমাদের মধ্যে কাহারও মিথ্যা ভাষণ বা ভণ্ডামি ধরা পড়িয়া গেলে তিনি তাহার সহিত আড়ি করিয়া দিতেন। তাহার সহিত কথা বলিতেন না, তাহার সহিত খেলা করিতেন না, তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতেন না পর্যন্ত। এ শাস্তি নিদারুণ শাস্তি ছিল আমাদের পক্ষে। জরিমানা দিয়া তাঁহার সহিত ভাব করিতে হইত। পূজায় দামী কাপড়-জামা মায়ের নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়া জরিমানা স্বরূপ তাঁহার নিকট দাখিল করিতে হইত। তিনি সেগুলি পুঁটুলি

করিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন। আমাদের ধারণা হইত ওগুলি চিরদিনের জন্ত বেহাত হইয়া গেল। কিন্তু তিনি চলিয়া যাইবার পর আবিষ্কার করিতাম সেগুলি তিনি মায়ের কাছে গোপনে দিয়া গিয়াছেন। মুখুজ্যে মশাই কোনও ছদ্মবেশী বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এম-এ ক্লাশের ফিলসফির ছাত্রকে পড়া বলিয়া দিতে পারিতেন, জটিল মোকদ্দমায় সুনিপুণ ব্যারিষ্টারের মতো পরামর্শ দিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসের মনোরম গল্প আমাদের শুনাইতেন। কিন্তু নিজেকে কখনও জাহির করেন নাই। আমরণ আত্মগোপন করিয়াছিলেন। বহু বাঙ্গালী নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বন্ধু ছিলেন তিনি, কিন্তু কেহ তাঁহার পূর্ণ পরিচয় জানিতে পারে নাই। তিনি কত দুঃখী পরিবারকে যে সাহায্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতাকে কন্যাদায় মুক্ত করা, বেকার ছেলেদের চাকুরি জোগাড় করিয়া দেওয়া, অসুস্থ রোগীর সেবা করা, মোকর্দ্দমাজালে জড়িত বিপন্ন বাঙ্গালীকে উদ্ধার করা—এই সবই তাঁহার কাজ ছিল। থিয়েটার দেখিতে খুব ভালোবাসিতেন। আর ভালোবাসিতেন কাব্যপাঠ করিতে। নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', 'পলাশীর যুদ্ধ' খুব প্রিয় ছিল তাঁহার। আমরা পড়িতাম, সকলে বসিয়া শুনিত। শ্রোতাদের মধ্যে মা-ও থাকিতেন। আমার মায়ের অদ্ভুত স্মরণশক্তি ছিল। তিনি নিজে যদিও তেমন লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু যাহা শুনিতেন তাহা তাঁহার মুখস্থ হইয়া যাইত। যাত্রা শুনিয়া তিনি সমস্ত যাত্রার পালাটাই বাড়িতে আসিয়া আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। মুখুজ্যে মশাই আমাদের বাড়িতে এই সান্ধ্যপাঠ সভা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাবা যেদিন বাড়িতে থাকিতেন সেদিন বাবাই পড়িতেন। না থাকিলে আমরা পড়িতাম। সেকালে আমাদের দেশে যতগুলি নামজাদা কাগজ ছিল সবই বাবা কিনিতেন। বান্ধব, সুপ্রভাত, সাহিত্য, প্রদীপ, প্রবাসী, বসুমতী, হিতবাদী, বঙ্গবাসী নিয়মিত আসিত আমাদের বাড়িতে। বসুমতী হইতে সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত বইগুলিও ছিল আমাদের। মোহিতবাবু রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি 'কাব্যগ্রন্থ' নাম দিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেগুলিও বাবা কিনিয়াছিলেন। আমার বাল্যকালটা এইভাবে একটা সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যেই কাটিয়া গিয়াছিল। বাবার রোগীরাও আমার উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। মনে আছে আমার ছোট ভাই ভোলা এবং আমি ছুটির দিন দ্বিপ্রহরে রোগী-ডাক্তার খেলা খেলিতাম। ভোলা হইত রোগী, আমি ডাক্তার। একটা ঘরে বাবার ডাক্তারখানার ঔষধের খালি বোতলগুলি সাজানো থাকিত। আমি এক-একদিনে এক-একটা বোতলে জল পুরিয়া ভোলাকে সেগুলি খাওয়াইতাম। একদিন একটা খালি টিংচার নাক্স-ভোমিকার বোতলে জল পুরিয়াছিলাম। বোতলের তলায় বোধহয় একটু নাক্স-ভোমিকা ছিল। তাহা পান করিয়া ভোলা অসুস্থ হইয়া পড়িল। বাবার হাতে প্রহার খাইতে হইল সেদিন। বাড়িতে হৈ-হৈ কাণ্ড। ভোলাকে নুন জল খাওয়াইয়া বমি করানো হইল। সেদিন হইতেই বন্ধ হইয়া গেল

আমাদের রোগী ডাক্তার খেলা। ছেলেবেলার আরও দুই একটা দুষ্কৃতি এইখানে বলিয়া লই।

আমার মা-বাবা দুইজনেই পান দোক্তা খাইতেন। মায়ের মুখ হইতে আমরা পান খাইতাম। সুতরাং খুব অল্প বয়স হইতেই দোক্তা খাওয়াটা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। ক্রমশঃ সেটা নেশায় পরিণত হইল। মা নানারকম মশলা দিয়া দোক্তা প্রস্তুত করিতেন। দোক্তা রোদে দিয়া, সেই দোক্তা গুঁড়া করিয়া তাহার সহিত মৌরি ভাজা মিশাইতেন। তাহার পর তাহার সহিত সামান্য একটু চুয়া মাখিয়া দিতেন। অপূর্ব জিনিস হইত। মায়ের কৌটা হইতে সেই দোক্তা আমরা চুরি করিয়া খাইতাম এবং উপরের ঠোঁটের ডানদিকে সেটা রাখিতাম। বেশ ভাল লাগিত। বিনা পানেই আমরা দুই ভাই ছেলেবেলায় দোক্তা খাইতে শিখিয়াছিলাম। চুরি বেশী দিন চলে না। একদিন ধরা পড়িয়া গেলাম। মা তখন দোক্তার কৌটাটা লুকাইয়া রাখিতে লাগিলেন। আমরা কিন্তু তাহাতে দমিলাম না। চুয়াগন্ধী-মশলা মিশ্রিত দোক্তার অভাব আমরা পূর্ণ করিলাম শুকনো দোক্তাপাতা দিয়া। আমাদের তখন তামাকের চাষ হইত। সুতরাং দোক্তাপাতার অভাব আমাদের হয় নাই। কিছু দোক্তাপাতা আমরা গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিতাম। আমাদের নিজেদের মধ্যে দোক্তাপাতার একটা সঙ্কেত নামও ছিল। আমরা দোক্তাকে 'সেই' বলিতাম। দোক্তা হইতে ক্রমশঃ বিড়িতে প্রমোশন হইল। আমাদের অনেক সহপাঠী তখন বিড়ি খাইত। তাহারা আমাদেরও দীক্ষা দিল। আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে অধিকাংশই বেহারী ছিল। তাহাদের মায়েরাও বিড়ি এবং হুঁকার তামাক খাইতেন অনেকে। সুতরাং ছেলেদের বিড়ি তামাক খাওয়াটা তাঁহাদের চক্ষে বিশেষ দোষাবহ ছিল না। কিন্তু মা আমাদের মুখে বিড়ির গন্ধ পাইয়া একদিন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করিলেন। বিড়ি খাওয়া ত্যাগ করিতে হইল। আমাদের একজন সঙ্গী বলিল—সিগারেট খাও। সিগারেট খাইবার পর এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি চিবাইয়া ফেলিলে মুখে আর গন্ধ থাকিবে না। পরামর্শটা সমীচীন মনে হইল। কিন্তু সিগারেট পাই কোথা? বন্ধুরা দুই একদিন বিনা পয়সায় খাওয়াইল। ধরাও পড়িলাম না। যখন নেশা জমিয়া গেল তখন দেখিলাম বন্ধুরা আর দিতেছে না। নিজেদেরই কিনিতে হইবে। কোথায় পয়সা পাই? মা-বাবা আমাদের হাতে পয়সা দিতেন না। পয়সা চুরি করার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতাম না। তবু শেষ পর্যন্ত একটা উপায় বাহির করিয়া ফেলিলাম। আমাদের বাগানে অনেক ছাগল ঢুকিয়া আমাদের ফুলগাছ নষ্ট করিত। আগে সেগুলিকে তাড়াইয়া দিতাম, আমাদের কুকুর কার্লো তাহাদের তাড়া করিয়া যাইত। এইবার ঠিক করিলাম তাহাদের তাড়াইয়া দিব না, ধরিয়া খোঁয়াড়ে দিব। তাহা হইলে কিছু পয়সা পাওয়া যাইবে। সপ্তাহে গোটা দুই পয়সা রোজগার করিলেই বেশ কয়েকদিন সিগারেট খাওয়া চলিবে। সেকালে 'রামরাম' নামে সিগারেট পয়সায় দশটা করিয়া

পাওয়া যাইত। 'রেডল্যাম্প' পয়সায় পাঁচটা। 'হাওয়া গাড়ি' চার পয়সা প্যাকেট। আর একটা কি ঈষৎ গোলাপী রঙের সুগন্ধী সিগারেট পাওয়া যাইত—তাহার নামটা এখন মনে পড়িতেছে না (হয়তো মোহিনী)—সেটা আর একটু দামী। আমাদের বাড়ির সংলগ্ন আমবাগান প্রায় দশ বারো বিঘা জমির উপর। সেখানে অনেক ছাগল চরিত। আমি, ভোলা এবং আর একটি ছোঁড়া চাকর (ভাগিয়া) সপ্তাহে প্রায় ৮৷১০টি ছাগল ধরিতাম। ভাগিয়া সেগুলি খোঁয়াড়ে দিয়া আসিত। আমাদের উপার্জনের কিছু অংশ অবশ্য ভাগিয়াকে দিতে হইত। ভাগিয়াকে আমরা সিগারেটও দুই একটা দিতাম। কিন্তু আর একটা মুস্কিল হইল। সিগারেট কিনিয়া রাখিব কোথা? বাড়িতে রাখা তো অসম্ভব। ভাগিয়াই বুদ্ধি দিল। আমাদের বাগানে অনেক আমগাছ ছিল। ভাগিয়া বলিল আমগাছের ডালে অনেক 'খোতা' আছে, অর্থাৎ গর্ত আছে, যেখানে পাখিরা বাসা বানায়। সে সেইখানেই সিগারেটের বাক্স ও দেশলাই লুকাইয়া রাখিবার পরামর্শ দিল। আমরা বাগানে গিয়াই সিগারেট ফুঁকিতাম। এইসব লিখিতে গিয়া ভাগিয়ার কথা মনে পড়িতেছে। তাহার বাবা বির্জু আমাদের চাকর ছিল। ভাগিয়া ছিল রাখাল। কিছুদিন পর ভাগিয়া কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়। তখনও বাবা তাহাকে খাইতে দিতেন, সামান্য বেতনও দিতেন। সে আমাদের মাঠে বাগানে পাহারার কাজ করিত। তখনও কুষ্ঠরোগের সুচিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নাই। ভাগিয়ার ভাই ন্যাংড়াও পরে রাখাল হিসাবে বহাল হইয়াছিল। তাহার বোন কেশিয়াও। এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল এবং বড় বড় দাঁত ছিল তাহার। মণিহারীতে এখনও আমাদের বাড়ি এবং চাষবাস বাগানপুকুর সবই আছে। আমার পঞ্চম ভ্রাতা নির্মল (কালু) সে সবের দেখাশোনা করে। ন্যাংড়া নাকি এখনও কাজকর্ম করে। তাহার ছেলেরাও নাকি কাজে বহাল হইয়াছে শুনিয়াছি। সেই ছেলেবেলায় যে সিগারেট খাওয়া শিখিয়াছিলাম তাহা অনেক বড় বয়স পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি নাই। আমার 'নিকোটিন' প্রীতি শুধু সিগারেট খাওয়াতেই নিবদ্ধ থাকে নাই। তামাক পাতা তো চিবাইতামই, সিগারেটও ক্রমশঃ বেশী দামী সিগারেটে, সিগারে, পাইপে, গড়গড়ায়, সটকায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। এসব অবশ্য হইয়াছিল আমি যখন রোজগার করিতে আরম্ভ করিয়াছি তখন। কলেজ জীবনে সিগারেট ফুঁকিতাম, নস্যও লইতাম। বাবার সামনে সিগারেট খাইবার সাহস সেকালের ছেলেদের ছিল না। বাবার জন্যই শেষকালে গড়গড়া, সট্‌কা প্রভৃতি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কারণ ওগুলি সহজে লুকানো যাইত না। বাবা কিন্তু একদিন আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন আমি নস্য লই। বলিলেন—দে তো দেখি, কেমন লাগে। বাবা নস্য লইয়া দুই একবার হাঁচিলেন কিন্তু নস্য লওয়া ত্যাগ করিলেন না। প্রায়ই আমার কৌটা হইতে নস্য লইতেন। তাহার পর ক্রমশঃ তিনিও একজন নস্য-খোর হইয়া উঠিলেন। আমি যখন প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছি এসব অবশ্য তখনকার ঘটনা। তাহার পর আমি নস্য ত্যাগ করিয়াছিলাম, বাবার জন্য কিন্তু

বরাবর র-মাত্রাজী নস্য সরবরাহ করিতে হইয়াছে আমাকে। বিদেশ হইতে যখন বাড়ি যাইতাম বাবার জন্য দুইটি জিনিস অবশ্যই লইয়া যাইতে হইত—একটিন র-মাত্রাজ নস্য এবং একটিন বিলাতী ক্রীমক্র্যাকার বিস্কুট। কয়েক বৎসর হইল বাবার মৃত্যু হইয়াছে, আমিও এখন বার্ধক্যে উপনীত। আমি আবার নস্য লইতে শুরু করিয়াছি। বাবার কথা প্রায়ই মনে পড়ে।

ছেলেবেলার কথায় আবার ফিরিয়া যাই। ছেলেবেলার আর একজন লোকের কথা মনে পড়ে। তাঁর নাম আশুতোষ চক্রবর্তী। আমরা তাঁহাকে জ্যাঠামশাই বলিয়া ডাকিতাম। যতদূর মনে পড়ে তিনি আমাদের বাড়িতে চাষ-বাস দেখাশোনা করিবার জন্যে আসিয়াছিলেন। বাবার সঙ্গে তাঁব কি সূত্রে পরিচয় হইল তাহা আমার জানা নাই। বাবা যদিও মোটেই বিষয়ী লোক ছিলেন না, কিন্তু তবু তাঁর কিছু জমি-জমা জুটিয়া গিয়াছিল। বাবা মণিহারী অঞ্চলের তিন চারজন জমিদারের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহারা জোর করিয়া বাবাকে কিছু জমি গছাইয়া দিয়াছিলেন। বাবা প্র্যাকটিস লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, চাকর বহাল করিয়া চাষ করিতে হইত। চাষের সম্বন্ধে বাবার অভিজ্ঞতাও তেমন কিছু ছিল না। ফলে চাষের পিছনে যদিও প্রচুর খরচ হইত, আমাদের পবিবার এবং বাবার বন্ধুবান্ধবদের পরিবারবর্গ যদিও আমাদের জমির পটল, বেগুন, কপি, আখ, ডাল, আম প্রভৃতি খাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেন কিন্তু চাষ হইতে লাভ তেমন কিছু হইত না। যে মুখুজ্যে মশাই-এর কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, তিনি একবার হিসাব কবিয়া বাবাকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে চাষ হইতে লাভ তো হইতেছেই না, লোকসান হইতেছে। তখন বাবা ঠিক করিলেন যে, একজন অভিজ্ঞ সৎ লোকের উপর চাষের ভার দিবেন। আমাদের দেশে অভিজ্ঞ লোক যদিও বা পাওয়া যায় সৎ লোক পাওয়া খুবই মুস্কিল। বাবা কি করিয়া আশু জ্যাঠামশাইয়ের নাগাল পাইয়াছিলেন তাহা জানি না। এলাহাবাদ হইতে প্রবাসী পত্রিকা যখন প্রাকাশিত হইত তখন সেই পত্রিকার অফিসে কাজ করিতেন জ্যাঠামশাই। 'প্রবাসী'র বৈষয়িক দিকটা তিনি দেখিতেন। রামানন্দবাবুর সহিত তিনি বেশীদিন কাজ করিতে পারেন নাই, কেন পারেন নাই, তাহা আমি জানি না। জ্যাঠামশাই সে যুগের ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ কবিয়াছিলেন বলিয়া গ্রামে অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল তাঁহাকে। শুনিয়াছি এইজন্যই তাঁহাকে গ্রাম ত্যাগ করিতে হইয়াছিল নাকি। তাঁহার দেশ যতদূর মনে পড়িতেছে যশোহর জেলায় ছিল। আমাদের বাড়িতে তিনি আমাদের বাড়িরই একজন হইয়া গিয়াছিলেন। শুনিয়াছি বাবা তাঁহাকে কিছু বেতন দিতেন। যতদূর মনে পড়িতেছে সে বেতনের পরিমাণ মাসিক কুড়ি টাকা। আমাদের বাড়িতেই তিনি থাকিতেন, আমাদের সঙ্গেই আহারাদিও করিতেন। আমার তৃতীয় ভাই টুলু (গৌরমোহন) তখন কয়েক মাসের শিশু মাত্র। তাহাকে তিনি সর্বদা কোলে লইয়া থাকিতেন। টুলু বারবার তাঁহার কাপড় ভিজাইয়া দিত বলিয়া তিনি একাধিক কাঁথা লইয়া তবে তাঁহাকে কোলে লইতেন। টুলুকে তিনি 'মিনিট মুতো'

আখ্যা দিয়াছিলেন। নিজে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। তাঁহার তিন চারিটি গামছা এবং একাধিক ফতুয়া থাকিত। ফতুয়াই তিনি সাধারণত পরিতেন। তাঁহাকে কখনও গেঞ্জী পরিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তিনি নিজের ফতুয়া, গামছা নিজের হাতে সাবান দিয়া পরিষ্কার করিতেন, নিজের কাপড় নিজে কাচিতেন। পান খাওয়া অভ্যাস ছিল। নিজে পান সাজিয়া খাইতেন এবং পান সাজিবার সময় দুই চারি খিলি পান সাজিয়া বাটায় রাখিয়া দিতেন। তখন আমাদের বাড়িতে প্রকাণ্ড একটা পানের বাটা ভিতরের বারান্দায় এক কোণে থাকিত। বহিরাগত অতিথিদের জন্য মাকেই পান সাজিতে হইত। মায়ের শ্রম লাঘব করিবার জন্য তিনি নিজের পান নিজে তো সাজিয়া খাইতেনই, দুই চারি খিলি বেশীও সাজিয়া বাটায় রাখিয়া দিতেন। সেকালে আমাদের বাড়িতে অনেক অতিথি-অভ্যাগতের সমাগম হইত। পানের খরচ প্রচুর ছিল। আমাদের বাড়িতে খাইতও অনেক লোক। জ্যাঠামশাই বাবাকে প্রায় উপদেশ দিতেন 'হেঁড়ো মেম্বাব' বেশী জুটাইবেন না। কিন্তু বাবা কখনও কোনও অতিথিকে বিমুখ করিতে পারেন নাই। মুশকিল হইত যখন কোন খবর না দিয়া সদলবলে কোন পরিবার আসিয়া হাজির হইতেন, এ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। আমাদের বাড়িতে প্রথম 'বামুন দিদি' নামে একজন বুড়ী রাঁধুনী থাকিতেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় তাঁহার বাড়ি ছিল। বড়ই মুখরা ছিলেন তিনি। অসময়ে খবর না দিয়া লোকজন আসিলে তিনি বড চেঁচামেচি কবিতেন। বাবাকেও ভর্ৎসনা করিতেন খুব। বাবা কিন্তু নির্বিকার ছিলেন এ বিষয়ে। জ্যাঠামশাইয়ের উপদেশ বা বামুনদিদির ভর্ৎসনা তাঁহাকে অতিথিপরায়ণতা হইতে কখনও বিচ্যুত করিতে পারে নাই। বামুন দিদি যখন মারা গেলেন, তখন আমাদের বাড়িতে 'ঠাকুর' আসিল। মৈথিলী পাচককে সাধাবণত ওদেশে ঠাকুর বলা হইত। নানারূপ বিচিত্র চরিত্রের 'ঠাকুর' জুটিয়াছিল আমাদের বাড়িতে। কেহ 'গায়ক', গান করিতে করিতেই রান্না করিত। কেহ খৈনী খোর, খৈনী মুখে দিয়া বার বার রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া পচপচ করিয়া থুতু ফেলিত। কেহ বা চন্দন-চর্চিত অতি ধার্মিক, রান্নাঘরে 'চৌকার' ভিতর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিত না। কেহ বা চোর, রাঁধিতে রাঁধিতে গরম গরম মাছ মাংস খাইয়া ফেলিত। মাকেই সমস্ত ব্যাপারটার হাল ধরিয়া থাকিতে হইত। ঠাকুর একটা থাকিত বটে, কিন্তু মা সর্বদা তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। শেষ যে ঠাকুরটির কথা মনে পরিতেছে সে খঞ্জ। যখন চলিত মনে হইত নাচিতে নাচিতে চলিতেছে। কথা কম বলিত, কিন্তু যেটি বলিত, সেটি অতি কর্কশ। কিন্তু রাঁধিত ভালো। হাটে-বাজারে গেলে চুরি করিত। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া সে একদিন প্রকাশ করিল যে এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। দেশ হইতে একটি পাত্রীর খবর আসিয়াছে, এইবার সে বিবাহ করিবে। বিবাহের জন্য কিছু অগ্রিম মাহিনা লইয়া সে দ্বারভাঙ্গায় চলিয়া গেল। ফিরিল মাস দুই পরে, পরিধানে একটি হলুদ রং-এর কাপড়। মা বলিলেন—তুমি বউকেও সঙ্গে করিয়া আনিলে না কেন। সে

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল তাহার পর বলিল, কনিয়া এখনও 'বুড়্রু' আছে। তাহার বয়স নাকি মাত্র নয় বৎসর। এইসব ঠাকুরদের ব্যাপার আমাদের বাল্যজীবনে নিত্য-নূতন বৈচিত্র্যময় আলোকপাত করিত। বেজদার (আসল নাম ছিল ব্রজ) কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে। বেজদা ছিল বাংলাদেশের চাকর। অত্যন্ত কুদর্শন। বড় বড় হলদে দাঁত, মুখে দুর্গন্ধ, চোখে পিঁচুটি, রং কালো। কিন্তু সে এমন স্নেহময় ছিল যে আমরা তাহার সঙ্গ বড় ভালোবাসিতাম। সে আমাদের ঘুড়ি তৈয়ারি করিয়া দিত, কালীপূজার সময় আকাশপ্রদীপ দিবার জন্য ফানুস প্রস্তুত করিত, মা বাবার অগোচরে বেতবন হইতে পাকা বেত ফল, পেয়ারা গাছের মগডাল হইতে পেয়ারা এবং বাগান হইতে করমচা সংগ্রহ করিয়া দিত। ভোলাকে সে বাল্যকাল হইতে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। ভোলা সন্ধ্যার সময় তাহার বিছানাতেই ঘুমাইয়া পড়িত। ভোলা বেজদার খুব ন্যাওটা ছিল। ভোলা একবার একটা শৌখিন ফুলদানী ভাঙিয়া ফেলে। বেজদা দোষটা নিজের ঘাড়ে লইয়া বাবার নিকট হইতে প্রচণ্ড বকুনি খাইয়াছিল মনে পড়িতেছে। বেজদা একবার দেশে গেল। হুগলি জেলার কি একটা গ্রামে তাহার বাড়ি ছিল। অনেক দিন ফিরিল না। তাহার পর খবর পাওয়া গেল বেজদা মারা গিয়াছে।

জগন্নাথের কথাও মনে পড়িতেছে। মণিহারীতে তাহার বাড়ি। আগে ঘোড়ার পিঠে মাল গাদাই করিয়া হাটে হাটে বিক্রয় করিত। কিন্তু সে ব্যবসাতে সুবিধা করিতে পারে নাই। অনেক লোকসান হইয়াছিল। তাই আমাদের বাড়িতে চাকর-রূপে বহাল হইয়াছিল। অনেকদিন আমাদের বাড়ির চাকর ছিল সে। খুব কুঁড়ে ছিল বলিয়া মায়ের কাছে প্রায়ই বকুনি খাইত। কিন্তু সে যে খুব কর্তব্যনিষ্ঠ ছিল, তাহার ধৈর্যও যে সাধারণ পর্যায়ের ছিল না ইহার একটি প্রমাণ আমার স্মৃতি-চিত্র-শালায় সঞ্চিত হইয়া আছে। আগেই বলিয়াছি আমাদের বাড়িতে প্রত্যহ অনেক অতিথি সমাগম হইত। বৈকালে সেদিন হাসপাতালের বারান্দায় চায়ের আসর বসিয়াছে। মা বাড়ির ভিতর চা প্রস্তুত করিতেছেন, জগন্নাথ দুইটি করিয়া কাপ হাতে ধরিয়া ধীর পদে আসিয়া সেগুলি বাহিরের আসরে পৌঁছাইয়া দিতেছে। তখনও আমাদের বাড়িতে 'ট্রে' নামক আসবাবটির আবির্ভাব হয় নাই। দুইটি দুইটি করিয়া কাপই লইয়া যাইত চাকরেরা। আমাদের বাড়ির খিড়কি দ্বার দিয়া বেশ কিছু দূর হাঁটিলে তবে চায়ের আসরে পৌঁছানো যায়। তখন খিড়কির নিকটই আমাদের 'ভুসকার' ছিল। এখানে গরুদের খাইবার জন্য নানারকম ভুসি জমা থাকিত। সেই ভুসকারের কোথায় যেন একটা ভীমরুলের চাক হইয়াছিল। আমাদের গরুর চাকর ভুসকার হইতে ভুসি বাহির করিতে গিয়া সেই চাকে খোঁচা দেয়। ভীমরুল উড়িবামাত্র সে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল। জগন্নাথ ঠিক সেই সময় দুই কাপ চা হাতে করিয়া খিড়কি দিয়া বাহির হইতে-ছিল। বাহির হইবামাত্র চার পাঁচটা ক্রুদ্ধ ভীমরুল উড়িয়া আসিয়া তাহার গালে কপালে মুখে থুতনিতে আক্রমণ করিয়া হুল ফুটাইতে লাগিল। জগন্নাথ অত্যন্ত কাতর হইল

বটে, কিন্তু কর্তব্যচ্যুত হইল না। তাহার হাত হইতে চায়ের পেয়ালা পড়িল না। সেগুলি চায়ের আসরে পৌঁছাইয়া দিয় তাহার পর হাত দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিল ভীমরুলগুলিকে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত মুখটা ফুলিয়া উঠিল। জ্বর আসিল একটু পরে। তাহার পরদিন তাহার মুখের চেহারা যাহা হইল তাহা ভয়ঙ্কর। চোখ দুইটি সম্পূর্ণ ঢাকিয়া গেল, ঠোঁট দুইটি এমন ফুলিয়া গেল যে সে মুখ খুলিতে পারিল না। গাল দুইটিও বিসদৃশ আকৃতি ধারণ করিল। জগন্নাথের মুখের এই বীভৎস ছবিটা এখনও আমার মনে আঁকা আছে। জগন্নাথ আমরণ আমাদের বাড়িতেই কাজ করিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার ছেলেরাও চাকর হিসাবে আমাদের বাড়িতে বহাল হইয়াছিল। বড় ছেলে মোহন আর ছোট ছেলে যদু। মোহনকে মোহন বলিয়া কেহ ডাকিত না। বলিত মোহনা আর যদুকে যদুয়া। মোহনা কিছুদিন চাকরি করিয়া আবার ব্যবসায় আরম্ভ করে। আমার বাবাই তাহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া ব্যবসায়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। যদুয়া কিন্তু চাকর হিসাবে অনেক দিন ছিল। সে আমার পঞ্চমভ্রাতা কালুর বাহন ছিল। কালুকে সে কোলে করিয়া বেড়াইত। কালু কিছুতেই তাহার কোল হইতে নামিতে চাহিত না। যদুয়ার কোমরে এজন্য একটা কালো দাগই হইয়া গিয়াছিল। যদুয়া এখনও আমাদের বাড়িতে আছে, কালুই এখন চাষবাসের মালিক। যদুয়া তাহার সহকারী। যদুয়ার এখন চুল ভুরু সব পাকিয়া গিয়াছে। যদুয়ার ছেলে দশরথ লেখাপড়া শিখিয়াছে। সে এখন সাধারণ চাকরি করে না। মাষ্টারি না কেরাণীগিরি, কি একটা করে যেন। তাহার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহ হইবার পর কি একটা গোলযোগ হইয়াছিল। সেটা মিটাইয়া দিবার জন্য যদুয়া ভাগলপুরে আমার কাছে গিয়াছিল। সেকালে আমাদের বাড়িতে অনেক চাকর থাকিত। আমাদের জমিতে কাজ করিত তাহারা। হিন্দু মুসলমান দুই রকম চাকরই ছিল। ইংরেজের কূটনীতি তখনও হিন্দু মুসলমানদের মধ্য এতটা বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। মুসলমান চাকরদের মধ্যে ছিল ফরিদ, আশুয়া, কয়লা আর চামরু। ইহারা সপরিবারে আমাদের জমিতে কাজ করিত। মাহিনা পাইত এবং সিধা পাইত। সিধাটা দেওয়া হইত জমিতে উৎপন্ন ফসল হইতে। চামরুর বউএর কথা আগেই বলিয়াছি। তাহার দুধ খাইয়াই আমি আমার শৈশবের পুষ্টি আহরণ করিয়াছিলাম। আরও দুইজন আমাদের পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ ছিল। আশুয়ার মা এবং আশুয়ার নানী (দিদিমা)। আশুয়ার নানী খুব বৃদ্ধা ছিল। কথা বলিতে গেলে গলা কাঁপিয়া কাঁপিয়া যাইত। সে বুড়ি আমার মায়ের খুব সেবা করিত। মা যখন আঁতুর ঘরে যাইতেন তখন একজন চামাইন তো থাকিতই। আশুয়ার নানীও থাকিত। গরম তেল মায়ের পিঠে কোমরে মালিশ করিয়া দিত। মনে পড়িতেছে মায়ের একবার পেটে ব্যথা হইয়াছিল, আশুয়ার নানী সমস্ত রাত বসিয়া মায়ের পেটে গরম তেল দিয়া গমের চোকরের সেঁক দিয়াছিল। আশুয়ার মা-ও আমাদের বাড়ির অনেক কাজ করিত। আমাদের বাড়িতে তখন গম পিষিবার জন্য জাঁতা ছিল।

চাষের গম হইতে ঘরের জাঁতাতে পিষিয়াই আটা প্রস্তুত হইত তখন। ছাতুও হইত। বাজার হইতে আটা বা ছাতু কিনিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না। মণিহারীর বাজারে ভাল আটা পাওয়াও যাইত না। এই জাঁতা চালাইতে দুইজনের প্রয়োজন হইত। আগুয়ার মা ও ভাগিয়ার বোন কেশিয়া প্রায়ই এ কাজ করিত। আমাদের গরুও ছিল অনেক। দুগ্ধবতী মহিষীও ছিল একটি। আমাদের বাড়ির দুধ দুহিত হোকরা গোয়ালা। লম্বা চেহারা। সম্ভবত সাড়ে ছয় ফিট। তেমনি রোগা। তাহার ক্ষুদ্রকায়া বেঁটে বউও আসিত আমাদের বাড়িতে। আসিয়া মায়ের কাছে ঘোমটা টানিয়া বসিয়া ফিস ফিস করিয়া গল্প কবিত। মাঝে মাঝে ছোট ভাঁড়ে করিয়া 'দহি' আনিত আমাদের জন্য। ভাঁড়কে উহারা বলিত 'লদিয়া'। মাকে বলিত—খোকাবাবুদের জন্য এক 'লদিয়া' দহি আনিয়াছি। দহি খাঁটি, সুস্বাদুও খুব, কিন্তু ধোঁয়া গন্ধ। যদুয়ার মাও আমাদের জন্য নাড়ু আনিত নানারকম। মুড়ির নাড়ু, মুড়কির নাড়ু, চিঁড়ার নাড়ু, মকাই-এর খই-এর নাড়ু, তিলের নাড়ু, চিনি এবং তিল দিয়া প্রস্তুত তিলিয়া—অনেক বকম খাবাব আনিত সে। আমার সহপাঠী নিত্যগোপালের মাও—অনেক নাড়ু পাঠাইতেন আমাদের জন্য। তিনি আবার নাড়ুর সহিত ক্ষীরও পাঠাইতেন। সে সময় আমরা আব একরকম জিনিসও খাইতাম। তাহার নাম মাড়া। চিনা নামক একপ্রকার শস্যের ভর্জিত রূপই মাড়া। ভিজাইয়া দুগ্ধ সহযোগে খুবই সুখাদ্য। আব একরকম নাড়ু ছিল রামদানা। ছট পরব বিহারের একটা বড় পরব। সে সময়ে আর এক প্রকার খাদ্য আমাদের বাড়িতে আসিত। তাহার নাম 'ঠেকুয়া'। শুকনো পিঠে গোছের। বেশ সুস্বাদু।

ছেলেবেলায় বাহিরের আরও কয়েকটি বাঙালী পরিবারের সহিত আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহারা আমাদের আত্মীয়ের মতোই ছিলেন। প্রথমে যাঁহার কথা মনে পড়িতেছে তাঁহার নাম সূর্যকান্ত বাগচী। তাঁহাকে আমরা জ্যাঠামশাই বলিয়া ডাকিতাম। তিনি থাকিতেন পূর্ণিয়ায় (ভাট্টায়), পূর্ণিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হেড ক্লার্ক ছিলেন। খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। পুরু লেন্সের চশমা পরিতেন। পড়িবার সময় খালি চোখে পড়িতেন, বই চোখের খুব কাছে আনিয়া পড়িতে হইত। তাঁহার বড় ছেলে নীলকান্ত আমাদেব নীলুদা ছিলেন। ইনি পরে জজ হইয়া পাটনা হইতে রিটায়ার করিয়াছিলেন। নীলুদার যখন বিবাহ হয়, তিনি বউকে লইয়া একবার মণিহারীতে আসিয়াছিলেন। আমরা নতুন বউদিকে লইয়া বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। আমাদের প্রায় সমবয়সী বউদিকে লইয়া আমাদের সেদিনকার উত্তেজনার কথাটা এখনও ভুলি নাই। উঁহারা প্রায়ই গঙ্গাস্নান উপলক্ষে সপরিবারে আসিয়া একদিন কাটাইয়া যাইতেন।

জ্যাঠাইমার কথাও মনে আছে। খুব স্নেহময়ী ছিলেন। নীলুদার বোন বীণুদি, নাতুদি এবং আস্তুকেও ভুলি নাই। জানি না তাহারা এখন কোথায়। নীলুদার ছোট ভাই বুঁচু (বমলকান্তি) এখনও পূর্ণিয়ায় আছে। সেখানে ওকালতি করে।

তাহার ছোট ভাই খোকন মারা গিয়াছে শুনিয়াছি।

জ্ঞানবাবু কাকা আমাদের পরিবারের আর একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকেও আমরা আমাদের পরিবারেরই একজন মনে করিতাম। মণিহারীতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহের জমিদারী ছিল। জ্ঞানবাবু ছিলেন সেই জমিদারের নায়েব। পরে ম্যানেজারও হইয়াছিলেন। কার্যত তিনিই জমিদারীর সর্বেসর্বা ছিলেন। আমাদের বাড়ির সহিত খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁহাদের। কাকীমা (জ্ঞানবাবু কাকার স্ত্রী) সেকালের আধুনিকা ছিলেন। জুতা পরিতেন, কাপড় জামার ফ্যাসানও নূতন রকমের ছিল। তিনি কাপড়ের উপর সৌখীন সূচীকর্ম করিতে পারিতেন। উলও বুনিতেন। রান্নাও জানিতেন অনেক রকম। পূর্ববঙ্গের মেয়ে ছিলেন। বাঙালী রান্না তো জানিতেনই, বিদেশী রান্নাও জানিতেন অনেক রকম। মাংস রাঁধিতেন চমৎকার। আমার মা তাঁহার নিকট হইতে অনেক কিছু শিখিয়াছিলেন। মনে পরিতেছে চপ,কাটলেট এবং পটলের দোরমা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কৌশল তিনি শিখাইয়াছিলেন মাকে। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই নূতন নূতন রকম খাবার প্রস্তুত করিয়া আনিতেন। পুডিং বোধহয় তিনিই প্রথম খাওয়ান আমাদের। তাঁহার দুইটি কন্যা ছিল—বড়টির নাম অরুণা। আমরা অরুণদিদি বলিতাম, আমাদের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। ছোট মেয়ের নাম যতদূর মনে পড়িতেছে—বুলবুলি ছিল। বুলবুলি বিবাহের পর একটি মেয়ে রাখিয়া মারা গিয়াছিল। তাহার মেয়েটির নাম ছিল টুনটুনি। সেও কিছুদিন পরে মারা যায়। তাহার মৃত্যু লইয়া উঁহাদের পরিবারে শোকের যে তুফান বহিয়া যায় তাহা এখনও আমার মনে আছে। জ্ঞানবাবু কাকা ছোট ছেলের মতো মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়াছিলেন।

জ্ঞানবাবু কাকা সত্যই আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। আমাদের বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে বাবাকে উপদেশ দিতেন। আমাদের বাড়িতে যখন যে ভোজ বা কাজ হইত তাহাতে অগ্রণী হইয়া সমস্ত ভার বহন করিতেন জ্ঞানবাবু কাকা। আমাদের উপনয়নের সময়, আমার বোন রাণীর বিবাহের সময় আমাদের বাড়িতে কয়েকদিনব্যাপী যে ভোজ চলিয়াছিল তাহার সমস্ত ভার ছিল জ্ঞানবাবু কাকার উপর। জ্ঞানবাবু কাকার একটি সুদক্ষ রাঁধুনী ছিল, দুনিয়ালাল। তাহার অধীনে আরও পাচক বহাল করিয়া জ্ঞানবাবু কাকা সুষ্ঠুরূপে সমস্ত নির্বাহ করিতেন। বাবা ও-অঞ্চলের জনপ্রিয় ডাক্তার ছিলেন। সুতরাং কয়েকখানা গ্রামের লোক আসিয়া সমবেত হইতেন। হিন্দু মুসলমান বাঙালী বিহারী সব। নিমন্ত্রিত, অনাহূত, রবাহুত, সব রকম লোকই থাকিত এবং সকলকেই খাওয়াইতে হইত। এ সমস্ত ব্যাপারের ভার লইতেন জ্ঞানবাবু কাকা।

পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জমিদারও এইসব ভোজকাজে প্রচুর সাহায্য করিতেন। মাছ এবং দই প্রচুর আসিত। আর আসিত বোঝা বোঝা কলাপাতা। এই প্রসঙ্গে

একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। আমার বোন রাণীর বিবাহ। দিল্লীর দেওয়ান গয়এঞুর জমিদার গৌরবাবুকে যথারীতি নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তিনি কিছু মাছ এবং কয়েক হাঁড়ি দই পাঠাইয়াছেন। কিন্তু বিবাহের দিন দুই পূর্বে কয়েকটি গরুর গাড়িতে চাল ডাল তরিতরকারি এবং গোটা দুই তাঁবু লইয়া কয়েকজন সমর্থ যুবকও আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা গৌরবাবুর একটি চিঠি আনিয়াছিল। সে চিঠিতে লেখা ছিল—কল্যাণীয়েষু, কয়েকটি সমর্থ যুবককে পাঠাইতেছি। ইহাদের ফরমাস করিবেন। বিবাহ বাড়িতে অনেক কাজ; ইহাদেব দিয়া কাজ করাইয়া লইবেন। খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে না। আমি ইহাদের সহিত প্রচুর খাদ্যদ্রব্য, একটি পাচক এবং দুইটি তাঁবু পাঠাইলাম।

বিবাহের দিন সকালে তিনি পালকি করিয়া আসিলেন। বলিলেন, আমি খাইয়া আসিয়াছি, এখন কিছু খাইব না।

তিনি বরযাত্রীদের সহিত আলাপ-আপ্যায়ন করিতে লাগিলেন। রাত্রে যতক্ষণ না কন্যা সম্প্রদান শেষ হইল, ততক্ষণ তিনি কিছু খাইলেন না। বাবা ব্যস্ত হওয়াতে বাবাকে বলিলেন—তুমি উপবাস করে আছ। যতক্ষণ না কন্যা সম্প্রদান হচ্ছে আমিও উপবাসী থাকব। খাওয়াতো আছেই, আগে আমরা দায়মুক্ত হই, তারপর খাওয়া যাবে।

ইহাই সেকালে আভিজাত্য ছিল। বাবা গৌরবাবুকে পিতৃবৎ মান্য করিতেন। আমরা তাঁহাকে ঠাকুরদা বলিতাম। তিনিও বরাবর আমাদের সহিত অনুরূপ ব্যবহার করিতেন। সেকালে প্রবাসী বাঙালীরা যেন বিরাট একটা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বহু বিশিষ্ট পরিবার যেন একটা অদৃশ্য সূত্রে পরস্পব আবদ্ধ থাকিতেন, পরস্পরকে নিজের লোক মনে করিতেন। পরস্পরকে বিপদে সাহায্য করিতেন, উৎসবে সঙ্গী হইতেন, কোনও জনহিতকর কাজকে সুসম্পন্ন করিবার জন্য সকলে একজোট হইয়া দাঁড়াইতেন। তখন সকলেই যে নিঃস্বার্থপর উদার ছিলেন তাহা নয়, কিন্তু তাঁহারা এমন একটি আভিজাত্যপূর্ণ অমায়িকতার সহিত পরস্পরের সুখে দুঃখে আবদ্ধ থাকিতেন যাহার তুলনা আজকাল আর বড একটা পাই না। সে বিস্তৃত উদার মন আজকাল যেন আর নাই। হিন্দু, মুসলমান, বিহারী সবরকম পরিবারই এই বিরাট লিষ্টিভুক্ত ছিল। সুবাতালি, তহশীলদাব, ভাদদো মুন্সী মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত আমাদের প্রাণের সম্পর্ক ছিল। বহু বিহারী পরিবার আমাদের পরিবারের সহিত প্রেমের বন্ধনে যুক্ত ছিলেন। এখনও অনেকে আছেন। রমজান আলী আমার সহপাঠী ছিল। রমজানের কথায় আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। মণিহারী স্কুলের কোন বোর্ডিং ছিল না। দূর হইতে যেসব ছেলেরা আসিত বাবা তাহাদের আমাদের হাতায় থাকিতে দিতেন। ছোট ছোট কুটির বানাইয়া তাহারা থাকিত। নিজেরাই খাইত, মা প্রায়ই উহাদের তরকারী রাঁধিয়া পাঠাইতেন। রমজান আলী এইরূপ একটি কুঁড়ে ঘরে থাকিত। খুব বন্ধুত্ব ছিল আমার সঙ্গে।

পড়াশোনায় ভালো ছেলে ছিল। মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া আমরা দুইজনেই সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে হাই স্কুলে গিয়া ভরতি হই। আমি হিন্দু বোর্ডিংয়ে ছিলাম। রমজান বোধহয় তাহার এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকিত। ঠিক মনে নাই। হাই স্কুলে রমজান আমার প্রতিযোগী ছিল। পরে সে পুলিশ লাইনে ঢুকিয়া দারোগা হয়। কাটিহারে কিছুদিন ছিল। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানে গিয়াছিল সে। সেখানে পুলিশ বিভাগে উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিল শুনিয়াছি। এখন বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়া গিয়াছে। এখন সে কোথায় আছে জানি না।

মণিহারীতে আমার বাল্য ও কৈশোর কাটিয়াছে। সব কথা মনে নাই, যাহা মনে আছে তাহার আভাসটুকু মাত্র এখানে দিলাম।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমি সাহেবগঞ্জে গিয়া সেখানকার রেলওয়ে হাইস্কুলে ভরতি হইয়াছিলাম। সঙ্গে ছিল আমার ভাই ভোলা। আমরা দুজনেই গিয়া ফোর্থ-ক্লাসে ভরতি হইলাম। স্কুলের বোর্ডিংয়ে একটি ঘরে আমাদের দুই ভায়ের থাকিবার স্থান হইল। আমাদের ঘরে আরও দুইটি ছেলে থাকিত। তাহাদের একজনের নাম ছিল জ্ঞান। সে আমাদের সঙ্গেই পড়িত, রেলের স্টেশন মাস্টারের ছেলে ছিল সে। খুব আমুদে। হো হো করিয়া আসিত। বড় বড় দাঁত ছিল, হাসিতে হাসিতে চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িত। দ্বিতীয় ছেলেটি আমাদের নীচে পড়িত। নাম মনে নাই। বরিশালে বাড়ি ছিল তাহার। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় কথা বলিত। খুব চালাক চতুর ছিল ছেলেটি। আমরা যে বছর সাহেবগঞ্জে যাই সে বছর প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু হয়। মণিহারী ঘাট ও সকরিগলি ঘাটের মধ্যে যে স্টীমার সারভিস ছিল তাহা বন্ধ হইয়া গেল। শোনা গেল সব জাহাজ যুদ্ধে চলিয়া গিয়াছে।

আমরা নৌকা করিয়া সাহেবগঞ্জে আসিলাম। মাঝে মাঝে ছুটিতে যখন বাড়ি যাইতাম তখন নৌকা করিয়াই যাতায়াত করিতে হইত। যে মাঝি আমাদের পারাপার করিত তাহার নাম ছিল ভগ্‌গু। রোগা পাতলা লোক ছিল সে। মুখে বসন্তের দাগ ছিল। আমাদের বাড়ি হইতে সাহেবগঞ্জ যাইতে প্রায় একদিন লাগিয়া যাইত। আমাদের স্কুল জীবনে এই নৌকা করিয়া যাওয়া আসা ভারি আনন্দজনক ছিল। অন্য কোন যাত্রী লইয়া ভগ্‌গু যখন সাহেবগঞ্জে আসিত, তখন আমাদের বাড়িতে খবর দিত, আমি সাহেবগঞ্জ যাইতেছি। মা প্রায়ই তাহার হাতে আমাদের জন্য নানারকম খাবার, কাপড় চোপড় প্রভৃতি পাঠাইতেন। কাচের জারে করিয়া ঘি, আচার প্রায়ই আসিত। সকলেই সেগুলি ভাগাভাগি করিয়া খাইতাম। মা প্রায়ই পিঠা এবং সন্দেশ পাঠাইতেন। আমের সময় পাঠাইতেন বাগানের আম। ভগ্‌গু আসিলেই আমাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যাইত। ছুটির সময় ভগ্‌গুই আমাদের লইয়া যাইবার জন্য নৌকা লইয়া আসিত। মাঝি হিসাবে ভগ্‌গু তো ভাল ছিলই, তাহার আর একটি গুণ ছিল। সে ভাল গান গাহিতে পারিত, ভালো গল্পও বলিতে পারিত। সুদীর্ঘ দিন গঙ্গা বক্ষে নৌকা-যাত্রা কখনও একঘেয়ে মনে হইত না।

একবারের একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। কিছুদূর যাইবার পর গঙ্গা-বক্ষে একটি ছোট চর দেখা গেল। ভগ্‌ণ্ড তাড়াতাড়ি দাঁড় বাহিয়া সেই চরের দিকে নৌকাটাকে লইয়া যাইতে লাগিল। আমরা আশ্চর্য হইলাম। ভগ্‌ণ্ড চরের দিকে চলিয়াছে কেন? জিজ্ঞাসা করিলাম। ভগ্‌ণ্ড উত্তর দিল—আজ রাতে বোধহয় চরেই কাটাইতে হইবে। তাহার পর সে আকাশে হাত তুলিয়া দেখাইল। দেখিলাম আকাশের এককোণে একটা কালো মেঘ উঠিয়াছে এবং ক্রমশঃ সেটা বড় হইতেছে। চরে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই ঝড় বৃষ্টি শুরু হইয়া গেল। ভগ্‌ণ্ড এবং তাহার সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি কয়েকটা লগি লগা পুঁতিয়া শক্ত দড়ি দিয়া নৌকাটিকে বাঁধিয়া ফেলিল। তুমুল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আমরা দুই ভাই জড়োসড়ো হইয়া নৌকার ছইএর ভিতর বসিয়া রহিলাম। ভগ্‌ণ্ড ছইয়ের ভিতর ঢুকিল এবং নৌকার খোল হইতে একটি পুঁটুলি বাহির করিল। পুঁটুলিতে ছিল কিছু ছাতু, আর কয়েকটা রামদানা। রামদানা একরকম নাড়ু জাতীয় খাবার। ভগ্‌ণ্ড ঘোষণা করিল—আমরা ছাতু খাইব। তোমরা রামদানা খাও। তাহাই হইল। চরের উপর হু হু করিয়া হাওয়া বহিতেছে। চারিদিকে অন্ধকার, আকাশে মেঘ, গঙ্গার কলকল ধ্বনি। আমাদের খাওয়া শেষ হইলে ভগ্‌ণ্ড আবার নৌকার খোল হইতে একটি কাঁথা বাহির করিয়া বলিল—ওঢ়ি কর শুতির। অর্থাৎ গায়ে দিয়ে শুয়ে পড। তাহাই করিলাম। যখন ঘুম ভাঙিল তখন দেখি প্রভাত হইয়াছে। রৌদ্র কিরণে চতুর্দিক ঝলমল করিতেছে। আমাদের নৌকা গুণ টানিয়া চলিতেছে। আমাদের স্কুল-জীবনে এই নৌকা-যাত্রাটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় জিনিস ছিল আমাদের কাছে। ভগ্‌ণ্ডর আগমনের জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতাম এবং আসিলেই উল্লসিত হইয়া উঠিতাম।

বাড়ির পরিবেশ হইতে বোর্ডিংএ স্থানান্তরিত হওয়ায় প্রথম প্রথম ভালো লাগিত না। বাড়ির জন্য মন কেমন করিত। কিন্তু ক্রমে সবই সহিয়া যায়। আমাদেরও সহিয়া গেল। আমি প্রথমত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম আমার সুনাম রক্ষা করিবার জন্য। আমি পূর্ণিয়া জেলা হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছিলাম।

সাহেবগঞ্জে আসিয়া আবও দুইজন প্রথম স্থান অধিকারীর সম্মুখীন হইতে হইল। একজন চণ্ডীচরণ চৌধুরী—সে ভাগলপুর জেলা হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। আর একজন প্রবোধ ঘোষ, সে পঞ্চম শ্রেণী হইতে প্রথম হইয়া ফোর্থ ক্লাসে প্রমোশন পাইয়াছে। এ দুজন ছাড়া ছিল রমজান আলী। সে মণিহারীতে আমার সহপাঠী ছিল, সে-ও বৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছিল। আর আমার ভাই ভোলা তো ছিলই। প্রতিযোগী হিসাবে সে-ও তুচ্ছ করিবার মত নহে। প্রথম প্রথম তাই পড়াশোনায় খুব মনোনিবেশ করিতে হইয়াছিল। প্রথম কোয়ার্টালি পরীক্ষার পর দেখা গেল আমার প্রথম স্থানটা প্রথমেই আছে। রমজান দ্বিতীয়, চণ্ডী তৃতীয় এবং প্রবোধ চতুর্থ স্থান অধিকার করিল। ভোলা অসুখ করিয়া বাড়ি চলিয়া গেল। একটা বছরই নষ্ট হইল তাহার। আমাকে কেহ আর প্রথম

স্থান হইতে সরাইতে পারে নাই। স্কুলের সব শিক্ষকেরই প্রিয় ছাত্র হইয়া উঠিলাম আমি। শিক্ষকদের পরিচয় দিবার আগে বোর্ডিং জীবনের দুই একটি ঘটনার কথা বলি।

প্রথমেই মনে পড়িতেছে আমাদের সেই রুম-মেটটির কথা, যাহার বাড়ি ছিল বরিশাল জেলায়। ছেলেটি আমাদের চেয়ে নীচু ক্লাসে পড়িত। বেশ চালাক চতুর করিৎকর্মা ছেলে ছিল সে। সকলের ফরমাস খাটিত। সকলের ঘরে গিয়া আড্ডা দিত। কিছুদিন পরেই কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা সমস্যা দেখা দিল। আমাদের সকলেরই পয়সা হারাইতে লাগিল। আমার বাক্সে চাবি ছিল না। আমার সামান্য যা পয়সা-কড়ি হাতে থাকিত, তাহা টেবিলের উপরই ছড়ানো থাকিত। বোর্ডিংয়ের যে চাকরটা ছিল সে-ই মাঝে মাঝে আসিয়া আমার বিছানা ঝাড়িয়া দিত এবং টেবিল হইতে পয়সা তুলিয়া আমার খোলা বাক্সটাতেই রাখিয়া দিত। আমার কাপড়ও কাচিয়া দিত সে স্নানের পর। সকালে আমার জন্য খাবার আনিয়া দিত পাশের খাবার দোকান হইতে। সে-ই একদিন বলিল, আমার বাক্সে একটি পয়সাও নাই। আমি কি সব খরচ করিয়া ফেলিয়াছি?

আমি খরচ করি নাই। আমার অবস্থা অন্যান্য ছাত্রদের অপেক্ষা স্বচ্ছল ছিল। কারণ আমার স্কুলের বেতন লাগিত না, তাছাড়া মাসে চাব টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতাম। বাবা আমাকে মাসে দশ টাকা কবিয়া পাঠাইতেন। বোর্ডিংয়ে খাওয়া থাকার জন্য দিতে হইত মাসে সাড়ে আট টাকা করিয়া। সাত টাকা খাওয়ার খরচ। দেড়টাকা সিট্ রেণ্ট। সাহেবগঞ্জে গিয়া সিগাবেট খাওয়া ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। রোজ খাইতাম না, মাঝে মাঝে খাইতাম গঙ্গার ধারে গিয়া। সিগারেটও শস্তা ছিল বেশ। এক পয়সায় দশটা রামরাম সিগারেট পাওয়া যাইত। তখনকার কালের অভিজাত সিগারেট 'হাওয়া-গাড়ি' চার পয়সায় দশটা মিলিত। পরে অবশ্য দাম কিছু বাড়িয়াছিল। কিন্তু সিগারেট খাইবার সুযোগ ছিল না বলিয়া সিগারেট প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।

আমার সহপাঠী কালী মিত্তির একটি নূতন নেশা শিখাইয়াছিল। নস্য। এক-পয়সার নস্য কিনিলেই অনেকদিন চলিয়া যাইত। আর তাছাড়া ছিল আমাদের 'সেই'—তামাকপাতা। তাহাও এক পয়সার কিনিলে অনেকদিন চলিয়া যাইত। সুতরাং যদিও দুই একটা নেশায় অভ্যস্ত হইয়াছিলাম শস্তা-গণ্ডার দিন ছিল বলিয়া কখনই আমার পয়সার টানাটানি পড়িত না। কিন্তু চাকরটা যখন বলিল বাক্সে এক পয়সাও নাই তখন একটু অবিশ্বাস হইল। মনে হইল সে বোধহয় ভালো করিয়া দেখে নাই। কালও তো আমি দুই একটা টাকা দেখিয়াছি। বলিলাম, ভালো করিয়া দেখ্। কাপড় জামার নীচে নিশ্চয় ঢুকিয়া গিয়াছে। সে বাক্স হইতে সব কাপড় জামা বাহির করিয়া ফেলিল। টাকা নাই।

ইহার পর পাশের ঘর হইতে আর একজনের টাকা হারাইল। তাহার পর

আমাদের ঘরের জ্ঞানের বাড়ি হইতে যেদিন মনি-অর্ডার আসিল সেদিন টাকাগুলি সে বিছানার নীচে রাখিয়াছিল। সে টাকাও উধাও হইয়া গেল বিকাল নাগাদ। আমাদের ঘরের সেই বরিশালবাসী ছোকরাটিকে আমাদের সন্দেহ হইল। সন্দেহ হইবার কারণ—সে নানারকম শৌখীন জিনিস কিনিতে আরম্ভ করিল। আমরা সাধারণ লণ্ঠন জ্বালিয়া পড়িতাম। সে একদিন বেশ দামী একটা বড় কাচের ল্যাম্প কিনিয়া আনিল। তাহার পর কিনিল একটা এয়ার-গান। কয়েকদিন পরে দোকান হইতে একটা দামী বুক-খোলা কোট কিনিয়া ফেলিল। তাহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি এসব দামী জিনিস কিনিতেছ। টাকা কোথায় পাও?' সে উত্তর দিল—'বাবা পাঠায়। আমার বাবা দারোগো। অনেক টাকা রোজগার তাঁর।' আমরা চুপ করিয়া গেলাম।

ইহার দিন দুই পরে তাহার টেবিলে একটা পোস্টকার্ড পাইলাম। তাহাতে তাহার বাবার ঠিকানা লেখা ছিল। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল। একটা খামে সব কথা খুলিয়া তাহার বাবাকে আমি একটা চিঠি লিখিয়া দিলাম। বিশেষ করিয়া লিখিলাম আমাদের প্রায়ই টাকা-পয়সা চুরি যাইতেছে। কিন্তু আপনার ছেলের একটি পয়সাও চুরি হয় নাই। সে বরং অনেক শৌখীন মূল্যবান জিনিস কিনিতেছে। জিজ্ঞাসা করাতে বলিল—আপনি তাহাকে নাকি বেশী টাকা পাঠান। আপনি উহাকে বেশী টাকা পাঠান কিনা অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন। আমাদের সকলেই উহাকে সন্দেহ করিতেছে।

চিঠির উত্তর আসিল না। কিন্তু প্রায় দিন কুড়ি পরে অপ্রত্যাশিতভাবে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিল। সেদিন কি একটা ছুটির দিন ছিল। আমাদের বোর্ডিং-এর সামনে একটা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া থামিল। গাড়ি হইতে নামিলেন দীর্ঘকায় ফরসা একটি লোক। তাঁহার মুখে সুচ্যগ্র ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি, হাতে একটি বেত। তিনি আসিয়াই প্রশ্ন করিলেন, 'আমার ছ্যামড়াটা কোথায়?' তাহার পর তিনি দ্বিতলে উঠিয়া আসিয়া আমাদের ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাহার ছ্যামড়া আমাদের ঘরের সেই ছেলেটি। নিজের সীটে বসিয়াছিল। পিতার রুদ্রমূর্তি দেখিয়া পালাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না। তিনি তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া সপাসপ বেত চালাইতে লাগিলেন। হৈ হৈ কাণ্ড পড়িয়া গেল। আমাদের বোর্ডিংয়ের রুদ্রপণ্ডিত মহাশয় ছুটিয়া আসিলেন। তিনি হুমড়ি খাইয়া ছেলেটাকে রক্ষা করিতে গিয়া দুই এক ঘা বেত খাইলেন। তাহার পর ভদ্রলোক আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তোমাদের কত টাকা চুরি গিয়াছে?'

জ্ঞান বলিল—'কুড়ি টাকা।'

তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যাগ খুলিয়া কুড়িটি টাকা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। তাহার পর আবার ছেলের ঝুঁটি ধরিয়া চাবকাইতে চাবকাইতে তাহাকে নীচে লইয়া গেলেন। বলিতে বলিতে গেলেন—'আমি দারোগা, অনেক চোরকে শায়েস্তা করেছি।

তোকেও করব।' ছেলেকে লইয়া তিনি ঘোড়ার গাড়িতে উঠিলেন। কয়েকদিন পর তাঁহার ভাই আসিয়া ছেলেটার জিনিসপত্র লইয়া গেলেন। স্কুল হইতে তাহার নামও কাটাইয়া দিলেন। তাহার পর তাহার কোন খবর আর আমি জানি না। এই ঘটনাটি মনে দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছিল। তাই এখনও মনে আছে।

বোর্ডিং জীবনের আর একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। এই ঘটনার একটি পশ্চাৎপট আছে। ঠিক কোন্ সময়ে মনে নাই, কিন্তু মনে হয় আমি যখন থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছি তখনই আমাব মনে সাহিত্য প্রেরণা উদ্বেল হইয়া ওঠে। আগেই বলিয়াছি আমাদের বাড়িতে বাংলা সাহিত্য পরিবেশনের মধ্যেই আমাদের শৈশবের ক্রমোন্মেষ হইয়াছিল। তখন দুই একটি কবিতাও লিখিয়াছি। সাহেবগঞ্জে বোর্ডিং-এ আসিয়া ঠিক করিলাম এবার একটা হাতে-লেখা মাসিক-পত্র বাহির করিতে হইবে। সেকালে বেশ ভাল একরকম ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজ পাওয়া যাইত। তাহাই দুই ভাঁজ করিয়া একসারসাইজ বুকের মতো আয়তন হইত। ঠিক করিলাম এই মাপেরই কাগজ করিব। কাগজেব নাম দিলাম 'বিকাশ'।

স্কুলে আমার প্রথম স্থান বজায় রাখিবার জন্য আমি সকাল-সন্ধ্যা পাঠ্যপুস্তকেই নিজেকে নিবদ্ধ রাখিতাম। 'বিকাশ' পত্রিকার জন্য প্রতিদিন বৈকালে এবং রাত্রে খাওয়ার পর রাত্রি বারোটা পর্যন্ত আমাকে খাটিতে হইত। ইহার ফলে আমি স্কুলের খেলা-ধূলায় যোগ দিতে পারিতাম না। 'বিকাশ' পত্রিকায় আমি ছাড়া ভোলা মাঝে মাঝে লিখিত। আমাব বন্ধু প্রবোধ ঘোষ লিখিত, আরও দুই একজন লিখিত, নাম ঠিক মনে পড়িতেছে না। তবে বেশীব ভাগ আমিই লিখিতাম। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ধাঁধা, অনুবাদ, সম্পাদকীয় মন্তব্য সব আমাকেই লিখিতে হইত। কি লিখিয়াছি তাহা এখন মনে নাই। তবে এই 'বিকাশ'কে কেন্দ্র করিয়াই আমার আলাপ হইয়াছিল তারকদাস মজুমদারের সঙ্গে এবং তাঁহার ভাই বটুদার সঙ্গে।

বটুদার ভাল নাম ছিল সুধাংশুশেখর মজুমদার। আমরা যখন সাহেবগঞ্জ স্কুলে পড়ি বটুদা তখন ভাগলপুরে টি. এন. জে. (T. N. J.) কলেজে বি. এ. পড়েন। বটুদার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন—নাম প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি রেলে কাজ করিতেন। বুকিং ক্লার্ক ছিলেন, যতদূর মনে পড়ে। 'বিকাশ' পত্রিকা যখন আরম্ভ করি তখন প্রথম যে সমস্যায় পড়িয়াছিলাম তাহা এই—মাসিকপত্রের একটা সুন্দর প্রচ্ছদ চাই। সেটা কে আঁকিয়া দিবে? একজন বলিল—আর্ট লজের (Art Logde) তারক মজুমদার এখানে থিয়েটার 'সিন' আঁকেন। তাঁকে বললেই তিনি এঁকে দেবেন। তারক মজুমদারের সঙ্গে একদিন গিয়া দেখা করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া গেলেন। বলিলেন—আমাকে তারকবাবু বলবে না। তারকদা বলবে। তোমাদের কাগজের মলাট নিশ্চয়ই এঁকে দেব। মলাটের কাগজটা আনবে আর আনবে একটা 'আইডিয়া', যা বলবে তাই এঁকে দেব। পরদিনই কাগজ লইয়া গেলাম এবং বলিলাম একটা ঊষার ছবি আঁকিয়া দিন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আঁকিয়া দিলেন। তাহার পর

চন্দ্রোদয়, ডিম ভাঙিয়া পাখীর ছানা বাহির হইতেছে, আমের আটি হইতে শিশু আমগাছের আত্মপ্রকাশ—এইরকম নানা ধরনের 'আইডিয়া' লইয়া তারকদার কাছে যাইতাম, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা আঁকিয়া দিতেন। তারকদা শুধু যে ভাল ছবি আঁকিতেন তাহা নয়, তিনি খুব সুরসিকও ছিলেন। পরে জানিয়াছিলাম কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল। কুমুদরঞ্জনের 'চুনকালি' নামক একটি ব্যঙ্গ কবিতার সংকলন তখন প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার মলাট তারকদা আঁকিয়াছিলেন। তারকদার সহিত আলাপ হইবার পর ক্রমশ বটুদা এবং পরে তাঁহার সমস্ত পরিবারের সহিতও আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। ক্রমশ আমি তাঁহাদের ঘরের ছেলে হইয়া গেলাম।

বটুদার বন্ধু ছিলেন প্রবোধদা। তিনিও খুব সাহিত্যোৎসাহী ছিলেন। তিনিও 'বীণাপাণি' নামে একটি হাতের লেখা কাগজ বাহির করিতেন। মনে পড়িতেছে এই 'বীণাপাণি' কাগজেও আমি একবার কি যেন একটা লিখিয়াছিলাম। কি লিখিয়াছিলাম মনে নাই। এই প্রবোধদাই একদিন আমাদের বোর্ডিংয়ে ফরসা ছিপছিপে রোগা বেশ বাবু গোছের একটি ছেলেকে লইয়া আসিলেন। ছেলেটি প্রায় আমাদেরই সমবয়সী। গলায় একটি শৌখীন কমফর্টার জড়ানো। গায়ের পাঞ্জাবীটিও সুরুচির পরিচয় বহন করিতেছে। নাম পরিমল গোস্বামী। শুনিলাম দেশে (রতন দিঘায়) শরীর খুব ভালো থাকে না। এখানে যদি শরীর ভালো থাকে তাহা হইলে এখানেই পড়িতে পারে। পরিমল কিন্তু সাহেবগঞ্জে দুই-চারিদিনের বেশী থাকে নাই। এই সময়—যে সময় আমার সাহিত্য-জীবনের সবে আরম্ভ—সেই সময় পরিমলের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব বেশ ইঙ্গিতবহ বলিয়া মনে হয়। কারণ আমার পরবর্তী সাহিত্য-জীবনে পরিমলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাহারই তাগাদায় আমি পরে 'শনিবারের চিঠি'তে নিয়মিত লিখিতে আরম্ভ করি। সে অবশ্য অনেক পরের কথা। তখন আমি ভাগলপুরে ডাক্তারি করি। আমি যখন কলিকাতায় ডাক্তারি পড়িবার জন্য মেডিকেল কলেজে ভরতি হই, তখন পরিমলের সঙ্গে আবার দেখা হয় এবং ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। ইহার অনেক সত্য বর্ণনা পরিমলের স্মৃতিচারণ গ্রন্থে আছে।

সাহেবগঞ্জ স্কুলের ছাত্রমহলে 'বিকাশ' কাগজটির আদর হইয়াছিল। অনেক ছাত্র এবং শিক্ষক কাগজটি পাঠ করিতেন। এক-কপি মাত্র কাগজ। হাতে হাতে ঘুরিয়া প্রায়ই ছিঁড়িয়া যাইত। সেগুলিকে মজবুত করিয়া বাঁধাইবার মতো আর্থিক ক্ষমতা আমার যে ছিল না, তাহা নহে, কিন্তু মনে হইত বাঁধাইলে তাহা একটা সাধারণ একসারসাইজ খাতার মতো দেখাইবে, তাহার সৌন্দর্য্যহানি হইবে। এই ভয়ে আমি তাহা বাঁধাইতাম না। ফলে হাতে হাতে ঘুরিয়া কাগজগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই হতশ্রী হইয়া পড়িত। কিন্তু এই হতশ্রী কাগজগুলিই একদিন বটুদার দৃষ্টি-আকর্ষণ করিল। তিনি একদিন আমার বোর্ডিংয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন খুব সকালেই

আসিলেন। দেখিলাম তাহার হাতে কয়েক সংখ্যা 'বিকাশ'। 'বিকাশ' পত্রিকার কয়েকটি কবিতা দেখাইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—এগুলি কার লেখা? বলিলাম—আমার। বটুদা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—চমৎকার কবিতা। এগুলো কোন ভালো মাসিকপত্রে পাঠাইয়া দাও। আমি বলিলাম—আমার লেখা কোন্ মাসিকপত্র ছাপাইবে? বটুদা বলিলেন—আচ্ছা, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।

বটুদাই আমার কয়েকটি কবিতা লইয়া বিভিন্ন মাসিকপত্রে পাঠাইয়া দিলেন। যতদূর মনে পড়ে আমি তখন থার্ড ক্লাসে পড়ি। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'মালঞ্চ' পত্রিকায় আমার প্রথম কবিতা ছাপা হইল। আমার স্বনামেই ছাপা হইল সেটি। আমার নামে বোর্ডিংয়ের ঠিকানায় যখন কাগজ আসিল তখন হৈ হৈ পড়িয়া গেল একটা। ছাপা মাসিকপত্রে বলাইয়ের লেখা কবিতা ছাপা হইয়াছে—কি আশ্চর্য কাণ্ড! সকলেই খুব খুশী। বটুদা আমাকে উৎসাহ দিয়া গেলেন। বলিলেন, আরও লেখ। চটিলেন কেবল একজন। আমাদের হেডপণ্ডিত মহাশয়। তিনি আমাদের সংস্কৃত পড়াইতেন। দ্বারভাঙার লোক। নাম ছিল রামচন্দ্র ঝা। আমি তাহাব খুব প্রিয় ছাত্র ছিলাম। সংস্কৃতে প্রতিবারই প্রায় শতকরা আশি নম্বর পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিতাম। পণ্ডিত মহাশয় আমাদের বোর্ডিংয়েই থাকিতেন। আলাদা একটি রান্নাঘরে নিজে রাঁধিয়া খাইতেন। শুদ্ধাচারী লোক ছিলেন তিনি। টকটকে গৌরবর্ণ, কপালে সিঁদুরের বা চন্দনের ফোঁটা, মাথায় প্রকাণ্ড শিখা। তিনি হঠাৎ খড়ম চট্‌চট্ করিতে করিতে আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

'তুমি নাকি কবিতা লিখে কাগজে ছাপাচ্ছ?'

'হাঁ। একটা কবিতা ছাপা হয়েছে।'

ভাবিলাম ইহার পরই বুঝি তিনিও উচ্ছ্বসিত হইয়া আমার প্রশংসা করিবেন। কিন্তু তাহা না করিয়া বলিলেন—'তোমার বাবা যে পয়সা খরচ করে তোমাকে বোর্ডিংয়ে রেখেছেন, তা কি কবিতা লেখার জন্য?'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া চলিলেন—'সংস্কৃতে তোমার ফুল মার্কস পাওয়া উচিত। কিন্তু তুমি তা পাও না। এর কারণ তোমার পড়ার অমনোযোগ। আর এই অমনোযোগের কারণ—এই কবিতা। আর কবিতা লিখো না।' পণ্ডিত মহাশয় নিজে কাব্যতীর্থ ছিলেন। কিন্তু আমাকে কাব্যচর্চায় তিনি বাধা দিলেন দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কিন্তু ভয়ে প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। চুপ করিয়া রহিলাম।

সেই দিনই খেলার মাঠে বৈকালে বটুদার সহিত দেখা হইল। বটুদা ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। লেফট্ আউট হইতে খেলিতেন। খেলার পর বটুদাকে পণ্ডিত মহাশয়ের ক্রোধের কথা বলিলাম। অনুরোধ করিলাম আর যেন তিনি কোন

কবিতা কাগজে না পাঠান। বটুদা খানিকক্ষণ ভাবিলেন। তাহার পর বলিলেন—'তুমি একটা ছদ্মনাম ঠিক কর, সেই নামেই লেখা প্রকাশিত হোক।'

ছেলেবেলায় ভৃত্য মহলে আমার নাম ছিল জংলিবাবু। বনজঙ্গল আমি খুব ভালোওবাসি। বাল্যকালে অনেক কীট-পতঙ্গ প্রজাপতির পেছনে ঘুরিয়াছি। পরিণত বয়সেও পাখী চিনিবার জন্য অনেক জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিতে হইয়াছে। বন চিরকালই আমার নিকট রহস্য-নিকেতন। এই জন্যই বোধহয় ছদ্মনাম নির্বাচনের সময় 'বনফুল' নামটা আমি ঠিক করিলাম। আগেও বোধহয় 'বিকাশ' পত্রিকায় বনফুল নাম দিয়া দুই একটা কবিতা লিখিয়াছি। বটুদাকে কথাটা বলিলাম—তিনিও রাজি হইয়া গেলেন। ইহার পর হইতেই আমার কবিতা বনফুল নাম দিয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। অনেক পাঠক-পাঠিকার ধারণা জন্মিয়াছিল 'বনফুল' কোন মহিলার ছদ্মনাম। 'বনফুল' যে রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম কবিতা-গ্রন্থ—এ খবরও তখন আমি জানিতাম না। অনেক পরে খবরটা শুনি। যাই হোক 'বনফুল' নাম দিয়া আমার কবিতা কুচবিহার হইতে প্রকাশিত 'পরিচারিকা পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইল। অন্যান্য দুই একটা কাগজেও বাহির হইতে লাগিল।

পণ্ডিত রামচন্দ্র ঝা কিছুদিন বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝিতে পারিলেন আমি কবিতা লেখা বন্ধ করি নাই। তিনি আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সত্য কথাই বলিলাম। বলিলাম—না লিখিয়া পারি না, লিখিতে বড়ই ইচ্ছা করে, তাই লিখি। জানি না বটুদা এ সম্বন্ধে তাহার সহিত কোন আলোচনা করিয়াছিলেন কিনা, কিন্তু এবার দেখিলাম তিনি আমাকে কবিতা লিখিবার অনুমতি দিলেন। বলিলেন, 'বেশ, কবিতা লেখ। আমি তোমাকে সংস্কৃত শ্লোক দিব, সেগুলি তুমি কবিতাতে অনুবাদ কর।'

তিনি আমাকে দিয়া অনেক সংস্কৃত শ্লোক অনুবাদ করাইয়াছিলেন। প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া একাজ আমি করিয়াছি। 'প্রবাসী' পত্রিকা তখন আমাদের মনে সর্বাধিক সম্ভ্রম উদ্রেক করিত। প্রবাসীতে লেখা প্রকাশ হওয়াটা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় ছিল তখন। আমি স্কুল জীবনেই প্রবাসীতে অনেক কবিতা পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু সেগুলি মনোনীত হয় নাই! সবই ফেরত আসিত। আমার উৎসাহ কিন্তু অদম্য। আমি কিছুতেই দমিতাম না। ক্রমাগত পাঠাইতাম। ক্রমাগত ফেরত আসিত। অবশেষে আমি যখন ফার্স্টক্লাসে পড়ি (১৯১৮) প্রবাসীতে আমার সংস্কৃত হইতে অনূদিত একটি চার লাইনের কবিতা প্রকাশিত হইল। সে যে কি আনন্দ, তাহা বর্ণনা করিতে পারিব না। ইহার কিছুদিন পরে 'ভারতী' পত্রিকাতেও আমার একটি কবিতা প্রকাশিত হইল। অনুভব করিলাম—হয়তো ভুল করিয়াই করিলাম—যে এইবার আমি সাহিত্যের অভিজাত মহলে প্রবেশাধিকার পাইয়াছি।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে হইতেছে। রামচন্দ্র ঝা—আমাদের স্কুলের হেডপণ্ডিত মহাশয়—আমার হিতৈষী ছিলেন বলিয়াই আমার কবিতা লেখায় এবং সাহিত্য-চর্চায়

বাধা দিয়াছিলেন। যদিও আমি ক্লাসে বরাবর সব বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করিতাম, কিন্তু একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে নিতন্ত দেশেই এরও হইয়াও আমি ক্রমের সম্মান লাভ করিতেছিলাম। সাহিত্যের নেশা যদি আমাকে অভিভূত না করিত তাহা হইলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অনেক ভালো ফল করিতে পারিতাম। আমার পরবর্তী ছাত্রজীবনেও কলেজের পাঠ্যপুস্তক-এর পরিবর্তে আমার ধ্যানজ্ঞান ছিল সাহিত্য। তাই শিক্ষা-জীবনে সাধারণ ছাত্ররূপেই আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, অসাধারণ ছাত্রদের দলে স্থান করিয়া লইতে পারি নাই। সাহিত্যের ভূত যদি ঘাড়ে না চাপিত তাহা হইলে হয়তো পারিতাম। আমি সাহিত্য-চর্চা করি বলিয়া আমার শিক্ষকরা—এমন কি মেডিকেল কলেজে যখন পড়ি তখন সেখানকার বাঙালী শিক্ষকেরাও আমাকে খাতির করিতেন।

এইবার আমার স্কুলের শিক্ষকদের কথা বলি। হেডমাস্টার ছিলেন মহাদেব বিশ্বাস। অতিশয় গম্ভীর লোক ছিলেন। খুব কম কথা বলিতেন। কিন্তু তাহার এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যে সকলেই তাহাকে ভয় করিত। ছেলেরা গোলমাল করিতেছে, তিনি কাছে আসিলেই সবাই চুপ করিয়া যাইত। ইংরাজি খুব ভালো পড়াইতেন। ভালো বক্তৃতাও দিতে পারতেন। মনে আছে একবার প্রাইজ ডিস্ট্রি-বিউশনের সভায় তিনি বলিয়াছিলেন—Let the Hun hordes hammer their heads at the gate of our impenitrable citadel—we will win the war. খুব হাততালি পরিয়াছিল। আমাকে স্নেহ করিতেন খুব। কিন্তু সে স্নেহের বিশেষ বহিঃপ্রকাশ ছিল না।

সুধীর মৈত্র মহাশয় আমাদের সেকেণ্ড মাস্টার ছিলেন। আমাদের ইতিহাস পড়াইতেন। চেয়ারে বসিয়া পড়াইতেন না। ক্লাসে পায়চারি করিয়া পড়াইতেন। ডান হাতটি তুলিয়া এবং মাঝে মাঝে ডান হাতের তর্জনীটি উৎক্ষিপ্ত করিয়া ইংরেজীতে পড়াইতেন তিনি। বেশ ভাল ইংরেজি বলিতে পারিতেন। সাধারণত কাহাকেও শাস্তি দিতেন না। কোন ছেলে পড়াইবার সময় গোলমাল করিলে তাহার কাছে গিয়া তাহার কানের পাশের চুল একটু টানিয়া বলিতেন, 'খুব দুষ্টু হয়েছ তুমি দেখছি।' গম্ভীর ছিলেন খুব। আমার সহিত খুব স্নেহের সম্পর্ক ছিল। আমি বরাবর তাহার সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছি। আমি যখন ভাগলপুরে ডাক্তারি করি তখনও তিনি কয়েকবার আমার বাড়িতে আসিয়াছেন। সাহেবগঞ্জেই শেষ পর্যন্ত বাড়ি করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের বাড়িতে পড়াইতেন। প্রকৃত সজ্জন ছিলেন।

থার্ড মাস্টার মহাশয় সুরেন্দ্রনাথ পাল ছিলেন ভিন্ন ধরনের লোক। তাঁহার প্রকৃতিটা ছিল ঝড়ের মতো। ঝড়ের বেগে পড়াইতেন, কোন ছেলে দুষ্টুমি করিলে ঝড়ের বেগে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। তাহার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া দেওয়ালের কাছে লইয়া গিয়া তাহার মাথা ঠুকিয়া দিতেন দেওয়ালে।

যখন জ্যামিতি পড়াইতেন তখন বোর্ডের উপর গিয়া কেবল ছবি আঁকিতেন এবং বই দেখিয়া আমাদের উচ্চকণ্ঠে তাহার অর্থ বলিতে হইত। বোর্ডে গিয়া হয়তো তিনি একটা সরলরেখা আঁকিয়া তাহার নাম দিলেন AB—আমাদের উচ্চকণ্ঠে বলিতে হইত : Let AB be a straight line. তাহার পর তিনি তাহার উপর CD আর একটি সরলরেখা দাঁড় করাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বই দেখিয়া বলিতে হইত : Let another straight line CD stand upon it. এইভাবে অনেকগুলি Theorem তিনি প্রত্যহ পড়াইতেন। তাহার পর বাড়িতে Extra কষিবার জন্য দিতেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের জ্যামিতির চারটি বই-ই শেষ হইয়া গেল এবং বারবার নামতার মতো ঘুসিয়া ঘুসিয়া সেগুলি প্রায় মুখস্থ হইয়া গেল। অ্যালজ্যাব্রা এবং পাটিগণিতও তিনি ঝড়ের বেগে পড়াইতেন। এক একটা উদাহরণের কয়েকটা অঙ্ক বোর্ডে কষিয়া দেখাইয়া দিতেন, তাহার পর আমাদের বলিতেন, 'বাকি অঙ্ক বাড়ি থেকে কষে নিয়ে এসো। যেটা পারবে না সেটাতে দাগ দিয়ে রেখো, আমি করে দেব।'

সুতরাং অনেক অঙ্ক বাড়িতেও কষিতে হইত। সব খাতা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেন। যে ছেলে যে অঙ্ক করিতে পারিত না সে ছেলেকে তিনি যে ছেলে অঙ্কটা পারিয়াছে, তাহার খাতা দেখিতে বলিতেন। যে অঙ্ক কেহই পারিত না তাহা তিনি ক্লাসে ব্ল্যাক বোর্ডে কষিয়া দিতেন। ছেলেদের জন্য অনেক পরিশ্রম করিতেন তিনি। কিন্তু তাহার একটি মহৎ দোষ ছিল। তিনি মোটেই ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। মুসলমানদের সম্বন্ধে খোলাখুলিই বলিতেন—'তেঁতুলে নেই মিষ্টি, নেড়েতে নেই ইস্টি'। মুসলমান ছাত্রদের উপর তাঁহার বিশেষ বিরূপতা ছিল। বিহারীদের লইয়াও তিনি মর্মান্তিক ঠাট্টা করিতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানের প্যারডি করিয়া লিখিয়াছিলেন 'বিহারী আমার মাসীমা আমার ধাইমা আমার আমার দেশ।'

এই গানটার খানিকটা অংশ আমি আমার একটা ছোটগল্পে ব্যবহার করিয়াছি। তাঁহার এই মনোভাবের জন্য তাঁহাকে অবশেষে স্কুল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইল। আমরা স্কুলের ছেলেরা তাঁহাকে খুব বড় একটা 'ফেয়ার ওয়েল' (farewell) দিয়াছিলাম। প্রবোধ ঘোষ খুব কাঁদিয়াছিল। প্রবোধকে থার্ড মাস্টার মহাশয় খুবই ভালবাসিতেন। প্রবোধের বাবা মা যখন প্লেগে মারা যান তখন প্রবোধের খুব কম বয়স। থার্ড মাস্টারই মানুষ করিয়াছিলেন তাহাকে। গুজব উঠিয়াছিল প্রবোধও তাঁহার সহিত চলিয়া যাইবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তাহার মামার কাছে রহিয়া গেল। থার্ড মাস্টারের বিদায় উপলক্ষে আমিও একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম। কবিতাটা বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গিয়াছে। সাহেবগঞ্জ হইতে চলিয়া যাইবার কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান।

ইহার পর ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের কথা। তাঁহার নাম ছিল রামতারণ নন্দিপুরী।

খুব ছোটখাটো মানুষ ছিলেন। মাথার চুল সোজাভাবে আঁচড়াইতেন, অর্থাৎ টেড়ি কাটিতেন না। চুল সোজা কপালের উপর ঝুলিত। কথাও আস্তে আস্তে বলিতেন। সাহেবগঞ্জে একটি ছোট বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতেন। আমাদের পড়াইতেন অঙ্ক ও বাংলা। থার্ড মাস্টারমশাই অঙ্ক পড়াইতেন ফোর্থ ক্লাসে ও থার্ড ক্লাসে। ফোর্থ মাস্টারমশাই পড়াইতেন সেকেণ্ড ক্লাস ও ফার্স্ট ক্লাসে। থার্ড মাস্টার মহাশয় ঝড়ের বেগে পড়াইতেন। ফোর্থ মাস্টারমশাই পড়াইতেন খুব আস্তে আস্তে। থার্ড মাস্টার মহাশয়ের দাপটে আমাদের জ্যামিতির সবটাই প্রায় মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। ফোর্থ মাস্টার মহাশয় সেইগুলি পুনরাবৃত্তি করাইতেন। করাইতেন কিন্তু অতি ধীরে ধীরে। তাঁর আর একটা বিশেষত্ব ছিল। তিনি ক্লাসের খারাপ ছেলেদের ডাকিয়া সামনের বেঞ্চে বসাইতেন। একটা উদাহরণ দিতেছি।

"পিছনের বেঞ্চে মুটে বসে আছিস নাকি? পিছনে কেন, সামনে আয়।"

মুটে সসঙ্কোচে আসিয়া বসিল।

"শুনেছি তুই আজকাল পড়াশোনায় মন দিয়েছিস। বোর্ডে গিয়ে একটা সরল-রেখা আঁক, দেখি কেমন হয়।" মুটে মুচকি হাসিতে হাসিতে বোর্ডে গিয়া একটি সরলরেখা আঁকিল।

"বাঃ, এতো চমৎকার হয়েছে। এইবার একটা নাম দে। না—AB নয়, ও নামটা বড় পুরোনো হয়ে গেছে। PQ দে—"

এইভাবে মুটেকে ফার্স্ট বুকের ফার্স্ট থিয়োরেমটা আস্তে আস্তে সমস্ত ঘণ্টা ধরিয়া পড়াইয়া দিলেন। অন্য ছেলেদের সে সময় Extra কষিতে বলিতেন। না পারিলে দেখাইয়া দিতেন। ভালো ছেলেদের তিনি গৌরীশঙ্করের জ্যামিতি, অ্যালজ্যাব্রা এবং পাটিগণিত পড়িতে উৎসাহ দিতেন। এ বিষয়ে সাহায্যও করিতেন।

তাঁহার আর একটা কাজ ছিল। লাইব্রেরী হইতে ছেলেদের তিনি বই দিতেন। প্রতি শনিবারে একটা হইতে দুইটা পর্যন্ত লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া থাকিতেন। আমি প্রথম যেদিন বই লইতে গেলাম, দেখিলাম নিজেই তিনি মনোযোগ সহকারে একটি মোটা বই পড়িতেছেন। আমি গিয়া বই চাহিলে তিনি প্রশ্ন করিলেন—'এর আগে তুমি বই নিয়েছ কি?'

'না।'

'তাহলে ওই এক নম্বর আলমারির প্রথম তাকের প্রথম বইটা নাও।'

চাবি দিলেন আমাকে। আমি নিজেই গিয়া চাবি খুলিয়া বইটি বাহির করিয়া আনিলাম। বেশ মোটা লাল রঙের বই। সোনার জলে নাম লেখা—OLIVER TWIST. নীচে লেখা—Charles Dickens. রেজিস্টারে নাম লিখিয়া সে বইখানা লইয়া গেলাম। এমন একটা মোটা বাহারের বই পাইয়া ভারী আনন্দ হইল। তখন আমি ফোর্থ ক্লাসে পড়ি। পড়িবার সময় দেখিলাম এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেছি না। বইটাতে অনেকগুলি ছবি ছিল। সেগুলি উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিলাম। অভিধান

দেখিয়া সাতদিনে পাতা চারেক পড়িলাম বটে, কিন্তু কিছুই বোধগম্য হইল না। সাতদিন পরে বই ফিরাইয়া দিবার কথা। ফোর্থ মাস্টারকে সসংকোচে বলিলাম—'এ বইটা বড় শক্ত স্যার। চারপাতার বেশী পড়তে পারিনি।'

'তুমি ডিক্‌শনারি দেখে দেখে পড়েছ নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'আউট বই ডিক্‌শনারি দেখে পড়বার দরকার নেই। একটা রিডিং দিয়ে যাও খালি। যতটুকু বুঝলে বুঝলে। নতুন শহরে যখন বেড়াতে যাও তখন সব লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় কি? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে চলে আসতে হয়। এ-ও তেমনি। টেক্‌স্‌ট বুক খুব খুঁটিয়ে পড়তে হয়, আউট বুক একটা রিডিং দিয়ে যাও খালি। এ বইটা আজও নিয়ে যাও, একটা রিডিং দিয়ে নিয়ে এস। পরে যদি ইংরেজি সাহিত্য পড় তখন এই বই ভাল করে পড়বে। এখন শুধু রিডিং দিয়ে নিয়ে এস।'

তাহাই করিলাম। সাতদিনে এক একটা বই পড়িয়া ফেরত দিতে লাগিলাম। তিনমাসের মধ্যে ডিকেন্স, স্কট, থ্যাকারে এবং আরও অনেক বই পড়িয়া ফেলিলাম। আলমারির নীচের থাকে বাংলা বই থাকিত। দীনেশ সেনের লেখা লাল রঙের বাঁধানো ছোট ছোট বই। একখানা বই ছিল 'জড়ভরত'। সে বইগুলি যখন পড়িতে শুরু করিলাম তখন তাহা একদিনে শেষ হইয়া যাইত। বাংলা বই পড়িতে বেশীক্ষণ লাগিত না। একদিন ফোর্থ মাস্টার মহাশয় বলিলেন—'তুমি তো এতো ইংরেজি বই পড়লে, এইবার এই বাংলা বইগুলোর ইংরেজিতে অনুবাদ কর না? পারবে না?' বলিলাম, 'পারব না কেন? কিন্তু অনেক ভুলও হবে, সেগুলি ঠিক করে দেবে কে?'

ফোর্থ মাস্টার মহাশয় বলিলেন—'তুমি যদি অনুবাদ কর, আমি সন্ধ্যের পর বোর্ডিংয়ে গিয়ে দেখে দেবো সেটা।'

তাহাই হইয়াছিল। দীর্ঘকাল আমি বাংলা হইতে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছি এবং ফোর্থ মাস্টারমশাই প্রত্যহ সন্ধ্যায় আসিয়া সেগুলি সংশোধন করিয়াছেন। আমার কাছে একটি পয়সাও লইতেন না। তিনি রোজ সন্ধ্যা সাতটার সময় রাতের খাওয়া শেষ করিতেন। খাওয়া শেষ করিয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইতেন। সেই বেড়াইবার সময়ই রোজ বোর্ডিংয়ে আসিয়া আমার অনুবাদ সংশোধন করিয়া দিতেন। সেকালে স্কুলের শিক্ষকরা প্রাইভেট ট্যুশন করিতেন। বড়লোকের ছেলেরা বেশ মোটা দক্ষিণা দিয়া অনেক শিক্ষককেই পড়াইবার জন্য বাড়িতে নিযুক্ত করিত। ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্র গোবরাদাকে ফোর্থ মাস্টার মহাশয় রোজ বৈকালে স্কুলের ছুটির পর একঘণ্টা পড়াইতেন। কত বেতন লইতেন তাহা জানি না।

গোবরাদা বড়লোকের ছেলে ছিলেন। আমাদের চেয়ে দুই ক্লাস উপরে পড়িতেন। একদিন শুনিলাম গোবরাদা ফোর্থ মাস্টারের নির্দেশ অনুসারে অনেক ভালো ভালো

ইংরেজী বই কেনেন। গোবরাদা ইংরেজীতে কাঁচা ছিলেন বলিয়া সম্ভবত ফোর্থ মাস্টার মহাশয় তাঁহাকে বেশী করিয়া 'আউট বুক' পড়াইতেন। এ খবর পাইয়া আমিও গোবরাদার সহিত গিয়া একদিন ভাব করিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার লাইব্রেরী দেখাইলেন। আমি তাঁহার নিকট বই চাহিলাম। তিনি আপত্তি করিলেন না। আমার তখন ভালো ছেলে বলিয়া একটা নাম-ডাক হইয়া গিয়াছিল। 'বিকাশ' পত্রিকার সম্পাদক রূপেও আমার খ্যাতি হইয়াছিল। গোবরাদাও সম্ভবত 'বিকাশ' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। গোবরাদার নিকট বই পাওয়া তাই আমার পক্ষে সহজ হইয়াছিল। বেশ ভালো ভালো বই ছিল গোবরাদার। সহজ ভাষায় লেখা অনেক ভ্রমণ কাহিনী, বড় বড় অক্ষরে ছাপা অনেক ইংরেজী উপন্যাসের মূল্যবান সংস্করণ গোবরাদার লাইব্রেরিতে ছিল। অনেক বই পড়িয়াছিলাম সেখান হইতে। গোবরাদার ফটোগ্রাফির শখও ছিল। মনে পড়িতেছে যখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি তখন তাহাদের বাড়ির বাগানের বেড়ার ধারে তিনি আমার একটি ফটো তুলিয়াছিলেন। সে ফটো এখনও আমার কাছে আছে। ফটোটিতে হাতে যে বইখানি আছে সেটা ডিকেন্সের 'পিকুইক পেপার্স'।

গোবরাদার নিকট হইতে আনিয়া বই পড়িতেছি শুনিয়া ফোর্থ মাস্টার মহাশয় খুব খুশি হইয়াছিলেন। গোবরাদার লেখাপড়া বেশী দূর হয় নাই, যতদূর মনে পড়িতেছে তিনি পুলিশ লাইনে ঢুকিয়া দারোগা হইয়াছিলেন। ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের কথাটা শেষ করিয়া লই। আমাদের ছাত্রজীবনে তাঁহার সম্যক পরিচয় পাই নাই। তিনি যে ভালো শিক্ষক ছিলেন, আমার প্রতি তাঁহার যে একটা বিশেষ কৃপা ছিল—এইটুকুই শুধু জানিতাম। তাঁহাকে চিনিয়াছিলাম অনেক পরে, যখন আমি ভাগলপুরে ডাক্তারি করি এবং যখন আমার সাহিত্যিক হিসাবে কিছু সুনাম হইয়াছে। দুই একখানা গ্রন্থও বাজারে বাহির হইয়াছে তখন। বিবাহও হইয়াছে বছর কয়েক আগে। আমার বড় মেয়ে কেয়া তখন বোধহয় বছর চারেকের। বড় ছেলে অসীম তখন কোলে। আমি বাবার চিঠি পাইয়া ভাগলপুর হইতে মণিহারী যাইতেছিলাম। মণিহারী যাইতে হইলে সাহেবগঞ্জে গাড়ি বদল করিয়া সকরিগলি ঘাটের গাড়িতে চড়িতে হয়। আমি রাত্রি দশটা নাগাদ সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পৌছিয়াছিলাম। পরদিন সকালে সকরিগলির গাড়ি পাওয়া যাইবে। লীলা, কেয়া এবং অসীমকে ফিমেল ওয়েটিং রুমে রাখিয়া নির্জন প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিতেছিলাম। তখন বোধহয় রাত এগারোটা। প্ল্যাটফর্মটিও বেশ লম্বা। তখন খুব সিগারেট খাইতাম। দৈনিক প্রায় একটিন সিগারেট লাগিত। সিগারেট খাইবার নানাবিধ পাইপও কিনিয়াছিলাম তখন। একটি সিগারেট ধরাইয়া মনের আনন্দে প্ল্যাটফর্মের উপর বেড়াইতেছিলাম —হঠাৎ কানে গেল—'কে, বলাই নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটটা ফেলিয়া দিলাম। ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের কণ্ঠস্বর। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কেহ নাই। তবে কি ভুল শুনিলাম? কিন্তু পর

মুহূর্তেই আমার ভুল ভাঙিল। সেকালে বড় বড় স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের উপর হুইলার কোম্পানীর কাঠের তৈয়ারী পুস্তকের দোকান থাকিত। সাহেবগঞ্জে সে রকম দোকান ছিল একটা। দোকানের পাশটা অন্ধকারে ঢাকা ছিল। দেখিলাম সেই ছায়ার ভিতর হইতে ঐ ফোর্থ মাস্টার মহাশয় বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি ওইখানে ওই প্ল্যাটফর্মের উপরই ছোট একটি শতরঞ্চি বিছাইয়া এবং ছোট একটি পুঁটুলি মাথায় দিয়া শুইয়াছিলেন।

তাড়াতাড়ি আগাইয়া দিয়া প্রণাম করিলাম।

'কেমন আছ? অনেকদিন পরে দেখা হল—'

চুপ করিয়া রহিলাম।

'তোমার খবর কিন্তু কিছু কিছু রাখি। তুমি তো ভাগলপুরে প্র্যাকটিস করছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তুমি সাহিত্যচর্চা করছ তাও আমি জানি। তোমার লেখা উপন্যাস আমি পড়েছি। বেশ ভাল হয়েছে—'

এই বলিয়া তিনি আমার 'দ্বৈরথ' উপন্যাসের খানিকটা গড়গড় করিয়া মুখস্থ বলিয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন—'এখনও কিন্তু মাঝে মাঝে তোমার ব্যাকরণ ভুল হচ্ছে। তুমি 'ভীষণ' রজনী লিখেছ। লেখা উচিত ছিল 'ভীষণা' রজনী।'

আমি বলিলাম—'আজকাল বাংলায় বিশেষণের লিঙ্গ বদলায় না।'

'ভুলটাই চলে বলছ?'

চুপ করিয়া রহিলাম। ফোর্থ মাস্টার মহাশয় প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন।

'বিয়ে-থা করেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

'ছেলে পিলে হয়েছে?'

'হয়েছে। একটি মেয়ে, একটি ছেলে—'

'কোথায় আছে তারা?'

'আমার কাছেই থাকে। আজ তাদের নিয়ে মণিহারীতে যাচ্ছি। বাবা ডেকেছেন—'

'কোথায় আছে তারা?

'ওয়েটিং-রুমে আছে—'

'চল দেখে আসি—'

ফোর্থ মাস্টার মহাশয় ছোট পুঁটুলিটি হাতে করিয়া আমার সহিত ওয়েটিং রুমে গেলেন। আমার স্ত্রীকে উঠাইলাম। সে আসিয়া প্রণাম করিল। কেয়া সর্বাঙ্গ ঢাকা দিয়া এক কোণে শুইয়াছিল। তাহাকে আর উঠাইলাম না। ফোর্থ মাস্টার মহাশয় অসীমের মুখ দেখিলেন এবং পুঁটুলি খুলিয়া দুইটি টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন।

আমি বলিলাম—'ও কি করছেন স্যার ?'

মাস্টার মহাশয় হাসিয়া উত্তর দিলেন—'পৌত্রমুখ দেখিলাম, কিছু দেব না, তা কি হয় ?'

ইহার পর আর কি বলিব ?

ওয়েটিং-রুম হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি সাহেবগঞ্জে কোথায় এসেছিলেন ?'

'একটু কাজ ছিল। এই ট্রেনেই ফিরে যাব। আমার ট্রেন এখনি আসবে।'

তাহার পর হঠাৎ তিনি আমাকে যাহা বলিলেন তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বলিলেন—'সিগারেট খাওয়াটা কি ভাল ? তুমি নিজেই ডাক্তার, তোমাকে আর কি বলব আমি—।'

আমি লজ্জায় অধোবদন হইলাম। কোনও উত্তর দিলাম না। একটু পরে তাঁহার গাড়ি আসিয়া পড়িল। তাঁহার থার্ড ক্লাসের টিকিট ছিল। কিন্তু থার্ড ক্লাসে ভয়ানক ভীড়। অনেক ছুটোছুটি করিয়াও বসিবার জায়গা পাওয়া গেল না। আমি বলিলাম—'আপনি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে পড়ুন। আমি টিকিটটা change করে দিচ্ছি।'

মাস্টার মহাশয় কিছুতেই রাজি হইলেন না। অবশেষে থার্ড ক্লাসের একটা কামরায় চড়িয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বলিলেন—'বেশী দূর যাব না তো। অনর্থক পয়সা খরচ করবে কেন ? আমি রামপুরহাটে নেমে যাব।'

তাহার পর ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের সহিত বহুকাল আর দেখা হয় নাই। এই ঘটনাটি কোনও একটি গল্পে লিখিয়াছি বোধহয়, ঠিক মনে নাই।

ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের আবার একবার দেখা পাইলাম, মাত্র কিছুদিন আগে। তখন আমি ভাগলপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক সভায় আমি সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছি। 'কাঁদি'তে সভা হইবে কাগজে সংবাদ বাহির হইয়াছে। হঠাৎ একদিন কাঁদি হইতে ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন—'তুমি এখানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হইয়া আসিতেছ এ সংবাদে খুবই আনন্দ লাভ করিলাম। তুমি এখানে আসিয়া কোথায় উঠিবে আমাকে জানাইও, আমি তোমার সহিত দেখা করিব। আমার মেয়ে এখানকার মেয়ে স্কুলের হেড মিস্ট্রেস, আমি তাহার বাসাতেই আছি।' আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম—'কাঁদি-তে গিয়া আমি প্রথমেই আপনার সহিত দেখা করিব। আপনি আসিবেন কেন, আমিই যাইব।'

কাঁদিতে নামিয়াই মাস্টার মহাশয়ের সহিত দেখা করিলাম। দেখিলাম খুব বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। দাঁড়াইতে গেলে পা কাঁপে। আমাকে দেখিয়া খুবই খুশী হইলেন। আমার সঙ্গে লীলাও ছিল। বলিলেন—'তুমি আর বৌমা এখানে খাবে। তুমি কি কি ভালোবাস আমার মনে আছে। হরিপ্রিয়া নিজে রান্না করবে—'

হরিপ্রিয়া তাঁহার মেয়ে। সেই হেড মিস্ট্রেস মাছ মাংস প্রচুর রান্না করিয়া খাওয়াইয়াছিল আমাদের। আমরা যখন খাইতেছিলাম মাস্টার মহাশয় সম্মুখে উদ্ভাসিত মুখে বসিয়াছিলেন। আর তাঁহাব খবর পাই নাই।

স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকদের সম্বন্ধে এত বিস্তৃতভাবে লিখিতেছি না। কিন্তু একথা অবশ্যই বলিব সকল শিক্ষকদের সহিতই আমার আন্তরিক ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। আমি খুব 'দুষ্টু' ছেলে ছিলাম না, কিন্তু রগ-চটা ছিলাম। মাঝে মাঝে হঠাৎ চটিয়া যাইতাম। বোর্ডিংয়ের খাওয়াই অনেক সময় আমাদের অসন্তোষের কারণ হইত। ভাত, ডাল, একটা নিরামিষ তরকারি এবং মাছের ঝোল ইহাই ছিল আমাদের দৈনিক বরাদ্দ। ক্রোধের কারণ ঘটিত যখন মোটা চালে কাঁকর থাকিত, যখন ডালে ডাল অপেক্ষা জলের আধিক্য ঘটিত। দুই টুক্‌রা মাছ পাইতাম। কিন্তু সেই টুক্‌রাগুলির আয়তন অতি ক্ষুদ্র হইলে হই-চই করিতাম আমরা। আমাদের মধ্যে যেসব ছেলেদের বেশী আর্থিক সঙ্গতি ছিল, তাহারা কেহ কেহ বাজার হইতে দই আনাইয়া লইত। অনেকে আলাদা করিয়া ঘি-ও খাইত নিজেদেব পয়সায়। আচারও। অনেকেরই ঘরে ঘি এবং আচাবের শিশি থাকিত। আমাদের বাড়ি হইতেও ঘি আসিত। কিন্তু সেটা আমরা কেবল নিজেরাই খাইতাম না, আমাদের ঘরের সকলেই ভাগ করিয়া খাইতাম। সুতরাং তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া যাইত। বাড়ি হইতে পুনরায় ঘি না আসা পর্যন্ত আমাদের ঘৃত-হীন অন্নই খাইতে হইত। কারণ বোর্ডিংয়ের কোন ব্যঞ্জনেই কোনদিন ঘৃতের অস্তিত্ব টের পাই নাই।

আমাদের বোর্ডিংয়ের ম্যানেজার ছিলেন আমাদের স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত দুর্গাদাস রুদ্র মহাশয়। তিনি নীচের ক্লাসে পড়াইতেন। আমাদের বোর্ডিংয়েরও ম্যানেজার ছিলেন তিনি। তিনিই চাকরকে সঙ্গে লইয়া বাজার-হাট করিতেন। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা তাঁহার নির্দেশেই হইত। সুতরাং আমরা যখন বিক্ষোভ করিতাম তখন তিনি তাহার লক্ষ্যস্থল হইতেন। তাঁহার অক্ষিগোলক দুইটি এমনিই একটু বহির্মুখী ছিল। মনে হইত কটমট করিয়া চাহিয়া আছেন। চটিয়া গেলে মনে হইত সেগুলি বুঝি ছিটকাইয়া বাহির হইয়া পড়িবে। আর একটি মুদ্রাদোষও ছিল তাঁহার। চটিয়া গেলে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী সহযোগে বার বার নিজের নাকটা টানিতেন। পটপট করিয়া শব্দ হইত। খাইবার সময় প্রত্যহ তিনি একটি বড় চামচে ঘি লইয়া এবং তাহার উপর একটি লাল লঙ্কা বসাইয়া আমাদের ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিতেন এবং ভাত খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চামচটি গরম ভাতের ভিতর ঢুকাইয়া দিতেন। ইহা দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। একদিন প্রবোধ—আমার সহপাঠী প্রবোধ ঘোষ—ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসিল। সে পণ্ডিত মহাশয়ের হাত হইতে ঘিয়ের চামচটি কাড়িয়া লইয়া নিজের ভাতে সেটি গুঁজিয়া দিল। বলিল—'আপনি তো রোজ খান। আজ আমি খাচ্ছি। অখাদ্য রান্না রোজ রোজ আর খেতে পারি না।'

পণ্ডিত মহাশয়ের অক্ষিগোলক দুইটি ছিটকাইয়া বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল। নাক টানিয়া তিনি পটপট শব্দ করিতে লাগিলেন। বলিলেন—'এরকম অসভ্যতা না করলেই পারতে। বেশ, আমি আর ঘি খাব না। আমার ঘি তুমিই খেও।'

তিনি উঠিয়া গেলেন এবং নিজের ঘর হইতে তাঁহার ঘিয়ের শিশিটা আনিয়া প্রবোধের থালার সামনে রাখিলেন। খাওয়ার 'হলে' একটা হৈ হৈ পড়িয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় ঘি কিছুতেই খাইবেন না, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম—'না, আপনি ঘি খান, প্রবোধের দোষ হয়েছে।'

শেষে প্রবোধ সর্বসমক্ষে তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিল। তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া আবার ঘি খাইতে লাগিলেন।

বোর্ডিংয়ের ছেলেদের খাওয়া খুব খারাপ হইতেছে এই খবরটা ক্রমশ হেডমাস্টার মহাশয় মহাদেববাবুর কানে পৌছিল। তিনি এক রবিবারে আমাদের খাওয়ার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সব দেখিয়া রুদ্র পণ্ডিত মহাশয়কে তিনি কি বলিলেন জানি না, কিন্তু ব্যবস্থা হইল চাল এবং মাছ একজন বোর্ডিংয়ের ছেলে চাকরকে সঙ্গে লইয়া গিয়া কিনিবে। আমার মনে আছে আমি বাজারে গিয়া একদিন একটি আট সের ওজনের রুইমাছ দুই টাকা দিয়া কিনিয়া আনিয়াছিলাম। ইহাতে রুদ্র পণ্ডিত মহাশয় আমাকে ভৎ‍র্সনা করিয়া বলিলেন—'আট-সের মাছ তোমরা একদিনে খাবে? দু'দিনে খাও। সমস্ত মাছটার অম্বল করে ফেল। বাসী অম্বল বেশ ভাল লাগবে কাল।'

তাহাই হইল। রুদ্র মহাশয়ের সহিত খাওয়া-দাওয়া লইয়া আমাদের কলহ হইত। রুদ্র মহাশয় বলিতেন—'মাসে তোমরা মাত্র সাত টাকা করে দাও। এ টাকায় এর চেয়ে ভালো খাওয়া-দাওয়া সম্ভব নয়।'

হয়তো সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমরা ঝগড়া করিতাম। আমরা সকালে এবং বিকালে নিজেরা খাবার কিনিয়া খাইতাম। আমি এবং ভোলা সকালে আদা ও ছোলা-ভিজানো খাইতাম। বোর্ডিংয়ের পাশেই ছিল রাজেনবাবুর দোকান। বিকালে স্কুল হইতে আসিয়া বোর্ডিংয়ের সব ছেলেরা ভীড় করিত সেখানে। ভীড়ের মধ্যে কোন্ ছেলে কোন্ খাবার লইতেছে তাহা অনেক সময় তিনি ঠিক করিতে পারিতেন না। আমরা তাহার দোকানে বসিয়াই খাইতাম। কে কত খাই তাহার হিসাবে তিনি গোলমাল করিয়া ফেলিতেন। আমরা যে যাহা দিতাম তাহাই তিনি লইতেন। বলিতেন—'আমি তোমাদের বিশ্বাস করি। তোমরা সব ভালো ছেলে, সোনা ছেলে।' আমার যতদূর মনে পড়ে আমরা কেহ তাঁহাকে চটাইতাম না। যেদিন বেশী খাইয়া ফেলিতাম সেদিন বলিতাম—'আজ বেশী খেয়েছি, বাকি পয়সা পরে শোধ করব।' রাজেনবাবু আপত্তি করিতেন না।

আমার সাহেবগঞ্জের জীবনে আর একটি পরিবারের কথা উজ্জ্বল হইয়া আঁকা

আছে। আমি আমার বাবার বন্ধু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা আগেই বলিয়াছি। আমরা যখন সাহেবগঞ্জে পড়িতে যাই তাহার অনেক পূর্বেই প্রমথনাথ মারা গিয়াছেন। তাঁহার দাদা অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখনও জীবিত। তিনি ছিলেন আমাদের জ্যাঠামশাই। আমার বাবা তাঁহাকে দাদার মতই শ্রদ্ধা করিতেন। তিনিও মাঝে মাঝে মণিহারী যাইতেন এবং আমাদের বাড়িতে দিন কয়েক কাটাইয়া আসিতেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের দুই ছেলে: আমাদের ফণীদা এবং মণিদা। ফণীদা বড় ডাক্তার হইয়া রেডিওলজিষ্ট রূপে বিখ্যাত হন। তিনি ছাত্রজীবনে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে যাইতেন। জ্যাঠামশাইয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন আমাদের জ্যাঠাইমা। এরকম স্নেহময়ী নারী বিরল। বোর্ডিং হইতে আমরা প্রায়ই তাঁহার কাছে যাইতাম। এবং ভালো-মন্দ খাইয়া আসিতাম। সে বাড়িতে কি স্নেহ ও আদর যে পাইতাম তাহা কথায় বলিয়া বুঝানো শক্ত। তাহাতে কোনও লোক দেখানো লৌকিকতা ছিল না, জাঁকজমকও ছিল না। তাহা ছিল সরল, অনাড়ম্বর এবং খাঁটি। জ্যাঠামশাইয়ের একটি বোন ছিলেন। আমরা তাঁহাকে মানা বলিয়া ডাকিতাম। তিনি খুব সুরসিকা এবং সদাহাস্যময়ী ছিলেন। আর ছিলেন স্থূলকায়া সেজ জ্যাঠাইমা—স্বর্গীয় প্রমথনাথের স্ত্রী। আমরা গেলে তিনিও খুশি হইতেন। তাঁহার পুত্র হাবুলদা আমার সহপাঠী ছিল। অনুকূলবাবুর দ্বিতীয়পক্ষের ছেলে বুড়ো (ভাল নাম ইন্দু), ক্যাবলা আমাদের ভাইয়ের মতই ছিল। অনুকূল জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমারা অনেকদিন আগেই দেহরক্ষা করিয়াছেন। ফণীদা, মণিদা, বুড়ো, ক্যাবলা কেহই এখন বাঁচিয়া নাই। বাঁচিয়া আছে কেবল তাহাদের স্নেহের উজ্জ্বল স্মৃতি।

সাহেবগঞ্জে স্কুল জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার আর একটি জীবন আরম্ভ হয়। তাহা লোকসেবার জীবন। আমাদের নেতা ছিলেন বটুদা। তিনি গঙ্গার ধারে একটি ভাঙা নীলকুঠিতে নাইট স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে অনেক প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, যুবককে অক্ষর পরিচয় করাইয়া দিতাম আমরা। তাহাদের রামায়ণ-মহাভারত হইতে গল্প পড়িয়া শুনাইতাম। ইহা ছাড়া, মুষ্টিভিক্ষার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন বটুদা। আমরা পরিচিত মহলে অনেকের বাড়িতে ছোট ছোট হাঁড়ি কিনিয়া দিয়া আসিতাম। অনুরোধ করিয়া আসিতাম, রাঁধিবার সময় একমুঠো চাল যেন তাঁহারা হাঁড়িতে দেন। এই চাল সংগৃহীত হইয়া হাটে বিক্রয় হইত। সে টাকা বিতরিত হইত দুঃস্থদের জন্য।

আশ্চর্য মানুষ ছিলেন বটুদা। সারাটা জীবনই তিনি পরের উপকারের জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন। আমরা আমাদের অবসর মতো তাঁহার কাজে সাহায্য করিতাম। তাঁহার বাড়ির বাহিরের দিকে বারান্দায় ছোট একটা লাইব্রেরিও স্থাপন করিয়াছিলাম। আমাদের পণ্ডিত মহাশয়, তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন—'শারদা ভবন'। এই লাইব্রেরিতে সন্ধ্যার সময় আমরা প্রায়ই যাইতাম। ক্রমশ বটুদার পরিবারের

বাড়ির লোক হইয়া গেলাম আমরা। বটুদারা বৈষ্ণব ছিলেন। বাড়িতে বাল-গোপালের মূর্তি ছিল একটি। রোজ সন্ধ্যার সময় পূজা হইত। আমরা প্রসাদ পাইতাম। বটুদার বাবা পুজো করিতেন। প্রকৃত ভক্ত ছিলেন একজন। ওই বাল-গোপালটিকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত। এই প্রসঙ্গে একটি আশ্চর্য কথা মনে পড়িল। বটুদার বাবাকে কি একটা কাজের জন্য দিল্লী যাইতে হইয়াছিল। যেদিন তিনি দিল্লী হইতে ফেরেন সেদিন কি একটা কাজে—(খুব সম্ভবত হুইলারের দোকান হইতে বই কিনিবার জন্য, বই কিনিবার জন্য প্রায়ই যাইতাম সেখানে) আমি স্টেশনে গিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়াই বটুদার বাবা প্রশ্ন করিলেন—'আমাদের বাড়িতে কাল সন্ধ্যাবেলা গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ—'

'গোপালের প্রসাদ খেয়েছিলি? গোপালকে ওরা আজকাল রোজই ছোলা-ভিজানো দিচ্ছে নাকি?'

'হ্যাঁ, কয়েকদিন থেকে ছোলা-ভিজানো আর বাতাসা প্রসাদই তো খাচ্ছি—'

'ওই দেখ। গোপাল আমাকে স্বপ্নে তাই বললে—রোজ ছোলা ভিজে খেয়ে আমার পেট কামড়াচ্ছে। স্বপ্ন দেখে তাই আমি তাড়াতাড়ি দিল্লী থেকে চলে এলাম।'

কথাটা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলাম। এখনও সে বিস্ময় কাটে নাই।

সাহেবগঞ্জের স্কুল জীবনে আরও অনেক লোকের ছায়া আমাদের জীবনে পড়িয়াছিল। ডাক্তার পশুপতিবাবুর কথা মনে পড়িতেছে। তিনি আমাদের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। বাবা যখন সাহেবগঞ্জে মাতুলালয়ে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন তখন পশুপতিবাবুর স্নেহভাজন ছিলেন তিনি। সে স্নেহের ধারা বংশানুক্রমে আজও প্রবাহিত আছে। পশুপতিবাবুর তিন ছেলে বিশুদা, ঢলাদা এবং ডলাদাকে আমরা দাদার মতই খাতির করিতাম। আমি যখন পরে মেডিকেল কলেজে পড়ি তখন বিশুদা এবং ডলাদা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তাহার পরও সম্বন্ধ বহুকাল অটুট ছিল। আমার ল্যাবরেটরিতে বিশুদা প্রায়ই রোগী পাঠাইতেন। ডলাদাও। এখনও সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ডলাদার মেয়ে মণ্টু এখনও মাঝে মাঝে খবর নেয়। পশুপতিবাবুর সম্বন্ধে একটি কথা মনে পড়িতেছে। তিনি রোজ সন্ধ্যার সময় নিজের বাড়ির রাস্তায় পায়চারি করিতেন। কখনও আমাদের সহিত দেখা হইলে বলিতেন—'কে রে?'

নিজের পরিচয় দিতে হইত। তখন তিনি বলিতেন—'এখনও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিস, পড়তে বসিসনি! তোর বাবাকে আমি চিঠি লিখে দেব।'

সুতরাং কোনদিন কোন কারণে কোথাও দেরী হইলে পশুপতিবাবুর বাড়ির রাস্তা দিয়া যাইতাম না। ঘুরিয়া অন্য রাস্তা দিয়া যাইতাম। সেকালে সব ছেলেদেরই সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ি ফিরিতে হইত, না ফিরিলে গার্জেনরা কৈফিয়ৎ তলব করিতেন। আমাদের বোর্ডিংয়ের সুপারিনটেন্ডেন্ট মহাশয় (থার্ড মাষ্টার) এ বিষয়ে বড় কড়া লোক ছিলেন।

মনে পড়িতেছে আমার সাহেবগঞ্জের স্কুল জীবনের আরও কয়েকজন লোক আমাদের নিকট 'হীরো' ছিলেন। বটুদা তো ছিলেনই, আরও কয়েকজন ছিলেন। আমি যদিও ফুটবল খেলিতাম না, কিন্তু ফুটবল খেলায় পারদর্শী খেলোয়াড়দের মনে মনে খুব খাতির করিতাম। সুধন্বুদা, পঙ্কজদা, বিজয়দা, হাওয়া, বাদলা (ইঁহারা বোধ হয় সাহেবগঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন না), সামাদ প্রভৃতি আমাদের নিকট 'হীরো' ছিলেন। আমাদের স্কুলেও ফকাস্ কাপ প্রতিযোগিতায় যাহারা যোগ দিত তাহাদের আমরা খুব সমীহ করিতাম। আমাদের স্কুলের কালী মিস্তিরকে এজন্য খুব খাতির করিতাম আমরা।

সাহেবগঞ্জে একটি এমেচার থিয়েটার ক্লাব ছিল। মাঝে মাঝে তাঁহারা থিয়েটার করিতেন। তখন ডি. এল. রায়ের নাটকগুলি বাজার গরম করিয়া রাখিয়াছে। সাহেবগঞ্জ থিয়েটার ক্লাবের থিয়েটার দেখিয়া আমি দ্বিজেন্দ্রলালের ভক্ত হইয়া পড়ি। চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, মেবার পতন, রাণা প্রতাপ সিংহ, বিরহ প্রভৃতি নাটক অভিনয় করিয়া সাহেবগঞ্জ থিয়েটার ক্লাব আমার মনে এমন একটা ছাপ রাখিয়া গিয়াছে যে আজিও তাহা মোছে নাই। সেই থিয়েটার ক্লাবের কৃতী অভিনেতারা আমাদের নিকট শ্রদ্ধেয় ছিলেন। আজও আছেন। কেশবদা, ফণীদা, বিজয়দা, সুধন্বুদা, জ্যোতিষদা আজও আমার মনে জাগরূক আছেন। তাঁহাদের থিয়েটারে হয়তো অনেক ত্রুটি ছিল। তখন পুরুষরাই নারীর ভূমিকায় অভিনয় করিতেন। স্টেজও ছিল একটা জোড়া-তাড়া ব্যাপার। কিন্তু কি ভালই যে লাগিত। তখন মনটাই অন্যরকম ছিল।

এই সূত্রে একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। খুব ছেলেবেলা বাবার সহিত আমি কোথায় যেন (খুব সম্ভবত সাহেবগঞ্জেই) নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনিতে আসিয়াছিলাম। সন্ধ্যায় যাত্রা হইবার কথা। কিন্তু শুনিলাম সন্ধ্যায় যাত্রা হইবে না। নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে ভোরে ব্রাহ্ম মুহূর্তে তিনি যাত্রা শুরু করিবেন এবং সকাল আটটা নাগাদ শেষ করিয়া দিবেন। ইহাতে রাতের ঘুমের ব্যাঘাত হইবে না। সকালে কাজের ব্যাঘাত হইবে না। খুব ভোরে ব্রাহ্ম মুহূর্তেই আমরা যাত্রার আসরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম বহু লোক সমবেত হইয়াছে। নীলকণ্ঠের তখন বিপুল খ্যাতি। হঠাৎ নীলকণ্ঠ একটি কালো রঙের জোব্বা পরিয়া আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম তিনি বৃদ্ধ। মাথার চুল পাকা। মুখমণ্ডলে কয়েকদিনের না কামানো গোঁফ-দাড়ি। তিনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন, 'আজ মাথুর গাইব। কিন্তু যে ছেলেটির বৃন্দা সাজবার কথা, তার খুব জ্বর এসেছে। সে অভিনয় করতে পারবে না। আপনারা যদি অনুমতি করেন আমিই বৃন্দা সাজবো।'

নীলকণ্ঠের এ প্রস্তাবে কেহ আপত্তি করিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু মনে মনে সবাই বোধহয় হতাশ হইয়াছিলেন। একটু পরে নীলকণ্ঠ বৃন্দা বেশে আসরে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিলাম তিনি দাড়ি কামান নাই। পোষাকও বদলান নাই। ওই

কালো জোব্বা এবং পেন্টালুনের উপর একটি গোলাপী রঙের বৃন্দাবনী চাদর গায়ে দিয়াছেন। সেই চাদরটিই মাথার উপর টানিয়া অবগুণ্ঠন দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি যখন গান ধরিলেন তখন তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদের কথা আমরা ভুলিয়া গেলাম। সে কি কণ্ঠস্বর, সে কি আকুতি! সে কি সুর! মনে হইল আমরা সকলেই যেন মথুরা চলিয়া গিয়াছি এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছি—তোমার রাজ্যপাট লইয়া কি করিবে! তোমার রাই যে মর মর। চল চল শীঘ্র চল। তাহার অভিনয়ের গুণে এবং গানের অলৌকিক ক্ষমতায় আমরা কয়েক ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসিয়াছিলাম। আজ-কালকার থিয়েটারে বাহ্যিক আড়ম্বর বেশী। অভিনয় প্রাণহীন।

আমাদের সাহেবগঞ্জের সেই ক্লাবের থিয়েটার কিন্তু প্রাণহীন ছিল না। কেশবদার চাণক্য, ফণীদার গোবিন্দ পন্থ আজও আমার মনে সজীব হইয়া আছে।

সাহেবগঞ্জের আর একটি লোককে মনে পড়িতেছে—মাসি গার্ড। ভাল নাম ছিল বোধহয় হরিসাধনবাবু। আমরা তখন কিশোর, আর তিনি তখন প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায়। তবু তিনি আমাদেব সমবয়সী ছিলেন। আমাদের সঙ্গে নানারূপ কৌতুক করিতেন। স্কুলের ছুটি হইয়াছে। স্কুলের গেট দিয়া পিলপিল করিয়া ছেলের দল বাহির হইতেছে। মাসি গার্ড গেটের সামনে আকাশের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—'বাঃ, বেশ কেটেছে।'

ছেলের দল অমনি দাঁড়াইয়া গেল। তখন ঘুড়ি ওড়ানোর সময়। ছেলেরা ভাবিল—কোথাও কাহারও ঘুড়ি কাটিয়াছে বোধহয়। উন্মুখ হইয়া আকাশের দিকে চাহিতে লাগিল তাহারা। কোথাও কাটা ঘুড়ি দেখিতে না পাইয়া যখন তাহারা মাসি গার্ডকে প্রশ্ন করিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল—তখন দেখিল তিনি নাই, নিঃশব্দে অন্তর্ধান করিয়াছেন। এরকম মজা তিনি মাঝে মাঝে করিতেন। তাঁহার ছেলের নাম ছিল মাখন। একদিন বেলা দশটা নাগাদ তাঁহাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া 'মাখন মাখন' বলিয়া ডাকিতেছি। মাসি গার্ড বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন —'তুই কি বোকারে। এই গ্রীষ্মকালে বেলা দশটার সময় মাখন কি মাখন থাকে? গলে যায়। তুই বরং ঘি ঘি বলে ডাক, হয়তো সাড়া পাবি।'

বলিয়াই ভিতরে চলিয়া গেলেন। এই ধরনের রসিকতা তিনি প্রায়ই করিতেন আমাদের সঙ্গে। রেলের গার্ড ছিলেন, কিন্তু সাহেবগঞ্জের বাঙালী সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ ছিলেন তিনি। তাঁহাকে ভোজের বাড়িতে পরিবেশন করিতে দেখিয়াছি, থিয়েটারের স্টেজ বাঁধিতে দেখিয়াছি, আবার মড়া পোড়াইতেও দেখিয়াছি। সাহেবগঞ্জের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে তাঁহাকে মান্য করিত। মনটা ছিল কৌতুক-প্রবণ, স্টেশনের কুলির সঙ্গেও যেমন সহজভাবে রসিকতা করিতেন, তেমনি সহজভাবেই ডি. টি. এস আপিসের বড়বাবুর সহিতও করিতে তাঁহার বাধিত না। পুণ্যবান লোক ছিলেন। গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া সহসা তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ছেলে

লালা, শুঁটি আর মাখনের কথা এখনও মনে আছে। জানি না তাহারা এখন কোথায়।

সাহেবগঞ্জের কথা শেষ করিবার আগে প্রবোধ ঘোষের কথা বলি। আগেই বলিয়াছি প্রবোধ ঘোষ আমার সহপাঠী ছিল। এখন তাহার সহিত ভাব হইয়া গেল আমার সাহিত্য-চর্চার জন্যই। সম্ভবত সে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ছেলেবেলাতেই তাহার বাবা ও মা প্লেগে মারা যান। স্কুলের থার্ড মাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে মানুষ করেন নিজের বাড়িতে। থার্ড মাষ্টার মহাশয়ের খুব প্রিয় ছিল সে।

থার্ড মাষ্টার মহাশয় যখন সাহেবগঞ্জ স্কুল হইতে চলিয়া গেলেন, তখন আমাদের মনে হইয়াছিল প্রবোধও তাহার সহিত চলিয়া যাইবে। সে কিন্তু গেল না। আমার সহিত তাহার যখন খুব ভাব, তখন একবার ছুটিতে সে আমাদের সহিত মণিহারী গেল। তাহার পর হইতে প্রায় প্রতি ছুটিতে সে আমাদের বাড়িতে যাইত। ক্রমে আমার মাকে মা, এবং বাবাকে বাবা বলিতে শুরু করিল। অর্থাৎ সে আমাদের বাড়ির ছেলে হইয়া গেল। একবার কোন একটা দীর্ঘ ছুটিতে—গ্রীষ্মে কি পূজায় তাহা মনে নাই—প্রবোধ আমাদের বাড়িতে গিয়াছিল। সে সময় তাহার নিমনিয়া হয়। বাবা তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন—মা করিয়াছিলেন শুশ্রূষা। যমে মানুষে টানাটানি হইয়াছিল। অনেক কষ্টে তাহার প্রাণ রক্ষা হয়। সেই হইতে প্রবোধ আমাদের আত্মীয় হইয়া যায়। যতদিন বাঁচিয়াছিল, ততদিন আমাদের সহিত নিবিড় সম্বন্ধ ছিল তাহার। তাহার বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার আঝাপুর গ্রামে। সেখানে সে মাষ্টারী করিত। যখন ছুটি পাইত আমাদের বাড়ি চলিয়া আসিত। আঝাপুরে এক সাহিত্য-সভায় সে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। আমি যাইতে পারি নাই। ইহার কিছুদিন পরে প্রবোধ মারা যায়। তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি নাই বলিয়া আজও যেন তাহার নিকট অপরাধী হইয়া আছি।

আমি ১৯১৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিই। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। ১০ টাকার একটি বৃত্তিও আমার ভাগ্যে জুটিয়াছিল, কিন্তু বাঙালী বলিয়া সে বৃত্তি আমাকে দেওয়া হয় নাই। কথাটা স্কুলের শিক্ষক মহাশয়দের মুখে শুনিয়াছিলাম—সত্য মিথ্যা জানি না।

১৯১৮ কিন্তু আমার স্মৃতিতে জাগরূক হইয়া আছে দুটি কারণে। প্রথম কারণ ঐ বৎসরই আমার একটি চার লাইনের কবিতা 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হয়। কবিতাটি একটি সংস্কৃত শ্লোক-এর অনুবাদ। 'প্রবাসী'-তে লেখা বাহির হওয়া তখন বিশেষ গৌরবের ছিল। তখন আমার বয়স ১৮ বৎসর কয়েক মাস। আগেই বলিয়াছি আমার পড়া বিলম্বে শুরু হইয়াছিল। তাই ১৬ বৎসরে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারি নাই। ১৯১৮ আমার মনে আর একটি কারণে উজ্জ্বল হইয়া আছে। ঐ বৎসর আমার ছোট বোন রানীর বিবাহ হয়। রানী আমাদের বাড়ির ফুটবল টিমের 'ব্যাক' ছিল। পেয়ারা গাছে, আমগাছে চড়িতে সে দক্ষ ছিল। বাড়ির বিড়াল

কুকুরগুলি খুব প্রিয় ছিল তাহার। একবার এক বিড়াল ছানা পাগল হইয়া তাহাকে কামড়াইয়া দেয়। এজন্য বাবা তাহাকে কশোউড়ি লইয়া গিয়াছিলেন। তখন সব হাসপাতালে 'এ্যান্টি রেবিজ' ইঞ্জেকশন পাওয়া যাইত না। সেই রানীর ১১ বৎসর বয়সে বিবাহ হইল। তখনও জাহাজ বন্ধ। নৌকাযোগে গঙ্গা পারাপার হইতে হয়। কয়েকটি নৌকা লইয়া আমি সাহেবগঞ্জে গিয়াছিলাম বরযাত্রী আনিবার জন্য। সাহেবগঞ্জ স্টেশনে তাহাদের স্নানাহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শুধু সাহেবগঞ্জে নয়, বর্ধমানেও তাহাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা বাবা করিয়াছিলেন। বর্ধমান স্টেশনে বাবার একজন পরিচিত লোক স্টেশনমাষ্টার ছিলেন। বর্ধমানে রাত্রি ১২টার সময় গাড়ি পৌঁছাইত তখন। স্টেশনমাষ্টারমশাই তখন প্রতি কামরা খোঁজ করিয়াছিলেন— মণিহারীর ডাক্তারবাবুর বাড়িতে বিবাহের বরযাত্রী কেহ ছিলেন কিনা। বরযাত্রীদেরও তিনি জলখাবার খাওয়াইয়াছিলেন। নৌকাযোগে আমরা যখন বাড়ির কাছাকাছি আসিলাম তখন নৌকা হইতে উপর্যুপরি কয়েকবার বন্দুকের আওয়াজ করা হইল। মণিহারীর ঘাটে একজন ঘোড়সওয়ার বন্দুকের শব্দের জন্য উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। বন্দুকের শব্দ পাওয়া মাত্র সে ঘোড়া ছুটাইয়া আমাদের বাড়িতে আসিয়া খবর দিল—বরযাত্রীর নৌকা দেখা গিয়াছে। বাড়িতে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল।

মণিহারী কুঠিতে বরযাত্রীদের রাখা হইয়াছিল। যোগেশকাকা তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। সন্ধ্যার সময় বরযাত্রী যখন আমাদের বাড়ীতে আসিলেন, তখন ঘোড়া, পাল্কি, হাতি, গরুর গাড়ি সবরকম যানেরই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দেশী ঢাক, ঢোল, ভেঁপুও ছিল প্রচুর। বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমি একটি গান লিখিয়াছিলাম। বাবার থিয়েটারপার্টির এক ভদ্রলোক, নামটি ঠিক মনে পড়িতেছে না, তাহাতে সুর বসাইয়া গাহিয়াছিলেন। সকলে খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন গানটির। তখন আমি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর খুব ভক্ত। তাঁহারই লেখা গান, 'জাগো জাগো পুরবাসী' গানটির ধাঁচে গানটি লেখা হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম অংশটি এখনও মনে আছে :

> এসো এসো গুণী-মানী,
> পুলকে ভরিয়া উজল করিয়া
> মোদের কুটিরখানি
> পর্ণ কুটির করিয়া ধন্য
> এসেছো গো হে মহামান্য,
> গৌরবময় করি লহ সব
> সৌরভ-কণা জানি।

বরযাত্রীরা তিনদিন ছিলেন। আত্মীয়-স্বজনরাও বেশ কিছুদিন। সাত-আট দিন ধরিয়া বাড়িতে ভোজ চলিয়াছিল। বাবার বন্ধু জমিদাররা এত মাছ পাঠাইয়াছিলেন

যে সব ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। তিনমণ মাছ পুঁতিয়া ফেলা হইয়াছিল। দুধ-দইও প্রচুর আসিয়াছিল। ক্ষীরও। মণিহারীর কাছাকাছি দশ-পনেরোটি গ্রাম হইতে নিমন্ত্রিতরা আসিয়াছিলেন। তাছাড়া ছিল অনাহুত, রবাহুত-র দল। এরকম ভোজ আজকাল আর হয় না। হওয়া সম্ভব নয়।

সাহেবগঞ্জ ছাড়িয়া আমি যেদিন চলিয়া আসি, সেদিনের কথা বিশেষ করিয়া মনে নাই। পরীক্ষা দিবার পরই সোজা বাড়ি চলিয়া গিয়াছিলাম। আমাদের পরীক্ষার সেণ্টার ছিল ভাগলপুর 'টি. এন. জুবিলি' কলেজে। সেই সময় সেখানকার বিখ্যাত অধ্যাপক প্রিন্সিপাল এন. এন. রায়কেও দেখিয়াছিলাম। ও-রকম কুৎসিত-দর্শন লোক বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু তাঁহার গুণের আলোয় তিনি প্রদীপ্ত ছিলেন—যখন বক্তৃতা দিতেন তখন সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত। পরে আমারও একবার তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। শুনিয়া সত্যি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম।

সাহেবগঞ্জে আমার কৈশোর জীবন কাটিয়াছে। বলিতে গেলে আমার জীবনের প্রস্তুতি-পর্ব—এই সাহেবগঞ্জে। সেখানকার শিক্ষকদের নিকট আমি ঋণী। বটুদার কাছেও আমি ঋণী। বটুদার সাহায্য ও উৎসাহ না পাইলে হয়ত আমি সাহিত্য-জগতে প্রবেশই করিতাম না। আমি স্কুলে পড়াশুনায় ভালোই ছিলাম। বরাবরই আমি প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলাম। কিন্তু যে ধরনের পুস্তককীট হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো ছেলে বলিয়া পরিচিত হওয়া যায় সে রকম পুস্তককীট হইবার প্রবৃত্তি আমার ছিল না। তা ছাড়া সাহিত্যের ভূত ঘাড়ে চাপিয়াছে। আমি অনেক বাজে বই পড়িয়া সময় কাটাইতাম, প্রায় রোজই কিছু না কিছু লিখিতাম। কাগজে পাঠাইতাম, প্রায়ই ফেরত আসিত। তবু দমিতাম না, আবার লিখিতাম, আবার কাগজে পাঠাইতাম। সাহেবগঞ্জে যতদিন ছিলাম বটুদার উৎসাহ পাইয়াছি। সাহেবগঞ্জ হইতে চলিয়া যাইবার পরও বটুদার সঙ্গে সম্পর্ক অটুট ছিল। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তিনি আমার ছেলের বিবাহে ভাগলপুরের বাড়িতে আসিয়াছিলেন। বটুদার ছেলে নেপু, ভালো নাম 'সরিৎশেখর মজুমদার' এখনও মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। সেও একজন রসিক এবং সাহিত্যশিল্পী।

বহুকাল পূর্বে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সাহেবগঞ্জ ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু সাহেবগঞ্জকে এখনও ভুলি নাই। সাহেবগঞ্জও এখন সাহিবগঞ্জ হইয়াছে। আমাদের সেই ছোট স্কুল অনেক বড় হইয়াছে। তাহার ঐশ্বর্য, তাহার ঘর-বাড়ি অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের সেই ছোট স্কুল বাড়িটি আমার সেই নাতিবৃহৎ বোর্ডিং-হাউসটি আজও অমর হইয়া আছে আমার মনে।

সাহেবগঞ্জের পাহাড়তলী, পাহাড়ের ঝর্ণা, সাহেবগঞ্জের ধারে নীলকুঠি, সেখানে বটুদার নাইট-স্কুল—এসব ভোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার ভাই ভোলা অসুখে পড়িয়াছিল। তাই এক বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে।

আমি যেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই, ভোলা সে বৎসর দিতে পারে নাই। আমি চলিয়া আসিবার পরও সে সাহেবগঞ্জ বোর্ডিংএ এক বৎসর ছিল।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার সময় আমার জীবনে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার ঠিক আগে মণিহারী হইতে একটি লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একটি মাদুলি ও বাবার একটি পত্র আনিয়াছিল। বাবা লিখিয়াছিলেন, পরীক্ষা দিতে যাইবার আগে আমি যেন মাদুলিটি ধারণ করি। যে চাকরটি মাদুলি আনিয়াছিল সেই আমার বাম বাহুমূলে শক্ত সুতার দ্বারা মাদুলিটি বাঁধিয়া দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কিসের মাদুলি এটা?'

সে যাহা বলিল তাহাতে অবাক হইয়া গেলাম। আমাদের বাড়িতে নাকি প্রচণ্ড একটি গোক্ষুর সর্প মারা পড়ে। তাহার প্রকাণ্ড ফণার ঠিক মাঝখানে একটি সাদা রংএর এঁটুলি ছিল। সেই এঁটুলিটি তুলিয়া এই মাদুলির ভিতর রাখা হইয়াছে। কে যেন বাবা-মাকে বলিয়াছে এ এঁটুলি সঙ্গে থাকিলে যে কোন কাজে সিদ্ধি অনিবার্য। তাই মা এঁটুলি-গর্ভ মাদুলিটি পরিয়া পরীক্ষা দিতে বলিয়াছেন। যিনি এঁটুলিটির বিশেষ্ গুণের কথা বলিয়াছিলেন তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, এ এঁটুলি কাহারও কাছে বেশিদিন থাকে না। এই এঁটুলি আবার একটা গোখরো সাপ খুঁজিয়া তাহার মাথায় গিয়া বসিবে। সুতরাং মা আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন আমি যেন মাদুলিটি খুব যত্ন করিয়া রাখি।

আমি যত্ন করিয়াই রাখিয়াছিলাম। যে কয়দিন পরীক্ষা দিয়াছিলাম সেই কয়দিন আমার হাতেও তাহা ছিল। পরীক্ষায় সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর যখন বাড়ি গেলাম তখন দেখিলাম হাতে মাদুলিটি নাই। সুতাটি আছে কেবল। তাহার পর আরেকটি দুশ্চিন্তার কারণ হইল, আমি জ্বরে পড়িয়া গেলাম। মায়ের মনে হইল এই এঁটুলির আবির্ভাব এবং তিরোভাব-এর সহিত আমার জ্বরের নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে। বাবা বলিলেন, 'প্যারা-টাইফয়েড' হইয়াছে। মা পীরবাবার কাছে সিন্নি মানত করিলেন।

পীরবাবার কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। পীরবাবা আমাদের বাড়ির কাছেই ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত একটি সিদ্ধ পীরের কবর-স্থান। খুব জাগ্রত ইনি। ও অঞ্চলের সকলেই পীরবাবার ভক্ত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই বিপদে পড়িলে পীরবাবার নিকট মানত করেন। এইরকম পীর একটি সকরি পাহাড়ে আছে, মুঙ্গেরেও আছে। জানি না, ইহাদের পরস্পরের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে কি না। জনশ্রুতি, মুসলমান আমলে এই সব উঁচু টিলায় ফৌজি পাহারা থাকিত। ছোটখাটো দুর্গও ছিল নাকি প্রত্যেক জায়গায়। মণিহারী পীরবাবার পাহাড়ের ধারে অনেক পুরাতন ইটের স্তূপ এবং কারুকর্ম অলংকৃত বড় বড় অনেক পাথর দেখিতে পাওয়া যাইত। একজন মাড়োওয়াড়ি এই অঞ্চল হইতে পাথর তুলিয়া ব্যবসা করিত। আমাদের আত্মীয় অতুলদা—'বাবার মামার শালা'—তাহার অধীন চাকরিতে বহাল

হইয়াছিল। লোকে বলে তিনি ওই পাথর খুঁড়িতে খুঁড়িতে নাকি মোহরের ঘড়া পান। তাহার পর হইতে নাকি অতুলদার অবস্থা ফিরিয়া যায়। ইহা কতদূর সত্য জানি না, কিন্তু ইহা জানি, অতুলদা পীরবাবার কবরটি ঘিরিয়া একটি পাকা ঘর করাইয়া দিয়াছিলেন। এবং পাহাড়ে উঠিবার জন্য পাকা সিঁড়িও নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

পীরবাবার পাহাড়ের একধারে রঙিন খড়ি পাওয়া যাইত। আমরা ছেলেবেলায় খড়ি আনিবার জন্য প্রায়ই সেখানে যাইতাম। কুল গাছ এবং বেত গাছের জঙ্গল ছিল চারদিকে। তাহার ভিতর ছিল নানারকম পাখীর বাসা। বুলবুলি, দরজি পাখী, মুনিয়া, বগেরি পাখীর আড্ডা ছিল স্থানটি।

এই পীরবাবার কৃপায় কিছুদিন পরে আমার জ্বর ছাড়িয়া গেল। কিন্তু আমি দুর্বল হইয়া পড়িলাম। আমাদের বাড়ির কাছে নিকটতম কলেজ ভাগলপুরের টি. এন. জুবিলি কলেজ। আমার সেইখানেই পড়িবার কথা। কিন্তু বাবা স্থির করিলেন আমাকে হাজারিবাগ সেন্ট কলম্বাস কলেজে পাঠাইবেন। সেখানকার জল-হাওয়া ভালো। আমার শরীরটা সারিয়া যাইবে। হাজারিবাগে দরখাস্ত করা হইল। কলেজ কর্তৃপক্ষের সম্মতি পাইবার পর বাবা ভরতির জন্য টাকাকড়ি পাঠাইয়া দিলেন। আমার যাইবার দিনও নির্দিষ্ট হইয়া গেল। সাহেবগঞ্জে আমরা বাড়ির কাছেই ছিলাম —প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বাড়ি আসিতাম। বাড়ি হইতেও কেহ না কেহ গিয়া আমাদের খবরাখবর করিতেন। বিদেশ-বাসের ব্যথা এত তীব্র অনুভব করি নাই। হাজারিবাগ গেলে করিতে হইবে। মনে মনে একটু ভয় হইল। মা তো খুব দমিয়া গেলেন। কিন্তু তবু যখন সবকিছু হইয়া গিয়াছে—তখন একদিন যাত্রা করিতে হইল। পিতা-মাতাকে প্রণাম করিয়া, ঠাকুর-ঘরে প্রণাম করিয়া, পীরবাবার উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া, পূজোর ফুল, বিল্বপত্র পকেটে লইয়া একদিন হাজারিবাগের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম। সঙ্গে কেহ ছিল না। আমি একাই গেলাম। মনে আছে সাহেবগঞ্জে গিয়া থার্ডক্লাসের টিকিট কাটিয়া গয়া-গামী একটি ট্রেনে চড়িয়া বসিয়াছিলাম। গয়া হইতে হাজারিবাগের ট্রেন পাওয়া যায়।

হাজারিবাগ

হাজারিবাগ শহরে কোনও রেলওয়ে স্টেশন নাই। চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত হাজারিবাগ রোড স্টেশনে নামিয়া 'বাস'-এ করিয়া হাজারিবাগ যাইতে হয়। আমি ইতিপূর্বে বাড়ি হইতে বেশী দূরে এতটা কখনও যাই নাই। সাহেবগঞ্জ স্টেশনে গয়া-গামী একটি ট্রেনে আমাকে চড়াইয়া কাকাবাবু যখন চলিয়া গেলেন তখন মনে মনে আমি যেন অকূল পাথারে পড়িলাম। বলা বাহুল্য, টিকিট ছিল থার্ড-ক্লাসের।

লটবহর লইয়া বহু অবাঙালীই ছিল সে কামরায়। একটি বিহারী বৃদ্ধাই আমাকে বসিতে জায়গা দিলেন, বলিলেন—'খোকাবাবু, আবো, জাগ্‌খা (জায়গা) ছে—।'

আমার সঙ্গে একটি তোরঙ্গ ও বিছানা ছিল। সেগুলিরও ব্যবস্থা বৃদ্ধাই করিলেন। বেঞ্চের তলায় 'ঘুসাইয়া' দিলেন। ট্রেন যতক্ষণ চলিয়াছিল, ততক্ষণ বৃদ্ধা ঢুলিয়াছিলেন। গয়া স্টেশনে যখন ট্রেন পৌছিল, তখন ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'হাজারিবাগের ট্রেন কোথায় মিলবে?'

যে কুলিটি আমার মালপত্র নামাইতে আসিল, বৃদ্ধা তাহাকেই আদেশ দিলেন, 'বুত্‌রুকে' (খোকাকে) হাজারিবাগের ট্রেনে একটা ভালো জায়গায় চড়াইয়া দাও।

হাজারিবাগের ট্রেনে সত্যিই একটা ভালো জায়গা আমি পাইয়াছিলাম। কোণের দিকে জানলার ধারে। ট্রেন কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। আমি সেই সময় গয়ার কয়েকটি প্যাঁড়া লুচিসহযোগে উদরস্থ করিয়া ফেলিলাম। গাড়িটি প্রথমে যাত্রীতে ভরিয়া গেল। মনে হইল, বেশীর ভাগ যাত্রীই সাঁওতাল জাতীয়। একজনের কাঁধে একটি মাদলও ছিল, মনে পড়িতেছে। ট্রেন ছাড়িয়া দিল এবং ট্রেনের দোলানিতে কিছুক্ষণ পরে আমার ঘুম আসিল। আমি জানালার উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। বাহিরে বেশ কনকনে ঠাণ্ডা। বেশ জোরে একটা হাওয়া বহিতেছিল। আমি আমার র‍্যাপারটা কানে জড়াইয়া লইলাম। যখন ঘুম ভাঙিল, তখন দেখি সকাল হইয়াছে। দূরে দূরে পাহাড় দেখা যাইতেছে। অনুভব করিলাম ডানদিকের কানের কাছটা বেশ ভারি হইয়া আছে। কিন্তু সেদিকে তখন আর বেশীক্ষণ মন দিতে পারিলাম না। কারণ, কয়েক মিনিট পরই হাজারি-বাগ-রোড স্টেশনে গাড়ি থামিল।

ট্রেন বেশীক্ষণ দাঁড়াইল না। কুলি ডাকিয়া জিনিসপত্র লইয়া হুড়মুড় করিয়া নামিয়া পড়িলাম। অনেকেই নামিলেন। হাজারিবাগ-রোড স্টেশন তখন খুব বড় স্টেশন ছিল না। আমাদের সাহেবগঞ্জ স্টেশনের তুলনায় নগণ্য মনে হইল। খোঁজ করিলাম, মোটর কোথায় পাওয়া যাইবে? একজন বলিলেন—'এখানে দিগ্‌বাবুর লাল মোটর পাবেন। ওরাই এখানকার ভাল মোটর কম্পানি।'

স্টেশনের বাহিরে গিয়া সত্যই একটি লাল রং-এর মোটর-গাড়ি দেখিলাম। সেখানে গিয়া ড্রাইভারকে বলিলাম, আমি সেট কলম্বাস কলেজে যাইব। সঙ্গে সঙ্গে তিনি টিকিটের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমার মালপত্র গাড়ির মাথায় চাপানো হইল। টিকিট কিনিয়া আমি মোটরের ভিতর গিয়া একটি সিট অধিকার করিলাম। দেখিলাম গাড়িতে দুই-একজন মিশনারি সাহেবও উঠিয়াছেন। অনেক বাঙালীও। আমি গায়ে পড়িয়া কাহারও সহিত আলাপ করিতে পারি না। সমস্ত পথটাই চুপ করিয়া রহিলাম। বিকালে, প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি সেন্ট কলম্বাস কলেজের সামনে গাড়ি দাঁড়াইল। আমি নামিলাম। মিশনারি সাহেবটিও নামিলেন। শুধু নামিলেন না,

তিনিও কলেজের গেট দিয়া ভিতরে ঢুকিলেন। আমিও ঢুকিলাম। হঠাৎ তিনি ফিরিয়া প্রশ্ন করিলেন—'Are you a new student ?'

বলিলাম—'Yes.'

তিনি বলিলেন—'Come with me.'

তাঁহার হাতে আমার পরিচয়-পত্রটি দিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া অফিসে লইয়া গেলেন। নর্থ-ব্লকের নীচের তলায় আমার ঘর ঠিক করাই ছিল। সেইখানেই আমি ঢুকিয়া পড়িলাম। সেণ্ট কলম্বাস কলেজ হস্টেলে প্রত্যেকটি ঘরে একজন ছাত্র থাকে। সব রুমই সিংগল-সীটেড। প্রত্যেক ঘরে একটি নম্বর। আমার ঘরের নম্বরটি ভুলিয়া গিয়াছি।

কানে ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল। রাত্রে কান কটকট করিতে লাগিল। বাবা আমার সঙ্গে একটি ছোট Primus Stove দিয়াছিলেন। সেরকম স্টোভ আজকাল পাওয়া যায় না। ছোট একটি স্টোভ, ছোট একটি বাক্সে প্যাক করা থাকিত। সেই স্টোভটি বাহির করিয়া জল গরম করিলাম। একটা পুরনো কাপড় ছিঁড়িয়া ন্যাকড়া করিয়া কানের গোড়ায় সেঁক দিবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। ঘরে আলো ছিল না। কারণ যদিও ঘরে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ঠিক এগারোটার সময় আলো নিবিয়া যাইত। স্টোভের আলোতেই বসিয়া কানে সেঁক দিতেছিলাম। হঠাৎ আমার বন্ধ দুয়ারে টুকটুক করিয়া শব্দ হইল। কবাট খুলিয়া দেখিতে পাইলাম—সেই সাহেবটি দাঁড়াইয়া আছেন, যিনি আমার ভরতির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরে জানিয়াছিলাম, ইঁহার নাম রেভারেণ্ড কেনেডি। ইনি কলেজের অধ্যক্ষ এবং নর্থ-ব্লকের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। স্টোভের শব্দ পাইয়া কবাটে টোকা দিয়াছেন।

'কি ব্যাপার ? স্টোভ জেলেছ কেন ?'

'কান ব্যথা করছে। সেঁক দিচ্ছি, তাই।'

'ও, আই সি।'

পকেট হইতে টর্চ বাহির করিয়া আমার কানটা দেখিলেন। তাহার পর নিজের ঘর হইতে আসপিরিন জাতীয় কি একটা বড়ি আনিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিলেন। নিজের ঘর হইতে একটি মোমবাতি আনিয়া সেটি জ্বালিলেন। তাহার পর নিজেই বসিয়া আমার কানে সেঁক দিলেন অনেকক্ষণ। আমাকে ঘুম পাড়াইয়া তবে তিনি গেলেন।

পর দিন অতি ভোরেই হস্টেলের ডাক্তার আশুবাবু আসিয়া হাজির। বলিলেন—'কেনেডি সাহেবের আর্জেণ্ট কলের তাড়ায় এই সকালে আসতে হল আমাকে। কি হয়েছে তোমার ?'

বলিলাম—'কানে ব্যথা হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের ব্যবস্থা হইয়া গেল।

নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ, মিশনারি রেসিডেন্‌শাল হস্টেল, কায়দাকানুন অনেক রকম। প্রত্যহ ভোরে পাঁচটার সময় এবং রাত্রে নয়টার সময় রোল কল হয়। রাত্রে রোল কলের পর কেহ কাহারও ঘরে যাইতে পারে না। রাত্রে এগারোটায় সময় ইলেকট্রিক আলো নিবিয়া যায়। কলেজেরই ডায়ানামো। আলোর জন্য শহরের উপর নির্ভর করিতে হয় না। কলেজের তিনটি ব্লক, প্রত্যেক ব্লকেই একতলা, দোতলা আছে। নর্থ-ব্লক, সাউথ-ব্লক এবং কিংস-ব্লক ছাড়া আর একটি ব্লক আছে। সেটির নাম অ্যানেক্‌স। কোন ছাত্র অসুস্থ হইয়া পড়িলে সেখানে গিয়া থাকিত। হস্টেলের সামনেই রাস্তা। তাহার পরই খেলিবার প্রকাণ্ড মাঠ। চারদিকে পাহাড়। দূরে যে পাহাড়টি দেখা যাইত, সেটির নাম ছিল কেনেরি পাহাড়। চারদিক খোলা একটা উন্মুক্ত পরিবেশের মধ্যে সেন্ট কলম্বাস কলেজ।

কলেজে মিশনারি সাহেব অধ্যাপক ছিলেন কেনেডি, স্টিভেন্‌সন এবং উইনটার। ফরেস্টার সাহেব ছিলেন তখন মিশনের সর্বময় কর্তা। আগে অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। আমি যখন গিয়াছিলাম তখন অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন চারুচন্দ্র রায়চৌধুরী। বাংলা তিনি পড়াইতেন। কেমিস্ট্রী পড়াইতেন হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ভূদেববাবুর আত্মীয় ছিলেন উনি। ইনিও বি. এ. ক্লাসে বাংলা পড়াইতেন। আমাদের বটানির অধ্যাপক ছিলেন মিস্টার ডি. কে. রায়। একজন বাঙালী ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান। বিবাহ করেন নাই। হাতে সর্বদা একটি সিগার থাকিত। অনেকে বলাবলি করিতেন তিনি মদও খান। লোক ছিলেন অতি চমৎকার। উদ্ভিদ জগতের অনেক আশ্চর্য গল্প বলিতেন আমাদের। তাঁহার বাড়িতে ছাত্রদের অবাধ যাতায়াত ছিল। যখনই যাইতাম, নিজে হাতে চা করিয়া খাওয়াইতেন।

তাঁহার বাড়িতেই আলাপ হইয়াছিল নীরজ মিশ্রের সঙ্গে। তিনি বি. এ. পড়িতেন। কিংস ব্লক-এ থাকিতেন। চমৎকার মানুষ, হাসি-খুশী, বিনয়-আভিজাত্যের আলোকে মুখখানি সদা সমুজ্জ্বল। সাহেবি পোষাক ছাড়া অন্য পোষাক পরিতেন না। ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান ছিলেন। ইঁহার সহিত আলাপ পরে গাঢ়তর হইয়াছিল। কারণও ছিল ইহার। আমি যদিও তখন সবে ফার্স্ট-ইয়ারে ঢুকিয়াছি, তবু কিছুদিন পরেই ফোর্থ ইয়ারের ভালো ছেলে নীরজবাবু যাচিয়া আমার সহিত আলাপ করিলেন। কারণ, আমি হস্টেলে আসিবার কয়েকদিন পরই প্রচার হইয়া গেল যে আমি 'বনফুল' নামে 'প্রবাসী'তে কবিতা লিখি। তখন 'প্রবাসী'তে লেখা প্রকাশ হওয়া খুব গৌরবের ব্যাপার ছিল। ব্যাপারটা প্রকাশ হইয়া পড়িল বাংলা ক্লাসে। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়চৌধুরী আমাদের বাংলা এবং অঙ্ক পড়াইতেন। প্রথম দিন তিনি বাংলা ক্লাসে আসিয়া বলিলেন—'আপনাদের আজ আমি ছুটি দিয়ে দেবো। কারণ, আজ আমি বক্তৃতা দিতে পারব না। শরীর ভালো নয়। আপনাদের একটি essay লিখতে দিচ্ছি। আপনারা কাল সেটি লিখে আনবেন। পদ্যেও লিখে আনতে পারেন। বিষয় হচ্ছে 'গরু', ফুল মার্কস কুড়ি। দেখি আপনারা কে কত পান।'

এই বলিয়া তিনি ক্লাস হইতে চলিয়া গেলেন। আমরা গেলাম নিজেদের নিজেদের ঘরে। হস্টেল আর ক্লাশ-রুম লাগোয়া ছিল। একই বিল্ডিং। আমি ঠিক করিলাম রচনাটি কবিতায় লিখিব। এই কবিতাটি লিখিলাম—

মানুষ তোমায় বেজায় খাটায়,
টানায় তোমায় লাঙল গাড়ি
একটু যদি দোষ করেছ—
অমনি পড়ে লাঠির বাড়ি।
আপন জিনিশ বলতে তোমার
নাই ক' কিছুই এ বিশ্বেতে
তোমার বাঁটের দুধ-টুকু তা-ও
বাছুর তোমার পায় না খেতে।
মানুষ তোমার মাংস খাবে,
অস্থি দেবে জমির সারে,
চামড়া দিয়ে পরবে জুতো
বারণ কে তায় করতে পারে!
তোমার পরেই এ অত্যাচার
হে মরতের কল্প-তরু,
কারণ নহ সিংহ কি বাঘ
কারণ তুমি নেহাৎ গরু।

পরের দিন ক্লাসে আমরা চারুবাবুর কাছে খাতা জমা দিলাম। তিনি সেগুলি বাড়ি লইয়া গেলেন। দুইদিন পরে ক্লাসে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—'বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় কে? দয়া করে উঠে দাঁড়ান।'

উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

চারুবাবু বলিলেন—'আপনার রচনাটি সব থেকে ভালো হয়েছে। আমি এক-নম্বরও কাটিনি। কুড়ির মধ্যে কুড়িই দিয়েছি। কবিতাটি চমৎকার হয়েছে।'

কবিতাটি জোরে জোরে পড়িতে লাগিলেন তিনি। তাহার পর বলিলেন—'এ কবিতাটি কাগজে বেরোনো উচিত। আপনি কোনো কাগজে লিখেছেন কখনও? মনে হচ্ছে পাকা হাত।'

আমি খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে সলজ্জে বলিলাম—'আমি মাঝে মাঝে 'বনফুল' ছদ্মনামে 'প্রবাসী'তে লিখি।'

সেইদিনই কথাটা প্রচার হইয়া গেল। অধ্যাপক চারুবাবুর কথা অনুসারে কবিতাটি 'প্রবাসী'তে পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু 'প্রবাসী'র চারুবাবু কবিতাটি ছাপিলেন না। ফেরত দিলেন। কবিতাটি পরে অন্য পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল। বোধহয় 'ভারতী'তে, ঠিক মনে নাই।

আমি যে লেখক এ খবরটি প্রকাশ হওয়ার পর অনেকেই আমার সহিত আলাপ করিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা লেখক শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সরোজ আই. এ. পড়িত। নর্থ-ব্লক-এ থাকিত। সে তখন সাহিত্যচর্চা করিত কি না আমি জানি না। সে আমাকে কিছু বলে নাই। কিন্তু তাহার সহিত ভাব হইয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরই নীরজ মিশ্র আমার ঘরে আসিয়া আলাপ করিলেন। বলিলেন—'আপনি এমন সুন্দর কবিতা লিখতে পারেন, আমাকে একটা কবিতা লিখে দেবেন?'

'কি বিষয়ে'?

'বিষয়টা হচ্ছে মানে—'

অপ্রস্তুত মুখে চুপ করিয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন—'মানে, একটা প্রাইভেট ব্যাপার। আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসি। তার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তাকে আমি মাঝে মাঝে চিঠি লিখি। ইচ্ছে করে কবিতায় চিঠি লিখি। কিন্তু পারি না। আপনি দেবেন একটা কবিতা লিখে? টুকে পাঠিয়ে দেব—'

নীরজবাবুর অনুরোধ রাখিয়াছিলাম।

বি. এ. পরীক্ষা দিয়া নীরজবাবু হাজারিবাগ ত্যাগ করেন। তাহার পর তাঁহার সহিত আমার আর দেখা হয় নাই। তাঁহার বিবাহের নিমন্ত্রণ অবশ্যই পাইয়াছিলাম। বহুদিন পরে আমি যখন ভাগলপুরে ডাক্তারী করিতেছি—তখন হঠাৎ নীরজবাবুর একটি পত্র পাই আফ্রিকা হইতে। সেখানে তিনি কোনও রেলওয়ে নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত তখন। তাহার পর আর খবর নাই।

আমি খুব মিশুক প্রকৃতির ছেলে ছিলাম না। আগ বাড়াইয়া কাহারও সহিত গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে পারিতাম না। তবু একসঙ্গে থাকিতে থাকিতে ক্রমে ক্রমে অনেকের সহিত আলাপ হইয়া গেল। কয়েকটি নাম মনে পড়িতেছে। বিশ্বেশ্বর রায় (ইহাকে কেন জানি না আমরা 'বিশু-তিশু' বলিয়া ডাকিতাম), রবি ঘোষ, ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য, শচীনবাবু, পার্বতী সেন, সরলেন্দু সেন (আমাদের সময় ম্যাট্রিকে প্রথম স্থান অধিকার করেন)। সরলেন্দুবাবু কাহারও সহিত মিশিতেন না। নিজের ঘরেই নিবদ্ধ থাকিতেন। অতিশয় ভালো ছেলে বলিয়া আমরাও উঁহার সঙ্গ এড়াইয়া চলিতাম। কিন্তু তাঁহার চেহারায়, স্বল্প কথাবার্তায় এমন একটি আভিজাত্য দেখিয়াছিলাম, যাহার জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। তাঁহার সহিত আমার আর দেখা হয় নাই। শুনিয়াছি, শেষে তিনি কোথায় যেন জজ হইয়াছিলেন।

আমাদের 'মেসে' আরও কয়েকজনের সহিত আলাপ হইল। অমিয় চক্রবর্তী এবং প্রমথ রায়ও নর্থ-ব্লকে থাকিতেন। ইহারা কেহই বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না বলিয়া ইঁহাদের সহিত আলাপ হইতে দেরি হইয়াছিল। অমিয় চক্রবর্তী (ইনি

পরে রবীন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারি হন) সাধারণ পর্যায়ের লোক নন। ইহাকে একটু অদ্ভুত ধরনের মনে হইয়াছিল। পায়ে সৌখীন নাগরা-জুতো, গায়ে সৌখীন পাঞ্জাবী এবং চাদর তো ছিলই। মুখে পাউডারও মাখিতেন তিনি এবং প্রচুর সুগন্ধি ব্যবহার করিতেন। পাশ দিয়া যখন চলিয়া যাইতেন, তখন ভুরভুর করিয়া গন্ধ ছাড়িত। মনে পড়িতেছে, একবার মেসের কে একজন তাঁহার সহিত একটু বাড়াবাড়ি রকমের অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া তিনি কিছুদিন মেসে খাইতে আসা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ভগবতী (আমাদের মেসের চাকর) তাঁহার ঘরে খাবার দিয়া আসিত। পরে একদিন তাঁহার ঘরে গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম। আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। বুঝিলাম তিনি সাহিত্যপ্রাণ ব্যক্তি। পৃথিবীর যাবতীয় বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গে পত্রালাপ করেন। একটা বাক্সে গাদা গাদা চিঠি—পৃথিবার বড় বড় লেখকদেব। জি. বি. এস, মেটারলিংক, রবীন্দ্রনাথ, আরও কত। আমি মফঃস্বলের ছেলে। অবাক হইয়া গেলাম। ভগবতী তখন চা করিতে আসিয়াছিল। তিনি ভগবতীকে বলিলেন—'কোকো করো।'

আমি কোকো এর আগে কখনও খাই নাই। সেই প্রথম খাইলাম। কোকোর সহিত দু'একটি দামী বিস্কুটও খাওয়াইলেন। সব বিষয়েই সৌখীন ছিলেন অমিয়বাবু। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া খুবই খুশি হইলাম। তিনি ব্যবহারে খুবই ভদ্র ছিলেন। কিন্তু স্বভাবটা একটু চাপা গোছের ছিল। প্রাণ খুলিয়া মিশিতে হইলে যে মন-খোলা স্বভাব থাকা প্রয়োজন, তাহা তাঁহার ছিল না। তাঁহার ব্যবহার ও কথাবার্তার মধ্যে কেমন যেন একটা 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' গোছের ভাব ছিল, স্বাভাবিক মনে হইত না, মনে হইত যেন মুখোশ পরিয়া আছেন। তথাপি তাঁহাকে ভালো লাগিত। প্রায়ই তাঁহার ঘরে গিয়া আড্ডা জমাইতাম, তাঁহার সাহিত্য-প্রীতির জন্য। ক্রমশই বুঝিতে পারিলাম ইংরাজি সাহিত্যে তাঁহার অনেক পড়াশুনা। আমার পড়াশুনা কম ছিল, তাই তাঁহাকে আমি বরাবর সমীহ করিয়া চলিয়াছি। তাঁহার আর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। তিনি রবীন্দ্রনাথের লেখা হুবহু নকল করিয়াছিলেন।

প্রমথ রায়ও একটি আশ্চর্য চরিত্র ছিলেন। প্রায় কাহারও সহিত মিশিতেন না। কথাও খুব কম বলিতেন। প্রায়ই দেখিতাম তাঁহার ঘরের কবাট বন্ধ। প্যাশনে চশমা পরিতেন। মনে হইত খুব হাই পাওয়ারের লেন্স। চোখের কোণে সামান্য পিচুঁটি প্রায়ই দেখা যাইত। আমার লেখক-খ্যাতির জন্যেই সম্ভবত তাঁহার কাছে আমল পাইয়াছিলাম। লক্ষ্য করিয়াছিলাম ইটালিয়ান সাহিত্যের দিকে তাঁহার খুব রুচি। ইংরাজিতে অনূদিত ইটালিয়ান নভেল নাটক প্রায়ই পড়িতেন। তাঁহার নিকটেই আমি প্রথম দান্নুনজিওর নাম শুনি। তাঁহার লেখা একটা উচ্ছ্বাসপূর্ণ উপন্যাস পড়িয়াছিলাম। আমার খুব ভালো লাগে নাই। বইটির নামও এখন মনে পড়িতেছে না।

আমাদের অপেক্ষা 'সিনিয়র' অর্থাৎ বি. এ. ক্লাসে পড়িতেন এইরকম অনেকের সঙ্গেও ক্রমশ আলাপ হইল। যোগেশদা, জ্যোতিদা, ভবতোষদা, কালী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম মনে আছে। অনেকের মুখ মনে আছে, নামটা ভুলিয়াছি। যোগেশদা খুব ভালো বক্তা ছিলেন। ইংরাজিতে খুব ভালো বক্তৃতা দিতে পারিতেন। স্বদেশী ভাবে তাঁহার প্রাণ সর্বদাই পূর্ণ হইয়া থাকিত এবং সুযোগ পাইলেই তাহা তিনি উদ্গীরণ করিতেন। শুনিয়াছি পরে তিনি উকিল হইয়া খুব নাম করিয়াছিলেন।

ভবতোষ সেন ছিলেন পুরুলিয়ার উকিল শরৎ সেনের ছেলে। খুব মজলিশি এবং খুব আড্ডাবাজ। ভালো খাইতে পারিতেন, ভালো থিয়েটার করিতেন। আমরা একবার 'সাজাহান' থিয়েটার করি। ভবতোষদা 'সুজা' সাজিয়াছিলেন। আর অমি (অমিয়) সাজিয়াছিল 'সাজাহান'। সে হস্টেলে থাকিত না। হাজারিবাগ শহর হইতে কলেজে পড়িতে আসিত। আমি সাজিয়াছিলাম 'দারা', নৃপেন সাজিয়াছিল 'নাদিরা' আব সরোজ রায়চৌধুরী 'সিপার'। খুব জমিয়াছিল নাটকটা। নৃপেন আই. এ. পড়িত। হস্টেলেই থাকিত। ভালো ছেলে ছিল। আমাদের সঙ্গে আই. এ. পড়িত এবং হস্টেলে থাকিত, ইহাদের মধ্যে অনেককেই ভুলিয়া গিয়াছি। সন্তোষ সেন (বাকা), সলিল দত্ত (গয়ায় বাড়ি ছিল), আর একটি ফুটফুটে সুন্দর মুসলমান ছেলে (নাম লতিফ কি ? ঠিক মনে নাই),—ইহাদের কথা মনে পড়িতেছে। পার্বতীর কথা আগেই লিখিয়াছি।

অতীতের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া যাইতেছি। যে অতীত একদা জীবন্ত, বর্তমান ছিল, তাহা আর জীবন্ত নাই ; তবু তাহাকে সম্পূর্ণ মৃত বলিতেও মন ইতস্তত করিতেছে। যে অতীতকে মন এখন সৃষ্টি করিতেছে—তাহা আমারই সৃষ্টি—নতুন অতীত, সে জীবন্ত। তাহার আলো-আঁধারির ভিতর হইতে আরও দুইটা নাম এবং মুখ ভাসিয়া উঠিল। গোপা আর পলান্ডু। গোপা আই. এ. পড়িত, আর পলান্ডু পড়িত আই. এস. সি। তাহার পিতৃদত্ত নাম অন্য ছিল (সেটা ভুলিয়াছি), আমরা তাকে পলান্ডু বলিয়া ডাকিতাম, কারণ রাঁচির কাছে পলান্ডু গ্রামে তাহার বাড়ি ছিল। আমরা তাহাকে লর্ড অফ পলান্ডু বলিতাম। যদিও শুনিতে অবিশ্বাস্য মনে হইবে, তবু এটা সত্য কথা যে, পলান্ডু-র সহিত আমার ছোট ছেলেদের মত হাতাহাতি মারামারি হইত। সে আমাকে কখনও মারিয়া কাবু করিয়া ফেলিত, কখনও আমি ধবস্তাইয়া দিতাম।

পলান্ডু এখন কোথায় জানি না। গোপা যতদূর মনে পড়িতেছে, আমাদের এক ক্লাস নীচে পড়িত। আমি যখন সেকেণ্ড-ইয়ারের ছাত্র, তখন সে ফার্স্ট-ইয়ারে আই. এ. ক্লাসের ছাত্র। গোপা কেন জানি না, আমার ঢিলেঢালা অগোছাল ভাব সহ্য করিতে পারিত না। আমার বিছানা কোঁচকানো, বালিস দোমড়ানো, আমার পড়িবার টেবিল এলোমেলো, আমার সেল্‌ফে বইগুলি যথাস্থানে রাখা নেই, হয় বিছানায় না হয় টেবিলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, আমার মাথার চুলে চিরুণি পড়িত না,

কারণ আমার আয়না-চিরুণি কিছুই ছিল না। গোপা এসব সহ্য করিতে পারিত না। নিজে হাতে সে আমার বিছানা করিয়া দিত, ঘর গুছাইয়া দিত, মাথার চুলও আঁচড়াইয়া দিত মাঝে মাঝে। আমার প্রতি তাঁহার এই অহেতুক ভালোবাসা যেন একটা অজানা অমরাবতীর আলোর মত আমার জীবনে পড়িয়াছিল। সে আলো এখন আর নাই। গোপার ভালো নাম ছিল অমিয়। ডাল্টনগঞ্জে বাড়ি ছিল তাহার। অনেক পরে—যখন আমি ভাগলপুরে ডাক্তারী করি, তখন সে সস্ত্রীক আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। ডাল্টনগঞ্জের নামজাদা উকিল হইয়াছিল সে। এম. এল. এ-ও হইয়াছিল। দশাসই চেহারা, গম্ভীর অমিয়র মধ্যে আমার সেই গোপাকে আর দেখিতে পাইলাম না। শুনিয়াছি, কিছুদিন আগে সে মারা গিয়াছে।

আমাদের কলেজ যদিও রেসিডেন্‌শাল কলেজ ছিল, তবু হাজারিবাগ শহর হইতে অনেক 'পে স্কলার' (Pay Scholar) পড়িতে আসিত। তাহাদের মধ্যে মোটা প্রফুল্ল, অমিয় (যে সাজাহান সাজিয়াছিল) এবং ফণীকে মনে পড়িতেছে। ফণী খুব ভালো ফুটবল খেলিত। মোটা প্রফুল্লও। যতদূর মনে পড়িতেছে 'হকি'ও খেলিত ইহারা। 'কেনেডি' সাহেব চলিয়া গিয়াছিলেন। আসিয়াছিলেন 'কার' সাহেব। তিনিও ভালো হকি খেলোয়াড় ছিলেন।

এইবার আমাদের কলেজের আর হস্টেলের কথা কিছু লিখি। আমাদের কলেজ আর হস্টেল একই বাড়িতে ছিল তাহা আগে বলিয়াছি। কলেজের ভিতর ছিল 'হুইট্‌লে হল'। প্রকাণ্ড হল। সেখানে বাইবেল-ক্লাস হইত। অন্য ক্লাসও হইত। মাঝে মাঝে বাহিরের অধ্যাপকরা আসিয়া এখানে বক্তৃতাও দিতেন। সেখানেই অধ্যাপক মহেশচন্দ্র ঘোষের বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। ইতিহাসের অধ্যাপক জ্ঞানবাবুও মানবের অতীত লইয়া একটি চমৎকার বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমার মনে 'স্থাবর' লিখিবার কল্পনা প্রথম অঙ্কুরিত হয়। মনে হইয়াছিল, অতীতের এই মানব-সমাজ যেন রূপকথার দেশের সমাজ। সে রূপকথা কি লেখায় মূর্ত করিতে পারিব? সে সময় হইতেই নৃতত্ত্ব-বিষয়ক বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতাম। প্রফেসর ডি. কে. রায় মাঝে মাঝে উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। হাজারিবাগে তখন একপ্রকার কীটভুক ছোট ছোট শাকের মত গাছ পাওয়া যাইত। যতদূর মনে পড়ে পাতাগুলি ছিল লালচে ধরনের। পাতার উপর অনেক শোঁয়ার মত থাকিত। একরকম আঁঠার মত জিনিস পাতার উপর স্ফুরিত হইত। মনে হইত যেন, মধু লাগিয়া আছে। কোনো পোকা তাহার উপর বসিলে তাহার পা জড়াইয়া যাইত। আর সে পলাইয়া যাইতে পারিত না। তাহার পর পাতাটি আস্তে আস্তে মুড়িয়া বন্দী করিয়া ফেলিত তাহাকে। অবশেষে জীর্ণ করিয়া ফেলিত। প্রফেসর টি. রায় বক্তৃতার সময় এই গাছ এবং লজ্জাবতী লতা আনিয়া আমাদের দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল হাজারিবাগের আশেপাশের গাছপালা। হাজারিবাগেই

আমি প্রথম ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ দেখি। 'শাল' গাছও। হুইটুলে হলের এই বক্তৃতাগুলির নাম ছিল—এক্‌সটেন্‌শন লেক্‌চারস। এগুলি খুবই ভালো লাগিত। অধ্যাপক মহেশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন গণিতজ্ঞ। একসময় হাজারিবাগ কলেজেই অঙ্ক পড়াইতেন। কিন্তু আমাদের সময় তিনি বক্তৃতা দিতেন দর্শন বিষয়ে। তাঁহার বক্তৃতার সবটা বুঝিবার মত বিদ্যা তখন ছিল না। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা মনে স্বপ্ন জাগাইত।

সে সময় আমি একটা হাস্যকর কাজ করিয়াছিলাম। দুইটি ছোট টবে দুইটি ছোট ছোট গাছ পুঁতিয়াছিলাম আমার ঘরে। একটি লজ্জাবতী লতা আর একটি কীটভুক গাছ। লজ্জাবতী লতার পাতা ছুঁইলেই সে সমস্ত পাতা মুড়িয়া লজ্জায় যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। দেখিতে বেশ লাগিত গাছটি। সকলেই আসিয়া একবার ছুঁইত তাহাকে। ক্রমশ দেখিলাম, সে নির্লজ্জ হইয়া গেল। ছুঁইলেও আর পাতা মুড়িয়া ঘোমটা দিত না। অনেকদিন বাঁচিয়াছিল আমার ঘরে। কীটভুক গাছ কিন্তু বেশিদিন বাঁচে নাই। আমার ঘরে বেশী কীট আসিত না। মাঝে মাঝে পিঁপড়া ধরিয়া দিতাম। কিন্তু পিঁপড়া তাহার সহ্য হইল না বোধহয়। কিছুকাল পরে মরিয়া গেল।

আমাদের চারটি 'মেস' ছিল। অর্থাৎ সবাই আমরা একসঙ্গে থাকিতাম না। হিন্দু মেস দুইটি। একটি কন্‌জারভেটিভ অর্থাৎ গোঁড়াদের জন্য। এটির বিশেষত্ব, এ মেসে মুরগীর মাংস বা মুরগীর ডিম রান্না হইত না। পাঁঠার মাংস, বড় জোর ভেঁড়ার মাংস চলিত। এইখানেই একেবারে নিরামিষাশীদের জন্যেও ব্যবস্থা ছিল। ইঁহারা আলুর দম এবং ছানার ডালনা খাইতেন। দ্বিতীয় হিন্দু মেসটি ছিল লিবারেল হিন্দু ছাত্রদের জন্য। ইহাতে মুরগী, মাটন সবই চলিত। গোমাংস চলিত না। ইহা ছাড়া ছিল মুসলমানদের মেস এবং ক্রিস্টানদের মেস। এখানে সম্ভবত সবই চলিত। যে কোন ছাত্র যে কোন মেসের মেম্বার হইতে পারিত নিজের রুচি ও সংস্কার অনুসারে। আমি হিন্দু কন্‌জারভেটিভ মেসের মেম্বার হইলাম। হাজারি-বাগে ভালো মাছ পাওয়া যাইত না। তরিতরকারীও তেমন প্রচুর ছিল না। আমি প্রত্যহ মাছ খাইতে অভ্যস্ত। প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধাই হইত। ডাল, আলুর দম, ছানার ডালনা দিয়া মাছের অভাব পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেন ম্যানেজার। আমাদের ভিতর হইতেই প্রতি মাসে ভোট দিয়া একজন ম্যানেজার নির্বাচিত হইতেন। বয়োঃজ্যেষ্ঠ সিনিয়ার ছাত্ররাই নির্বাচিত হইতেন। জ্যোতিদাদাকেই আমরা প্রায়ই নির্বাচিত করিতাম।

আমাদের কলেজে নিয়ম ছিল, প্রতি মাসে বেতনের সহিত মেসের খরচের মাথা পিছু ১৪ টাকা করিয়া কলেজের অফিসে জমা দিতে হইত। যিনি যে মাসে ম্যানেজার হইতেন, তিনি কলেজের অফিস হইতে প্রতি সপ্তাহের খরচের জন্য টাকা লইয়া আসিতেন। সে টাকার হিসাব তাঁহাকে রাখিতে হইত এবং মাসের শেষে সে-হিসাব

কলেজের প্রিন্সিপালকে বুঝাইয়া দিতে হইত। যদি কোন মাসে ১৪ টাকার কম খরচ পড়িত আমরা বাকি টাকা ফেরত পাইতাম। খরচ বেশী পড়িলে বেশী টাকাটা আমাদের পরের মাসে জমা দিতে হইত। প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে হিসাব বুঝাইয়া দেওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল। আমি একবার ম্যানেজার ছিলাম। মাছ দুর্লভ, তরকারিও পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রত্যহই আমি 'শালন' আনাইতাম। ওখানে মাংসকে 'শালন' বলিত। অন্তত আমাদের ভগবতী এবং টহল নামক চাকর দুইটি মাংসকে 'শালন' বলিত। সে মাসে খরচ পড়িয়া গেল মাথা পিছু ১৮ টাকা করিয়া।

জ্যোতিদাদা একটু রুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—'বলাই, তুমি আমাদের বাঘ বানাবে নাকি ? রোজ মাংস খাওয়াচ্ছ ?'

আমি উত্তর দিলাম—'হাজারিবাগে এসেছি। বাঘের কাছাকাছি কিছু একটা তো হওয়া উচিত।'

সবচেয়ে মুশকিলে পড়িলাম কিন্তু প্রিন্সিপাল 'কার' সাহেবের কাছে হিসাব দিতে গিয়া। তিনি আমার গা টিপিয়া টিপিয়া দেখিলেন, তাহার পর বলিলেন—'এত মাংস খেয়েছো কিন্তু মোটা তো হওনি ! তেমনি রোগাই আছো। তুমি বুঝি মাংস খুব ভালোবাসো ?'

বলিলাম—'মাছ, তরি-তরকারি, কিছুই তো পাওয়া যায় না, তাই মাংস দিয়ে সে অভাব পূরণ করছি।'

'কার' সাহেব বলিলেন —'অলরাইট, এবার হিসাবটা দেখি।'

দেখিলাম, প্রতিদিন কি দরে কোন্ জিনিশ বাজারে বিক্রয় হয় তাহার একটা ফর্দ তাঁহার কাছে আছে। সেটা হইতে মিলাইয়া মিলাইয়া তিনি তিরিশ দিনের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলেন। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন—'তোমাদের তরি-তরকারির অভাবে বড় কষ্ট হচ্ছে ? আচ্ছা, আমি এর ব্যবস্থা করছি।'

পরের দিন তিনি আমাদের মেসে আসিয়া হাজির হইলেন। আমাদের মেসের সামনে খানিকটা পড়তি জমি ছিল, আর তাহার পাশে ছিল একটা ইঁদারা। 'কার' সাহেব বলিলেন—এই জমি খুঁড়িয়া আমরা সবজি বাগান তৈয়ারি করিব। জমিটা খুঁড়িয়া, উহার উপর সার ফেলিলে ভালো ফসল ফলিবে। সারের ব্যবস্থা আমি করিয়াছি। জমিটা খুঁড়িয়া আগে ইট-পাটকেল বাছিয়া ফেলিতে হইবে। আমি তোমাদের সহিত প্রত্যহ জমি খুঁড়িব—বিকাল পাঁচটা হইতে। তোমরা কে কবে আমার সহিত বসিবে ঠিক করিয়া লও। অন্তত ছ-জন করিয়া প্রত্যহ কাজ না করিলে এতখানি জমি এক সপ্তাহের মধ্যে কোপানো যাইবে না। আমি রোজ থাকিব। তোমরা পাঁচজন করিয়া থাকিবে। কে কে কবে থাকিবে তাহার একটা তালিকা আমার অফিসে পাঠাইয়া দাও। আমি অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাইপ করিয়া টাঙাইয়া দিবো।

দিন দুই পর হইতেই কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। কার সাহেব ছয়টা কোদাল

লইয়া যথাসময়ে মাঠে দেখা দিলেন। ইতিপূর্বে কার সাহেব কোদাল চালান নাই। আমরাও না। একটা মালির নিকট হইতে আমরা শিক্ষা লাভ করিলাম, কিভাবে কোদাল চালাইতে হইবে। আমরা সকলেই একটু-আধটু জখম হইলাম, কার সাহেবও। তিনি কিন্তু থামিলেন না, আমাদেরও থামিতে দিলেন না। মাঠটা সম্পূর্ণ খোঁড়া হইল। ইট-পাথর বাছা হইল। তাহার পর শাক-সবজির বিচি এবং চারা পোঁতা হইল। এইবার ইঁদারা হইতে জল-সেচন করিবার পালা। টোমাটো, ভিন্‌ডি, ওলকপি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, লেটুস শাক, পালং শাকের গাছগুলির চারপাশে ছোট ছোট নালী তৈয়ারী করা হইল। ইঁদারার গায়েও বেশ প্রশস্ত একটা নালী করাই ছিল। ইঁদারা হইতে জল তুলিয়া সেই নালীতে ঢালিলে আমাদের বাগানের প্রতি গাছের গোড়ায় সে জল যাইবে। কিন্তু ইঁদারা হইতে জল তুলিয়া সেই নালীতে ঢালা সহজ ছিল না। ইঁদারার উপর প্রকাণ্ড একটি বাঁশের একপ্রান্তে দড়ি দিয়া বাঁধা এমন একটি বালতি ছিল যাহার নিম্নভাগ সুচোল (conical), তাহা কোথাও বসানো যায় না। বাঁশের আর একপ্রান্তে বাঁধা একটি ভারী ওজন। ওখানে সবাই উহাকে 'লাট' বলিত। মালীরা সাধারণত সেই লাটের সাহায্যে জল তুলিয়া বালতিটি বড় নালীর উপার বসাইয়া দিত। কিন্তু তাহা বসিত না। সঙ্গে সঙ্গে কাত হইয়া যাইত এবং সমস্ত জলটা নালীর ভিতর গিয়া পড়িত। আমরা এ কৌশলে জল তুলিতে পারিতাম না। আমি তো আর একটু হইলেই উহার ভিতর পড়িয়া যাইতাম! মালী বলিল—আমি বাবু রোজ আপনাদের বাগানে জল 'পটাইব' (সেচ করিয়া দিব), আপনারা মাসে আমাকে কিছু বেতন দিবেন।

কার সাহেব উহাতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন—আমরা নিজেরাই সেচ করিব। বাহিরের কোন সাহায্য লইব না। তোমরা যদি জল তুলিতে না পারো, আমি নিজেই তুলিব। অবশ্য জল তোলার কায়দাটা আমাকে মালীর নিকট শিখিয়া লইতে হইবে।

কার সাহেব আইরিশ ছিলেন। জিদি একগুঁয়ে লোক। অনেকবার ভুল করিয়া, অনেকবার অন্য জায়গায় জল ঢালিয়া, অনেকবার কুয়ায় পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়া অবশেষে তিনি ঠিকমত জল তুলিতে সক্ষম হইলেন এবং পঞ্চাশ বালতি জল ঠিক মত তুলিয়া আমাদের বাগান ভাসাইয়া দিলেন। বলিলেন—এখন সাতদিন আর জল দিব না। Poor plants have been flooded.

প্রচুর তরিতরকারি ফলিয়াছিল। আমরাই শুধু খাই নাই, বিতরণ করিয়াছিলাম, বিক্রিও করিয়াছিলাম কিছু।

আমাদের প্রিন্সিপাল কার সাহেব একটি অদ্ভুত চরিত্রের লোক ছিলেন। আমাদের হোস্টেলের নিয়ম ছিল সকালে ভোর পাঁচটায় এবং প্রত্যহ রাত্রি ন-টায় রোলকল হইত। নর্থ-ব্লক যতদিন ছিলাম, ততদিন মিঃ কচ্ছব আমাদের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। আদিবাসী ক্রিশ্চান ভদ্রলোক। অতিশয় ভালোমানুষ। কাহারও

সহিত মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারিতেন না। আমি প্রায়ই অত ভোরে উঠিয়া সকালের রোলকলে যাইতে পারিতাম না। তিনি দুই একদিন আসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিতেন—রোলকলে না যাওয়াটা বে-আইনী। আমি বলিতাম—আমি উঠিতে পারি না, কি করিয়া যাইব। তিনি বলিতেন—বেশ, উঠিবামাত্র আমার সহিত গিয়া দেখা করিবে।

এইভাবেই চলিতেছিল। এমন সময়ে কিংস-ব্লকে একটি ভালো ঘর খালি হইল। ঘরটি দোতলায়। জানলা দিয়া পাহাড়ের দৃশ্য দেখা যায়। ঘরটি পাইবার জন্য আমি দরখাস্ত করিলাম। এবং ভাগ্যক্রমে পাইয়াও গেলাম। কিংস-ব্লকের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তখন ছিলেন 'কার' সাহেব। যখন রুমটি পাইলাম, তখনও বুঝি নাই যে, কি ভীষণ খপ্পরে পড়িয়াছি। তখন শীতকাল। ঘোর শীত। ঠিক পাঁচটার সময় যথারীতি অনুপস্থিত হইতে লাগিলাম। তৃতীয় দিন কার সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি মর্ণিং রোলকলে থাক না কেন? That's bad. I shall not tolerate it.

আমি বলিলাম, স্যার, মর্ণিং রোলকল মর্ণিংয়ে হওয়া উচিত। আপনি মর্ণিং রোলকল করেন গভীর রাত্রে। তখন চারিদিকে অন্ধকার। আমি ঘুমাইয়া থাকি। রোলকলের ঘণ্টা শুনিতে পাই না।

কার সাহেব কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—বেশ, তুমি তোমার ঘরের কবাট খুলিয়া রাখিও, আমি যথাসময়ে উঠাইয়া দিব।

পরদিন, তখন বোধহয় ভোর চারটে। কার সাহেব আসিয়া আমার লেপ ধরিয়া টান দিলেন—It is time now, get up, get up.

দেখি, তিনি দাড়িতে সাবান লাগাইতে লাগাইতে আসিয়াছেন। রোজ ভোরে উঠিয়া তিনি কামান। আমি বলিলাম—Yes Sir, I am getting up.

কার সাহেব নিজের ঘরে চলিয়া যাইতেন। কিন্তু আমি উঠিতাম না, আবার ঘুমাইয়া পড়িতাম। কার সাহেব কামাইয়া আবার ফিরিয়া আসিতেন এবং আমার লেপটা কাড়িয়া লইতেন। নিজে দাঁড়াইয়া আমার চোখে-মুখে জল দেওয়াইতেন। তাহার পর আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার ঘরের সম্মুখে লইয়া যাইতেন। তাঁহার ঘরের সম্মুখেই রোলকল হইত। দিন দশেক পরে আমার আপনিই ঘুম ভাঙিয়া যাইত। কার সাহেব আসিয়া দেখিতেন আমি মুখ ধুইয়া বসিয়া আছি। হাসিয়া হাসিয়া বলিতেন Good, good, very good.

হোস্টেলের নিয়ম ছিল নটার পর কেহ কাহারও ঘরে যাইতে পারিবে না। একটা নিয়ম থাকিলেই সেটা ভাঙিবার প্রবৃত্তি হয়। আমরাও লুকাইয়া প্রয়োজন-বোধে একে অন্যের ঘরে যাইতাম। অনেক সময় দু'জন একঘরে বসিয়া পড়াশুনাও করিতাম ঘরে খিল দিয়া। সলিল দত্ত প্রায়ই আমার ঘরে পড়িবার জন্য আসিত। আমি

জোরে জোরে পড়িতাম, সে বসিয়া শুনিত। একদিন বিপদে পড়িয়া গেলাম। সলিল তখন আমার ছোট প্রাইমাস স্টোভটি ধরাইয়া চায়ের জল চড়াইয়াছে। রাত্রি প্রায় দশটা। পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত হইলে আমরা রাত দশটা নাগাদ এক-কাপ করিয়া চা পান করিয়া 'ইস্টিম' করিয়া লইতাম। হঠাৎ আমার দুয়ারে খুটখুট করিয়া কড়া নড়িল। বুঝিলাম, কার সাহেব স্টোভের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া আমার ঘরের সামনে থামিয়াছেন। তিনি 'রবার-সোল' জুতা পায়ে দিয়া সারা হোস্টেলের বারান্দায় বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তখন শীতকাল, আমি সলিলকে ইঙ্গিত করিলাম—তুই বিছানায় শুয়ে পড়। সে শুইবামাত্র তাহার উপর লেপ, কম্বল সব চাপাইয়া দিলাম। তাহার পর কবাট খুলিলাম। দেখিলাম কার সাহেব দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছেন। বলিলেন—চা চড়াইয়াছ নাকি? আমাকেও এক কাপ দাও।

আমার বিছানায় আসিয়া বসিলেন এবং মাঝে মাঝে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে স্তূপীকৃত লেপ-কম্বলের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু সেগুলি তুলিবার চেষ্টা করিলেন না। কিংবা সে সম্বন্ধে কিছু বলিলেনও না। আমার অস্বস্তি হইতে লাগিল, সলিলটা দম বন্ধ হইয়া মারা না যায়। কার সাহেবকে এক কাপ চা করিয়া দিলাম। চা-পান করিয়া খুশি হইলেন সাহেব। কোথা হইতে চা কিনি জানিতে চাহিলেন। পড়াশুনা কেমন হইতেছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। মোট কথা, আমার ঘরে প্রায় মিনিট পনেরো-কুড়ি রহিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—কোন বন্ধুর সহিত তুমি যদি পড়িতে চাও, আমার কাছে একটা দরখাস্ত দিও। আমি দরখাস্ত মঞ্জুর করিব।

কার সাহেব সম্বন্ধে আর একটি গল্প মনে পড়িল। আমি একটা ক্লাশ সারিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছি, কার সাহেব সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছেন বাইবেল ক্লাস লইবার জন্য। আমাদের সকলকেই বাইবেল ক্লাসে যাইতে হইত। নিয়ম ছিল ৫০% লেকচার শুনিতেই হইবে। না শুনিলে বিশ্বালয়ে পরীক্ষা দিতে দিবেন না কলেজ কর্তৃপক্ষ।

আমাকে দেখিয়া কার সাহেব প্রশ্ন করিলেন—তুমি চলে আসছ যে? বাইবেল-ক্লাসে যাবে না? আমি বলিলাম—না। আমার ৫০% হয়ে গেছে। এর পরই আমার কেমিস্ট্রি প্রাকটিকাল ক্লাস—আমি একটু ঘুমিয়ে নিতে চাই।

কার সাহেব বিস্মিত হইলেন। বলিলেন—তুমি কেবল পারসেনটেজের জন্য বাইবেল ক্লাসে যাও? Have you no love for the Bible?

বলিলাম—লাভ যথেষ্ট আছে। আমি দু-বার বাইবেল পড়েছি।

'বেশ আমি আজ সন্ধ্যাবেলা তোমার ঘরে গিয়ে দেখব তোমার বাইবেল বিদ্যার দৌড় কতদূর?' সেদিন ঠিক সন্ধ্যায় কার সাহেব আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। New Testament সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু আমাকে ঠকাইতে পারিলেন না। বাইবেলটা তখন আমার ভালোই পড়া ছিল। খুসী হইয়া

কার সাহেব বলিলেন—তোমাকে বাইবেল ক্লাসে যাইতে হইবে না। তোমাকে আমি একটা বই উপহার দিচ্ছি। নিজের ঘরে গিয়া তিনি 'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট' বইটি আনিয়া আমাকে উপহার দিলেন। আমি বলিলাম—ধন্যবাদ স্যার। আমি কিন্তু আপনার ক্লাসে যেতে রাজি আছি, যদি আপনি আপনার ক্লাসে পৃথিবীর অন্যান্য মহাপুরুষদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, চৈতন্য, জরথুষ্ট্র, মহম্মদ—কার সাহেব হাসিয়া উত্তর দিলেন—বাইবেল ক্লাসে তাহা করা সম্ভব নয়।

কার সাহেবের আর একটি গল্প। কোনও উৎসব উপলক্ষে কার সাহেব হোস্টেলের প্রায় সব ছেলেকে তাঁহার মিশনে যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গেলাম। গিয়া দেখি সবই সাহেবী বন্দোবস্ত। টেবিলে কাঁটা-চামচ দিয়া খাইতে হইবে। আমি কাঁটা-চামচ দিয়া কখনও খাই নাই। অনেকে খাইতে বসিল। আমি চলিয়া আসিলাম। পরদিন কার সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমাকে কাল দেখিনি তো। যাওনি না কি?' বলিলাম—'গিয়াছিলাম। কিন্তু কাঁটা-চামচে খেতে আমি জানি না। তাই চলে এলাম। আমার আশ্চর্য লাগছে, আপনি ভারতীয় ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করে সাহেবী ধরনের ব্যবস্থা করেছেন কেন?'

কার সাহেবী হাসিয়া বলিলেন—'I am so sorry. কাল আবার তুমি এসো মিশনে। Indian ব্যবস্থা থাকবে।'

গেলাম। ভারতীয় রীতিতেই ভাত রুটি এবং মাংসের ব্যবস্থা ছিল।

কার সাহেবের আর একটি গল্প।

তখন হাজারিবাগ অঞ্চলে খুব কলেরা এপিডেমিক হইয়াছিল। হাজারিবাগ শহরের কাছাকাছি অনেক গ্রামে বহু লোক মারা যাইতেছিল। মিশনারি সাহেব-মেমেরা চারিদিকে ভলাণ্টিয়ার হইয়া রোগীদের সেবা, তাহাদের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া, চতুর্দিক ঔষধ ছিটাইয়া ডিস্ইনফেক্ট করা, কূয়ার মধ্যে potassiam permanganate দেওয়া প্রভৃতি কার্যে নিজেদের নিয়োজিত করিয়াছিলেন। একদিন নোটিশ-বোর্ডে একটি নোটিশ দেখিলাম—হস্টেলের কোন ছেলে যদি ভলাণ্টিয়ারের কাজ করিতে চায় সে যেন প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করে। আমি গেলাম। কার সাহেব বলিলেন—তুমি আগে তোমার বাবার নিকট হইতে অনুমতি নাও। তিনি যদি আপত্তি না করেন তাহা হইলে তোমাকে ভলাণ্টিয়ারের দলে ভর্তি করিয়া লইব। বাবাকে চিঠি লিখিলাম। তিনি আপত্তি করিলেন না। কেবল লিখিলেন বাইরের কোন জিনিশ খাইও না এবং কার্বলিক সোপ দিয়া গরম জলে হাত ধুইয়া বাড়ি আসিবে। বাড়িতেও ফুটানো জল খাইবে এবং ঠাণ্ডা জিনিশ একেবারে খাইবে না।

কার সাহেব আমাকে ভলাণ্টিয়ার করিয়া লইলেন। কার সাহেব সাইকেল করিয়া যাইতেন, আমি তাহার পিছন দিকে পিনের উপর পা রাখিয়া তাঁহার কাঁধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম।

প্রথম দিনের একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। ফাঁকা জায়গায় একটি কুটিরের

সামনে আসিয়া আমরা উপস্থিত হইলাম। কুটিরের দ্বার এত ছোট যে হামাগুড়ি দিয়া ঢুকিতে হয়। কার সাহেব ঢুকিয়া গেলেন। তারপর আমিও তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম। ভিতরে ঘোর অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। কার সাহেব টর্চ জ্বালিলেন। দেখিলাম কয়েকটি শূকর রহিয়াছে। আর ঘরের একধারে একটা লোক শুইয়া আছে। মনে হইল তাঁহার চোখে ঠুলি বা গগলস্ জাতীয় চশমা রহিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙিল। কার সাহেব পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাহার মুখে বাতাস দিতেই ভনভন করিয়া মাছি উড়িয়া গেল। কোটরগত চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল। কার সাহেব লোকটিকে কোলে করিয়া বাহিরে লইয়া আসিলেন। আমি বলিলাম ইহারা কি জঘন্য ভাবে থাকে। কার সাহেব বলিলেন—Remember my boy, your country lives in these huts and not in palaces.

কার সাহেব তাহাকে কাঁধে করিয়া হাসপাতালে লইয়া গেলেন। আমি চারিদিকে ফিনাইল ছিটাইতে লাগিলাম।

ও অঞ্চলের অধিবাসীরা অনেকেই খ্রীস্টধর্ম বরণ করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাহাদের বিপদ-আপদের সময় আমরা গিয়া দাঁড়াই না। খ্রীস্টান মিশনারীরা গিয়া দাঁড়ান। আমরা আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র হেঁসেল এবং ছুৎমার্গ লইয়া আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে বা বৈঠকখানায় বসিয়া হিন্দুধর্ম সংরক্ষণ করি। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন যতদিন হইতে সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন ততদিন হইতে বোধহয় ধর্মান্তরিত লোকের সংখ্যা কমিয়াছে। সেবা-যত্ন ভালো-বাসাই লোককে আপন করে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এবং কুসংস্কার আমাদের ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু করিতেছে। বর্তমানে জাতি-ভেদের সাবেক রূপ আর নাই। এখন নতুন রকম জাতি-ভেদ। আজকাল আর্থিক মানদণ্ডেই নতুন নতুন জাতির সৃষ্টি হইতেছে। এই কাঞ্চন-কৌলিন্য লাভ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এবং শূদ্রেরা চুরি ডাকাতি অথবা ভোটের শরণাপন্ন হইতেছে। এখন শিক্ষা, সাহিত্য, গণতন্ত্র, সবই টাকার মাপে এবং বাহ্যিক আড়ম্বরের মাপে নির্দিষ্ট হইতেছে। প্রগতির নামে নতুন দুর্গতি আমাদের কোন রসাতলের দিকে যে লইয়া যাইতেছে জানি না, আমরা এখনও এক জাতি এক প্রাণ হইতে পারি নাই। আশঙ্কা হয় এই সুড়ঙ্গ পথে আসিয়া আবার কোনও বিদেশী শত্রু না হানা দেয়। দেশে বিশ্বাসঘাতকের তো অভাব নাই।

অন্য প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছি। এবার হাজারিবাগের কথায় ফিরিয়া যাই। হাজারিবাগে আমাদের ইংলিশ পোয়েট্রি পড়াইতেন 'স্টিভেনসন্' সাহেব। টেনিশন আমাদের পাঠ্য ছিল। প্রথম প্রথম তাঁহার কথা বুঝিতে পারিতাম না। পরে সড়গড় হইয়া গেল। তাঁহার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, এখনও মনে আছে। চোখের দুইপাশে ত্যাড়চা ভাবে দুই দিকে গোঁফ রাখিয়াছিলেন তিনি। একদিন কৌতূহলবশতঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আসল গোঁফ কামাইয়া তিনি চোখের পাশে গোঁফ রাখিয়াছেন কেন? তিনি বলিলেন, আমার দাড়ি প্রায় চোখ পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই

জন্তেই দাড়ির সীমা নির্দিষ্ট করিয়াছি! তাহা না হইলে আমার চোখ ঢাকিয়া যাইবে। কারণ যাই হোক তাহার এই নতুন রকমের গোঁফের জন্ম তাহাকে আমি মনে মনে বেশী খাতির করিতাম। পণ্ডিত লোক ছিলেন তিনি। ইংরাজি সাহিত্যের প্রসিদ্ধ সমালোচক 'স্টপ্-ফোর্ড এ ব্রুক'-এর সন্ধান তিনি আমাকে দিয়েছিলেন।

আমাদের কলেজে যে লাইব্রেরী ছিল সেটি আমার খুব কাজে লাগিয়াছিল। অনেক ভালো বই পডিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমাদের ইংরাজি প্রোজ পড়াইতেন বৃদ্ধ একজন প্রফেসর। নাম প্রফেসর নন্দী। সেকালের গুরু মশাইএর মত ছিলেন তিনি। ক্লাসময় বেড়াইয়া বেড়াইয়া পডাইতেন তিনি। প্রত্যেক ছেলের পিছনে গিয়া দাঁড়াইতেন। বই-এর শক্ত জায়গায় 'আণ্ডারলাইন' করিয়া মানে লিখিয়া দিতেন। সব শেষে যতটা পড়ানো হইত তাহার 'সামারি' রোজ লিখিয়া দিতেন, প্রত্যেক ছেলের খাতায়। কলেজের কাছেই কোয়ার্টার্স ছিল তাঁহার। বাড়ি গেলে খুব খুশী হইতেন। খৃস্টান ছিলেন তিনি। তার কাছে আমরা Vicar of Wakefield এবং Helps' Essays পড়িয়াছিলাম। তিনিই আমাকে প্রথমে টলস্টয়ের বই পড়িতে বলেন। প্রথমবার War and Peace সেই সময়েই পড়ি। তাহার পর আরও তুইবার পড়িয়াছি। Victor Hugo-র সাহিত্যের পরিচয় সেই সময় হইয়াছিল। অধ্যাপক মহাশয়ের নির্দেশে আরও কয়েকজন ইংরেজ কবি যেমন Wordsworth এবং Burns-এর কবিতা কিছু কিছু পড়িতে চেষ্টা করি তখন। মিল্টন পড়িবার চেষ্টাও করিয়াছিলাম। কিন্তু দন্তস্ফুট করিতে পারি নাই। Shakespeare-ও তখন ভালো বুঝিতে পারি নাই। সাহেবদের নোটওয়ালা বই—যেমন 'চেরিটি' বাঙালী ছেলেদের খুব সহায়ক ছিল না। পরে বাঙালী প্রফেসরের লেখা (Prof. Banerji, Prof. Sen) বিশদ নোট-সমষ্টি শেক্সপীয়র পড়িয়া বুঝিয়াছি।

আমাদের কেমিস্ট্রি পডাইতেন—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁহারও সাহিত্যের দিকে প্রবণতা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে কিছু প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের শুনাইয়াছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত শ্বশুরবাড়ির দিক দিয়া তাহার কি যেন সম্পর্ক ছিল একটা। তিনি বি. এ. ক্লাশে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পড়াইতেন। আমাকে তাঁহার ক্লাসে যাইবার জন্ম মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিতেন। আমি কবিতা লিখিতে পারি বলিয়া আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন তি'ন। ভালোবাসিতেন খুব। 'সায়েন্স-ব্লকে' তাঁহার আহ্বানে প্রায়ই যাইতে হইত। হাজারিবাগে তখন ফিজিক্স পড়ানো হইত না। আমরা 'কেমিস্ট্রি' 'ম্যাথামেটিকস' এবং 'বটানি' লইয়া আই. এস. সি. পড়িয়াছিলাম। 'বটানি'র প্রফেসর মিঃ ডি.কে. রায়ের কথা আগেই বলিয়াছি।

চারুবাবু আমাদের বাংলা পড়াইতেন, অঙ্ক শেখাইতেন। একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। গলাবন্ধ কোট গায়ে দিয়া, কাপড় পরিয়া কলেজে আসিতেন। পায়ে থাকিত অতি সাধারণ একটা ক্যামবিসের জুতো। বৃষ্টি পড়িলে খালি পায়ে আসিতেন।

একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেদিন খুব বৃষ্টি। আমরা সবাই ক্লাশে বসিয়া আছি। চারুবাবু আসেন নাই। তিনি শহরে থাকিতেন। লাল মোটর কম্পানির মালিক দিগ্‌বাবু তাঁহার আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার বাড়িতেই তিনি থাকিতেন। রোজ হাঁটিয়া কলেজে আসিতেন। সেদিন তুমুল বৃষ্টি। আমরা ভাবিলাম তিনি বুঝি আসিবেন না। কিন্তু একটু পরে আপাদমস্তক ভিজিয়া তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—আপনারা আকাশের নীলজটা দেখছেন, আমি কিন্তু দেখবার অবসর পেলাম না। বৃষ্টির ভিতর আকাশের নীলজটা দেখবার মত মনের অবস্থা ছিল না।

আমরা ছুটিয়া তাঁহার জন্য কাপড় আনিয়া দিলাম। বারান্দায় দাঁড়াইয়া তিনি কাপড় ছাড়িলেন। জামা পরিলেন না। খালি গায়ে আসিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। একটা কথা বলিয়াছিলেন, আজও মনে আছে। বলিয়াছিলেন, কোন শক্ত অঙ্ক যদি কষতে না পারো উপোষ আরম্ভ করে দিও, যতক্ষণ না অঙ্কটা হয় উপোষ করে থেকো। দেখো, অঙ্ক ঠিক মিলে যাবে। মাঝে মাঝে তিনি আমার ঘরে গিয়া হাজির হইতেন।—বলিতেন, নতুন কি কবিতা লিখেছ, দেখাও।

তখন আমার কবিতার একটা খাতা ছিল বটে, কিন্তু প্রায় সকল কবিতা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সে সময় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাজাহান নাটকের একটি গান বেশ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। 'আমি এসেছি, এসেছি এসেছি বঁধু হে, নিয়ে এই হাসি-রূপ গান'। সে সময় আমাদের কলেজে ইতিহাস পরীক্ষা চলিতেছিল। আমি এই গানটির একটি প্যারডি রচনা করিয়াছিলাম।

আজি এসেছি এসেছি বঁধু হে
  ঠোঁটে করে সারা ইতিহাস
আমার যেটুকু আছে, এনেছি তোমার কাছে
  দয়া করে করে দিও পাশ।
ঐ ভেসে আসে উচ্ছল ইতিহাস—গৌরব
ভেসে আসে আকবর বাবরের কলরব
ভেসে আসে অবিরত 'ডেট' রাশি শত শত
  ভেসে আসে পাল, সেন, দাস।
ওগো, অনেক লিখেছি আজি
কম দাও তাও রাজি
একেবারে কোরনা হতাশ।

আমার ঘরে আসিয়া আমার মুখে এই কবিতাটি শুনিয়া তিনি খুব খুশী হইলেন। বলিলেন,—কবিতাটি আমাকে লিখে দাও।

আমি লিখিয়া দিলাম। কবিতাটি লইয়া তিনি যাহা করিলেন, তাহা অপ্রত্যাশিত এবং তাহাতে আমি একটু বিপদে পড়িয়া গেলাম। তখন ইতিহাসের পরীক্ষা

চলিতেছিল। চারুবাবু কবিতাটি লইয়া গিয়া, জানি না, কি উপায়ে কলেজের 'নোটিশ বোর্ডে' টাঙাইয়া দিলেন। কলেজে হই-হই পড়িয়া গেল। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা ইতিহাসের ছাত্রদের দেখিলেই ওই কবিতাটি সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের অধ্যাপক জ্ঞানবাবু আমার নামে প্রিন্সিপাল 'কার' সাহেবের কাছে নালিশ করিলেন। কার সাহেব তখন আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, দেখিলাম কবিতাটি ইংরাজিতে অনূদিত হইয়া তাঁহার টেবিলের উপর রাখা আছে। তিনি বলিলেন—I appreciate this fine piece of poem. But I would request you to contribute to our college magazine and not to our Notice Board. Please, go and see the professor of the History and pacify him. He feels offended.

আমি জ্ঞানবাবুকে গিয়া বলিলাম, আমাকে ক্ষমা করুন। কাহাকেও আমার অপমান করা উদ্দেশ্য নয়। আমি কবিতাটি চারুবাবুকে লিখিয়া দিয়াছিলাম, তাহার পর সেটি কি করিয়া নোটিশ-বোর্ডে হাজির হইয়াছে, তাহা আমি জানি না। জ্ঞানবাবু সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, তুমি ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে কবিতা লেখ।

তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম লিখিব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারি নাই। তিনি পৃথ্বীরাজ, রানা প্রতাপ সিংহ, রাজা গনেশ, মহারাজ শশাঙ্ক প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ও নির্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ফরমাসি লেখা আমি কখনও প্রায় লিখিতে পারি নাই। তাই উক্ত ঐতিহাসিক বীরবৃন্দ কেবল আমায় এড়াইয়া গিয়াছেন। ফরমাসি লেখা লিখি নাই তাহাও সত্য নয়। বিবাহের অনেক প্রীতি-উপহার লিখিয়াছি। সুখের বিষয় সেগুলির অধিকাংশই হারাইয়া গিয়াছে।

কলেজের সাহেব অধ্যাপকেরা সকলেই ভালো ছিলেন। ভালো পড়াইতেন, আমাদের ভালো করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহারা 'সাহেব' বলিয়া আমরা মনে মনে তাঁহাদের উপর চটিয়াছিলাম। তাঁহাদের অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের আপন লোক মনে করিতে পারি নাই। তখন দেশে অগ্নিযুগের বিস্ফোরণ মাঝে মাঝে হইতেছিল। আমরা সকলেই বোমারুদের দলে ছিলাম।

একদিন একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিল। আমাদের প্রিন্সিপাল কার সাহেব 'হুইট্‌লে হলে' আমাদের সমবেত হইতে বলিলেন। আমরা সকলে সমবেত হইলে তিনি বলিলেন—পুলিশ সাহেব হস্টেল সার্চ করিতে আসিবেন বলিয়া আমাকে খবর পাঠাইয়াছেন, তাঁহার সন্দেহ এখানে বোমার দলের কোনও ছেলে আছে। আমি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছি। তবু তিনি কাল আসিবেন। আশা করি তোমরা আমার মান রক্ষা করিবে।

পরদিন দেখা গেল হস্টেল হইতে একটি ছেলে অন্তর্ধান করিয়াছে। শুনিলাম সে না কি ক্রিশ্চান মেসে খাইত। কাহারও সহিত বড় একটা মিশিত না। পরদিন

পুলিশ সাহেব আসিলেন, সব ছেলেদের ঘরে ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন। কিন্তু সন্দেহজনক কোন কিছু খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আমার এখন মনে হয় কার সাহেব বোধহয় জানিতেন যে একটি স্বদেশী ছেলে তাঁহার হস্টেলে আছে। তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কার সাহেব আইরিশম্যান ছিলেন এবং স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন।

একটি গল্প মনে পড়িল। আমি তখন মেডিকেল কলেজে পড়ি। দুপুরে কলেজ হইতে মেসে আসিয়া দেখি কার সাহেব আমার ঘরে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া হাস্যোদ্ভাসিত মুখে বলিলেন—আমি এবার এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছি। তাই আমার যেসব ছাত্রের ঠিকানা জোগাড় করিতে পারিয়াছি তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে যাইতেছি। আর তো দেখা হইবে না। বলাবাহুল্য আমি খুবই আনন্দিত হইলাম। বলিলাম—দেশে গিয়া এখন কি করিবেন? কার সাহেব উত্তর দিলেন—বিবাহ করিব। আমাকে কি কোন মেয়ে পছন্দ করিবে না? আমি হাসিয়া ফেলিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনার এখন বয়স কত? কার সাহেব একটি অদ্ভুত উত্তর দিলেন। বলিলেন—আমার দেশকে, আমার সমাজকে সন্তান দেওয়া একটি মহৎ কর্তব্য। সেই কর্তব্য পালন করিবার চেষ্টা করিব এবার। বেশীক্ষণ বসিলেন না। চলিয়া গেলেন।

অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন কার সাহেব।

তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প মনে পড়িতেছে। ইহা হইতে আপনারা তাঁহার চরিত্রের কিছুটা আভাস পাইবেন।

কার সাহেব খেলাধুলা খুব পছন্দ করিতেন। একজন ভালো স্পোর্টস্‌ম্যান ছিলেন। তিনি নিজেদের দেশে কলেজে পড়িবার সময় একবার এক সুদীর্ঘ রেসে (বোধহয় পঞ্চাশ মাইল) প্রথম হইয়াছিলেন। প্রাইজ পাইয়াছিলেন একটি চমৎকার লাল কোট। সেটি প্রায়ই আমাদের দেখাইতেন। আমার স্পোর্টসের প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না। ওই সব গুঁতাগুতি হুড়াহুড়ি হইতে আমি বরাবরই এড়াইয়া চলিতাম। চারদিকে প্রকাণ্ড মাঠ ছিল। বেড়াইতে খুব ভালো লাগিত।

একদিন বৈকালে বেড়াইয়া ফিরিতেছি তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। হঠাৎ দেখিলাম আমাদের কলেজের সামনের মাঠে কে একজন হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতেছে। কাছে গিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। আমাদের প্রিন্সিপাল কার সাহেব। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে স্যার?

আমি একটু আগে ছেলেদের সহিত হকি খেলিতে ছিলাম, আমার প্যাণ্টের পকেটে আমার পাইপটা ছিল, সেটা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে খুঁজিয়া পাইতেছি না।

আমিও খুঁজিতে লাগিলাম। একটু খুঁজিবার পর বলিলাম—এখন না পাওয়া গেলে সকালে আসিয়া খুঁজিব। সকালে পাওয়া যাইবে—

কার সাহেব উত্তর দিলেন—পাইপ না লইয়া আমি ফিরিব না। পাইপটি আমার নিকট খুবই মূল্যবান।

সোনার বা রূপোর নাকি?

কার সাহেব বলিলেন, তাঁহার চেয়েও মূল্যবান। ওটি আমি এ্যাকর্ণ (Acorn ওক গাছের ফল) হইতে নিজে হাতে প্রস্তুত করিয়াছি। ও জিনিশ বাজারে পাওয়া যায় না।

উভয়েই আবার খুঁজিতে লাগিলাম। একটু পরেই আমি পাইপটি দূরে দেখিতে পাইলাম।

বলিলাম—'আমি যদি খুঁজিয়া পাই, কি দিবেন?'

'তুমি যাহা চাও তাহাই দিব, যদি তাহা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত না হয়।'

পাইপটি আনিয়া তাঁহার হাতে দিতে খুব খুসী হইলেন তিনি।

বলিলেন—'কি চাও তুমি?'

বলিলাম—'ভোরে উঠিতে বড়ই কষ্ট হয়। আমাকে মর্নিং রোলকলটা হইতে অব্যাহতি দিন।'

কার সাহেব উত্তর দিলেন—'তাহা পারিব না। হস্টেলের আইন অমান্য করা আমার সাধ্যাতীত। তুমি অন্য কিছু চাও'

বলিলাম, 'আচ্ছা, ভাবিয়া পরে বলিব।'

'বেশ, চল এখন তোমাকে এক কাপ চা খাওয়াই। আজ আমাকে এক বন্ধু ভাল কন্‌ডেন্‌সড্‌ মিল্ক পাঠাইয়া দিয়াছে।'

কার সাহেবের কাছে আমার পাওনার দাবিটা অনেক পরে পেশ করিয়াছিলাম।

তাহা বলিবার পূর্বে আর একটি গল্প বলা দরকার। লাল মোটর কোম্পানীর মালিক ছিলেন দিগ্‌বাবু। একদিন শুনিলাম তিনি অত্যন্ত স্থূলকায়। তাঁহার জন্য নাকি ফরমাস দিয়া বড একটি চেয়ার করানো হইয়াছে। সাধারণ চেয়ারে তিনি বসিতে পারেন না। আমার কৌতূহল হইল তাঁহাকে দেখিতে যাইব। কিন্তু কি করিয়া দেখা যায়। তিনি বাহির হন না, অন্দর মহলে থাকেন। আমাদের বাংলা ও অঙ্কের অধ্যাপক চারুবাবু দিগ্‌বাবুর আত্মীয় ছিলেন। তিনি দিগ্‌বাবুর বাড়িতেই থাকিতেন। চারুবাবুর নিকট আমার মনের বাসনাটি একদিন নিবেদন করিলাম। শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

'তুমি দিগ্‌বাবুকে দেখতে চাও? কেন?'

চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর বলিলাম—'উনি একজন অদ্ভুত অসাধারণ পুরুষ। তাই দেখবার ইচ্ছে হয়েছে। আপনি সাহায্য না করলে তো দেখা পাব না। শুনেছি তিনি বাইরে আসেন না।'

'না, ভিতরেই থাকেন তিনি। কিন্তু তার কাছে তোমাকে হঠাৎ নিয়ে যাব কি করে? তাঁর সঙ্গে দেখা করার একটা সঙ্গত কারণ থাকা চাই তো। কেন তার সঙ্গে দেখা করছ তার একটা ভদ্র কারণ ঠিক করো আগে।'

তাহার পর নিজেই তিনি বলিলেন—'সামনে তো দোলের ছুটি। তুমি গিয়ে বলতে পারো, আমরা এই ছুটিতে পরেশনাথ পাহাড়ে বেড়াতে যাব। আপনি যদি কন্‌সেশন রেটে আমাদের একটি ট্যাক্সি দেন, এই অনুরোধ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি—' আমি তোমাকে আমার ছাত্র বলে পরিচয় করে দেব।

তাহাই হইল। চারুবাবু আমাকে দিগ্‌বাবুর সম্মুখে লইয়া গেলেন। আমি গিয়া প্রণাম করিলাম। দেখিলাম তিনি বিরাট একটি স্তূপের মত প্রকাণ্ড একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন। তাঁহার সবকিছু কাপড় দিয়া ঢাকা। মুখটি ছোট। গলার স্বরও সরু।

চারুবাবু পরিচয় করিয়া দিলেন। 'এটি আমার একটি ছাত্র। আপনার কাছে একটি অনুরোধ নিয়ে এসেছে।'

আমি অনুরোধটি ব্যক্ত করিলাম।

দিগ্‌বাবু বলিলেন—'তুমি চারুর ছাত্র, তোমার কাছে থেকে আর কি ভাড়া নেব। পেট্রোলের যা খরচ লাগবে আর ড্রাইভারকে খাই-খরচ দিও। আমাকে কিছু দিতে হবে না।'

এই সংবাদটি লইয়া আমি হোস্টেলে ফিরিয়া আসিলাম। হিসাব করিয়া দেখা গেল একটি বড় ট্যাক্সিতে ছ-জন অনায়াসেই যাওয়া যাইবে। কিন্তু পার্বতী, রবি এবং আরও একজন (নাম মনে পড়িতেছে না) সোৎসাহে বলিল—'চল ঘুরেই আসা যাক্ তা হলে। পাহাড়ের উপর ডাক-বাংলো আছে, সেখানে আমরা রান্না করে খাবো। কিছু চাল, ডাল, আলু আর ডিম সঙ্গে নেব। সেখানে গিয়ে সিদ্ধ করে খেলেই চলবে।' আমি ব্রাহ্মণ, ঠিক হইল রান্নাটা আমাকে করিতে হইবে। রাজি হইলাম।

কিন্তু হোস্টেল ত্যাগ করিয়া বাহিরে কোথাও বেড়াইতে গেলে প্রিন্সিপালের অনুমতি লইতে হয়। আমি কার সাহেবের কাছে গেলাম। বলিলাম, 'আপনার পাইপ খুঁজিয়া দিয়াছিলাম। আপনি এখনও আমাকে কিছু দেন নাই। আপনি আমাদের পরেশনাথে বেড়াইতে যাইবার অনুমতি দিন।'

কার সাহেব কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—'বিনা গার্জেনে এতগুলি সুবোধ বালককে আমি এতদূর যাইতে দিতে পারি না। আমার এখন মিশনের কাজ আছে, আমার যাইবার সময় নাই। সময় থাকিলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যাইতাম। তোমরা অন্য কোন প্রফেসারকে যদি তোমাদের সঙ্গে যাইতে রাজি করাইতে পারো, আমি অনুমতি দিব। কিন্তু কোন প্রফেসর যদি রাজি না হন আমি অনুমতি দিব না।'

আমাদের কলেজে যাহারা বাঙালী প্রফেসর ছিলেন যেমন কেমিষ্ট্রির প্রফেসর হেমন্তবাবু, ইতিহাসের প্রফেসর জ্ঞানবাবু, দর্শনের প্রফেসর খড়্গাবাবু, ইংরাজীর প্রফেসর নন্দী সাহেব, বাংলার প্রফেসর চারুবাবু—সকলকে অনুরোধ করিলাম।

কেহই রাজি হইলেন না। কেনেডি সাহেব, স্টিভেনসন সাহেব বলিলেন, তাঁহাদের মিশনের কাজ আছে। আমরা হতাশ হইয়া পড়িলাম। কেনেডি সাহেব বলিলেন —You may request Rev. Winter.

Winter সাহেব কিছুদিন আগেই ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তবু তাঁহাকে গিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, পরেশনাথ একটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। আমার দেখিবার খুবই ইচ্ছে কিন্তু আমি গরীব মানুষ। মোটরে করিয়া এমন ব্যয়সাধ্য ভ্রমণ-বিলাস যাইবার সামর্থ্য আমার নাই। আমরা বলিলাম—আপনার এক পয়সাও খরচ লাগিবে না। আমরাই আপনার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিব। আপনি শুধু রাজি হোন। তিনি বলিলেন—'ছাত্রদের পয়সায় যাওয়াটা কি উচিৎ হইবে?' আমরা তখন বলিলাম— 'আপনি রাজি না হইলে আমাদের যাওয়া হইবে না। রেভারেণ্ড কার সাহেব অনুমতি দিবেন না।' তিনি কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন—বেশ আমি যাইব। তোমাদের জন্য সামান্য কিছু ব্রেকফাস্ট লইবার ব্যবস্থা বোধহয় করিতে পারিব। তিনি কার সাহেবকে চিঠি লিখিয়া দিলেন—আমি ছেলেদের সহিত পরেশনাথ যাইব।

কার সাহেবের অনুমতি পাওয়া গেল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলাম লাল মোটর কোম্পানিতে। দিগ্‌বাবুর আদেশে একটা ভালো বড় মোটর গাড়ির ব্যবস্থা হইল। ঠিক হইল গাড়িটি আমাদের লইয়া পরেশনাথ পাহাড়ের পাদদেশে নামাইয়া দিবে। আমরা পাহাড়ে উঠিয়া যাইব, যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ মোটরটি আমাদের জন্য অপেক্ষা করিবে। ড্রাইভারকে খাওয়া খরচ বাবদ দৈনিক দুই-টাকা দিতে হইবে। স্থির হইল পরদিন সকালে আমরা পরেশনাথ অভিমুখে যাত্রা করিব। কার সাহেবকে খবরটি জানাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন—'ভেরি গুড'।

পরেশনাথ ভ্রমণ আমার জীবনে একটি অপূর্ব অভিজ্ঞতা। উইনটার সাহেবের একটি ক্যামেরা ছিল। তিনি সেটি সঙ্গে লইলেন এবং মোটর ছাড়িবার পূর্বেই বলিলেন—মোটরটার সুস্থ অবস্থায় তাহার একটি ফটো লওয়া যাক। তোমরা সব মোটরটার পাশে দাঁড়াও। আমরা দাঁড়াইলাম। তিনি ফটো তুলিলেন। তাহার পর যাত্রা শুরু হইল।

গাড়ির যখন বেগ বাড়িল, তখন আমরা সমস্বরে গান ধরিয়া দিলাম। আমরা প্রত্যেকেই ছিলাম বেসুরো এবং প্রত্যেকে বোধহয় আলাদা গান গাহিতেছিলাম। উইনটার সাহেব হাসি মুখে আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং বেতালা ভাবে হাততালি দিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত ঐকতানে মগ্ন হইয়া আমরা কতক্ষণ ছিলাম জানি না। হঠাৎ ফটাস করিয়া একটা আওয়াজ হইল। গাড়ি থামিয়া গেল। ড্রাইভার বলিল—চাকার টিউব ফাটিয়া গিয়াছে।

কাছেই একটি মুদির দোকান ছিল, দোকানদারের সাহায্য লইয়া ড্রাইভার চাকা

ঠিক করিতে লাগিল। আমরা সকলে নামিয়া পড়িলাম। উইনটার সাহেব বলিলেন—এইবার অসুস্থ মোটরের একটি ফটো তোলা যাক। তোমরা মোটরটিকে ঘিরিয়া দাঁড়াও। মুদির দোকানে এক ঝুড়ি রামদানার লাড্ডু ছিল। আমরা এক টাকার লাড্ডু কিনিয়া লইলাম। একটাকায় অনেকগুলি লাড্ডু পাওয়া গেল। বত্রিশটা। দেখিলাম দোকানে কাগজ ও পেন্সিলও পাওয়া যায়। আমি একটা পেন্সিল এবং কিছু কাগজও কিনিয়া ফেলিলাম। কাগজ কলম দেখিলেই কিনিতে ইচ্ছে করে। এখনও সে স্বভাব যায় নাই। উইনটার সাহেবের চাবির রিং-এ ছোট একটি ছুরি ছিল। তিনি আমার পেন্সিল বাড়িয়া দিলেন।

মোটর ঠিক হইলে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হইল। কিছু দূর গিয়া একটা মেলার মধ্যে গিয়া পড়িলাম। সেখানে দেখিলাম এক দল লোক হোলি খেলিতেছে, প্রত্যেকের মুখে মাথায় আবির, নূতন কাপড় এবং জামায় রং, সকলেরই চক্ষু প্রায় ঢুলু-ঢুলু। মুখে হোলির গান। দুটি লোক ঢোল ও খঞ্জনী বাজাইতেছে। তাহারও আপাদমস্তক রঞ্জিত। তাহারা আমাদের গাড়ি থামাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ছা-রা-রা-রা—হোলি হ্যায়।

আমরা নামিয়া পড়িলাম। তাহারা আমাদের আবীর মাখাইয়া দিল। উইনটার সাহেব ঘাবড়াইয়া গেলেন। তাহারাও সাহেব দেখিয়া একটু ইতস্তত করিতে লাগিলেন। আমি সাহেবের কানে কানে বলিলাম—সাহেব তুমি আগাইয়া গিয়া উহাদের রং মাখো। তাহা না হইলে উহারা অপমানিত হইবেন। উইনটার সাহেব বলিলেন—Is it so? I don't understand what is happening! তিনি মাত্র কয়েকদিন আগে বিলাত থেকে আসিয়াছিলেন। এ দেশের দোল সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণা ছিল না। আমি তাহাকে বুঝাইলাম To-day we are offering our colour of love to all. The colour is the symbol of love. You should accept it. উইনটার সাহেব উদ্ভাসিত মুখে উত্তর দিলেন—Oh, certainly. তিনিও মোটর হইতে নামিয়া মাথা পাতিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে তাঁহার মুখে মাথায় আবীর মাখাইয়া দিল। একজন পিচকারি সহযোগে তাঁহার সাদা প্যান্টে রং দিতেই লাফাইয়া আসিলেন উইনটার সাহেব। বলিলেন—'আমার এই একটি মাত্রই ভাল প্যান্ট আছে। এটি খারাপ হইলে আমি ভদ্র-সমাজে বাহির হইতে পারিব না।'

আমরা তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম—পাকা রং নয়। কাচিলেই উঠিয়া যাইবে।

আবার আমাদের মোটর চলিতে শুরু করিল। আমি উইনটার সাহেবকে প্রশ্ন করিলাম—আপনার মাত্র একটি প্যান্ট?

তিনি বলিলেন—'হ্যাঁ, ভাল প্যান্ট একটিই। বাকিগুলো সব তালি লাগানো।'

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—আমি কখনও নতুন প্যান্ট বা কোট করিতে পারি নাই। আমার চারজন দাদা। তাহাদের পুরানো জামা-কাপড় পরিয়াই আমি কাটাইয়াছি। এখন মিশনের কাজ লইয়া এখানে আসিয়াছি। আমাকে উহারা

নামে-মাত্র ২৫ টাকা 'পকেট-মানি' দেন। অবশ্য আমাদের খাওয়া-খরচ মিশনের। সুতরাং বুঝিতেই পারো ঘন ঘন নতুন প্যাণ্ট করা আমার সাধ্যাতীত।

শুনিয়াছিলাম উইনটার সাহেব কোন বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ডিগ্রীধারী। মিশনের কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং কষ্ট করিয়া এদেশে আছেন। শুধু এ-দেশের অবজ্ঞাত এবং অবহেলিত লোকদের খৃস্টানই করিতেছেন না, নানা ভাবে তাহাদের সেবাও করিতেছেন। অবশ্য তাঁহাদের পিছনে রাজশক্তির দোর্দণ্ড-প্রতাপ বর্তমান। এখন আমরা স্বাধীন হইয়াছি। এখনও আমাদের দেশে এ-রকম মিশনারির আবির্ভাব হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম দেশের অনেক সেবা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ঠিক ওই সাহেব মিশনারিদের মতো লোক তাঁহাদের মধ্যে আছেন কিনা জানি না। থাকিলেও আমার চোখে পড়ে নাই। অবশ্য আমার অভিজ্ঞতা সীমিত, ইহাও স্বীকার করি।

সন্ধ্যার একটু পূর্বে আমরা পরেশনাথ পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছিলাম। যেখান হইতে পাহাড়ের উপর উঠিবার পথ, সেখানে দু'ই একটি দোকান ছিল। খাবারের দোকান, চায়ের দোকান তো ছিলই, একটি মনিহারি দোকানও ছিল মনে পড়িতেছে।

আমরা সকলে একবার করিয়া চা-পান করিয়া লইলাম। লক্ষ্য করিলাম একটি লাঠির দোকানও রহিয়াছে। অনেকেই লাঠি কিনিল। উইনটার সাহেবও একটি লাঠি কিনিলেন। তাহার পর পাহাড়ে চড়া শুরু হইল।

আমার বন্ধুরা দেখিলাম পর্বতারোহণে দক্ষ। তাহারা দেখিতে দেখিতে আগাইয়া গেল। আমি ইহার আগে বড় পাহাড়ে কখনও চড়ি নাই। সাহেবগঞ্জের পাহাড়ে অবশ্য দুই একবার চড়িয়াছি। কিন্তু পরেশনাথের পাহাড়ের তুলনায় ইহা তেমন কিছু নয়। আমি প্রথমে খানিকটা বেশ দ্রুত-গতিতেই উঠিয়াছিলাম, কিন্তু একটু পরেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। উইনটার সাহেব আর পার্বতী সেন আমার সঙ্গে ছিল। উইনটার সাহেব বলিলেন—খুব আস্তে আস্তে চল। আস্তে আস্তে চলিয়াও কিন্তু বেশী দূর উঠিতে পারিলাম না। দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। উইনটার সাহেব বলিলেন—একটু বস। খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর আবার উঠা যাইবে। উইনটার সাহেব বসিলেন। পার্বতী উঠিয়া গেল। খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর উইনটার সাহেব উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন এইবার ওঠ। আস্তে আস্তে চল। কিছুদূর উঠিয়া আবার আমি দাঁড়াইয়া পড়িলাম। শ্বাসকষ্ট হইতেছিল, পা-ও ব্যথা করিতে লাগিল। তখন উইনটার সাহেব একটি অদ্ভুত কাণ্ড করিলেন। তিনি আমার সম্মুখে হঠাৎ উবু হইয়া বসিয়া পড়িলেন। আমাকে বলিলেন—'তুমি আমার কাঁধে চড়।' আমি তো অবাক। বলিলাম—আমাকে কাঁধে লইয়া আপনি উঠিতে পারিবেন? তিনি হাসি মুখে বলিলেন—'নিশ্চয় পারিব। তোমার ওজন আর কতটুকু? আমি যখন (Alps) পাহাড়ে উঠিয়াছিলাম তখন আমার পিঠে মস্ত একটা বোঝা ছিল। ওঠো।' উইনটার সাহেবের কাঁধে উঠিলাম। কিছুদূর তিনি অবলীলাক্রমে লইয়া গেলেন। আমার

কিন্তু বড় লজ্জা করিতেছিল। একটু দূরে গিয়া নামিয়া পড়িলাম। উইনটার সাহেবের কাঁধে হাত রাখিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম। সেই মুহূর্তে উইনটার সাহেবকে আমার পরম এবং একমাত্র হিতৈষী আত্মীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। আজ তিনি কোথায়। তিনি বাঁচিয়া আছেন কি না তাহাও তো জানি না। তিনি কিন্তু আমার মনে অমর হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

উঠিতে উঠিতে আমার আর একটা দুশ্চিন্তা হইতেছিল। উঠিবার পর আমাকে গিয়া রাঁধিতে হইবে। তাহার পর খাওয়া-দাওয়া। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছিল। চারিদিকে জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধিত ছিলাম। জ্যোৎস্না আমার চিত্তে তেমন সাড়া জাগাইতে পারিল না। সম্মুখের ঊর্ধ্বগামী পথটাই তখন আমার কাছে একমাত্র বাস্তব বলিয়া মনে হইতে লাগিল। উইনটার সাহেবের কাঁধটাও। তাঁহার কাঁধে হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া, কখনও বা থামিয়া অবশেষে পরেশনাথের পাহাড়ের শিখরস্থিত ডাকবাংলোয় পৌঁছিলাম। আমার বন্ধুরা আগেই পৌঁছিয়া গিয়াছিল। আমরা পৌঁছিবামাত্র ডাকবাংলোর চাপরাসি আগাইয়া আসিল; মোলায়েম করিয়া জানাইল 'আস্নান কা লিয়ে গরম জল তৈয়ার হ্যায়। খানা ভি বন গিয়া হ্যায়—'

আমি তো আকাশ হইতে পড়িলাম। শুনিলাম আমাদের প্রিন্সিপাল কার সাহেব নাকি আমরা চলিয়া আসিবার পূর্বেই এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন—**A Professor with five students leaving by car for Pareshnath Hill. Please arrange food and lodge for them at the Duk Bungalow.** ভাষাটা ঠিক হইল কিনা জানি না, কারণ টেলিগ্রামটা স্বচক্ষে দেখি নাই। ডাকবাংলোর চাপরাসি তাহার মাতৃভাষায় যাহা জানাইল, তাহার ইংরাজি অনুবাদ উহাই। বেশ বড় ডাকবাংলো। স্নানাহার সারিয়া যখন বাহিরে আসিয়া 'ডেক চেয়ারে' বসিলাম তখন মনে কবিত্ব জাগিয়া উঠিল। মনে হইল—

নিজেকে উজাড় করি মহাকাশে ভেসেছে কে
জ্যোৎস্নার ছদ্মবেশে এসেছে কে!

অনেক কবিতা লিখিয়াছিলাম সেদিন। ওই দুইটি লাইন ছাড়া আর কিছু মনে নাই। কবিতা অনুবাদ করিয়া উইনটার সাহেবকে শুনাইয়াছিলাম। তিনি তো মুগ্ধ। আমাদের অনেক দেশী রূপকথাও সেদিন অনুবাদ করিয়া শুনাইয়াছিলাম তাঁহাকে। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সব শুনিয়াছিলেন। সেদিন প্রায় সমস্ত রাত্রি যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে দিয়া কাটিয়া গেল। ভোরবেলা ঘুমাইয়া যখন উঠিলাম তখন বেলা প্রায় দশটা। চা খাইবার সময় দেখি উইনটার সাহেব একটা সিদ্ধ মুরগীর বাচ্চা আর দু'ই টুকরা পাউরুটি দিলেন। সসঙ্কোচে বলিলেন,—'তোমাদের জন্য এই সামান্য কিছু এনে ছিলাম। খাও।' খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া আমরা ভ্রমণে বাহির

হইয়া পড়িলাম। প্রথমে পরেশনাথের মন্দিরে গিয়া পরেশনাথজীকে দর্শন করিলাম। আর যে সব মূর্তি ছিল, সব দেখিলাম। উইনটার সাহেব কয়েকটি ফটো তুলিয়া লইলেন। তাহার পর আমাদের এলোমেলো ভ্রমণ আরম্ভ হইল। এলোমেলো মানে লক্ষ্য স্থির নাই। হুড়মুড় করিয়া যে-দিকে চু-চক্ষু গেল সেই দিকেই আমরা ঢালু পাহাড় বাহিয়া নামিতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম একটা বেশ বড় বন্যলতায় অজস্র ফুল ফুটিয়াছে। ইচ্ছা হইল ওই লতায় নিজেকে আবৃত করি। লতাটা ছিঁড়িয়া গাছ হইতে নামাইয়া লইলাম তাহার পর সেটিকে নিজের গায়ে জড়াইলাম। প্রকাণ্ড লতা। সকলের গায়ে পুষ্পিত লতাটি টুকরা টুকরা জড়ানো হইল। উইনটার সাহেবেরও। উইনটার সাহেব মহা খুশী। তিনি এই অবস্থায় আমাদের কয়েকটি ফটো তুলিলেন। তাহার পর আমরা চতুর্দিকে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। বেশ খানিকক্ষণ বেড়াইবার পর ক্ষুধার উদ্রেক হইল। কিন্তু তখন আমরা জঙ্গলে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। যে পথ আমাদের ডাকবাংলোয় লইয়া যাইবে সে পথ কিছুতেই খুঁজিয়া পাইলাম না। কিছুক্ষণ ঘুরিবার পর দূরে একটি বাড়ি দেখা গেল। সেই দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মনে হইল সেখানে হয়ত হারানো পথের সন্ধান মিলিবে। বাড়িটি ফরেস্ট রেন্‌জারের। আমাদের তিনি সমাদরে বসাইলেন। ভদ্রলোক মুসলমান। মনে হইল খানদানী ঘরের ছেলে। আমাদের কথা শুনিয়া, এবং আমাদের লতামণ্ডিত চেহারা দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন ভদ্রলোক। বলিলেন—আপনারা এখন এখানে খাওয়া-দাওয়া করুন তাহার পর আমি আপনাদের সঙ্গে লোক দিব। সে-ই আপনাদের পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। তাহাই হইল। তিনি আমাদের জন্য কয়েকটি মুরগী জবাই করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বাবুর্চি চমৎকার 'কারি' বানাইল। গরম ভাতের সহিত পরম তৃপ্তি সহকারে আমরা আহার সম্পন্ন করিলাম। সেদিনের আনন্দময় স্মৃতি আজও আমার মনে অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে। খাওয়া দাওয়ার পর ফরেস্ট রেঞ্জারের সহিত আর একবার ফটো তোলা হইল। তাহার পর ডাকবাংলোয় ফিরিয়া গিয়া সকলেই শুইয়া পড়িলাম। ফিরিলাম তাহার পরদিন সকালে। মোটর আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

হাজারিবাগের অনেক স্মৃতি মনে আছে। বেশীর ভাগই আনন্দময়। দুই একটি বিশ্রী কথা মনে পড়িতেছে। আমাদের পায়খানার দেয়ালে অনেক বিশ্রী অশ্লীল কথা লেখা থাকিত। অনেক সময় সচিত্র। কে বা কাহারা লিখিত জানি না। আমাদের মধ্যে কাহারও রুচি বিকার ছিল নিশ্চয়। কিন্তু বাহিরে তাহাদের ভদ্রতার মুখোস ছিল, তাই তাহাদের সনাক্ত করিতে পারি নাই। আমি সকলের সহিত ভালোভাবে মিশিতে পারিতাম না। সাহিত্যের ভূত অনেক আগেই আমার কাঁধে চাপিয়াছিল। অবসর পাইলেই কবিতা লিখিতাম আর ডাক-যোগে 'প্রবাসী'তে পাঠাইয়া দিতাম। তাহা হইতে মাঝে মাঝে 'প্রবাসী' সম্পাদক দুই একটি কবিতা ছাপিতেন। বাকিগুলি

'অ' (অর্থাৎ অমনোনীত) চিহ্নিত হইয়া ফিরিয়া আসিত। এই ভাবেই আমার সাহিত্য-চর্চা চলিতেছিল তখন! কবিতাই লিখিতাম কেবল।

হাজারিবাগের আর বিশেষ কোন স্মৃতি মনে পড়িতেছে না। কেবল পরীক্ষার সময় যে দুর্ঘটনাটি ঘটিয়াছিল সেটি মনে আছে। আই. এস. সি. পরীক্ষায় আমার বিষয় ছিল অঙ্ক, রসায়ন বিদ্যা (কেমিস্ট্রি) এবং উদ্ভিদ-বিদ্যা (বটানি)। পরীক্ষার সময় সব বিষয়ই মোটামুটি ভাল করিয়া দিলাম। কিন্তু বটানির প্রাকটিকালের সময় প্রায় অকূলপাথারে পড়িয়া গেলাম। বটানি প্রাকটিকালে বাহিরের পরীক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। তিনি কটক কলেজে বটানির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমাদের জন্য কটক হইতে কিছু ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেইগুলি আমাদের দিয়া বলিলেন 'ওভারি' (ovary) কাটিয়া নির্ণয় কর, ইহা কোন জাতের ফুল। ফুলগুলি ছোট ছোট এবং কালো রঙের, শুকনো।. এ ফুলের ওভারির সেকশন করা আমাদের সাধ্যে কুলাইল না। আমাদের প্রফেসর মিঃ ডি. কে. রায়ও একজন পরীক্ষক ছিলেন। তাঁহাকে আমরা বলিলাম। তিনি যোগেশবাবুকে গিয়া বলিলেন। তাহার পর আমাদের জবা-ফুল দেওয়া হইল। জবা আমাদের খুব চেনা ফুল। আমরা পরীক্ষা দিয়া সানন্দে ফিরিয়া আসিলাম। জবাফুলে আমাদের কোন রকম ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু পরে শুনিলাম যোগেশবাবু আমাদের সকলকেই ন্যূনতম পাশ নাম্বার মাত্র দিয়াছেন। এই পরীক্ষার ফল খুব ভালো হইল না। সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করিলাম। সেবার মাত্র আটজন ছেলে ফার্ষ্ট ডিভিশন পাইয়াছিল। বাবা চিঠি লিখিলেন তোমাদের অফিসেই মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইবার ফর্ম পাওয়া যাইবে। তুমি ফর্মটি পূরণ করিয়া প্রিন্সিপালের হাতে দিয়া আসিও। তাহাই করিলাম। আমাদের মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে দরখাস্ত করিতে হইত না। করিতে হইত—Inspector General of Civil Hospital-এর কাছে পাটনায়। আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল প্রত্যেক দরখাস্তের পাশে নিজের মন্তব্য লিখিয়া I. G. C. H. আফিসে পাঠাইয়া দিতেন। Inspector General—বিহার হইতে বারো জন ছাত্রকে নির্বাচিত করিতেন।

দরখাস্ত দিয়া আমি বাড়ি চলিয়া গেলাম। সাহেবগঞ্জ হইতে চলিয়া আসিবার সময় যেমন কষ্ট হইয়াছিল, হাজারিবাগ হইতে চলিয়া আসিবার সময় তেমনি বিয়োগ বেদনা অনুভব করিলাম। আমরা যখন যেখানে থাকি সেখানকার সহিত দৃশ্য-অদৃশ্য নানা সূত্রে আমাদের মন বাঁধা পড়ে। চলিয়া আসিবার সময় সেসব বাঁধনে টান পড়ে। ছিঁড়িয়া চলিয়া আসিতে বড়ই কষ্ট হয়। হাজারিবাগ ছাড়িয়া আসিবার আগে আমরা একটি রোমান্টিক ব্যাপার করিয়াছিলাম। দশখানা মোটা কাগজে লিখিয়াছিলাম—'আমরা শপথ করিতেছি যে আমরা কখনও কাহাকেও ভুলিব না। এবং যতদিন বাঁচিব পরস্পরের খোঁজ করিব।' নীচে আমরা দশজন সই করিয়াছিলাম। কিন্তু জীবন বড় আশ্চর্যের জিনিশ। ভোলাই তাহার স্বভাব। সে কাগজটি তো

হারাইয়াছিই, সকলের নামও আজ মনে নাই। পার্বতীর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। আর কাহারও সহিত হয় না। বিশুর কথা, রবির কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। গোপাকে মনে পড়ে এখনও। গোপা কিছুদিন আগে মারা গিয়াছে। আরও অনেকে হয়ত গিয়াছে। খবর পাই নাই। কাল-স্রোতের টানে কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছি।

বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম, মা খুব অসুস্থ। Sprue হইয়াছে। মুখে ঘা। কিছু খাইতে পারেন না। শুনিয়াছিলাম আমার একটি ছোট ভাই হইয়াছে। সে আঁতুরেই মরিয়া গিয়াছে। দশদিন মাত্র বাঁচিয়াছিল। আমার ছোট ভাই ঢুলুর পর তাহার জন্ম হইয়াছিল। মায়ের অসুখ যখন কিছুতেই সারিল না, তখন সাহেবগঞ্জের অনুকূল জ্যাঠামশাই (বাবার বন্ধু প্রমথনাথের বড় দাদা) বলিলেন, সাকরিগলি পাহাড়ের উপর আমার একটি বাংলো আছে। সেখানকার জল হাওয়া খুব ভালো। বৌমাকে সেখানে লইয়া যাও। তিনি ভালো হইয়া যাইবেন।

সেখানে আমরা একদিন সপরিবারে হাজির হইলাম। সাকরিগলি জংগল স্টেশন হইতে প্রায় মাইলখানেক দূরে ছোট একটি পাহাড় এবং তাহার উপর চমৎকার একটি বাংলো। পাহাড় বাহিয়া অনেকদূর কিন্তু উঠিতে হয়। মা তো ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মাঝে একবার বিশ্রাম করিলেন। আমরা অবশ্য একবারে উঠিয়া গেলাম। মুশকিল হইল আমাদের জিনিশপত্র লইয়া। আমাদের সঙ্গে একটা সংসারের যাবতীয় জিনিশ ছিল। কয়েকটা ট্রাঙ্ক। কয়েকটা বিছানার বড় বাণ্ডিল। তাহা ছাড়া বাসনপত্র এবং আরো নানা রকম জিনিশ। আমরা স্টেশন হইতে হাঁটিয়া গিয়াছিলাম। মা-বাবা বোধহয় গিয়াছিলেন কাহারও গাড়িতে। ঠিক মনে নাই। সঙ্গে কয়েকটি কুলি গিয়াছিল। তাহারা বলিল যে হালকা মালগুলি তাহারা বাংলোয় পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু ভারী ভারী ট্রাঙ্ক এবং বিছানার বাণ্ডিল লইয়া তাহারা পাহাড়ে চড়িতে পারিবে না। শক্তিতে কুলাইবে না। তাহারা ভারী জিনিশগুলি পাহাড়ের পাদমূলে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। ভাগ্যক্রমে আমাদের চাকর রামকিষনা আমাদের সঙ্গে ছিল। সে জাতিতে তুরী, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং অত্যন্ত বেঁটে। সে বাবাকে আশ্বাস দিল, চিন্তার কোন কারণ নাই। আমিই একে একে সব তুলিয়া দিব। সত্যিই দিল। একে একে জিনিশগুলি পিঠের উপর তুলিয়া লইল এবং আস্তে আস্তে পাহাড়ের উপর উঠিয়া আসিল। আমাদের এই খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ রামকিষনা যে এত শক্তিধর তাহা জানা ছিল না। পাহাড়ে তো ওঠা গেল। দৃশ্য অতি চমৎকার। কিন্তু আমরা ক্রমশ হৃদয়ঙ্গম করিলাম শুধু দৃশ্য দেখিয়া পেট ভরিবে না। রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে, বাজার হাট হইতে জিনিশ কিনিয়া আনিতে হইবে। অর্থাৎ বারবার পাহাড় হইতে ওঠানামা না করিলে চলিবে-না।

রামকিষনা পাহাড়ের নীচের একটি ইদারা হইতে কলসী কলসী জল তুলিয়া আনিয়া স্নান করাইত। একটি মৈথীলি চাকর ছিল। সে প্রত্যহ ভোরে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিত এবং ফিরিবার সময় একঘড়া গঙ্গাজল লইয়া আসিত। সেই জলে রান্না হইত। সেই পাহাড়ের গায়ে পিছন দিকে একটি ঘন জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলে ছোট ছোট পাখি সর্বদা ডাকাডাকি করিত। সেই জঙ্গলে সহসা একদিন আর একটি জিনিশ আবিষ্কার করিলাম। কাঁকড়া বিছা। একটা দু'টো নয়, অনেক। বিষাক্ত পুচ্ছটি পিঠের উপর তুলিয়া দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কাঁকড়া বিছা আগে দেখি নাই। এই প্রথম দেখিলাম। পরে যখন আকাশ-চর্চা করিয়াছিলাম, তখন বৃশ্চিক রাশিতে এই কাঁকড়ার প্রতিরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

ঘরের ভিতরও দুই একটি কাঁকড়া দেখা যাইতে লাগিল। রামকিষনা বলিল, এই জঙ্গলে 'গহুমনা' (গোখরা) সাপও আছে। মা বলিলেন, এই রকম জায়গায় ছেলেদের লইয়া থাকিব না। চল বাড়ি ফিরিয়া যাই।

কিন্তু বাড়ি ফিরিতে হইল না। বাবার এক বন্ধু পাঁচুবাবু আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। গঙ্গার ধারে দ্বিতলে তাহার একটি বাড়ি খালি পড়িয়া ছিল। তিনি বলিলেন—আপনারা আমাদের বাড়িতে চলুন।

পাঁচুবাবুর বাড়িতে কিছুদিন ছিলাম আমরা। মায়ের অসুখ কিন্তু সারিল না। উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। শেষে দুধ ছাড়া আর কিছুই খাইতে পারিতেন না। দুধও হজম হইত না। তখন বাবা স্থির করিলেন, মা-কে লইয়া কলিকাতায় আসিবেন। হাতিবাগানের কোনও স্থানে আমার বড়মাসির বাড়ি ছিল। ঠিক মনে নাই। বড়-মাসির বাসায় আমাদের সকলের স্থান-সঙ্কুলান হইবে না ভাবিয়া বাবা আমাদের মণিহারী পৌঁছাইয়া দিলেন। সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া বাবা তাঁহার আর এক বন্ধু বিনোদবাবুর বাসায় চলিয়া যান। সেই বাসায় বিধানবাবু আসিয়া মা-কে দেখেন। তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্যেই মা ভালো হইয়া যান। বিনোদবাবুর বাসায় থাকিতে থাকিতেই বাবা তাঁহার আর এক সহপাঠির খবর পান। তিনি বাবার সহিত ক্যাম্বেল-স্কুলে ডাক্তারী পড়িতেন। কিন্তু তিনি ডাক্তারী করেন নাই, ব্যবসা করিয়া বড়লোক হইয়াছিলেন। বাবা মা-কে লইয়া তাহার বাসাতেও ছিলেন কিছুদিন। এই সময় আমি মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া মার কাছে থাকিয়াছি। যতদূর মনে পড়িতেছে বিধানবাবু মায়ের মুখের ঘা Boroglycerine এবং সঙ্গে Electragol লাগাইয়া সারাইয়া দিয়াছিলেন। বিধানবাবু Benger's food এবং Pancreatin দিয়া মাকে প্রত্যহ সেড়সের দুধ হজম করাইতেন। মায়ের অসুখের সময়ই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত আমাদের পরিচয়।

বাড়িতে আসিবার কিছুদিন পরেই আমাদের কর্ণেল এণ্ডারসন আসিয়া পড়িলেন এবং আমাকে কর্ণেল অস্টিন স্মিথের নামে একটি চিঠি দিয়া বলিলেন 'তুমি এই চিঠি লইয়া নিজে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করো।' এ-কথা আগেই আমি লিখিয়াছি।

তাহার পর যাহা ঘটিল তাহা আমি লিখিয়াছি আমার 'নির্মোক' উপন্যাসের গোড়ার দিকে। সেখান হইতেই উদ্ধৃতি করিতেছি।

'পিতামাতার পদধূলি এবং দেবতার নির্মাল্য মাথায় ধারণ করিয়া কম্পিত বক্ষে বড় সাহেবের (কর্ণেল অস্টিন স্মিথ) দ্বারস্থ হইলাম। দ্বারে কিন্তু দারোয়ান ছিল। পেটি-পাগড়ি-লাগানো বেশ কায়দা দুরস্ত দারোয়ান। অগ্রাহ্য করা চলে না। তাহাকে বলিলাম যে আমি বড সাহেবের সহিত সাক্ষাত করিতে চাই। সে বার কয়েক আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর বলিল যে সাহেব এখন ব্যস্ত আছে। অপেক্ষা করিতে হইবে। অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সময় কিন্তু কাহারও জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে না। দেখিতে দেখিতে একটি ঘণ্টা কাটিয়া গেল। পা ব্যথা করিতে লাগিল। এবং অবশেষে নিরুপায় হইয়া নিকটস্থ বেঞ্চিটাতে সসঙ্কোচে উপবেশন করিলাম। শহুরে ছেলে হইলে আমার হয়ত এই সঙ্কোচটুকু থাকিত না। কিন্তু আমি পাড়া গাঁ হইতে আসিয়াছিলাম, কোথায় কি প্রকার আচরণ শোভন হইবে ঠিক জানা ছিল না। কাঠের বেঞ্চিতে বসিলে হয়ত বে-আইনী হইবে, এই ভয় ছিল। দারোয়ান কিন্তু কিছু বলিল না। বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইত জানি না, এমন সময় অনাদিবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। অনাদিবাবু আমাদের পূর্ব-পরিচিত লোক, এককালে আমাদের বাড়ির সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল।

'আরে তুমি হঠাৎ এখানে যে?' উঠিয়া গিয়া সমস্ত কথা তাহাকে বলিলাম। তিনিও বারকয়েক আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'এস আমার সঙ্গে, আমাদের বাড়ি কাছেই।'

'আমাকে যে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

'সেই জন্যেই তো বলছি, এস আমার সঙ্গে, সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

ভাবিলাম, হয়ত অনাদিবাবুর সঙ্গে আপিসের কাহারও সহিত আলাপ আছে এবং তিনিও হয়ত একটি সুপারিস-পত্র দিবেন। তাঁহার অনুগমন করিলাম। কিছু দূর গিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—'উঠলে কোথায়?'

'একটি হোটেলে।'

হোটেলের নাম ঠিকানা দিলাম।

'আমাদের বাড়িতে উঠলেই পারতে।'

'আপনি যে এখানে আছেন, তা তো জানতাম না।'

আমার দিকে সস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া অনাদিবাবু বলিলেন—'তুমি এই বেশে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, মাথা খারাপ নাকি তোমার। এই আধ-ময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবী আর তালি-লাগানো জুতো—মাই গড।'

অত্যন্ত চটিয়া গেলাম।

অনাদিবাবু হাসিয়া বলিলেন—'ভাগ্যিস আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে গেল, তা না হোলে হয়েছিল আর কি। এস, এই গলিটার ভিতর।'

গলির ভিতর ঢুকিয়া অনাদিবাবুর বাসায় উপনীত হইলাম।

অনাদিবাবু প্রথমে বাড়িতে ঢুকিয়া চাকরকে একটা নাপিত ডাকিতে বলিলেন এবং আমাকে বৈঠকখানার ঘরে বসাইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি বসিয়া তাঁহার বৈঠকখানা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। ভদ্রলোকের রুচি যে বেশ সুসজ্জিত তাহাতে সন্দেহ নেই। ঘরখানি ছোট কিন্তু চমৎকার সাজানো। প্রতিটি জিনিসে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। টেবিলের উপরে কাগজ চাপা দিবার ছোট প্রস্তর খণ্ডটি, দেওয়ালে টাঙানো ছবিখানি, কোণের শেলফে চমৎকার করিয়া সাজানো বইগুলি, তাহার উপর ছোট 'টাইমপিস'টি—সমস্তই সুন্দর।

এক পেয়ালা চা লইয়া অনাদিবাবু প্রবেশ করিলেন।

'যদিও এখন ঠিক চা খাবার সময় নয়, তৈরি হচ্ছিল যখন—' মৃদু হাসিয়া তিনি চায়ের পেয়ালাটি সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, 'চা-টা খেয়ে তুমি মাথার চুলগুলো কেটে ফেলো দিকি আগে, ওই যে নাপিতও এসে গেছে। ওরে, বাবুর চুলটা বেশ ভালো করে কেটে দে দিকি। বেশ দশ-আনা, ছ-আনা করে। নাও চা-টা খেয়ে নাও তুমি।'

বাল্যকাল হইতে যে আবহাওয়ায় মানুষ হইয়াছিলাম সে আবহাওয়ায় দশ-আনা ছ-আনা চুল কাটা চলিত না। অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে দশ-আনা, ছ-আনা চুলকাটা লোককে মেথর কিংবা গাড়োয়ান পর্যায়ে ফেলিতাম। অনাদিবাবুর কথায় একটু বিচলিত হইলাম। হঠাৎ চুল কাটিবার প্রস্তাবে কম বিস্মিত হই নাই। আমার মুখের ভাবে অনাদিবাবু কথাটা বুঝিতে পারিলেন বোধহয়। বলিলেন—'অমন নোংরা হয়ে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে কোট-প্যান্ট আছে?'

'না।'

'আছা, আমি সে সব ঠিক করে দিচ্ছি। অনিলের স্যুটটা তোমার গায়ে ফিট করবে হয়ত। দেখি—'

আবার তিনি ত্বরিতপদে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন। আমি চা-পান করিয়া দ্বিধাগ্রস্থ-চিত্তে ভাবিতেছিলাম ওই টেরিকাটা টিনের-বাক্স-হাতে ছোকরা নাপিতটার হাতে আত্মসমর্পণ করিব কিনা। এমন সময়, অনাদিবাবু একটি পত্র লইয়া পুনরায় প্রবেশ করিলেন।

বলিলেন—'ভাগ্যি তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—এই দেখ তোমার বাড়ির চিঠি এসেছে।'

দেখিলাম বাবা লিখিতেছেন যে, অনাদিবাবু যেন আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার সব বন্দোবস্ত করিয়া দেন। আমি মফঃস্বলের কলেজ হইতে পাশ করিয়াছি। বড় শহর সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। ছুটি পাইলে তিনি নিজেই সঙ্গে আসিতেন। কিন্তু কিছুতেই ছুটি পাওয়া গেল না। এদিকে

ভর্তি হইবার শেষ দিন আসন্ন হইয়া আসিতেছে। সেজন্য একাই পাঠাইতে হইল। অনাদিবাবু যে এখানে আছেন তাহা বাবা জানিতেন না। জানিলে আমার সঙ্গেই তিনি পত্র দিয়া অনাদিবাবুর শরণাপন্ন হইবার পরামর্শ দিতেন। নরেনবাবুর মুখে অনাদিবাবুর খবর লইয়া এই পত্র লিখিতেছেন। অনাদিবাবু যেন—ইত্যাদি।

অনাদিবাবু বলিলেন—চুলটা কেটে ফেল, দেরি কোর না। উঠিয়া গিয়া নাপিতের হস্তে মুণ্ডটি বাড়াইয়া দিলাম।

অনাদিবাবুর ভাই অনিলবাবুর স্যুটটা আমাকে ঠিক 'ফিট' করে নাই। অপরের জন্য যাহা প্রস্তুত, তাহা আমাকে ঠিক 'ফিট' করিবেই বা কেন। জামাটা একটু ঢিলা, আর প্যাণ্টালুনটা একটু আঁট হইল। অনাদিবাবু কিন্তু তাহাতে নিরুৎসাহ হইলেন না। আমার কলার এবং টাইটা স্বহস্তে বাঁধিয়া দিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিলেন এবং সোৎসাহে বলিলেন—'বা চমৎকার হয়েছে – ফেমাস্।'

সবচেয়ে মুশকিল হইল জুতা লইয়া। অনাদিবাবুর আগ্রহাতিশয্যে অনিলবাবুর জুতা জোড়াতেই পা ঢুকাইতে হইল।

'ফস্, ফস্ করছে নাকি?' ঠিক উলটা, ভয়নক আঁট হইয়াছে। তাহাই বলিলাম। অনাদিবাবু বলিলেন, 'ফিতেগুলি একটু আলগা করে দাও। হাঁটতে গেলে যদি লাগে একটা গাড়ী করেই না হয় চল। পাঁচ মিনিটের তো ব্যাপার। দেখাটা হয়ে গেলেই সব চুকে গেল।'

সত্য সত্যই গাড়ি করিয়া যাইতে হইল। অত আঁট জুতা পায়ে দিয়া বেশী দূরে হাঁটা সম্ভবপর ছিল না। স্যুটের সঙ্গে আমার তালি দেওয়া জুতা পরিয়া যাওয়া আরো অসম্ভব ছিল। সুতরাং গাড়িই একটা ডাকিতে হইল।

আফিসে গিয়া শুনিলাম সাহেব টিফিন খাইতেছেন। আধ-ঘণ্টা পর দেখা হইবে। অনাদিবাবু চাপরাসীকে আড়ালে ডাকিয়া প্রায় প্রকাশ্যভাবেই একটা টাকা বকশিস দিলেন। দেখা হইয়া গেল। বড় সাহেব তাহার বাল্যবন্ধুর চিঠি পড়িয়া প্রশ্ন করিলেন যে আমি দরখাস্ত করিয়াছি কিনা। বলিলাম করিয়াছি। সাহেব ঘণ্টা টিপিতেই, তাঁহার একজন সাহেব অ্যাসিস্টেণ্ট আসিয়া দাঁড়াইল। বড় সাহেব হুকুম করিলেন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইবার জন্য যতগুলি দরখাস্ত আসিয়াছে আনিয়া হাজির কর। ক্ষণপরেই তিনি একবোঝা দরখাস্ত আনিয়া হাজির করিলেন। সাহেব আমাকে বলিলেন, 'তোমার দরখাস্ত খুঁজিয়া বাহির কর।' দরখাস্ত খুঁজিয়া বাহির করিলাম। দেখিলাম যে আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল (পূর্ব-বর্ণিত কার সাহেব) আমার দরখাস্তের পাশে ছোট ছোট অক্ষরে অনেকখানি কি যেন লিখিয়াছেন। বাইবেল ক্লাসে কামাই করিতাম বলিয়া পাদ্রী প্রিন্সিপাল আমার উপর একটু চটা ছিলেন। ভয় হইতে লাগিল তিনি আমার বিরুদ্ধে যদি কিছু লিখিয়া থাকেন। সে ভয় কিন্তু অপনোদিত হইল। সাহেব হাসিয়া বলিলেন যে, প্রিন্সিপাল আমার খুব-সুখ্যাতি করিয়াছেন। পাদ্রি প্রিন্সিপালের বিচিত্র মতিগতি

কোনদিনই বুঝিতে পারি নাই। আজও পারিলাম না। সাহেব লাল পেন্সিল লইয়া আমার দরখাস্তের উপর গোটা গোটা অক্ষরে লিখিলেন—'সিলেকটেড'। ধন্যবাদ দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। আসিয়াই শুনিতে পাইলাম অনাদিবাবুর সহিত হেডক্লার্ক মহাশয় আলাপ করিতেছেন। ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়াতে তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন মনে হইল।'

উপরোক্ত অংশটুকু আমার উপন্যাস 'নির্মোক' হইতে উদ্ধৃতি তাহা আগেই লিখিয়াছি। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল তাহা নির্মোকে নাই।

আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়িতে বসিয়াছিলাম। কারণ, আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলাম যে সাহেব আমার দরখাস্তের উপর 'সিলেকটেড' লিখিয়াছেন। কিন্তু পনেরো দিন কাটিয়া যাওয়ার পর সাহেবের অফিস থেকে 'অফিসিয়াল' কোন পত্র আসিল না। আরও সাত-আটদিন অপেক্ষা করিলাম, তবু আসিল না। বাবা চিন্তিত হইলেন, আমিও হইলাম। কলিকাতা হইতে খবর আসিল যে ৫-ই জুন ভর্তি হইবার শেষ দিন। ব্যাকুল হইয়া শেষে অস্টিন স্মিথের নামে একটি প্রাইভেট চিঠি রেজিস্ট্রি করিয়া পাঠাইয়া দিলাম। তাহাতে লিখিয়া দিলাম আপনি আমাকে মেডিকেল কলেজে ভরতি হইবার জন্য নির্বাচন করিয়াছিলেন বলিয়া আমি অন্য কোথাও দরখাস্ত করি নাই। শুনিতেছি মেডিকেল কলেজে ভরতির শেষ দিন ৫-ই জুন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার অনুমোদন পত্র ৫-ই জুনের মধ্যে পাঠাইয়া দিবেন। সে পত্র ৩-রা জুন না পাইলে আমি কলিকাতায় ৫-ই জুন পৌছিতে পারিব না। আমি যেখানে থাকি সেখান হইতে কলিকাতা প্রায় একদিনের পথ। ১লা জুন পর্যন্ত কোন উত্তর আসিল না। ২রা জুন সন্ধ্যায় একটি প্রকাণ্ড টেলিগ্রাম পাইলাম। অফিসের নম্বর তারিখ দেওয়া একটি অফিসিয়াল টেলিগ্রাম। সেই টেলিগ্রাম লইয়া কলিকাতায় রওনা হইলাম। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অফিসে গিয়া আর এক বাধার সম্মুখীন হইতে হইল। সেদিন ভরতির শেষ দিন। তদানীন্তন হেডক্লার্ক বলিলেন—টেলিগ্রামে তো আই. জি. সাহেবের স্বহস্তের সই নাই। টেলিগ্রাম জাল হইতে পারে। আমি বলিলাম, আমি এই টেলিগ্রামই পাইয়াছি চিঠি পাই নাই। আপনি যদি ভরতি না করেন তবে এই টেলিগ্রামের পিঠে লিখিয়া দিন এই ছেলেটি ঠিক তারিখে এই টেলিগ্রাম লইয়া আসিয়াছিল কিন্তু আমি ভর্তি করি নাই। ক্লার্ক মহাশয় কিন্তু তাহাতেও রাজি হইলেন না। আমি কি করিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। আমার পাশেই আর একটি ছেলে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল আপনি প্রিন্সিপাল ডিয়ার সাহেবের কাছে যান। ভাগ্যক্রমে ডিয়ার সাহেব তখন অফিসের বারান্দা দিয়া যাইতেছিলেন, তাহাকে গিয়া ধরিলাম। তিনি টেলিগ্রাম দেখিলেন এবং অফিসে আসিয়া ক্লার্ক-কে বলিলেন 'Admit him'. ক্লার্ক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'Yes, Sir' ভরতি-পর্ব নির্বিঘ্নে শেষ হইল। কিন্তু তখন আমি বুঝি নাই, পরে বুঝিয়াছিলাম যে উক্ত ক্লার্কটি আমার একটি প্রচ্ছন্ন শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। পরে তিনি

আমাকে মহা বিপদে ফেলিয়াছিলেন। তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকা ঘুস দিয়া তবে উদ্ধার পাই। এ কাহিনী পরে যথাস্থানে বলিব।

কলিকাতায় আমি আসি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। প্রথমেই সমস্যায় পড়িলাম কোথায় থাকিব? তখন মেডিকেল কলেজে হোস্টেল ছিল না। ছাত্ররা মেসে থাকিত। ৩নং মির্জাপুর স্ট্রীটে আমাদের চেনা বিশুদা ছিলেন। তিনি সাহেবগঞ্জের পশুপতিবাবু ডাক্তারের বড় ছেলে। বিশুদার ছোট ভাই ডাক্তারী পড়িতেন। এবং তিনি ৩ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীট-এ থাকিতেন। তাঁহাদের আমার সমস্যার কথা বলিলাম। বিশুদা বলিলেন—আমাদের মেসে ১২ জন ছাত্র। তাহার মধ্যে তিনজন ছাত্র আগামী ছ মাসের মধ্যে ফাইনাল পরীক্ষা দিবে। একটা না একটা সীট খালি হইবেই। তুমি সুপারিনটেনডেণ্ডকে বলিয়া রাখো। তখন মেসগুলির তত্ত্বাবধান করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একজন করিয়া সুপারিনটেনডেণ্ড নিযুক্ত হইতেন। আমি বিশুদার কাছে একটি দরখাস্ত লিখিয়া দিয়া আসিলাম। বিশুদা আশ্বাস দিয়া বলিলেন, হইয়া যাইবে। যে ছাত্রটি ভরতির দিন আমাকে প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে যাইতে বলিয়াছিল, তাহার নাম শৈলেন সেন। পরে ওই শৈলেন সেনেই কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার শৈলেন সেন হইয়াছিলেন। শৈলেনের সঙ্গেই মেডিকেল কলেজে আমাব প্রথম ভাব। আমি দেহাতের ছেলে, শৈলেন শহরে। তাহার বাবাও ডাক্তার। সে-ই আমাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মেডিকেল কলেজ দেখাইল। সে-ই আবার আমাদের ফার্স্ট ইয়ারের রুটিন কি তাহাও বলিল। তাহার মুখেই শুনিলাম অ্যানাটমির লেকচারার পান সাহেব দিবেন। সকাল সাতটা হইতে আটটা পর্যন্ত হইবে। কলেজ সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া আমি সেওড়াফুলি চলিয়া গেলাম। সেখানে আমার বাবার মামা—আমার দাদামশায় বাস করিতেন। আর তাহার কাছে থাকিতেন তাঁহার দৌহিত্র শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়। তিনি তখন এম. এ. পড়িতেছেন। সব শুনিয়া দাদামশায় বলিলেন—'যতদিন না মেসে সীট পাওয়া যায় ততদিন তুমি এখান থেকেই ডেলি প্যাসেঞ্জারি কর। কানাই নিজের পড়াশুনার জন্য পাশেই ছোট একটা দোতলা ভাড়া করেছে। সেখানে তুমিও থাক। জায়গা যথেষ্ট আছে।' আমার বিহারে জন্ম। বাংলা দেশের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না। সেওড়াফুলি হইতে কলিকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করিতে করিতে আমার সে পরিচয় হইয়া গেল। নানা রকম বাঙালী দেখিলাম এবং মধ্যবিত্ত বাঙালী চরিত্রের আভাসও পাইলাম। যাহাদের প্রত্যহ দেখিতাম, তাহারা অধিকাংশই অফিস-গামী কেরাণী। ছাত্রও কিছু কিছু থাকিত। কিছু ব্যবসায়ী, কিছু ভিক্ষুক প্রত্যহ আমার সঙ্গী হইত। সমস্ত মিলাইয়া মনে সেদিন যে ছবি আঁকা হইয়াছিল তাহাতে নানা রং। স্বার্থপরতার রং, নীচুতার রং, কলহ-প্রবণতার রং, রসিকতার রং, ভাব-প্রবণতার রং, ছ্যাবলামির রং, অসভ্যতার রং, ভদ্রতার রং—অনেক রঙের বিচিত্র ছবি সেটি। এই ডেলি প্যাসেনজারদের একটি সমাজও গড়িয়া উঠিয়াছিল ট্রেনের মধ্যে। খুড়ো, জ্যাঠা, মামা, দাদা প্রভৃতি সম্বোধনে অনেকে অনেককে

ডাকিতেন। অনেকে অনেকের জন্য কোণের সীটটি রিজার্ভ করিয়া রাখিতেন। বেঞ্চির শেষ প্রান্তে এ বেঞ্চিতে দুইজন সামনের বেঞ্চিতে দুইজন বসিয়া এবং হাঁটুর উপর চাদর বা খবরকাগজ বিছাইয়া তাসও খেলিতেন। পরনিন্দা এবং পরচর্চার আমেজে কামরা অনেক সময় গুলজার হইয়া উঠিত। ফেরিওয়ালাদের নানারকম মজাদার ছড়াও ভালো লাগিত খুব। দাদের মলম, দাঁতের মাজন, চিরুণী-ফিতা, চানাচুর, সব রকম গাড়িতে উঠিত। অনেক ডেলি প্যাসেনজার ছোট ছোট কৌটায় বা সিগারেটের টিনে খাবার লইয়া যাইতেন। একজন ডেলি প্যাসেনজার একবার চাদরের বদলে একটা মশারী ঘাড়ে করিয়া আসিয়াছিলেন। ট্রেন ধরিবার তাড়ায় এমন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন যে চাদর আর মশারীর তফাত ঠিক করিতে পারেন নাই। ট্রেনে আর একটি জিনিশ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ট্রেনের টাইম সম্বন্ধে ডেলি প্যাসেনজারদের জ্ঞান নির্ভুল। অনেকের পকেটেই মান্থলি টিকিটের সঙ্গে পাতলা একটা টাইম টেবিল থাকিত। ৭টা ৩২ ফেল করিলে তাহার পর ৮-১২ পাওয়া যাইবে। বর্দ্ধমান লোকাল ঠিক সময়ে কোন্নগরে পৌঁছিল কি না—এ ধরনের আলোচনা প্রায়ই শুনিতে পাইতাম। ট্রেনে বইও ফেরি করিত ফেরিওয়ালা। কিন্তু তাহাদের ভাণ্ডারে প্রায়ই বাজে বই থাকিত। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের দেখা কচিৎ পাইতাম। একবার 'চাঁদমুখ' প্রণেতা একজন শরৎচন্দ্রের দেখা পাইয়াছিলাম। 'চাঁদমুখ' এককপি কিনিয়া ভুলটি ভাঙিয়াছিল। ডেলি-প্যাসেনজারদের মধ্যে কিন্তু নাটকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিল না। তাঁহারা বাড়ি হইতে ভালো বই আনিতেন। ডেলি-প্যাসেনজারদের মধ্যে প্রবীণ বয়সের একজন ডিকেন্স-পাঠককেও আবিষ্কার করিয়াছিলাম। তবে অধিকাংশ লোকই খবরের কাগজ পড়িতেন। সিনেমা পত্রিকাও অনেকের হাতে দেখিতাম।

আমি যখন মেডিকেল কলেজে ঢুকিলাম তখন কবি হিসাবে জনসমাজে আমার কিঞ্চিৎ পরিচিতি ঘটিয়াছে। 'প্রবাসী' 'ভারতী' পরিচারিকা' 'কল্লোল' প্রভৃতি কাগজে আমার কবিতা তখন প্রকাশিত হইয়াছে। কলেজের অনেক বাঙালী ছেলেরা এবং দু-একজন বাঙালী শিক্ষকও আমার লেখা পড়িয়াছেন। সুতরাং কলেজে আমাকে ঘিরিয়া একটা কৌতূহল অনেকের মনে জাগিল। অনেকে যাচিয়া আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিল। কিন্তু আমি একটু মুখচোরা প্রকৃতির ছিলাম। কাহারও সহিত বড় একটা আলাপ জমাইতে পারিতাম না। সোমনাথ সাহা নামক একটি ছেলের সহিত কিন্তু একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা হইল। সে বলিল যে 'ঝর্ণা' নাম দিয়া একটি পত্রিকা বাহির করিতে চায়। আমার একটি কবিতা চাই। কবিতা দিলাম তাহাকে। কিছুদিন পর 'ঝর্ণা' বাহির হইল। দেখিলাম আমার কবিতাটি ছাপা হইয়াছে। সে আরও বলিল, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত না কি কাগজটি দেখিয়াছেন এবং আমার কবিতাটি নাকি তাঁহার ভালো লাগিয়াছে। বলাবাহুল্য এ-সংবাদে খুবই উৎফুল্ল হইলাম। সোমনাথ বলিল সত্যেন্দ্রনাথ 'ঝর্ণা'-তে একটি কবিতা দিবেন বলিয়াছেন। তাঁহার সুবিখ্যাত 'ঝর্ণা' কবিতাটি সোমনাথের 'ঝর্ণা'-তেই প্রথম

প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ কবিতাটি পরে 'প্রবাসী' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। তখন 'প্রবাসী'-র কষ্টিপাথর বিভাগে ভালো ভালো লেখা পুনর্মুদ্রিত হইত। কাজি নজরুলের 'বল বীর চির উন্নত মম শির' কবিতাটিও প্রথমে আমি খণ্ডিত আকারে প্রবাসী পত্রিকায় কষ্টিপাথরেই পড়িয়াছিলাম। আমিও তখন কবিতা লিখিলেই প্রবাসীতে পাঠাইতাম, কিছু ছাপা হইত, কিছু ফেরত আসিত। মেডিকেল কলেজে এইভাবে আমার সাহিত্যচর্চা চলিতেছিল। আমি কবিতা লিখিয়া প্রায়ই কাহাকেও শুনাইতাম না। কেবল একটি ছেলেকে মাঝে মাঝে শুনাইতাম, কিন্তু এখন তাহার নামটি মনে পড়িতেছে না। বিস্মৃতির 'রবার' সর্বাগ্রে মানুষের নামটি স্মৃতি হইতে মুছিয়া দেয়। তাহার নামটি ভুলিয়াছি, কিন্তু আর সব মনে আছে। তাহার বাবাও একজন ডাক্তার ছিলেন। তাহার বাড়িতে আমি দুই-একবার গিয়াছিলাম। তাহার মা আমাকে যত্ন করিয়া খাবার খাওয়াইয়াছিলেন। মনে পড়িতেছে ভবানীপুরে তাহার বাড়ি ছিল। মেডিকেল কলেজে তিন বৎসর আমরা একসঙ্গে পড়িয়াছি। ফোর্থ-ইয়ারে তাহার টাইফয়েড হয়। সেকালে টাইফয়েড মারাত্মক অসুখ বলিয়া গণ্য হইত। কারণ তখনও ক্লোরোমাইসেটিন বাহির হয় নাই। টাইফয়েডেই মারা গেল সে। তাহার শ্রাদ্ধ বাসরে আমি গিয়াছিলাম। সে সময় একটি কবিতাও লিখিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। জানি না কবিতাটি তাহার বাড়িতে এখনও আছে কি না। কবিতার খানিকটা আমার এখনও মনে আছে।

আমাদের ফেলে গেছ তুমি চলে
গেছ কি গো সেই দেশে
উষার কনক কিরণ যেথায়
সন্ধ্যায় নামে এসে
ঘুমোয় যেথা ঝরা ফুলদল
অধরের হাসি নয়নের জল
জ্যোৎস্নার ধাবা হয় যেথা হারা
পূর্ণিমা নিশি শেষে

বিশ্বের ধন দু-দিনের লাগি
ছিলে আমাদের তীরে
কত সাধ-আশা স্নেহ-ভালোবাসা
গড়েছি তোমারে ঘিরে

ইহার পর আর ঠিক মনে পড়িতেছে না। যেটুকু লিখিলাম তাহাও হয়ত আসল কবিতার হুবহু প্রতিচ্ছবি হইল না। বিস্মৃতির কবল হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে পড়িল। কথাটা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু এখনই বলিয়া রাখা ভালো। পরে হয়ত ভুলিয়া যাইব।

আমরা যখন প্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন কাহারও প্রভাব অতিক্রম করিব এরূপ কোন সজ্ঞান চেষ্টা আমাদের ছিল না। আমরা যে যুগে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িতাম। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা পড়িতাম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রমোহন সেন, অনুরূপা দেবী, ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এবং আরো অনেক উদীয়মান কবির কবিতা সাগ্রহে পড়িতাম। ইহাদের সকলের প্রভাব নিশ্চয়ই আমাদের মনের উপর এবং লেখার উপর পড়িত। কিন্তু আমরা কখনও স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই যে এইসব মনীষীদের প্রভাব মুক্ত না হইতে পারিলে বড় সাহিত্যিক হইতে পারা যাইবে না। আমাদের প্রায় সমকালীন একদল সাহিত্যিকের মনে কিন্তু এ চিন্তা জাগিয়াছিল। তাঁহারা সর্বশক্তি ব্যয় করিয়া অরবীন্দ্রনাথ হইতে চেষ্টা করিতেন। পরে দেখা গিয়াছে তাহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তাঁহারা যেখানেই অরবীন্দ্রনাথ হইয়াছেন, সেখানেই উদ্ভট, হাস্যকর বা রসহীন হইয়া পড়িয়াছেন। দু-একজন লেখকের অরবীন্দ্রনাথ-অনন্যতার মধ্যে বিদেশী কন্‌টিনেন্‌টাল লেখকদের নির্লজ্জ নকলও দেখা গেল। হুবহু চুরিও ধরা পড়িল, দু-এক জায়গায়। আমার মনে এ ধরনের কোনও চিন্তা জাগে নাই তাহার কারণ আমার সাহিত্য-চর্চা কলিকাতার বাইরে শুরু হইয়াছিল। এ ধরনের হুজুগে মাতিয়া উঠিবার কোন সুযোগই আমি পাই নাই। যাহা যখন মনে হইয়াছে, লিখিয়াছি। এবং কাগজে পাঠাইয়া দিয়াছি। তাহার বেশী আর কিছু করিবার ইচ্ছা আমার হয় নাই। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল যুগ' লিখিয়াছেন। বইটি সুখপাঠ্য। কিন্তু আমার মনে হয় নামকরণে কিঞ্চিৎ ভুল হইয়াছে। নামটা হওয়া উচিত ছিল 'কল্লোল হুজুগ'। একটা স্বল্প-জীবী মাসিক পত্রিকা যুগান্তর আনিয়াছে এ কথা হাস্যকর। বাংলা সাহিত্যে এখনও রবীন্দ্রযুগ চলিতেছে। রবীন্দ্রযুগে এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগেও অনেক প্রতিভাবান সাহিত্যিকের অকপট সাহিত্য-সাধনা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সত্ত্বেও তাঁহারা নিজ নিজ স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উপরই কি কম লোকের প্রভাব পড়িয়াছিল? বিহারীলাল, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, শেক্সপীয়র, শেলী, কীটস্‌, ব্রাউনিং, বৈষ্ণব-পদাবলী, কালিদাস, বাউলসংগীত—কত নাম করিব। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ। তিনি কাহারও প্রভাব অতিক্রম করিবার চেষ্টা করেন নাই। কাহারও নকল করেন নাই। চেষ্টা করিয়া কেহ অনন্য হইতে পারে না। অনন্যতা অর্জন করা যায় না, ইহা বিধাতার দান।

এবার মেডিকেল কলেজের প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাক্‌। মেডিকেল কলেজে তখন সব প্রফেসারই সাহেব ছিলেন। কেবল অ্যানাটমি ও কেমিস্ট্রী ফিজিক্স্‌-এর প্রফেসর ছিলেন বাঙালী। অ্যানাটমির ছিলেন ডাক্তার ননীলাল পাল। কেমিস্ট্রি ও ফিজিক্সের প্রফেসারের নাম মনে নাই। অ্যানাটমির ডিমনস্ট্রেটাররা সবাই বাঙালী ছিলেন। নগেন চাটুজ্যে খুড়ো, (তাঁহার আসল নাম ভুলিয়াছি) ডক্টর দবীরাদ্দিন আমেদ, ডক্টর বসাক। জ্ঞানবাবু নামেও একজন ছিলেন বোধহয়। ফিজিওলজির

ভার চারুব্রত রায়, দুর্গাপদবাবু, অমূল্যরতন চক্রবর্তী প্রভৃতির কথা আজও ভুলি নাই। ফিজিওলজির প্রফেসর ছিলেন Shorten সাহেব। ইহাদের মধ্যে অনেকেই লেখক 'বনফুল'-এর সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং সে জন্য আমাকে স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের অনেকের স্নেহধারা আমার ছাত্রজীবনকে স্নিগ্ধ করিয়াছে, আমার উত্তরজীবনেও তাহা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ডাক্তার চারুব্রত রায়ের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। পরে তাহার নিকট আমি প্যাথলজির কাজ শিখিয়াছি। যথাস্থানে সে কথা বলিব।

কিছুদিন ডেলি-প্যাসেনজারি করিয়া আমি অবশেষে তিন নম্বর মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মেসে দ্বিতলে একটি সীট পাইলাম। সেখানে আমার সহপাঠী ননী সাহা, গৌর সাহা এবং হরেন ছিল। অবিলম্বে তাহাদের সহিত ভাব হইয়া গেল। ননীর সহিত ভাবটা বেশী হইল। তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমশঃ সে সকলের দাদা হইয়া গেল। ননী ক্রমশ গার্জেন হইয়া উঠিল আমার। আমার জামা-কাপড় ঠিক করিয়া রাখা, আমার বিছানার চাদর পাতিয়া দেওয়া, শেলফের বই গুছাইয়া দেওয়া, আমার ট্রাঙ্কে তালা থাকিত না বলিয়া আমাকে ভর্ৎসনা করা—আমাকে ভোরে উঠাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি···। বাড়ি হইতে টাকা আসিতে দেরী হইলে দাদাই আমার খরচ চালাইয়া দিত। আমি বরাবরই একটু কাছাখোলা, অগোছালো প্রকৃতির লোক। ভগবান কিন্তু বরাবরই আমাকে সামলাইবার জন্যে একজন না একজন লোক জুটাইয়া দিয়াছেন। যখন সাহেবগঞ্জের স্কুল-বোর্ডিংয়ে ছিলাম তখন ছিল মুন্সী নামে একটা চাকর। আমার প্রতি তাহার অহেতুক স্নেহ ছিল। স্নানের পর সব ছেলেরাই নিজেদের কাপড় নিজে কাচিয়া লইত। আমিও কাচিতাম। কিন্তু ঠিকমত কাচিতে পারিতাম না। কোন রকমে জলে ডুবাইয়া ভাল করিয়া না নিংড়াইয়া শুকাইতে দিতাম। মুন্সী দু-একদিন দেখিল তারপর বলিল, 'বুতুরু তু কাপড়া রাখি দ। হম খিচি দেবো।' সেই হইতে সে বরাবর আমার কাপড় কাচিত, বিছানা করিত। টেবিলটাও মাঝে মাঝে ঝাড়িয়া দিত। হাজারিবাগ কলেজ-হস্টেলে জুটিয়াছিল গোপা। সে আমার সব করিয়া দিত। মেডিকেল কলেজ মেসে দাদা আমার ভার লইল। দাদার সম্পর্কে আর একটি মজার ঘটনা মনে পড়িতেছে। দাদার যখন বিবাহ হইল আমরা অনেকে কুষ্টিয়ায় বরযাত্রী গেলাম। আমাদের সঙ্গে গেলেন খগেনদা। খগেনদার মত আমুদে সরল লোক বিরল। তিনি পরে মেজর কে. কে. ঘোষ হইয়া কর্ণনাশা কণ্ঠরোগ বিশারদ হিসাবে খ্যাতিমান হইয়াছিলেন। খগেনদার কিন্তু আরো নানারকম গুণ। তিনি ভালো গান গাইতে পারেন, গানে সুর দিতে পারেন, ফুটবল ও ক্রিকেট সম্বন্ধে চিরউৎসুক তিনি। চমৎকার প্রাণ খোলা লোক। খগেন দত্ত দাদার বিবাহে বরযাত্রী গেলেন। বিবাহ-বাসরে গিয়া দেখিলাম নববধূটি

দাদার দেহায়তনের তুলনায় খুবই ছোট। উচ্চতায় দাদার বুক পর্যন্ত পৌঁছায় না। আমি একটি কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম।

গাও আনন্দে গাও
দাদার মস্ত জীবনে একটা
এসেছে ছোট্ট ফাও
মোদের দাদার জীবনে মস্ত
এসেছেরে ফাও আড়াই হস্ত
তাইতেই ওগো দাদা যে ত্রস্ত
উৎসাহ তারে দাও।

খগেনদা এই গানের সুর দিলেন এবং পরদিন আমরা কুস্টিয়ার রাস্তায় এই গান গাহিতে গাহিতে একটা শোভাযাত্রা বাহির করিলাম। খগেনদার গলায় হার্মোনিয়ম ঝোলানো আর বাকি সকলের কণ্ঠে সমস্বরে এই গান। আর একটি গানও লিখিয়াছিলাম, চলিয়া আসিবার দিন বিদায়-সঙ্গীত। প্রথম ক'টা লাইন মনে আছে।

এবার তবে যাচ্ছি মশাই
নেহাত তবে যাচ্ছি এবার
দিয়েই গেলাম পা টুকুতে (মানে শ্রীচরণে)
যতটুকু কষ্ট দেবার।

বাকিটা মনে নাই। খগেনদার হয়ত আছে। তিনিই সভায় গানটি গাহিয়াছিলেন। দাদার বিবাহে খুবই আনন্দ করিয়াছিলাম আমরা। অনেক কিছু ভুলিয়া গিয়াছি। দুইটি জিনিস কিন্তু এখনও ভুলিতে পারি নাই। বিবাহের ভোজে টাটকা টাঁই মাছের যে চমৎকার ঝোল হইয়াছিল তাহার স্বাদটি এখনও মুখে লাগিয়া আছে। আর মনে আছে দাদার কিশোর বয়স্ক শ্যামবর্ণের ছটফটে ভাইটিকে। সে যে কতবার ছোটাছুটি করিয়া আমাদের ফাই-ফরমাস খাটিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাকে দেখিয়া বুধ-গ্রহের কথা মনে পড়িয়াছিল আমার। কিছুদিন আগে দাদা মারা গিয়াছে। তাহার সেই ভাইটি কোথায় আছে জানি না। কিছুদিন আগে বৈষ্ণবদের এক সভায় দাদার সহিত আমার শেষবার দেখা হয়। দাদা শেষে বৈষ্ণব ভক্ত হইয়াছিল।

মেডিকেল কলেজের আর একটি বন্ধুর কথা মনে পড়িল। সমরেশ ভট্টাচার্য। সে আমাদের মেসে থাকিত না। নিমতলা স্ট্রীটে তাহার বাড়ি ছিল। সে ছিল সেকালের সুবিখ্যাত ডাক্তার সুরেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। আমার সঙ্গে যখন তাহার আলাপ হয় তখন তাহার বাবা মারা গিয়াছেন। তাহার দাদা সমরেশ তখন সবে ডাক্তার হইয়াছেন। সমরেশের সঙ্গে আমার আলাপের সূত্র অবশ্য সাহিত্য। খুব রসগ্রাহী লোক ছিল সে। এখনও বাঁচিয়া আছে। পারত পক্ষে বাড়ির বাহির হইত না। শুনিয়াছি রোজ সকালে নিজে বাজার করে। তাহার সহিত আলাপের সূত্রপাত একটি কবিতার মাধ্যমে। কবিতাটি এই—

মোর নেশা হয় যদি লাল
আর সবুজ রঙের মন যদি পাই
গোলাপী রঙের গাল
আর হ'য়ে যদি কল্পনা মম
সাঁঝের সোনালি সাগরের সম
আমি খুলে দিতে পারি মনের তরণী
তুলে দিতে পারি পাল।

আরও খানিকটা ছিল, মনে পড়িতেছে না। এই কবিতাটা কোন কাগজে বাহির হইয়াছিল বোধহয়, কিংবা আমার মুখেই সমর হয়ত কবিতাটি শুনিয়াছিল। তখন আমার সব কবিতাই মুখস্থ থাকিত। মোট কথা এ কবিতাটা সমরের খুব ভালো লাগিয়াছিল। বোধহয় সে ইহাতে সুরও বসাইয়াছিল। তখন সে গান-বাজনার চর্চাও করিত। তিমিরবরণের সহিত ভাব ছিল তাহার। সমরই আমাকে তিমির-বরণের সহিত আলাপ করাইয়া দিয়াছিল। একটি রাত্রির কথা মনে হয় এখনও। সেদিন জ্যোৎস্না রাত্রি। সমরদের বাড়ির ছাদে বসিয়া তিমির বাঁশী বাজাইয়াছিল। তাহার পর তিমিরের সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় নাই। তবে সমরের বাড়িতে আমি প্রায়ই যাইতাম। তাহার মা খুব স্নেহময়ী ছিলেন। খুব যত্ন করিতেন। সমরের মত ধীমান ছেলে আমি বড একটা দেখি নাই। সে কখনও বই পড়িত না। আমরা জোরে জোরে পড়িতাম, সে চোখ বুজিয়া শুনিত। তাহাতেই সে পরীক্ষায় পাশ করিয়া যাইত। সে বড লোকের ছেলে ছিল। দামী দামী ডাক্তারী বই কিনিতে কখনও কার্পণ্য করে নাই। আমি সব বই কিনিতে পারিতাম না। তাই সমরের বাড়িতে গিয়া সেগুলি পডিতাম। আমি জোরে জোরে পড়িতাম। ঘরের একপাশে ছিল একটি বড় পালঙ্ক। আর একদিকে একটা গোল টেবিল। চেয়ারও ছিল খান দুই-তিন। আর ছিল একটি গ্রামোফোন। আর খান দুই রেকর্ড। একটি লাল চাঁদ বড়ালের—কাদের কূলের বউ গো তুমি, কাদের কূলের বউ। আর একটি বিশ্বনাথ রাওয়ের হর হর হর, বোম বোম বোম বামে শোভে গৌরী। আমরা যখন পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত হইয়া যাইতাম তখন এক-কাপ করিয়া চায়ের অর্ডার দেওয়া হইত। চা খাইতে খাইতে আমরা গ্রামোফোনে একটা রেকর্ড চাপাইয়া দিতাম। কখনও লাল চাঁদ, কখনও বিশ্বনাথ রাও। 'কাদের কূলের বউ' শেষ হইলেই—'হর হর হর, বোম বোম'—তাহার পর আবার, 'কাদের কূলের বউ' যতক্ষণ আমাদের পড়ার 'মুড' আবার ফিরিয়া না আসিত ততক্ষণ আমরা এই দুটি রেকর্ড বাজাইতাম।

এই সময় শিশির কুমার ভাদুড়ী আমাদের খুব অভিভূত করিয়াছিলেন। তাহার 'সীতা' আমাদের খুব মুগ্ধ করিয়াছিল। উপর্যুপরি ছয়-সাতবার বইটি দেখিয়াছিলাম, মনে পড়িতেছে। এই সময়ের আগে বা পরে পরিমল গোস্বামীর সহিত আমার পুনর্মিলন ঘটে। সে তখন বোধ হয় জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে থাকিয়া

এম. এ. পড়িত। মনে পড়িতেছে এই সময় তাহার সহিত আমি রবীন্দ্রনাথকে প্রথম প্রণাম করিয়া আসি। তিনি জোড়াসাঁকোর সুবিখ্যাত দক্ষিণের বারান্দার মাঝখানে বসিয়া ছিলেন। আর এক প্রান্তে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ আর একপ্রান্তে গগনেন্দ্রনাথ। বিরাট বারান্দা, তিনজন নিবিষ্ট চিত্তে কাজে মগ্ন। আমি রবীন্দ্রনাথকে গিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি দুই একটি কি কথা বলিয়াছিলেন মনে নাই। সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াই নাই, তিনজন তপস্বীর তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাইবার সাহস ছিল না।

পবিমল গোস্বামীর কথা বলিতেছিলাম। সে এ-সময় প্রায়ই আমার সঙ্গে জুটিয়া যাইত। তাহার সহিত অনেক থিয়েটার দেখিয়াছি। রাস্তায় রাস্তায় টো টো করিয়া বেড়াইয়াছি। মাঝে মাঝে সাহেবগঞ্জ হইতে প্রবোধদাও আসিতেন, প্রবোধদার কথা আগে বলিয়াছি। প্রবোধদার কোমল অন্তঃকরণ ছিল। তিনি দুঃখের গল্প পড়িতে পড়িতে কাঁদিয়া ফেলিতেন। একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। আমরা একবার ট্রেনে করিয়া কোথায় যেন যাইতেছিলাম। তখন শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' আট আনা সিরিজ-সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবোধদা একখণ্ড কিনিয়াছেন এবং ট্রেনে পড়িতে পড়িতে চলিয়াছেন। দেখিলাম ক্রমশঃ তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। অবশেষে গণ্ড বহিয়া অশ্রু-ধারা নামিতে লাগিল। তাহার পর তিনি যাহা করিলেন, তাহা অপ্রত্যাশিত। 'উঃ, আর পড়তে পারছি না', বলে চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়া সদ্য-কেনা বইটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। প্রবোধদা (প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) একটি অদ্ভুত সুন্দর চরিত্র। আদর্শবাদী, স্বদেশ-প্রেমিক, হঠাৎ চটিয়া যান, হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলেন, বন্ধুবৎসল বিদগ্ধ পুরুষ। তিনি এখন কোথায় আছেন জানি না। লিলুয়ায় বাড়ি করিয়াছিলেন। কিছুদিন আগে সেখানে চিঠি লিখিয়াছিলাম। উত্তর আসে নাই। বাঁচিয়া আছেন তো? সমরেশের বাড়ি যখন যাইতাম তখন আমি 'রূপকথা' নামে একটি নাটক লিখিয়াছিলাম। রূপক একটা। সমরেশের খুব ভালো লাগিয়া গেল। সে প্রস্তাব করিল—'চল এটা শিশির ভাদুড়ীকে শুনিয়ে আসি।'

'শিশির ভাদুড়ীকে পাব কোথায়?'

'চল না, থিয়েটার থেকে তাঁর বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করব—'

উভয়ে পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। বেলা তখন দশটা। রবিবার। কলেজ ছুটি। থিয়েটারে গিয়া তাঁহার বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করিল সমরেশ। মনে হইতেছে বাদুড়বাগানে তখন তিনি থাকিতেন। আমরা বাদুড়বাগানে গিয়া তাহার বাসাটাও বাহির করিলাম। বাসার সামনে ছোট বারান্দা ছিল, আমি তাহার উপর বসিয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সমর দুয়ারের কড়া নাড়িতে লাগিল। একটি খাঁকি হাফ-প্যান্ট-পরা কিশোর ছেলে কপাট খুলিয়া বলিল, 'বাবা বাড়ি নেই।'

'তুমি কে? আমরা শিশিরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'আমি তাঁর ছেলে, উনি সকালবেলায়ই বেরিয়ে গেছেন। এক্ষুণি ফিরবেন। দুপুরে এখানেই খাবেন, খেয়ে যান নি।'

এই বলিয়া সে কপাট বন্ধ করিয়া দিল। আমরা দু-জন বারান্দায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় আধ-ঘণ্টা পর একটা ঝরঝরে মোটর সামনে আসিয়া থামিল। সেই প্রথম শিশির ভাদুড়ীকে দেখিলাম, যিনি রাম-বেশে সজ্জিত নন। যাঁহার পরিধান আমাদেরই মত পাঞ্জাবী আর কাপড়। আগাইয়া গিয়া প্রণাম করিলাম।

'কে আপনারা ?'

আমি বলিলাম, 'আমরা দুইজনেই মেডিকেল কলেজের ছাত্র। আমি একটা ছোট নাটক লিখেছি। আপনাকে শোনাবার ইচ্ছা। শুনবেন কি ?'

'নিশ্চয় শুনবো।'

'কখন আসব তা-হলে ?'

'এখুনি শুনবো। আগে খেয়ে নিই। আপনারা খেয়ে এসেছেন তো ?'

'আমরা খেয়ে এসেছি।'

'তাহলে আসুন।'

ভিতরে গিয়ে দেখিলাম গামলায় তাঁহার ভাত ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। তাহার ছেলেই আসিয়া আসন পাতিয়া দিল, জল দিল, এবং ভাতের থালাটি তাঁহার সম্মুখে আগাইয়া দিল। অল্প সময়ের মধ্যে তাহার খাওয়া শেষ হইয়া গেল। আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'এইবার চলুন। থিয়েটারে যাওয়া যাক্। সেইখানেই আপনার নাটক শুনবো—।' গাড়িটি দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাতে চড়িয়া আমরা থিয়েটারে গেলাম। থিয়েটারের নামটা 'নাট্য-নিকেতন' না, 'নাট্য-মন্দির' তাহা ঠিক মনে নাই।

থিয়েটারের ভিতর গিয়া দেখিলাম একটি প্রকাণ্ড ঘরের এক-কোণে একটি খাটে বিছানা পাতা আছে। চেয়ারও ছিল কয়েকখানা। আমাদের বলিলেন—'আপনারা ওই চেয়ারে বসুন। আমি খাটে শুয়ে শুনবো।'

তিনি খাটে উঠিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া চোখ বুজিলেন।

'পড়ুন।'

আমি নাটক পড়িতে লাগিলাম। তিনি সর্বক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিলেন। আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হইতে লাগিল তিনি বোধহয় ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু আমি থামি নাই। পড়িয়া যাইতে লাগিলাম। 'ছোট নাটক' অল্পক্ষণেই পড়া শেষ হইয়া গেল। শেষ হইবামাত্র শিশিরবাবু বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

বলিলেন, 'নাটক খুব ভালো হয়েছে আপনার। আমার যদি পয়সা থাকত, আমি এটাকে মঞ্চস্থ করতাম। কিন্তু ঋণে আমার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে আছে, আমি পারব না।'

সমর বলিল, 'কত টাকা লাগবে ?'

'এক লক্ষ টাকা। উনি কল্পনার যে দৌড় দেখিয়েছেন স্টেজে সেটা ফুটিয়ে তুলতে গেলে ওর কমে হবে না। তবে আপনার নাটক লেখার হাত আছে, ছোটখাটো সামাজিক বিষয় নিয়ে কিংবা আরব্য-উপন্যাসের গল্প নিয়ে নাটক লিখুন। আমি অভিনয় করব।'

এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই কক্ষে আমাদের মাস্টারমশাই ফিজিওলজির ডেমন্‌সস্ট্রেটার ডাক্তার চারুব্রত রায় প্রবেশ করিলেন এবং শিশিরবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আমাকে ফোন করেছিলে কেন? আমি যা বলেছি, তা কোরছ?'

শিশিরবাবু যেন কেঁচোটি হইয়া গেলেন।

বলিলেন—'এইবার করব। লিভারের ব্যথাটা কমছে না।'

'মদ না ছাড়লে ও ব্যথা ছাড়বে না। ফোন করে আমাকে বিরক্ত কোর না। মানে যা বলেছি, তাই করো। তারপর আসব—'

বলিয়া তিনি গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমাদেব সহিত বাক্যালাপও করিলেন না। আমরা কয়েক মুহূর্ত হতবাক হইয়া বসিয়া রহিলাম, তাহার পর প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

পরদিন মাস্টারমশায়ের সহিত আবার দেখা হইল।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রশ্ন করিলেন—'শিশির ভাতুড়ীর কাছে গিয়েছিলে কেন?'

'আমি একটা নাটক লিখেছি। সেটাই ওকে শোনাতে গিয়েছিলাম।'

'আগে এম. বি. পাশ করে ডাক্তার হও, তারপর নাটক লিখো। এখন থেকে যদি শিশিরের কাছে যাও, আর তোমার টিকিটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

উজ্জ্বল উৎসাহের আগুনে মাস্টারমশায় ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিলেন। এম. বি. পাশ করিবার আগে আর নাটক লিখিবার চেষ্টা করি নাই। তাঁহার থিয়েটার অবশ্য দেখিতাম 'পীটে'র সিটে বসিয়া। তাঁহার অভিনীত প্রায় সব নাটকই বোধহয় দেখিয়াছি। অভিনেতা হিসেবে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। মাস্টার-মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রকৃত সম্পর্ক পরে জানিয়াছিলাম। মাস্টারমশাই শিশির ভাতুড়ীর প্রতিভাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। স্নেহ করিতেন খুব। উভয়েই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। মাস্টারমশাই কিন্তু সিনিয়র ছিলেন। শিশিরবাবু তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন এবং দাদার মতই শ্রদ্ধা করিতেন। তিনিই তাহার চিকিৎসক ছিলেন। বিপদে পড়িলে তাঁহাকেই ডাকিতেন। অনেকদিন পরের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। তখন আমি এম. বি. পাশ করিয়া মাস্টারমশায়ের নিকট ল্যাবরেটরি ট্রেনিং লইতেছিলাম। সেদিন সন্ধ্যা, আন্দাজ ৭টার সময় মেডিকেল কলেজের ফিজিওলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে আমি মাইক্রোস্কোপে একটি স্লাইড পরীক্ষা করিতেছিলাম। এমন সময় ফোনটা ঝনঝন করিয়া বাজিয়া উঠিল।

'হ্যালো, চারুবাবু আছেন ?'

'আছেন, উনি এখন স্নান করছেন, বাথরুমে ঢুকেছেন।'

'ওকে বলুন, এখখুনি যেন একবার আসেন, শিশিরবাবু রামের পার্ট প্লে করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেছেন, ড্রপ সিন ফেলে দেওয়া হয়েছে। অডিটোরিয়মে ভয়ানক হৈ-চৈ হচ্ছে।'

'বলছি, এখুনি।'

আমি বাথরুমের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া খবরটি মাস্টারমশায়কে দিলাম। মনে হইল অস্ফুট স্বরে কি যেন একটা বলিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'বলে দাও আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। ওকে যেন শুইয়ে রেখে দেয়।'

বাথরুম হইতে বাহির হইয়া মাস্টারমশাই আমাকে বলিলেন 'তুমিও আমার সঙ্গে চল। রাস্তায় গাড়ি থামাইয়া একটি বরফের slat (চাঙড়) কিনিয়া লইলেন। একটা ওষুধের দোকান হইতে কিছু ওষুধ কিনিলেন।

থিয়েটারে গিয়া আমরা সোজা গ্রীনরুমে ঢুকিয়া পড়িলাম। দেখিলাম একটি সোফায় রামবেশী শিশিরকুমার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন। চারুবাবু বরফগুলি ভাঙিয়া তাঁহার মাথায় চাপাইয়া দিলেন। তাহার পর বরফ শীতল জলে তোয়ালে ভিজাইয়া তাহা নিঙড়াইয়া তাহার মুখে জল দিতে লাগিলেন। অডিটোরিয়মে তুমুল চীৎকার চলিতেছে। একটু পরে শিশিরবাবুর জ্ঞান ফিরিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। শেষ পর্যন্ত আবার গিয়া সেই দিনই দর্শকদের অভিবাদনও না কি করিয়াছিলেন। আমরা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ছিলাম না। তাঁহার জ্ঞান হইবার পরই আমরা চলিয়া আসিলাম।

মেডিকেল কলেজে আরও তিনজন বন্ধুর কথা মনে পড়িল। অখিলদা (অখিলকৃষ্ণ দত্ত), ক্ষিতীশ সর্বাধিকারী এবং শিবদাস বসু মল্লিক। অখিলদা আমাদের অপেক্ষা অনেক সিনিয়র ছিলেন। আমরা যখন সেকেণ্ড-ইয়ারে তিনি তখন বোধহয় সিক্‌সথ ইয়ারে পড়িতেন। আমাদের অনেক আগে তিনি ডাক্তার হইয়া প্রাক্‌টিস আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন আমার কবিতা পড়িয়া। আমার যে সব কবিতা কাগজে বাহির হইয়াছিল, সেগুলি তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। একদিন হঠাৎ আসিয়া বলিলেন, 'তোমার কবিতার খাতাটা দেখি তো।' তখন আমার কোন কবিতার খাতা ছিল না। যে সব কবিতা ছাপা হইত, সেগুলিও সংগ্রহ করিয়া রাখিবার মত বৈষয়িক বুদ্ধি আমার ছিল না। মাসিক পত্রিকা হইতে ছিঁড়িয়া এলোমেলোভাবে সেগুলি আমার তোরঙ্গে রাখা থাকিত। তখনও স্যুটকেস জিনিসটা এত প্রচলিত হয় নাই, তোরঙ্গের উপরই আমাদের নির্ভর করিতে হইত। আমার খাতা নাই বলিয়া অখিলদা আশ্চর্য হইয়া গেলেন।

বলিলেন, 'তুমি কবিতা লেখ কিসে ?'

'কলেজের এক্‌সারসাইজ বুকে।'

অবাক হইয়া গেলেন অখিলদা। তাহার পর হাসিতে লাগিলেন। কথায় কথায় হাসিতেন তিনি।

কয়েকদিন পরে অখিলদা একটি মোটা বাঁধানো খাতা লইয়া হাজির হইলেন। চামড়া দিয়া বাঁধানো কাগজগুলি প্রায় আর্ট-পেপারের মত।

অখিলদা খাতাটি আমার হাতে দিয়ে বলিলেন, 'বলাই এটি তোমাকে দিলাম। এই খাতাতেই কবিতা লিখো।'

আমি অবাক হইয়া গেলাম। আনন্দ হইল খুব। আমার সাহিত্যজীবনে এইটেই প্রথম অকৃত্রিম স্নেহের উপহার। ভালো-মন্দ অনেক কবিতা লিখিয়া সে খাতা ভরাইয়া ফেলিলাম। কিন্তু সে খাতাটিও আমার কাছে রাখিতে পারি নাই। আমার বন্ধু শিবদাস বসু মল্লিকের যখন বিবাহ হয় তখন খাতাটি শিবদাসের স্ত্রী হাসিকে উপহার দিয়াছিলাম। হাসি এখন বৃদ্ধা হইয়াছে, কোথায় যেন ডাক্তারী করে। আমার সেই খাতাটি এখন তাহার কাছে আছে কিনা জানি না। শিবদাস বসু মল্লিক আমার মেডিকেল কলেজের জীবনে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাহার কথা পরে বিস্তৃতভাবে বলিব।

ক্ষিতীশ সর্বাধিকারার সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল একটু অদ্ভুতরকমে। একদিন ক্লাসে দেখি ঠিক আমার পিছনে বসিয়া একটি ছেলে আমার কবিতা আবৃত্তি করিতেছে। পিছন ফিরিয়া তাকাইলাম। দেখিলাম একটি চশমাপরা ছেলে আমার দিকে চাহিয়া আছে। মুখে দুষ্টুমি-ভরা হাসি। ক্ষিতিশের সহিত তখনই আলাপ হইল। আলাপ ক্রমশ বন্ধুত্বে পরিণত হইল। সে বন্ধুত্ব আজও অটুট আছে। যদিও তাহার কর্মস্থল মেদিনীপুর এবং আমার ভাগলপুর ছিল, তবুও মাঝে মাঝে পত্রালাপ হইত। মেদিনীপুরে একবার সাহিত্য-সম্মেলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি হই আমি। ক্ষিতিশের বাড়িতেই ছিলাম। তাহার ছেলেদের সঙ্গে এবং কন্যা দীপার সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল তখন। দীপা এখনও মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। ক্ষিতীশ অন্ধ হইয়া গিয়াছে। অমন একটা প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের চোখের আলো হঠাৎ নিবিয়া গিয়াছে একথা যেন কল্পনাও করা যায় না। প্রাণবন্ত লোক ছিল ক্ষিতীশ। জোরে জোরে কথা বলিত, হা হা করিয়া হাসিত। যে কোন হুজুগে মাতিবার জন্য পা বাড়াইয়া থাকিত। ক্ষিতীশ আমাকে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে মাংস রাঁধিতে শিখাইয়াছিল। সুযোগ পাইলে এখনও সেই পদ্ধতিতেই মাংস রাঁধি। সে পদ্ধতিতে আমি মাছ, এমনকি তরিতরকারীও রাঁধিয়াছি। খুব সুস্বাদু হয়।

এইবার শিবদাস বসুমল্লিকের কথা বলি। শিবদাস আমার মেডিকেল কলেজের জীবনের অনেকখানি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। ক্লাসে ঠিক আমার পরেই শিবদাসের নাম ছিল। কিন্তু ক্লাসে কোনদিন তাহাকে দেখি নাই। থিয়োরিটিকাল ক্লাসগুলিতে কেহ বোধ হয় তাহার হইয়া proxy দিত। প্রাকটিকাল ক্লাসেও তাহাকে কোনদিন দেখি নাই। আমার পাশের স্থানটা বরাবর খালিই থাকিত।

ফার্স্ট-ইয়ারের শেষে একদিন জুওলজি প্রাকটিকাল ক্লাস হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম ক্লাসের বাহিরে মাঠের উপর একটি মোটাসোটা ছেলে আমার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাহার পরনের কাপড় মালকোচা দেওয়া। ডান হাতে একটি বাইক ধরিয়া আছে। আমি মাঠে নাবিতেই সে আমার দিকে আগাইয়া আসিল এবং প্রশ্ন করিল 'আপনার নামই কি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়?'

বলিলাম, 'হ্যাঁ—।'

সঙ্গে সঙ্গে সে আমার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম আমি।

'আমার নাম শিবদাস বসু মল্লিক।'

'রোগ অব দি ফার্স্ট ওয়াটার' অদ্ভুত লোকটিকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম এবং তাহার হাসি দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্টও হইলাম। কলেজে তখন নীলমণির দোকানই আমাদের একমাত্র রেস্তরাঁ ছিল। সেখানে গিয়া উভয়ে চা-পান করিলাম, ডিমের মামলেট সহ।

'এতদিন কলেজে আসনি কেন?'

'আমি একটি আফিসে চাকরি করছি।'

'চাকরি? সে কি?'

'চাকরি না করলে আমরা গুষ্টিসুদ্ধ না খেয়ে মরব। দাদা এখন আমাদের বাড়িতে একমাত্র উপার্জনক্ষম লোক। তিনি অসুস্থ হয়ে চেঞ্জে গেছেন। হাফ-পে পান এখন। সে টাকা তাঁর চেঞ্জের খরচেই চলে যায়। আমি একটা আফিসে চাকরি করে সংসার চালাচ্ছি। তাই কলেজে আসতে পারি নি। অর্থাৎ আমি একটা চাম-চামাটু।'

বলিয়া সে হাসিল। তাহার হাসিটি অবর্ণনীয়। তাহাতে ব্যঙ্গ ও করুণ রসের সহিত এমন একটা বেপরোয়া নির্ভীকতার আমেজ ছিল যে আমি সত্যিই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। শিবদাস বলিল, 'আমি আসছে বছর পরীক্ষা দেব ঠিক করেছি। বইপত্র এখন কিছু নেই। পরে সে সব জোগাড় করতে হবে। দাদা যতদিন না ফিরে এসে কাজে জয়েন করছেন ততদিন কিছু হবে না। পরে আবার আপনার কাছে আসব। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন তো? আমাকে পড়িয়ে দিতে হবে। আমি বি. এস. সি. পাশ। আমাকে কেমিষ্ট্রি ফিজিকস্ দিতে হবে না, কিন্তু বায়োলজিটা দিতে হবে। সে সম্বন্ধে আপনার সাহায্য চাই—'

প্রতিশ্রুতি দিলাম সাহায্য করিব।

এই সূত্রে ক্রমশ তাহার সহিত আলাপ ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিল। সে মাঝে মাঝে আমার মেসে আসিত এবং পড়াশুনো করিত। বছর দুই-এর মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা অন্তরঙ্গতায় পরিণত হইল। তাহার চরিত্রের মহত্ত্ব, তাহার কর্তব্যনিষ্ঠা, কথাবার্তার মধ্যে তার নিজের সৃষ্ট অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দাবলী, তাহার হিউমার আমাকে

বড়ই মুগ্ধ করিত। এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে কিছুদিন মেস পরিত্যাগ করিয়া তাহার বাড়িতে পেইং-গেষ্ট হিসাবে বাস করিয়াছিলাম। ফলে তাহার পরিবারের সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। ঘনিষ্ঠতা না বলিয়া আত্মীয়তা বলাই উচিত। ভণ্টুর বাবা, দাদা, মেজদা, ছোট ভাই, ভণ্টুর বউ-দিদিরা, বিশেষ করিয়া বড বউদি, তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা সকলেই আমার পরম আত্মীয় হইয়া গেল। ইহাদের সুখ-দুঃখের সহিত আমি অনেকদিন ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত ছিলাম। এই সবের ছাপ আমার পরবর্তীকালে রচিত উপন্যাস 'জঙ্গম' বইটিতে আছে। 'জঙ্গমের' ভণ্টু চরিত্রের ভিত্তি শিবদাস। যদিও তাহাতে অনেক রং লাগাইয়াছি, তাহার জীবন চরিতের সহিত শিবদাসের জীবন চরিতের অনেক অমিল আছে, তবু ভণ্টু চরিত্রের কাঠামোটা শিবদাস বসু মল্লিকে'ই। তাহার পরিবারবর্গের অনেকের চিত্রও উক্ত উপন্যাসে আছে। কিন্তু সেগুলি বাস্তব-কল্পনায় মেশানো চিত্র, কোনটিই হুবহু ফটোগ্রাফ নহে। এই সময় পরিমল গোস্বামীও কলিকাতায় পডাশুনো করিত। সেও আমার ও শিবদাসের সহিত আসিয়া প্রায়ই জুটিত। শিবদাসের বাড়ি কিছুদিন থাকিবার পর আমি আবার চলিয়া আসিলাম। কারণ তাহারা অনেক সময় অনেক দূরে চলিয়া যাইত, আমার কলেজের ডিউটির অসুবিধা হইত। শিবদাস অবশ্য চেষ্টাব ত্রুটি করে নাই। আমি প্রত্যহ খুব ভোরে উঠিয়া চলিয়া আসিতাম। শিবদাস কিম্বা তাহার মেজদা আমার জন্য ডিমের তরকারি ও রুটি বা লুচি প্রত্যহ মেডিকেল কলেজে পৌঁছাইয়া দিত। তবু কিন্তু অসুবিধা হইতে লাগিল। আমি শেষে কলেজের কাছাকাছি একটা বোর্ডিংয়ে উঠিয়া আসিলাম। সেখানে পরিমল ও আমার সহপাঠী অমিয় সেনও ছিল। তিন-নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটে আমি আর সীট পাই নাই। কিন্তু ওই ইণ্টারন্যাশনাল বোর্ডিংয়েও আমার জীবন আনন্দময় ছিল। আমার সে সময়কার জীবনের কিছু সত্য ছবি পরিমল তাহার স্মৃতিচারণ গ্রন্থে দিয়াছে। তাহার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু বলিতে পারি যে যদিও তখন আমি কলিকাতা শহরে বাস করিতাম, কিন্তু আসলে আমি বাস করিতাম একটা আদর্শ স্বপ্নলোকে। যে স্বপ্নলোকে আমার প্রধান সঙ্গী ছিল, আনন্দ, আদর্শ এবং নির্ভীকতা। উৎকেন্দ্রিক গোছের হইয়া পড়িয়াছিলাম অনেকের কাছে। অনেকে বিস্মিত হইত, অনেকে মজার খোরাক পাইত। সে সময় আমার সাহিত্য-চর্চাও অব্যাহত ছিল। কবিতাই লিখিতাম। অধিকাংশই হাসির কবিতা বা ব্যঙ্গ কবিতা। নানা কাগজে প্রকাশিত হইত। বেশীর ভাগ 'প্রবাসী'তে। যতদূর মনে পড়িতেছে আমি যখন মেডিকেল কলেজে পডি তখনই আমার 'বিবাহের ব্যাকরণ' 'ছারপোকা' প্রভৃতি কবিতা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। সাল-তারিখ ঠিক মনে নাই। যখন মেডিকেল কলেজে পড়ি তখন কাজি নজরুল ইসলামের কাগজ 'বিজলী'-তে 'ফরমায়েসি প্রিয়া' কবিতাটি লিখিয়াছিলাম। পবিত্রদা আমার মেসে আসিয়া কবিতাটি লইয়া গিয়াছিলেন। তখন আমি তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটেই থাকিতাম।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে আছে। পবিত্রদা আসিয়া প্রথমেই আমাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। যেন কতকালের চেনা। পবিত্রদা কিছুদিন আগে মারা গিয়াছেন, যতদিন বাঁচিয়াছিলেন আমাকে ঠিক ছোট ভাই-এর মত স্নেহ করিতেন। প্রকৃত স্নেহ-পরায়ণ লোক ক্রমশ বিরল হইয়া পড়িতেছে।

মেডিকেল কলেজে থাকিবার সময়ই আমি ছোট-গল্প লিখিতে আরম্ভ করি। মেডিকেল কলেজে আমি অনেক সময় খালি ক্লাস-রুমে বসিয়া থাকিতাম। প্রকাণ্ড ঘরে নির্জন গ্যালারিতে বসিয়া থাকিতে খুব ভালো লাগিত। নির্জন পরিবেশ না হইলে আমি লিখিতে পারি না। মেডিকেল কলেজে খালি ক্লাসরুমগুলিতেই সেই নির্জনতা পাইতাম। একদিন 'বাড়তি-মাশুল' 'অজান্তে' প্রভৃতি চার-পাঁচটি গল্প একসঙ্গে লিখিয়া ফেলিলাম। লিখিবার পর মনে হইল এগুলি গল্প হইল তো? 'প্রবাসী'-তেই সব গল্পগুলি পাঠাইয়া দিলাম। সম্পাদক মহাশয়কে লিখিলাম—এগুলি ঠিক রসোত্তীর্ণ রচনা হইল কিনা বুঝিতে পারিতেছি না। রচনাগুলির নামকরণও করিতে পারি নাই। আপনাদের যদি ভালো লাগে এগুলির নামকরণ করিয়া 'প্রবাসী'-তে ছাপিবেন। আর ভাল যদি না লাগে ফেরত দিবেন, সঙ্গে টিকিট দিলাম। 'প্রবাসীতে' লেখা পাঠাইবার এই রীতি ছিল তখন। লেখা পাঠাইয়া প্রতীক্ষা করিতে হইত। তখন চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী'র সহ-সম্পাদক ছিলেন। কয়েকদিন পর তাহার একটি পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন—গল্পগুলি পছন্দ হইয়াছে। সবগুলিই 'প্রবাসী'-তে ছাঁপিব। আপনার ঠিকানা দেখিতেছি কলকাতায়। একদিন আমাদের অফিসে আসুন। বলাবাহুল্য খুব আনন্দ-চিত্তে গেলাম। চারুবাবু প্রত্যাশা করিয়াছিলেন কোন প্রৌঢ়-ব্যক্তি আসিবেন বোধহয়। আমার কম বয়স দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

'আপনার বয়স এত কম তা ভাবতে পারিনি। কি করেন আপনি?'

'আমি মেডিকেল কলেজের ছাত্র।'

'বাঃ বাঃ বসুন।

তাহার পর প্রশ্ন করিলেন আমি কি কি ইংরাজি গল্পের বই পড়ি। খুব বেশী পড়ি নাই। যাহা পড়িয়াছিলাম, বলিলাম। আমি তখনও কোন কন্‌টিনেন্‌টাল লেখকের বই পড়ি নাই শুনিয়া একটু আশ্চর্য হইলেন। বলিলেন ওগুলো একটু-আধটু পড়ে দেখবেন—ভালো লাগবে।

মেডিকেল কলেজে তখন আমাকে পাঠ্যপুস্তকগুলি লইয়া বিব্রত থাকিতে হইত। বাহিরের বই কচিৎ পড়িবার অবসর পাইতাম। সুযোগও তেমন ছিল না। মাঝে মাঝে পুরানো পুস্তকের দোকান হইতে দুই-একটা বই কিনিয়া পড়িয়াছিলাম। পুরানো পুস্তকের দোকানেই জর্জ বার্ণার্ডশ'-এর সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার মিসেস্ ওয়ারেনস প্রফেশন বইটি বড়ই ভালো লাগিয়াছিল। পুরাতন পুস্তকের দোকান হইতে মেটারলিংকের বইও কিনিয়াছিলাম। ব্লু-বার্ড মুগ্ধ

করিয়াছিল আমাকে। আর একটি পড়িয়াছিলাম বোধহয় 'ঘোনা ভানা।' সে সময় বেশী বাহিরের বই পড়িবার সময় পাইতাম না। মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় 'শনিবারের চিঠি'-র সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল। ঘটিয়াছিল এক অপ্রত্যাশিত জায়গায়। পানের দোকানে। একদিন একটি পানের দোকানে সিগারেট কিনিতে গিয়া দেখিলাম এককোণে কয়েকটি লম্বা-গোছের থাম রহিয়াছে। তাহার উপর ছাপা 'শনিবারের চিঠি।' দাম প্রতি-খণ্ড দুই আনা। একখণ্ড কিনিয়া লইলাম। পড়িয়া দেখিলাম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কাগজ। সব লেখকেরই ছদ্ম-নাম। অনেকের লেখার মুন্সীয়ানা এবং বৈদগ্ধ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তবু আমি তাহার পর আর 'শনিবারের চিঠি'-র খোঁজ করি নাই। সময়ের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। মেডিকেল কলেজের ক্লাস, ডিউটি এবং পড়াশুনা করিয়াই সময় চলিয়া যাইত। ইহার বেশ কিছুদিন পরে 'শনিবারের চিঠি'-র সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়া গেল, 'প্রবাসী' অফিসে। 'প্রবাসী'-তে আমার একটি কবিতা বাহির হইয়াছিল। 'সেই কপি'-টি আনিতে আমি 'প্রবাসী' অফিসে গিয়াছিলাম। সজনীকান্ত ভিতরে ছিল, বাহিরে আসিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া গেল এবং আলাপ করিল। অনুরোধ করিল আমি যেন তাহার 'শনিবারের চিঠি'র জন্য মাঝে মাঝে কিছু লিখি। তাহার সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলাম। যতদূর মনে পড়িতেছে তাঁহাকে এ-সময় গোটা দুই লেখা দিয়াছিলাম। 'কাঁচি' নামক একটি কবিতা আর একটা কি গল্প লেখা। নাম ঠিক মনে নাই। তাহার পর শনিবারের চিঠির সহিত অনেকদিন আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। অনেক পরে আবার সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। সে কথা পরে বলিব।

মেডিকেল কলেজের জীবনে আমার আর একটি পরম-প্রাপ্তির কথা এইখানেই বলি। সেটি ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরিচয়। তাঁহার সহিত পূর্বেই সামান্য পরিচয় ছিল, যখন তিনি কাটিহারে রেলওয়ে মেডিকেল অফিসার ছিলেন। আমাদের বাড়ি মণিহারী হইতে কাটিহার খুবই কাছে। আমার বাবা কখনও কখনও 'কন্‌সাল্ট' করিবার জন্য তাঁহাকে 'কল' দিতেন। সেই সময় মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিয়াছি। মেডিকেল কলেজে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইল, খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। আমার সহিত পূর্বপরিচয়ের জন্য হোক, কিংবা আমি লেখক বলিয়াই হোক, আমাকে কিছু আমল দিয়াছিলেন। আমি আমার লেখা তাঁহাকে দেখাইতে সাহস করি নাই। তিনি নিজেই একদিন বলিলেন, 'তোমার 'প্রবাসী'র কবিতাটা ভালো হয়েছে।' বনবিহারীবাবু প্রথমে মেডিকেল কলেজে সার্জিকাল আউটডোরে আসিয়াছিলেন, পরে সার্জিকাল রেজিস্টার হন। সেই সময় আমি তাহার সহকারী ছাত্র ছিলাম। সেই সময় আমি তাঁহার বাসাতেও দুই একবার গিয়াছি। তাহার প্রাক্‌টিস একেবারেই ছিল না। প্রাক্‌টিস করিতে হইলে যে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি থাকা প্রয়োজন সেইটারই অভাব ছিল তাঁহার। দুই-একটি রুগী জুটিলে টিকিত না। তিনি কাহারও সহিত দুর্ব্যবহার করিতেন না। কিন্তু প্রখরতা এত অধিক ছিল যে যে কোনও

রোগীর আত্মীয়স্বজনের কোনরূপ বেচাল তিনি সহ্য করিতেন না। তাহাদের হামবড়া-ভাব বা ডাক্তার, বিদ্যা ফলানোর চেষ্টা দেখিলেই তিনি মুখের উপর এমন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করিতেন যে লোকটা চুপ হইয়া যাইত। যাহাকে মোটা ফি দিয়া ডাকিয়াছি তিনি বিনীত লোক হইবেন ইহাই সকলে প্রত্যাশা করিত। কিন্তু বনবিহারীবাবু সে জাতীয় লোক ছিলেন না। তিনি নিজেকে বিজ্ঞাপিত করিতে চাহিতেন না। সুতরাং তাহার প্রাকৃটিস ছিল না। কিন্তু ডাক্তার হিসাবে তিনি প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার ছিলেন। মেডিকেল কলেজে নামকরা ছাত্র ছিলেন তিনি। শুধু ডাক্তারী জ্ঞান নয়, সাহিত্য জ্ঞানও তাঁহার গভীর ছিল। শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, ইংরাজি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের গভীরেও তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহলাভ করিয়া ধন্য হইয়া-ছিলাম আমি। মাঝে মাঝে যেদিন তিনি 'প্রাইভেট কল' পাইতেন সেদিন তিনি আমাদের সিনেমা দেখাইতেন, এবং হোটেলে খাওয়াইতেন। বলিতেন, খোঁজ কর কোন সিনেমায় কম ভীড় সেইখানেই যাব। এখানে ভালো সিনেমায় ভীড় হয় না। হোটেলে গিয়াও তিনি মেনুতে সেই খাবারগুলি বাছিয়া বাছিয়া দাগ দিতেন যেগুলি সাধারণতঃ লোকে খায় না। বলিতেনে, চপ, কাটলেট, রুটি, অমলেট তো সবাই খায়—অন্য জিনিস খেয়ে দেখ। মনে পড়িতেছে একবার কি একটা ষ্ট্যু লইয়া আমরা একটু বিপদে পড়িয়াছিলাম। চেহাবাটা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গেলাম সকলে। দেখিতে অনেকটা যেন বমিব মত। বনবিহারীবাবু ওয়েটারকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—এ ষ্ট্যু আর কাউকে খেতে দেখেছো তুমি? খেয়ে বেশ সুস্থ চিত্তে ফিরে গেছে? ওয়েটার বলিল—হ্যাঁ, ভালো জিনিস। আপনারা খান। খাইয়া খুব খারাপ লাগে নাই। বনবিহারীবাবুর সহিত তাঁহার বাসায় গিয়াছি কয়েকবার। তাঁহার মোটর ছিল না। বৈকালে তিনি হাঁটিয়া তাঁহার সহপাঠী ডাক্তার তুলসীচবণ ভট্টাচার্যের বাড়িতে যাইতেন। তাঁহাব বাড়ি ছিল রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রীটে। বনবিহারীবাবু তাঁহার বাড়ির সম্মুখে আসিয়া—'ও—' বলিয়া জোবে একটা চীৎকার করিতেন। বলিতেন—এই চীৎকারেই ও বেরিয়ে আসবে যদি বাড়িতে থাকে। বুঝবে আমি এসেছি। বনবিহারীবাবুর আর একজন বন্ধু ছিলেন অধ্যাপক চারু ভট্টাচার্য মহশয়। ইহারা 'বেপরোয়া' নামে একটি কাগজ বাহির করিতেন। কয়েকটি সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে বন-বিহারীবাবুর কয়েকটি উজ্জ্বল ব্যঙ্গ রচনা আছে। বনবিহারীর ব্যঙ্গ-রচনা ও তাঁহার আঁকা কার্টুনগুলি অপূর্ব। তাঁহার পূর্বে ডি. এল. রায় বঙ্গসাহিত্যকে সার্থক ব্যঙ্গ রচনা দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। সেগুলি তাঁহার রচনাবলীতে সুরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বনবিহারীবাবুর রচনাগুলি হারাইয়া গেল। নানা পত্রিকায় সেগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সেইগুলি একত্রিত করিয়া একটি গ্রন্থে নিবদ্ধ করিলে বাংলা সাহিত্য রসিকরা একটি অমূল্য সম্পদ পাইতেন। কিন্তু কেহই সে বিষয়ে উদ্যোগী নহেন। তাঁহার পুত্র বাঁচিয়া আছেন। তিনিই আইনত ইহা করিবার একমাত্র অধিকারী। কিন্তু তাহার এ-বিষয়ে উৎসাহ নাই। দুর্ভাগ্য!

ব্যঙ্গ সাহিত্য রচনার দিকে আমারও প্রবণতা অনেকদিন হইতে ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা হইতেই আমি বোধহয় প্রথম প্রেরণা পাই। তাহার পর বনবিহারীবাবু আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

বনবিহারীবাবুর কাছে আমার ঋণ অনেক। আগেই বলিয়াছি কিছুদিন আমি শিবদাসের বাড়িতে পেইং গেষ্ট হইয়াছিলাম। শিবদাসের মেজদা তখন ট্রেন-কনট্রোলার হইয়া শিয়ালদহে ছিলেন। চারতলার উপর তাঁহার বেশ বড় কোয়ার্টরস ছিল। আমরা সকলেই সেখানে থাকিতাম। সেই সময়ে বনবিহারীবাবুর সহিত শিবদাসেরও খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। বনবিহারীবাবু সে সময় একটা কথা বলিয়াছিলেন মনে আছে। বলিয়াছিলেন—তোমাদের দু-জনের মধ্যে একজন যদি স্ত্রীলোক হইতে, তাহলে তোমরা আদর্শ দম্পতি হইতে পারিতে। কিন্তু তোমাদের ভগবান তো ঠিক কাজটি কখনও করেন না।

শিবদাসের সহিত শিয়ালদহ স্টেশনের কোয়ার্টসে যখন ছিলাম সেই সময় একদিন চন্দ্রগ্রহণ হয়। শিবদাস ও আমি বাহির হইতেছিলাম, বউদিদি বলিলেন 'একটু পরেই গ্রহণ লাগবে, আমার রান্না হয়ে গেছে ; তোমরা খেয়ে বেরোও।'

আমরা যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক, আমরা কি সে কথা শুনি ? বলিলাম, 'আমরা গ্রহণের সময়ই খাব। তোমরা আগে খেয়ে নাও।'

আমরা বাহির হইয়া গেলাম। রাস্তাতেই দেখিতে পাইলাম চন্দ্রগ্রহণ শুরু হইয়া গিয়াছে। অনেক বাড়ি হইতে শাঁখ বাজিতেছে। হঠাৎ একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক শঙ্খধ্বনি শুনিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'What's happening ? What's this noise about ?'

শিবদাস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'Do you know what is happening in the moon ? Look up and see.'

'There is a shadow on the moon. I think it is eclipse.' আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম—'You are ignorant, that's why you are seeing a shadow. It is not shadow, it is Rahu who is swallowing the moon as the English power swallows India. But both will go away soon.'

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছোকরা আমার কথা শুনিয়া একটু ঘাবড়াইয়া গেল এবং কালবিলম্ব না করিয়া সরিয়া পড়িল।

আমরা যখন বাড়ি ফিরিলাম, তখন পূর্ণগ্রহণ। ছাদের উপর আকাশের নীচে বসিয়া বউদিদিকে বলিলাম—'আমাদের ভাত এখানেই দিয়ে যাও। গ্রহণ দেখতে দেখতে ভাত খাব।'

বউদি একটু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, 'এতোটা ভালো নয়।' কিন্তু আমাদের জেদাজেদিতে ছাদেই ভাত দিয়া গেলেন। আমরা রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের সম্মুখে বসিয়াই আহারাদি শেষ করিলাম। শিবদাসের কিছুই হইল না, কিন্তু আমার সেদিন রাত্রেই

খুব কম্প দিয়া জ্বর আসিল। আমি গুডিভ্ পরীক্ষা দিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু সে পরীক্ষা আমি আর দিতে পারি নাই। আমার মেডিকেল কলেজের জীবনে অসুখের জন্যে ঠিক সময়ে সব পরীক্ষা দিতে পারি নাই। Preliminary সায়েন্টিফিক এম. বি. পরীক্ষার সময় অর্থাৎ ফার্স্ট-ইয়ারের শেষে—আমি ঠিক সময়ে পরীক্ষা দিতে পারি নাই বাবার অসুখের জন্যে। বাবার অসুখের খবর পাইয়া আমাকে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। ছ-মাস পরে সে পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু irregular student হইয়া গেলাম। এই জন্যে কলেজের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে (অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি বিষয়ে) বসিবার অনুমতি পাই নাই। First M. B পরীক্ষা দিয়া regular student হইলাম। ঠিক করিলাম গুডিভ্ পরীক্ষা দিব। কিন্তু জ্বরে পড়িয়া গেলাম। পরীক্ষা দেওয়া হইল না। তিনদিন কুইনিয়ন খাইয়া যখন জ্বর ছাড়িল, তখন বনবিহারীবাবুকে খবর দিল শিবদাস। তিনি আসিয়া আমাকে পরীক্ষা করিলেন এবং বলিলেন লোবার নিউমোনিয়া হইয়াছে। বাবাকে খবর দেওয়া হইল। বাবা-মা দু-জনেই আসিয়া পড়িলেন। বনবিহারীবাবু আমাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিতেন। শ্যামবাজারের নিকট তাঁহার বাসা ছিল। সেখান হইতে হাঁটিয়া প্রত্যহ আসিতেন। ট্যাক্সি চড়িয়া আসিতেন না। বলিতেন—কয়েক মিনিট আগে এসে কিছু লাভ তো হবে না। মাঝখান থেকে কিছু পয়সা নষ্ট হবে তোমাদের। আমি রোজই সন্ধ্যায় হেঁটে বেড়াই। আমার কিছু কষ্ট হয় না। বনবিহারীবাবু আসিয়া অনেকক্ষণ আমার বিছানার পাশে বসিয়া থাকিতেন। তখন পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং নিউমোনিয়া তখন ভয়াবহ অসুখ ছিল। আমার অসুখও ক্রমশ বাড়িয়া উঠিল। ক্রমশ আমি জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলাম। একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। সেদিন আমি খুব প্রলাপ বকিতেছিলাম। আমার মনে হইতেছিল যেন একসারি লোক দাঁড়াইয়া আছে এবং আর একটি লোক একটা তরবারি দিয়া কচাকচ তাহাদের মুণ্ড কাটিয়া চলিয়াছে। তাহাদের কবন্ধ হইতে ফোয়ারার মত রক্তধারা বাহির হইতেছে। চতুর্দিকে ছিন্ন মুণ্ডের ছড়াছড়ি। আমি উত্তেজিত হইয়া বনবিহারীবাবুকে বলিতেছি 'স্যার, বসে বসে দেখছেন কি ? থানায় খবর দিন।' বনবিহারীবাবু ধীরকণ্ঠে বলিতেছেন—'তুমি ঘুমোও। চোখ বুজে চুপ করো, শুয়ে থাকো।'

'চোখের সামনে এতগুলো খুন হয়ে যাচ্ছে, আর আমি চুপ করে শুয়ে থাকবো! কি বলছেন আপনি স্যার ? আপনারা কেউ থানায় খবর না দেন তো আমি দেব।'

আমি বিছানা হইতে জোর করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বনবিহারী-বাবু এবং শিবদাস আমাকে জোর করিয়া বিছানায় শোয়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এইটুকু আমার মনে আছে। তাহার পরের ঘটনাটা পরে আমি বনবিহারীবাবুর মুখে শুনিয়াছি।

আমার বাবা খুব ঘাবড়াইয়া গেলেন। আমার মা পাশের ঘরে ঢুকিয়া ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলেন। বনবিহারীবাবু বলিলেন, 'আমার মনে হচ্ছে মরফিন্ ইন্‌জেকশন না দিলে এ ডিলিরিয়াম থামানো যাবে না। কিন্তু নিউমোনিয়া অসুখে মরফিন দেওয়া মানা। তাই আর একজন ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করতে চাই। আপনিও ডাক্তার, কিন্তু আপনার ছেলের অসুখ, তাই আপনার সঙ্গে কনসাল্ট করাটা ঠিক হবে না। পাড়ায় যদি অন্য কোন ডাক্তার থাকে তাকেই ডেকে আনুন।'

বাবা বলিলেন—'আমার পক্ষে তো এতো রাতে ডাক্তার খুঁজে বার করা শক্ত। এ-সব পাড়ার কোন খবরই আমি জানি না—'

শিবদাসের দাদা নারানদা বলিলেন—'আমি এ-পাড়ায় একজন ডাক্তারের বাসা চিনি। চলুন আমার সঙ্গে।'

বাবা ও নারানদা বাহির হইয়া গেলেন। মা পাশের ঘরে বসিয়া ঠাকুর ডাকিতেছিলেন, তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

বনবিহারীবাবুকে প্রশ্ন করিলেন, 'এদের কাউকে দেখছিনা। এরা কোথায় গেলেন এতো রাতে।'

'ওদের পাঠিয়েছি একজন ডাক্তারের কাছে। বলাইকে একটা ইন্‌জেক্‌শন্ দেওয়া দরকার। সেটা একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে দিতে চাই।' ইহার উত্তরে মা যাহা বলিলেন তাহা বনবিহারীবাবু প্রত্যাশা করেন নাই।

মা বলিলেন—আমার ঠাকুর বলেছেন তোর ছেলে ভালো হয়ে যাবে। আপনি যে ইন্‌জেক্‌শন্ দেবেন ঠিক করেছেন তা এখনি দিয়ে দিন। দেরী করে কি হবে। অন্য ডাক্তার কি আপনার চেয়ে ভালো ডাক্তার? আপনার উপর আমার খুব বিশ্বাস। যা করবার আপনিই করুন। এখনি ইন্‌জেক্‌শন্ দিয়ে দিন।'

বনবিহারীবাবুর ঠাকুরদেবতায় আস্থা ছিল না। কিন্তু মায়ের কথায় এমন একটা জোর পাইলেন যে ডাক্তার আসিবার পূর্বেই আমাকে ইন্‌জেক্‌শন্ দিয়া দিলেন। বনবিহারীবাবুর মুখেই ঘটনাটি শুনিয়াছি। আমার জ্বর ছাড়িয়া গেল বটে, কিন্তু দুই-তিন পর আবার রোজ সন্ধ্যায় কম্প দিয়া জ্বর আসিতে লাগিল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়-কে ডাকা হইল। তিনি আসিয়া আমাকে ভালো করিয়া দেখিলেন। অবশেষে বলিলেন 'প্লুরায়' নাকি পুঁজ জমিয়া আছে। পাঁজরের হাড় কাটিয়া পুঁজটি বাহির করিয়া দিতে হইবে। তিনি চলিয়া গেলে বনবিহারীবাবু বাবাকে বলিলেন 'এই সব মহারথী ডাক্তারদের পাল্লায় পড়িলে বলাই আর বাঁচিবে না। আপনি ওকে নিয়ে পালান। আপনার বাগান আছে। সেখানে একটা গাছের তলায় একটা চৌকি-পাতা বিছানা করে দেবেন। বলাই সকালবেলা আপনার ঘরের গাই-এর দুধ খেয়ে চলে যাবে। দুপুরে ভাত আর মুর্গীর ঝোল বাগানেই পাঠিয়ে দেবেন। ওষুধের মধ্যে কেবল কডলিভার অয়েল খাবে খাওয়ার পর। তারপর বিকালে বাড়িতে এসে জ্বরের জন্যে অপেক্ষা করবে। জ্বরের সময় দুধ-সাবু খেতে দেবেন। আমার বিশ্বাস এতেই জ্বর বন্ধ হয়ে

যাবে।' বাবা বনবিহারীবাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। আমাকে লইয়া মণিহারী চলিয়া গেলেন। আমাদের বাগানের মুক্ত বাতাসে কাঁচামিঠে আমগাছের তলায় বেশ একটি বড় চৌকির উপর আমার বিছানা পাতা হইল। আমি সকাল সাতটার মধ্যে একগ্লাস দুধ খাইয়া এবং সঙ্গে কিছু বই লইয়া সেখানে চলিয়া যাইতাম। আর শুইয়া শুইয়া কখনও ডাক্তারী বই, কখনও সাহিত্যের বই পড়িতাম। কাছে এক-কুঁজো জল ও একটি গ্লাস থাকিত। আর থাকিত একজন চাকর। উৎপাত ছিল কাঠ-পিঁপড়ার। গাছ হইতে সেগুলি বিছানায় পড়িত। আমার চাকরটি (ভাগিয়া ছিল নাম) একদিন একটা ঝাঁটা লইয়া আসিল এবং সমস্ত পিঁপড়াকে ঝাঁটা পেটা করিয়া বিদায় করিল। গাছে পিঁপড়াদের বাসা ছিল। ভাগিয়া বাসাগুলিও বিধ্বস্ত করিল। দুই-তিনদিন জেহাদ ঘোষণার ফলে পিঁপড়ারা আর আমার কাছে আসিত না।

মুরগীর ব্যাপার লইয়া একটু গোলযোগ ঘটিয়াছিল। মা খুব নিষ্ঠাবতী ছিলেন। প্রথম দুই-একদিন আমাদের পশ্চিম-বারন্দায় একটা তোলা-উনুনে আমাদেরই একটা মুসলমান চাকর মুরগী রান্না করিয়া দিত। কিন্তু মা লক্ষ্য করিলেন ইহা ঠিক রোগীর পথ্য হইতেছে না, মশলা-গরগরে কালিয়া হইতেছে। মা তখন নিজেই রাঁধিবেন স্থির করিলেন। কম মশলা দেওয়া পাতলা মুরগীর ঝোলে নতুন রকম স্বাদ পাইলাম। মুরগী রাঁধিয়া মা স্নান করিতেন। আমার খাওয়ার জন্য এক সেট বাসন তিনি আলাদা করিয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি ভাগিয়া মাজিয়া আলাদা একটি তাকে রাখিয়া দিত। এখন যুগ বদলাইয়াছে। এখন হিন্দুর বাড়িতে মুরগী নিজের অধিকার জারি করিয়াছে। এখন মুরগী আর অচ্ছুৎ নয়। কয়েকটা গোঁড়া লোক অবশ্য থাকিবেই। এখনও আছে। তাহাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা বাইরে মুরগী খাইয়া আসে। ইহাতে অভিভাবকেরা আপত্তি করেন না। ঘরের হাঁড়ির জাত তাঁহারা বাঁচাইয়া চলিতেছেন।

প্রায় মাসখানেক পরে আমি বিজ্বর হইলাম। বনবিহারীবাবুকে চিঠি লেখা হইল। এখন কি করা হইবে? আর একটি মুশকিল হইতেছে, রোজ মুরগী পাওয়া যাইতেছে না। মণিহারীতে তখন মাংস বা মুরগীর দোকান ছিল না। বাবার চেনাশোনা মুসলমান রোগীরাই প্রত্যহ মুরগী আনিত। বনবিহারীবাবু উত্তর দিলেন, বলাই আরও তিনমাস ওখানেই থাকুক। এখন কলিকাতায় আসিবার দরকার নাই। মুরগীর বদলে পায়রার বাচ্চা, মাগুরমাছ বা কচিপাঠা চলিতে পারে। প্রতিদিন অন্তত একসের করিয়া দুধ খাওয়া চাই। কড্‌লিভার অয়েলও চলিবে।

বনবিহারীবাবুর নির্দেশ মান্য করিয়া আমি বেশ মোটা হইয়া গেলাম। ভুঁড়ি হইয়া গেল।

তিনমাস কামাই করিবার ফলে আমি অনেক পিছাইয়া গেলাম। কলিকাতায় আসিয়া আর শিবদাসের বাড়িতে গেলাম না। বাবা মত করিলেন না। তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসেও আর স্থান পাইলাম না। একটু মুশকিলে পড়িয়া গেলাম।

শুনিলাম বহুবাজার স্ট্রীটে 'ডায়মণ্ড বোর্ডিং হাউস' বলিয়া একটি ভালো বোর্ডিং আছে। সেখানে গিয়া ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিলাম। খুব ভদ্রলোক। নামটা মনে পড়িতেছে না। তিনি বলিলেন, চারতলার উপর একটি ঘর খালি আছে। সে ঘরটা আমাকে তিনি দিতে পারেন। ভাড়া মাসিক কুড়ি টাকা। আমি বোর্ডিং-এ একবেলা খাইয়া দেখিলাম। মোটা সেদ্ধ-চালের ভাত। অত্যন্ত পাতলা ডাল, চচ্চড়ি গোছের একটা ঘ্যাঁট। মাছের ঝোলে খুব ক্ষীণকায় দুটি মাছের টুকরো এবং অম্বল। এ খাওয়া পছন্দ হইল না। ম্যানেজারকে বলিলাম—আমি ঘরটি ভাড়া লইব কিন্তু বোর্ডিংএ খাইব না। নিজে ইক্‌মিক্ কুকারে রাঁধিয়া খাইব। আপনাদের চাকরটি যদি আমাকে সাহায্য করে তবে তাহাকে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিব। আমার প্রস্তাবে ম্যানেজারবাবু রাজি হইলেন। আমি একটি ছোট ইক্‌মিক্ কুকার বসাইবার জন্যে একটি ছোট stand এবং একটি টেবিল কিনিয়া ফেলিলাম। ম্যানেজারবাবু একটি চেয়ার এবং একটি চৌকি আমাকে দিলেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ইক্‌মিকে ভাত এবং মাংস সুসিদ্ধ হতে প্রায় দুই-ঘণ্টা সময় এবং তিন আউন্স কেরাসিন তেল লাগে। বোর্ডিং-য়ের চাকর রোজ মাংস, তরিতরকারী কিনিয়া আনিত। সের পাঁচেক ভালো চালও আমি কিনিয়া আনিলাম। কিছু গুঁড়া-মশলা, ঘি, তেল, একটি ছোট কড়া, খুনতি এবং একটি ছোট প্রাইমাস স্টোভও কিনিলাম। স্টোভে মশলা ভাজিয়া দধিসহযোগে মাংসটা কিঞ্চিৎ 'কষিয়া' লইয়া তাহার পর ইক্‌মিকে চড়াইতাম। ভোরে সাতটার আগেই ইক্‌মিক্ ঠিক করিয়া জুয়েল-ল্যাম্পে সাড়ে-তিন আউন্স তেল দিয়া ল্যাম্পটি জ্বালিয়া ইক্‌মিক্ চড়াইয়া কলেজে চলিয়া যাইতাম। কলেজে নীলমণির ক্যান্‌টিনে প্রাতরাশ সমাপন করিয়া বড় আনন্দ হইত। অমন 'ডবল-ডিমের' ওম্‌লেট্ আর কোথাও খাই নাই। ওম্‌লেট্, দু-টুকরো পাউরুটি, পুডিং এবং চা—এই ছিল আমার প্রাতরাশ। কখনও পুডিং-এর বদলে কেক্ খাইতাম। নীলমণির পুডিংও চমৎকার ছিল। তারপর ওয়ার্ডে যাইতাম। বোর্ডিংয়ে ফিরিতাম বেলা বারোটা নাগাদ। দেখিতাম জুয়েল ল্যাম্পের আলো নিবিয়া গিয়াছে। ইক্‌মিকে গরম মাংস, ভাত প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

সে সময়ে ওয়ার্ডে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করিবার ছিল না। মাঝে মাঝে ইমার্জেন্সি ডিউটি এবং নাইট ডিউটি অবশ্য থাকিত।

সার্জারি (Surgery) পড়িতে গিয়া Anatomy প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। মনে হইল Anatomyটা আর একবার পড়িয়া লইলে মন্দ হয় না। Anatomyর প্রফেসার ডাঃ ননীলাল পাল এবং অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর ডাঃ নগেন চ্যাটুজ্যে আমাকে স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের গিয়া বলিলাম এখন Body অর্থাৎ ডিসেক্‌শন্ করিবার জন্য মড়া পাওয়া যাইবে কি না। যদি যায় তবে আমি আবার Anatomyটা পড়িয়া ফেলিব। তাঁহারা বলিলেন—কলেজে ৪০্ জমা দিলে একটা Body তাঁহারা দিতে পারিবেন। আমাদের কলেজে তখন নিয়ম ছিল ৪০্ জমা দিলে যে কোনও বিষয়

আবার পড়া যায়। তাহাই করিলাম—৪০ জমা দিয়া দিলাম। কয়েকদিনের মধ্যে নগেনবাবু একটা মড়াও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তখন ক্লাস নাই। Anatomy Hall খালি। আমার জন্যে Prosector's Room এ 'বডি' দেওয়া হইল। আমি সময় পাইলেই সেখানে গিয়া ডিসেকশন্ করিতাম। কারণ অ্যানাটমি ক্লাস আরম্ভ হইবার পূর্বেই আমাকে ডিসেক্‌শন্ শেষ করিতে হইবে। সেজন্যে সন্ধ্যার পর গিয়াও অনেক সময় ডিসেক্‌শন করিতে হইত। মুন্না ডোম আমাকে খুব সাহায্য করিত। অ্যানাটমি হলের বাহিরেব বারান্দায় থাকিত সে, তাহাকে ডাকিলেই সাড়া পাওয়া যায়। একদিন একটু বিপদে পড়িলাম। রাতে ডিসেক্‌শন্ করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিক বাতিটা নিবিয়া গেল। আমি কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া ডাক দিলাম—মুন্না। কাহারও সাড়াশব্দ নাই। আবার ডাকিলাম—মুন্না। মুন্না সাড়া দিল না। একটু পরে খস্‌খস্ শব্দ শোনা গেল। প্রোসেক্টর রুমের দরজাটা ক্যাঁক্ করিয়া খুলিয়া গেল। সর্বাঙ্গ একবার শিউরিয়া উঠিল। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম—যে হও, কাছে এলেই ছুরি বসিয়ে দেব। হাতে আমার ছুরি আছে। সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলিয়া উঠিল। দ্বারপ্রান্তে দেখিলাম সমরেশ ভট্টাচার্য ও আর একজন কে। ইহার নামটা মনে নাই। আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছিল। নিজেরাই অপ্রস্তুত হইয়া গেল।

অনেক তাড়াতাড়ি করিয়াও কিন্তু ডিসেক্‌শন্ শেষ করিতে পারি নাই। থোরাক্স্ (Thorax), অ্যাবডোমেন (Abdomen) বাকি রহিয়া গেল। মানে বুক আর পেট। তখন আমি একটি দুঃসাহসিক কাজ করিলাম। শুধু দুঃসাহসিক নহে, বেআইনীও, আমি Heart, Lungs, Liver, Spleen এবং Kidney কাটিয়া একটি বড় হাঁড়িতে পুড়িয়া Formalin-এ ভিজাইয়া দিলাম। Thorax, Abdomen মোটা কাগজে জড়াইয়া একটি ট্রাঙ্কে পুরিয়া ফেলিলাম এবং সমস্তটাই লইয়া গেলাম Diamond Boarding-এ আমার সেই চারতলার ঘরটিতে। বোর্ডিংয়ের কাহাকেও খবরটা জানাইলাম না। বোর্ডিংবাসীরা আমার ঘরে কেহই প্রায় আসিতেন না। দুপুরে তাঁহারা সকলে বাহির হইয়া যাইতেন, আমি একা ঘরে খিল দিয়া ডিসেক্‌শন্ করিতাম। আমি ঘরে যে মড়া লইয়া বাস করিতেছি তাহা অবশ্য আমার বন্ধুবান্ধবরা —শিবদাস এবং সমরেশ জানিত। ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ও জানিতেন। শিবদাস আমার ঘরটির নাম দিয়েছিল Devil's den. সে ঘরে আমার পড়িবার টেবিল ছিল, সেই টেবিলে ইক্‌মিকের stand-এর তলায় জুয়েল-ল্যাম্প জ্বলিত। সেই ল্যাম্পেও আমার রাত্রের রান্নাও হইত। লেখাপড়াও চলিত। সে সময় মাঝে মাঝে কবিতা বা ছোট গল্প লিখিতাম। কোথায় কখন লিখিতাম ভালো করিয়া মনে নাই। প্রতি লেখাই প্রথমে 'প্রবাসী'তে পাঠাইতাম। প্রবাসী না ছাপিলে অন্যত্র দিতাম। আমি যখন মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে থাকিতাম তখন মনোজ বসু (বিখ্যাত লেখক তখন) আমার মেসে 'বঙ্গলক্ষ্মী' কাগজের জন্যে লেখা চাহিতে

আসিত। তখন সে বোধ হয় কোথাও শিক্ষকতা করিত। তখন 'বঙ্গলক্ষ্মী' কাগজে মাঝে মাঝে লিখিয়াছি। আমার সেই Devil's den ঘরটিতে সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে আড্ডা বসিত। বনবিহারীবাবুও তাহাতে যোগ দিতেন। আনন্দের স্রোত বহিত। এইরূপ কোন একটা আড্ডায় একদিন Tragedy ও Comedy লইয়া আলোচনা শুরু হইয়া গেল। আমি বলিলাম, একই গল্পে Tragic বা Comic হইতে পারে। বনবিহারীবাবু বলিলেন, 'আলিবাবা' নাটকটি কি Tragedy করা সম্ভব? আমি বললাম—আমার মনে হয় সম্ভব। বনবিহারীবাবু বলিলেন—সম্ভব বললে হবে না। হাতেকলমে করে দেখিয়ে দাও। সেই সময় 'আলিবাবা' গল্পটা লইয়া 'রূপান্তর' নাটকটি লিখিয়াছিলাম। মাস্টারমশাই (বনবিহারীবাবু) খুশী হইয়াছিলেন। এটা সংশোধন করিয়া পরে কোথাও প্রকাশিত হইয়াছিল। ঠিক কোথায় তাহা এখন মনে নাই। 'মিত্র ও ঘোষ' পরে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

'ডায়মণ্ড বোর্ডিং'য়েও আমার ডিসেক্‌শন্ শেষ হইল না। মণিহারী হইতে চিঠি পাইলাম, বাবা অসুস্থ। আমি যেন শীঘ্র বাড়ি চলিয়া যাই। মড়ার যে অংশটুকু ডিসেক্‌শন্ করিয়াছিলাম abdomen এবং ভিসেরাগুলি (Visara—লাংস, হার্ট, লিভার, পিলে, কিডনি) সেগুলিকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া আসিলাম। একটা কাঠের বাক্সে পুরিয়া লইয়া গেলাম। কোনও অসুবিধা হইল না। Thorax-এর কিছুটা বাকি ছিল। সেটাকে ট্রাংকে পুরিয়া মণিহারী লইয়া গেলাম। আমাদের আম-বাগানে বসিয়া ডিসেক্‌শন্ শেষ করিলাম এবং শেষ করিয়া সেটিকেও মণিহারার গঙ্গায় বিসর্জন দিলাম।

বাবার রোজ জ্বর হইতেছিল। প্রচুর কুইনাইন খাইয়া জ্বর কিছু কমিয়াছিল বটে কিন্তু রোজ সন্ধ্যা নাগাদ ৯৯° ডিগ্রী, কোনদিন ১০০ ডিগ্রী উঠিত। কাটিহার হইতে রেলওয়ে মেডিকেল অফিসার আসিয়া তাহাকে দেখিলেন, পূর্ণিয়া হইতে সিভিল সার্জন একদিন আসিলেন। তাঁহাদের চিকিৎসা কিছুদিন চলিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। শেষে ঠিক হইল বাবাকে কলিকাতায় আনিতে হইবে। শেওড়াফুলি বাবার মামাবাড়ি। সেখানেই প্রথমে আমরা গেলাম। তাহার পর কলিকাতায় একটি বাসা ভাড়া করা হইল। সরকার বাই লেন-এ। বাবাকে সেখানে আনিয়া প্রথমে ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখানো হইল। তাঁহারই পরামর্শমত দিনকতক চিকিৎসা চলিল। তিনিই শেষে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এবং ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীকে লইয়া আসিলেন। তাঁহারা বলিলেন—ইহা মেলেরিয়া এবং কালাজ্বরের সংমিশ্রণজাত অসুখ। রক্ত পরীক্ষা করিয়া কিন্তু কালাজ্বরের Test গুলি Negative হইল। তবু ধীরেনবাবু সপ্তাহে একটি করিয়া Sodium Antimony tartarate ইন্‌জেক্‌শন্ দিতে লাগিলেন। পথ্যের সম্বন্ধে খুব ধরাকাট করিলেন তিনি। বাবাকে মাগুর মাছের ঝোল এবং অতি পুরাতন চালের ভাত দেওয়া হইতে লাগিল।

জলখাবার দুধ-সাবু, খই। ধীরেনবাবু ঘিয়ের খাবার দিতে একেবারে বারণ করিয়া দিলেন। বলিলেন, 'কালাজ্বরে যদি পেট ভাঙে আর বাঁচানো যাইবে না। বাবা কিন্তু অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তিনি বরাবর খাদ্যরসিক, ওই উরস্থনি ঝোল-ভাত বেশীদিন তিনি বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। জ্বর একটু কমিল বটে, কিন্তু রোজই সন্ধ্যায় ৯৯° হইত। বাবা বলিলেন, এ-ভাবে অনাহারে থাকিলে আমি বাঁচব না। রাত্রে বাবা সুজির দু-খানা রুটি খাইতেন। একদিন তিনি জেদ ধরিলেন, 'আমি লুচি খাইব। মরি তো মরিব। কিন্তু এভাবে না খাইয়া মরিতে চাহি না।' আমি কলেজ হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় দেখিলাম বাবা রান্নাঘরে খাইতে বসিয়াছেন। সম্মুখে থালা পাতা, মা একটি লুচি ভাজিয়া থালার উপর দিয়াছেন। বাবা খাইতে যাইবেন, এমন সময় আমি বাধা দিলাম। থালাটি তাঁহার সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া বলিলাম, 'ডাক্তারে বারণ করেছে, তবু তুমি লুচি খাবে কেন?' বাবা উঠিয়া গেলেন, মা কাঁদিতে লাগিলেন। আমি গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার সহসা মনে হইল বাবা যদি না বাঁচেন আমি আর জীবনে লুচি খাওয়াইতে পারিব না। ভগবানের কৃপায় আমার জীবনে কিন্তু সে ট্রাজেডি ঘটে নাই। বাবা ক্রমশঃ ভালো হইয়া অবশেষে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। বাবার অসুখের এই পাঁচ-ছয় মাস সময়ের মধ্যে আমি অনেক কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। প্রথমতঃ বাড়িওয়ালার সহিত প্রায়ই তুচ্ছ বিষয় লইয়া মনোমালিন্য হইতে লাগিল। ও রকম নীচুমনা লোক আমি বড় একটা দেখি নাই। ভীষণ মশা চতুর্দিকে। আমরা মশারি টাঙাইবার আয়োজন করিলাম। এ-জন্য ঘরের দেয়ালে পেরেক পুঁতিতে হইল। বাড়িওয়ালা আপত্তি করিলেন। আমি সে আপত্তি গ্রাহ্য করিলাম না। ঝগড়া বাধিল। তাহার পর তিনি বলিলেন, 'আপনার বাবার যক্ষ্মা হইয়াছে, আমরা যক্ষ্মারোগী বাড়িতে রাখিব না। আপনারা আমার বাড়ি ছাড়িয়া দিন। বলিলাম—'বাড়ি পাইলেই ছাড়িয়া দিব। যতদিন না পাই এখানেই থাকিতে হইবে।' মেডিকেল কলেজের ক্লাস করিয়া বিকালের দিকে যে অবসরটুকু পাইতাম বাড়ি খুঁজিতাম। বাড়ি পাওয়া তখনও সহজ ছিল না। রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টে অনেক সময় খালি বাড়ির খবর পাওয়া যাইত। অনেক সময় বাড়ির দেওয়ালেও খালি বাড়ির খবর ও ঠিকানা লেখা থাকিত। আমি কলেজের পর সেই সব ঠিকানায় খোঁজ করিতে লাগিলাম। কিন্তু মনোমত বাড়ি জুটাইতে পারিলাম না। অবশেষে বাড়ি-ওলাটি একদিন বলিল গুণ্ডা লাগাইয়া আমাদের বিতাড়িত করিবে। মা-বাবা দু-জনেই ভয় পাইয়া গেলেন। একদিন ভাগ্যক্রমে বাবার পরিচিত একজন পুলিশের লোক বাবার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন—'এ অঞ্চলের থানার দারোগার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা আছে। তাহাকে বলিয়া দিব, সে সব ব্যবস্থা করিবে। দারোগাবাবু হয়ত কিছু করিয়াছিলেন। কারণ তাহার পর হইতে বাড়িওয়ালা টুঁ-শব্দটি করিলেন না। এ সময় আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমাদের বাসায়

বাবা-মা'র সঙ্গে ছিল আমার ছোট দুটি ভাই কালু আর টুলু এবং একটি বোন খুকী। আমার আরও দুটি ভাই ভোলা আর টুলু আমাদের সঙ্গে আসে নাই। তাহারা মণিহারীতে ছিল। আর এক ভাই নালু (লালমোহন) তখন স্কুলে পড়িত। সে ছুটির সময় আমাদের কাছে আসিয়াছিল। নালু কলিকাতার কোনও পথঘাট চিনিত না। একেবারে পাড়া-গেঁয়ে ছেলে। সে আসিবার পর বাবা বলিলেন—ভালোই হইল। নালুকে সঙ্গে লইয়া বিকালে হেদোতে বেড়াইতে যাইব। ধীরেনবাবু ডাক্তার, বাবাকে বৈকালে রোজ বেড়াইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। সঙ্গীর অভাবে বাবা যাইতে পারিতেছিলেন না। বাবা তখনও বেশ দুর্বল। তবু বাবা নালুকে লইয়া একদিন বাহির হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশ্য ট্রামে করিয়া হেদো পর্যন্ত যাইবেন। তাহার পর সেখানে একটু বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিবেন। নালু ইতিপূর্বে ট্রামে চড়ে নাই। ট্রাম যখন আসিল নালু টপ করিয়া উঠিয়া পড়িল। বাবা উঠিতে পারিলেন না। হেদো কোথায় নালু তাহা জানিত না। তাহার কাছে পয়সাও ছিল না। সে যখন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পৌঁছিয়াছে তখন কনডাকটর তাহার নিকট টিকিট চাহিল এবং টিকিট নাই দেখিয়া নাবাইয়া দিল। অকূল পাথারে পড়িল নালু। তখন সে বুদ্ধি করিয়া একটি রিক্সা ডাকিল। রিক্সাওয়ালাকে বলিল তুমি আমাকে সরকার বাই লেনে লইয়া চল। রিক্সাওয়ালা কিন্তু তাহাকে লইয়া গেল সরদার শঙ্কর রোড। নালু বলিল, 'এ তো সরকার বাই লেন নয়। আমাকে সরকার বাই লেনে লইয়া চল। রিক্সাওয়ালা রাজি হইল না। বলিল, 'আমার ভাড়া মিটাইয়া দিন।' নালুর কাছে একটিও পয়সা নাই। সে বারবার বলিতে লাগিল, 'আমাকে সরকার বাই লেনে লইয়া চল। সেখানেই তোমাকে পয়সা দিব।' বচসা বাধিয়া গেল।

এদিকে সন্ধ্যার সময় কলেজ হইতে ফিরিয়া শুনিলাম নালু হারাইয়া গিয়াছে। বাবা বলিলেন সে ট্রামে উঠেছে দেখেছি। কেন নাবল না, কেন ফিরল না, বুঝতে পারছি না। আমি আবার মেডিকেল কলেজে ফিরিয়া গেলাম। এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে খোঁজ করিলাম। তাহার পর সেখান হইতে থানায় ফোন করিয়া তাহাদের ব্যাপারটা জানাইয়া দিলাম। বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম নালু তখনও ফেরে নাই। মা-বাবা দু-জনেই কাঁদিতেছেন। টুলু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কালু ও খুকী হতভম্ব হইয়া বসিয়া আছে। আমার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। ইহার পর কি করা উচিত ভাবিতেছি। এমন সময় আমাদের বাড়ির সামনে একটি মোটরের হর্ণ শোনা গেল। কপাট খুলিয়া দেখি প্রকাণ্ড একটি মোটর দাঁড়াইয়া আছে। মোটর হইতে নালুকে সঙ্গে লইয়া একটি অপরিচিত ভদ্রলোক নামিলেন। অপরিচিত ভদ্রলোক বলিলেন, 'সত্যবাবু কি জেগে আছেন? যদি থাকেন তা হলে তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করব।' বাড়িশুদ্ধ সকলেই আমরা জাগিয়াছিলাম। তখনও খাওয়া হয় নাই।

ভদ্রলোককে বাবার ঘরে লইয়া গেলাম। তিনি নমস্কার করিয়া বলিলেন, 'আমাকে চিনতে পারছেন না বোধ হয়।'

বাবা উত্তর দিলেন—'না।'

'চিনতে পারবার কথা নয়। প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা। আমি একবার আপনার বাড়িতে আতিথ্য-গ্রহণ করেছিলাম। আপনার আদর-যত্ন, আন্তরিকতার কথা আজও আমি ভুলি নি।'

'মনে পড়ছে না-তো। কেন গিয়েছিলেন?'

'আমি গিয়েছিলাম মাছের ব্যবসা করবার উদ্দেশ্যে। আমাকে একজন বলেছিলেন, মণিহারী অঞ্চলে অনেক বড় বড় বিল আছে। গঙ্গা থেকেও নাকি অনেক মাছ ধরে বাইরে চালান হয়। সেই সব মাছের কলকাতার আড়তদার হওয়া সম্ভব কিনা এই উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছিলাম। মণিহারীতে কোনও হোটেল বা ডাক-বাংলো ছিল না। কারও সঙ্গে তেমন পরিচয়ও ছিল না। স্টেশনের কুলী বলল, 'ডাক্তারবাবুর ওখানে চলুন, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সেখানে গিয়ে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। এই অজ্ঞাতকুলশীলকে যে সহৃদয়তার সঙ্গে আপনি অভ্যর্থনা করলেন তা আমার জীবনে কখনও পাই নি। আপনি শুধু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাই করলেন না, আপনার জানা শোনা মাছের মহলদারদেরও খবর পাঠিয়ে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেই ব্যবসা করে আমি অনেক টাকা উপার্জন করেছি। তখন আমি মেসে থাকতুম, এখন আমার প্রকাণ্ড বাড়ি হয়েছে। ওই মাছের ব্যবসা থেকেই। অনেকবার মনে হয়েছে আপনাকে একবার প্রণাম করে আসি। কিন্তু সময় করে উঠতে পারি নি। আজ খেয়েদেয়ে শুতে যাব, এমন সময় দেখি আমার বাড়ির সামনে একটা রিক্সাওয়ালার সঙ্গে কার যেন বচসা হচ্ছে। কবাট খুলে বেরিয়ে দেখলাম একটি বালকের সঙ্গে বচসা হচ্ছে। ছেলেটি বলল, 'আমি মফঃস্বল থেকে এসেছি। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি কলকাতার। এই রিক্সাওয়ালা আমাকে বলেছিল সরকার বাই লেনে নিয়ে যাবে, কিন্তু এনেছে সরদার শঙ্কর রোডে। আর যেতে চাইছে না, বলছে আমার ভাড়া দিয়ে দাও। কিন্তু আমার কাছে পয়সা নেই। দেবো কি করে?' আমি তখন ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বাড়ি কোথা?' সে বলল, 'মণিহারী।' মণিহারী? কার ছেলে তুমি? বলল—সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় আমার বাবা। ডাক্তার সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়? বলল—হ্যাঁ। তখন আমি তাকে বললাম—'তুমি ঘরের ভিতর এসে বোস। আমি রিক্সার ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছি। রিক্সার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আপনার ছেলেকে কিছু খাইয়ে আমার মোটর বের করলাম। তারপর অনেক খুঁজে খুঁজে বাড়ি বের করেছি।'

এই রকম আশ্চর্য অঘটন বাবার জীবনে অনেক ঘটিয়াছে। আমার জীবনেও। জীবনে অনেকবার অকূল পাথারে পড়িয়াছি এবং আশ্চর্যভাবে উদ্ধার পাইয়াছি। অপ্রত্যাশিতভাবে কে যেন কোথা হইতে আসিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছে। ইহা কি আকস্মিক যোগাযোগ, না কি করুণাময় ভগবানের দয়া? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি আমার নাই।

আমরা সে সময় অর্থাভাবেও পড়িয়াছিলাম। বাবা প্রায় ছয় মাস অসুস্থ হইয়া পড়াতে তাঁহার উপার্জন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি পূর্ণিয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনে মণিহারী ডিস্পেনসারিতে চাকুরি করিতেন। শেষের দিকে তাঁহাকে বিনা বেতনে ছুটি লইতে হইয়াছিল। তখন আমার ভগিনীপতি ভ্রাতা টুলু (গৌরমোহন) সবে ডাক্তারী পাশ করিয়া চাকুরি পাইয়াছে। সে-ই কিছু কিছু টাকা পাঠাইত। আরও কিছু টাকার মণি-অর্ডার মাঝে মাঝে আসিত। কিন্তু কে পাঠাইত তাহা আমার সঠিক মনে নাই। সম্ভবত মণিহারীতে আমাদের যে বিষয় সম্পত্তি ছিল তাহাই এই সব টাকার উৎস ছিল। টাকা অবশ্য সামান্যই আসিত, বড় কষ্টেই দিন চলিত আমাদের। কলেজ যাইবার সময় সবদিন ট্রামের পয়সাও জুটিত না, হাঁটিয়া যাইতাম। কষ্ট হইত না। এমন একটা স্ফূর্তি, এমন একটা আত্মবিশ্বাস ও আনন্দের আবেগ তখন আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া রাখিত যে কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করিতাম না। এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন একটি লোক আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল, 'আমি অঘোরবাবু ডাক্তারের নিকট হইতে চিঠি ও টাকা আনিয়াছি।'

ডাক্তার অঘোরনাথ ঘোষ কাটিহারে রেলওয়ে মেডিকেল অফিসার ছিলেন। মায়ের একবার খুব অসুখের সময় প্রথম তিনি আমাদের বাড়িতে মণিহারীতে আসেন। সেই সময় হইতেই আমার মাকে তিনি মা বলিতেন। বাবা প্রয়োজন হইলেই দুরারোগ্য রোগীর জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। অনেকবার তিনি আমাদের বাড়িতে আসিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। শুনিয়াছিলাম শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তিনি দীক্ষা লইয়াছিলেন। মিশনের জ্ঞান মহারাজকে প্রায়ই তাঁহার বাড়িতে দেখিতাম। এই অঘোরবাবু চিঠি এবং প্রায় হাজারখানেক টাকা পাঠাইয়াছেন। চিঠিটি লিখিয়াছেন মাকে। লিখিয়াছেন—মা, শুনিলাম আপনি বিপদে পড়িয়াছেন। সামান্য কিছু পাঠাইলাম। আমিও আপনার ছেলে, গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবেন না।

বাবা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র দিলেন। পরে টাকাটা তিনি শোধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দুর্দিনে অঘোরবাবুর মহত্ত্ব আমাদের অভিভূত করিয়াছিল। তাই তাঁহাকে আজও মনে আছে।

মায়ের অসুখের সময় বাবা যে বাল্যবন্ধুটির নাগাল পাইয়াছিলেন তাঁহাকেই আবার পত্র দিলেন। মায়ের অসুখের সময় বাবা কয়েকদিন তাঁহার বাড়িতে গিয়াছিলেন।

কয়েকদিন পরে বাবার সেই বন্ধুটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখা গেল, সত্যই তিনি বেশ কড়া লোক। নিজের মোটরে আসিয়াছেন। সঙ্গে দুই একটি পারিষদও আছে। বাবাকে তিনি প্রথমে খুব ভর্ৎসনা করিলেন। বলিলেন, 'কলকাতায় আমার অত বড় বাড়ি পড়ে আছে। আর তুই এই এঁদো গলিতে এসে আছিস। কালই চল আমার ওখানে। সেখান থেকেই চিকিৎসা হবে।'

মা প্রথমে সেখানে যাইতে রাজি হন নাই। বাবার আগ্রহ এবং বাবার বন্ধুর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত আমাদের সেখানে যাইতে হইল। ভদ্রলোকের নাম-ধাম আমি ইচ্ছা করিয়াই গোপন রাখিতেছি, কারণ শেষ-পর্যন্ত সুর কাটিয়া গিয়াছিল। মানুষ অনেক সময় সাময়িক বাহাদুরি দেখাইবার জন্য মহত্ত্ব আস্ফালন করে, কিন্তু শেষ-পর্যন্ত তাল সামলাইতে পারে না। শেষে ছন্দ পতন হয়। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল।

আমরা তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ির দ্বিতলে আশ্রয় পাইলাম। বাবার জন্যে মা আলাদা করিয়া পুরানো চালের ভাত এবং মাগুর মাছের ঝোল তোলা-উনানে রাঁধিয়া দিতেন। চাল এবং মাছ আমিই কিনিয়া আনিতাম। তোলা-উনুন, কাঠ, গুল, কয়লা, তেল, নুন, কিছু মশলাপাতিও সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। বাবার বন্ধুর বাড়িতে একজন ঠাকুর ছিল। বাবার বন্ধু, বন্ধুর ছেলে, কারখানার কর্মচারীরা এবং দুই-একজন পারিষদ দ্বিপ্রহরে এখানে খাইতেন। একটি ঝি ছিল। সে-ই সব তদারক করিত। ক্রমশঃ বোঝা গেল সেই ঝি-টির সহিত বাবার বন্ধুটির কিছু 'নট্‌ঘট্' আছে। এ-সব ব্যাপার গোপন থাকে না। মা আমাকে বলিলেন, 'তুমি বাড়ি খোঁজ, আমি এখানে থাকব না।' আমি আবার বাড়ি খোঁজ করিতে লাগিলাম। কিন্তু মনোমত বাড়ি পাওয়া গেল না। বাবার অসুখ ক্রমশ ভালোর দিকে যাইতেছিল। মা আবার বলিলেন, 'ওঁর জ্বরটা যখন কমেছে তখন এ বাড়িটার আনছে মনে হচ্ছে। এখন কোথাও নড়ানড়ি করব না। পরে ভালো বাড়ি দেখে উঠে গেলেই চলবে।' আমি বাড়ি খোঁজ বন্ধ করিয়া দিলাম। বাবার বন্ধু সন্ধ্যার সময় মোটরে করিয়া হাওড়ায় তাঁহার বাড়িতে চলিয়া যাইতেন। সন্ধ্যার পর আমরা ছাড়া বাড়িতে আর কেহ থাকিত না। মাঝে মাঝে কিছু বকসিস দিয়া ঝি, চাকর ও ঠাকুরকে বশীভূত করিয়াছিলাম। তাহারা আমাদের যথেষ্ট সেবাযত্ন করিতে লাগিল। ধীরেনবাবু ডাক্তার প্রত্যহ আসিয়া বাবাকে দেখিয়া যাইতেন। প্রয়োজন হইলে মাঝে মাঝে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ও আসিতেন। বাবার অসুখ যখন প্রায় সারিয়া আসিয়াছে তখন একদিন বিধানচন্দ্র রায়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাবাকে আর কতদিন এখানে থাকিতে হইবে?' বিধান রায় বলিলেন, 'আরও মাসতিনেক।'

বাবা ইহার উত্তরে বলিলেন, 'আমার ছুটি তো ফুরিয়ে যাবে কয়েকদিন পরে। তা হলে আবার দরখাস্ত করতে হবে। আপনি একটা সার্টিফিকেট দেবেন তো?'

'দেব। আপনার ছেলেকে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন। তখন লিখে দেব।'

আমি পরদিনই বিধানবাবুর বাড়িতে সার্টিফিকেট আনিতে গেলাম। বিধান রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার বাবা কোথায় চাকরি করেন?

'পূর্ণিয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে তিনি ডাক্তার।'

'তুমি কি করো?'

'আমি মেডিকেল কলেজে পড়ি।'

বিধানবাবু তখন কিছু বলিলেন না। একটি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন।

দিন দুই পরে কলেজ হইতে ফিরিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে অবাক হইয়া গেলাম। বিধানবাবু নাকি একটু আগে আসিয়াছিলেন এবং আমরা আগে তাঁহাকে যে 'ফি' দিয়াছিলাম তাহা জোর করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন। বাবাকে বলিয়াছেন— 'আপনি ডাক্তার, আপনার ছেলে মেডিকেল কলেজে পড়ে, আপনার কাছ থেকে আমি 'ফি' নিতে পারব না। আমাকে যখন খুসী ডাকবেন, আমি এসে দেখে যাব। 'ফি' দিতে হবে না।'

ইহার পর বিধানবাবুকে আরও কয়েকবার ডাকিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি 'ফি' লন নাই এবং বরাবর আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। বিধানবাবুর সহিত ইহার পর হইতে আমাদের একটা সকৃতজ্ঞ হৃদ্যতার ভাব স্থাপিত হইয়াছিল।

বাবা ক্রমশ সুস্থ হইতেছিলেন, এমন সময় আমার ছোট বোন খুকী টাইফয়েড্ অসুখে আক্রান্ত হইল। সে যুগে টাইফয়েড্ রোগের ভালো চিকিৎসা ছিল না। 'সিম্‌টম্' অনুসারে চিকিৎসা হইত। জ্বর বাড়িলে স্নান করাইয়া জ্বর কমাইয়া দেওয়া হইত। পথ্যের সম্বন্ধেও নানারকম ধরাকাট ছিল। খুকীর অসুখ একটু বাড়াবাড়ি রকমের হইয়াছিল। ধীরেনবাবু প্রত্যহ আসিতেন। বিধানবাবুও মাঝে মাঝে আসিতেন। এই সময় বিধানবাবুর চিকিৎসা-নৈপুণ্য এবং বিদ্যাবত্তার একটা পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম।

খুকীর জ্বর ধীরে ধীরে ক্রমশ কমিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ একদিন জ্বর খুব বাড়িল। বিধানবাবুকে খবর দিলাম। তিনি সন্ধ্যার সময় আসিলেন। আসিয়া ঘরে একটি চেয়ারে বসিলেন। খুকীর দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিলেন—'ধীরেন কি আজ এসেছিল?'

'একটু আগেই এসেছিলেন তিনি।'

'খুকী কতক্ষণ থেকে এরকমভাবে শুয়ে আছে?'

'সকাল থেকে।'

'আচ্ছা, একটা কাগজ দাও। আমি ধীরেনকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। এই চিঠিটা নিয়ে গিয়ে দাও তাকে।'

চিঠিতে লিখলেন—'আমার মনে হইতেছে মেয়েটির মেনিন্‌জাইটিস্ হইয়াছে। তাহাকে রোজ সোয়ামিন ইন্‌জেক্‌শন্ দাও।'

আমি চিঠিটা লইয়া ধীরেনবাবুর সহিত দেখা করিলাম। চিঠি পড়িয়া ধীরেনবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন।

বলিলেন, 'উনি বোধহয় গোলমাল করে ফেলেছিলেন। আমি তোমার বাবাকে Soamin দেব ভাবছিলাম। উনিও বোধহয় তাই ভেবেছেন। কিন্তু তোমার বাবার কথা না লিখে খুকীর কথা লিখেছেন। টাইফয়েডে সোয়ামিন্ দেব কি?

ওটা আর্সেনিকের প্রিপারেশন্। আমি ওঁকে চিঠি দিচ্ছি একটা। সেটার উত্তর নিয়ে এসো তুমি।'

ধীরেনবাবুর চিঠি লইয়া আবার বিধানবাবুর বাড়ি গেলাম। দেখিলাম তখনও তিনি ফেরেন নাই। তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। খানিকক্ষণ বসার পর তিনি ফিরিলেন। ধীরেনবাবুর চিঠিটা পড়িয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। তাহার পর ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেলেন। এবং শেল্ফ্ হইতে একটি বই বাহির করিয়া উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর একটা জায়গায় একটা চিহ্ন দিয়া বইটা আমাকে দিয়া বলিলেন, 'এইটে ধীরেনকে দাও গিয়ে। আমি একটা article-এ page mark করে দিলুম; এটা যেন ধীরেন পড়ে।' দেখিলাম সেটা একটি বিখ্যাত ডাক্তারী জার্নাল। ট্রামে উঠিয়া দেখিলাম যে প্রবন্ধটি ধীরেনবাবুকে পড়িতে দিয়াছেন সে প্রবন্ধটি টাইফয়েড্ মেনিন্জাইটিস্-এ সোয়ামিন ইন্জেক্শনের উপকারিতা সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক আলোচনা। গবেষক লিখিয়াছেন 'সোয়ামিন্' ইন্জেক্শন দিয়া খুব উপকার পাওয়া গিয়াছে। ধীরেনবাবু প্রবন্ধ পড়িলেন এবং খুকীকে 'সোয়ামিন্' ইন্জেক্শন্ দেওয়া শুরু করিলেন। দুই তিনটি ইন্জেক্শন্ দেওয়ার পরই খুকীর খুব উপকার হইল। কিন্তু ঠিক এই সময় আমরা আর একটি বিপদে পড়িয়া গেলাম। বাবার বন্ধু বাবাকে জানাইলেন যে তাহার এক আত্মীয়ের মেয়ের বিবাহ এই বাড়িতে হইবে। সাতদিনের মধ্যে আমরা যেন আর একটা বাড়ি খুঁজিয়া লই। কারণ বিবাহের ব্যাপারে অনেক লোকজন বাড়িতে আসিবে। সাতদিনের মধ্যে ভালো বাড়ি খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। সৌভাগ্যক্রমে কাছেই একটি বাড়ির বাহিরের একটি ঘর পাওয়া গেল। সেই ঘরেই আমরা উঠিয়া আসিলাম। ভগবানের দয়ায় খুকী এবং বাবার অসুখ ক্রমশ ভালোর দিকে যাইতে লাগিল। একটা ঘরে রান্না, খাওয়া, শোওয়া, বড়ই অসুবিধে হইতেছিল। এমন সময় খবর পাইলাম বেলগাছিয়া অঞ্চলে একটি খালি দ্বিতল বাড়ি আছে। ভাড়া চল্লিশ টাকা। তখনই গিয়া বাড়িটি ভাড়া করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু সে বাড়িতেও থাকা গেল না। ভয়ানক মাছি। ভাত বাড়িতে না বাড়িতে মাছির ঝাঁক আসিয়া ভাত ঢাকিয়া ফেলে। ডালের বাটিতে ক্রমাগত মাছি পড়িতে থাকে। শুইয়া বসিয়া স্বস্তি নাই, চোখে মুখে দলে দলে মাছি আসিয়া বসে। মাছির জ্বালায় সে বাড়ি ত্যাগ করিয়া আবার আমরা বাবার মামাবাড়ি শেওড়াফুলিতে গেলাম। সেখানেও বিপদ ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল। আমার ছোট ভাই টুলুর কলেরা হইল। পঞ্চম ভ্রাতা কালু ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়া মাথা ফাটাইল। কলিকাতায় ছুটিলাম ধীরেনবাবুর কাছে। তিনি ট্যাক্সি করিয়া স্যালাইন্ প্রভৃতি লইয়া আসিলেন। টুলুকে স্যালাইন্ দিলেন। কালুর কাটামাথা সেলাই করিলেন।

ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু ভাল ডাক্তার ছিলেন না। মহৎহৃদয় মহাপুরুষ ছিলেন। আমাদের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার প্রতিদান আমরা দিতে

পারি নাই। তাঁহার ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। তিনি আজ পরলোকে। তাঁহার উদ্দেশ্যে আজ প্রণাম নিবেদন করিলাম। তিনি বজার্স সাহেবের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। আর. জি. কর মেডিকেল কলেজে প্যাথলজির অধ্যাপক ছিলেন তিনি। আর. জি. কর মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের উন্নতিকল্পে তিনি প্রচুর পরিশ্রম করিতেন। শুনিয়াছি আর. জি. কর মেডিকেল কলেজের প্যাথলজিকাল মিউজিয়মে তাঁহার প্রচুর অবদান আছে। বাবা যখন ভালো হইয়া মণিহারী গেলেন তাহার কিছুদিন পর ধীরেনবাবুও একবার মণিহারী গিয়া কয়েকদিন ছিলেন আমাদের বাড়িতে। ধীরেনবাবুর মত সদা-হাস্যময় মহৎ লোক আজকাল ক্বচিৎ চোখে পড়ে।

বাবার অসুখের জন্যে আমার পড়ার বেশ ক্ষতি হইল। লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় চুকিয়া গিয়াছিল। আমার পড়িবার কোন ঘরই ছিল না। কোনরকমে ওয়ার্ডগুলিতে যাইতাম। একটু সময় পাইলেই লাইব্রেরীতে বসিয়া পড়িতাম। ইহার মধ্যেও ওই লাইব্রেরীতে বসিয়াই দু-একটি কবিতা বা ছোট গল্প লিখিতাম এবং ডাকযোগে কাগজে পাঠাইতাম। কখনও ছাপা হইত কখনও বা ছাপা হইত না। এই সময়ই বোধহয় 'কল্লোল' পত্রিকায় কবিতা পাঠাইয়াছিলাম একটা। ঠিক কবে তাহা মনে নাই। কবিতাটার নাম দিয়াছিলাম 'সই'। কলিকাতায় যখন ছিলাম তখন কোনও সাহিত্যিকদের আড্ডায় মিশিবার সুযোগ হয় নাই। সুযোগ পাইলেও সময় পাইতাম না বোধহয়।

মেডিকেল কলেজের কয়েকটি স্মৃতি এখনও মনে আছে। সেগুলি কালানুক্রমিকভাবে লিপিবদ্ধ করিলে ভালো হইত। কিন্তু স্মৃতির ভাণ্ডারে কালানুক্রমিক সঞ্চয়ের রেওয়াজ নাই। এলোমেলোভাবে রাখা আছে। যখন যেটা মনে পড়িতেছে সেটাই লিখিতেছি। প্রথম যে ঘটনাটি লিখিতেছি বোধহয় আমার কোর্থ ইয়ারে ঘটিয়াছিল। আমি তখন উইল্‌সন্ সাহেবের ওয়ার্ডে। উইল্‌সন্ সাহেব আমাদের সময় ফার্স্ট সার্জেন ছিলেন। প্রকাণ্ড পাকা গোঁফ ছিল উইল্‌সন্ সাহেবের। কিন্তু বার্দ্ধক্যের আর কোন লক্ষণ ছিল না তাঁহার। লাফাইয়া লাফাইয়া সিঁড়িতে উঠিতেন। আমাদের সার্জারি-ক্লাস হইত বৈকাল চারটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত। উইল্‌সন্ সাহেব প্রথমদিন আসিয়াই বলিলেন,'এখন তোমাদের খেলিবার সময়, আমি তোমাদের বেশী সময় নষ্ট করিব না। আমার প্রফেসর আমাকে যাহা পড়াইয়াছিলেন, তাহার নোট আমার লেখা আছে। সেই নোট তোমাদের টুকিয়া দিব। তাহা পড়িয়া তোমরা সার্জারি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। তাহা ছাড়া তোমাদের টেক্‌স্‌টবুক তো আছেই। আর একটা কথা তোমাদের বলিয়া দিই। আসল সার্জারি বই পড়িয়া শেখা যায় না। ওটা হাতেকলমে শিখিতে হয়। ডাক্তারি পাশ করিয়া তোমরা যখন নিজের হাতে ছুরি ধরিবে, তখন হইতেই তোমাদের প্রকৃত সার্জারি-শিক্ষা শুরু হইবে।' প্রতিদিন পনেরো মিনিট তিনি আমাদের সার্জারির নোট লিখাইতেন। শ্রুতিলিখনের সময় সব কথা সবদিন বুঝিতে পারিতাম না।

পরদিন তাঁহাকে সে কথা বলিলে তিনি সংশোধন করিয়া দিতেন। এই উইল্‌সন্‌ সাহেবের ওয়ার্ডে যখন ছিলাম তখন ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় সার্জিকাল আউট্‌ডোরে। সার্জিকাল আউট্‌ডোর হইতে অনেক রোগীকে তিনি সার্জিকাল ইন্‌ডোরে ভর্তি করিতে পারিতেন। একদিন মেডিকেল কলেজের ঠিক সামনে আমার দুর্গা ওঝার সহিত দেখা হইয়া গেল। দুর্গা ওঝার মণিহারীতে বাড়ি, বাবার সঙ্গে খুব খাতির ছিল। দেখিলাম তাঁহার একটি হাতের দুইটি হাড়ই ভাঙা। বলিল, 'একদল ডাকাত আমার বাড়ি আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের বাধা দিয়াছিলাম। তাহাদের লাঠির ঘায়ে হাড়দুটি ভাঙিয়াছে, আর জোড়া লাগে নাই। তুমি ইহার কোনো ব্যবস্থা করিতে পারো?' তাহাকে বনবিহারীবাবুর কাছে লইয়া গেলাম। তিনি বলিলেন, 'অপারেশন না করিলে এ হাড় জোড়া লাগিবে না। দরকার হইলে মেটালের প্লেট দিয়া জুড়িয়া দিতে হইবে। উনি Prince of Wales হাসপাতালে যদি ভর্তি হইতে চান আমি ভর্তি করিয়া দিতে পারি।'

দুর্গা ওঝা বলিলেন, 'ভর্তি হইতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু পনেরো দিনের বেশী থাকিতে পারিব না। কারণ ব্যবসায়ের জরুরী একটা কাজে পনেরো দিন পরে আমাকে বোম্বাই যাইতে হইবে।' বনবিহারীবাবু বলিলেন, 'পনেরো দিনের মধ্যে তো অপারেশন হইয়া যাওয়া উচিত।'

আমাকে বলিলেন, 'তুমি সিনিয়র হাউস সার্জেনকে একটু অনুরোধ করো তিনি যদি দুই-এক দিনের মধ্যে put-up করিয়া দেন হইয়া যাইবে। এখন put-up করা ব্যাপারটাকে একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সার্জেন প্রতিদিন যে যে 'কেস' অপারেশন করিবেন সে 'কেস্‌'গুলি তাহার পূর্বদিন সিনিয়র হাউস সার্জেন বাছিয়া সার্জেনকে জানাইবেন ইহাই তখন আইন ছিল। হাউস সার্জেন যতক্ষণ না কোন 'কেস্‌'-কে পুট্‌-আপ করিতেছেন ততক্ষণ তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে, তাহার অপারেশন হইবে না। দুর্গা ওঝাকে ভর্তি করাইয়া আমি সিনিয়র হাউস সার্জেনকে অনুরোধ করিলাম তাঁহাকে যেন শীঘ্র 'পুট্‌-আপ করা হয়। তিনি বলিলেন কালই করিয়া দিব। কিন্তু অনেক 'কাল' আসিল এবং চলিয়া গেল দুর্গা ওঝাকে তিনি পুট-আপ করিলেন না। দুর্গা ওঝা খুব ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, আমিও হাউস সার্জেনকে অনুরোধ করিয়া করিয়া হয়রাণ হইয়া গেলাম। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার 'কেস্‌' আর 'পুট্‌-আপ' হয় না। একদিন সন্ধ্যায় মেসে বসিয়া পড়িতেছি এমন সময় দুর্গা ওঝার মুনিমজি (অর্থাৎ ম্যানেজার) আমাকে আসিয়া বলিলেন—কাল অপারেশন হইবে। মালিকজির (অর্থাৎ দুর্গা ওঝার) প্রকাণ্ড অনুরোধ আমি যেন অপারেশনের সময় উপস্থিত থাকি। ইহার পর একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন, 'ব্যাপারটা যদি আমাদের আগে জানা থাকিত অনেকদিন আগেই অপারেশন হইয়া যাইত। অনর্থক কয়েকটা দিন নষ্ট হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোন্‌ ব্যাপারটা?' মুনিমজি উত্তর দিলেন, 'আজ সকালে আমি সিনিয়র হাউস সার্জেনের বাসায় একটি পাঁচসের ওজনের

রুইমাছ এবং পঞ্চাশটি টাকা দিয়া আসিয়াছি। ডাক্তারবাবু কথা দিয়াছেন কালই তাহাকে 'পুট-আপ' করিবেন। ঘুস-ঘাস না দিলে প্রায় কোন জায়গাতেই কাজ হাসিল হয় না। এখানে ভাবিয়াছিলাম আপনি আছেন—বিনা ঘুসেই হইয়া যাইবে।' কথাটা শুনিয়া আমি বড়ই অপমানিত বোধ করিলাম। মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মুনিমজিকে বলিলাম, 'আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি সেই ডাক্তারের বিরুদ্ধে নালিশ করিব।' তাঁহাকে লইয়া গেলাম আমাদের রেসিডেন্ট সার্জন ক্যাপটেন এস. এন. মুখার্জির কাছে। তাঁহার পুরা নাম ছিল সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি। তিনি সেকালের আই. এম. এস. ছিলেন। শুনিয়াছিলাম তিনি দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা। ক্যাপটেন মুখার্জি আমার সব কথা মন দিয়া শুনিলেন, তাহার পর মুনিমজিকে বলিলেন, 'আপনি যাহা মুখে বলিতেছেন তাহা যদি লিখিয়া দেন তাহা হইলে আমি কলেজের কমিটিতে সেটা লইয়া যাইব এবং ওই ডাক্তারের সাজা হইবে।'

মুনিমজি একটু ভাবিয়া বলিলেন, 'লিখিয়া দিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু ওই ডাক্তারের হাতেই তো আমার মালিককে থাকিতে হইবে। তাই আমার একটু দ্বিধা হইতেছে।' ক্যাপটেন মুখার্জি বলিলেন, 'আপনার মালিক কাল হইতে আমার তত্ত্বাবধানে থাকিবেন। আমিই দরকার হইলে তাঁহার ঘা ড্রেস্ করিয়া দিব। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।' তখন মুনিমজি একটি কাগজে সব লিখিয়া দিলেন। পরদিন দুর্গা ওঝার হাত অপারেশন করা হইল। আমি অপারেশন থিয়েটারে উপস্থিত ছিলাম। দুর্গা ওঝা প্রায় পনেরো দিন পরে হাসপাতাল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার হাতের হাড় জোড়া লাগে নাই। সেই সিনিয়র হাউস সার্জেনটির নামে ক্যাপ্টেন মুখার্জি নালিশ করিয়াছিলেন, তাহারও ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। কমিটিতে যেদিন তাঁহার বিচার হয়—সেদিন আমি অসুস্থ। নিউমোনিয়া হইয়াছিল আমার। ইহার বিবরণ পূর্বেই দিয়াছি। মণিহারী হইতে সুস্থ হইয়া যখন ফিরিলাম, শুনিলাম উক্ত সিনিয়র হাউস সার্জেনটির বিশেষ কোন সাজা হয় নাই। তিনি অন্য ওয়ার্ডে বদলি হইয়াছেন মাত্র। শুনিয়াছিলাম আমাদের প্রিন্সিপাল বার্নাডো সাহেব তাঁহাকে নাকি কঠোর শাস্তি দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু উইল্‌সন্ সাহেব বলিলেন, 'ঘুস তো আমরা সকলেই লই। বাড়িতে রোগী দেখিয়া ফি লইয়া চিঠি লিখিয়া দিই—এ রোগীকে ভরতি করো, অমনি সে ভরতি হইয়া যায়। ইহা কি ঘুসের নামান্তর নহে? তবে এই হাউস সার্জনটি অতি লোভী। এ কেসটি স্টুডেন্টের কেস, তাহার নিকট হইতে ঘুস লওয়াটা এটিকেট-বহির্ভূত হইয়াছে। এজন্য তাহাকে অন্য ওয়ার্ডে বদলি করিয়া দেওয়া হোক। পরে সেই হাউস সার্জনটির সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। তিনি হাসিয়া আমাকে বলিলেন, 'তুমি আমার নামে নালিশ করিয়াছ এজন্য তোমার উপর আমার রাগ নাই। তুমি আদর্শবাদী লোক, তোমাকে আমি দূর হতে শ্রদ্ধা জানাইতেছি। কিন্তু কার্যকালে আমি সুবিধা পাইলেই আবার ঘুস

লইব। কারণ সংসার আমার বিশাল, মাহিনা যথেষ্ট নয় এবং প্রাকৃটিসও কিছু নাই। সুতরাং যেখানে যাহা পাই কুড়াইয়া লই। এ পাপের জন্য পরলোকে হয়ত শাস্তি পাইব। তখন দেখা যাইবে, ইহলোকের ধাক্কাটা তো আগে সামলাই।'

ইহার পূর্বে, আমার থার্ড ইয়ারে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল আমার জীবনে। আমি যখন মেডিকেল কলেজে ঢুকি তখনই লেখক বলিয়া ছাত্রমহলে আমার কিঞ্চিৎ খ্যাতি ছিল। শিক্ষক-মহল হইতে সে খ্যাতির স্বীকৃতি এই সময় প্রথম পাইলাম। আমাদের মেডিকেল কলেজে প্রতি বৎসর থিয়েটার হইত। মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা খুব ভালো থিয়েটার করিতেন। বাংলা নাটক এবং ইংরেজী নাটক দুই-ই অভিনয় করিতেন তাঁহারা। পুরুষরাই স্ত্রী-ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন। এমন নিখুঁত অভিনয় করিতেন যে পুরুষ বলিয়া বোঝাই যাইত না। এই প্রসঙ্গে হাবেনদার কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহার 'জনা' 'শ্যামলী'-র অপূর্ব অভিনয়ের কথা আজও মনে আছে। ইংরাজী অভিনয় শেখাইতেন 'উণওয়ালা'। এই অভিনয়ের ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন আমাদের অ্যানাটমির সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ছাত্রমহলে তিনি নগেন চাটুজ্যে নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাকে আমরা খুব ভয় করিতাম। তাহার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, খুব দ্রুতবেগে তিনি হাঁটিতেন। অ্যানাটমি হলের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত তিনি দ্রুতগতিতে চলিয়া বেড়াইতেন। হঠাৎ একদিন তিনি দ্রুতবেগে অ্যানাটমি হলে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং কাঁধে দুই হাত রাখিয়া বলিলেন, 'বনফুল, আমাদের থিয়েটারের জন্য ভালো একটা 'ওয়েলকাম সং' লিখতে হবে তোমাকে। লেখা হলেই আমাকে দিও, ওটা ছাপাব আমরা।'

বলা বাহুল্য গর্বে আমার বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল।

যে গানটি লিখিয়া দিয়াছিলাম সেটি এই :

মরণ লইয়া ঘর করি মোরা বেদনা মোদের সাথী
আর্ত আহত আতুর লইয়া কাটাই দিবসরাতি
তারি মাঝখানে অবসরমত আজিকার দিনটিরে
ছন্দমুখর আনন্দগানে হাসিতে ফেলেছি ঘিরে।
এসো গো তোমরা সবে
মুখরিত করি তোল আজিকার আনন্দ উৎসবে।

আমরা সব দেখেছি শিখেছি জীবনটা কিছু নয়
মরণের সাথে আমাদের হয় নিতি নব পরিচয়
জীবনের কত বেদনা ও জ্বালা ভালো করে তাহা জানি

তবুও আমরা অমানুষ নই—হাসির দাবীটা মানি।
এসো গো তোমরা সবে
মুখরিত করি তোল আজিকার আনন্দ উৎসবে।

আজিকার এই মধু উৎসবে অপূর্ণ যাহা আছে
তাহার লাগিয়া বিনীত মিনতি জানাই সবার কাছে
কালো যাহা আছে আলো হয়ে যাবে তোমরা চাহিলে পরে
হরষে ও গানে কানায় কানায় সকলি উঠিবে ভরে।
এসো গো তোমরা সবে
মুখরিত করি তোল আজিকার আনন্দ উৎসবে।

থিয়েটার আরম্ভ হইবার পূর্বে গানটি গাওয়া হইয়াছিল। ইহার পর হইতে মেডিকেল কলেজে আমার সাহিত্যিক-খ্যাতি আরও একটু বাড়িল। অর্থাৎ আমাদের কলেজের বাঙালী শিক্ষকরাও জানিতে পারিলেন তাঁহাদের ছাত্রদের মধ্যে একজন কবি দেখা দিয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের মনোভাব ঠিক কি প্রকারের হইয়াছিল তাহা জানি না, এইটুকু শুধু জানি তাঁহারা সকলেই আমাকে সস্নেহে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। ছাত্রজীবনে তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দাক্ষিণ্য লাভ করিয়াছি। আমার অনেক অসঙ্গত আবদারও তাঁহারা রক্ষা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে ইহার প্রায় ষোল বছর পরে—যখন আমি ভাগলপুরে প্র্যাকটিস্ করি—তখনও ডাক্তাররা আমাকে সবিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন আমার 'শ্রীমধুসূদন' নাটকটি অভিনয় করিয়া। আমার শিক্ষক ও শিক্ষক-স্থানীয় ডাক্তাররা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার দীনেশ চক্রবর্তী, ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়, ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্ত্রী-ভূমিকায় পুরুষ ডাক্তারদের অভিনয় নিখুঁত হইয়াছিল। আমি ডাক্তারদের নিমন্ত্রণে ভাগলপুর হইতে সপরিবারে আসিয়াছিলাম। কি আনন্দ যে পাইয়াছিলাম তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা শক্ত।

ছাত্রজীবনে মেডিকেল কলেজে যখন পড়ি তখন আমার জীবনে অপ্রত্যাশিত আর একটি ঘটনা ঘটিল। বাংলার বাঘ, তখনকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল একদিন।

আমার এক ঠাকুরদা, বাবার একজন কাকা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গৃহশিক্ষক ছিলেন। বাবা আমাকে চিঠি লিখিলেন আমি যেন তাঁহাকে গিয়া প্রণাম করিয়া আসি। আমি ভবানীপুরে তাঁহার বাসায় (বোধহয় গোবিন্দ বসু লেনে) গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি বলিলেন, 'চল আশুতোষবাবুকেও প্রণাম করবি চল।'

আমাকে আশুতোষবাবুর কাছে লইয়া গেলেন। দেখিলাম আশুতোষবাবুর প্রকাণ্ড বৈঠকখানা বহু লোকের সমাগমে গমগম করিতেছে। তাহার মধ্যে দু-একজন সাহেবও রহিয়াছে দেখিলাম। তাঁহাদের মধ্যে গিয়া আশুতোষকে প্রণাম করিলাম।

প্রশ্ন করিলেন, 'কে তুমি ?'

ঠাকুরদা আমার পিছনেই ছিলেন। বলিলেন, 'আমার নাতি, মেডিকেল কলেজে পড়ে। আপনাকে প্রণাম করতে এসেছে। ওকে আশীর্বাদ করুন।'

আশুতোষ আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—'বস বস, পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। বস—' কাছেই একটা খালি চেয়ার ছিল, তাহার উপরই বসিয়া পড়িলাম। ঠাকুরদা আমার কানে কানে বলিয়া গেলেন—'বসে থাকো। চলে যেও না।'

বসিয়া রহিলাম।

তাঁহাদের নানাবিষয়ে নানারকম কথা হইতেছিল। আমি সব বুঝিতে পারিতেছিলাম না। একটু পরে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ কানে গেল পাণিপথের যুদ্ধ লইয়া কি একটা কথা উঠিয়াছে।

আশুতোষ আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'এই তো কলেজের একটি ছেলে রয়েছে। এ বলতে পারবে। পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কবে হয় ? স্কুলের থার্ড-ক্লাসেই আমি ইতিহাসবিদ্যায় পরিচ্ছেদ টানিয়াছিলাম। সংস্কৃত এবং অঙ্ক আমার অতিরিক্ত বিষয় ছিল। আমাদের সময় এইরকমই নিয়ম ছিল। সুতরাং পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কবে হইয়াছিল তাহা আমারও মনে ছিল না। একটু বিব্রত হইয়া পড়িলাম এবং বলিলাম, 'আমার তো মনে নেই। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। স্কুলে থার্ড-ক্লাসের পর আর ইতিহাস পড়ি নি—'

আশুতোষ কিছু বলিলেন না। আলোচনা চলিতে লাগিল। আমি খুব অপ্রস্তুত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

আশুতোষ বলিলেন, 'তুমি যেও না। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'না, আমি যাই নি। বাইরেই আছি—'

বাহিরের বারান্দায় চলিয়া গেলাম।

কিছুক্ষণ পরেই বৈঠকখানার লোকজন কমিয়া গেল। আমি আবার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আশুতোষ বলিলেন, 'তুমি এ কি কথা বললে। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র বলে দেশের ইতিহাস জানবে না। আজ রবিবার, আজ তো তোমার ক্লাস নেই।'

'না।'

'তা হলে তুমি আমার লাইব্রেরীতে বসে ঈশানচন্দ্র ঘোষের ভারতবর্ষের ইতিহাস বইখানা পড়ে ফেল। সবটা শেষ করে তারপর বাড়ি যেও।'

সেদিন তাঁহার লাইব্রেরীতে বসিয়া ঈশানচন্দ্র ঘোষের ইতিহাসটি পড়িয়া শেষ করিয়াছিলাম। ইহার কিছুদিন পরে আর একবার আমরা তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর

ছাত্ররা—দল বাঁধিয়া গিয়াছিলাম তাঁহার বাড়ি। পায়ে হাঁটিয়া গিয়াছিলাম। কারণ সেদিন ট্রাম স্ট্রাইক ছিল, কলিকাতায় তখন বাস চলিত না। আমিই আমাদের দলের মুখপাত্র ছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্যে ছিল ফার্স্ট এম. বি. পরীক্ষার দিন পিছাইয়া দেওয়া। আশুতোষ আমাদের কথা শুনিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'আমার বাড়িতে এতগুলো ডাক্তার কেন? বাড়িতে তো কারো অসুখ হয় নি।'

আমি আগাইয়া গিয়া সব কথা বলিলাম। 'আমাদের ডিসেকশন এখনও শেষ হয় নি। অথচ ইউনিভার্সিটি থেকে নোটিশ এসেছে আর পনেরো দিন পরই ফার্স্ট এম.বি. পরীক্ষা শুরু হবে। আমাদের কোর্সই এখনও শেষ হয় নি। পরীক্ষা দেব কি করে?'

আশুতোষ বলিলেন, 'কোর্স যদি শেষ না হয়ে থাকে পরীক্ষার দিন পিছিয়ে দেব। তোমরা পরশু আমার সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে দেখা কোর। তাহার পরদিনই আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল বার্নার্ডো সাহেব অ্যানাটমি হলে আসিয়া খবর লইলেন আমাদের ডিসেক্‌শন শেষ হইয়াছে কি না। আমাদের প্রফেসর নন্দলাল পাল বলিলেন—'না, হয় নাই। কারণ 'বডি' পাওয়া যাইতেছে না। অনেক ছাত্র ডিসেক্‌শন শেষ করিতে পারে নাই।'

তাহার পরদিন ইউনিভার্সিটিতে গেলাম। আশুতোষ একটি ক্লার্ককে ডাকিয়া বলিলেন—'ফার্স্ট এম. বি. পরীক্ষার দিন পিছাইয়া দিতে হইবে।' ক্লার্কটি চলিয়া গেলেন এবং একটি লম্বা-চাওড়া কাগজ আনিয়া বলিলেন, 'কি করে পেছিয়ে দেব। কোথাও তো ফাঁক দেখছি না। তিনমাসের মধ্যে কোন ফাঁক নেই।' আশুতোষ গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'তিনমাস পরে তো আছে? তা হলে ফার্স্ট এম. বি. পরীক্ষা তিনমাস পরেই হবে। নোটিশ দিয়ে দাও।' সে বছর ফার্স্ট এম. বি. পরীক্ষা তিনমাস পরেই হইয়াছিল।

আশুতোষের আর একটি উজ্জ্বল চিত্র মানসপটে আঁকা আছে। হাওড়া স্টেশন হইতে বিরাট একটি শোভাযাত্রা আসিতেছে। শোভাযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা এবং ছাত্ররা আছেন; আর সে শোভাযাত্রার পুরোভাগে আছেন নগ্নগাত্র, নগ্নপদে আশুতোষ। তাঁহার মাথার উপরে একটি পাত্র, পাত্রটির ভিতরে আছে ভগবান বুদ্ধের দেহের কোন অংশ। সেইটি লইয়া কলেজ স্কোয়ারের মহাবোধি সোসাইটিতে তিনি স্থাপন করেন। সেই মহান দৃশ্যটি আজও ভুলি নাই। বুদ্ধদেবের দেহের একটি অংশ আমাদের ভাইস্‌চ্যান্সেলার মাথায় করিয়া বহিয়া আনিতেছেন—এই ঘটনাই আমাদের চিত্ত সেদিন উদ্বেলিত করিয়াছিল।

আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। এটি ঘটিয়াছিল যখন আমি বার্নার্ডো সাহেবের ওয়ার্ডে ছিলাম। তখন বোধহয় আমার পঞ্চম বর্ষের শেষ বা ষষ্ঠ বর্ষ। কারণ এটা মনে আছে যোগেশদা (ডাক্তার যোগেশ ব্যানার্জি) তখন বার্নার্ডো সাহেবের জুনিয়র হউস সার্জন। যোগেশদা আমার অপেক্ষা এক বছরের সিনিয়র ছিলেন।

সেই সময় নিয়ম ছিল আটটার সময় ছাত্রদের ওয়ার্ডে গিয়া উপস্থিত হইতে

হইত। যাহার ওয়ার্ড তিনিও ঠিক আটটার সময় আসিয়া ওয়ার্ডে 'রাউণ্ড' দিবেন এবং কোন রোগীকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রদের বক্তৃতা দিবেন। ইহাকে বলা হইত Clinics দেওয়া। বার্নাডো সাহেবের বেশ 'প্রাকটিস' ছিল। তিনি ওয়ার্ডে আসিতে বেশ বিলম্ব করিতেন। কোন কোনদিন একেবারেই আসিতেন না। যোগেশদা তখন রোলকল করিয়া আমাদের ছাড়িয়া দিতেন। হঠাৎ অমৃতবাজার পত্রিকায় কে একদিন সংবাদটি প্রচার করিয়া দিল। লিখিল বার্নাডো সাহেব আজকাল ওয়ার্ডের কাজে ফাঁকি দিতেছেন। ছাত্রদের আর তিনি 'Clinics' দেন না, প্রাকটিস করিয়া বেড়ান। পরদিনই বার্নাডো সাহেব কাগজটি হাতে করিয়া ওয়ার্ডে আসিলেন। বলিলেন, 'আমাকে আমার কর্তব্য সম্বন্ধে যিনি সচেতন করিয়া দিয়াছেন তাঁহাকে ধন্যবাদ। আমাকে অনেক সময় জরুরী রোগীর জন্য ডাক্তারেরা Consultation-এ ডাকেন, তাই আমাকে যাইতে হয়। ঠিক করিয়াছি কাল হইতে আর যাইব না। ঠিক আটটার সময় ওয়ার্ডে আসিব। ঠিক আটটার সময় রোলকল হইবে। তোমরাও আশা করি ঠিক আটটার সময় উপস্থিত থাকিবে।'

আমরা সাধারণতঃ ওয়ার্ডে যাইবার আগে নীলমণির চায়ের দোকানে সমবেত হইতাম। সেখানে চা জলখাবার খাইয়া একটু আড্ডা দিয়া তাহার পর ওয়ার্ডে যাইতাম। সুতরাং ঘড়ি ধরিয়া ঠিক আটটার সময় অনেকেই যাইতে পারিতাম না। পরদিন হইতেই কিন্তু বার্নাডো সাহেব ঠিক আটটার সময় ওয়ার্ডে আসিতে লাগিলেন, ঠিক আটটার সময়ই 'রোলকল' হইতে লাগিল। আমরা অনেকেই 'A' অর্থাৎ Absent চিহ্নিত হইয়া Percentage হারাইতে লাগিলাম। এইরূপ কয়েকদিন চলিল। কিন্তু একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। বার্নাডো সাহেব ঠিক আটটার সময় আসিয়া যোগেশদাকে বলিলেন, 'Joges, call the rolls'. যোগেশদা কিন্তু রোলকল করিতে গিয়া দেখেন রোলকলের রেজিস্টারটাই নাই। সেটি তিনি সামনের টেবিলে রাখিয়াছিলেন। সেখান হইতে খাতাটি উধাও হইয়া গিয়াছে। বার্নাডো সাহেব যোগেশদাকে খুবই বকিতে লাগিলেন। যোগেশদা বলিলেন, 'রোজই তো এই টেবিলের উপর রাখি, কোন দিন তো এমন হয় নাই।' তখন বার্নাডো সাহেব এক নাটকীয় কাণ্ড করিয়া বসিলেন। তিনি হাসপাতালের সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেবকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন—'হাসপাতালের সব গেট বন্ধ করিয়া দাও। সামনের গেটটি শুধু খোলা থাকিবে এবং সে গেট দিয়া কেহ যদি বাহিরে যাইতে চায় তাহাকে সার্চ না করিয়া যাইতে দিবে না। আমাদের একটি দরকারি খাতা চুরি গিয়াছে।' তাহার পর বার্নাডো সাহেব টেগার্ট সাহেবকে ফোন করিলেন। একটু পরেই দীর্ঘকায় টেগার্ট সাহেব আমাদের ওয়ার্ডে আসিয়া হাজির। তিনি বার্নাডোর মুখে সব শুনিলেন এবং যোগেশদাকে প্রশ্ন করিলেন। খাতাটি তিনি ঠিক কোনস্থানে রাখিয়াছিলেন? যোগেশদা দেখাইয়া দিলেন। টেগার্ট সাহেব লম্বা ওয়ার্ডের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত চাহিয়া দেখিলেন। ওয়ার্ডের শেষপ্রান্তে একটি বিছানা খালি ছিল।

সেখানে কোন রোগী ছিল না। টেগার্ট সাহেব সেই বিছানাটির কাছে গেলেন এবং বিছানার গদিটি উল্টাইয়া দেখিলেন গদির নীচে খাতাটি রহিয়াছে। হাসিয়া তিনি খাতাটি আনিয়া বার্নাডো সাহেবকে দিলেন এবং 'গুডবাই' জানাইয়া চলিয়া গেলেন। বার্নাডো সাহেব এবং যোগেশদা অপ্রস্তুত হইয়া মূঢ়বৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমরা সকলে ওয়ার্ড পরিত্যাগ করিয়া 'কমন রুমে' চলিয়া গেলাম। 'কমন রুমে' আমাদের একটি সভা হইল। সভায় স্থির হইল আমরা বার্নাডো সাহেবের ওয়ার্ডে আর যাইব না। ইহাতে আমাদের ছয় মাস নষ্ট হইবে, তথাপি যাইব না। তিনি পুলিস ডাকিয়া আমাদের অপমান করিয়াছেন। কয়েকদিন আমরা ওয়ার্ডে গেলাম না। সাত আট-দিন পর বার্নাডো সাহেবের দূত ডাক্তার অখিল মজুমদার মহাশয় একদিন আমাদের সহিত দেখা করিলেন। তিনি তখন মেডিকেল রেজিস্ট্রার ছিলেন এবং অত্যন্ত প্রিয়-পাত্র ছিলেন বার্নাডো সাহেবের। তিনি আসিয়া বলিলেন—'সাহেবের সহিত চটাচটি করিয়া লাভ নাই। তা ছাড়া দোষটা তোমাদেরই। তোমাদেরই মধ্যে কেহ খাতাটি লুকাইয়া রাখিয়াছিল। টেগার্ট সাহেবকে ডাকিয়া সাহেব নিজেও একটু অপ্রস্তুত বোধ করিতেছেন। তাহার উপর তোমরা স্ট্রাইক করাতে সাহেবের মন আরো খারাপ হইয়া গিয়াছে। সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—ছেলেদের সহিত একটা মিটমাট করিয়া ফেল। আমার একটা মতলব মাথায় আসিয়াছে—তোমরা যদি মত কর সাহেবকে গিয়া বলি। আমি বলিব যে সব ছেলেরা এই কয়দিন ওয়ার্ডে সময়মত উপস্থিত হইতে পারে নাই, তাহাদের অনুপস্থিত বলিয়া চিহ্নিত করা হইবে না এবং ওয়ার্ড শেষ হইয়া গেলে সাহেব ছেলেদের একটি ভোজ দিবেন। ছেলেরা যে যাহা খাইতে চাইবে তাহাই খাওয়াইতে হইবে। আমরা রাজি হইলাম। বার্নাডো সাহেবও রাজি হইয়া গেলেন। ক্রমে আমাদের সঙ্গে খুব হৃদ্যতা হইয়া গেল। তাহার ওয়ার্ড যখন শেষ হইয়া গেল সত্যই তিনি তাহার বাড়িতে বিরাট ভোজের আয়োজন করিলেন। সাহেবী, মুসলমানী এবং আমাদের স্বদেশী খাবারের প্রচুর সমারোহ হইল সেদিন। বার্নাডো সাহেবের বাড়িতে ভীম নাগের ভিয়ান বসাইয়াছিলাম আমরা। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা এক একটি টেবিল ছিল এবং প্রত্যেক টেবিলে প্রচুর খাবার। খাবার আরম্ভ করিবার পূর্বে বার্নাডো সাহেব হাসিয়া বলিলেন—Before we start let me remind you that the capacity of normal human stomach is four ounces only. Now let us begin.'

শুধু খাবার নয়। মদও ছিল। দুই একটি ছেলে মদ খাইয়া মাতাল হইয়া পড়িল। একজন তো বলিল—'Col-Barnado, please send for a rick-saw. I always ride a rick-saw after drinking'. বার্নাডো সাহেব তাহাকে রিক্সা আনাইয়া দিলেন। পরদিন নোটিশ-বোর্ডে ছোট একটি নিবন্ধ দেখা গেল। নিবন্ধটির নাম—How to drink like a gentleman. যতদূর মনে আছে সেটির সারমর্ম এই—পরের পয়সায় মদ খাইলেও কোন ভদ্রলোক কখনও ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করেন না।

বার্নার্ডো সাহেবের ওয়ার্ডে যখন ছিলাম তখন ডাক্তার প্রফুল্লরঞ্জন দাশগুপ্ত সিনিয়র হাউস সার্জেন ছিলেন। তাঁহার নিকট আমি অনেক ঋণী। তিনি হাতেকলমে আমাকে অনেক জিনিস শিখাইয়াছিলেন। Percussion করা (অর্থাৎ বুক পিঠ আঙুল দ্বারা ঠুকিয়া পরীক্ষা করা), Auscultate করা (স্টেথোস্কোপ দিয়া পরীক্ষা করা) তাঁহার নিকটই শিখিয়াছিলাম। তিনিই বলিয়াছিলেন, 'দুপুরবেলা যখন ক্লাস থাকবে না, তখন একা একা ওয়ার্ডে এসে তোমার 'বেড'-এর রোগীদের পরীক্ষা কোরো। হাসপাতালের টিকিটে কি লেখা আছে তা দেখো না। রোগীকে জিজ্ঞাসা কোরো তার কি কষ্ট, কেন সে হাসপাতালে এসেছে। তারপর তুমি তাকে নিজে পরীক্ষা করবে। সঙ্গে যেন Hutchinson এর Clinical methods বইটা থাকে। গ্রীণের differential diagnosis বইটাও এনো। তুমি নিজে সেটা করবে, diagnosis যদি ভুল হয়, ক্ষতি নেই, তোমার কেন ভুল হচ্ছে সেটা আমি পরে দেখিয়ে দেব। কিন্তু তোমাকে আগে রোগীটি পরীক্ষা করে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। তারপর এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব।'

তাঁহার এ আদেশ আমি পালন করিয়াছিলাম। তাঁহার অভিজ্ঞতা আমার ডাক্তারি জ্ঞানকে অনেক পরিপুষ্ট করিয়াছিল। তাহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

এই প্রসঙ্গে ডাক্তার মণি দেব কথাও মনে পড়িল। তিনি আমাদের সময় Pathology-র demonstrator ছিলেন। তাঁহার নিকটও আমি ঋণী। তিনি যত্ন করিয়া আমাকে Pathological Histology শিখাইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনিও মারা গিয়াছেন। প্রফুল্লবাবুর খবর জানি না।

এই সময় আমার বন্ধু শিবদাস বসুমল্লিক ও আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলাম। শিবদাসের জ্যোতিষ-চর্চা করা একটা নেশা ছিল। সে কোষ্ঠি এবং হস্ত-রেখা বিচার করিত। আমিও তাহার নিকট এ বিদ্যাটা কিছু কিছু শিখিয়াছিলাম। মনে বাসনা জাগিল এ বিষয় একটু গবেষণা করিব। যে সব রোগী সাংঘাতিক রোগের কবলে পড়িয়া হাসপাতালে ভরতি হইত আমরা সম্ভব হইলে তাহাদের ঠিকুজি সংগ্রহ করিতাম এবং নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতাম যে ঠিকুজি হইতে ঠিক সেই সময় তাহার ফাঁড়ার কোন খবর পাওয়া যায় কি না। অনেক রোগী আমাদের ঠিকুজি সরবরাহ করিত। যেখানে ঠিকুজি মিলিত না সেখানে হস্ত-রেখা বিচার করিবার চেষ্টা করিতাম। সব সময় মিলিত না, অনেক সময় খুব মিলিয়া যাইত। আমি অনেক ভিখারীর হস্ত-রেখাও দেখিতাম তখন। তখনই দেখিয়াছি, অনেক ভিখারীর ভাগ্যরেখা খুব চমৎকার, কিন্তু সে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের প্রায়ই Sun-line থাকিত না। এসব খবর একটা খাতায় লিখিয়া রাখিতাম। কিন্তু সে খাতা কবে হারাইয়া গিয়াছে। জীবনে অনেক জিনিস হারাইয়াছি। অনেক লেখাও হারাইয়া গিয়াছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব অনেকের বিবাহে প্রীতি-উপহার লিখিয়াছি। কয়েকটি মাত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এবং আমার 'স্বরসপ্তক' নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি

মেডিকেল কলেজের অনেক স্মৃতি।

আমাদের সময় মেডিকেল কলেজে প্রায়ই মেমসাহেব নার্স থাকিত। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানও থাকিত কিছু কিছু। নার্সদের নিকট হইতে আমরা অনেক কিছু শিখিতাম। প্রথম প্রথম যখন নাইট-ডিউটি পড়িত তখন ওই নার্সরা আমাদের দেখাইয়া দিত। সব শিখাইত। রাত্রে আমাদের সাধারণতঃ ইনজেক্শন দিতে হইত এবং সার্জিক্যাল কেসের ড্রেসিং মাঝে মাঝে বদলাইয়া দিতে হইত। কি করিয়া কি করিতে হয় তাহা নার্সদের নিকটই শিখিয়াছি। নার্স গ্রীণের কথা এখনও মনে আছে। তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। শুধু যে যত্ন করিয়া শিখাইতেন তাহা নহে। মাঝে মাঝে চা, কফি, ওভালটিন প্রভৃতিও খাওয়াইতেন। তাঁহার সেই মাতৃমূর্তি এখনও আমার মনে আঁকা আছে। মেডিকেল কলেজে আমরা প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতাম এই নার্স এবং হাউস সার্জনদের নিকট হইতে। সাহেব প্রফেসরদের সঙ্গে সাধারণ ছেলেদের তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তাঁহারা সাহেব হওয়াতে তাঁহাদের খুব কাছ ঘেঁষিতে আমরা সাহস করিতাম না। তবে আমাদের মধ্যে কিছু 'খলিফা' ছেলে ছিল, যাহারা সাহেবদের 'কল' জোগাড় করিয়া দিত এবং সেইজন্যেই সাহেবদের অনুগ্রহভাজন হইত। পদলেহীর দল সেকালেও ছিল, একালেও আছে। এই পদলেহীদের মধ্যে অনেকে জীবনে উন্নতি করিয়াছিল কেবল সুপারিশের জোরে, যোগ্যতার জোরে নয়। সাহেবদের মনে হইত 'নেটিভদের' মনে মনে ঘৃণা করিতেন। একটা কথা মনে পড়িতেছে—আমরা যখন কলেজে পড়িতাম তখন ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কালাজ্বর বিষয়ে গবেষণা করিতেছিলেন, যে গবেষণার ফলে Urea Stibamine নামক ওষুধটি আবিষ্কৃত হইয়া হাজার হাজার কালাজ্বর রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করে। কিন্তু যখন তিনি গবেষণা করিতেছিলেন তখন তিনি ওই সাহেবদের নিকট হইতে উৎসাহ পান নাই। তাঁহার গিনিপিগগুলি রাখিবার স্থানও তিনি পাইতেন না। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ হাসপাতালের ছাতে সেগুলি রাখিয়াছিলেন ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার অপরাধ তিনি নেটিভ—কালা আদমি। তখন দেশে স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণবেগে চলিতেছিল। বিশেষ করিয়া মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন। তাই সাহেবদের উপর আমরা খুব সন্তুষ্ট ছিলাম না। সাহেবরাও আমাদের সুচক্ষে দেখিতেন না। এ সব সত্ত্বেও দুই একজন প্রফেসর আমাদের প্রিয় ছিলেন। প্রথমেই নাম করতে হয় আর্মিটেজ সাহেবের। তিনি Midwifery এবং Gynaecology পড়াইতেন। যখন ফোর্থ ইয়ারে উঠিয়া প্রথম তাঁহার ক্লাসে গেলাম তখন প্রথমেই লক্ষ্য করিলাম তিনি রোলকল করেন না। সমস্ত ছেলেকেই 'P' চিহ্নে চিহ্নিত করেন। ফোর্থ ইয়ারের ছেলেদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, 'তোমরা ইচ্ছা করিলে এ বছরটা আমার ক্লাসে না আসিতে পারো।—এ সময়টা তোমরা মেডিসিন এবং সারজারি পড়। Fifth year-এ যখন তোমরা আমার ওয়ার্ডে আসিবে তখন অন্য কোনও বিষয় পড়িবার সময় পাইবে না। সর্বক্ষণ Midwifery ও

Gynaecology পড়িতে হইবে। তোমাদের পারসেন্টেজ হারাইবার ভয় নাই। আমি সে ব্যবস্থা করিব।' তবু আমরা তাঁহাব ক্লাসে যাইতাম এবং সামনের দিকের বেঞ্চে বসিবার চেষ্টা করিতাম। উদ্দেশ্য মুখ চেনানো। প্রথম প্রথম তাঁহার বক্তৃতা বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা দিবার এমন একটা মোহিনী শক্তি ছিল, সকলেই আকৃষ্ট হইত। ফোর্থ ইয়ার, ফিফ্‌থ ইয়ার, সিক্সথ ইয়ারের ছেলেরা তো থাকিতই, অনেক হাউস সার্জন এবং বাহিবের ডাক্তাররাও তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন। আমাদের লেকচাব থিয়েটার উপচাইয়া পড়িত।

আমরা যখন ফিফ্‌থ ইয়াবে উঠিলাম তখন সত্যই আমাদের অন্য বিষয় পড়িবার অবসর ছিল না। সব সময়ই মিডওয়াইফাবি বা গাইনিকোলজিব বই পড়িতে হইত। আমাদের কার্যক্রম নিম্নলিখিত প্রকাব ছিল। প্রথম দিনই গ্রীণ আর্মিটেজ আমাদের টেক্‌স্ট বুক দুইটি দেখাইয়া বলিলেন, 'তোমবা ছয় মাস আমার ওয়ার্ডে থাকিবে। এই ছয় মাসের মধ্যে এই বই দুটি পড়িয়া শেষ করিবে। আমি প্রতিদিন পড়া ধবিব।' প্রতিদিন প্রায় কুড়ি-পঁচিশ পাতা পড়িয়া আসিতে হইত। পড়া না পাবিলে আমাদের তীব্র ভর্ৎসনাব সম্মুখীন হইতে হইত। পড়া না পারার জন্য তিনি আমাদের একজন সহপাঠীর কান পর্যন্ত মলিয়া দিয়াছিলেন। সে মেডিকেল ক্লাস ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল। গ্রীণ আর্মিটেজ তাহাকে যাইতে দিলেন না। বলিলেন, 'আমি যখন প্রথম পাশ করিয়া এখানে আসি তখন আমি মহামূর্খ ছিলাম। আমার মূর্খতার জন্য আমাব গুরু লাথি পর্যন্ত মারিয়াছিলেন। তাঁহার লাথি সহ্য করিয়াছিলাম বলিয়া কিছু শিখিতে পারিয়াছি।'

আমাদের প্রথমে ডিউটি ছিল ইডেন হাসপাতালের আউটডোরে। সেখানে অপেক্ষমান বোগিণীদেব Case history আউটডোর টিকিটে লিখিতে হইত। কি কষ্টের জন্য হাসপাতালে আসিয়াছে, কষ্ট কবে শুরু হইয়াছে, বয়স কত, কি জাত, তাহার মাসিক ঋতু স্বাভাবিকভাবে হয় কি-না—এই সব। এই সব লিখিয়া টিকিটের উপব নিজেব নাম লিখিতে হইত। এই সময় আউটডোবের কর্তা ছিলেন ম্যাকস্থইনি সাহেব। সব টিকিটগুলি গিয়া তাঁহার টেবিলে জমা হইত। তিনি একে একে রোগিণীদের ডাকিতেন এবং যে ছাত্রেব নাম টিকিটেব উপর লেখা থাকিত তাহাকেও ডাকিতেন। সেই ছাত্রটি রোগিণীব বিষয়ে ম্যাকস্থইনি সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করিবার এবং রোগিণীটিকে পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইত। সেই সময় আমরা P. V. (অর্থাৎ Pen Vaginum) পরীক্ষা করিবার প্রথম পাঠ পাইতাম। একটি ছবি মনের ভিতর ভাসিয়া উঠিল। একটি অসহায় কিশোরী মেয়ের মুখ। বয়স বোধ হয় ষোলর কাছাকাছি। চার মাস মাসিক ঋতু বন্ধ আছে। তাঁহার সঙ্গে যে ভদ্রলোকটি আসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, 'আমাদের গ্রামের ডাক্তারবাবুর সন্দেহ, পেটে টিউমার হয়েছে। তাই এখানে আনিয়াছি।' পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, মেয়েটি গর্ভবতী। আরও জানা গেল, মেয়েটি বাল-বিধবা। আমরা কাজকর্ম সারিয়া

প্রায় বারোটা নাগাদ যখন বাহির হইলাম তখন চোখে পড়িল সেই মেয়েটি ইডেন হাসপাতালের গেটের ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম তাহার দেবর তাহাকে গেটের ধারে বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম্য বালিকা ভাবিয়া পাইতেছে না এখন কি করিবে। আমি বলিলাম, 'আপনি এইখানে থাকুন, হয়ত একটু পরে তিনি ফিরিয়া আসিবেন।' মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল 'না সে আর ফিরিবে না।' তখন আমি বলিলাম, 'তবু আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমার একটি জানা-শোনা অবলা-আশ্রম আছে। সেখানেই আপনাকে লইয়া গিয়া পৌঁছাইয়া দিতে পারি। তাহারা আপনার একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। আপনি একটু বসুন, আমি মেস হইতে খাইয়া আসিয়া আপনাকে লইয়া যাইব।' মেয়েটি বসিয়া রহিল। আমি চলিয়া গেলাম। তখন ৩নং মিরজাপুর স্ট্রীটে থাকিতাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া দেখিলাম মেয়েটি নাই। কলিকাতার জনসমুদ্রে সে হারাইয়া গেল। তাহার আর সন্ধান পাই নাই। মনে হইতেছে এই ঘটনাটি আমার কোন গল্পগ্রন্থে গাঁথিয়া রাখিয়াছি।

আউট-ডোর শেষ করিয়া আমরা যখন ইন-ডোরে গেলাম, তখন আমাদের প্রত্যেককে চারটি করিয়া Bed দেওয়া হইল, অর্থাৎ চারজন রোগী আমাদের প্রত্যেকের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। গ্রীণ আমিটেজ বলিলেন—'ইহাদের টিকিট তোমরা দেখিও না। তোমরা নিজেরা ইহাদের প্রশ্ন করিয়া, পরীক্ষা করিয়া, বই পড়িয়া ঠিক কর ইহাদের কি হইয়াছে এবং তাহা একটা খাতায় লিখিয়া ফেল। তোমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পর তোমাদের সহিত আলোচনা করিব।' দুই একজন ছেলে টিকিট দেখিয়া diagnosis লিখিয়াছিল কিন্তু জেরায় ধরা পড়িয়া গেল এবং খুব বকুনি খাইল। গ্রীণ আর্মিটেজ যখন বকুনি দিতেন মনে হইত একটা ঝড় বহিয়া যাইতেছে। আমাদের Case যখন অপারেশন টেবিলে উঠিত তখন একটি খাতা-পেন্সিল লইয়া আর্মিটেজ সাহেবের পাশে দাঁড়াইতে হইত। তিনি যেভাবে অপারেশন করিতেন তাহা সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লইতে হইত। অপারেশন শেষ করিয়া তিনি যখন হাত ধুইতেন তখন সে খাতা তাঁহার চোখের সামনে ধরিয়া রাখিতাম; তিনি সাবধানে হাত ধুইতে ধুইতে সেটি পড়িতেন।

তাহার পর কলম বাহির করিয়া সেটি সংশোধন করিয়া দিতেন। মনে পড়িতেছে একবার লিখিয়াছিলাম—'An incisun ab.ut six inches long, was given on the abdomen.' আর্মিটেজ সাহেব given কাটিয়া made লিখিলেন এবং আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'it is not a gift'.

এ সব ছাড়াও Museum-এ আমাদের লইয়া গিয়া আমাদের অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত specimen দেখাইতেন তিনি। তাঁহার বাড়িতেও আমরা কেহ কেহ যাইতাম এবং তিনি অনেক বই আমাদের পড়িতে দিতেন। মনে পড়ে তাঁহাকে একদিন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 'Semen' [শুক্র] আমাদের শরীরে প্রস্তুত হয়। কিন্তু

তাহার সার্থকতা আমাদের শরীরের বাহিরে স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে তাহা হইলে শুক্রক্ষয় এত নিন্দনীয় কেন? আর্মিটেজ সাহেব আমাকে একটি বই দিয়া বলিলেন—'এই বইটা পড়িয়া দেখ তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইবে।' বইটির নাম Excessive Venery, গ্রন্থকারের নাম নাই। বইটিতে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে আমাদের Brain (মস্তিষ্ক) এবং Nervous Tissue যে সব উপাদান দিয়া প্রস্তুত হয়, শুক্রও সেই সব উপাদানে প্রস্তুত। আমাদের শরীরে শুক্রের ভাণ্ডার খালি হইয়া গেলে শরীর আগে সেই ভাণ্ডার পূর্ণ করে। সুতরাং সে ভাণ্ডার যদি ঘন ঘন খালি হইয়া যায় মস্তিষ্কের অন্যান্য স্নায়ুগুলি উপাদানের অভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে।

অধ্যাপক আর্মিটেজ গ্রীণ ছেলেদের জ্ঞানদান করিবার জন্য মাঝে মাঝে দুঃসাহসিক কাজও করিতেন। মনে আছে একটি মহিলার জননেন্দ্রিয়ে একটু অস্বাভাবিকতা ছিল। মূত্রাশয়ের সহিত যুক্ত ছিল সেটি। আর্মিটেজ সাহেব সেই মেয়েটিকে ক্লাসে আনিয়াছিলেন সব ছাত্রদের দেখাইবার জন্য। ইহা লইয়া কাগজে লেখালিখি হইয়াছিল। বলা হইয়াছিল যে মহিলাটি ভারতীয় বলিয়াই গ্রীণ আর্মিটেজ সাহেব তাহাকে ক্লাসে আনিতে পারিয়াছিলেন, তিনি যদি মেমসাহেব হইতেন তাহা হইলে ইহা সম্ভবপর হইত না। তিনি কিন্তু মেয়েটির অভিভাবকদের অনুমতি লইয়াই এ কাজ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়িতেছে; একটি মেমসাহেব রোগিণী আমাকে P. V. (Pen Vaginum) পরীক্ষা করিতে দিতে চাহে নাই। গ্রীণ আর্মিটেজ তাহাকে বলিলেন, 'এটি প্রাইভেট ক্লিনিক নয়। এটি শিক্ষালয়ের হাসপাতাল। আপনি যদি ছাত্রকে পরীক্ষা করিতে দিতে না চান, এ হাসপাতালে আপনার থাকা চলিবে না। কোন প্রাইভেট ক্লিনিকে চলিয়া যান।' মেমসাহেব প্রাইভেট ক্লিনিকে চলিয়া গেলেন। খাঁটি মেমসাহেব রোগিণী আমাদের হাসপাতালে বড় একটা আসিত না। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ভারতীয় মহিলারাই সংখ্যায় বেশী ছিল। তাঁহারা বিশেষ আপত্তি করিতেন না। গ্রীণ আর্মিটেজ ত আপত্তি বরদাস্ত করিতেন না। তাঁহার কাছে ফাঁকি দিবার উপায় ছিল না। সকলে তাঁহাকে ভয় করিত, ভালোবাসিত। তাঁহার চাপে পড়িয়া ধাত্রীবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলাম। গ্রীণ আর্মিটেজের আর একটি গুণ ছিল, তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যকে সম্মান করিতেন। চরক সুশ্রুতকে চিকিৎসা-জগতের অগ্রগামী পথিকৃৎ বলিয়া বারম্বার উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি তাঁহাকে। ডাঃ কেদার দাস মহাশয়কেও খুব শ্রদ্ধা করিতেন তিনি। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মনে হইত তিনি যেন আমাদের আপনজন নন। তিনি বিদেশী শাসকের প্রতিনিধি। সে যুগে সব সাহেব সম্বন্ধেই আমাদের সকলের মনে এই ধারণা প্রচ্ছন্নভাবে থাকিত। সেটা স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। কোন সাহেবকেই আমরা প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখিতাম না। তবে সাহেবদের কর্তব্যবোধ, তাহাদের সময়-নিষ্ঠা আমাদের মনে দাগ কাটিত। তাহাদের নিকট যে অনেক কিছু শিখিবার আছে এ কথা আমরা স্বীকার না করিয়া পারিতাম না।

প্রফেসার স্টীন সাহেবের কথা মনে পড়িতেছে। স্টীন সাহেব আমাদের সময়ে সেকেণ্ড সার্জন ছিলেন। বেশ বলিষ্ঠ, লম্বা-চওড়া পুরুষ ছিলেন তিনি। কথা বলিতেন কিন্তু খুব আস্তে আস্তে। তিনি আর্মিটেজ সাহেবের মতো বক্তৃতা দিতে পারিতেন না। ওয়ার্ডে যে ক্লিনিকাল বক্তৃতা দিতেন তাহাও ভালো করিয়া শোনা যাইত না। কিন্তু সার্জন হিসাবে তাঁহার নাম ছিল। একটি ঘটনার জন্য তাঁহাকে ভুলি নাই। তখন শীতকাল। একটা রোগীর একটি Kidney-তে Tumour হইয়াছে। Kidneyটি অপারেশন করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। স্টীন সাহেব ওয়ার্ডে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'অপারেশন করিবার পূর্বে প্রথমে আমাদের কি করিতে হইবে?' আমরা কেহ সদুত্তর দিতে পারিলাম না। স্টীন সাহেব বলিলেন—'প্রথমে দেখিতে হইবে যে Kidney-তে Tumour হয় নাই সেই Kidney-টি সম্পূর্ণ সুস্থ আছে কি না। Kidney হইতে Ureter (উরিটার) নামক নল দিয়া মূত্র মূত্রস্থলীতে (যাহাকে ইংরাজিতে Bludder বলে) সঞ্চিত হয়। স্টীন সাহেব ঠিক করিলেন যে ভালো Kidney-টির Ureter হইতে মূত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা পরীক্ষা করিবেন। তিনি ইহাও স্থির করিলেন যে ঐ সুস্থ Kidney-টি মিনিটে কয় ফোঁটা করিয়া মূত্র প্রস্তুত করিতে সক্ষম তাহাও নির্ণয় করিতে হইবে। অসুস্থ Kidney অপসারিত হইলে এই Kidney-টি তাহার ভার সামলাইতে পারিবে কি-না সেটি সর্বাগ্রে জানা দরকার। সুতরাং প্রথমে তিনি সুস্থ Kidney-টির Ureter-টি বাহির করিয়া তাহা হইতে মূত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন। ব্যবস্থা এমন হইল যে একটি বড় কাঁচের শিশির ভিতর একটি ক্যাথিটার হইতে ফোঁটা ফোঁটা মূত্র পড়িতেছে তাহা দেখা যাইবে। আমাদের বলিলেন—'প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর গণিয়া দেখিতে হইবে, মিনিটে কয় ফোঁটা করিয়া ইউরিন পড়িতেছে। অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় বারো বার গণিতে হইবে।' স্টীন সাহেব বলিলেন, 'সুতরাং বারোজন ভলাণ্টিয়ার চাই। প্রত্যেকে একঘণ্টা করিয়া কাজ করিবে। আমি একজন ভলাণ্টিয়ার হইলাম। সন্ধ্যা ৬টা হইতে সকাল ৬টা পর্যন্ত এই গণনা চলিবে। আমাকে তোমরা যে সময় আসিতে বলিবে সেই সময় আসিব। বাকি ১১ জন তোমরা কে কখন আসিবে নিজেদের মধ্যে ঠিক করিয়া লও।'

আমার পালা পড়িয়াছিল রাত্রি ১২ টা হইতে ১টা পর্যন্ত। তাহার পর স্টীন সাহেবের আসিবার পালা। রাত্রি ১টা হইতে ২টা পর্যন্ত তিনি গণিবেন। আমি একমনে গণিতেছিলাম। টং করিয়া ১টা বাজিল। কানের কাছে স্টীন সাহেব ফিসফিস করিয়া বলিলেন, 'Have you finished? I have come—' ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম কালো গরম সুট পরিয়া স্টীন সাহেব দাঁড়াইয়া আছেন। মুখে মৃদু হাসি। তাঁহার এ মূর্তিটি আজও আমার মনে আঁকা আছে। ঘটনাটি খুবই সাধারণ ঘটনা, তবু স্টীন সাহেবের এই মূর্তিটি আজও আমার মনে আঁকা আছে কারণ সেটি কর্তব্য-পরায়ণ সময়-নিষ্ঠ সভ্য মানবের ছবি। যে গুণের জন্য পাশ্চাত্য জাতিরা আজও সকলের শ্রদ্ধাভাজন—এই ছবিটি যেন তাঁহারই প্রতীক।

আমাদের সেকালের মেডিকেল কলেজের যে ছবি আমার মনে দেদীপ্যমান হইয়া আছে তাহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুশাসিত শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি চিকিৎসা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ব্রহ্মদেশ হইতে ছাত্ররা এখানে ডাক্তারী পড়িবার জন্য আসিত, ওই সব প্রদেশ হইতে নানারকম রোগীও আসিত চিকিৎসার জন্য। আমাদের মেডিকেল কলেজ একটা নামজাদা কলেজ ছিল। সমস্ত প্রদেশের নির্বাচিত ভালো ছেলেরাই সে কলেজে পড়িত। আমি খুব একটা মিশুক প্রকৃতির ছিলাম না। তবু যে কয়জনের সঙ্গে মিশিয়াছিলাম তাহাদের প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ছাত্রদের মধ্যে ভালো গায়ক, ভালো অভিনেতা, ভালো বক্তা, ভালো চিত্রকর অনেক ছিল। আমি সে সময় অবসর পাইলেই রাস্তায় ঘুরিতাম। পরিমল গোস্বামী, শিবদাস বসু মল্লিক, সমর ভট্টাচার্য—ইহাদের মধ্যে কেহ না কেহ আমার সঙ্গে থাকিত।

কলিকাতার রাস্তার ফুটপাতে তখন হাঁটা অসম্ভব ছিল না। কলিকাতা শহরকে এবং কলিকাতার সদা-চঞ্চল জীবনধারাকে আমি যেন মনে মনে গ্রাস করিতাম।

'জঙ্গম' উপন্যাসের উপাদান এবং চরিত্রাবলী এই সময়ই আমার মনের প্রচ্ছন্ন-লোকে ধীরে ধীরে একত্রিত হইতেছিল। কিছুদিন পরে তাহাদের রূপায়িত করিয়াছিলাম। 'জঙ্গম' উপন্যাসের একটু প্রধান চরিত্র ভন্টু। শিবদাসেরই প্রতিচ্ছবি সেটি। ঠিক ফটোগ্রাফ নয়, পোরট্রেট। আমার কলিকাতা জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা আমার পরবর্তী অনেক লেখায় ফুটিয়াছে। আমি সে সময় মাঝে মাঝে সাহিত্য-চর্চা করিতাম, কিন্তু কোন সাহিত্যিক-আড্ডায় জুটিতে পারি নাই। প্রথমতঃ অবসর ছিল না। দ্বিতীয়তঃ সুযোগ ছিল না এবং তৃতীয়তঃ খুব একটা প্রবৃত্তিও হইত না। আমি কাগজে লেখা পাঠাইয়া নেপথ্যে থাকাই বেশী পছন্দ করিতাম। 'কল্লোল' পত্রিকাতেও দুই একটা লেখা লিখিয়াছি। কিন্তু 'কল্লোল' দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিবার প্রয়াস নাই। 'শনিবারের চিঠি'র সজনীর সহিত 'প্রবাসী' অফিসে একদিনমাত্র দেখা হইয়াছিল। তাঁহার কাগজে তাঁহার অনুরোধে সে সময় 'কাঁচি' বলিয়া একটি কবিতা এবং আর একটা কি গল্প-রচনা লিখিয়াছি, কিন্তু তাহার আড্ডায় তখনও আমি যাই নাই। 'শনিবারের চিঠি'র সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল পরিমল সম্পাদক হইবার পর। আমি যে সময় মেডিকেল কলেজে পড়িতাম সে সময় বিদেশী নোংরা সাহিত্যের নকলে এদেশেও একরকম নোংরা সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সাহিত্যের লেখকরা নিজেদের বিদেশী বলিয়া জাহির করিতেন। তাঁহারা নিজেরাই ঢাক-ঢোল বাজাইয়া আত্মপ্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিতেন। তাঁহাদের এই ধরনের ক্লেদাক্ত সাহিত্য-চর্চা আমার ভালো লাগিত না। সজনীকান্ত ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র পত্রিকায়। মাঝে মাঝে 'শনিবারের চিঠি' কিনিয়া পড়িতাম, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতাটা উপভোগ করিতাম কিন্তু আর একটা কথাও মনে হইত; মনে হইত উহার ভিতরও যেন

ক্লেদ আছে। প্রতি সপ্তাহে—'মণি-মুক্তা' নাম দিয়া যে সব রচনার উদ্ধৃতি দেওয়া হইত, তাহাতেও সুরুচির পরিচয় নাই বলিয়া আমার মনে হইত। 'শনিবারের চিঠি'র দৌলতেই ওই সব লেখকরা তখন জনসমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন লেখক বেশ প্রতিভাবান ছিলেন এবং সেই প্রতিভার জোরেই পরে তাঁহারা বাংলাসাহিত্যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সেকালকার নোংরামির জন্য নয়। কিম্বা রবীন্দ্র-যুগ-অন্তকারী বিদ্রোহীরূপেও নয়। তাঁহাদের লেখাতেও রবীন্দ্র-প্রভাব যথেষ্ট। তাঁহারা রবীন্দ্র-অনুসারী সার্থক লেখক হিসাবেই এখন খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

তখন কিন্তু এইসব লইয়া আমি বিশেষ মাথা ঘামাইতাম না। মেডিকেল কলেজের পড়া লইয়া ব্যস্ত থাকিতাম। বাংলাসাহিত্যের বই পড়িবার সময় ছিল না। বাংলা মাসিক-পত্র কিঞ্চিৎ কখনও ষ্টলে দাঁড়াইয়া উল্টাইয়া দেখিতাম। কিনিতাম না। হাতে বাড়তি পয়সা থাকিত না। বস্তুত সে সময় থিয়েটার ও সিনেমা দেখিয়াই আমার মনের শিল্প-পিপাসা মিটিত। তখন বিজু থিয়েটারের উপরতলার চার আনার টিকিট খরচ করিয়া আমরা ভালো ভালো বিদেশী সিনেমা দেখিতাম। চার্লি চ্যাপলিন, লরেল হার্ডি, হ্যারল্ড লয়েড, মেরি পিকফোর্ড, নাজি মোভা (রাশিয়ার অভিনেত্রী) প্রভৃতি নটনটীরা তখন আমাদের হৃদয় হরণ করিতেন। তখন সিনেমা 'টকি' হয় নাই। নির্বাক সিনেমাতেই কিন্তু তখন যে আনন্দ পাইয়াছি পরে 'টকি'তে তত পাইয়াছি কিনা সন্দেহ। থিয়েটার দেখিতে হইলে বেশি পয়সা লাগিত। আমরা পীটেই বসিতাম। টিকিট যতদূর মনে পড়ে আট আনা কিংবা বারো আনা ছিল। ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছি না। দানী-বাবু, কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী, তিনকড়িবাবু প্রভৃতি নামজাদা অভিনেতা ছিলেন সেযুগে। আরো অনেকে ছিলেন, সকলের নাম মনে পড়িতেছে না। অপরেশবাবু, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্রবাবুর নাম পরে শুনিয়াছিলাম। অভিনেত্রীদের মধ্যে নাম মনে পড়িতেছে তারাসুন্দরীর, আঙুরবালার, কৃষ্ণভামিনীর, সুবাসিনীর, সুশীলাসুন্দরীর। নীহারবালা বলিয়া আর একজনের নামও মনে পড়িতেছে। কিন্তু শিশির ভাদুড়ী যখন তাঁহার 'সীতা' লইয়া নাট্যমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন তখন চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সিনেমা অপেক্ষা থিয়েটারই বেশী ভালো লাগিত আমার। এখনও তাহাই লাগে। কিন্তু তখন সবসময় থিয়েটার দেখিবার পয়সা জুটিত না। সাহেবগঞ্জ হইতে মাঝে মাঝে প্রবোধদা আসিয়া থিয়েটার দেখাইতেন। আর অখিলদা মাঝে মাঝে টাকা দিতেন। অখিলদার কথা আগে একবার উল্লেখ করিয়াছি। অখিলদার কাছে নানাভাবে ঋণী আছি। অখিলদা তখন ডাক্তার হইয়া রোজগার করিতেছেন। যখন কলেজের ক্যান্টিনে নীলমণির দোকানে ধার স্তূপীকৃত হইয়া যাইত অখিলদা তাহা শোধ করিয়া দিতেন। যখন পকেট শূন্য অথচ থিয়েটার দেখিবার জন্য প্রাণ আকুল, তখন অখিলদা থিয়েটার দেখাইতেন। অখিলদার কাছে অনেক ঋণ। অখিলদা কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমার কাছে আসিয়াছিলেন, জানি না এখন কোথায় আছেন।

যে কথা বলিতেছিলাম—থিয়েটার, সিনেমাই শিল্পপিপাসা মিটাইত। নাটক লিখিবার প্রেরণাও সে সময় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। একটা নাটক লিখিয়া শিশিরবাবুর কাছে লইয়া গিয়াছিলাম একথাও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু মেডিকেল কলেজের পড়ার চাপে আর বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই। কিন্তু আমার একটা ধারণা তখন হইতেই মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে মহৎ সৃষ্টির সঙ্গে নাটকীয়তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আমার কলিকাতায় এই জীবনে কিন্তু হঠাৎ একদিন যবনিকাপাত হইল। বিহারে নতুন মেডিকেল কলেজ খুলিল। বিহার গভর্ণমেণ্ট বাংলা গভর্ণমেণ্টকে জানাইলেন আমরা যেসব ছাত্র তোমাদের মেডিকেল কলেজে পাঠাইয়াছি, তাহাদের ফেরত পাঠাও। তাঁহাদের আমরা পাটনা কলেজে পড়াইব এবং তাহাদের জন্য প্রতি বছর যে টাকা তোমাদের দিতাম তাহাও আর দিব না। একদিন নোটিশ-বোর্ডে এই বার্তা পড়িয়া বড়ই মুষড়াইয়া পড়িলাম। আমি তখন ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে। অসুখের জন্য পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম। তাই আমাদের দলের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে পারি নাই। এখন পাটনায় গিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। আমি যদিও বরাবর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলাম, তবু ছয় বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া কলিকাতার উপর একটা মায়া বসিয়া গিয়াছিল। এম. বি. পরীক্ষার শেষ ডিগ্রীটাও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে লইব—মনে মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগিল। তখন আর. জি. কর মেডিকেল কলেজে ডাঃ কেদার দাস প্রিন্সিপাল ছিলেন। তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে সব খুলিয়া বলিলাম এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম আমাকে আর. জি. কর কলেজে ভরতি করিয়া লউন। তিনি সম্মত হইলেন না। আমাকে উপদেশ দিলেন 'তুমি পাটনাতেই যাও। পাটনা ইউনিভারসিটি থেকে যদি প্রথম ব্যাচে এম. বি. পাশ করতে পারো তাহলে তোমার আলাদা কদর হবে। এখানে তা হবে না। পাটনা-তেই চলে যাও।'

পাটনাই চলিয়া গেলাম শেষে।

পাটনা এবং পুনশ্চ কলিকাতা

পাটনার স্মৃতি বিস্তৃত করিয়া লিখিব না। কারণ লিখিবার মতো কিছুই নাই। কলিকাতা হইতে পাটনা গিয়ে মনে হইল যেন বনবাসে আসিলাম। নোংরা হাসপাতাল। নোংরা পরিবেশ; যে মেডিকেল কলেজে এতদিন কাটাইয়াছি সে মেডিকেল কলেজের আভিজাত্য কোথাও নাই। পুরাতন টেম্পল মেডিকেল স্কুলকেই প্রিন্স অফ ওয়েলস্ মেডিকেল কলেজ করা হইয়াছে। মেডিকেল কলেজের গৌরবে সে তখনও ভূষিত হয় নাই। আমি প্রথমে গিয়া হোস্টেলে সিট পাই নাই। ফণীদার বাড়িতে উঠিয়াছিলাম। ফণীদা (ক্যাপটেন পি. বি. মুখার্জি, রেডিওলজিস্ট) বাবার বন্ধু স্থানীয় প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাইপো, অনুকূল জ্যাঠামশাইয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

তিনি পাটনা মেডিকেলের রেডিওলজিষ্ট ছিলেন। মেডিকেল কলেজের কাছেই তাঁহার বাসা ছিল। নামজাদা রেডিওলজিষ্ট ছিলেন ফণীদা। ফণীদার সহিত খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল পূর্ব হইতে। তাঁহাদের বাড়ির সহিত আমাদের আত্মীয়তা ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমি যখন পাটনায় গেলাম তখন বৌদি ঠিক দেবরের মতোই স-স্নেহে আমাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ছেলেমেয়েরা আমার বন্ধু হইয়া উঠিল। বীণু, বুলু, বাপি, ক্ষেপি, কানু, লালটুর কথা মনে আছে। কানু, লালটু তখন খুব ছোট ছিল, আমার কোলে-পিঠে, বুকে চড়িত। এখন ভাবিতে কষ্ট হইতেছে বাপি, ক্ষেপি, কানু, লালটু সবাই অকালে মারা গিয়াছে। ফণীদাও কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছেন। বৌদি বাঁচিয়া আছেন এখনও। তাঁহার মেয়েরা এখনও বাঁচিয়া আছে। আমার পাটনার স্মৃতি ফণীদার পরিবারের সহিত জড়িত। লিখিতে বসিয়া বারবার তাহাদের কথা মনে পড়িতেছে। বৌদি এখন কলিকাতাতেই গড়িয়া অঞ্চলে আছেন। আমিও বৃদ্ধ বয়সে কলিকাতায় আসিয়াছি। থাকি লেকটাউনে। গড়িয়া হইতে অনেক দূরে। বৌদির সহিত দেখা করিতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে। কিন্তু দূরত্ব এত বেশী এবং যাওয়া-আসা এত কষ্টকর যে যাওয়া আর হইয়া ওঠে না। বুড়ো-বয়সে ট্রামে, বাসে চড়িতে পারি না, মোটরে যাতায়াত খুবই ব্যয়সাধ্য। জীবনযাত্রাই দুঃসাধ্য আজকাল। চিঠিপত্র লিখিয়াও কাহারও খবর লওয়া যায় না, কারণ পোষ্টাফিসে না কি চিঠি বিলি হয় না। স্বাধীনতার পর সকলেই স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে। শাসন-কর্তারাই যেখানে অসাধু সেখানে এইরূপ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

পাটনা মেডিকেল কলেজের দুইজন শিক্ষকের স্মৃতি আজও মনে উজ্জ্বল হইয়া আছে। ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং সনৎ বরাট। শিক্ষক হিসাবে তো বটেই, মানুষ হিসেবেও তাঁহারা উচ্চ কোটির লোক ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন Eye, Ear, Nose এবং Throat-এর অধ্যাপক। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. বি. বি. এস. পরীক্ষার পাঠ্যক্রম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসরণে হইয়াছিল। সুতরাং Eye, Ear, Nose, Throat আলাদা একটি বিষয়রূপে গণ্য হইয়াছিল পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা Surgery-র অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং পাটনায় গিয়া ওই বিষয়গুলি আমাদের আবার ভালো করিয়া পড়িতে হইয়াছিল। এই বিষয়ে আমাদের সহায়ক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। আমার মনে চক্ষু রোগবিশেষজ্ঞ হইবার বাসনাও জাগিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কতো যত্ন করিয়া যে শিখাইয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষার সহিত কতো স্নেহ, কতো আন্তরিকতা যে ছিল তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝানো যাইবে না। তাঁহার মতো অতো ভালো লোক, অতো ভালো শিক্ষক আমি খুব বেশী দেখি নাই। তাঁহার সহিত প্রায় প্রত্যহ রাত্রি আটটা নয়টা পর্যন্ত 'ডার্ক রুমে' কাটাইয়াছি। তাঁহারই সাহায্যে আমি প্রথমে 'রেটিনা' (Retina) দেখি। যেদিন প্রথমে দেখিলাম সেদিন আনন্দে, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। আমাদের চোখের ভিতর যে অমন

একটা আশ্চর্যজনক দৃশ্য আছে, তাহার ছবি পুস্তকে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আসলে যে অমন চমৎকার তাহা আমার ধারণা ছিল না। সত্যই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। ফাইনাল পরীক্ষা দিয়াছি। লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগত জনৈক পরীক্ষক আমার প্র্যাক্‌টিকাল পরীক্ষা লইয়াছিলেন। বাহিরে যে সব রোগী ছিল তাহাদের পরীক্ষা সন্তোষজনক হইয়াছিল, কিন্তু 'ডার্ক-রুমে' যে রোগীটি বসিয়াছিল তাহাকে পরীক্ষা করিয়া আমি কোনও রোগই ধরিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণ রেটিনোস্কোপ দিয়া পরীক্ষা করিলাম কিন্তু কোন রোগের লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। আমার সন্দেহ হইল নিশ্চয় কোনও রোগ আছে আমি ধরিতে পারিতেছি না। শেষ-পর্যন্ত উত্তর লিখিতে হইল চোখে কোনও দোষ নাই। লিখিলাম বটে কিন্তু মনে একটা দুর্ভাবনা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনে হইল—ফেল হইয়া যাইব।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। আমাদের হোস্টেলের বিছানায় বিনিদ্র-নয়নে শুইয়া আছি। একটি ছেলে আসিয়া বলিল—'সুরেনবাবু এসেছেন। আপনাকে ডাকছেন।' আমি দ্রুতপদে দ্বিতল হইতে নামিয়া গেলাম। দেখিলাম সুরেন্দ্রনাথ মোটরে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন—'তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তুমি 'ডার্করুমে' যাকে পরীক্ষা করেছিলে সে লোকটি ওঁর মোটরের ড্রাইভার। উনি লক্ষ্মৌ থেকে মোটরে এসেছেন। চোখ খারাপ থাকলে তাকে উনি মোটরের ড্রাইভার রাখতেন না। আমার মনে হয় তুমি ঠিক উত্তরই লিখেছো। মনে হয় ওঁর কাছে তুমি ফুল-মার্কস পেয়েছো।'

অত রাত্রে আমার হোস্টেলে আসিয়া আমাকে ওই খবরটি দেওয়ার মধ্যে যে ভদ্রতার পরিচয় আছে তাহা আজকাল দুর্লভ। তখন তাঁহার সম্বন্ধে মনে যে শ্রদ্ধা জাগিয়াছিল, তাহা আজও আছে। শুধু একজন উৎকৃষ্ট শিক্ষক-রূপেই নয়, প্রথম শ্রেণীর ভদ্রলোক হিসাবেও তাঁহাকে এখনও মনে রাখিয়াছি।

ডাক্তার সনৎ বরাট ছিলেন একটু রুক্ষ, বগচটা প্রকৃতির মানুষ। চটিয়া গেলে মুখ খারাপ করিয়া গালাগালি দিতেন। তাঁহার রোগীরা, তাঁহার ছাত্রগণ সকলেই তাঁহার নিকট গালাগালি খাইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সকলেই তাঁহাকে ভালোবাসিয়াছে। তাঁহার কর্কশ বহিরাবরণের অন্তরালে একটি সুবর্ণখনি ছিল। পর্বতের ভিতর স্নেহ-মমতার যে নির্ঝরিণী ছিল তাহার সন্ধান পাইলে সকলেই মুগ্ধ হইত। চটিয়া গেলে ছাত্র, রোগীদের তিনি 'শালা' পর্যন্ত বলিতেন। কিন্তু ছাত্ররা, রোগীরা তাঁহার উপর রাগ করিত না, তাঁহার এমনি একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। তাঁহাকে আমরা ভয় করিতাম, ভালোও বাসিতাম। তাঁহার নিকট একদিন গিয়া আমরা বলিলাম—'স্যার, আমাদের Medicineটা আপনি revise করাইয়া দিন।' তিনি বলিলেন—'আমার আপত্তি নাই, আমি দুপুরবেলা আসিয়া তোমাদের পড়াইয়া দিব। কিন্তু তোমাদের পড়িয়া আসিতে হইবে।' বেলা দু-টা

হইতে চারটে পর্যন্ত আমাদের ক্লাস লইতেন। সে সময়টা ছিল তাঁহার বিশ্রামের সময়। কিন্তু আমাদের আবদারে সে সময়টুকু তিনি আমাদের জন্য ব্যয় করিতেন। ক্লাসে গিয়া তাঁহার বিদ্যাবত্তা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া যাইতাম। দেখিলাম Medicine এর বিখ্যাত বই Osler তাঁহার মুখস্থ। কোন বই বা খাতা না খুলিয়াই তিনি বক্তৃতা দিতেন, মনে হইতে একটা কল হইতে যেন ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। কখনও Osler, কখনও Price, কখনও বা অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে অনর্গল বলিয়া যাইতেন, আমরা বসিয়া শুনিতাম। মধ্যে মধ্যে তিনি এক আধটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। উত্তর দিতে না পারিলে গালাগালি দিতেন। এইভাবে তিনি সমস্ত Medicineটা আমাদের পড়াইয়া দিতেন। শুনিয়াছিলাম আমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আসিয়াছিল। প্রশ্ন-পত্রে কোন অল্টার্নেটিভ প্রশ্ন থাকিত না। প্রত্যেক প্রশ্নেরই উত্তব দিতে হইবে। আমাদের ফাইনাল পরীক্ষার একটি প্রশ্ন ছিল Epidemic Prophecy বিষয়। সনৎবাবু কিন্তু Epidemic Prophecy সম্বন্ধে আমাদের কিছু পড়ান নাই। কোনও Text বইতে তখন Epidemic Prophecy প্রসঙ্গে ছাপাও হয় নাই। পরীক্ষার হলে বসিয়া আমাদের মুখ শুকাইয়া গেল। সনৎবাবু পরীক্ষার হলে গার্ড দিতেছিলেন। তিনিও চটিয়া লাল হইয়া গেলেন এবং প্রশ্নকর্তাকে 'শালা' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। তাহাব পর তিনি যাহা কবিলেন তাহা আরও বিস্ময়কর। তিনি পরীক্ষার হল হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আধ ঘণ্টা পরে যখন ফিরিলেন তখন আমরা দেখিলাম দুইটি চাকর একটি ব্লাক-বোর্ড বহিয়া আনিতেছে। ব্লাক-বোর্ডে Epidemic Prophecy সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি বড় বড় করিয়া লেখা রহিয়াছে। চাকরেরা ব্লাক-বোর্ডটি ডায়াসেব উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। সনৎবাবু আমাদের প্রত্যেকের কাছে আসিয়া কানে কানে বলিলেন, লাইব্রেরীতে গিয়া তিনি ম্যাগাজিন হইতে Epidemic Prophecy সম্বন্ধে পয়েন্টগুলি বোর্ডে লিখিয়া দিয়াছিলেন। আমরা যেন ইহা দেখিয়া নিজেদের ভাষায় উত্তব লিখিয়া দিই।

এই অত্যাশ্চর্য বে-আইনী কাণ্ড ডাক্তার সনৎ বরাট ছাড়া আর কেহই করিতে পারিত না।

তাঁহার সম্বন্ধে আর একটি গল্পও মনে পড়িতেছে।

সেদিন পৌষ-সংক্রান্তি। পিঠে পার্বণ। আমরা পরীক্ষার্থীরা কেহই বাড়ি যাই নাই। হোস্টেলে পরীক্ষার পড়া লইয়া হিমসিম খাইতেছি। হঠাৎ একদিন সনৎবাবুর সহিত দেখা হইল। বলিলাম, 'শুনি, আপনার দিদি খুব ভালো পিঠে করেন। আমাদের অদৃষ্টে কি দুই-একটা পিঠে জুটিবে না?' সনৎবাবু বলিলেন, 'দিদি খুব বুড়ো হয়ে গেছেন, তিনি আর পিঠে তৈরী করতে পারেন না। পিঠে গড়বার লোক আমার বাড়িতে কেহ নাই। ওরা কেক, পুডিং, ওমলেট, চপ, কাটলেট বানাতে পারে। পিঠে বানাতে জানে না কেউ। পিঠে খাওয়াতে পারব না। তবে

ছুটো সেকেলে বুড়ি বাঁকিপুরে এখন আছে, তাদের যদি আনতে পারি, তা-হলে খবর দেব।' সন্ধ্যার একটু আগে খবর আসিল। তিনি নিজেই আসিয়াছিলেন, বলিলেন, 'পিঠে হবে, তোরা আসিস। রাতে খাবি।' গিয়া দেখি বিরাট খাওয়ার আয়োজন। শুধু আমাদের জন্য নয়, অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। শুধু পিঠা নয়, মাংস, পোলাও, মাছ, মিষ্টান্ন, পায়েসও। এ রকম অপূর্ব পিঠা অনেকদিন খাই নাই। সনৎবাবু আসিয়া বারবার ধমকাইতে লাগিলেন—'তোমাদের হুজুকে পড়েই এই আয়োজন, একটি জিনিস নষ্ট করতে পারবে না।'

সনৎবাবুর মতো লোক আজকাল বিরল। সনৎবাবু, সুরেনবাবু দু-জনেই এখন পরলোকে। আমাদের মনে তাঁহাদের স্মৃতিটুকু বাঁচিয়া আছে। এই সব স্মৃতির ঐশ্বর্যেই আমরা ঐশ্বর্যবান।

আজকাল 'আপনি-কোপনি'র যুগ। প্রত্যেকেরই নুন আনতে পান্তা ফুরায়; দীয়তাং ভুজ্যতাং আর হয় না। হইবেও না বোধ হয়। পাটনা কলেজের আর কোনও স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া মনে আঁকা নাই। কেবল কয়েকজন ছাত্রের কথা মনে আছে। বিধুভূষণ বসু এবং বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার অপেক্ষা কিছু জুনিয়র ছিল। তাহারা আমাকে দাদা বলিত। দু-জনেই পড়াশুনায় 'গুড-বয়' ছিল। আমি যদিও গুড-বয় ছিলাম না, কিন্তু তবু আমাকে তাহারা শ্রদ্ধা করিত, সম্ভবত আমার সাহিত্যের জন্যে। কারণ তখনও মাঝে মাঝে আমার কবিতা, গল্প ছাপা হইতেছিল। তাহাদের এই শ্রদ্ধা, ভালোবাসা কলেজ-জীবনেই শেষ হইয়া যায় নাই। সাংসারিক জীবনেও তাহা বিস্তৃত হইয়াছিল। বিধুর মতো অমন সরল সদা-হাস্যময় প্রাণখোলা ভদ্রলোক জীবনে বেশী দেখি নাই। কিছুদিন আগে সে মারা গিয়াছে। শেষজীবনে কলিকাতায় টালিগঞ্জের কাছাকাছি বাড়ি করিয়াছিল। মাঝে মাঝে আমার সহিত দেখা করিতে আসিত। তাহার প্রাণ-খোলা উচ্চ হাস্য এখনও যেন শুনিতে পাইতেছি। বীরেন ছিল চালাকচতুর প্রকৃতির লোক, কিন্তু সাহিত্য-রসিক ছিল সে। সেইজন্যেই আমার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। সে এখন মুঙ্গেরে আছে। আরও দুইটি ছাত্রের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। একজনের নাম ধীরেন দত্ত, আর একজনের নাম বিজয় (সম্ভবত বসু)। ইহারা দুইজনে, পরে মুঙ্গেরে ল্যাবরেটরি করিয়াছিল। ইহারা আমাকে অনেক কেস পাঠাইত। সেজন্য ইহাদের নিকট আজও কৃতজ্ঞ আছি। ধীরেনের শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছিল। রাত্রে নিজের ক্লিনিকে সে হার্ট-ফেল করিয়া মারা যায়। তখন সেখানে কেহ ছিল না। পরদিন তাহার মৃতদেহ আবিষ্কার হয়। পাটনা কলেজের জীবনের প্রধান ঘটনা আমাদের ব্যাঙ্গালোর যাত্রা। আমরা যখন পাটনায় যাই তখন আমাদের Maternity ward (ছেলে প্রসব করানো) করা হয় নাই। নিয়ম ছিল পরীক্ষা দিবার আগে প্রতিটি ছাত্রকে ত্রিশটি প্রসব করাইতে হইবে। পাটনা মেডিকেল কলেজে তখন Maternity ward ছিল না। সুতরাং বিহার গভর্ণমেন্ট আমাদের জন্য ব্যাঙ্গালোরের Victoria

হাসপাতালের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহারা প্রতিমাসে চারজন ছাত্রকে হাতে-কলমে প্রসব করানো শিখাইবেন এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমাদের জন্যে হাসপাতালের কাছে একটি ঘরভাড়া করিলেন বিহার গভর্ণমেণ্ট। একটি রাঁধুনী এবং চাকরও ছিল। সরকারের খরচেই আমরা সেখানে গিয়াছিলাম। আমার সহযাত্রী তিনজন আগেই চলিয়া গিয়াছিলেন। আমি একা শেষ মুহূর্তে গিয়া পৌঁছিলাম। গিয়াই শুনিলাম আমার আগে যে তিনজন আসিয়াছিলেন সকলেই একটি করিয়া প্রসব করাইয়াছেন। ইহার পরই আমার পালা। ভিক্‌টোরিয়া হাসপাতালে নাকি প্রত্যহ চার পাঁচটা 'ডেলিভারি-কেস' হয়। খুব বড় হাসপাতাল। ঘণ্টাখানেক পরেই আমার ডাক আসিল। আমি তখন খদ্দরের জামা-কাপড় ছাড়া অন্য কিছু পরিতাম না। তাহা পরিয়াই ওয়ার্ডে গেলাম। দেখিলাম একটি মেয়ে টেবিলের উপর শুইয়া প্রসব-ব্যথায় কাঁদিতেছে। একটি তরুণী মেম নার্স তাহাকে সান্ত্বনা দিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু পারিতেছে না। দুই-জনের ভাষা আলাদা। একজনের তামিল, তেলেগু অথবা কানাড়ি (ঠিক জানি না) আর একজনের ইংরেজি। এখানে কোন রোগিণীর ভাষা আমি বুঝিতে পারিতাম না। মনে হইত কড়মড় করিয়া কি যেন বলিতেছে। আমি লেবার-রুমে ঢুকিবামাত্র নার্সটি আমাকে একটি এপ্রণ (Apron) পরাইয়া দিলেন। নিকটেই একটি বর্ষীয়সী গম্ভীরপ্রকৃতির মেট্রন দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে আদেশ করিলেন, 'Now, wash your hands properly'. Liquid Antiseptic soap হাতে ঢালিয়া হাত ধুইলাম এবং কড়া বুরুশ দিয়া নখগুলিও পরিষ্কার করিলাম। মেট্রন বলিলেন, 'অন্তত পাঁচ-মিনিট করিয়া হাত ধুইতে হইবে।' তিনি নিজের হাত-ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আমি যতক্ষণ না থামিতে বলি, ততক্ষণ হাত পরিষ্কার কর।' পাঁচ-মিনিট ধরিয়াই বুরুশসহযোগে হাত পরিষ্কার করিলাম। তাহার পর নার্সটি একজোড়া স্টেরিলাইজড (sterilised) রবারের দস্তানা আনিয়া দিল। তাহার পর টেবিলের দিকে আগাইয়া গেলাম। শিশুর মাথাটি অল্প অল্প দেখা যাইতেছে। মেট্রনের নির্দেশমত কাজে লাগিয়া পড়িলাম। তিনি যেমন যেমন বলিতে লাগিলেন তেমনি করিতে লাগিলাম। তিনিই এ বিষয়ে আমার প্রথম শিক্ষয়িত্রী। অত্যন্ত গম্ভীর, একটিও বাজে কথা বলিলেন না। নির্দেশগুলি নির্ভুল। একটি কন্যা প্রসব করাইলাম। নার্স সেটিকে পরিষ্কার করিবার জন্যে পাশের ঘরে লইয়া গেল। সব শেষ হইয়া গেলে মেট্রন আমাকে বলিলেন—'তুমি কাপড় পরিয়া আসিয়াছ কেন? কাল হইতে ট্রাউজার পরিয়া আসিতে হইবে।'

বলিলাম, 'আমার তো ট্রাউজার নাই।'

'তাহা হইলে এখানে কিনিয়া লও। এখানে তোমাদের ডাক্তার বলিয়া পরিচয় দিয়াছি। এখানে ডাক্তারমাত্রেই সাহেবী পোষাক পরে। তোমাকেও তাহা পরিতে হইবে।'

বলিলাম, 'সাহেবী স্যুট করাইবার পয়সা আমার নাই। আমি গরীবের ছেলে। বেশী টাকাও সঙ্গে নাই।'

মেট্রন ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'একটা ট্রাউজার তোমাকে কিনিতেই হইবে। কাপড়পরা চলিবে না।' নার্সটি আমার দিকে তাকাইয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

আমি পরদিন সকালে উঠিয়াই বাজারে চলিয়া গেলাম এবং মোটা খদ্দর কিনিয়া দুইটা প্যান্টালুন করাইতে দিলাম। দরজিকে বলিলাম, 'ডবল চার্জ দিব, কিন্তু আজ সন্ধ্যার মধ্যে চাই।' সন্ধ্যার মধ্যেই পাইয়া গেলাম। পরের দিন যখন হাসপাতালে গেলাম তখন আমি প্যাণ্ট-ভূষিত। প্যাণ্টের ভিতর আমার খদ্দরের পাঞ্জাবীটা ঢুকাইয়া দিয়া, পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটাইয়া যখন আমি হাসপাতালে উপস্থিত হইলাম তখন সেই নার্সটির সহিত দেখা হইল। সে আমাকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল।

বলিল, 'এ কি কাপড়ের প্যাণ্ট করাইয়াছ? কোথায় করাইলে? কাট-ছাঁটও তো ভাল নয়—।'

আমি বলিলাম—'কাপড় যদিও আমাদের দেশীয় জিনিস। কাট-ছাঁট যাই হোক আইন বাঁচিবে বলিয়া মনে হয়। Matron wanted me to imprison my legs in a pair of tubes that I have done.'

মেট্রন আসিয়া আমাকে দেখিলেন। কোনও মন্তব্য করিলেন না। মনে হইল ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

আমার তিনজন সঙ্গী রীতিমত সাহেবী স্যুট পরিয়া হাসপাতালে যাইত। তাহাদের চাল-চলনও সাহেবীগোছের ছিল। আমার ছিল ওই কিম্ভূতকিমাকার পোষাক, আমি আদব-কায়দাও তেমন জানিতাম না। কথায় কথায় Thank you বলিতে পারিতাম না;—ইহার জন্যেই, এই বৈসাদৃশ্যের জন্যই বোধ হয় সেই নার্সটি আমার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কৌতূহলী হইল এবং আমার বন্ধুদের নিকট আমার সম্বন্ধে খবরাখবর লইতে লাগিল। বন্ধুরা তাঁহাকে জানাইল যে, আমি কবিতা লিখিতে পারি। নার্সটি আমার সম্বন্ধে আরও উৎসুক হইল। ঔৎসুক্যের আর একটি কারণ বোধ হয় আমি আমাদের পরিমণ্ডলে একটু বেখাপ্পাগোছের ছিলাম। কাহারও সহিত বিশেষ মিশিতাম না। সিনেমা যাইতাম না। হাসপাতালে গিয়া নার্সদের সহিত আলাপ জমাইবার প্রবৃত্তিও আমার ছিল না। ইহার উপর আর একদিন আর একটি কাণ্ড ঘটিল। তখন ক্ষুর দিয়া দাড়ি কাটিতাম। খুব ভোরে সেদিন হাসপাতাল হইতে আমার ডাক আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি কামাইতে গিয়া আমার ডানদিকের গোঁফের খানিকটা কাটিয়া গেল। বামদিকের গোঁফের খানিকটা কাটিয়া সমতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। পূর্বদিন রাত্রে হাসপাতালে স-গুম্ফ গিয়াছিলাম, সকালে যখন গেলাম তখন আমি গুম্ফহীন। কারণ সমস্ত

গোঁফটাই কামাইয়া ফেলিতে হইয়াছিল। নার্সটি সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

'হঠাৎ গোঁফ কামাইলে কেন?'

বলিলাম, 'Accident.'

আনুপূর্বিক সব শুনিয়া সে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। একটি কথা আগে উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছি। নার্সটিও নবাগতা। স্কটল্যাণ্ড হইতে এখানে চাকরী করিতে আসিয়াছে। আমি যেদিন প্রথম হাসপাতালে আসি, সে-ও সেইদিনই প্রথম কাজে যোগদান করে। সে স্কটল্যাণ্ডবাসিনী বলিয়া ইংরেজদের প্রতি মনে মনে একটু বিরূপ। আমার খদ্দর-প্রীতি দেখিয়া সে আমার সম্বন্ধে মনে মনে সশ্রদ্ধ হইয়াছিল। পরে জানিয়াছিলাম সেও স্কটল্যাণ্ডের home shine কাপড ছাডা অন্য কাপড ব্যবহার করে না। যদিও কাজের সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে তাহার কাছে যাইতাম না, তবু তাহার সম্বন্ধে কেন জানি না একটা আত্মীয়তা-বোধ জাগিয়াছিল মনে। সে ভাবটা মনে মনেই ছিল, বাইরে কখনও প্রকাশ করি নাই।

সেদিন কাজের পর সে হঠাৎ আমাকে বলিল, 'ওভালটিন খাইবে? আমার ঘরে এসো। আমি এখনই ওভালটিন বানাইব।'

তাহার ঘরে গেলাম। চমৎকার এক কাপ ওভালটিন খাওয়াল সে।

তাহার পর হঠাৎ প্রশ্ন করিল—'তুমি সিনেমা দেখ না?'

'না। পয়সায় কুলোয় না।'

'আমি তোমাকে দেখাইব। চল না, আজ একটা ছবি আছে—'

'না, তোমার পয়সায় আমি যাইব না। আমি পুরুষ, আমারই উচিত তোমাকে দেখানো। কিন্তু আপাতত হাতে পয়সা নাই। দুই একদিনের মধ্যে বাড়ি হইতে টাকা আসিবে—তখন যাইব।'

বাড়ি হইতে টাকা আসিবার পর দুইখানি নিম্ন শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া সিনেমায় গিয়াছিলাম তাহাকে লইয়া।

সে নিম্নশ্রেণীতে বসিতে আপত্তি করিল। বলিল, 'আমি টিকিট বদলাইয়া আনিতেছি—টিকিট দুইটি দাও আমাকে—'

আমি ইহাতে রাজি হইলাম না। সিনেমা দেখা হইল না।

ঘনিষ্ঠতা ইহাতে যেন আরও বাড়িল। একদিন হঠাৎ সে প্রশ্ন করিল, 'তোমার বন্ধুরা বলিতেছিল তুমি কবি। সত্যি?'

বলিলাম, 'হ্যাঁ, আমি কবিতা লিখি।'

'আমাকে দেখাও না।'

'আমি বাংলায় কবিতা লিখি। তুমি তো তাহা বুঝিতে পারিবে না।'

'তুমি ইংরাজীতে কবিতা লিখতে পার না?'

'আগে কখনও লিখি নাই। তবে চেষ্টা করলে পারি হয়ত—'

অনুনয় করিয়া বলিল, 'তবে একটা লেখ না! প্লীজ—'

'বিষয়টা তুমি ঠিক করিয়া দাও—'

মুচকি হাসিয়া বলিল, 'আমার সম্বন্ধে লেখ।'

'লিখিতে পারি। তবে সে কবিতা তোমাকে এখানে দেখাইতে পারিব না—'

'কেন?'

'কারণ তোমার সম্বন্ধে আমার যাহা সত্য ধারণা, তাহা তোমার সামনে প্রকাশ করা অসম্ভব। আমি এখান হইতে যেদিন চলিয়া যাইব, সেদিন তোমার নামে কবিতাটি ডাকে পাঠাইয়া দিব। আমি চলিয়া গেলে পড়িয়া দেখিও।'

কয়েকদিন কাটিল।

সহসা একদিন সে প্রশ্ন করিল—'তুমি কি বিবাহিত?'

'না। আমাব বিবাহ হয় নাই।'

'কবে বিবাহ করিবে?'

'আমার বাবা-মা তাহা ঠিক করিবেন।'

'তোমার বাবা-মা? তোমার বউ তাঁহারা ঠিক করিবেন? এ তো বড অদ্ভুত।'

'ওই আমাদের সমাজের নিয়ম। ছেলেমেয়ের বিবাহ বাবা-মাই ঠিক করিবেন।'

'তুমি যাহাকে জীবনসঙ্গিনী করিবে তাহার সঙ্গে আগে মিশিবে না?'

'না। আমাদের সমাজে সে রেওয়াজ নাই। তবে বাবা-মা ভালো বংশের ভালো মেয়েই পছন্দ করিবেন এ বিশ্বাস আছে।'

নার্সটি কয়েক সেকেণ্ড চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'তুমি কবি, তুমি নিশ্চয় মনে মনে তোমার জীবনসঙ্গিনীর একটি কাল্পনিক ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছ। সে ছবি কিরূপ?'

'অবর্ণনীয়।'

নার্সটি মুচকি হাসিয়া বলিল, 'তাহার একটি নেগেটিভ বর্ণনা কিন্তু আমি দিতে পারি।'

'দাও—'

'তাহার সহিত আমার কিছু মিল নাই।'

দুইজনেই হাসিয়া উঠিলাম।

বলিলাম, 'তোমার মত রূপসী আমাদের সমাজে দুর্লভ। তুমি আমাদের সমাজে বেমানান।'

আমি ব্যাঙ্গালোর ত্যাগ করিবার দিন তাহাকে একটি কবিতা লিখিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। এই কবিতাটি আমার 'ডানা' পুস্তকে রূপচাঁদের জীবনীতে ছাপা আছে।

কবিতাটি এই—

Evening speaks in golden clouds
Morning speaks in light.
Flowers speak in scented petals
Lightning speaks in flight.
The manner in which they express
Is simple, plain and sweet.
But what we do, we human beings ?
We know not how to do it.
When the heart is full and feelings melting
We try to hide and alter.
When the eyes speak, the tongue denies
Words fail or falter,
I know not how to word my feelings
How to call my Muse
I wish I had the knack of Nature
To sing in light and Huse.

কবিতাটি 'ডানা' বই লিখিবার বহু আগে সেই নার্সের উদ্দেশেই লিখিয়াছিলাম। তাহার সহিত জীবনে আমার আর দেখা হয় নাই। আমি তাহার নাম জানিতাম, সে কিন্তু আমার পুরা নাম জানিত না। আমি তাহার কাছে—'স্টুডেণ্ট মুখার্জি' নামেই পরিচিত ছিলাম। নার্সের নামটা ইচ্ছা করিয়াই উহ্য রাখিলাম।

ব্যাঙ্গালোর হইতে আমি সোজা মণিহারী চলিয়া গেলাম বাবা-মায়ের কাছে। কারণ কলেজে কোনো ক্লাস বা ওয়ার্ড বাকি ছিল না। ইহার পর গিয়াই ফাইনাল পরীক্ষায় বসিতে হইবে। তাহার পূর্বে, বাবা-মাকে প্রণাম কবিবার জন্য মণিহারী চলিয়া গেলাম। পীরবাবার নিকটও মানত করিলাম। মনে মনে ভয় ছিল। কলিকাতা হইতে আসিয়াই মাইনর এম. বি. বি. এস. পরীক্ষাটা দিয়াছিলাম। কিন্তু জুরিসপ্রুডেন্টে প্র্যাকটিক্যালে পাশ করিতে পারি নাই। আমরা জুরিস প্র্যাকটিকালে মড়া চিরিয়াছি। এখানে পরীক্ষক আসিয়া কাঠের টুকরার মতো একটা ধরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'পুলিস এই হাড়ের টুকরোটা পাঠাইয়া দিয়াছে। ইহার রিপোর্ট তুমি দিবে।' এ ধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। বলিলাম, 'প্রথমে ঠিক করিতে হইবে এটা মানুষের হাড় কিনা। আমি প্রথমে একজন Zoologist-এর সহিত পরামর্শ করিব।' এ উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। আমাকে ফেল করাইয়া দিলেন। পরীক্ষক ছিলেন প্রফেসর মোডি। শুনিলাম তাঁহার একটি বই আছে এবং তাহাতে ঐ প্রশ্নের উত্তর আছে। পরে তাহার বইটি কিনিয়া পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম।

ইহার অল্পদিন পরে বাবা আমার বিবাহ দিলেন। চীনের কাছাকাছি আপার বর্ডার মিচিনা শহরের অ্যাডভোকেট শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী তখন বেথুন কলেজে আই-এ ফার্স্ট ইয়ারে পড়িতেছিল। বাবার বন্ধু আশুতোষ চক্রবর্তী (আমাদের আশু জ্যাঠামশাই) সম্বন্ধটি আনিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই বিবাহ হইয়া গেল। কিছুদিন পূর্বেই আমার জীবনে রোমান্সের একটা আভাস জাগিয়াছিল। বিবাহের পর সে রোমান্স অন্য রোমান্সে রূপান্তরিত হইয়া আমার জীবনকে উদ্ভাসিত করিয়া দিল। আমি বাবার বড় ছেলে। সুতরাং আমার বিবাহে প্রচুর ধূম হইয়াছিল। বিবাহ করিতে যাইবার পূর্বে প্রকৃতি এমন ধূমধাম করিয়া বর্ষা নামাইয়া দিলেন যে, আমরা মুশকিলে পড়িয়া গেলাম। মণিহারী হইতে স্টীমার করিয়া গঙ্গা পার না হইলে কলিকাতায় পৌছোন যাইবে না। কিন্তু এমন বৃষ্টি ও সাইক্লোন শুরু হইল যে রেল-কোম্পানী আদেশ দিলেন সাইক্লোন না কমিলে স্টীমার ছাড়া যাইবে না। ওদিকে আমার ভাবী শ্বশুরমশাই কলিকাতায় একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। কথা ছিল আমরা বিবাহের একদিন আগেই পৌছিব। তাহা কিন্তু সম্ভব হইল না। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি। বাবা অবশেষে স্টীমারের সারেংকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সারেং এবং স্টীমারের সব খালাসীর ডাক্তার বাবাই ছিলেন। সারেং বলিল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওপর-ওলার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আমরা আপনাদের পার করিয়া দিব। বাবুর বিয়ে পণ্ড হইতে দিব না।

তাহাই হইল। ৭০জন বরযাত্রীসহ স্টীমারটি ছাড়িল এবং আমাদের সকরিগলিঘাটে পৌছাইয়া দিল। সেখান হইতে আমরা হাঁটিয়া সকরিগলি স্টেশনে গেলাম এবং সেখান হইতে কলিকাতার ট্রেন ধরিলাম। আমার বিবাহের তারিখ ছিল ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ সাল। বাঙালী, বিহারী, হিন্দু, মুসলমান, মাড়োয়ারি—সবরকম বরযাত্রীই আমাদের সঙ্গে ছিল। বন্দুকধারী ডাঃ গিরিজাবাবুও ছিলেন। তিনি এক কাণ্ড করিলেন। সকালে জলযোগ করিয়া মাড়োয়ারি, বিহারী বন্ধুদের লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—চলুন আপনাদের কলিকাতা দেখাইয়া আনি। কাঁধে রাইফেল লইয়া প্যাণ্ট পরিয়া তিনি অগ্রবর্তী হইলেন। বাকি সকলে সার বাঁধিয়া তাঁহার পিছু-পিছু চলিতে লাগিল। ফিরিলেন ঘণ্টাতিনেক পরে। ভবানীপুর হইতে তিনি তাহাদের লইয়া আউটরামঘাটে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া সকলকে গঙ্গাস্নান করাইয়া আনিয়াছেন। বরযাত্রীহিসাবে আমার কলিকাতার বন্ধুরাও সকলে আসিয়াছিল। তাহারাও প্রায় সংখ্যায় একশত। আমার শ্বশুরমশাই খুব ভালো খাওয়াইয়াছিলেন। ইলিশমাছের ডিমের অম্বলের কথা আজও মনে আছে।

মণিহারীতে জাহাজঘাটে বিরাট একটা জনতা আমাদের অভ্যর্থনা করিল। বহু ঢাক-ঢোল এবং শিঙা একযোগে বাজিয়া উঠিল। ও অঞ্চলে যতো ঢাকি-ঢুলী

সকলেই অনাহুত আসিয়া হাজির হইয়াছিল। জনতার মধ্যে সুসজ্জিত হাতী ও ঘোড়া ছিল। আমাদের জন্য পালকি ছিল। লীলা এবং আমি দুইটি সুসজ্জিত পালকিতে চড়িয়া রওনা হইলাম। আমাদের আগে একটি ঘোড়া নানারকম খেলা দেখাইতে দেখাইতে চলিল। ঢাক-ঢোলের বাদ্যে আকাশ-বাতাস ভরিয়া উঠিল। গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা হাতীতে চড়িয়া মিছিলের পিছনে পিছনে আসিতে লাগিলেন। বিরাট মিছিল।

বিরাট ভোজেরও আয়োজন হইয়াছিল। বাবার জমিদারবন্ধুগণ প্রচুর মাছ, দই, আম, ক্ষীর উপহার পাঠাইয়াছিলেন। তিনদিন ধরিয়া বহুলোককে খাওয়ানো হইয়াছিল। বাবা ও মা দুইজনেরই গলা ভাঙিয়া গিয়াছিল। আমাদের আত্মীয়-স্বজনও প্রায় সকলেই আসিয়াছিলেন এবং বিবাহের পরেও অনেকদিন আমাদের বাড়িতে ছিলেন।

সব চুকিয়া যাইবার পর লীলা কলিকাতায় বেথুন কলেজের হোস্টেলে ফিরিয়া গেল। মা, বাবা স্থির করিলেন আই-এ পরীক্ষাটা দিয়া তবে সে বাড়িতে আসিবে। আমিও পাটনায় চলিয়া গেলাম। আমার তখন সম্মুখে পরীক্ষা, শিরে সংক্রান্তি।

পাটনা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডটন (Dutton) সাহেবের নিকট গিয়া বলিলাম যে আমি ব্যাঙ্গালোরে ৪৫টি কেস ডেলিভারি করাইয়াছি। হাসপাতালের সুপারিনটেনডেণ্ট আমাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন। সেটি সাহেবকে দেখাইলাম।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, 'I think you had a very good time there.'

'Yes sir, I was quite happy'.

'I know. I have a proof of it also. Here you are.'

টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া সাহেব একটি মোটা খামের চিঠি বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। দেখিলাম খামটি খোলা। খামের উপর ঠিকানা—Student Mukherjee, C/o Principal P.W. Medical College, Patna, Bihar.

সেই নার্সের চিঠি। বলা বাহুল্য, আমি একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলাম।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, 'That's alright. কোনক্রমে তাহার অফিস হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

সুদীর্ঘ চিঠি। তাহাতে কি লেখা ছিল এখন ঠিক মনে নাই। এইটুকু মনে আছে তাহাতে উচ্ছ্বাসপূর্ণ আবোল-তাবোল ছিল না, ছিল পাশ্চাত্য রমণীদের অনিশ্চিত দাম্পত্যজীবনের ব্যথা-বেদনার কাহিনী। বারবার লিখিয়াছিল, তোমাদের সমাজ-ব্যবস্থা ঢের ভালো। আমরা ঘাটে ঘাটে ছিপ ফেলিয়া বেড়াই, তোমাদের তাহা করিতে হয় না। আমাদের বয়স যখন বাড়িয়া যায় তখন আমরা old maid হইয়া জীবনের আনন্দলোক হইতে নির্বাসিত হই। অনেকদিন পরে 'Anton Chekhov'-এর লেখা 'A Woman's Kingdom' গল্পে এই বেদনার প্রতিধ্বনি শুনিয়াছিলাম।

ডটন সাহেব আবার একদিন ডাকিয়া পাঠাইলেন অফিসে। ভয় হইল আবার বুঝি সেই নার্সের চিঠি আসিল। কিন্তু গিয়া দেখিলাম বিপদ অন্যরকম। ডটন সাহেব বলিলেন—কলিকাতা হইতে তোমাদের যে রিপ্লাই আসিয়াছে, তাহাতেও দেখিতেছি তুমি Mental Disease-এর ward কর নাই। তোমাকে রাঁচি যাইতে হইবে। আমি বলিলাম—ভুল রিপোর্ট আসিয়াছে। আমি Mental Disease-এর সব ক্লাসেই হাজির ছিলাম। ডটন সাহেব বলিলেন—তবে তুমি নিজে কলিকাতায় যাও এবং ভুল সংশোধন করিয়া আনো। আমি কলিকাতার মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালকে একটি পত্র লিখিয়া দিতেছি। তুমি নিজেই চলিয়া যাও। যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। প্রথমে মেডিকেল কলেজের অফিসে গেলাম। আমাকে দেখিয়া ক্লার্ক একটু মৃদু হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন, কি ব্যাপার? সব খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, দাঁড়ান, রেজিস্ট্রি-খাতাটা খুলিয়া দেখি। খাতা খুলিয়া দেখা গেল, খাতায় আমার সমস্ত P-গুলি কাটিয়া কে 'A' লিখিয়া রাখিয়াছে। অবাক হইয়া গেলাম। খোঁজ করিলাম যে সাহেব প্রফেসর আমাদের Mental Disease পড়াইয়াছিলেন তিনি কোথায়। তিনি আমাকে ভালোভাবে চিনিতেন। শুনিলাম, তিনি পেশোয়ারে বদলি হইয়া গিয়াছেন। বলিলাম, তাহা হইলে এখন উপায় কি? অম্লানবদনে ক্লার্ক বলিলেন—আমাকে পঞ্চাশটা টাকা যদি দেন আমি এই রেজেস্ট্রি-খাতার পাতা বদলাইয়া সব ঠিক করিয়া দিব। সম্মত হইলাম। বন্ধুদের নিকট হইতে টাকা কর্জ করিয়া আনিয়া তাঁহাকে দিলাম। তিনি খাতার পাতা বদল করিয়া সব ঠিক করিয়া দিলেন। আমাকে বলিলেন—এইবার আপনি গিয়া প্রিন্সিপালের সহিত দেখা করুন। প্রিন্সিপাল ক্লার্ককে ডাকিলেন। তাহাকে আদেশ করিলেন—রেজেস্ট্রি-খাতা লইয়া এস। ক্লার্ক রেজেস্ট্রি-খাতা লইয়া আসিল এবং মাথা চুলকাইয়া বলিল—সত্যই এই ছেলেটির সম্বন্ধে ভুল রিপোর্ট পাঠানো হইয়াছে। ছেলেটি সেন্ট-পারসেন্ট ক্লাসে Attend করিয়াছিল। সাহেব তাহাকে খুব বকিলেন। সে মাথা হেঁট করিয়া বকুনিটি হজম করিল। বার্নাডো সাহেব বলিলেন—এখন আমাদের ত্রুটিস্বীকার করিয়া একটি চিঠি draft করিয়া আনো। আমি এখনই সই করিয়া দিব। আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'Boy, I am very sorry'. ব্যাপারটা এখনও আমার নিকট রহস্যময় হইয়া আছে। মেডিকেল কলেজের অনেক ছাত্রদের নিকট 'ক্লার্করা' 'উপরি' কিছু পাইত। আমি কিন্তু কখনও কাহাকেও কিছু দিই নাই, তাহাদের নিকট কোন কৃপাপ্রার্থনাও করি নাই। মনে হয় তির্যকপথে ক্লার্কটি আমার নিকট হইতে কিছু 'উপরি' আদায় করিয়া লইল।

ডটন সাহেবের নিকট ফিরিয়া গেলাম। তিনি আমাকে ফাইনাল M.B.B.S-এর পরীক্ষার্থীরূপে মনোনীত করিয়া যথাস্থানে নাম পাঠাইয়া দিলেন। আমি 'ফি' জমা দিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

পরীক্ষা মোটামুটি ভালই হইল। পরীক্ষার সময় Eye, Ear, Nose, Throat

এবং প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় যে বিপদে পড়িয়াছিলাম তাহার কথা আগেই বলিয়াছি। Medicine প্র্যাকটিকালের সময়ও একটু ভয় হইয়াছিল। আমার যে লং কেসটি পড়িয়াছিল সঠিকভাবে তাহার রোগনির্ণয় করিতে পারি নাই। যতদূর মনে হয় সেটি ডিসেমিনেটেড স্পাইনাল স্ক্লেরোসিস ছিল। আমাদের প্রশ্ন ছিল—Examine the case, give your Diagnosis and treatment. সময় তিন ঘণ্টা। আমি রোগীটিকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিলাম। যাহা যাহা পাইলাম লিখিলাম। Diagnosis-এর বেলায় লিখিলাম রক্তের W. R. পরীক্ষা না করিয়া ঠিক Diagnosis দেওয়া যায় না। মনে হইতেছে ব্যাপারটা ডিস্সেমিনেটেড স্ক্লেরোসিস। কি চিকিৎসা করিব তাহারও একটা প্রেসক্রিপ্সন লিখিয়া দিলাম। পরীক্ষক ছিলেন লক্ষ্ণৌ কলেজের Sprawson সাহেব। তিনি আসিয়া আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন এবং আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন। ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

আমাদের Midwifery এবং Gynaecology-র বাহিরের পরীক্ষক ছিলেন Green Armitage সাহেব। তিনি আমাকে যে সব প্রশ্ন করিলেন তাহার সহিত ধাত্রীবিদ্যার কোন সম্পর্ক নাই।

'এখানে আসিয়া কেমন আছ?'

'ভালই।'

'এখানকার খাওয়াদাওয়া কেমন?'

'ভাল। হোস্টেলে থাকি।'

'খেলা-ধূলার ব্যবস্থা আছে?'

'আছে।'

'এখানকার নার্সরা ভদ্র-ব্যবহার করে তো?'

'হাঁ, তাহারা খুব ভালো।'

'আচ্ছা, তুমি যাইতে পার।'

তখন আর একজন পরীক্ষক তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে উহাকে আপনি Midwifery বা Gynaecology সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেন নাই।

আর্মিটেজ সাহেব উত্তর দিলেন—'ও আমার ছাত্র ছিল। উহার বিদ্যার দৌড় কতদূর তাহা আমি জানি। প্রশ্ন করিবার দরকার নাই। আপনি যদি প্রশ্ন করিতে চান করুন।' তিনি তখন দুই-একটি প্রশ্ন করিলেন, আমার উত্তর শুনিয়া খুশীও হইলেন।

অন্যান্য বিষয়েও পরীক্ষা ভালো হইল। পরীক্ষা দিয়া এবং কবে পরীক্ষার ফল বাহির হইবে তাহার খবর লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলাম। এবার মা-বাবা ছাড়া আর একটি আকর্ষণ ছিল—নব-বিবাহিতা বধূ—লীলা। সে আমার জন্য কলেজ কামাই করিয়া বসিয়াছিল। তাহার পর আমার জীবনে নতুন রং লাগিল। আমার সাহিত্যেও একটা নতুন মোড় ঘুরিল। লীলা হোস্টেলে চলিয়া গেল। প্রেমপত্র ও প্রেমের কবিতা লিখিতে শুরু করিলাম। পরিমল তাহার স্মৃতিচারণে লিখিয়াছে

যে এই সময়টা আমি সাহিত্য-চর্চা হইতে বিরত ছিলাম। মোটেই বিরত ছিলাম না। কিন্তু যে সাহিত্য আমি তখন রচনা করিয়াছিলাম তাহা মাসিকপত্রে প্রকাশযোগ্য ছিল না। তাহা লীলার নিকট প্রেরিত এবং সে তাহা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিত। এই চিঠিগুলির কয়েকটি পরে আমি কিছু পরিবর্তন করিয়া আমার 'কষ্টিপাথর' উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছিলাম। প্রেমের কবিতাগুলি অনেকদিন পর সুরেশ তাহার 'উত্তরা' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিল এবং আমি সেগুলি 'সুরসপ্তক' পুস্তকে সংকলন করিয়াছি। 'চতুর্দশী'-নামক সনেটগুলিও লীলাকে কেন্দ্র করিয়াই লেখা। কিন্তু এগুলি অনেক পরে লিখিয়াছিলাম। সজনীকান্ত এগুলি 'শনিবারের চিঠি'তে দুই সংখ্যায় প্রকাশ করে। এ কবিতাগুলি কবি মোহিতলালের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। এ সব অবশ্য অনেক পরের কথা। আমি পাটনা হইতে আসিবার সময় একটি ছেলেকে টাকা দিয়া আসিয়াছিলাম, সে যেন পরীক্ষার ফল বাহির হইবামাত্র আমাকে খবরটা জানাইয়া দেয়।

যে তারিখে পরীক্ষকদের মিটিং হইয়া পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হইবে সে তারিখটা আমার জানা ছিল।

মা আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে আমার পরীক্ষার ফল বাহির হইবে। আমি তারিখটা বলিলাম। আরও বলিলাম সেই তারিখে বেলা এগারোটা নাগাদ পরীক্ষকদের মিটিং হইবে এবং তাহার পর পরীক্ষার ফল জানা যাইবে।

আমি প্রতিদিন সকালে চা খাইয়া আমাদের বাহিরতলার বাগানে চলিয়া যাইতাম। বাহিরতলায় আমাদের চল্লিশ বিঘার একটি আমবাগান আছে। বাবা সেখানে একটি ছোট্ট ঘরও করাইয়াছিলেন। আমি সেখানে বসিয়াই পড়াশুনা করিতাম। সেই সময়ই বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থগুলি আর একবার পড়িয়াছিলাম।

একদিন—তখন প্রায় বেলা বারোটা হইবে, দেখিলাম মা মাঠের উপর দিয়া দ্রুতপদে হাঁটিয়া আসিতেছেন। রোদে তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। মা কাছাকাছি আসিয়া বলিয়া উঠিলেন—'তুই পাশ করেছিস।' আনন্দে তাঁহার মুখ উদ্ভাসিত।

'টেলিগ্রাম এসেছে নাকি!'

'না। আমি ঠাকুরঘরে ছিলাম। ঠাকুর আমাকে বললেন—তোর ছেলে পাশ করেছে।'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'ও তোমার কল্পনা।'

'না দেখিস, একটু পরে ঠিক খবর আসবে। আমার ঠাকুর মিথ্যেকথা বলে না।'

মায়ের ঠাকুর ছিলেন জগদ্ধাত্রীর পট একটি। আমি আর মায়ের সহিত তর্ক করিলাম না। মা বলিলেন—'বেলা হয়ে গেছে। চল, খাবি চল। টেলিগ্রাম আসুক, তারপর পীরবাবাকে সিন্নি দেব।'

বিকেলবেলা টেলিগ্রাম পাইলাম, আমি পাশ করিয়াছি।

কয়েকদিন পরে পাটনা গভর্ণমেণ্ট হইতে পত্র পাইলাম আমাকে অ্যাসিস্টেন্ট সার্জনরূপে নিযুক্ত করিতে তাহারা ইচ্ছুক। আমি যেন দরখাস্তকর্মে যথারীতি দরখাস্ত করি। দরখাস্ত করিলাম এবং কিছুদিন পরেই খবর পাইলাম আমি পাটনা মেডিকেল কলেজে জুনিয়র হাউসসার্জনরূপে মনোনীত হইয়াছি। আমার পিতৃবন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞান দাস তখন মণিহারী আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে একটি গরম স্যুটের জন্য কাপড় উপহার দিলেন। সেই কাপড়ের স্যুট করাইয়া এবং তাহা পরিধান করিয়া আমি পাটনা যাত্রা করিলাম। সেখানে গিয়া হাসপাতালেব ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেখা হইতে বলিলাম, 'Good morning'. তিনিও গুডমর্ণিং করিয়া এবং আমার নিয়োগপত্র দেখিয়া বলিলেন—'Dr. Mukherjee, I shall take you to your ward just now. Please take your seat and wait a few minutes'.

বসিয়া রহিলাম। ডেপুটিসাহেব ফাইল সই করিতে লাগিলেন। আমার কেমন যেন অস্বস্তিবোধ হইতে লাগিল। সই করিতে কবিতে হঠাৎ ডেপুটিসাহেব বলিলেন, 'By the bye, do you know the rules of the College ?'

'No. Sir.'

'Please have a look at them'.

একটি টাইপকরা কাগজ আমাব হাতে দিলেন। তাহাতে প্রথম রুল দেখিলাম—Whenever a junior officer or a student meets his superiors he must show him respect by touching his forehead with his palm.

পড়িয়া আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। আমি চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িলাম ডেপুটিসাহেব বলিলেন—'I have almost finished'.

আমি বলিলাম, 'না, আপনি কাজ করুন। আমি আপনাদের এই প্রথম রুল পড়িয়া ঠিক কবিয়া ফেলিলাম এখানে আর কাজ করিব না।'

ডেপুটিসাহেব ইহা প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

বলিলেন, 'সে কি !'

আমাকে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আমি আর তাঁহার কথায় কান দিলাম না। 'গুডবাই' করিয়া চলিয়া আসিলাম। এবং সোজা পাটনা স্টেশনে চলিয়া গেলাম। পাটনা স্টেশনের ওয়েটিংরুমে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম—অতঃ কিম্? অনেক ভাবিয়া ঠিক করিলাম Pathology-তে special training লইয়া কোনো বড় শহরে ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিশ করিব। এই সিদ্ধান্ত লইবার প্রধান কারণ হাতে কিছু সময় পাইব, সেই সময়টুকু আমি সাহিত্য-সাধনায় দিতে পারিব। জেনারেল প্র্যাকটিশনার হইলে সাহিত্য-চর্চা করা যাইবে না।

আমাদের সময় Pathology তে Special ট্রেনিং লইবার কোন কোর্স ছিল

না। কোন বিশেষজ্ঞের অধীনে থাকিয়া কাজ শিখিতে হইত। বিশেষজ্ঞদের সংখ্যাও খুব বেশী ছিল না।

আমাদের কলেজের ফিজিওলজির ডেমনস্ট্রেটার ডাক্তার চারুব্রত রায়ের এ বিষয়ে খুব নাম ছিল। ঠিক করিলাম তাঁহারই শরণাপন্ন হইব।

স্টেশন হইতেই বাবাকে একটি চিঠি লিখিলাম। বাবাকে জানাইলাম আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়া আমি চাকুরি করিতে পারিব না। আমি কলিকাতায় চলিলাম। সেখানে আমি ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিতে স্পেশাল ট্রেনিং লইব। আপনি আমার পুরাতন মেসের ঠিকানায় আপনার মতামত জানাইবেন। আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব।

কলিকাতায় ফিরিয়া পুরাতন মেসে (৩নং মির্জাপুর স্ট্রীট) বাবার চিঠির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

বাবার চিঠি আসিতে দেরী হইল না। তিনি লিখিয়াছেন—তুমি চাকরী লইলে আমাদের আর্থিক কিছু সুবিধা হইত। কারণ তোমার সব ভাইরা এখনও মানুষ হয় নাই। কিন্তু তুমি এখন সাবালক হইয়াছ। লেখাপড়া শিখিয়াছ। তোমার বিবেকের বিরুদ্ধে আমি কিছু করিতে বলিব না। তুমি যদি ওখানে কাহারও অধীনে ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি সম্বন্ধে শিক্ষা লইতে চাও তাহাই লও। আমি মাসে মাসে তোমার খরচ পাঠাইয়া দিব।

বাবার অনুমতি পাইয়া আমি ডাক্তার চারুব্রত রায়ের সহিত দেখা করিলাম। সব কথা শুনিয়া তিনি আমাকে ধমক দিলেন। বলিলেন—'তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে। তুমি পাটনায় ফিরিয়া গিয়া কাজে যোগদান করো। আমি তোমাকে ট্রেনিং দিতে পারিব না। কারণ দিনকয়েক ট্রেনিং লইয়া তুমি ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া যাইবে এবং কোথাও জেনারেল প্র্যাক্‌টিশনার হইয়া বসিবে।'

আমি বলিলাম—'আপনি যতদিন না যাইতে বলিবেন, ততদিন যাইব না।' কিন্তু তিনি রাজী হইলেন না।

খবর পাইলাম উনি ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ছাত্র এবং তাঁহাকে খুব খাতির করেন। বনবিহারীবাবু যদি আমার জন্য অনুরোধ করেন চারুবাবু আপত্তি করিবেন না।

গেলাম বনবিহারীবাবুর কাছে। সব কথা বলিলাম তাঁকে। সব শুনিয়া ডান-পাটা নাচাইতে নাচাইতে তিনি বলিলেন, 'দেখ বনফুল, যে দেশে জন্মেছ সে দেশে বাঁচতে হলে সেলাম করতেই হবে। চাকরিতে একজন ভদ্র শিক্ষিত সাহেবকে সেলাম করে খুশী রাখতে পারলে আর কাউকে সেলাম করতে হবে না। আর চাকরি যদি না-ও করো তাহলে হাজার হাজার বাজে লোককে সেলাম করতে হবে। তা না হলে প্রাইভেট প্র্যাকটিশ জমবে না। তুমি একটা ভালো চাকরী পেয়ে ছেড়ে দিচ্ছ!'

আমি তখন বলিলাম, 'আমি সাহিত্য-চর্চা করতে চাই। ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিশ করলে তার জন্য সময় পাবো। চাকরী করলে তা পাব না। জেনারেল প্র্যাকটিশ করলেও তা সম্ভব নয়।'

বনবিহারীবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'অকূল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড তা হলে।' তিনি আমার সামনেই ফোন তুলিয়া চারুবাবুর সহিত কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। তাহার পর ফোন নামাইয়া বলিলেন—'চারুর কাছে যাও। দু-একটি শর্ত আছে, তা যদি তুমি মেনে নাও, ও তোমাকে নেবে। আর ও যদি তোমাকে ভালো করে শেখায় তাহলে ভালো প্যাথলজিস্ট হবে তুমি।'

চারুবাবুর সহিত দেখা করিতেই তিনি বলিলেন—'তুমি মাস্টারমশাইকে গিয়ে ধরেছো? ওঁর অনুরোধ তো উপেক্ষা করা যায় না। তোমাকে শেখাবো। কিন্তু আমার কয়েকটি শর্ত আছে। প্রথম, তোমাকে একবছর অন্তত আমার কাছে কাজ শিখতে হবে। দ্বিতীয়—তোমার ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি আগেই সব কিনতে হবে। তৃতীয়তঃ, তোমাকে কথা দিতে হবে সব শেখার পর কলকাতায় তুমি প্র্যাকটিশ করবে না। কোনও মফঃস্বল শহরে গিয়ে করবে।'

আমি বলিলাম--'প্রথম ও তৃতীয় শর্ত আমি নিশ্চয় মানিব। কিন্তু দ্বিতীয় শর্তটির সম্বন্ধে এখন কিছু বলিতে পারিতেছি না। কারণ বাবাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি বলিতে পারিতেছি না যে সমস্ত যন্ত্রপাতি কেনার সামর্থ্য আমার আছে কি-না। বাবাই তো সব টাকা দিবেন।'

চারুবাবু বলিলেন—'যদি শিখিতে চাও, নিজের ল্যাবরেটরি কিনিতেই হইবে। কলেজের ল্যাবরেটরিতে তোমাকে শিখাইব কি করিয়া। তাহা বেআইনী। কলেজের যন্ত্রপাতি লইয়া স্বচ্ছন্দে কাজও করিতে পারিবে না। নানারকম অসুবিধা দেখা দিবে।'

বাবাকে চিঠি লিখিলাম। বাবা উত্তর দিলেন—'আজ মাণি-অর্ডার করিয়া তোমাকে পাঁচশত টাকা পাঠাইলাম। এখন ইহার বেশী টাকা আমার কাছে নাই।'

চারুবাবু বলিলেন—'পাঁচশত টাকা দিয়া Zeiss (জাইস্) মাইক্রোসকোপ কিনিয়া ফেল আর বাকি জিনিসগুলি ধারে কিনিয়া লও।'

বলিলাম, 'আমাকে ধার দেবে কে?'

'আমি জামিন হইলে দিবে।'

তখন কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দ্বিতলে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সায়েন্টিফিক সাপ্লাইজ নামে একটি দোকান ছিল। দোকানটি এখনও বোধহয় আছে। চারুবাবু সেই দোকানের মালিককে একটি চিঠি দিলেন—'নিম্নলিখিত জিনিসগুলি আমার ছাত্রকে ধার দিতে হইবে। ছেলেটি ভালো, তোমার টাকা মার যাইবে না। তোমার টাকার সুদও দিবে। জিনিসগুলি ইহাকে দিও।'

প্রবোধবাবু একটি দলিল করিয়া তাহাতে আমাকে সই করাইয়া লইলেন।

প্রায় হাজার তিনেক টাকার জিনিস তিনি দিলেন। তাহার মূল্য সম্পূর্ণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত শতকরা সাড়ে বারো টাকা সুদে তাঁহাকে দিব লিখিতভাবে দলিলে এই প্রতিশ্রুতি আমি দিলাম।

চারুবাবু যদি তাঁহার পত্রে লিখিয়া দিতেন যে .আমিই বনফুল, তাহা হইলে আমার হয়ত সুবিধা হইত। কারণ পরে জানিয়াছিলাম—তিনি বনফুলের লেখার অনুরাগী পাঠক একজন। ব্যাপারটা অনেকদিন পরে জানিয়াছিলাম। তখন আমি ধার শোধ করিয়া ফেলিয়াছি। প্রবোধবাবু একটু লজ্জিত হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, আগে জানিলে সুদটা লইতাম না।

আমার জিনিসগুলি রাখিবাব ব্যবস্থা মাস্টারমশাই (চারুবাবু) করিলেন। তখন মেডিকেল কলেজেব ঠিক সামনে কলেজ স্ট্রীটের উপর লাহিড়ী কোম্পানীর একটি দোকান ছিল। তাঁহাদের সহিত মাস্টাবমশায়ের আত্মীয়তা কিংবা বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহাদের দোকানের পিছনের একটি ঘরে মাস্টারমশাই আমাব জিনিসপত্রগুলি রাখিয়া দিলেন। দেখিলাম সেখানে তাঁহাব ভেড়াটিও রাহয়াছে। W. R. পবীক্ষা করিবার জন্য ভেড়ার রক্তেব প্রয়োজন।

আমার মাইক্রোস্কোপটি মেডিকেল কলেজ pathological department-এর একটি লকাবে রাখা হইল।

আমার মাইক্রোসকোপ অনেক ডেমনস্ট্রেটারই ব্যবহার করিতেন। তাঁহারাও আমার শিক্ষক হইয়া পড়িলেন ক্রমশঃ। মাস্টারমশাই যে যত্ন লইয়া আমাকে কাজ শিখাইয়াছিলেন তেমন যত্ন লইয়া নিজের ছেলেকেও বোধহয় কেহ শেখায় না। তিনি রোগীদেব নিকট হইতে যখন রক্ত আনিতে যাইতেন তখন আমার জন্যও কিছু বাডতি রক্ত আনিতেন। সেগুলি আমি স্বাধীনভাবে নিজে পরীক্ষা করিতাম এবং সন্ধ্যার সময় তাঁহার সহিত মিলাইয়া দেখিতাম ঠিক হইয়াছে কিনা। মল-মূত্র পরীক্ষাও প্রত্যহ করিতে হইত। সকাল দশটা হইতে রাত্রি আটটা, নটা পর্যন্ত তাঁহার কাছে থাকিতাম। তিনি স্বল্পভাষী রাশভারি লোক ছিলেন। কথা খুব কম বলিতেন। কিন্তু তাঁহার অন্তর যে তাঁহার অনুরূপ ইহাব প্রথম প্রমাণ পাইলাম প্রথমদিনই। বাড়ি হইতে টিফিন-কেরিয়ারে তিনি প্রত্যহ খাবার আনিতেন। বৈকালে সেগুলি খাইতেন। প্রথমদিনই আমাকে বলিলেন—'টিফিন-কেরিয়ারটা খোল। কিছু খাও।' একটা আলাদা বাটিতে তিনি নিজেই প্রত্যহ আমাকে তাঁহার খাবারের অংশ তুলিয়া দিতেন। সিংহভাগটা আমিই পাইতাম। একদিন একটু আপত্তি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিছু বলিবার পূর্বেই মাস্টারমশাই বলিলেন—'তুমি যা বলতে চাইছ, আমি বুঝেছি। আর বলতে হবে না, যা দিচ্ছি খাও।'

প্রতিদিনই খাইতাম।

লীলা তখন বেথুন কলেজের হোস্টেলে থাকিত। আমি থাকিতাম ৩নং মির্জাপুর মেসে। সেই মেসে উপরে উঠিবার সিঁড়ির দেওয়ালে একটি বিস্কুটের টিন

লাগানো ছিল। সেই টিনে পিওন চিঠি দিয়া যাইত। প্রতিবার সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় ও উঠিবার সময় টিনের বাক্সটিতে একবার উঁকি দিয়া যাইতাম। সেইখানে লীলার মাঝে মাঝে চিঠি আসিত। আগেই লিখিয়াছি যে আমিও আমার বাড়তি সময়টুকু তখন পত্ররচনাতেই খরচ করিতাম। একদিন লীলার চিঠিতে জানিলাম তাহার গোটা পনেরো টাকা দরকার। আমার কাছে টাকা ছিল। ঠিক করিলাম বৈকালে গিয়া টাকাটা দিয়া আসিব। সেদিন মাস্টারমশাইকে বলিলাম, 'আজ একটু সকাল সকাল ছুটি চাই। বেলা তিনটের সময়।'

'কেন?'

'আমার স্ত্রীকে কয়েকটা টাকা দিয়ে আসতে হবে।'

'স্ত্রীকে? তোমার স্ত্রী আছে নাকি?'

'আছে। বেথুন কলেজে পড়ে, হোস্টেলে থাকে—'

মাস্টারমশাই অবাক হইয়া গেলেন। কিন্তু কিছু বলিলেন না। লীলাকে টাকা দিয়া আসিলাম। আমার তৃতীয় ভাই (গৌরমোহন) তখন সাবএসিস্টেন্ট সার্জন হইয়া পূর্ণিয়া ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডে চাকরী করিতেছিল। সে লীলাকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাইত। আমাকেও পাঠাইত। আমার ল্যাবরেটরির জন্য অটোক্লেভ সেই পরে কিনিয়া দিয়াছিল। আমার ভাইরা সকলেই ভালো। তাহারা বরাবর আমার সহায়, আমার ঐশ্বর্য। তাহারা আমার গর্ব।

সেইসময় আমার পুরাতন বন্ধু পরিমলের সহিত দেখা হইত। সে শুধু বড় সাহিত্যিক এবং রসিকই নয়, সে একজন উঁচুদরের ফটোগ্রাফারও। সে তখন ইলেক্‌ট্রোফোটো সার্ভিস নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিল। সে প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন মণিবাবু ও লাল মিঞাও। আমার একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। পরিমল বলিল, 'রাত্রে আমার কাছে আসিয়া একদিন থাকো।' মণিবাবু সস্ত্রীক সেই বাড়ির এক অংশে থাকিতেন। তাঁহারা আমাকে খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। গেলাম। পরিমলকে বলিলাম—'আমার কিন্তু রাত্রে নির্জন জায়গা চাই। লীলাকে চিঠি লিখিতে হইবে।' খাওয়াদাওয়ার পর প্রায় রাত বারোটার সময় পরিমল আমাকে তাহাদের ফটো তুলিবার প্রকাণ্ড ঘরটিতে লইয়া গেল। দেখিলাম সেখানে খুব হাইপাওয়ারের আলো জ্বলিতেছে। পরিমল একটি টেবিল দেখাইয়া বলিল—এইখানে বোস। বসিলাম। কিছুক্ষণ পরেই পত্ররচনায় মগ্ন হইয়া গেলাম। যতদূর মনে পড়ে সেদিন কবিতায় পত্ররচনা করিতেছিলাম। এই অবস্থায় পরিমল কখন যে আমার ফটো তুলিয়া লইয়াছে জানিতে পারি নাই। পরদিন সেটি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। পরিমলের কাছে আমার অনেক ফটো এখনও আছে। আমার কাছে নাই। পরিমল একটু সঞ্চয়ীপ্রকৃতির লোক। আমার ঠিক বিপরীত। আমি কোন কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখি নাই। অনেক বই কিনিয়াছি এবং হারাইয়াছি। অনেক ভালো ভালো চিঠি জীবনে পাইয়াছি, সেগুলিও রক্ষা করিতে পারি নাই।

এমন কি রবীন্দ্রনাথ আমাকে যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন সেগুলিও হারাইয়া গিয়াছে। 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' বইটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাই তাঁহার কিছু পত্র ছাপা হইয়া গিয়াছে। আমার জীবনটা যেন ঢালু জায়গা। সব গড়াইয়া চলিয়া যায়।

হঠাৎ একদিন মাস্টারমশাই বলিলেন, 'তুমি বউমাকে খবর দাও। তিনি যেন হোস্টেল থেকে কাল রাতে ছুটি নেন। কাল রাত্রে আমার বাড়িতে তোমরা দুজনে খাবে।'

ফোনে খবর দিলাম।

পরদিন মাস্টারমশাই বলিলেন—'তোমাকে ছুটি দিলাম। মোটরে তেল ভরিয়া দিয়াছি। তুমি বউমাকে হোস্টেল হইতে তুলিয়া লইয়া যেখানে খুসী ঘুরিয়া বেড়াও। রাত্রি সাড়ে ন-টা নাগাদ আমার বাড়িতে আসিলেই চলিবে। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার তোমাদের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিব।' আমি বলিলাম, 'আপনি কি করিয়া ফিরিবেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'সে ব্যবস্থা আমি করিয়াছি।' মাস্টারমশায়ের গাড়ি লইয়া গড়ের মাঠেই সর্বক্ষণ বেড়াইয়াছিলাম। লক্ষ্য করিলাম লীলা খুব কাশিতেছে। বলিল—'এ কাশি কিছুতেই ভালো হইতেছে না।' অনেকরকম ওষুধ দিয়াছি। মাস্টারমশাই বলিলেন—ডাঃ সত্যবান রায়কে দেখাইতে। আমার যতদূর মনে আছে ডাঃ সত্যবান রায়ই বোধহয় সেকালের প্রথম বাঙালী Ear, Nose, Throat Specialist. তিনি মেডিকেল কলেজের Dr. Juda সাহেবের কাছে কাজ শিখিয়াছিলেন। সেকালের M. Sc. M. B. ছিলেন তিনি। কলিকাতায় তখন তাঁহার খুব পশার। আমাকে তিনি বিশেষ স্নেহ করিতেন। আমি যে সাহিত্যিক এ গর্বে তিনিও যেন গর্ব অনুভব করিতেন। তাঁহাকে বলিতেই তিনি একদিন লীলার গলাটা দেখিলেন। বলিলেন, 'দুইটি টন্‌সিলই পচিয়া গিয়াছে। ও দুটিকে কাটিয়া বাহির করিয়া দিতে হইবে।' ঠিক হইল লীলার পরীক্ষার পর অপারেশন হইবে। কিন্তু তখন বিছানা খালি পাওয়া গেল না। কেবিন পর্যন্ত ভরতি। সত্যবানবাবু বলিলেন, 'তুমি কাছাকাছি একটা ঘর ঠিক করো। সেখানেই আমি অপারেশন করে দিয়ে আসব।'

ইলেক্‌ট্রোফোটো লাগোয়া মণিবাবুর বাসা। মণিবাবু বলিলেন, 'আমার বাসাতেই আমি সব ঠিক করিয়া দিতেছি।' তাহাই হইল। মণিবাবুর বাসাতেই ডাক্তার সত্যবান রায় অপারেশন টেবিল, আলো, যন্ত্রপাতি লইয়া একজন নার্সসহ হাজির হইলেন এবং লীলার টন্‌সিল দুটিকে 'গিলোটিন' করিয়া বাহির করিয়া দিলেন। তাহার পর লীলার কাশি কমিল। মণিবাবু ও তাহার স্ত্রী সে সময় যে সেবা করিয়াছিলেন তাহা আজও ভুলি নাই। মণিবাবুর স্ত্রী ছিলেন মেমসাহেবের মতো ফর্সা, মাথার চুল লাল, চোখের তারা নীল। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত একজন মেমসাহেব যেন বাঙালী পোষাক পরিয়া ঘোরাফেরা করিতেছেন। কয়েকদিন পরেই লীলা ভালো

হইয়া হোস্টেলে গেল। আমিও আবার যথারীতি ল্যাবরেটরির কাজে লাগিয়া পড়িলাম। সেই সময় আমার জীবনে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। সে কথা কাহাকেও বলি নাই। ভদ্রলোকটির নিকট শপথ করিয়াছিলাম কাহাকেও বলিব না। তাঁহার হাঁপানি রোগ ছিল। তিনি মাঝে মাঝে রক্তপরীক্ষা করাইতে আসিতেন। ক্রমশ জানিতে পারিলাম, ভদ্রলোক পুলিশে কাজ করেন। পুলিসে কাজ করেন, কিন্তু মনে মনে খুব স্বদেশী। আমরাও সকলে মনে-প্রাণে স্বদেশী ছিলাম। ক্রমশ ভদ্রলোকের সহিত ভাব হইয়া গেল। আমি তাঁহাকে 'সোয়ামিন' ইনজেকশন দিয়া দিতাম। এই ইনজেকশনটা তখন হাঁপানিতে খুব চমকপ্রদ ছিল। একদিন ভদ্রলোককে কথাপ্রসঙ্গে বলিলাম, 'ইংরেজদের যতোই দোষ থাকুক তাহারা দুষ্টের শাসন করে।' ভদ্রলোক বলিলেন, 'ইংরেজ গরীব দুষ্টদের শাসন করে, বড়লোক দুষ্টদের পোষণ করে।'

প্রশ্ন করিলাম, 'কি রকম?'

উত্তর দিলেন, 'গভর্ণমেণ্ট কোন দুষ্ট বড়লোকের কেশাগ্র স্পর্শ করেন না, রাজামহারাজাদের দুষ্কৃতির সহায়তাই করিয়া থাকেন বরং। যদি দেখিতে চান আজই ইহার একটা প্রমাণ আপনাকে দেখাইতে পারি।'

'কি প্রমাণ?' প্রশ্ন করিলাম।

'সন্ধ্যার সময় আমি এসে আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবো। গাড়ি নিয়ে আসব। কিন্তু আপনার চোখ বেঁধে নিয়ে যাব। ব্যাপারটা টপ সিক্রেট। যদি জানাজানি হয়ে যায় আমার চাকরী যাবে। আপনি রাত্রি নটার সময় প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। আমি আসব।'

ঠিক রাত্রি নটার সময় তিনি একটি 'কার' ড্রাইভ করিয়া আসিলেন। গাড়িতে আর কেহ ছিল না। আমাকে তিনি পিছনের সিটে বসাইয়া রুমাল দিয়া চোখ বাঁধিয়া দিলেন। গাড়িটি ব্যাক করিয়া ঘুরাইয়া লইলেন, তাহার পর মিনিটদশেক বোধহয় সোজা চলিলেন। তাহার পর থামিলাম, আবার ব্যাক করিয়া গাড়ি একটি গলিতে ঢুকিল। ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে গাড়ি হইতে হাত ধরিয়া নামাইলেন। তাঁহার হাত ধরিয়াই একটি ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া আমার চোখ হইতে রুমাল খুলিয়া দিলেন। দেখুন—

দেখিলাম প্রকাণ্ড লম্বা একটা কাঠের প্যাকিং কেস। প্যাকিং কেসটি বাক্সের মতো। ডালাটি বন্ধ। ডালার উপর একটি ছিদ্র এবং ছিদ্র দিয়া একটি রবারের নল বাক্সের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছে। অদূরে দেখিলাম একটি অক্সিজেন সিলিণ্ডার।

বলিলাম—'কোন রোগী না কি।'

ভদ্রলোক বাক্সটির ডালা তুলিয়া দিলেন। ভিতরে দেখিলাম, একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে চোখ বুঁজিয়া শুইয়া আছে। মনে হইল মেয়েটি কিশোরী। বয়স ষোল বছরের কমই। ভদ্রলোক বলিলেন—'স্বচক্ষে দেখলেন তো। এর ইতিহাস আপনাকে পরে বলব। এখন চলুন।'

আবার আমার চোখ বাঁধিয়া দিলেন এবং গাড়ি লইয়া সোজা গড়ের মাঠে চলিয়া গেলেন। সেখানে মন্থমেণ্টের কাছে গাড়ি থামাইয়া আমার চোখের বাঁধন খুলিয়া দিলেন। বলিলেন—'যে মেয়েটিকে দেখলেন ওটি একজন মহারাজের মনে কামোদ্রেক করেছে। ভদ্রলোক যে মহারাজের নামটি বলিলেন তিনি দেশীয় রাজাগণের মধ্যে একজন নামজাদা রাজা। সে নামটি উহ্য রাখিতেছি। ভদ্রলোক বলিলেন সেই মহারাজার লোকজনরা ইহাকে বাড়ি হইতে হরণ করিয়াছে। মেয়েটি কিন্তু সতী এবং তেজস্বিনী। মহারাজের বাহুবন্ধনে ধরা দিতে বহু প্রলোভনসত্ত্বেও কিছুতেই রাজি হয় নাই। তাহার পর ইহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া ক্লোরোফর্ম করিয়া অজ্ঞান করা হইয়াছে এবং এই বাক্সে প্যাক করিয়া ইহাকে মহারাজার নিকট লইয়া যাওয়া হইতেছে। সঙ্গে একজন ডাক্তার আছেন। তিনি মাঝে মাঝে মর্ফিন ইন্‌জেকশন দিতেছেন এবং অক্সিজেন শুঁকাইতেছেন। আমাদের উপর মালিকেরা অর্ডার দিয়াছেন আমরা পুলিসরা গোপনে যেন এই মালটিকে নিরাপদে এবং গোপনে পাচার করিয়া যথাস্থানে পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করি। ইহার পর কি বলা চলে যে ইংরেজরা দুষ্টের শাসক? যে সব দুষ্টেরা ইহাদের শোষণকার্যে সহায়তা করে তাহাদের ইহারাই লালন-পালন করে।

এ ঘটনা বহুদিন আগেকার। তাহার পর আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। স্বাধীনতার পর সাতাশ বছর কাটিয়া গেল। মনে এখন প্রশ্ন জাগিতেছে—ছবিটা কি বদলাইয়াছে? মনই উত্তর দিল—বদলায় নাই। এখনও আমাদের শাসনকর্তারা নিজেদের গদিরক্ষা করিবার জন্য নানাজাতের দুর্বৃত্ত পোষণ করিতেছেন। জীবনের প্রতিস্তরে দুর্নীতি, অবিচার, অত্যাচার, অপচয়, চুরি, স্বজন-পোষণ ও অযোগ্যতা। দেশ এখনও নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। এতদিন পরে, শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণজীর কণ্ঠে ইহার প্রতিবাদ উচ্চারিত হইয়াছে। এ প্রতিবাদ অনেক আগেই উচ্চারিত হওয়া উচিত ছিল। সর্বোদয়-নেতা এতদিন নীরব ছিলেন কেন এ প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগিবে। Better late than never—এই প্রবচন অনুসারে আমরা কিঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিতেছি বটে, কিন্তু মনে আর একটা ভয়ও জাগিয়া উঠিতেছে। তাঁহার দলে যে সব লোক জুটিতেছে তাহারা খাঁটি মাল তো? আজ যাহারা দেশের গদি অধিকার করিয়া দুই হাতে লুণ্ঠন করিতেছে, যাহাদের অবিচার ও অন্যায়ের তুলনা মেলা ভার, তাহারা একদিন মহাত্মা গান্ধীর দলে সেরা ভক্ত ছিল। জয়প্রকাশজী যদি ঠিক লোক নির্বাচন করিতে না পারেন তাহা হইলে আবার একদল সুবিধাবাদী জুয়াচোর আসিয়া গদি দখল করিবে এবং দেশ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরে থাকিয়া যাইবে।

আমি যে কাহিনীটি উপরে বিবৃত করিলাম তাহা আমার মনে গভীর দাগ কাটিয়াছিল। ইহার অনেক পরে আমি 'জঙ্গম' লিখিয়াছিলাম। তাহাতে আমি এই কাহিনীটি ব্যবহার করিয়াছি। বস্তুত 'জঙ্গমে'র অনেক চরিত্রই কলিকাতার বহমান জনস্রোতের ভিতরই ভাসিতে ভাসিতে আমার মনে আটকাইয়া গিয়াছিল। অনেক পরে কল্প-

জগতের নূতন পরিবেশে তাহারা নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। আমি যখন মাস্টার-মশাইয়ের নিকট ট্রেনিং লইতেছিলাম তখনও মাঝে মাঝে আমি দুই একটা কবিতা লিখিতাম। মাসিকপত্রে সেগুলি প্রকাশিত হইত। কিন্তু তখনও আমি উপন্যাস রচনায় মন দিই নাই। কখনও যে উপন্যাস লিখিব, কল্পনাও করি নাই। উপন্যাস লেখার উপকরণ কিন্তু অজ্ঞাতসারেই আমার মনে জমা হইতেছিল। সে সময় লীলাকে চিঠি লেখাই আমার প্রধান সাহিত্য-কর্ম ছিল। কবিতায়, গদ্যে, নানাভাবে অলঙ্কৃত অনেক রঙিন-সচিত্র চিঠিতে অনেক কিছু লিখিয়াছি তাহাকে। সেগুলি হারাইয়া গিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে এক বছর কাটিয়া গেল। লীলা পরীক্ষা দিয়া মণিহারী চলিয়া গেল একদিন। মাস্টারমশাই আমাকেও বলিলেন—'তোমার আর কলিকাতায় থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমার যতটুকু বিদ্যা ছিল তাহা তোমাকে দিয়াছি। এবার এগুলি বারবার করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। তাহার জন্য খরচ করিয়া কলিকাতায় থাকিবার প্রয়োজন নাই। তুমি একবছরের জন্য কোন হাসপাতালে চাকরী লও। সেখানে যেন ইনডোর বেড থাকে। সেখানে গিয়া যাহা শিখিয়াছ তাহা বারবার প্র্যাকটিশ কর। তাহার পর কোনও একটা বড় শহর বাছিয়া প্রাইভেট প্র্যাকটিশ শুরু করিয়া দাও। তোমার আর পয়সা খরচ করিয়া কলিকাতায় থাকিবার দরকার নাই।'

সেটা ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ। মেসে ফিরিয়া সেইদিনের স্টেটসম্যানে একটি বিজ্ঞাপন দেখিলাম আজিমগঞ্জ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসারের জন্য একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছে। হাসপাতালটি মিউনিসিপালিটির। বেতন মাসিক ৮০৲। ফ্রি কোয়ার্টার্স। প্রাইভেট প্রাকটিশ করিতে দেওয়া হইবে। হাসপাতালে ষোলটি ইনডোর বেড আছে। মাস্টারমশাইকে বিজ্ঞাপনটি দেখাইলাম। তিনি বলিলেন—'এখুনি দরখাস্ত করে দাও।' চেয়ারম্যান টেলিগ্রামে আমাকে নিয়োগ করিলেন। কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্বে মাস্টারমশাইকে বলিলাম—'আপনার একটি ফটো চাই। আমার ল্যাবরেটরিতে রাখিব।' তিনি বলিলেন—'আমার তো ফটো নাই। বিবাহের সময় একবার তোলা হইয়াছিল। সেটাও কোথায় আছে জানি না। আর একবার সম্ভবতঃ মৃত্যুর পর তোলা হইবে।' বলিলাম—'তাহা হইলে চলুন কোনো ফটো স্টুডিওতে একটা ফটো তোলাই। আপনার ফটো না লইয়া আমি কলিকাতা ত্যাগ করিব না। ইলেকট্রোফটো সার্ভিস বা সি. গুহ কোন স্টুডিওতে ফটো তোলা হইয়াছিল। সে ফটোটি আমার কাছে এখনও আছে। তাহা হইতে 'সোনা'-কে দিয়া সেদিন আবার একটি রিপ্রিণ্ট করাইয়াছি।

আজিমগঞ্জে গিয়া দেখিলাম মণিহারীর জমিদার সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (রায়-বাহাদুর) সেখানকার মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান। ভাগীরথী নদীর ওপারে জিয়াগঞ্জে তাঁহার বাড়ি। ভাগীরথীতে সর্বদা নৌকা পারাপার হয়। এপার-ওপার সর্বদাই যাতায়াত চলিতেছে।

আমার কোয়ার্টারটি আজিমগঞ্জে ভাগীরথীর ধারে। পাশ দিয়া রেললাইন চলিয়া গিয়াছে।

আমি আজিমগঞ্জে পৌঁছিলাম সন্ধ্যার পর। একাই গিয়াছিলাম। প্রবোধদা তখন আজিমগঞ্জে বুকিং ক্লার্ক। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন! স্টেশনে দেখিলাম একটি বুড়ি পড়িয়া আছে। জ্বর হইয়াছে, উঠিতে পারিতেছে না। আমি যে হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হইয়া আসিয়াছি সেটি ছিল স্টেশনের পাশেই। আমি স্টেশনমাস্টারকে বলিয়া একটি স্ট্রেচার জোগাড় করিলাম এবং সেই বুড়িকে হাসপাতালে ভরতি করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। তাহার পর প্রবোধদার বাসায় গিয়া খাওয়াদাওয়া করিয়া শুইয়া পড়িলাম। ঠিক হইল—লীলা না আসা পর্যন্ত প্রবোধদার বাসাতেই আমি খাইব এবং আমার কোয়ার্টারে শুইব। প্রবোধদা কিছুতেই আলাদা ব্যবস্থা করিতে দিলেন না।

আজিমগঞ্জ

আজিমগঞ্জ হাসপাতাল দেখিয়া প্রথমে খুব আনন্দ হইয়াছিল। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড-ওলা বাড়ি। ষোলটি রোগী থাকিবার মতো ইনডোর ওয়ার্ড। আলাদা অপারেশন থিয়েটার। আলাদা চাকর, আলাদা মেথর। একজন কম্পাউণ্ডার এবং একজন ড্রেসার। মেথর-দম্পতী হাসপাতাল-কম্পাউণ্ডেই থাকে। ভোলা চাকরও সেখানে থাকে। কম্পাউণ্ডারবাবুর কোয়ার্টারস্‌ও হাসপাতালের মধ্যে। আমার পূর্বে যিনি ডাক্তার ছিলেন তাঁহাকে সকলে 'পাগলা ডাক্তার' বলিত। তিনি আমাকে চার্জ দিবার সময় বলিলেন, 'কিছুদিন থাকুন, সব বুঝতে পারবেন। আমি কিছু বলব না।'

অল্প কয়েকদিন কাজ করিবার পরই বুঝিতে পারিলাম। হাসপাতালে ঔষধ নাই, ঔষধ কিনিবার টাকাও নাই। ষোলটি ইনডোর রোগী রাখিবার ব্যয়বহন করিতে হাসপাতাল অক্ষম। হাসপাতালের আয়ের উৎস মিউনিসিপালিটি, মিউনিসিপালিটির আয়ের উৎস ট্যাক্স। বহু লোকের বহু ট্যাক্স বাকি আছে। আদায় করিবার জন্য যে নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা দরকার তাহা নাই। গভর্ণমেণ্ট হইতে কিছু সাহায্য হাসপাতাল অবশ্য পায়, কেবল তাহা দিয়া হাসপাতাল চালানো সম্ভব হয় না। সুতরাং কাজ আরম্ভ করিয়াই বেশ দমিয়া গেলাম।

আমার উৎসাহ কিন্তু অদম্য ছিল। যে সব রোগী বাড়ি হইতে পথ্য আনিয়া খাইতে পারে এবং যে ঔষধ হাসপাতালে নাই তাহা কিনিয়া আনিতে পারে এমন সব রোগীকে আমি ইনডোরে ভরতি করিয়া তাহাদের মলমূত্র এবং রক্ত বিনা পয়সায় পরীক্ষা করিয়া তাহাদের চিকিৎসা শুরু করিয়া দিলাম। অনেক রোগী ইহাতে খুব উপকৃত হইল এবং হাসপাতালে ভীড় করিয়া আসিতে লাগিল। আজিমগঞ্জে যে জীবন আমি যাপন করিয়াছিলাম তাহার প্রতিচ্ছবি আমার 'নির্মোক' নামক গ্রন্থে

পরে আঁকিয়াছি। নির্মোকে অবশ্য অনেক কাল্পনিক কাহিনী আছে, কিন্তু কাঠামোটা আজিমগঞ্জের পরিবেশ। আজিমগঞ্জের ডাক্তার হিসাবে আমার কিছু সুনাম হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার অনেক দূরের গ্রাম হইতেও রোগী আমার কাছে আসিতে লাগিল। এ সময়ও এক লীলাকে চিঠি লেখা ছাড়া আর কোনও লেখালিখি করি নাই। সময় পাইতাম না। আমার কোয়ার্টারের একপাশে আমার ছোট ল্যাবরেটরিটি স্থাপন করিয়াছিলাম। সেখানকার ডাক্তাররা মাঝে মাঝে কেস পাঠাইতেন। আজিমগঞ্জে যোগেশবাবু এবং নিবারণবাবুর ভালো প্র্যাকটিশ ছিল। কোয়াক প্র্যাকটিশনারও ছিল কয়েকজন। নাম মনে নাই। তাহারা আমাকে অনেক কেস আনিয়া দিত। আজিমগঞ্জের কবিরাজ অনাথবন্ধু রায়ের সহিত শীঘ্রই বন্ধুত্ব হইয়া গেল। তিনি শুধু বড় কবিরাজই ছিলেন না, অতিশয় সুরসিক, বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তাঁহার দাদা অকালে দুইটি শিশু-পুত্রকে রাখিয়া মারা যান। অনাথবাবু সেজন্য আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দুইটিকে সযত্নে তিনি মানুষ করিতেছিলেন। তাঁহার বিধবা বৌদিকে ঘরের সর্বময়ী কর্ত্রীপদে স্থাপন করিয়া আদর্শ হিন্দুজীবনযাপন করিতেছেন অনাথবাবু। তাঁহাকে খুবই শ্রদ্ধা করিতাম। আজিমগঞ্জের যে কয়েকজনের স্মৃতি মনে আঁকা আছে তাহার মধ্যে অনাথবাবুর স্মৃতিই উজ্জ্বলতম, পবিত্রতম। তিনি পান ও কিমাম খাইতেন। ক্রমশঃ আমারও এ অভ্যাসটি হইল। চমৎকার কিমাম—ঘরে প্রস্তুত করিতেন তিনি।

আজিমগঞ্জে কিছুদিন থাকিবার পর লীলাকে লইয়া আসিবার জন্য মনে মনে উৎসুক হইলাম। কিন্তু সেযুগে বাবা-মা যাহা ঠিক করিতেন তাহাই হইত। বিধাতা সদয় হইলেন—বাবা নিজেই একদিন আমাকে চিঠি লিখিলেন। বৌমাকে তুমি আসিয়া লইয়া যাও, আমি একটি শুভদিন দেখিয়া রাখিয়াছি। লীলা পরীক্ষা দিয়া মণিহারীতেই ছিল। মণিহারীতেই খবর আসিয়াছিল যে সে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করিয়াছে। লীলা সঙ্গীতেও পারদর্শিনী ছিল। রবীন্দ্র-সংগীতও খুব চমৎকার গাহিত। বিবাহের সময় সঙ্গে একটি সেতারও আনিয়াছিল সে। কিন্তু সংসারের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া সঙ্গীতসাধনা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আমারও সঙ্গীতে অনুরাগ ছিল। অনাথবাবুর বাড়িতে মিশিরজী নামে একজন ভালো ওস্তাদ ছিলেন। তাহার নিকট আমিও কিছুদিন সেতার শিখিয়াছিলাম। কিন্তু সে শিক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই।

বাবার চিঠি পাইয়া লীলাকে আনিবার জন্য মণিহারী চলিয়া গেলাম। যাইবার পূর্বে লীলার জন্য একটি বড় হাত-আয়না, একটি চিরুণী কিনিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। একটি টেবিল-ক্লথ এবং স্বামী বিবেকানন্দের একটি ছবিও। আমার দাম্পত্য-জীবনে এইগুলি বোধহয় লীলাকে আমার প্রথম উপহার। লীলা খুব খুশী হইল। তখন কত তুচ্ছ জিনিসে কত আনন্দ হইত। মা আসিবার সময় সঙ্গে কাঁসার বাসন দেন নাই। বলিয়াছিলেন, সেখানে বাসাবাড়িতে দামী কাঁসার বাসন

চুরি হইয়া যাইবে। সেখান হইতে শস্তা বাসন কিনিয়া লইও। সুতরাং কিছু কলাইকরা বাসন এবং কিছু অ্যালুমিনিয়মেব বাসনও কিনিলাম।

আজিমগঞ্জে আমার নতুন সংসার আরম্ভ হইয়া গেল। দেখিলাম লীলা রাঁধেও ভালো। আজিমগঞ্জে তরিতবকারি এবং মাছ ভালো পাওয়া যাইত। পুকুরের সুস্বাদু মাছ। রোজগারও কিছু কিছু হইতেছিল। বাড়িতে একটা ট্যারা ঝি রাখিয়াছিলাম। ঝুনু বলিয়া একটি কুকুরও জুটিয়াছিল। ধবাসন বলিয়া একটি চাকরও পাওয়া গেল। ঝুনুকে দুধ দিলে ধরাসন আপত্তি করিত। তাহার যুক্তি ছিল মানুষ দুধ পায় না, কুত্তারে দুধ দেওয়া কেন? হাসপাতালেব চাকর ভোলা বাজারটা করিয়া দিত। হাসপাতালের মেথব ভুষণ এবং তাহার স্ত্রী আমাদের বাড়ির উঠান ও নালি পবিষ্কাব করিত। একটা নতুন ধরনের জীবন শুরু হইয়া গেল।

কিছুদিন পরেই আজিমগঞ্জে কলেরা এপিডেমিক শুরু হইয়া গেল। হাসপাতালে দলে দলে রোগী আসিতে লাগিল। ইনডোর ভরিয়া গেল। আমি হাসপাতাল-কম্পাউণ্ডে খড়ের ও দরমার শেড তৈয়ারি করাইয়া রোগী ভর্তি করিতে লাগিলাম। সে সময় দিবারাত্রি পরিশ্রম কবিতে হইয়াছিল। কম্পাউণ্ডার এবং ড্রেসারকে স্যালাইন কি করিয়া দিতে হয়—তাহা শিখাইয়া দিলাম। সে সময় একটি acute Arsenic poisoning-এর কেসও কলেরা রোগীদের সহিত আসিয়াছিল। সেটি আমি ধরিয়া ফেলি। রোগীর বমিতে এবং পায়খানায় রক্তের আধিক্য দেখিয়া আমার সন্দেহ হয়। কলিকাতায় কলেরাব জীবন্ত জীবাণু দেখি নাই। এখানে প্রচুর দেখিলাম। অনেক রোগী প্রাণে রক্ষা পাইলেন। আমার খুব একটা নাম হইয়া গেল। নিয়মিতরূপে সব রোগীর মল-মূত্র পরীক্ষা করিতাম বলিয়া নাম বাহির হইয়া পড়িল। ও অঞ্চলে রোগীও অসংখ্য। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, অ্যামিবিয়াসিস এবং গিয়ারডিয়াসিসও কম নয়। অনেক রোগী জুটিতে লাগিল। কিন্তু হাসপাতালে ঔষধের অভাব। আমাদেব চেয়াবম্যান রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ উপদেশ দিলেন দেশী গাছ-গাছড়া দিয়ে চিকিৎসা করুন। চিরতা, কালমেঘ, গুলঞ্চ, ত্রিফলা প্রভৃতির গুণগান করিয়া বলিলেন, আপাতত এই সব দিয়া চালান। আমি বহরমপুর গিয়া সিভিল সার্জনের সহিত দেখা করিলাম। সিভিল সার্জন ছিলেন—মেজর কাপুর। তিনি মেডিকেল কলেজে আমাদের শিক্ষক ছিলেন। আমাকে দেখিয়া খুব খুশী হইলেন। তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি আমাকে কিছু ওষুধ মঞ্জুর করিলেন। এইভাবে জোড়াতাপ্পি দিয়া আমার কাজ চলিতে লাগিল। ওখানকার কিছু সহৃদয় কেঁইয়া ধনীও আমার খাতিরে হাসপাতালে কিছু কিছু ঔষধ কিনিয়া দিয়াছিলেন। আজিমগঞ্জে নও-লক্ষা পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। খুবই ভদ্র পরিবার। আমার বাড়ির পাশেই ছিলেন রিটায়ার্ড ডাক্তার রাধিকাবাবু। তাঁহার দুই পুত্র তারাপদবাবু এবং রমাপদবাবু। তারাপদবাবু বেশ বিদ্বান লোক ছিলেন। জিয়াগঞ্জ স্কুলের হেড-মাস্টার ছিলেন তিনি। স্কুল-লাইব্রেরী হইতে অনেক

ভালো-ভালো বই আনিয়া দিতেন আমাকে। রাত জাগিয়া সেগুলি পড়িতাম। ডিকেন্স, টলস্টয়, গর্কি, গলসওয়ার্দির সহিত তখনই পরিচয় ঘটে। তখন বাংলা-সাহিত্যে যে সব আধুনিক মার্কা বই বাহির হইত তাহাও মাঝে মাঝে পড়িতাম। দেখিতাম বেলেল্লাগিরি এবং অসভ্যতাকে ভাষা দিয়া কতগুলি অসভ্য লেখক নিজেদের স্থূলতা জাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তখন মনে মনে যে উত্তাপ সঞ্চিত হইয়াছিল তাহাই পরে অনেক ব্যঙ্গকবিতায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম। তখন লিখিবার সময় ছিল না। শনিবারের চিঠির সঙ্গে তেমন পরিচয়ও হয় নাই। আমি যখন আজিমগঞ্জে ছিলাম তখন পরিমল গোস্বামী একবার সেখানে গিয়াছিল। তখন সে ফটো লইয়া মশগুল। পরিমল সঙ্গে ক্যামেরা আনিয়াছিল একটি। লীলা তখন অন্তঃসত্ত্বা। কেয়া তখন পেটে। পরিমল বলিল, 'তোমাদের দুজনের একটি pair ফটো তুলিব।' আমাদের বাড়ির সংলগ্ন একটি বাহিরের উঠান ছিল। সেখানে ছিল একটি কাপাসগাছ। সেই কাপাসগাছের সামনে লীলাকে লইয়া বসিলাম। পরিমল ফটো তুলিল। কিন্তু তাহার পর পত্র পাইলাম বাবা, মা সেইদিন রাত্রেই আমার কাছে আসিতেছেন। বাবা, মা কেহই তথাকথিত আধুনিক ছিলেন না। বাড়ির বউ পর-পুরুষের সহিত মেলামেশা করিতেছে ইহা তাঁহারা চাহিতেন না। পরিমলকে বলিলাম, 'বাবা, মা যেন না জানিতে পারে তুমি আমাদের ফটো তুলিয়াছ।' পরিমল বলিল, 'আমি রাত্রে ছাদে শুইব। সেখানেই develop করিয়া print করিয়া শুকাইয়া লইব। তুমি কিছু চিন্তা করিও না।' পরিমল তাঁহার কথা রাখিয়াছিল। কিন্তু বিধি বিরূপ ছিলেন। একটি ফটো যে ছাদ হইতে উড়িয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে আসিতে পারে ইহা পরিমল ভাবে নাই। বাবা সকালবেলা উঠিয়াই দেখিতে পাইলেন সিঁড়ির কাছে একটি ফটো পড়িয়া আছে। তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ ফটো কোথা হইতে আসিল?' বলিলাম, 'ওটা আমরা সম্প্রতি তুলিয়াছি। উড়িয়া আসিয়া এখানে পড়িয়াছে।' বাবা ইহা লইয়া আর বিশেষ উচ্চবাচ্য করিলেন না। পরিমলও দুই-একদিন পরে চলিয়া গেল। পরিমলের তোলা সে ফটোটি এখনও আমার কাছে আছে। আমার বিবাহের বৌভাতে পরিমল মণিহারী গিয়াছিল। বিবাহের পরদিনই সে আমাদের একটি ফটো তুলিয়াছিল। পরে সেটি রঙিন করিয়া পাঠাইয়া দেয়। সে ছবিটিও এখনও আছে।

আজিমগঞ্জে মাত্র একবছর ছিলাম। কিন্তু এই একবৎসরের মধ্যে আমার বাবা, মা, ভাইরা, বোনেরা, বড় বোন রাণীর স্বামী সুধাংশু (ডাকনাম খোকা), আমার কাকাবাবু সকলেই কিছুদিন গিয়া আমার কাছে ছিলেন। যদিও বাজারে ধার জমিয়া যাইতেছিল, তবু খুব আনন্দে ছিলাম। প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করিয়া আমি খুব বেশী রোজগার করিতে পারিতাম না। আমি হাসপাতালের গরীব রোগীদের লইয়াই বেশী সময়ক্ষেপ করিতাম। ল্যাবরেটরি হইতে মাঝে মাঝে কিছু আয় হইত। আয়ের আর একটা উৎস ছিল লাইফ ইনসিওরেন্সের কেসগুলি। আমি

যাহা উপার্জন করিতাম তাহা হইতে কিছু টাকা আমাকে ঋণশোধবাবদ পাঠাইতে হইত প্রতিমাসে। ধারে ল্যাবরেটরি কিনিয়াছিলাম এবং সে ঋণ পরিশোধ না করিলে সুদে-আসলে তাহা তুমুল হইয়া উঠিবে এ ভয় ছিল। তাই যখনই যাহা পারিতাম শোধ করিয়া দিতাম। আমি নর্থ ব্রিটিশ লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ডাক্তার ছিলাম। তাহারা ভালো ফি দিত। কিন্তু নর্থ-ব্রিটিশের কাজটা শেষে ছাড়িয়া দিতে হইল। একজন ভদ্রলোককে বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তাহার মূল্য দিলাম। একজন এজেণ্ট আমার জানা-শোনা ভদ্রলোকটিকে একদিন আমার কাছে লইয়া আসিলেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম তাঁহার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই। ইউরিণটা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে একটি পাত্র দিয়া বলিলাম—'বাথরুমে যান, গিয়া ইহার ভিতর প্রস্রাব করুন।' তিনি বাথরুমে গেলেন ও একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'একটু আগেই আমি প্রস্রাব করিয়াছি, এখন প্রস্রাব হইবে না। আমি যদি বাড়ি হইতে পাঠাইয়া দিই ক্ষতি আছে কি?' বলিলাম, 'ক্ষতি নাই, 'তবে ইহাদের নিয়ম যে প্রস্রাবটা আমার সামনে করিতে হইবে। বেশ, আপনাকে বিশ্বাস করিতেছি, আপনি বাড়ি হইতেই প্রস্রাবটা পাঠাইয়া দিন।' তিনি চলিয়া গেলেন। একটু পরে প্রস্রাব আসিল। দেখিলাম, প্রস্রাবে কোন দোষ নাই। ভালো রিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইয়া দিলাম। সেইদিন রাত্রেই অন্য কোম্পানীর একজন এজেণ্ট আসিয়া আমার সহিত দেখা করিয়া প্রশ্ন করিলেন—'আপনি অমুকবাবুর রিপোর্টটি কি পাঠাইয়া দিয়াছেন?' বলিলাম, 'দিয়াছি, কোন দোষ নাই।' 'তাঁহার ইউরিণটা কি পরীক্ষা করিয়াছিলেন?' যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলিলাম। এজেণ্ট বলিলেন, 'উঁহার ইউরিণে দোষ আছে, সেইজন্যেই এই চাতুরী করিয়াছে।' পরদিনই ভদ্রলোককে আমি ডাকিয়া পাঠাইলাম। বলিলাম, 'আপনার ইউরিণ লইয়া নানারকম গুজব শুনিতেছি—ওটা আর একবার পরীক্ষা করিতে চাই। আমার সামনেই প্রস্রাবটা করুন।' করিলেন। দেখিলাম প্রস্রাবে অ্যালবুমেন এবং সুগার দুই আছে। তখনই নর্থ ব্রিটিশ কোম্পানীকে একটি আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করিলাম। Don't accept the report I have sent. Letter forwarded. চিঠিতে সব কথা খুলিয়া লিখিলাম এবং তাহার সঙ্গে আমার রেজিগ্‌নেশন-পত্রও পাঠাইয়া দিলাম। লিখিলাম, আমি প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার, সাধারণ লোকের আশ্রয়ভাজন হইতে পারিব না। ঠিকমত পরীক্ষা করিলে অধিকাংশ লোকেই Unfit হইয়া যাইবে। কারণ প্রকৃত সুস্থলোকের সংখ্যা এ দেশে কম। আমাদের স্বার্থে যদি আমি সততা অবলম্বন করি তাহা হইলে আমি সকলের কোপদৃষ্টিতে পড়িব। তাহা আমি হইতে চাই না। তাই কাজে ইস্তফা দিলাম। নর্থ ব্রিটিশ কোম্পানী আমার সততার খুব প্রশংসা করিয়া আমাকে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন এবং আমাকে উচ্চপদে নিয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন। আমি কিন্তু আর রাজি হই নাই। আমার ইন্‌সেওরেন্সের কাজ-কর্মও ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল। প্রধানতঃ ধারের উপর নির্ভর করিতাম। অনেকদিন

পরে সাহিত্য-সংসারের দাদামশায়ের মুখে একটি বড় খাঁটি কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—দেখ ভায়া, নিম্নমধ্যবিত্ত গৃহস্থের ধারই লক্ষ্মী। লক্ষ্মী আমার উপর কৃপা করিয়াছিলেন। লোকে আমাকে বিশ্বাস করিয়া ধার দিত এবং সেই ঋণের পাল তুলিয়া আমার জীবন-তরী ভালোভাবেই ভাসিয়া যাইত। জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া আজ দেখিতেছি, সমস্ত জীবনটাই এইভাবে কাটিয়াছে।

আজিমগঞ্জের আর একটি প্রধান ঘটনা আমার প্রথম সন্তানের জন্ম। আমার মা ও বাবা পূর্বেই আসিয়াছিলেন। আজিমগঞ্জে তেমন যোগ্য নার্স বা দাই ছিল না। গঙ্গার ওপারে জিয়াগঞ্জে মিস হুকারের একটি নামকরা মেটারনিটি হাসপাতাল ছিল। একদিন লীলাকে সেখানে লইয়া গেলাম। তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন সব ঠিক আছে। আর মাসখানেকের মধ্যেই হইবে। একটা তারিখও বলিলেন। আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম—'আপনি আমার বাসায় গিয়া প্রসব করাইবেন কি?' তিনি বলিলেন—'যাইতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু অসুবিধা অনেক। প্রথম অসুবিধা নদী। তাহা ছাড়া কখন ব্যথা ধরিবে তাহা অনিশ্চিত। রাত-দুপুরে হইলে নদী পার হইয়া সেখানে পৌঁছাইতে আমার কষ্টও হইবে। সুতরাং এক সপ্তাহ আগে হাস-পাতালে একটি ঘরে আপনার স্ত্রীকে রাখিয়া যান। এখানে কোনও কষ্টও হইবে না। আপনারা দুবেলা আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাইবেন। সঙ্গে ঘরের খাবারও আনিতে পারিবেন।' মা-বাবাকে গিয়া সব বলিলাম। মা বলিলেন—'হাসপাতালে যদি দাও সঙ্গে আমিও থাকিব।' বাবা বলিলেন, 'হাসপাতালে দেওয়াই ভালো।' ডঃ মিস হুকারকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার মায়ের জন্যেও তিনি একটি ঘর দিতে পারিবেন কিনা। সঙ্গে একটি ছোট বোনও থাকিবে। তিনি বলিলেন—'একটি নতুন ঘর হইয়াছে। সেখানে কোন রোগী এখনও রাখা হয় নাই। সেই ঘরে অনায়াসে আপনার মা থাকিতে পারেন।' সেখানে আমরা মাকে লইয়া গেলাম। কিন্তু অচিরেই আর একটি সমস্যা দেখা দিল। বাথরুম। সেখানে কমোড। মা অপরের ব্যবহৃত কমোডে বসিতে রাজি হইলেন না। তিন থাক্ ইঁটের মাঝখানে একটি নতুন pot দিয়া মিস হুকার এ সমস্যাটা সমাধান করিয়া দিলেন অবশেষে।

বাবা ও আমি রোজ আজিমগঞ্জ হইতে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। রোজ বিকেলে আমরা নদী পার হইয়া জিয়াগঞ্জের হাসপাতালে যাইতাম। মা একদিন বলিলেন—'আমাকে এক কলসী গঙ্গাজল দিয়া যাও। মেমসাহেব যখন তখন আসিয়া বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড় ছুঁইয়া দিতেছেন। তাঁহাকে বারণ করা যায় না। গঙ্গাজল ছিটাইয়া শুদ্ধ করিয়া লইব।' গঙ্গাজল জোগাড় করা শক্ত হইল না। কিন্তু যাহা ক্রমশঃ শক্ত হইয়া উঠিল তাহা প্রত্যহ গঙ্গা পার হইয়া হাসপাতালে যাতায়াত করা। গঙ্গা পার হইয়া হাঁটিয়াই সেখানে যাইতাম। আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম, বাবার উৎসাহ কিন্তু অদম্য। তখন বর্ষাকাল। শ্রাবণ মাস। রাস্তায় জল-কাদা। রোজই গিয়া শুনি 'ব্যথা' ধরে নাই। মিস হুকার যে তারিখ ঠিক করিয়াছিলেন তাহা উত্তীর্ণ

হইয়া আরও চার-পাঁচদিন কাটিয়া গেল। তখন মিস হকার বলিলেন আর বেশী দেরী করা ঠিক নয়। Labour induce করিতে হইবে। অর্থাৎ ঔষধ খাওয়াইয়া এবং ইনজেকশন দিয়া 'ব্যথা' জাগাইতে হইবে। তখন 'সিজরিয়ান' করিবার কথা সহজে কেহ ভাবিত না। মিস হকার আশঙ্কাপ্রকাশ করিলেন বেশী দেরী করিলে ছেলের মাথা শক্ত হইয়া যাইবে। প্রসব করিতে কষ্ট হইবে খুব। সুতরাং Labour induce করাই স্থির হইল। মিস হকার বলিলেন, 'কাল সকালেই Castor Oil এবং কুইনিন খাওয়াইয়া দিব। তাহার পর প্রয়োজন হইলে Pituitrin ইনজেকশন দিব। আপনারা বিকালে আসিয়া দেখিবেন শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে।' সকালে আমার আসিবার উপায় ছিল না, কারণ সকালে আমারও হাসপাতালের ডিউটি। রোগীর ভীড়ও প্রচুর। বারোটার আগে হাসপাতাল ছাড়িয়া আসা সম্ভবই ছিল না। বাবা যাইবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়াছিলেন। হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া খাওয়াদাওয়া সারিতেই দুইটা বাজিয়া গেল। একটু বিশ্রাম করিয়া বেলা চারটা নাগাদ আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। অকালেও বেশ মেঘ ঘনাইয়া আসিল। আমরা যখন নৌকোয় তখনই টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে অবশ্য ছাতা ছিল, কিন্তু ওপারে গিয়া যখন পৌঁছিলাম বৃষ্টি বেশ জোরে নামিল। ছাতায় কুলাইল না। আমরা দ্রুতপদে ছুটিয়া গিয়া অবশেষে হাসপাতালের পিছনে একটা গাছের তলায় গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিলাম না। গাছতলায় দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলাম। এক পশলা প্রবল বর্ষা হইয়া গেল। খানিকক্ষণ গাছতলায় দাঁড়াইয়া আপাদমস্তক ভিজিয়া ছপ-ছপ করিতে করিতে আমরা শেষে হাসপাতালের দিকেই অগ্রসর হইলাম। সেখানে গিয়া খবর পাইলাম, তখনও কিছু হয় নাই। শুনিলাম লীলাকে ডেলিভারি রুমে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। খুব ব্যথা শুরু হইয়াছে। ডক্টর নিউল, ডক্টর হকার এবং আর একজন বিলাতী সিস্টার সেখানে আছেন। ভিজা কাপড়ে আমরা দুইজন খানিকক্ষণ ভিজিটার রুমে বসিয়া রহিলাম। কিন্তু আশঙ্কা হইল আমাদের হয়তো ঠাণ্ডা লাগিতে পারে। তাই আর অপেক্ষা না করিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন সকালে উঠিয়াই আবার আমরা হাসপাতালে গেলাম। শুনিলাম আমরা চলিয়া আসিবার পরই একটি মেয়ে হইয়াছে। ডক্টর হকার্স হাসিয়া আমাদের সম্বর্ধনা করিলেন—'দেখবেন আসুন, কেমন গোলগাল মেয়ে হয়েছে।' শ্রাবণমাসে হইয়াছিল বলিয়া মেয়ের নাম রাখিলাম কেয়া। আঁতুরের সংস্কার ছিল বলিয়া মা কেয়াকে ছুঁইতেন না। দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেন। মিস হকার একদিন আমাকে বলিলেন—মেয়ে হইয়াছে বলিয়া কি আপনার মা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন? তিনি তো নাতনীকে একদিনও কোলে করিতেছেন না। তখন তাঁহাকে আঁতুর-রহস্য বিবৃত করিয়া বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন আপনাদের নিয়মটি খারাপ নয়—ভালো। মাসখানেক নবজাতককে বা প্রসূতিকে বাহিরের লোকের সংস্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া রাখাই উচিত। কয়েকদিন পরে হাসপাতাল হইতে কেয়াকে বাড়িতে

লইয়া আসিলাম। শাঁখ বাজানো হইল। মেয়ে হইলে শাঁখ বাজানো হইবে না এ নিয়ম আমি উঠাইয়া দিলাম।

প্রথম পিতৃত্বের একটা বিশেষ অনুভূতি আছে। সদ্যোজাত কন্যাটির কাছেই মন সর্বদা পড়িয়া থাকিত। তাহার দেয়ালা-করা, তাহার কান্না-হাসি, তাহার হাত-পা ছোড়া একটা অপরূপ সৌন্দর্য-লোকে লইয়া গেল আমাকে। একটা সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধও সঞ্চারিত হইল মনের ভিতর। যে প্রাণীটিকে সংসারে আনিয়াছি তাহার ভবিষ্যৎ যে আমার উপরই নির্ভর করিতেছে। এ বিষয়ে আমার অজ্ঞাতসারেই যেন একটু সচেতন হইলাম। আমার ভাইরা একে একে খবর পাইয়া আজিমগঞ্জে আসিয়া হাজির হইল। আমার আর্থিক অবস্থা তখন ভালো ছিল না। রাঁধুনী রাখিতে পারি নাই। লীলাকে রাঁধিতে হইত। মা সাহায্য করিতেন। এতগুলি লোকের রান্নাবান্না করা এবং তাদের নানাবিধ দাবী মিটানো সহজসাধ্য নয়। তবু কি আনন্দে যে সে দিনগুলো কাটিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমার নাই। আনন্দের জন্যে বাহিরের উপকরণ বেশী প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন সকলের মনের সহৃদয়তার। সে সহৃদয়তা না থাকিলে আনন্দের ঐকতান বাজে না। আমাদের পরিবারে সে সহৃদয়তা তখন ছিল। ভগবানের আশীর্বাদে এখনও আছে। আজিমগঞ্জের নিকটেই মুর্শিদাবাদ, সেই মুর্শিদাবাদ যেখানে মুর্শিদকুলী খাঁ হইতে মিরজাফর ও আরো অনেকের লালাখেলা রঙ্গ-ভূমি, যে মুর্শিদাবাদে বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরেজদের গলায় জয়মাল্য পরাইয়া দিয়া অসমর্থ বিলাসী উচ্ছৃঙ্খল সিরাজকে চরম শাস্তি দিয়াছিলেন পলাশীর প্রাঙ্গণে, এই মুর্শিদাবাদ দেখিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সকলেই দফায় দফায় সেখানে গেল এবং হাজারদুয়ারীর সঙ্গে অনেক কবরখানা দেখিয়া আসিল। দেখিয়া আসিল সিরাজের সমসাময়িক ইতিহাসে যে মহিলাটি সত্যিই মহীয়সী ছিলেন সেই লুৎফুন্নিসার কবরটি বড়ই অযত্নে, বড়ই অবহেলায় পড়িয়া আছে। কিছুদিন পর তাহা বিলুপ্ত হইবে।

আজিমগঞ্জে যখন ছিলাম তখন একটি অপরূপ উৎসবও দেখিয়াছিলাম। ইহা 'বেড়া' নামে প্রসিদ্ধ ছিল তখন। জানিনা এ উৎসব এখন আর হয় কিনা। ভাদ্রমাসের শেষের দিকে—সম্ভবতঃ পূর্ণিমায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। সন্ধ্যার পর ভাদ্রমাসের ভরা-গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া আমোদ-আহ্লাদে মত্ত বহুলোক সেদিন গঙ্গাবক্ষে বিহার করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িত। কল্পনা করুন—কূলে কূলে ভরা শারদ-জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত। তাহার উপর অনেক সুসজ্জিত আলোকিত নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে। কোনটি হইতে হাসির হররা শোনা যাইতেছে, কোনটি হইতে বা গান। কোন বড় নৌকায় নাচও হইতেছে, নটীর নূপুরের শব্দও শোনা যাইতেছে মাঝে মাঝে। সারেঙ্গী এবং তবলচির বাজনাও। আধো-আলো অন্ধকারে সুরলোকের আভাস পাওয়া যাইতেছে যেন। সব নৌকাই ভাসিয়া চলিয়াছে মুর্শিদাবাদের ঘাটের দিকে। সেখান হইতেই নবাবের নৌকা ভাসিত। সেই নৌকাটিকে সম্বর্ধনা করিবার জন্যেই এতগুলি নৌকার সানন্দ অভিযান।

কেয়ার বয়স তখন একমাস। মা এ ধরনের হুজুকে খুবই উৎসাহী ছিলেন। বলিলেন, 'তুই একটা বড় নৌকা ঠিক কর। আমরা বেড়া দেখতে যাব। সব্বাই যাব। ছই-দেওয়া নৌকা ভাড়া করিস, তোর মেয়েকে ছইয়ের তলায় ঢাকাঢুকি দিয়ে রেখে দেব, ঠাণ্ডা লাগবে না।'

ঠিক করিলাম একটি নৌকা। গঙ্গাবক্ষে অনেক নৌকার সহিত আমাদের নৌকাও ভাসিল—ভাসিতে ভাসিতে আমরাও মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। চারিদিকে গান-বাজনা, আনন্দ-কলবর শোনা যাইতেছে নানা নৌকা হইতে। কিন্তু নবাবের নৌকা কই? সকলেই উদগ্রীব হইয়া আছি। ক্রমে ক্রমে একটি বিরাট হর্ম্য যেন নদীবক্ষে ধীরে ধীরে মূর্ত হইয়া উঠিল। তাহার অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে আলো জ্বলিতে লাগিল একে একে। নানা রঙের আলো, সমস্তটা যখন আলোকিত হইয়া উঠিল তখন মনে হইল ইহা যেন নৌকা নয়, একটা অপূর্ব আবির্ভাব। মুর্শিদাবাদের নবাবরা যখন প্রকৃত নবাব ছিলেন তখন এই উৎসব নাকি আরও জাঁকজমকের সহিত হইত। সে যুগের বড়লোকেরা পরস্পরের সহিত পাল্লা দিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকা বাহির করিতেন। শারদ-পূর্ণিমায় ভাদ্রের ভরা গঙ্গার উপর স্বপ্নের রূপকথালোক মূর্ত হইয়া উঠিত। রাত বারোটা পর্যন্ত এই শোভা দেখিলাম আমরা।

ইহার কিছুদিন পরেই একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিল। রাধিকাবাবুর কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি একজন রিটায়ার্ড ডাক্তার, আমাদের বাড়ির কাছেই তিনি থাকিতেন। বাবার সহিত খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তিনি প্রত্যহ বৈকালে আসিয়া বাবাকে লইয়া বাহির হইতেন। একদিন লক্ষ্য করিলাম আমার বাড়ির পাশ দিয়া যে রেললাইন চলিয়া গিয়াছে, সেই রেললাইনের পাশ দিয়া উভয়ে রোজ আজিমগঞ্জ জংশন স্টেশনের দিকে যান। বাবাকে বলিলাম রেললাইনের কাছ দিয়া বেড়াইতে যাওয়াটা নিরাপদ নহে। কিন্তু তাহারা রোজই সেইপথে বেড়াইতে যাইতেন। আমার পোষা কুকুর ঝুনুটাও তাঁহাদের পিছু পিছু যাইত। তাহার প্রবণতা ছিল দুইটি রেলের ঠিক মাঝখান দিয়া চলিবার। সেদিন বাবা হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন একটি ট্রেন আসিতেছে। ঝুনু লাইনের ভিতর রহিয়াছে। বাবা তাহাকে বাঁচাইবার জন্য লাইনের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। তাহার পরই দুর্ঘটনা।

আমি তখন গঙ্গার ওপারে জিয়াগঞ্জে একটি রোগীর বাড়ি বসিয়া রোগী দেখিতে-ছিলাম। একজন উর্ধ্বশ্বাসে আসিয়া খবর দিলেন, আপনি শীঘ্র চলুন, আপনার বাবা রেলে চাপা পড়িয়াছেন। বাঁচিয়া আছেন কিনা বলিতে পারি না। আমি প্রায় ঘণ্টা-খানেক পরে পৌঁছিলাম। দেখিলাম রেলের পাশে লোকে লোকারণ্য। ভীড় ঠেলিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বাবা মাটিতেই রেলের পাশে চোখ বুঁজিয়া শুইয়া আছেন। তাঁহার মাথায় রক্ত। আমি ঝুঁকিয়া যখন তাঁহার নাড়ী দেখিতে গেলাম বাবা চোখ খুলিয়া আমার দিকে চাহিলেন। বলিলেন, 'আমার মাথায় কিছু আঘাত

লেগেছে, আর বুকের পাঁজর ভেঙে গেছে। আর বিশেষ কিছু হয় নি। ওরা আমাকে নিয়ে যেতে চাইছিল হাসপাতালে, আমি যাই নি। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। তুমি একটা স্ট্রেচার আনাও।'

একটি স্ট্রেচার আনাইয়া অতি সাবধানে বাবাকে ধীরে ধীরে বাড়িতে লইয়া গেলাম। শহরের প্রবীণ ডাক্তারদের ডাকিলাম। তাঁহারা বলিলেন—মাথার একজায়গায় খানিকটা চামড়া কাটিয়া গিয়াছে। সেটা stitch করিয়া দেওয়া হইল। দেখা গেল পাঁজরের তিনটি হাড় ভাঙিয়াছে। যথারীতি strat করিয়া দিলেন। তাঁহাকে Anti-futanic injection এবং মর্ফিনও দেওয়া হইল। বাবা যে প্রাণে বাঁচিয়া ফিরিয়াছেন ইহাতেই আমরা সবাই আশ্বস্ত হইলাম। বাবা কিন্তু বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া ঘুমাইতে পারিতেছেন না। তখন তাঁহার জন্যে একটা ইজিচেয়ারের ব্যবস্থা করিলাম। ইজি-চেয়ারের আশেপাশে বালিস গুঁজিয়া দিবার পর বাবা আরাম-বোধ করিতে লাগিলেন। রাত্রে ঘুমও হইতে লাগিল। বাবার সঙ্গে গল্প করিবার জন্যে রাধিকাবাবু প্রায় প্রত্যহ আসিতেন। আরও আসিতেন অনেকে। চা-জলখাবার সরবরাহ করিতে লাগিল লীলা। তাহার খাটুনি খুব বাড়িয়া গেল কিন্তু কাঁচা পোয়াতির পক্ষে যেসব নিয়ম পালন করা উচিত তাহা পালিত হইতেছিল না। ফলে লীলা ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। কেয়া প্রচুর মাই-দুধ খাইত, তাহার স্বাস্থ্যের কোন অসুবিধা হয় নাই। লীলার দুর্বলতা তখন ধরা পড়ে নাই, বাবাকে লইয়া এবং আমার কাজকর্ম লইয়া এত ব্যস্ত থাকিতাম যে লীলার দিকে মন দিবার অবসর পাইতাম না। বেশী মনোযোগ দিবার উপায়ও ছিল না। মা ছিলেন সেখানে। আমি লীলার ঔষধপত্র, খাওয়াদাওয়া লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে মা যদি কিছু মনে করে এ সঙ্কোচও ছিল। লীলাকে কেবল এক বোতল উইনকারনিস্ (wincarnis) কিনিয়া দিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। বাবাকে লইয়া খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম তখন। কারণ বাবার ডায়াবিটিস ছিল। যাহা হোক, ভগবানের কৃপায় বাবা ক্রমশঃ ভালোর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতিবেশীরা সে সময় খুব সাহায্য করিয়াছিল। বাবা তাহাদের ভদ্রতায় খুব মুগ্ধ হইলেন। আমাকে বারবার বলিতে লাগিলেন, 'জায়গাটি খুব ভাল। তুমি এখানেই থাকিয়া যাও। এখানে তোমার সুনাম হইয়াছে, এখানেই ক্রমশঃ প্র্যাকটিশ জমিয়া যাইবে। প্র্যাকটিশ জমিয়া গেলে চাকরি ছাড়িয়া দিও। এ অঞ্চলে ল্যাবরেটারি নাই, তোমার ল্যাবরেটারি ভালই চলিবে।' শুধু বাবা নয়, অনেকেই আমাকে এ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এমনকি আমাদের চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এবং তাঁহার দাদা পান্নালাল সিংহও বলিতে লাগিলেন, আমরা ভবিষ্যতে তোমার উন্নতি করিয়া দিবার চেষ্টা করিব। তুমি থাকিয়া যাও। লীলার কিন্তু এই আজিমগঞ্জে থাকিবার ইচ্ছা ছিল না, আমার তো ছিলই না। আজিমগঞ্জে দুই-চারিজন লোক খুবই ভদ্র ছিলেন কিন্তু অধিকাংশ লোকই ছিল নিম্নস্তরের। নানারকম চক্রান্ত, দলাদলি লাগিয়াই থাকিত। সেখানে বড়লোক

ছিলেন কৈঁইয়েরা, তাঁহাদের মধ্যে অনেক ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজাসাহেব। তিনি ছিলেন আমাদের চেয়ারম্যান রায়বাহাদুরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই দুইজনকে কেন্দ্র করিয়া আজিমগঞ্জের রাজনীতির ঘোঁট চলিত। অনেকে আমাকেও একটা ঘোঁটের মধ্যে টানিবার চেষ্টা করিতেন। আমি কিন্তু কোন দলেই যাইতে চাহিতাম না, এ জন্যে উভয়দলেরই বিরাগভাজন হইতেছিলাম ক্রমশঃ। মোট কথা আজিমগঞ্জের আবহাওয়াটা ভালো লাগিতেছিল না। ঠিক করিলাম বাবা একটু ভালো হইলে এক বছরের ছুটি লইয়া আজিমগঞ্জ হইতে সরিয়া পড়িব, আর ফিরিব না। বাবা যখন সুস্থ হইয়া চলাফেরা করিতে লাগিলেন তখন তাঁহাকে বলিয়া একদিন ছুটির দরখাস্ত করিয়া দিলাম। আমার নিতান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া বাবা আমাকে আর আজিমগঞ্জে থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন না। বলিলেন—অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। ঠিক করিলাম, ভাগলপুরে গিয়া বসিব। মণিহারীর কাছে ভাগলপুরই সবচেয়ে বড় শহর। ডিভিশনাল হেড-কোয়ার্টার্সে অনেক ডাক্তার। ল্যাবরেটরি করিবার পক্ষে লোভনীয় শহর। ছেলেদের দুই-তিনটি হাইস্কুল, মেয়েদের, ছেলেদের কলেজ—সব আছে। বাবা ইহাতে মত দিলেন। ঠিক হইল আমরা আজিমগঞ্জ হইতে প্রথমে মণিহারী যাইব। তাহার পর মণিহারী হইতে আমি ভাগলপুর গিয়া সেখানকার ডাক্তারদের সহিত আলাপ করিব। সেখানকার কোনও ডাক্তারকেই আমি চিনিতাম না। সেখানকার একজন বড় ডাক্তার ছিলেন, ডাক্তার মোহিনীমোহন ঘোষ। বাবার সহিত তাঁহার আলাপ ছিল। ঠিক হইল বাবার নিকট হইতে চিঠি লইয়া তাঁহার সহিত প্রথম দেখা করিব।

আমি আজিমগঞ্জ হইতে যেদিন চলিয়া আসি সেদিন সত্যই বুঝিলাম কত লোক আমাকে ভালবাসিত। স্টেশন লোকে লোকারণ্য। সকলেই অনুরোধ করিতে লাগিল আমি আবার যেন আজিমগঞ্জে ফিরিয়া আসি।

আজিমগঞ্জে আর ফিরিয়া যাই নাই।

আমার তৃতীয় ভাই টুলু (গৌরমোহন) ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে পাটনার টেম্পল্ মেডিকেল স্কুল হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়াছিল। আমি যখন আজিমগঞ্জে ডাক্তার, সে তখন মণিহারীতে বাবার জায়গায় চাকরি করিতেছে। সে আমার চেয়ে চার বছরের সিনিয়র। আমি যখন আজিমগঞ্জে ছিলাম তখন সে আমার ল্যাবরেটরির জন্য একটি ছোট 'অটোক্লেভ' কিনিয়া দিয়াছিল। কলিকাতায় ছোট 'অটোক্লেভ' পাই নাই।

আমার পরের ভাই ভোলা নন-কো-অপারেশন করিয়া অনেকদিন বাড়িতে বসিয়াছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধাবী ছিল সে। কিন্তু চার পাঁচ বৎসর বাড়িতে বসিয়া আমাদের জমির তদারক করিয়া কাটাইয়া দিল। অবশেষে মা-বাবার আগ্রহাতিশয্যে এবং বাবার এক প্রাক্তন সিভিলসার্জন জন সাহেবের আনুকূল্যে ভোলা কটক মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হইল। আমি যখন আজিমগঞ্জ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি সেই সময়

ভোলাও কটক হইতে পাশ করিয়া ফেলিল। শুধু পাশই নয়, সব বিষয়ে ভোলা ফার্স্ট হইয়া পাশ করিল। নন-কো-অপারেশনের হুজুকে পড়িয়া জীবনের অমূল্য কয়েকটা বৎসর নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে ডাক্তার হইয়া বাহির হইল এবং ভাগলপুর সদর হাসপাতালে সেকেণ্ড মেডিকেল অফিসারের চাকরি পাইল। টেম্পোরারি চাকরি। ভাগলপুর সদর হাসপাতালে মাত্র ছমাসের জন্য ঐ পোস্টটি সৃষ্টি করিয়াছিলেন ভাগলপুর মিউনিসিপালিটির কর্তৃপক্ষরা। ভোলা হাসপাতালে একটি কোয়ার্টার পাইয়াছিল। আমি যখন ভাগলপুরে গেলাম তখন ভোলার সেই কোয়ার্টারে গিয়া উঠিলাম। লীলা মণিহারীতে ছিল।

ভাগলপুর

ভাগলপুরে গিয়া প্রথমে দেখা করিলাম ডাক্তার মোহিনীমোহন ঘোষের সহিত।

দেখিলাম তাঁহার বিরাট প্র্যাকটিশ। তাঁহার বাড়ির সামনের সমস্ত রাস্তাটা গাড়িতে গাড়িতে ভর্তি। অধিকাংশই ঘোড়ার গাড়ি এবং টমটম। লোকের ভিড়ও প্রচুর। মোহিনীবাবু আমাকে প্রচুর উৎসাহ দিলেন। বলিলেন—'এখানে ভালো ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি নেই, আপনি আসুন, আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব।' কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সাহায্য আমি পাই নাই। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। ভাগলপুরের অন্যান্য বড় ডাক্তারদের সহিত দেখা করিলাম। ডাক্তার অমূল্যচরণ ঘোষ, ডাক্তার মহীউদ্দিন আমেদ, ডাক্তার ক্ষিতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত, ভব ডাক্তার (ভাল নাম মনে নাই), ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ নিয়োগী (দাও ডাক্তার) এবং আরো অনেকের সহিত দেখা করিয়া আমার আগমনবার্তা জানাইলাম। সকলেই আমাকে আশ্বাস দিলেন সাহায্য করিবেন। সকলের নিকট হইতে আশ্বাস পাইয়া বাজারের ভিতর একটি ঘর খুঁজিতে লাগিলাম। অবশেষে একটি মনোমত ঘর পাওয়া গেল খলিফাবাগে। একপাশে সি. এল বড়ুয়া ডেন্টিস্ট এবং আর একপাশে ঢনঢনিয়াদের ইলেকট্রিক্যাল গুডস্-এর দোকান। মাঝখানে প্রকাণ্ড একটি হল। ল্যাবরেটরির নামকরণ হইল—The Sero Bactro Clinic। একটি প্রকাণ্ড কাঁচের উপর সাদা পশ্চাৎভূমির উপর লাল অক্ষরে নামটি লিখাইলাম। তাহার পর সেই কাঁচটি লাগাইয়া দিলাম একটি বড় কাঠের বাক্সের উপর। বাক্সের ভিতর একটি বড় ইলেকট্রিক বাল্‌বও দিলাম। একজন মিস্ত্রিকে দিয়া অনেকগুলি কাঠের র‍্যাক তৈয়ারী করাইয়া সেগুলি দেওয়ালে আটকাইয়া দিলাম। তাহার উপর রাখিলাম আমার ল্যাবরেটরির Reagents গুলি। গোটা দুই টেবিল এবং গোটা চারেক চেয়ারও কিনিতে হইল। 'হল'-টি প্রকাণ্ড। ঘন সবুজ রঙের কাপড় দিয়া ঘিরিয়া সেই হলের ভিতর একটি ছোট আপিসঘরও বানানো হইল। সেটিও টেবিল, চেয়ার এবং শৌখীন একটি টেবিলল্যাম্পে ভূষিত হইল। চমৎকার লিখিবার ঘর হইল একটি। টেবিলটি বেশ বড়, সেকালের টেবিল, চারদিকে

ড্রয়ার দেওয়া, উপরে রেকসিন আঁটা। টেবিলটি বাবার বন্ধু অনুকূল জ্যাঠামশাই আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। বেশ বড় প্রকাণ্ড টেবিল। সেটি আমার নিকট এখনও আছে। সেই টেবিলের একধারে একটি ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারও আমদানী করিলাম। টেবিলের উপর একধারে রহিল আমার Report-এর ছাপানো Form গুলি। আর একধারে ফুলদানী, কিছু বই এবং সাদা কাগজ। একটি ফাউণ্টেন পেন ছিল আমার তখন। পরে Swan এবং তাহার পর Waterman কিনিয়াছিলাম। ভালো কলম কেনার সখ আমার চিরকাল। কলমের পিছনে অনেক অর্থব্যয় করিয়াছি। অনেক ভালো ভালো পেনও উপহার পাইয়াছি। কিন্তু হারাইয়াছি এবং ভাঙিয়াছিও অনেক। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গানটির অনুকরণে বলিতে ইচ্ছা করে—

পেনগুলি মোর হাতের মুঠোয় রইল না
সেই যে আমার নানারঙের পেনগুলি
মোর আঙুলের চাপ যে তারা সইল না
সেই যে আমার নানা রঙের পেনগুলি।

অবান্তর কথায় আসিয়া পড়িয়াছি। এবার আসল কাহিনীতে ফিরিয়া আসা যাক্। আমার ল্যাবরেটরির জিনিসপত্র কেনাই ছিল। সেগুলি আনিয়া ল্যাবরেটরি সাজাইয়া ফেলিলাম। বহাল করিলাম মুনূনি মেথরকে। সেই আমাকে সব বিষয়ে সাহায্য করিল। তাহার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—যদিও গাঁজা খাইত কিন্তু বড বাধ্য ছিল সে। চোখদুটি সর্বদাই লাল, কিন্তু সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ। ডাকিবামাত্র সাড়া দিত। সন্ধ্যার পর রোজ তাড়ি খাইত সে। তাহাকে একদিন উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম—কেন ওই সব ছাইপাঁশ খেয়ে পয়সা লোকসান করিস। সে বলিল—আমরা গরীব, আপনাদের মতো দামী সিগারেট কিনিবার পয়সা নাই আমাদের। তাই সস্তা নেশা করি। আর নেশা না করিলে কি লইয়া থাকিব। তাহার উত্তর আমাকে নীরব করিয়া দিল। আমি হাসিয়া তাহাকে একটা কাঁচি সিগারেট দিলাম।

সব গুছাইয়া গাছাইয়া যেদিন ল্যাবরেটরি খুলিব ঠিক করিলাম দেখা গেল সেদিনটি কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা। বাজার হইতে একটি লক্ষ্মীর পট কিনিয়া ল্যাবরেটরিতে টাঙাইয়া দিলাম; আর টাঙাইয়া দিলাম আমার মাস্টারমশাই চারুব্রত রায়ের ফটোখনি। সেইদিনই ক্ষিতীনবাবু আমাকে একটি 'কেস' ও পাঠাইলেন। একটি stool। সেই দিনই নগদ চারটাকা উপার্জন করিলাম। প্রতিবছর কোজাগরী পূর্ণিমার দিন এই পটটিকে আমরা অর্চনা করিয়া আসিয়াছি। এখনও করি। ভাগলপুরে আমার ল্যাবরেটরী-জীবন শুরু হইয়া গেল। তখনও আমি ভাগলপুর সদর হাসপাতালে ভোলার কোয়ার্টারে থাকি। একটি বুড়োগোছের চাকর আমাদের তত্ত্বাবধান করে। চাকরটার পাকা গোঁফ ছিল, সেটি সে পাকাইয়া শিঙের মতো উদ্যত করিয়া রাখিত। ভোলার বাসায় থাকিবার সময় আমি দুইটি বড় বড় শাদা খরগোস কিনিয়াছিলাম।

ইচ্ছা ছিল একটি ভেড়া এবং কিছু গিনিপিগ কিনিয়া 'ভাসারম্যান' পরীক্ষার ব্যবস্থা করিব। একদিন ল্যাবরেটরি হইতে ফিরিতেই ভোলার সেই বৃদ্ধ চাকরটি অদ্ভুত ভাষায় বলিল, 'বাবু সোব সাফ হয়ে গেলো।' প্রথম বুঝিতে পারি নাই, পরে দেখিলাম খরগোস দুইটি কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। সুতরাং তখনকার মতো 'ভাসারম্যান' পরীক্ষা স্থগিত রাখিতে হইল। আরও দুর্ঘটনা ঘটিল। হাসপাতালে কুক্ (Cook) সাহেব নামে একজন সিভিলসার্জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আগেও নাকি এখানে ছিলেন। গুজব শুনিলাম তাঁহারই খুঁটির জোরে মিস লাল নামক একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা ওখানকার মেয়ে হাসপাতালের ডাক্তার হইয়া আছেন। সকলে বলিত মিস লালের ডাক্তারী কোন ডিগ্রী নাই। কুক্ সাহেবের জোরেই তিনি চাকরিটি পাইয়াছেন। ইহাও শুনিলাম মিস লালের নেক-নজরে পড়িলে কুক্ সাহেবের কৃপা পাওয়া যায়। মনে হয় ভোলা মিস লালের নেক-নজরে পড়িবার চেষ্টা করে নাই। সুতরাং কুক্ সাহেব ভোলার উপব খুব প্রসন্ন হইলেন না। একদিন শুনিলাম ভোলা হাসপাতালে যে সেকেণ্ড মেডিকাল অফিসাররূপে ছিল সেই সেকেণ্ড মেডিকেল অফিসারেব পোষ্টটি নাকি কুক্ সাহেব বাতিল করিয়া দিবেন। আমি তগন উঠিয়া পড়িয়া একটি বাড়ি খুঁজিতে শুরু করিলাম।

লীলা মণিহারীতে গিয়া একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। আমার শ্বশুরমহাশয় মণিহারীতে আসিয়াছিলেন কেয়াকে দেখিতে। তিনি লীলাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া গেলেন, চিকিৎসাব জন্যে। সেখানে ডাক্তার দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসায় লীলা অনেকটা ভালো হইল।

আমার তখনকার লেখা লীলাকেই নানাভাবে চিঠি লেখা। চিঠি কখনও গদ্যে, কখনও কবিতায়। কবিতার অনেক চিঠি আবার রঙীন করিয়াও দিতাম।

ভোলার চাকরিটা অবশেষে গেল। মণিহারী হইতে চিঠি পাইলাম আমি যেন লীলাকে কলিকাতা হইতে লইয়া আসি। ভোলা মণিহারী চলিয়া গেল। আমি কলিকাতায় গিয়া শুনিলাম পরিমল কেয়ার একটি ফটো তুলিয়াছে। কেয়ার বয়স তখন চার-পাঁচমাস। ছবিটি এখনও আমাদের কাছে আছে, নষ্ট হয় নাই।

লীলাকে মণিহারীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আমি আবার ভাগলপুরে ফিরিলাম। একটি বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। আসিয়াই ভাগ্যক্রমে দুই-একদিনের মধ্যেই বাড়ি পাইয়া গেলাম একটা। ভিখনপুরের একটি গলিতে। বাড়িটির নানারকম অসুবিধা। বাড়িতে কল নাই, রাস্তা হইতে জল আনিতে হয়। একটা কুয়াও আছে, সেটাও বাহিরে। বাড়িটি পাকা। রান্নাঘর ছাড়া বোধহয় গোটাতিনেক শোয়ার ঘর ছিল। বাহিরে বারান্দাও ছিল। আমার ল্যাবরেটরি হইতে হাঁটাপথে প্রায় পনেরো মিনিট। ইলেকট্রিক আলো নাই। এ সব সত্ত্বেও বাড়িটা ভাড়া করিয়া ফেলিলাম।

লীলার জন্য আটটাকা খরচ করিয়া একটি বড় আয়না কিনিলাম। ফুলদানী কিনিলাম। স্নো, পাউডার কিনিলাম। আর কিনিলাম কয়েকটি ছবি। একটি সরস্বতী,

একটি বিবেকানন্দের। একটি টেবিল এবং তুইটি চেয়ারও কিনিতে হইল। ইজিচেয়ারে শোওয়া আমার বিলাস, সুতরাং একটি ক্যাম্পের ফোলডিং ইজিচেয়ারও কিনিলাম। শুইবার চৌকি, জল রাখিবার জন্যে বড় একটি টিনের পাত্র এবং আরও খুঁটিনাটি জিনিস কিনিয়া আমার ভাগলপুর-বাসের প্রথম ভাড়াটে বাসাটি যথাসম্ভব মনোরম করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলাম। পরে অবশ্য প্রয়োজনমতো আরও নানা আসবাব খরিদ করিতে হইয়াছিল। ভাগলপুরে যখন প্রথম বাসা করি তখন আমার বাসায় ভোলা তো ছিলই, কারণ চাকুরিটি যাইবার পর তাহাকে হাসপাতালের বাসাটি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। ভোলা ছাড়া ছিল কালু, আমার পঞ্চম ভ্রাতা। কালু ওখানে কলেজে ভরতি হইয়া আই. এস. সি. পড়িতেছিল। আর ছিল জয়া, আমার মামাতো ভাই। সেও কলেজে ভর্তি হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ছিল টুলু আমার কনিষ্ঠ-ভ্রাতা, সে ভরতি হইয়াছিল সি. এম. এস. স্কুলে। সুতরাং শুরু হইতেই আমাকে অনেকের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব লইতে হইয়াছিল। লইবারই কথা, কারণ আমি বাবার বড় ছেলে। ভগবান সহায় ছিলেন। প্র্যাকটিশ করিয়া মাসে তিন-চারশো টাকা রোজগার হইতে লাগিল।

ভাগলপুরে ভাগলপুর ইনস্টিটিউট নামে একটি পুরাতন ক্লাব ছিল। তাস, বিলিয়ার্ডস, টেনিস প্রভৃতি খেলা হইত। কিন্তু ক্লাবের প্রধান আকর্ষণ ছিল ক্লাবের লাইব্রেরীটি। অনেক ভালো ইংরাজী বই ছিল সেখানে। এইটিই আমার প্রধান আকর্ষণ হইল—আমি উক্ত ক্লাবের মেম্বার হইলাম। যতদূর মনে পড়িতেছে শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ রায় মহাশয়ই আমাকে ক্লাবে লইয়া গিয়া মেম্বার করাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ রায় ছিলেন একজন কৃতবিদ্য সাহিত্যরসিক ব্যক্তি। আমার 'বনফুল' পরিচয় জানিবামাত্র তিনি আমার কাছে আসিয়া আলাপ করিলেন। যতদিন ভাগলপুরে ছিলাম ততদিন তাঁহার সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। এখনও আছে। তিনি এখনও ভাগলপুরে ওকালতি প্র্যাকটিশ করিতেছেন। আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছি। সুতরাং চাক্ষুষ মিলন আজকাল আর হয় না। মানসিক বন্ধুত্বটা কিন্তু এখনও অটুট আছে।

অমূল্যবাবুর সহিত প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় ক্লাবে দেখা হইত। ক্লাবের ছাদটি খুব মনোহর ছিল। সেখানে চেয়ার বিছাইয়া অনেকের সহিত গল্পগুজব করিতাম। সেই-খানেই 'নন্দ'-বাবু উকীল এবং আশু দের (বিখ্যাত Asude) সঙ্গে আলাপ হইয়া-ছিল। শ্রীযুক্ত আশু দে-ও উকীল ছিলেন। কিন্তু তাঁহার খ্যাতি ছিল অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে 'Patter' লেখার জন্য। আশুবাবুও কৃতবিদ্য (এম. এ. বি. এল.) এবং গুণী লোক ছিলেন। ভালো ম্যাজিক দেখাইতে পারিতেন, ভালো থিয়েটার করিতেন, বাংলায় 'ত্রয়ী' নামে একটা নাটকও লিখিয়াছিলেন। শনিবারের চিঠিতে তুই একটি ব্যঙ্গরচনাও লিখিয়াছিলেন বোধহয়। মানুষ হিসাবেও তিনি অদ্ভুতচরিত্রের লোক ছিলেন। কথাবার্তা বলিবার ধরণ, চাল-চলন, এমন কি জামার

'কোর্ট' পর্যন্ত অসাধারণ ছিল তাঁহার। অচিরেই আমার সহিত তাঁহার খুব ভাব হইয়া গেল। ভিখনপুরে আমার বাড়ির কাছেই তাঁহার বাড়ি ছিল। যেদিন ক্লাবে যাইতাম না সেদিন তাঁহার বাড়িতে গিয়া আড্ডা জমাইতাম। খুব ভালো চা খাওয়াইতেন। বাড়ির সংলগ্ন ছোট একটি আলাদা বাড়ি ছিল তাঁহার। সেখানেই পড়াশুনা করিতেন, সেখানেই মক্কেলদের সহিত আলাপ করিতেন। সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধবদের সহিত আড্ডা দিতেন সেইখানে। তাঁহার এই বাড়িতে পারিবারিক ঝামেলা, গোলমাল, কচকচি কিছুই ছিল না। অথচ পারিবারিক সুখ-সুবিধা ভোগ করিবার ষোল আনা বন্দোবস্ত ছিল। আশুবাবু বাড়ির কাছে থাকিয়াই বাণ-প্রস্থের আনন্দ উপভোগ করিতেন। আমি মাঝে মাঝে গিয়া এই বাড়িতে তাঁহার সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতাম।

কিছুদিন পরে আর একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সহিত অকস্মাৎ আলাপ হইয়া গেল আমার ল্যাবরেটারিতে। তিনি নিজের ইউরিণ পরীক্ষা করাইতে আসিয়াছিলেন। ডেন্টিস্‌ট্‌ চুনীলাল বড়ুয়া আমার পাশেই থাকিতেন। তিনিই আসিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। বলিলেন—ইনি বরারির ডাক্তার ভুবনবাবু। তাঁহার ইউরিণ পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট লিখিয়া তাঁহাকে দিলাম। তিনি আমাকে 'ফি' দিতে গেলেন। ফি লইলাম না। বলিলাম, 'আপনি ডাক্তার, আপনার নিকট হইতে 'ফি' লইতে পারি না। আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকিলেই আমি কৃতার্থ হইব। শুধু আপনার নয়, আপনার পরিবারের সমস্তরকম ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ভার আমি লইলাম। আপনি কি এখনও চাকুরি করিতেছেন?' ভুবনবাবু উত্তর দিলেন —'করিতেছি। আমার যাঁহারা মালিক তাঁহারা বলিতেছেন আপনি অবসরগ্রহণের পূর্বে আপনার মনোমত একজন লোক আপনার জায়গায় বসাইয়া দিলেই আপনার ছুটি। কিন্তু মনোমত লোক এখনও পাই নাই।'

জিজ্ঞাসা করিলাম—'কিরূপ লোক আপনি চান?' ভুবনবাবু বাঁধানো দাঁতে হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'প্রথমত চাই, লোকটি ভরদ্বাজগোত্রের হবে। অর্থাৎ মুখোপাধ্যায় তার উপাধি হবে। আমি নিজে মুখোপাধ্যায়, আমার জায়গায় একজন মুখোপাধ্যায়কেই বসাইব। দ্বিতীয়তঃ, সাব অ্যাসিস্টেন্ট সার্জেন হইলেই চলিবে। এম. বি. চাই না। কারণ জায়গাটা পাড়াগাঁয়ের মতো। এম. বি. ওখানে টিকিবে না। আর তার পরীক্ষার ফল যতটা ভালো থাকে, ততই ভালো।'

আমি বলিলাম, 'আমার একটি ভাই আছে। উপাধি মুখোপাধ্যায়। সে কটক মেডিকেল স্কুল হইতে প্রত্যেক সাবজেক্টে ফার্স্ট হইয়া পাশ করিয়াছে। সদর হাসপাতালে সেকেণ্ড মেডিকাল অফিসারের পোস্টে চাকরি করিতেছিল, কিন্তু সে পোস্ট কিছুদিন আগে উঠিয়া গিয়াছে।'

ভুবনবাবু সাগ্রহে রাজি হইলেন। বলিলেন—'আমি আপনার ভাইকে নিশ্চই লইব। কিন্তু আপনার ভাই খুব ভালো ছেলে। কোথাও না কোথাও ভালো

গভর্ণমেণ্ট চাকুরি পাইয়া যাইবে। বরারি জায়গাটা খুব ভালো নয়, যদিও ভাগলপুর মিউনিসিপালিটির ভিতর ; ওখানে হাই-স্কুলও আছে। কিন্তু ভদ্রসমাজ বলিয়া কিছুই নাই। তিনজন জমিদার আছেন, তাঁহাদেরই সাঙ্গোপাঙ্গরা সেখানে থাকে। ডাক্তারের কোয়ার্টার্স আছে, ইনডোর হাসপাতাল আছে, আউটডোর তো আছেই। রোগীও ভালো হয়। কিন্তু আমি সেখানে আমার পরিবার রাখি নাই। শ্বশুরপুরে আলাদা বাড়ি করিয়া সেখানেই থাকি। সকালবেলা খাইয়া হাসপাতাল যাই, সমস্ত-দিন সেখানেই থাকি ; রাত্রে চলিয়া আসি। বরারির সবাই ভালো, কিন্তু সমাজ বলিতে কিছুই নাই। দেখুন, আপনাদের যদি পছন্দ হয়, আমি আপনার ভাইকে চাকরিটি করিয়া দিব।'

বাবা তখন আমার কাছে আসিয়াছিলেন। বাবাকে গিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, 'চল, জায়গাটা দেখিয়া আসি।' ভাগলপুর হইতে বরারি চার মাইল দূরে। একদিন একটা ছ্যাকড়াগাড়ি ভাড়া করিয়া সকলে বরারি গেলাম। বরারি হাসপাতাল গঙ্গার ঠিক উপরে অবস্থিত। দৃশ্য অতিশয় রমণীয়। বাড়ির সামনে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। বাবা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। আমরাও হইলাম। বরারির হাসপাতালেই ভোলা অবশেষে মেডিকেল অফিসার-রূপে বাহাল হইল। তাহার সমগ্র কর্মজীবন বরারিতেই কাটিয়াছিল।

ভোলা প্রথম প্রথম আমার বাসা হইতেই বরারিতে যাতায়াত করিত। কখনও একাগাড়িতে, কখনও ট্রেনে। ভাগলপুর হইতে বরারিঘাট পর্যন্ত একটি ট্রেন কয়েক-বার যাতায়াত করিত।

বরারিতে ভোলা যাওয়ার পর আরও দুইটি লোকের সহিত হৃদ্যতা হইল। তাঁহারা সেইজাতের লোক যাঁহাদের সহিত আলাপ করিবার পর মনে হয় তাঁহারা অতি নিকট আত্মীয়। যে ভদ্রতা, যে বিনয়, যে আভিজাত্য, যে সহৃদয়তা আগে অনেক শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে দেখিতাম (এবং যাহা আজকাল ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছে) সেই পরম রমণীয় মনুষ্যগুণেই তাঁহারা মণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। প্রথমজনের নাম বিজয় বসু। ওখানকার ওয়াটারওয়ার্কসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। সকলেরই তিনি বিজয়দা। অবিলম্বে আমারও বিজয়দা হইয়া গেলেন। আমাকেও তিনি বলাইদা বলিয়া ডাকিতেন। সদা-হাস্যমুখ। সকলের উপকার করিবার জন্য সদা-ব্যস্ত। বৌদিও ঠিক তেমনি। তাঁহার উপর কতো জুলুম যে করিয়াছি তাহার ঠিক নাই। বিজয়দা কিছুদিন আগে মারা গিয়াছেন। বৌদি তাঁহার একমাত্র কন্যা-সন্তান পুতুর কাছে চলিয়া গিয়াছেন। কেমন আছেন জানি না। কাছের মানুষ অন্তরঙ্গ থাকে, দূরে চলিয়া গেলে সে অন্তরঙ্গতাও লোপ পায়। ইহা অমোঘ নিয়ম। স্মৃতি কিন্তু তাহাদের এখনও ধরিয়া রাখিয়াছে।

দ্বিতীয় লোকটির নাম পাঁচুগোপাল সেন। তিনি তখন ভাগলপুর জেলে Weaving Department-এর কর্তা ছিলেন। অতিশয় অমায়িক, কৃতবিদ্য ভদ্রলোক।

বিলাতফেরৎ, কিন্তু গায়ে বিলাতী গন্ধ নাই। তাঁহার স্ত্রী—আমাদের উষাদি ছিলেন তাঁহার যোগ্যা সহধর্মিণী। অবসর পাইলেই আমরা জেলখানায় তাঁহার বাসায় গিয়া আড্ডা জমাইতাম। পাঁচুবাবু শান্তিনিকেতনে গোড়ার আমলের ছাত্র। তখন ইহার নাম ছিল ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়। পাঁচুবাবু সে সময়কার একটি গল্প বলিয়াছিলেন। সেটি এখনও মনে আছে। রবীন্দ্রনাথের একটি রূপার বুরুশ ছিল। সেটি দিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজের মাথার চুল সুবিন্যস্ত করিতেন। বালক পাঁচুগোপালের ভারি লোভ ছিল ওই বুরুশটির প্রতি এবং সুবিধা পাইলেই তিনি রবীন্দ্রনাথের অগোচরে তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া ও২ বুরুশটি নিজেব মাথায় বুলাইয়া লইতেন। একদিন ধরা পড়িয়া গেলেন হাতে-নাতে। ধরিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বলিলেন—'তুই বুঝি আমার বুরুশে রোজ মাথা আঁচড়াস্? তাই ভাবছিলাম, আমার বুরুশে কাল চুল এলো কি করে? বুরুশটা তোর খুব পছন্দ? আচ্ছা, তুই নে ওটা। তোকে দিয়ে দিলুম।'

পাঁচুবাবু সেই অমূল্য উপহারটি সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আমরা সময় পাইলেই পাঁচুবাবুর বাড়িতে গিয়া আড্ডা জমাইতাম। একটা সুবিধা ছিল, ডাক্তার ক্ষিতীনবাবু তাঁহাদেব চিকিৎসক ছিলেন। যখনই সেখানে যাইতেন, তাঁহার মোটরে আমাদের তুলিয়া লইতেন। ক্ষিতীনবাবু শুধু ভালো ডাক্তারই ছিলেন না, ভালো সাহিত্য-রসিকও ছিলেন। সুতরাং আমার সঙ্গে তাঁহার একটু বেশী হৃদ্যতা হইয়াছিল। ডাক্তাব হিসাবে তিনি আমাব ল্যাবরেটরির বড় পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। আমাকে অনেক 'কেস' পাঠাইতেন তিনি।

ভাগলপুরের বিদ্বৎসমাজের সহিত ক্রমশঃ পরিচয় হইল। তখন টি. এন. জুবিলি কলেজে খুব ভালো ভালো বাঙালী প্রফেসর ছিলেন। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন একজন বাঙালী। রসায়ণের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। নাম ছিল হরলাল দাশগুপ্ত। বিদগ্ধ লোক। ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন মোহিনী সরখেল মহাশয় এবং নিশানাথ সরকার মহাশয়, কেমিস্ট্রির ডিমনস্ট্রেটার রাখাল ভট্টাচার্য, ফিজিক্সের গিরিধর চক্রবর্তী, অঙ্কের প্রফেসব গিরিজাপ্রসন্ন, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলেই শুধু বিদগ্ধ ব্যক্তিই ছিলেন না, প্রকৃত ভদ্রলোক ছিলেন তাঁহারা। ক্রমশঃ সকলের সহিত আমার আলাপ হইল। এ আলাপ ক্রমে গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। নারায়ণবাবুকে আমি দাদা বলিতাম, কারণ তাঁহাদের পরিবারের সহিত সাহেবগঞ্জ হইতেই আমার এবং কাকার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তখন প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। সকলেই পরস্পরের আত্মীয়ের মতো হইয়া থাকিতেন। সকলের সুখদুঃখের অংশীদার হইতেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পরলোকবাসী। কিন্তু তবু অনেকের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এখনও আমার যোগাযোগ আছে। অনেকে এখনও আসে আমার কাছে।

ভাগলপুরে যে বাড়িটায় প্রথম বাসা বাঁধিয়াছিলাম সেটি ছিল ভিখনপুরে। আমার ল্যাবরেটরি হইতে বেশ কিছুটা দূরে। আমাকে রোজ চারবার যাতায়াত করিতে হইত। তাহা ছাড়া বাড়িটায় আরো নানারকম অসুবিধা ছিল, জল ছিল না, দুই

একটি বিরক্তিকর প্রতিবেশীও জুটিয়াছিল। তাই বাড়ি বদল করিবার চেষ্টায় ছিলাম। হঠাৎ স্টেশন রোডের উপর একটা ছোট দ্বিতল বাড়ি পাইয়া গেলাম। ভাড়া একটু বেশী, কিন্তু ল্যাবরেটরির পাশে। খরচ একটু বাড়িল, তবু বাড়িটা ভাড়া করিলাম। সে বাড়ি লইবার পর আমার ভগ্নীপতি এবং বোন ছেলেমেয়েদের লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগ্নীপতির শরীর খারাপ হইয়াছিল। আমার কাছে আসিয়াছিল চিকিৎসার জন্য। তাহাবা কিছুদিন রহিল। রাঁধুনী ছিল না। লীলাকেই সব সামলাইতে হইত। আমার ল্যাবরেটরির মেথর চাকরটা বাজার প্রভৃতি করিয়া দিত। আমি ল্যাবরেটরিতে মেথরের হাতেই চা, জল সব খাইতাম। হঠাৎ একদিন বাড়ির দাইটা অন্তর্ধান করিল। শুনিলাম, পাড়ার কোন ধর্ম-প্রাণা বৃদ্ধা তাহাকে বলিয়াছেন—ওই ডাক্তারবাবুর বাড়ির সবাই ম্লেচ্ছ। মেথরের হাতে খায়। তুমি উহাদের বাড়ি কাজ করিলে তোমাকে জাতে পতিত করিবে। তুমি ওখানে কাজ করিও না। অন্য দাই জুটানো শক্ত হইল। আমি তখন বাধ্য হইয়া মেথরের বউটিকে দিয়াই বাসন মাজাইতে লাগিলাম। ভাগলপুরে তখন খাটা-পায়খানা ছিল। মিউনিসিপালিটির মেথররা পায়খানা পরিষ্কার করিত। হঠাৎ একদিন উক্ত ধর্ম-প্রাণা বৃদ্ধার বাড়ির সকলে বুঝিতে পারিলেন তাঁহাদের পায়খানা পরিষ্কার হইতেছে না। দুর্গন্ধে বাড়ি ভরিয়া গিয়াছে। আমাকে আসিয়া বলিলেন—'আপনার তো মেথর চাকর, আপনি যদি কোন ব্যবস্থা করে দেন।' আমি তখন মুন্নিকে বলিলাম। মুন্নি বলিল, 'কোনও মেথর উহাদের পায়খানা পরিষ্কার করিবে না। আমরা আপনার বাড়িতে কাজ করি বলিয়া উহাদের পরামর্শে ঝি পালাইয়াছে। আমরা উহাদের পায়খানা পরিষ্কার করিব না।' আমি একটু বিপন্নবোধ করিলাম। কারণ আমার মনে হইল ভদ্রলোক বোধহয় ভাবিবেন আমিই মেথরদের ক্ষ্যাপাইয়া এই কাণ্ড করিয়াছি। মুন্নিকে বুঝাইয়া বলিলাম। তখন ভদ্রলোকের বাড়িতে মেথর গেল—সমস্যার সমাধান হইল। এ বাড়িতে আমরা অবশ্য বেশীদিন থাকি নাই। বড্ড বেশী খরচ হইতেছিল। বাবা বলিলেন, 'বরারিতে ভোলার যখন কোয়ার্টার্স আছে, তখন তোমরা সেইখানেই গিয়া থাক। তুমি রোজ বরারি হইতে ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করিবে।' সকলে বরারি চলিয়া গেলাম। কিন্তু সেখান হইতে ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করা কষ্টকর হইয়া উঠিল আমার পক্ষে। এই সময় মাথায় আর একটি দুর্বুদ্ধি জুটিল। টাকা ধার করিয়া এই সময় একটি ফোর্ডহ্যাণ্ড মোটর কিনিলাম। কয়েকদিন ব্যবহার করার পর বোঝা গেল মোটরটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া যায় এবং লোক দিয়া না ঠেলাইলে স্টার্ট লয় না। কিছুদিন পর এমন অবস্থা দাঁড়াইল আমার মোটর দেখা গেলেই আশপাশের চেনা লোক সরিয়া পড়িত। পাছে ঠেলিতে হয়। মিস্ত্রির পিছনে খরচ হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার দুরারোগ্য ব্যাধি সারিল না। তখন আমি মোট'টি বেচিয়া দিব ঠিক করিলাম। যে জমিদারদের হসপিটালে ভোলা ডাক্তার

হইয়াছিল, তিনিই আমাকে মোটর কিনিবার টাকা দিয়াছিলেন। ৩০০ টাকা। এখনকার হিসাবে বেশী নয়, কিন্তু তখনকার হিসাবে অনেক। এই মোটরেরও একজন খরিদ্দার জুটিয়াছিল। ভোলা কিন্তু মোটরটা বিক্রি করিতে দিল না। বলিল, 'ওটা আমাকেই দাও। আমি আমার মাহিনা হইতে কাটাইয়া ধার শোধ করিয়া দিব।' জলকলের বিজয়দা আশ্বাস দিলেন, তিনিই মোটর ঠিক করিয়া দিবেন। কিন্তু তিনিও জবাব দিলেন শেষে। আমি পুনরায় ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিলাম। এবার বাড়ি পাইলাম মোশাকচকে কীর্তিচন্দ্র চ্যাটার্জি লেনে। একটি গলির মধ্যে বাড়ি। সে বাড়িটির পাশেই আর একটি বাড়ি। ঠিক যেন তাহার যমজ ভাই। সে বাড়িতে থাকতেন শ্রীযুক্ত ভূপেন চন্দ্র। অতিশয় ভদ্র। প্রায় আমার বাবার বয়সী। বাবার সহিত তাঁহার অচিরেই বন্ধুত্ব হইয়া গেল এবং তিনি আমাদের হিতৈষী হইয়া উঠিলেন। আমাদের বাড়ির পাশেই ছিলেন আর একটি grand old gentleman—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। জানা গেল তাঁহার ভাই ফণীবাবু (S. D. O.) আমার কাকাবাবুর সহপাঠী ছিলেন। উপেনবাবুর বড় ছেলেও ডাক্তার—হেলথ অফিসার—তাঁহার সহিত এবং ক্রমশঃ তাঁহাদের সমস্ত পরিবারের সহিতই আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। উপেনবাবুর ছোটো ছেলে অমল তখন মোটরমিস্ত্রি ধনুর নিকট কাজ শিখিতেছিল। পরে সে নিজেই একটি মোটর সারাইবার কারখানা করে এবং পরে আমি যে নতুন গাড়ি কিনি, সেই গাড়ির অভিভাবক হয়। এ বাসাটি হইতে আমার ল্যাবরেটরি খুব বেশী দূরে ছিল না, মাইলখানেকের মধ্যেই। কখনও হাঁটিয়া যাইতাম, কখনও বা রিক্স, টমটম ব্যবহার করিতাম। এই বাসায় আসিবার কিছুদিন পরে আমার ছোটবোন খুকীর বিবাহ হয়। ঢনঢনিয়াদের বাগান-বাড়িতে বরযাত্রী রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। লীলার খাটুনি বাড়িয়াছিল খুব। আত্মীয়স্বজন অনেকেই আসিয়াছিলেন। খুকীর যাবতীয় সায়া-সেমিজ লীলাই বাড়িতে কল চালাইয়া সেলাই করিয়াছিল। আমি কিছুদিন পূর্বে একটি Singer's sewing machine মাসিক কিস্তিতে খরিদ করিয়াছিলাম। সেই কলটি এখন বেশ কাজে লাগিয়া গেল। লীলার খাটুনি অবশ্য বাড়িল খুব। সে তখন চারমাস অন্তঃসত্ত্বা। আমার বড়ছেলে অসীম তখন পেটে। আশঙ্কা হইতে লাগিল ক্রমাগত পা-কল চালাইলে যদি কিছু হইয়া যায়। সাংঘাতিক কিছু হয় নাই, পেটে একটা ব্যথা হইয়াছিল। খুকীর বিবাহে কবিতায় একটি প্রীতি-উপহার লিখিয়াছিলাম। কবিতাটি ভুলিয়া গিয়াছি। একটি লাইন মনে আছে কেবল—'এসেছে ডাক—এসেছে ডাক'। আমার সব ভাইবোনের বিবাহের প্রীতি-উপহার লিখিয়াছি। কিন্তু একটিও মনে নাই, সংগ্রহও করিয়া রাখি নাই। অনেক প্রীতি-উপহার লিখিয়াছি জীবনে। অধিকাংশই হারাইয়া গিয়াছে। কয়েকটি পাইয়াছিলাম, আমার 'স্বরসপ্তক' পুস্তকে সেগুলি আছে। মোশাকচকের বাড়িটি ভালো ছিল, কিন্তু একটি কারণে বাড়িটি ছাড়িতে হইল। কীর্তি চাটুজ্যের গলির শেষপ্রান্তে

আমার বাড়িটি এবং সে প্রান্তে পৌঁছিতে হইলে অনেকগুলি খোলা খাটা-পায়খানা পার হইয়া যাইতে হইত। আমার মা ঘোর আপত্তি তুলিলেন। বলিলেন—এ বাড়িতে থাকা যাইবে না। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মনোমত বাড়ি পাওয়া গেল না। আর একটি অসুবিধা ছিল, লীলা তখন আসন্ন-প্রসবা। সুতরাং অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, ভাগলপুরে তখন লেডি ডাক্তার ছিলেন মিস লাল। সকলে তাঁহাকে হাতুড়ে বলিত। সে সময় হাসপাতালের অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন ছিলেন ডাঃ ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। মিস লাল তাঁহার স্ত্রীকে প্রসব করাইয়াছিলেন। সেপ্‌টিক হইয়া তিনি মারা যান। যেদিন মারা যান সেদিন আমি ভূপতিবাবুর কোয়ার্টার্সে উপস্থিত ছিলাম। ভূপতিবাবুকে আমি মাস্টারমশাই বলিয়া ডাকিতাম। কারণ আমি যখন মেডিকেল কলেজে ফিফ্‌থ ইয়ারে, তখন তিনি আমাদের ওয়ার্ডে জুনিয়র হাউস সার্জেন ছিলেন। মাস্টারমশায়ের স্ত্রীর মৃত্যু হয় সন্ধ্যার সময়। ভাগলপুরের অনেক ডাক্তার সেদিন তাঁহার বাসায় উপস্থিত ছিলেন। আমিও ছিলাম। একটি আশ্চর্য কাণ্ড দেখিয়াছিলাম সেদিন। মৃত্যুর ঠিক পূর্বে আমি রোগিণীর কাছে দাঁড়াইয়া-ছিলাম। তিনি হঠাৎ চোখ খুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'ওঁকে একবার ডেকে দিন।' মাস্টারমশাই বাহিরে বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে ডাকিয়া দিলাম। মাস্টারমশাই গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। কি কথা হইল জানি না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেলেন তিনি। মাস্টারমশাই কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং বাহিরঘরে মেঝের ওপর লুটোপুটি করিয়া শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিলেন। প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া কাঁদিলেন তিনি। তাহার পর উঠিয়া চোখ মুছিলেন এবং উঠিয়া খাটে শুইয়া অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িলেন। একটু পরে লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার নাক ডাকিতেছে। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই শবদেহের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মাস্টারমশাই ঘুমাইতে লাগিলেন।

ভূপতিবাবুর সহিত আমার খুব অন্তরঙ্গতা হইয়াছিল। তিনি শুধু ভাল ডাক্তারই ছিলেন না, সুরসিক, বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আনন্দ হইত।

একদিন তাঁহাকে বলিলাম, 'লীলা তো আসন্নপ্রসবা। মাসখানেকের মধ্যেই তাহার ছেলে হইবে। আমি মিস লালকে দিয়া প্রসব করাইব না। আমার ইচ্ছা, আপনিই প্রসব করান। আপনি এ বিষয়ে পারঙ্গম। লীলা কিন্তু রাজি হইতেছে না। মায়েরও তেমন মত নাই। মহা মুশকিলে পড়িয়াছি। কি করি বলুন তো।'

মাস্টারমশাই বলিলেন, 'তুমিই করাও। তুমি তো ব্যাংগালোর হইতে ভালো ট্রেনিং লইয়া আসিয়াছ। ভয় কি।'

বলিলাম, 'করিতে পারি। কিন্তু আপনাকে বাহিরের বারান্দায় বসিয়া থাকিতে হইবে। যদি প্রয়োজন বুঝি, আপনাকে ডাকিব।'

মাস্টারমশাই রাজি হইলেন।

আমি বাজার হইতে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও জিনিসপত্র কিনিয়া আনিলাম। দুইটি

খুব বড় বড় কলাই-করা গামলা কিনিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। অনেক সময় প্রসবের সময় ছেলের দম বন্ধ হইয়া যায়। তখন তাহাকে একবার ঠাণ্ডা জলে এবং তাহার পর গরম জলে ডুবাইলে অনেক সময় শ্বাস-ক্রিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসে।

সব প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। একদিন রাত্রি দশটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়ার পর ব্যথা ধরিল।

মাস্টারমশাইকে খবর দিলাম। তিনি আসিয়া বাহিরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিলেন। তখন শ্রাবণ মাস। বর্ষণ শুরু হইয়া গেল। আমি হাতের আস্তিন গুটাইয়া আঁতুরঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। মা লীলার মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন।

অসীমের জন্ম হইল ভোর চারটা নাগাদ। নির্বিঘ্নেই সব নিষ্পন্ন হইল। মাস্টার-মশাইকে আর হাত লাগাইতে হইল না। তবে তিনি সমস্ত রাত জাগিয়া বসিয়া-ছিলেন। ভালোবাসার এই সব ছোটখাটো জিনিসগুলি আমার জীবনে অমূল্য সম্পদ।

অসীমের বয়স যখন দুই-সপ্তাহ, তখন একটি ভালো বাড়ির খবর পাইলাম। উকীল ধীরেন সেনের বাড়ি। তাঁহার বাড়ির প্রায় সামনাসামনি। আমাদের সকলেরই বাড়িটি খুব পছন্দ হইয়া গেল। মা বলিলেন, 'আর দেরী নয়, এখনই বাড়ি বদল করিয়া ফেল।' কীর্তি চাটুজ্যের লেনে পায়খানা-কলুষিত গলি তিনি আর বরদাস্ত করিতে পারিতে-ছিলেন না। অবিলম্বে বাড়িটি ঠিক করিয়া ফেলিলাম। অসীমের বয়স যখন ২১ দিন, তখন আমরা নতুন বাড়তে উঠিয়া গেলাম। বাড়িটি যে রাস্তার উপর অবস্থিত ছিল, সেটির নাম লায়াল রোড। বাড়িটি দ্বিতল এবং উত্তরমুখী। পশ্চিমের রোদটাও সোজা আসিয়া দ্বিতলের ঘরটার উপর পড়িত। সেটি আমাদের শুইবার ঘর। বাড়িতে উঠিয়া গিয়া অনুভব করিলাম, তপ্ত কটাহের উপর পড়িলাম। আমাদের বাড়ির পাশেই কলহগাঁয়ের এক জমিদার থাকিতেন। দেখিলাম, তিনি একটি বালক ভৃত্যকে দিয়া দিবারাত্র টানা-পাখা টানাইতেছেন। আমাদের সে উপায় ছিল না। গরমে ছটফট করিতে লাগিলাম। নবজাত অসীম দিনরাত চিৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু তখন উপায় কি। মা হাত-পাখা লইয়া দিনরাত নাতিকে বাতাস করিতে লাগিলেন। ভাদ্রমাসটা সে বাড়িতে অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়াও আমাদের থাকিতে হইল। আশ্বিন-মাসে মা আমাদের লইয়া মণিহারী চলিয়া গেলেন। মণিহারীতে পূজাটা কাটাইয়া আমরা লক্ষ্মীপূজার পূর্বেই ফিরিয়া আসিয়া ল্যাবরেটরিতে লক্ষ্মীপূজা করিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বাড়িরও সন্ধান পাইলাম। এ বাড়িটিরও মালিক ছিলেন উকীল ধীরেন সেন। বাড়ির নাম কিন্তু ছিল বরেন বাগচির বাড়ি। বাগচী মহাশয়ই বাড়িটির পূর্বতন মালিক। তিনি ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ বাগচি পরিবারের সন্তান। কিন্তু তিনি মেম বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া এবং তাঁহার মনোভাব সাহেবীভাবাপন্ন ছিল বলিয়া পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন তিনি। আলাদা বাড়ি করিয়া থাকিতেন। বাড়িটিও করিয়াছিলেন সাহেবী কেতায়। বাড়িটির সামনেই বেশ একটি বড় বারান্দা ছিল। বারান্দার দুই-পাশে দুইটি ঘর। ভিতরের দিকেও শোবার

ঘর দুইটি। তা ছাড়া রান্নাঘর এবং একটি ঢাকা বারান্দা। বাড়ির ভিতর একটি প্রশস্ত উঠানও ছিল। ডাক্তার অমূল্যচরণ ঘোষ এবং স্বর্গীয় ডাক্তার মোহিনীমোহন ঘোষের বাড়িও এই পাড়ায়। কাছেই দাওবাবুর (ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ নিয়োগী) বাড়ি। পাড়াটি খুব ভালো। বরেনবাবু বহুপূর্বে বাড়িটি ধীরেনবাবুকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। বাড়িটির একমাত্র দোষ ছিল, বাড়িটি অত্যন্ত পুরাতন।

এই বাড়িতে আসিয়া আমার মাথায় একটা নতুন মতলব জাগিল। খরচ কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। মনে হইল, বাড়ির বাহিরের বারান্দাটি ঘিরিয়া আমার ল্যাবরেটরি যদি ওইখানে লইয়া যাই, তাহা হইলে খরচ অনেকটা কমিবে। তা ছাড়া যাওয়া-আসার হাত হইতেও পরিত্রাণ পাইব। বাবা ইহাতে অমত করিলেন না। মিস্ত্রি ডাকাইয়া কাঠের ফ্রেম ও কাঁচসহযোগে বারান্দাটি ঘিরিয়া ফেলিলাম। মুন্নির ছেলে সিতাবী আমার কাছে আসিয়া বাহাল হইল। মুন্নি অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন পরেই সে মারা গেল। সিতাবী বরাবর আমার কাছে ছিল। সিতাবীর মতো সুদক্ষ চাকর জীবনে আর পাই নাই। সে সবরকম কাজ করিতে পারিত। বাজার করিত। মুরগী ছাড়াইত। ছোটখাটো মিস্ত্রির কাজ করিত। এমন কি অবসর-সময়ে সে কাঁথা ও পরদা সেলাইও করিয়াছে। নির্ভরযোগ্য ভৃত্য ছিল সে। ল্যাবরেটরিতে আমার চা-ও সে বানাইয়া দিত। আমার দামাল-পুত্র অসীম তাহার কাছেই থাকিত। বাড়ির প্রশস্ত উঠানে আমার ল্যাবরেটরির গিনিপিগ এবং খরগোসের থাকিবার খুব সুবিধা হইয়াছিল। আমার ছোট ঝুমু কুকুরটিও থাকিত সেই ঘরে। তাহাদেরও তদারক করিত সিতাবী। সে সময় অর্থাভাবের জন্য আমি Electric Centrifugal Machine কিনিতে পারি নাই। কিন্তু Necessity is the mother of invention। মাথায় একটা বুদ্ধি গজাইল। একটা সিমেন্‌স্‌ টেবিল-ফ্যান কিনিয়া সেটাকে Centrifugal Machine-এ রূপান্তরিত করিয়া ফেলিলাম। প্রয়োজন-এর চাপে এবং অর্থের অভাবে স্থানীয় মিস্ত্রিদের সাহায্যে একটি Dry Heating Chamberও বানাইয়াছিলাম টিন দিয়া। এ সময় আমি বেশী লিখিতাম না। পড়িতাম খুব। ভাগলপুর ইন্‌স্টিটিউট হইতে অনেক ভালো ভালো বই আনিতাম। কলেজের অধ্যাপক বন্ধুরাও অনেক ভালো বই আনিয়া দিতেন। তখন ইন্‌স্টিটিউটেরই একটি ঘরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ছিল অতি ম্রিয়মাণ অবস্থায়। বন্ধুবর অমূল্যকৃষ্ণ রায়ই সেটিকে কোনওক্রমে জিয়াইয়া রাখিয়াছিলেন। অমূল্যবাবুই আমাকে তাহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত করেন। সেখানেও বাংলা-সাহিত্যের অনেক পুস্তকের সহিত আমার পরিচয় ঘটে। মনে লিখিবার নানা উপাদান সংগৃহীত হইতেছিল, কিন্তু সেটি কাগজে লিপিবদ্ধ হইতেছিল না। তাহার কারণ বাহির হইতে কোনও তাগাদা ছিল না। ঠিক এই সময়েই একদিন পরিমল গোস্বামী আমার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিমল আমার অনেকদিনের বন্ধু। সুরসিক, বিদগ্ধ ব্যক্তি। বাংলায় প্রথম শ্রেণীর এম-এ তো বটেই, আরও নানা বিষয়ে সে সুপণ্ডিত। বিজ্ঞানের

ছাত্র না হইয়াও বিজ্ঞানজগতের অনেক নির্ভুল খবর সে রাখে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সে কোনও নির্ভরযোগ্য চাকুরি জুটাইতে পারে নাই। নানা সংবাদপত্রের সহিত, নানা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সহিত নিজেকে সাময়িকভাবে যুক্ত রাখিয়া সে একটা অনিশ্চিত জোড়া-তাড়া দেওয়া জীবনযাপন করিতেছিল। সে আমার কাছে আসিয়া বলিল—'শনিবারের চিঠি' কাগজের সম্পূর্ণ ভার সজনীবাবু আমার হাতে তুলিয়া দিতে চান। সজনী 'বঙ্গশ্রী' কাগজের সম্পাদক হইতেছেন। 'বঙ্গশ্রী' কাগজের মালিকের শর্ত এই যে তাহাকে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকতা ত্যাগ করিয়া 'বঙ্গশ্রী'-র উন্নতি-কল্পেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। সজনী তাই পরিমলকে ডাকিয়া বলিয়াছে, আপনি 'শনিবারেব চিঠি'-র ভার লউন এবং কাগজটিকে বাঁচাইয়া রাখুন। শনিবারের চিঠির জন্য লেখা আপনাকেই জোগাড কবিতে হইবে। লেখার কোন পারিশ্রমিক আমি দিতে পারিব না। বিজ্ঞাপনও আপনাকে যোগাড় করিতে হইবে। শনিবারের চিঠির আয় যাহা হইবে তাহা আপনি লইবেন। আপনাব থাকিবার জন্য একটি ঘর আমি আপনাকে দিব। আমার বাড়ির নীচের তলার একটি ঘবে আপনি থাকিবেন। আপনাকে কোন ভাড়া দিতে হইবে না।

পরিমল বলিল—তুমি যদি প্রতিমাসে লিখিতে রাজি হও আমি নিশ্চিন্তমনে এ ভার লইতে পারি। তোমাকে ব্যঙ্গবচনা লিখিতে হইবে। কাগজে মোহিতলাল মজুমদার, নীরদ চৌধুরী নিয়মিত লিখিবেন বলিয়াছেন। আমি তো লিখিবই। তোমাকেও লিখিতে হইবে।

পরিমলকে প্রতিশ্রুতি দিলাম লিখিব। আমার মনে ব্যঙ্গ-রসাত্মক অনেক গল্পের প্লট তখন গিজগিজ করিতেছে। তাহাই কবিতায় লিখিতে শুরু করিলাম। প্রথম কবিতা বোধহয় 'ভাদুড়ী'। তাহার পর প্রতিমাসেই শনিবারের চিঠিতে আমার ব্যঙ্গকবিতা প্রকাশিত হইতে লাগিল। রসিকদের নিকট বাহবা পাইলাম। পরিমল ক্রমাগত তাগাদা দিতে লাগিল। সুতরাং আমার লেখার উৎসাহ স্তিমিত হইল না। পরিমল আমাকে থামিতে দিল না। পরিমলেব নিরন্তর তাগাদা না থাকিলে আমি এতগুলি ব্যঙ্গকবিতা বোধহয় লিখিতাম না। এই সময় আমার আর একটি মহাপ্রাণ ব্যক্তির সহিত আলাপ হইল এবং সে আলাপ ক্রমশঃ গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়া গেল। শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত আমার জীবনে একটি পরম প্রাপ্তি। দেখিলাম, তিনি শুধু সাহিত্যরসিকই নন, খাদ্যরসিকও। তিনি চাকুরিজীবী, কিন্তু স্বাধীনচেতা লোক। বড় চাকুরি করিতেন—ইনকামট্যাক্স-অফিসার ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁহার চাল-চলনে অফিসারসুলভ ঠাট-ঠমক বা চালিয়াতির লেশমাত্র ছিল না। বাল্যকালে শান্তি-নিকেতনে পড়িয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের বড় ভক্ত একজন। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রসমিতির সদস্য এই লোকটির সহিত আলাপ করিয়া বড় ভালো লাগিয়াছিল। ইনি যখন টুরে ভাগলপুর আসিতেন, উঠিতেন 'সারকিট' হাউসে এবং সেখানে আমাদের নিমন্ত্রণ করিতেন। অমূল্য রায়, বসন্ত ডাক্তার, জলকলের বিজয়দা, সুকুমার

ডাক্তার এবং আমি—এই পাঁচজনেই সেখানে গিয়া জুটিতাম। অমূল্য রায় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তাঁহার বাড়িতেই প্রদ্যোতের সহিত প্রথম আলাপ হয়। প্রদ্যোৎ-বাবুর কাছেই আমি প্রথম Mutton Roast খাই। তাঁহার বুদ্ধ নামে একটি রন্ধন-বিশারদ ওড়িশাবাসী সূপকার ছিল। English Roast সে চমৎকার বানাইত। তাহার নিকট আমি পরে রোস্ট-রন্ধনের পদ্ধতিটি শিখিয়া লইয়াছিলাম। প্রদ্যোৎবাবু আসিলে আমাদের পাঁচজনের বাড়িতে পালাক্রমে ভোজ হইত। প্রদ্যোৎবাবু যে কয়দিন থাকিতেন বড় আনন্দে দিন কাটিত। কিন্তু তিনি বেশীদিন থাকিতেন না। কয়েকদিন থাকিয়া পাটনা চলিয়া যাইতেন। মটন-রোস্ট আমার ভালো লাগিয়াছিল, কিন্তু ভাগলপুরে তখন ভাল ভেড়ার মাংস পাওয়া যাইত না। পাটনা শহরে তখন Judges' Mutton নামে খ্যাত ভালো ভেড়ার মাংস পাওয়া যাইত। একদিন দেখি, প্রদ্যোৎবাবু প্লেনের এক যাত্রীর মারফৎ আমার জন্য সেই অপূর্ব 'মাটন' পাঠাইয়া দিয়াছেন। তখন ভাগলপুর-পাটনা প্লেন-সার্ভিস ছিল। প্রদ্যোৎবাবুর ভদ্রতায় ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই পরিচয় পরে আরও অনেকবার পাইয়াছি। পরে যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব।

পরিমলের তাগাদায় প্রতিমাসে 'শনিবারের চিঠি'-তে ব্যঙ্গকবিতা লিখিয়া চলিয়াছি। এমন সময় একটা মহাবিপর্যয় ঘটিয়া গেল। বিহারের সেই প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প কয়েকমিনিটের মধ্যে আমাকে একেবারে পথে দাঁড় করাইয়া দিল। তারিখটা ছিল ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৪, সময় বেলা দুইটা পনেরো মিনিট। ১৫ই জানুয়ারী ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে হইতে পারে ইহার ভবিষ্যদ্বাণী কয়েকদিন পূর্বে অমৃতবাজার পত্রিকায় পড়িয়াছিলাম। ভূমিকম্পের আগের দিন আকাশে ঘনঘটা করিয়া মেঘ জমিল, ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল, বজ্রগর্জনও শোনা গেল। আমাদের মনে হইল, প্রচুর ঝড়বৃষ্টি বোধহয় হইবে। কিন্তু পরদিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম—মেঘ নাই, আকাশ পরিষ্কার, চমৎকার রোদ উঠিয়াছে। সেদিন পৌষ-সংক্রান্তি ছিল। লীলা পিঠা প্রস্তুত করিতে লাগিল। আমি বাজারে গিয়া একটা ভালো খাসির বাং কিনিয়া আনিলাম। ঠিক হইল, রাত্রে ইংলিশ রোস্ট করিব। বুদ্ধর নিকট হইতে রোস্ট করিতে শিখিয়াছিলাম।

সেদিন আমার মফঃস্বল হইতে একটি রোগী আসিয়াছিল। সে তিনটার ট্রেনে রিপোর্ট লইয়া চলিয়া যাইবে। আমি তাই খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম না করিয়া তাহার কাজ করিতেছিলাম। ঘরের ভিতর লীলা অসীমকে ঘুম পাড়াইতেছিল। ধোপানী আসিয়াছিল কাপড় লইবার জন্য। সে অপেক্ষা করিতেছিল, অসীম ঘুমাইলেই লীলা তাহাকে কাপড় দিবে। কেয়ার বয়স তখন বছর চারেক, সে পাশের বাড়িতে বেড়াইতে গিয়াছিল। ওই বয়সেই সে বেশ পাড়া-বেড়ানী হইয়া উঠিয়াছিল। অজস্র কথা বলিত, গানও গাহিত। আমি পরীক্ষা শেষ করিয়া রিপোর্ট লিখিতে-ছিলাম। যে টেবিলটার উপর লিখিতেছিলাম সেই টেবিলটার আর এক প্রান্তে

আমার Centrifugal Machine-টা ঘুরিতেছিল। হঠাৎ টেবিলটা খুব জোরে নড়িতে লাগিল। আমার মনে হইল Centrifugal যন্ত্রটাই বোধহয় গোলমাল করিতেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপর ছাদ হইতে চাপড়া ভাঙিয়া পড়িল, বুঝিলাম ভূমিকম্প হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলাম। রাস্তায় বাহির হইয়াই খেয়াল হইল, লীলা হয়ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া খিড়কির দরজার দিকে গেলাম। দেখিলাম অসীমকে কোলে লইয়া লীলা বাহির হইয়া আসিতেছে। সেই খোপানিটা তাহাকে ঘুমাইতে দেয় নাই। কেয়াও পাশের বাড়ি হইতে ছুটিয়া চলিয়া আসিল। আমরা সকলে রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু কম্পন এত প্রবল যে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। সকলে বসিয়া মাটি ধরিয়া রহিলাম। চারদিকে একটা শব্দ উঠিল—যেন মোটরলরি আসিতেছে। ধুলায় চতুর্দিক ভরিয়া গেল। আমার বাড়িটাও আমার চোখের সামনে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া গেল। মিনিট-খানেক পরেই আবার দাঁড়াইয়া রহিলাম কয়েকমুহূর্ত। চতুর্দিকেই একটা কোলাহল হইতেছিল। একটা জেলেনী বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে রাস্তা দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। শুনিলাম সে বলিতেছে—আশুবাবু বিতি গেল। অর্থাৎ আশুবাবু মারা গিয়াছেন। ডাক্তার আশুবাবুর বাড়ি আমার বাড়ির কাছেই। সংবাদটা পাইয়া বিচলিত হইলাম এবং লীলাদের রাস্তায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া ছুটিলাম দাও ডাক্তারের বাড়ির দিকে। বাড়ির সামনেই তাঁহার দেখা পাইলাম। একটা চাঙড় পড়িয়া তাঁহার মাথাটা ফাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি জীবিত আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম লীলাদের কাছে। সেখানে একটা ছ্যাকড়াগাড়িও পাইয়া গেলাম। সাধারণতঃ ভাগলপুর হইতে বরারির গাড়ি-ভাড়া একটাকা ছিল। লোকটা চারটাকা চাহিল। ঠিক করিলাম, বরারি গিয়া ভোলার খবর লইব। আরও দুই একটি কুলিও সংগ্রহ করিতে হইল। ভগ্নস্তূপের মধ্যে আমার ল্যাবরেটরি পড়িয়া রহিল। আমি কেবল মাইক্রোশকোপটা বাহির করিয়া আনিলাম। লীলা গহনাপত্র, কাপড়ের ট্রাঙ্কটা এবং আরো কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে লইল। খাসির রংটাকেও সঙ্গে লইয়াছিলাম। কেয়া, অসীমকে লইয়া আমরা বরারির দিকে অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর গিয়া ভোলার সহিত দেখা হইল। সেও আমাদের খোঁজে আসিতেছিল। শুনিলাম, তাহার বাড়ির তেমন কিছু ক্ষতি হয় নাই। বরারি পৌঁছিয়াই আর ঘরে ঢুকিতে সাহস হইল না। কারণ সেখানে গিয়া গুজব শুনিলাম মুঙ্গের শহর ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আরও শুনিলাম, যে ভূমিকম্পটা হইয়া গেল তাহা ভূমিকামাত্র। প্রচণ্ডতর ভূমিকম্প শীঘ্রই আবার আসিবে। সেদিন প্রখর শীতের হাওয়া। তবু সেই গঙ্গার তীরের খোলা মাঠে হাসপাতালের পাশে বিছানা বিছাইয়া শুইব ইহাই ঠিক হইল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া শুইতে সাহসে কুলাইল না। মাঠে শুইয়াও শান্তি নাই। কোথাও মোটরের বা লরির শব্দ হইলেই চমকাইয়া উঠিতাম—ওই বুঝি আবার শুরু হইল। হাসপাতালের একটা জায়গায় একটা টিন লাগানো ছিল। জোরে বাতাস বহিলে সেটি

খড়খড় শব্দ করিত। শব্দ শুনিলেই আমরা সচকিত হইয়া উঠিতাম। তাহার পর মুঙ্গের, মজঃফরপুর প্রভৃতি স্থান হইতে যে সব খবর আসিতে লাগিল তাহাতে আমাদের আরও কাবু করিয়া ফেলিল। দুই-একদিন বড়ই অশান্তিতে কাটিয়াছিল। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও গাড়ি-ভাড়া করিয়া আবার ভাগলপুরে গেলাম। ভাঙা বাড়িটার ভিতর হইতে আমার ল্যাবরেটরির জিনিসপত্রগুলি তো উদ্ধার করিতে হইবে। গিয়া দেখিলাম, আমার গিনিপিগ, খরগোস সব মরিয়া গিয়াছে। ঝুনু কুকুরটাও। পোস্টাপিস বন্ধ। ব্যাংকও বন্ধ। স্টেশনে অনেক ট্রেন আটকাইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত শহরে চরম বিশৃঙ্খলা। আমার কাছে মাত্র আড়াইটি টাকা সম্বল। প্রায় সামনাসামনিই ছিল অমূল্য ডাক্তারের বাড়ি। তাহাকে গিয়া বলিলাম—আপনার বাড়িতে আপাততঃ আমার ল্যাবরেটরির জিনিসপত্র রাখিয়া দিতে চাই। জায়গা আছে কি? অমূল্যবাবুর বাড়ির বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। তাহা ছাড়া তাঁহার বাড়ির সম্মুখে তিনি খাপড়ার একটি ঘর বানাইয়াছিলেন রোগী দেখিবার জন্য। অতিশয় দয়াশয় লোক ছিলেন অমূল্য ডাক্তার। তিনি বলিলেন—আপনি জিনিসপত্র আমার বাড়িতেই রাখুন এবং যতদিন অন্য কোথাও ঘর না পাইতেছেন আমার ওই ঘরেই আপনি ল্যাবরেটরি করুন। আগেই বলিয়াছি তখন আমার কাছে মাত্র আড়াই টাকা সম্বল। আমি ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিশ করিতাম বটে কিন্তু অনেক গরীব রোগীর বিনা পয়সায় চিকিৎসাও করিতাম। অনেক মেথর, অনেক রিকসাওয়ালা, মুটে, অনেক মেছো, অনেক গরীব দাই, চাকর আমার রোগী ছিল। সেদিন হঠাৎ আমার একটা পুরাতন রোগী রিক্সা-ওয়ালাকে রাস্তায় দেখিতে পাইলাম। বলিলাম—আমার ল্যাবরেটরির জিনিসপত্র-গুলি ওই ভগ্নস্তূপ হইতে বাহির করিয়া অমূল্যবাবুর বাড়িতে পৌঁছাইয়া দাও, তোমাকে আমি দুইটি টাকা দিব। সে রাজি হইল। সে জিনিসপত্র বাহির করিতেছে, আমি রাস্তার উপর একটা কাল্‌ভার্টের উপর বসিয়া আছি। এমন সময় একটা প্রায়-উলঙ্গ মাতাল টলিতে টলিতে আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল এবং আমাকে আদেশের ভঙ্গীতে বলিল—হামকো দো রুপিয়া দে। লোকটির চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ—ঠিক মাতালের মতো নয়। আমি বলিলাম—আমার কাছে এখন বাড়তি দুই টাকা নাই। মাত্র আড়াই টাকা আছে। দুই টাকা এই কুলিটিকে দিতে হইবে এবং আট আনা লাগিবে একার ভাড়া। একা চড়িয়া আমি বরারি যাইব।

লোকটি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, যদি তোমার কাছে বেশী টাকা থাকিত, তুমি আমাকে দিতে কি? বলিলাম—নিশ্চয় দিতাম।

তখন সে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করিল।

বলিল—তুমি একটু পরে বত্রিশ টাকা পাইবে। বলিয়া সে টলিতে টলিতে চলিয়া গেল।

একটু পরেই কিন্তু তাহার ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়া গেল। সত্যিই দুইজন রোগী আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—আমাদের ট্রেন এখানে আটকাইয়া পড়িয়াছে, কখন

ছাড়িবে ঠিক নাই। আমার এবং আমার স্ত্রীর রক্ত পরীক্ষা করিতে হইবে। আমাদের ডাক্তারবাবু আপনাকে দিয়াই পরীক্ষা করাইতে বলিয়াছেন। একটি চিঠিও দিয়াছেন তিনি। আমরা ভাবিলাম, যখন এখানে আসিয়াই পড়িয়াছি আপনাকে রক্তটা দিয়া যাই। আপনি পরে রিপোর্ট পাঠাইয়া দিবেন।

আমি বলিলাম—আমার ল্যাবরেটরি তো এখন ধ্বংসস্তূপের ভিতর। এখন রক্ত লইয়া কি করিব। তোমরা দিনসাতেক পরে আসিও। সে কিন্তু বলিল—রক্ত লইয়া বরফে রাখিয়া দিন। যদি করা সম্ভব হয় করিবেন, আর যদি না করিতে পারেন তখন আমরা আবার আসিব। এখন আমরা রক্তটা দিয়া যাই।

লোকটি জোর করিয়া আমাকে রক্ত দিয়া গেল। নগদ বত্রিশটি টাকা পাইয়া গেলাম। সেই উলঙ্গ মাতাল লোকটা কোথা গেল? উঠিয়া গিয়া রাস্তায় একটু ঘোরাঘুরি করিলাম কিন্তু তাহার দেখা পাইলাম না। পাইলে তাহাকে দুইটি টাকা দিতাম। কিন্তু লোকটি কোথায় যেন উবিয়া গেল। খুঁজিয়া পাইলাম না।

ইহার পরও ভূমিকম্পের কম্পন মাঝে মাঝে হইতেছিল। কিন্তু খুব বেশী নয়। তবু আমরা স্বস্তি পাইতেছিলাম না। রোগীপত্রও তেমন আসিতেছিল না। সমস্ত মুঙ্গের শহরটাই ভূমিকম্পের কবলে পড়িয়াছিল। মুঙ্গেরের শোচনীয় দুর্দশার কাহিনী রোজই শুনিতে পাইতেছিলাম। খবর পাইলাম, আমাদের মণিহারীর বাড়ির কিছুই হয় নাই। আমাদের মণিহারীর বাড়ির মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। বাবা লিখিলেন, তোমরা সকলে মণিহারীতে এস। সকলকে লইয়া মণিহারীতে চলিয়া গেলাম। কয়েকদিন পরেই কিন্তু আমাকে একাই ফিরিতে হইল। মা বলিলেন—আগে সেখানে ভালো ঘর ঠিক হোক, তারপর সকলকে লইয়া যাইও।

ভাগলপুরে ফিরিয়া অমূল্য ডাক্তারের খাপরার ঘরেই আবার আমি ল্যাবরেটরির কাজ আরম্ভ করিলাম। কিছু কিছু রোজগারও হইতে লাগিল। যতদূর মনে পড়িতেছে, ইহার মধ্যেও আমি শনিবারের চিঠির জন্য কিছু লেখা পাঠাইতে পারিয়াছিলাম।

কিন্তু, মুশকিলে পড়িলাম, কোথাও বাড়ির সন্ধান না পাওয়ায়। আমি একটা বড় রাস্তার ওপর এমন একটা বাড়ি খুঁজিতেছিলাম যেখানে আমার ল্যাবরেটরি ও বাড়ি একসঙ্গে হয়। কিন্তু তাহা পাওয়া যাইতেছিল না। হঠাৎ একদিন পটলবাবুর সহিত দেখা হইল। তিনি ছিলেন ভাগলপুরের একজন নামজাদা উকিল এবং একজন প্রভাবশালী কংগ্রেসকর্মী। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত ও খাতির করিত। ভয়ও করিত অনেকে। কারণ, তিনি খুব একরোখা, জেদি মানুষ ছিলেন। আমাকে স্নেহ করিতেন তিনি। সম্ভবতঃ, আমার সাহিত্যিক খ্যাতির জন্য। তখন তিনি মুঙ্গেরে ত্রাণকার্য করিতেছিলেন। আমার সহিত দেখা হইতেই বলিলেন—আমি মুঙ্গেরে ছিলাম অনেকদিন, আপনার সহিত দেখা হয় নাই। শুনিয়াছি, আপনার বাড়িটাও পড়িয়া গিয়াছে।

আমি উত্তর দিলাম—ঠিকই শুনিয়াছেন। বড় অসুবিধার মধ্যে আছি। কোথাও বাড়ি পাইতেছি না। ভাবিতেছি, ভাগলপুর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব।

'কেন?'

'বাড়ি না পাইলে থাকিব কোথায়?'

'আমি আপনার বাড়ির ভার লইতেছি। আমার বাড়ির পাশে মীরজুল্লা লেনে ছোট একটা বাড়ি আছে, আপনি আজই সেটা গিয়ে দখল করুন। প্রয়োজন হইলে, ওই বাড়িতেই আরও দু-একখানা ঘর বাড়াইয়া দিব।'

'আমার ল্যাবরেটরি?'

'আচ্ছা, ভাবিয়া দেখিতেছি। কাল বলিব।' পরদিন তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি রাস্তার উপর এক টুকরা জমি দেখাইয়া বলিলেন—এইখানে যদি আপনার ল্যাবরেটরি করিয়া দিই, তাহা হইলে চলিবে কি? জায়গাটা ভালো। বলিলাম—ল্যাবরেটরি তৈয়ারি করিতে তো অনেকদিন লাগিবে। তিনি বলিলেন—আমি একমাসের মধ্যে করিয়া দিব। একটা 'হল' করাইতে আর কতদিন লাগিবে? আপনি হলের মধ্যে যদি সিমেন্টের টেবিল বা তাক করাইতে চান, তাহাও করাইয়া দিব। তখনও মাঝে মাঝে কম্পন হইতেছিল। পটলবাবু বলিলেন, 'ভয় নাই, আমি খুব মজবুত কংক্রিটের বাড়ি করাইয়া দিব। দুইটা বড় বড় বীম (Beam) দিলে আর পড়িয়া যাইবার ভয় থাকিবে না। আপনি থাকিবেন বলিয়াই এই ল্যাবরেটরি করিয়া দিতেছি। জায়গাটা আমার বাড়ির সংলগ্ন উঠান।' পাশেই তাহার দ্বিতল বাড়িটা দেখিলাম। পটলবাবু বলিলেন—'আমার মীরজুল্লা লেনের বাড়িতে যদি থাকেন, আপনার ল্যাবরেটরির খুব কাছে হইবে।' মীরজুল্লা লেনের বাসাটি খুব ছোট। দুইটিমাত্র ঘর এবং একটি বারান্দা। ঠিক করিলাম, ইহাতেই উঠিয়া আসিব। Any port in the storm. পটলবাবু বলিলেন—পরে আপনার প্রয়োজনমত আরও ঘর বাড়াইয়া দিব। এখন উঠানের একধারে যে টিনের চালাঘরটা আছে, সেটাকেই রান্নাঘর করুন।

পটলবাবুর প্রস্তাবে রাজি হইয়া গেলাম। মণিহারী গিয়া লীলাকে লইয়া আসিলাম। সঙ্গে টুলুও আসিল। তাহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলাম।

সে সময় আমাদের একটি বড় ইক্‌মিক্ কুকার ছিল। কুকারে ভাত, ডাল-ভাতে এবং মাংস হইত। মাংস এবং ভাতই তখন প্রধান খাদ্য ছিল আমাদের।

দিবারাত্র মিস্ত্রি লাগাইয়া পেট্রোমাক্সের আলোয় কাজ করাইয়া ঠিক একমাসের মধ্যেই পটলবাবু আমার নতুন ল্যাবরেটরিটি প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। ল্যাবরেটরিটি সত্যই আমার মনোমত হইল। ল্যাবরেটরিটি আমার বাড়ির খুব কাছে হওয়াতে আমি দ্বিপ্রহরে সেখানে আসিয়া থাকিতাম। সন্ধ্যার পরও রাত্রি নটা-দশটা পর্যন্ত অতিবাহিত করিতাম। সন্ধ্যার পর সেখানে বসিয়া লিখিতাম। বন্ধুবান্ধব কেহ আসিলে, সেইখানেই গিয়া বসিতেন। নিজস্ব একটা লেখার ঘর পাইয়া আমার

লেখার বেগ বাড়িতে লাগিল। হাস্যরসের এবং ব্যঙ্গরসের কবিতা তো লিখিতে লাগিলামই, দুই-একটা গম্ভীর লেখাও লিখিলাম। সেই সময়, বন্ধুবর অমূল্য রায় প্রায়ই আমার ল্যাবরেটরিতে আসিতেন এবং আমার লেখা শুনিতেন। বেশ রসিক ব্যক্তি তিনি। তাঁহার উপদেশ অনেক সময় আমার বড় কাজে লাগিয়াছে। নেপথ্যে আর একটি পাঠিকা ছিল—তাহাকে না পড়াইয়া আমি কোন লেখাই ছাপিতে দিতাম না—সে ব্যক্তি লীলাবতী, আমার সহধর্মিণী। কোথায় রস জমিল না, কিংবা সুরটা কাটিয়া গেল, লীলা তাহা ধরিতে পারিত। সুতরাং লীলার বিচারের উপরও আমার অনেকটা আস্থা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ—'লেখা লিখিবার পর কিছুদিন ফেলিয়া রাখিবে, তাহার পর আবার সংশোধন করিয়া ছাপিতে দিবে।' কিন্তু, আজকাল তাহা আর হইবার জো নাই। বাজারে একটু নাম হইয়া গেলে, প্রকাশক বা সম্পাদকরা লেখার কালি শুকাইতে দেন না। রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলিয়াছিলেন, যদি নিরপেক্ষ, রসিক ব্যক্তি লেখাটি শুনিয়া বা পড়িয়া বলেন, ভালো হইয়াছে, তাহা হইলে, লেখা ছাপিতে দিতে পার। প্রকৃত রসিকরা ক্বচিৎ ভুল করেন। আমি তখন অমূল্য রায় ও লীলার উপর নির্ভর করিতাম। পরে সজনীও আসিয়াছিল।

আমার একটা স্বভাব, আমি একঘেয়ে ব্যাপার বেশীদিন বরদাস্ত করিতে পারি না। উপর্যুপরি একইরকম তরকারি খাইতে পারি না। আমার আহারের বৈচিত্র্যের জন্যও লীলাবতীকেও নানারূপ নতুন রান্না শিখিতে হইয়াছে। আমি নিজেও মাঝে মাঝে রান্নাঘরে ঢুকিয়া নতুন ধরনের কিছু রাঁধিবার চেষ্টা করিতাম। ডিম বেগুন, ব্রেণ-বর্বটি, লাউয়ের স্টু প্রভৃতি নানারকম Experiment করিয়াছি। মাংসেরও রোস্ট, স্টু, শিককাবাব প্রভৃতি করিয়াছি।

লিখিবার বেলাতেও আমার এই স্বভাব ক্রমশঃ নিজেকে জাহির করিতে লাগিল। কিছুদিন ব্যঙ্গকবিতা লিখিবার পরই ব্যঙ্গকবিতা লেখায় আর রুচি রহিল না। আমি তখন একদিন 'তৃণখণ্ড' নাম দিয়া একটি গদ্য-পদ্য-মিশ্রিত গল্প লিখিয়া ফেলিলাম। পরে শুনিয়াছি, ইহাকেই সংস্কৃতে নাকি 'চম্পূকাব্য' বলে। এতদিন, প্রত্যেক মাসে পরিমলকে 'শনিবারের চিঠি'-র জন্য ব্যঙ্গরচনা পাঠাইতেছিলাম। 'তৃণখণ্ড' সম্পূর্ণ হইবার পর ব্যঙ্গকবিতা না পাঠাইয়া ওইটাই পাঠাইয়া দিলাম। পরিমল কিন্তু ওটা না ছাপিয়া ফেরৎ দিল। লিখিল, তুমি ব্যঙ্গকবিতাই পাঠাও। 'তৃণখণ্ড'-কে বাক্সবন্দী করিয়া ব্যঙ্গরচনাই পাঠাইলাম তাহাকে। আমার মনে হইল, রচনাটি হয়তো ঠিক রসোত্তীর্ণ হয় নাই।

ঠিক মনে পড়িতেছে না, তবে মনে হয়, এই সময় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মারা গেলেন। তাঁহার সহিত আমার ব্যক্তিগত আলাপ ছিল না। তাঁহার কয়েকটি লেখা আমার বড় ভালো লাগিয়াছিল। 'পল্লীসমাজ,' 'অরক্ষণীয়া,' 'নিষ্কৃতি,' 'বিন্দুর ছেলে,' 'রামের সুমতি,' 'বৈকুণ্ঠের উইল,' 'অভাগীর স্বর্গ,' 'মহেশ'। 'দেবদাস,' 'দেনা-

পাওনা', 'পথের দাবী' তত ভালো লাগে নাই। তাঁহার শেষের দিকের অনেক রচনাই আমার তত ভালো লাগিত না। তাঁহার মৃত্যুতে তবু আঘাত পাইলাম। মনে হইল, একজন বড় শিল্পী চলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে আমি কলিকাতায় গেলাম একবার আমার ল্যাবরেটরির Reajent প্রভৃতি আনিতে। সে সময় 'শনিবারের চিঠি'র অফিসেও গেলাম। তখন ২৫।২ মোহনবাগান রো—এই ঠিকানায় অফিস ছিল। সজনীর সহিত আলাপ হইল। যতদূর মনে পড়ে, সেদিন তারাশঙ্কর, বিভূতি বাঁড়ুষো, বীরেন ভদ্র, নীরদ চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার সকলের সহিত পরিচিত হইলাম। শনিবারের চিঠির অফিসে তখন বেশ জমজমাট একটা আড্ডা বসিত। পরে, আমি আরও অনেকবার ওই আড্ডায় গিয়াছি এবং ওই আড্ডাতেই প্রমথনাথ বিশী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ স্থশীলকুমার দে, অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকের সহিত পরিচয় হইয়াছে। অনেকের সহিত 'আপনি' সম্বোধন 'আপনি' থাকিয়া গিয়াছে, আবার অনেকের বেলায় তাহা তুমিতে পরিণত হইয়াছে। দুই এক ক্ষেত্রে 'তুই' তুঙ্গেও আরোহণ করিয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সজনীর সহিত অন্তরঙ্গতা জমিয়া গেল। তাহাকে আমি ভালো বাসিয়া ফেলিলাম। সেও আমাকে ভালোবাসিল। তাহার পর আর একটা কাণ্ড ঘটিল এক দিন। কাপল ভট্টাচার্য একদিন প্যারিস হইতে ভাগলপুরে আমার বাসায় হাজির হইল। কপিল আমার কাকাবাবুর ছাত্র, আমাকে দাদা বলিয়া ডাকে। পড়শোনায় ভালো ছেলে। ইনজিনিয়ারিং পাশ করিয়াছে শিবপুর কলেজ হইতে। সাহিত্যচর্চাও করিত এককালে। তাহার 'রেলইয়ার্ডের বক্ষপঞ্জরে' গল্প বোধহয় প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল। গল্পটি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কপিল কিন্তু সাহিত্য-পথে বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। সে ভালো ইনজিনিয়ার হইয়াছিল। সিভিল ইনজিনিয়ার। কংক্রিটের কাজ শিখিবার জন্য সে প্যারিসে গিয়াছিল। সেই প্যারিস হইতে সে হঠাৎ আমার কাছে আসিয়া হাজির হইল। দেখিলাম, সঙ্গে করিয়া অনেকগুলি 'শনিবারের চিঠি' এবং অন্য কয়েকখানা মাসিকপত্রও আনিয়াছে। সবগুলিতেই আমার লেখা ছিল। সেইগুলি দেখাইয়া কপিল আমাকে বলিল—আপনার এত ভালো লেখা কিন্তু ছাপা কি বিশ্রী। আমার ইচ্ছা, এগুলি ভালোভাবে ছাপা হোক এবং আপনার লেখাগুলি পুস্তক-আকারে প্রকাশিত হোক। আমি কলিকাতায় সজনীবাবুর সহিত দেখা করিয়া আসিয়াছি। তিনি আমার সহিত পার্টনারশিপে ব্যবসা করিতে রাজি হইয়াছেন। ভালো একটা সাপ্তাহিক পত্রিকাও বাহির করিব। আপনাকে লিখিতে হইবে। আপনার কাছে নতুন কোন অপ্রকাশিত লেখা আছে?

আমি বলিলাম, 'আছে। কিন্তু এ লেখাটি পরিমলের পছন্দ হয় নাই। সে 'শনিবারের চিঠি'তে ছাপে নাই।'

'কোথায় সেটা?'

'তৃণখণ্ডের' পাণ্ডুলিপিটি তাহাকে দিলাম। সে সেটি লইয়া চলিয়া গেল। ভাগলপুরে তখন তাহার একটা বাসা ছিল।

পরদিন আসিল আবার।

বলিল, "'তৃণখণ্ড' অপূর্ব সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা আমরা পুস্তক-আকারে ছাপিব। আপনাকে সামান্য কিছু অগ্রিম দক্ষিণা দিতেছি।' একশো টাকার নোট আমার হাতে দিল। আমি একটু অবাক হইয়া গেলাম। কপিল বলিল—'আপনার কবিতাগুলিও সংগ্রহ করিয়া 'বনফুল-কবিতা' নাম দিয়া আমরা ছাপিব।' আমার লেখা যে পুস্তক-আকারে ছাপা হইবে, তাহা আমি কখনও কল্পনাও করি নাই। কোথা হইতে কপিল আসিয়া জুটিয়া গেল। আর একটা যোগাযোগও এইসময় ঘটিল। বাবার পত্র পাইলাম—বাংলাসাহিত্যজগতের দাদামশাই শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মণিহারীতে আমাদের বাড়িতে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য আসিয়াছেন। সঙ্গে দিদিমা আছেন। তাঁহারা আমার ভাই টুলুর কোয়ার্টার্সে উঠিয়াছেন। টুলু তখন মণিহারী হাসপাতালের ডাক্তার। বাবা লিখিয়াছেন—দাদামশাই আমার সহিত দেখা করিতে চান। আমি যেন দুই-একদিনের জন্য মণিহারীতে যাই।

মণিহারী গেলাম একদিন। গিয়াই প্রথমে দাদামশায়ের সহিত দেখা করিবার জন্য টুলুর কোয়ার্টার্সে গেলাম। দেখিলাম, ঘরের কপাট বন্ধ। বাহিরে একটি চাকর বসিয়া আছে। চাকরটি আমাকে বলিল—'বাবু এখন পূজা করিতেছেন, কাহারও সহিত দেখা করিবেন না।' আমি তাহাকে বলিলাম—'বাবু পূজা হইতে উঠিলে বলিও যে, বলাইবাবু ভাগলপুর হইতে আসিয়াছেন। একঘণ্টা পরে দেখা করিতে আসিবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে পাশের জানালাটা খুলিয়া গেল।—'আরে কে, বলাই নাকি—এসো এসো।'

ভিতরে ঢুকিয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম, 'আপনি পূজা করিতেছিলেন নাকি—'

'আরে না, না, বাজে লোক তাড়াবার জন্যে এই ফন্দী করেছি।'

দাদামশাই বলিলেন, 'ভায়া, মাসিকপত্রে তোমার অনেক গল্প, অনেক কবিতা পড়েছি। কিন্তু এখনও বই একটাও বেরুল না কেন?'

বলিলাম, 'আমি তো কোনও প্রকাশককে চিনি না। কে আমার বই প্রকাশ করবে, বলুন। সজনীরা হয়তো প্রকাশ করতে পারে।'

দাদামশাই আর কিছু বলিলেন না। দাদামশায়ের সহিত দিনদুই আড্ডা দিয়া ফিরিয়া আসিলাম। দিন পনেরো পরে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পত্র পাইলাম একটি। তিনি লিখিয়াছেন, কেদারবাবু জানাইয়াছেন, প্রকাশকের অভাবে আপনি আপনার গল্পগুলি প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। আমি আপনার প্রকাশক হইতে ইচ্ছুক। আপনার ছোট গল্পগুলি পাঠাইয়া দিবেন। একটু মুশকিলে পড়িলাম। নানা পত্রিকায় আমার গল্পগুলি প্রকাশিত হইতেছিল। সবগুলির ফাইল-কপি আমার কাছে ছিল না।

অনেকগুলি হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। সজনীকে পত্র দিলাম, আমার গল্পগুলি সংগ্রহ করিয়া দাও। সজনী সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল—দিব। কিন্তু, কিছু সময় লাগিবে। তোমার 'তৃণখণ্ড' পড়িয়া চমৎকৃত হইয়াছি। তোমাকে এবার বড় গল্প লিখিতে হইবে। কয়েকদিন পরে, হরিদাসবাবুর নিকট হইতে আর একটি পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন—আমি যেন তাঁহার 'ভারতবর্ষ' কাগজেও লিখি।

হঠাৎ, এই সময় পাটনা কলেজ হইতে একটা সাহিত্যসভার নিমন্ত্রণ আসিল। সে সভায় অনেক সাহিত্যিক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, সজনীকান্ত দাস তো ছিলেনই, আরও বোধহয় দু-একজন ছিলেন, এখন ঠিক নাম মনে পড়িতেছে না। আমাদের থাকিবার স্থান হইয়াছিল ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দারের বাড়িতে। তাঁহাদের লাইব্রেরীর বিস্তৃত ঘরে, মেঝেতে সারি সারি আমাদের বিছানা পাতা হইল। ঘরের চারদিকে আলমারিতে বই ঠাসা। সজনী ঘুরিয়া ঘুরিয়া বইগুলি দেখিতে লাগিল। একটু পরে সে হঠাৎ আমাকে বলিল—তোমার সব গল্পগুলি এইখানেই আছে। আমার কাছে যে গল্পগুলি নাই, সেগুলি আমি টুকিয়া লইব। যোগেন্দ্রনাথের ছোট ছেলে মণি সমাদ্দার সর্বদা আমাদের সেবায় নিযুক্ত ছিল। সজনী তাহাকে বলিল—'মণি, এখনই আমাকে একটা খাতা এনে দাও।'

সজনী সেদিন না ঘুমাইয়া আমার গল্পগুলি খাতায় টুকিয়া ফেলিল। সজনীর মতো বন্ধু ছাড়া আর কেহ এ-কাজ করিত না।

এইখানেই মণি সমাদ্দারের কথা বলিয়া লই। সে অকালে পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। তাহার মতো আদর্শবাদী, শিক্ষিত, বিনয়ী ছেলে খুব বেশী চোখে পড়ে না। তাহার 'প্রভাতী' বলিয়া একটি কাগজ ছিল এবং এই কাগজটিকে কেন্দ্র করিয়া প্রভাতী সংঘ গড়িয়া তুলিয়াছিল। সত্যই সাহিত্য-প্রাণ ছেলে ছিল সে। বাঁচিয়া থাকিলে সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক কিছু করিতে পারিত। কিন্তু অকালমৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিল। তাহার বেশ কিছুদিন পরে, তাহারই অনুরোধে, তাহার 'প্রভাতী' পত্রিকায় আমি বিনা পারিশ্রমিকে 'রাত্রি' উপন্যাসটি লিখিতে আরম্ভ করি। 'রাত্রি' উপন্যাসটি দু-এক সংখ্যা বাহির করিবার পর সজনী 'শনিবারের চিঠি'তে লিখিল 'রাত্রি' প্রভাতীতে বেমানান। সুতরাং সেও 'শনিবারের চিঠি'তে 'রাত্রি' পুনর্মুদ্রণ করিতে লাগিল। এ সব অবশ্য অনেক পরের কথা। 'রাত্রি' লিখিবার পূর্বে আমি আরও কয়েকটি উপন্যাস লিখিয়াছিলাম। মণির প্রসঙ্গে 'রাত্রি'-র কথা মনে পড়িল।

সজনীর নিকট হইতে আমার গল্পের ফাইল সংগ্রহ করিয়া আমি তাহা হরিদাস-বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিলাম। সজনীর 'শনি-রঞ্জন প্রেসে' 'বনফুলের কবিতা' ও 'তৃণখণ্ড' ছাপা হইতে লাগিল। যতদূর মনে পড়িতেছে 'বনফুলের গল্প' বইটাই সর্বাগ্রে বাজারে বাহির হইয়াছিল। তাহার পর 'বনফুলের কবিতা' এবং তাহার পর 'তৃণখণ্ড'।

এতদিন লেখক ছিলাম, এইবার গ্রন্থকার হইলাম। সজনী পত্রযোগে আমাকে ক্রমাগত তাগাদা দিতেছিল, আমি যেন আর একটা উপন্যাস আরম্ভ করি। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও ভারতবর্ষের জন্য লেখা চাহিতে লাগিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশ মজুমদার মহাশয়ও তাঁহাদের দোলসংখ্যা ও পূজা-সংখ্যার জন্য লেখা দাবী করিলেন। সজনীর বাড়িতেই সুরেশবাবুর সহিত আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল, যাহা স্নেহে কোমল, উদারতায় মুক্ত-হস্ত; কিন্তু কর্তব্যে কঠোর। তাঁহাকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। তাঁহার অনুরোধ দাবীরই নামান্তর ছিল। তাঁহার দাবীতে অনেক গল্প লিখিয়াছি। ঠিক সাল মনে নাই—তবে এই সময়ের কাছাকাছি উপেনদার সম্পাদনায় 'বিচিত্রা প্রকাশিত হয়। তাঁহার কাগজে একটি ছোটগল্প লিখিয়াছিলাম, মনে আছে।

সজনীর তাগাদার চোটে অস্থির হইয়া একদিন একটি বড় গল্প ফাঁদিয়া বসিলাম। গল্পটি যখন শেষ হইল, ঠিক সেই সময় পটলবাবু আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত। পটলবাবু সাহিত্যরসিক ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথের গান খুব ভালোবাসিতেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন—'আপনি লিখছেন নাকি? তা হলে আমি যাই।' বলিলাম—'লেখা শেষ হয়ে গেছে। শুনবেন?'

'নিশ্চয়।'

পটলবাবু বসিয়া পড়িলেন সামনের চেয়ারটায়। তাঁহাকে গল্পটি পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন—প্লটটি সুন্দর। এটিকে আরও বড় করুন। ইহাতে উপন্যাসের মালমশলা আছে।

এই বড় গল্পটি পরে 'দ্বৈরথ' উপন্যাসে রূপান্তরিত হইয়াছিল। লেখা শেষ হইবার পরই সজনীকে খবর দিলাম। শরদিন্দুকেও খবর দিলাম। শরদিন্দু মুঙ্গেরে থাকিত। সে-ও একজন উঁচুদরের রসিক ও লেখক ছিল। সেও 'শনিবারের চিঠি'তে 'চন্দ্রহাস' ছদ্মনামে লিখিত। সে নিজেই একদিন ভাগলপুরে আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিয়াছিল। আমি মুঙ্গেরে তাহার বাড়ি গিয়া তাহার লেখা শুনিতাম। তাহার বাবা, মা, ভাই, তাহার বউ, ভ্রাতৃবধূ, তাহাদের ছেলেমেয়ে সকলের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল আমার। এই সম্ভ্রান্ত পরিবারটির প্রতি সত্যই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তাহাদের আত্মীয়বৎ মনে করিতাম। তাই শরদিন্দুকে লিখিতে দ্বিধা হইল না—আমি একটা উপন্যাস লিখিয়াছি, তুমি আসিয়া শুনিয়া যাও। সজনীকেও আসিতে লিখিলাম। সজনীর চিঠি পাইলাম, আমি অমুক তারিখে যাইতেছি। তারিখটি শরদিন্দুকেও জানাইয়া দিলাম। তাহারা যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। লীলা তাহাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করিতে লাগিল। আমি তাহাদের সম্মুখে বসিয়া উপন্যাসটি পড়িয়া ফেলিলাম। তাহারা মাঝে মাঝে এখানে, ওখানে কিছু রদবদলের পরামর্শ দিল, কিন্তু উভয়েই এক মত দিল যে, গল্পটি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। বইটির নাম কি হইবে, ঠিক করি নাই। আমি বলিলাম 'অহিনকুল' দিলে কেমন হয়। শরদিন্দু

মাথা নাড়িল, না, অন্য নাম দিতে হইবে। আমার উপর ও ভারটা ছাড়িয়া দাও। আমি ভাবিয়া পরে তোমাকে জানাইব। শরদিন্দু চলিয়া গেল। সজনী যাইবার সময় বলিয়া গেল—হরিদাসবাবু যদি উপন্যাসটি তাঁহার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশ করিতে চান, সেইখানেই দিও। কয়েকদিন পরেই শরদিন্দুর চিঠি পাইলাম—সে লিখিয়াছে, তোমার বই-এর নামকরণ করিলাম 'দ্বৈরথ'। পটলবাবুকে বইটি শুনাইবার বাসনা ছিল, কিন্তু তিনি ওকালতি, পলিটিকস্ এবং নিজের বিষয়সম্পত্তি লইয়া এত ব্যস্ত থাকিতেন যে, তাঁহার নাগাল পাইলাম না। কিছুদিন পরেই হরিদাস-বাবুর নিকট হইতে পত্র পাইয়া 'দ্বৈরথ' উপন্যাসটি 'ভারতবর্ষে' পাঠাইয়া দিলাম।

আগে কবিতা এবং ছোট গল্প লইয়া মত্ত থাকিতাম। এবার উপন্যাস লিখিবার নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। কিছুদিন পরেই আর একটি উপন্যাস লিখিয়া ফেলিলাম—'বৈতরণী তীরে'। সেটিও হরিদাসবাবুকে পাঠাইয়া দিলাম। তিনি এটি ভারতবর্ষে না ছাপিয়া কিছুদিন পরে পুস্তক-আকারেই প্রকাশ করিলেন। এই উপন্যাসটিতে আমি বীভৎস রস ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার মনে হইয়াছিল, বীভৎস রসের উপন্যাস বড় একটা নাই—চেষ্টা করিয়া দেখি, পারি কিনা। রবীন্দ্রনাথ বইটির প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই উঠিয়া পড়িয়া, সাহিত্য সাধনায় লাগিয়া পড়িলাম। লিখিবার জন্য তাগাদাও নানা-স্থান হইতে আসিতে লাগিল।

আনন্দবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর পত্রিকা আমার নিকট গল্প চাহিতে লাগিল। ল্যাবরেটরির কাজের জন্য দিনের বেলা লিখিতে পারিতাম না। কিছুদিন সন্ধ্যার পর ল্যাবরেটরিতে বসিয়াই লিখিয়াছি। কিন্তু দেখিলাম, আমাকে সেখানে বসিয়া থাকিতে দেখিলেই লোকসমাগম হয়। অনেক ভদ্রলোক সময় কাটাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং তাহাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের গল্প (যাহার সহিত আমার কিছুমাত্র সংস্রব নাই) অনবরত শুনাইতে লাগিলেন। লক্ষ্য করিয়াছি, সাধারণ লোকে আত্ম-আস্ফালন করিতে বড় ভালোবাসে। নিজের ছেলেমেয়ের গল্প, জামাইয়ের গল্প, তাহার মনিব তাহাকে কত ভালোবাসেন, তাহার গল্প—এই সব গল্প কয়েকদিন শুনিবার পর স্থির করিলাম, সন্ধ্যার পর আর ল্যাবরেটরিতে বসিব না। ইহার পর লিখিবার যে পদ্ধতি অবলম্বন করিলাম, তাহা সাধারণতঃ কেহ করে না। আমি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় খাইয়া ৭টা নাগাদ শুইয়া পড়িতাম। ঘড়িতে এলার্ম দিয়া উঠিতাম রাত্রি ১টার সময়। একটা হইতে রাত্রি ৪টা পর্যন্ত (কোন কোন দিন পাঁচটা পর্যন্ত) লিখিতাম। তাহার পর আবার শুইয়া পড়িতাম। উঠিতাম বেলা আটটার সময়। তখন প্রাতরাশ করিয়া ল্যাবরেটরিতে চলিয়া যাইতাম। সঙ্গে লেখার খাতা থাকিত। সময় পাইলে সেখানেও লিখিতাম। আমার ল্যাবরেটরির মেথর সীতাবি বাজার করিয়া আনিত। আমি যাহা রোজগার করিতাম, সব লীলাকে দিয়া দিতাম। সংসারের সব ঝড়-ঝাপটা লীলাই সামলাইত।

নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে, আমাকে সে বিরক্ত করিত না। আমার সংসারটি নিতান্ত ছোট ছিল না। কেয়া, অসীম তো ছিলই, কিছুদিন পরে রঞ্জুরও জন্ম হইল ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে। তা ছাড়া আমার ভাইরা ছিল। তাহারা আমার বাসায় থাকিয়া স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করিত। বাবা, মা মাঝে মাঝে আসিয়া আমার কাছে থাকিতেন। বাড়িতে অতিথিবর্গের ভিড়ও ছিল। আমি মাঝে মাঝে আমার বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতাম। সব ঝঞ্ঝাট লীলাই পোহাইত। এই সময়ই সাহিত্য-চর্চা করিয়া কিছু কিছু উপার্জনও হইতে লাগিল। হরিদাসবাবু বেশ কিছু টাকা দিলেন। কয়েকটি মাসিকপত্রও আমার গল্পের জন্য টাকা পাঠাইতে লাগিল। সাহিত্য-চর্চা করিয়া যে অর্থাগম হইবে, এ কথা কখনও ভাবি নাই। কিন্তু, সেই অর্থ যখন আপনি আসিতে লাগিল, তখন পুলকিত হইলাম। লেখার বেগ বাড়াইয়া দিলাম। এই সময় সজনী প্রায়ই ভাগলপুর যাইত। উদ্দেশ্য, আমার সাহিত্য-প্রেরণার বহ্নিকে উৎসাহের হাওয়া দিয়া আরও প্রজ্জ্বলিত করা। ও যখন আসিত, তখন আমি উহাকে আনিতে স্টেশনে যাইতাম। কলিকাতা হইতে ট্রেনটা তখন খুব ভোরে পৌঁছাইত। যতদূর মনে পড়িতেছে, ভোর সাড়ে চারটায়। একবার খবর পাইয়া সজনীকে আনিতে স্টেশনে গিয়াছি, শুনিলাম, ট্রেন লেট আছে। আমি সাড়ে তিনটা নাগাদ স্টেশনে পৌঁছিয়াছিলাম। ট্রেন লেট শুনিয়া ওভার-ব্রিজের উপর উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিলাম। দেখিলাম দুইটি প্ল্যাটফর্মে নানাজাতের প্যাসেঞ্জাররা ট্রেনের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। অনেকে অনেকের ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, অনেকে আবার ঝগড়াও করিতেছে। হঠাৎ 'কিছুক্ষণ' গল্পের আভাসটি আমার মনে যেন বিদ্যুৎ-চমকের মতো খেলিয়া গেল। আমি ওভার-ব্রিজের উপর পায়চারি করিতে করিতেই এই কল্পনাটির উপর তা দিতে লাগিলাম। অনেকদিন তা দিতে হইয়াছিল। তাহার পর গল্পের শাবকটি অণ্ড হইতে বাহির হইয়া পড়িল একদিন। কিছু সময় লাগিয়াছিল।

এই সময় ভাগলপুরে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। আদমপুরের রাজবাড়ি ভাগলপুরের বাঙালী-সমাজ একটি বিখ্যাত স্থান। রাজবাড়ি রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। তিনি ছিলেন উকিল; কিন্তু, নিজ প্রতিভাবলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। সে অর্থ শুধু তিনি নিজে ভোগ করেন নাই, ভাগলপুরের জনসাধারণের হিতার্থে অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্তি দুর্গাচরণ হাইস্কুল, মোক্ষদা গার্লসস্কুল, হাসপাতালে শিবতারিণী ওয়ার্ড। টি. এন. জুবিলি কলেজেও তাঁহার অনেক দান। তাঁহার এই সব কৃতিত্বের জন্য সেকালে তিনি রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। আমি যখন ভাগলপুরে যাই, তখন তাঁহার পৌত্রেরা সেখানে ছিলেন। পৌত্রেরা অবশ্য পিতামহের মতো কৃতী ছিলেন না। তাঁহারা ছিলেন বড়লোকের আদুরে নাতি। তাঁহারাই তাঁহাদের বাড়ির সামনের এক টুকরো জমি সস্তায় বিক্রয় করিয়া দেন এবং সেই জমির উপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ভবন

নির্মিত হয়। বন্ধুবর অমূল্যকৃষ্ণ রায় এবং ভাগলপুরের বিখ্যাত উকিল শ্রীরঞ্জিত কুমার সিংহের উদ্যোগে ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ইহার পর হইতে আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠতরভাবে সংযুক্ত হইহাম। ক্রমশঃ সেখানে কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য হইলাম। তাহার পর—অনেকদিন পর সভাপতি হইলাম। যতদিন ভাগলপুরে ছিলাম, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলাম। ভাগলপুর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে গিয়া প্রথমেই দুইখানি অমূল্য পুস্তক পড়িবার সুযোগ পাইলাম। একটি শিবনাথ শাস্ত্রীর (?) লেখা 'রামতনু লাহিড়ী ও তদানীন্তন বঙ্গসমাজ' আব একটি দীনেশ সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ'। কিছুদিন পরে, ভাগলপুরে আর একটি ব্যাপার প্রায়ই করিতে হইত। সাহিত্য-সভার সভাপতিত্ব। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তো বটেই, ওখানকার টি. এন. জুবিলি কলেজে, মাড়োয়াড়ি কলেজে (এবং পরে মেয়েদের কলেজ) প্রতি বৎসর যে সব সাহিত্য-সভা হইত, তাহাতেও আমাকে কর্ণধাব হইতে হইত। আমিই শেষে তাহাদের বলি—বাহির হইতে সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ কবিয়া আনুন, আমি একা কতবার সভাপতিত্ব করিব। তাহারা আমার উপরই সভাপতি নির্বাচন করিবার ভার দিতেন। যে সব সাহিত্যিকেরা আমার নিমন্ত্রণে আসিতেন, সাধারণতঃ আমারই বাড়িতে তাঁহারা আতিথ্যগ্রহণ কবিতেন। তাঁহাদেব সহিত একটা অন্তরঙ্গতা হইয়া যাইত। এইরূপে তদনীন্তন বঙ্গসাহিত্যেব নামজাদা সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার ভাব হইয়া গেল। আমি নিজের ঘরে বসিয়াই তাহাদের আপনজন হইয়া গেলাম। তাহাদের আড্ডায় যাইবার কোন প্রয়োজন হইল না। কলিকাতায় যখন আসিতাম, তখন সজনীর বাড়িতে কিম্বা হোটেলে উঠিতাম। সেজন্য সাহিত্যের বিশেষ কোনও গোষ্ঠির সহিত যুক্ত হইবার প্রয়োজন হয় নাই। 'শনিবারের চিঠি'তে অনেকদিন লিখিয়াছি, কিন্তু শনিবাবের চিঠির দলভুক্ত ঠিক ছিলাম না। আমি সেখানে লেখকমাত্র ছিলাম। সে-কাগজের নীতি-নিয়ন্ত্রণে আমি কোনদিন অংশগ্রহণ করি নাই। তবে সজনীকান্তের সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। সজনীর ব্যক্তিত্ব প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল আমাকে। সে আমাব প্রকৃত হিতৈষী ছিল। ক্রমশঃ সে আমার ঘরের লোক হইয়া উঠিয়াছিল। সে একটু বে-পরোয়া ছিল বলিয়া তাহাকে আরও ভালো লাগিত। একটা উদাহরণ মনে পড়িতেছে। সেটা বোধহয়, এই সময়েই ঘটিয়াছিল। আগেই বলিয়াছি, সজনী সময় পাইলেই ভাগলপুরে আমার কাছে চলিয়া যাইত। সেবার ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুরে গিয়া আলাদা একটি বাড়িভাড়া করিয়া সস্ত্রীক সেখানে ছিলেন। সজনীকে লইয়া আমি সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। হাঁটিতে হাঁটিতে অবশেষে ভাগলপুরের গড়েব মাঠ স্যানডিস কম্পাউণ্ডে গিয়া হাজির হইলাম। সুন্দর হাওয়া দিতেছিল, আমরা দুইজনে মাঠে ঘাসের উপর গিয়া বসিলাম। দেখিলাম, পূর্বাকাশে চাঁদ উঠিতেছে। সেদিন বোধহয়, শুক্লা-ত্রয়োদশী কিম্বা চতুর্দশী ছিল। কয়েকমুহূর্ত মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলাম। ইহার পরই মনে হইল, এবং সেটি তৎক্ষণাৎ

বলিয়া ফেলিলাম—'ভাই, শুনেছি নাকি চন্দ্রালোকে তাজমহল অতি সুন্দর দেখতে। কিন্তু আমার ভাগ্যে তা আর দেখা হবে না।'

সজনী সঙ্গে সঙ্গে বলিল—'চল, কালই চল।'

'টাকা কোথায়? আমার তো ব্যাংক-ব্যালান্স নেই।'

'আমার টাকা আছে। আমি 'মুক্তি' নামে একটা সিনেমা-গল্পের Script লিখে ৫০০ টাকা পেয়েছি। সেটা আছে আমার কাছে। কালই বেরিয়ে পড়ি চল—'

আমি বলিলাম, 'না ভাই, তোমার টাকা খরচ করে আমি যাব না। তা ছাড়া আমি একা যেতে চাই না। লীলা আছে, লীলার বোন ছায়াও রয়েছে। তাদের কার কাছে রেখে যাব?'

'চল, বাড়ি গিয়ে পরামর্শ করা যাক। টাকা আমি দেব। তুমি পরে শোধ কোর। টাকার জন্য ভেবো না।'

সজনীর এই 'কুছ পরোয়া নেই' ভাবটাই আমার বড় ভাল লাগিত। বাড়ি আসিয়া লীলাকে বলিলাম। লীলা বলিল, 'আমাকে যদি লইয়া যাইতে চাও, মা-বাবাকেও সঙ্গে লইতে হইবে। মা-বাবাকে ফেলিয়া আমি যাইতে পারিব না। ছায়াও সঙ্গে যাইবে।' মা-বাবা তখন বরারিতে ভোলার বাসায় ছিলেন। মায়ের তখন কোমরে খুব ব্যথা, 'শায়াটিকা' হইয়াছে। মা সোৎসাহে উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—'আমি যাইব'। সজনী বলিল—আমি তাহা হইলে কলিকাতায় গিয়া সুধা, খোকন এবং উমাকে লইয়া আসি। আরও কিছু টাকাও আনিতে হইবে। কারণ, দল বেশ ভারি হইয়া গেল। পাঁচ শ' টাকায় কুলাইবে না। ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় সস্ত্রীক আমাদের সঙ্গী হইলেন।

ঠিক হইল, আমি সকলকে লইয়া গয়া চলিয়া যাইব। সজনী সপরিবারে আগ্রাগামী ট্রেনে চড়িয়া গয়া আসিবে, আমরা সেই গাড়িতে উঠিব। তাহাই হইল।

এই ভ্রমণকাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ দিব না। একটি ঘটনা কেবল উল্লেখ করিতেছি। আগ্রা গিয়া পৌঁছাইলাম সন্ধ্যার একটু আগে। ব্রজেনদা ইতিপূর্বে আগ্রা আসিয়াছিলেন, তিনি আমাদের তাঁহার পূর্বপরিচিত একটি হোটেলে লইয়া গেলেন। সেখানে চার্জ শুনিলাম, জনপ্রতি তেরো টাকা করিয়া। সেকালের পক্ষে চার্জটা একটু বেশি মনে হইল। কিন্তু ব্রজেনদার পরিচিত হোটেল, আমরা আপত্তি করিলাম না। আমি কেবল হোটেলের মালিককে প্রশ্ন করিলাম, পেট ভরিয়া খাইতে দিবেন তো? তিনি বলিলেন—'হ্যাঁ নিশ্চয়ই।' সেদিন রাত্রেই কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিলেন না। সজনী এবং আমি যখন তৃতীয়বার ভাত লইয়া তৃতীয়-বার মাংস চাহিলাম, তখন পাচক আসিয়া বলিল, সব ফুরাইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, ম্যানেজারকে ডাক, এরকম কথা তো ছিল না। ম্যানেজার আসিলেন। আমার এবং সজনীর উচ্চকণ্ঠে হোটেলের অন্যান্য বোর্ডাররাও আসিয়া দরজায় ভিড়

করিয়া দাঁড়াইল। ম্যানেজারকে আমরা বলিলাম, আমরা আধপেটা খাইয়া শুইতে চলিলাম। কালই আপনার বোর্ডিং ত্যাগ করিব।

ঐতিহাসিক ব্রজেনদা বলিলেন—বহুপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রও এই হোটেলে আসিয়াছিলেন এবং অনুরূপ কারণে হোটেলের ম্যানেজারের সহিত তাঁহার কলহ হইয়াছিল। এ ঘটনা আমি পূর্ববর্তী ম্যানেজারের মুখে শুনিয়াছি। তোমরাও সেই সাহিত্যিক ঐতিহ্য রক্ষা করিলে। কাল, অন্য হোটেলে উঠিয়া যাইও। আমি কিন্তু তোমাদের সহিত থাকিব না। আমি এখান হইতে মথুরা, বৃন্দাবন হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব।

আগ্রা হোটেলে নাবিয়াই অবশ্য আমরা তাজমহল দেখিয়া আসিয়াছিলাম। সে বর্ণনাটা আর দিলাম না। সংক্ষেপে বলিতেছি—স্বপ্নের সমুদ্রে যেন অবগাহন করিলাম। তাহার পরদিন উঠিতে একটু বেলা হইল। উঠিয়া দেখিলাম, হোটেলের সম্মুখে কয়েকজন বাঙালী যুবক দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা আসিয়া বলিল—শুনিলাম, এই হোটেলে বনফুল, সজনীকান্ত দাস এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়াছেন। তাঁহারা আগ্রায় আসিয়া হোটেলে থাকিবেন, এটা আগ্রাবাসী বাঙালীদের পক্ষে মর্যাদাহানিকর।

তখন আত্মপরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনারা কি করিতে চান?

—আমরা একটি বাড়ি ঠিক করিয়াছি, সেইখানে আপনাদের লইয়া যাইতে চাই। আপনাদের সমস্ত খাওয়ার ভারও আমরা লইব।

দেখিলাম, ভদ্রলোকেরা নাছোড়বান্দা। অবশেষে তাঁহাদের প্রস্তাবে আমরা রাজি হইলাম। তাঁহাদেব মধ্যে তাবাশঙ্করের একজন আত্মীয়ও ছিলেন। যতদূর মনে পড়িতেছে, তারাশঙ্করের ভাগিনেয়। তিনিই একটা ঘর আমাদের জন্য ঠিক কবিয়া দিলেন। দ্বিতলের উপর গিয়া আমবা আস্তানা গাড়িলাম। সেদিন বৈকালে একটা সাহিত্যসভারও আয়োজন করিলেন তাঁহারা। ব্রজেনদা সন্ধ্যার ট্রেনে চলিয়া গেলেন। আমরা সেই বাসায় আসর জমাইলাম। অনেক বাঙালী-বাড়ি হইতে আমাদের জন্য রান্না খাবার আসিতে লাগিল। আগ্রাবাসী বাঙালীদের সেই আতিথেয়তার কথা আজও মনে আছে। সেখানে দুই-তিনদিন থাকিবার পর যখন আমরা ফিরিবার উপক্রম করিলাম, তখন একজন ভদ্রলোক বলিলেন—এতদূর আসিয়াছেন, হরিদ্বারটা অন্ততঃ দেখিয়া যান। অকপটে সত্যি কথাই বলিলাম—আমাদের টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তর দিলেন—টাকার জন্যে ভাবনা কি? যত টাকা লাগে, আমরা দিচ্ছি, আপনারা গিয়া পাঠাইয়া দিবেন। তখন আমরা স্থির করিলাম, তাহা হইলে যাওয়া যাক। তাঁহার নিকট হইতে কিছু টাকা ঋণ করিয়া আমরা হরিদ্বার রওনা হইলাম। আমার ভাইকে চিঠি লিখিয়া দিলাম, ভদ্রলোককে টাকাটা যেন T.M.O. করে দেয়। সে যাত্রায় আমরা হরিদ্বার, হৃষীকেশ এবং লছমনঝোলা দেখিয়া ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিলাম। নতুনরকম একটা অভিজ্ঞতা হইল। নতুন উৎসাহে আবার

লেখা শুরু করিলাম। সজনীর নিকট কিছু ধার হইয়া গিয়াছিল, ঠিক করিলাম, লেখা দিয়াই সেগুলি শোধ করিয়া ফেলিব। সজনী বলিল, তুমি লেখা হইলেই আমাকে পাঠাইয়া দিবে, আমি কোথাও না কোথাও সেগুলি বিক্রয় করিয়া দিব। অনেক ছোট গল্প লিখিয়াছিলাম সেই সময়। আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, অলকা, সচিত্র ভারত প্রভৃতি কাগজে গল্পগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পগুলির নাম আমার মনে নাই। এই সময়ই আমি ভারতবর্ষেও নিয়মিত লেখক হইয়াছিলাম। 'দ্বৈরথ' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে সেখানে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে আমার মনে যেন প্রেরণার একটা জোয়ার আসিয়াছিল। প্রতিদিনই রাত্রে লেখার টেবিলে বসিতাম। ইহার পরই বোধহয় 'নির্মোক' বইটা লিখিতে শুরু করি। আমার আজিমগঞ্জ-জীবনের কিছু ছাপ 'নির্মোক' বইটাতে আছে। 'নির্মোক' পরে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে আর একটি ঘটনাও ঘটিল। মোক্ষদা গার্লস স্কুলের কর্তৃপক্ষেরা স্থির করিলেন যে, তাঁহারা মেয়েদের জন্যে কলেজও খুলিবেন। সন্ধ্যার পর সেখানে কলেজ বসিবে। তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজের অধ্যাপকরা বিনা-বেতনে পড়াইতে সম্মত হইলেন। প্রথমে 'আর্টস' বিভাগ আরম্ভ হইবে। আই. এ. ক্লাসে অনেকগুলি মেয়ে ভরতি হইল। কর্তৃপক্ষ আমাকেও অনুরোধ করিলেন, আমি যেন তাঁহাদের বাংলাটা পড়াইয়া দিই। আমি সম্মত হইলাম। সে বৎসর যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী পাঠ্যতালিকার মধ্যে ছিল। ছাত্রীদের সে বইটি আমাকে পড়াইতে হইয়াছিল। পড়াইতে গিয়া দেখিলাম, জীবনচরিতে কবি মধুসূদনের জীবন্ত মূর্তি ঠিক যেন ফোটে নাই। আমার ইচ্ছা হইল, আমি সেটি ফুটাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু সে কি উপায়ে? উপন্যাস লিখিব, না নাটক? বন্ধুবর অমূল্যকৃষ্ণ রায় উপদেশ দিলেন, যদি পারেন, নাটক লিখুন। আমি লাগিয়া পড়িলাম। সজনীকে পত্র লিখিলাম, কবি মধুসূদনকে জীবন্ত করিতে হইলে কি কি বই পড়া দরকার? সজনী আমাকে কিছু বই পাঠাইয়া দিল। ভাগলপুরেও আমি কিছু বই জোগাড় করিয়া ফেলিলাম। অনেক পড়াশুনা করিয়া 'শ্রীমধুসূদন' নাটক শুরু করিয়া দিলাম। অমূল্যবাবু প্রায়ই সন্ধ্যার পর আসিতেন এবং আমি যেটুকু লিখিয়াছি, শুনিয়া যাইতেন। খুব উৎসাহ দিতেন তিনি। যেখানটা খটকা লাগিত, অকপটে বলিতেন এবং আমি তাহা সংশোধন করিয়া লইতাম। লেখা শেষ হইলে, কলিকাতায় চলিয়া গেলাম, সজনীকে লেখাটা শুনাইবার জন্যে। সজনী মহা খুশী। সে একটা কথা বলিয়াছিল। এখনও মনে আছে—I envy you. ফিরিবার সময় লেখাটা 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক ফণীর হাতে দিয়া আসিলাম। 'শ্রীমধুসূদন' ভারতবর্ষে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল। 'নির্মোক' বইটি আগেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদক ব্রজেনদা 'প্রবাসী'-তে ছাপিবেন বলিয়া তাহার পাণ্ডুলিপিটি আমার নিকট হইতে লইয়া গেলেন। বলিলেন, পরের মাস হইতেই ছাপিব। কিন্তু তাহা হইল না। প্রবাসী সম্পাদক

মহাশয়ের কোনও কন্যার (শান্তা দেবী বা সীতা দেবী, ঠিক মনে নাই) একটি উপন্যাস প্রকাশিত হইতে লাগিল। 'নির্মোক' প্রবাসী আপিসে পড়িয়া রহিল। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে আমার 'দ্বৈরথ' প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল। সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের প্রকাশভবন হইতে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়িতেছে। 'দ্বৈরথ' পুস্তকটি আমার মায়ের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলাম। হরিদাস-বাবু আমাকে রয়্যালটি বাবদ একশত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। আমি ঠিক করিলাম, টাকাটাও মাকে দিব। মা কিন্তু টাকা লইতে চাহিলেন না। বলিলেন, 'আমি টাকা নিয়ে কি করব বাবা? আমার যা অভাব, তোমরাই তো মিটিয়ে দিচ্ছ। টাকা নিয়ে আমি কি করব কি?' মায়ের অর্থলোভ একেবারেই ছিল না, তিনি জীবনে কখনও সঞ্চয় করেন নাই। আমার বাবা আমাদের বড় আমবাগানটা তাঁহার নামে লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, মা তাহাও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন— তুমি আমার ছেলেদেব উপর অবিশ্বাস কবিতেছ কেন? তোমার অবর্তমানে তাহারা আমাকে অযত্ন করিবে, এ চিন্তা তোমাব মনে আসিতেছে কেন? নির্লোভ, নিঃস্বার্থপর, তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন তিনি। আমি মাকে বলিলাম, 'তোমার দরকার নাই জানি, কিন্তু তোমার নামে উৎসর্গ করা বইতেই তো এই আমার প্রথম উপার্জন। তুমি যদি টাকাটা লও, আমার বড় আনন্দ হইবে।'

মা বলিলেন,—'টাকা লইয়া আমি করিব?'

'কোনও তীর্থ ঘুরিয়া এস।'

অনেক জেদাজেদির পর মা টাকাটা লইলেন এবং বাবাকে লইয়া পুরী চলিয়া গেলেন।

ইহার পর গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স হইতে 'বনফুলের আরও গল্প' এবং 'কিছুক্ষণ' প্রকাশিত হইল।

এই সময় বন্ধু, পরিষদ, শনিবারের চিঠিব ও শনিবঞ্জন প্রেসের কর্মকর্তা সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, শনিবারের চিঠির জন্য একটি প্রহসন লিখুন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে এই সময় 'মন্ত্রমুগ্ধ' নাটকটিও লিখিতে শুরু করিলাম। সে বারবার তাগাদা না দিলে এ নাটক লিখিতাম না বোধহয়। কিছু-দিন আগে সুবল মারা গিয়াছে। তাহার মতো চালাক, চতুর, বশম্বদ এবং কর্মক্ষম বন্ধু আমি বড় একটা দেখি নাই। আমরা যখন আগ্রা গিয়াছিলাম, সে সঙ্গে ছিল। সে না থাকিলে, আমাব কনিষ্ঠ পুত্র চিরন্তনকে (রন্তু) লইয়া বিপদে পড়িতাম। চিরন্তন তখন খুব শিশু, হাঁটিতে পারে না। সুবলই তাহাকে সর্বদা কোলে বহন করিয়াছে। সুবল আজ নাই, তাহার স্মৃতি মনকে ভারাক্রান্ত করিতেছে। সে উপীনদার (সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) বৈবাহিক ছিল। উপেনদার ছেলের সহিত তাহার একমাত্র মেয়ের বিবাহ হয়।

এই সময় আমি একটি বড় উপন্যাসও আরম্ভ করি। তখনকার জীবনস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যে অসংখ্য চরিত্র আমি দেখিয়াছি বা কল্পনা করিয়াছি, তাহাদের

লইয়া আমি 'জঙ্গম' শুরু করিয়াছিলাম। 'জঙ্গম' লিখিয়া শেষ করিতে বেশ সময় লাগিয়াছিল। সজনী মাঝে মাঝে আসিয়া শুনিয়া যাইত এবং আমাকে খুব উৎসাহ দিত। 'জঙ্গম' উপন্যাসে একটি কোন সুগঠিত প্লট নাই। ইহা একটি লোকের জীবনপ্রবাহের চতুর্দিকে নানাবিধ চরিত্রের আবর্তন ও বিবর্তন। বস্তুতঃ, জঙ্গমে আমি তদানীন্তন সমাজের বহুমুখী চিত্তবৃত্তিকে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। 'জঙ্গম' উপন্যাস শেষ পর্যন্ত একটা বড় আর্ট গ্যালারি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক সমালোচক বইটিকে বহু চরিত্রের মিছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'জঙ্গম' বইটিও ধারাবাহিকভাবে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই সময়টা আমি যেন একটা উন্মাদনার মধ্যে থাকিতাম। সমস্ত দিন ল্যাবরেটরির কাজ এবং রাতে সাহিত্যসাধনা। সংসারের সমস্ত ঝক্কি লীলার উপর। আমি যেন স্বপ্নজগতে বাস করিতাম তখন।

সংসার ক্রমশঃ বড় হইতেছিল, খরচও বাড়িতেছিল। বর্তমানের তুলনায় খরচ তখন অবশ্য খুব কম ছিল। ভালো প্রথম শ্রেণীর কাতার্নি (কাটারিভোগ) চাল ছিল আট টাকা মণ, পাকা রুইমাছ ছিল আট আনা সের, খাঁটি ঘি ছিল টাকায় চৌদ্দ ছটাক, দুধ টাকায় পাঁচ সের। তরি-তরকারি কোনটাই চার-আনা সেরের বেশি নয়। কিন্তু, আয়ও অবশ্য কম ছিল। আমি ল্যাবরেটরি হইতে মাসে তিন শত বা খুব বেশি হইলে চারি শত টাকা রোজগার করিতাম। লেখা হইতেও কিছু কিছু টাকা পাইতেছিলাম। ইহাও আমাকে সাহিত্যকর্মে আরও বেশি উৎসাহিত করিতেছিল। কিন্তু, উৎসাহের আসল উৎস ছিল, সজনীকান্ত এবং পরিমল। শনিবারের চিঠির নিরন্তর চাহিদার জন্য আমাকে সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইত। নানাধরনের লেখা লিখিয়াছি শনিবারের চিঠিতে। অনেক লেখার নাম থাকিত না, অনেক লেখায় 'বনফুল' ছাড়াও অন্য ছদ্মনাম ব্যবহার করিতাম। তবে, অধিকাংশ লেখাই 'বনফুল' নামে লিখিয়াছি।

আমি ভাগলপুরে ডাক্তারি করিতে করিতে সাহিত্য-সেবা করিতাম। সজনীকান্ত এবং তাহার দলের লোক ছাড়া অন্য কাহারও সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না। শরদিন্দুর সহিত আমার পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল। সজনী আমাকে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর সহিত, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সহিত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত, কবি শান্তি পালের সহিত, নিখিল দাসের সহিত, প্রমথনাথ বিশীর সহিত, নীরদ চৌধুরীর সহিত, শিল্পী হরিপদ রায়ের সহিত, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর) মহাশয়ের সহিত, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এবং আরও অনেক বিদগ্ধ গুণীর সহিত, যাঁহাদের নাম এখন মনে পড়িতেছে না। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভাগলপুরে আমার বাড়িতে গিয়াছিলেন পরে। অনেকের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতাও হইয়াছিল। সজনীর মাধ্যমেই অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুশীল দে এবং কবি মোহিতলালের সহিত আমার পরিচয়

ঘটিয়াছিল। ইহারাও পরে আমার বাড়িতে গিয়াছিলেন। কলিকাতায় তখন একদল 'বোহিমিয়ান' সাহিত্যিক ছিলেন। ইহাদের অনেকেরই কোনও সুনির্দিষ্ট পেশা বা চাকুরি ছিল না। কোন সাময়িকপত্রের অফিসে, বা গ্রামোফোনের দোকানে বা অন্য কোথাও ইহারা অনিশ্চিত চাকুরি করিতেন। ইহাদের সহিত আলাপ করিবার তেমন সুযোগ হয় নাই। তবে সজনীর আফিসে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আলাপ হইয়াছিল। সে আলাপ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। সে 'গল্পভারতী' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিল। তাহার অনুরোধে 'গল্পভারতী'তেও অনেক লেখা দিতাম। নৃপেনও ভাগলপুরে গিয়াছিল। তাহার লেখার হাতটি বড় মিষ্টি ছিল। পণ্ডিত লোকও ছিল সে। অনেক পড়াশোনা ছিল। সেই সময় আরও তিনজন লেখকের গল্প আমার ভালো লাগিত। রমেশচন্দ্র সেন, জগদীশ গুপ্ত এবং মণীন্দ্রনাথ বসু। মণীন্দ্র-নাথের 'রমলা' পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। জগদীশ গুপ্তের গল্পে একটা আসামান্য অনন্যতা আছে। তাঁহার সহিত আমার দেখা হয় নাই। 'প্রবাসী'-তে মাঝে মাঝে তাঁহার লেখা পড়িতাম। খুব ভালো লাগিত। রমেশচন্দ্র সেনের সহিত শেষ বয়সে যখন দেখা হয়, তখন তিনি অন্ধ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ছোট গল্পগুলি চমৎকার। আমার আর একজন প্রিয় লেখক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বড় উকিলও ছিলেন। একবার ভাগলপুর আদালতের কাজে তিনি গিয়াছিলেন। সেই সময় আমার বাড়িতে আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। সে যুগের 'বিদ্রোহী' লেখকদের মধ্যে তাঁহার নাম ছিল। তাঁহার 'মেঘনাদ' বইটি নাম করিয়াছিল সেকালে। এখন সে 'মেঘনাদ'কে লোকে ভুলিয়াছে। মাইকেলের মেঘনাদকে কিন্তু ভুলিতে পারে নাই।

এই সময় আমার জীবনে একটি পরম সৌভাগ্য উদিত হইয়াছিল। এই সময় আমি রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। কি করিয়া আসিলাম, তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমি আমার 'রবীন্দ্রস্মৃতি' বইটিতে দিয়াছি। এখানে সে সবের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু বলিতে পারি, আমি অনাহূত যাই নাই, রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে সপরিবারে গিয়াছিলাম। একবার নয়, বার বার। কবি রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়া-ছিলাম তাঁহার বিপুল সৃষ্টির মধ্যে, মানুষ রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়াছিলাম তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া। বুঝিতে পারিলাম, প্রকৃত আভিজাত্যের স্বরূপ কি। তাহা অর্থের ঝঙ্কার নহে, তাহা মহত্ত্বের প্রকাশ। সেই মহত্ত্বে অবগাহন করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত তাঁহার শেষ জীবনে আমার যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল, তাহাই আমার জীবনের একটি পরম সম্পদ হইয়া আছে।

এই সময় পৃথিবীর রাজনৈতিক জগতে খুব ডামাডোল কাণ্ড ঘটিতেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তর্জন-গর্জন কাগজের মারফৎ শুনিতে পাইতেছিলাম। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসও তখন আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করিয়াছে। এই সময়ই বোধহয়, আমার নাটক শ্রীমধুসূদন পুস্তক-আকারে প্রকাশিত হয় ডি. এম. লাইব্রেরী হইতে। আমার বাবার মামাতো ভাইয়ের জামাতার (অমর ভট্টাচার্য) সহিত ডি.

এম. লাইব্রেরীর মালিক শ্রীগোপালদাস মজুমদারের (প্রকাশকজগতে গোপালদা নামে সুপরিচিত) বন্ধুত্ব ছিল। তাহারা আমার ভাগলপুরের বাড়িতে আসিয়াছিলেন বইটি লইবার জন্য। মনে পড়িতেছে, প্রথম সংস্করণের জন্য আমাকে আড়াইশো টাকা দিয়াছিলেন। বইটি প্রকাশিত হইবার পর আর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী হঠাৎ একদিন ভোরবেলার ট্রেনে আমার কাছে আসিয়া হাজির। তাঁহার পকেটে আমার নাটক শ্রীমধুসূদন। আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন—'এসেছি কবির দ্বারে—'। তাহার পর বলিলেন, 'অনেকদিন আগে 'রূপকথা' নাটক শুনে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, আপনি ভালো নাটক লিখতে পারবেন। আমার সে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। আমি আপনার 'শ্রীমধুসূদন' অভিনয় করব।' এ কথা শুনিয়া আমি একটু অসুবিধায় পড়িলাম। কারণ, কয়েকদিন পূর্বে সতু সেন নামক এক ভদ্রলোককে নাটকটি অভিনয় করিবার অনুমতি দিয়াছিলাম। শিশিরবাবুকে সে কথা বলিলাম এবং তাহার হাতে সতু সেনের নামে একটি পত্র দিলাম যে, তিনি যেন আমার নাটক অভিনয় না করেন। শিশিরবাবুই আমার নাটকের অভিনয় করিবেন। শিশিরবাবু চিঠি লইয়া পরের ট্রেনেই ফিরিয়া গেলেন এবং পরে আমাকে জানাইলেন যে, তিনি সতু সেনের নাগাল পাইতেছেন না। তিনি অবশেষে নিজেই একটি 'মাইকেল' লিখিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন। আমার শ্রীমধুসূদন এবং বিদ্যাসাগরের নকলে অনেকগুলি নাটক লেখা হইয়াছিল। কিন্তু, সে সব নাটকে নকল-নবিশী প্রতিভা ছাড়া অন্য প্রতিভা দেখা যায় নাই। অনেকে নির্লজ্জের মতো আমার সৃষ্টচরিত্র এবং আমার লেখা-সংলাপগুলিও আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। আরও অনেকের জীবনী লইয়া আমার নাটক লিখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু, চোরদের ভয়ে আর লিখি নাই। বর্তমান যুগেও থিয়েটার ও সিনেমার জগতে অনেক চোরের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। স্বদেশী, বিদেশী নানা নাটক মারিয়া নাট্যকার হইয়াছেন তাঁহারা। হায়, হায়।

আমার শ্রীমধুসূদন নাটক প্রথম অভিনয় করেন, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্ররা। তাহার পর, ডাক্তাররা। ডাক্তারদের অভিনয় অতি চমৎকার হইয়াছিল। আমি ভাগলপুর হইতে আসিয়া দুইটি অভিনয়ই দেখিয়াছিলাম। আমার শ্রীমধুসূদন রেডিওতেও অনেকবার অভিনীত হইয়াছে। অ্যামেচার থিয়েটারের দলও মাঝে মাঝে অভিনয় করিয়াছেন। এখনও করেন। চোরদের নাম ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। সাহিত্যজগতে সর্বত্রই চোরেরা বর্তমান। এ দেশে একটু যেন বেশি।

যদিও আমি প্রকাশ্যভাবে কোন রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত ছিলাম না, কিন্তু, রাজনীতির প্রভাব আমার মনে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। মনে মনে আমি কংগ্রেসী ছিলাম, মহাত্মা গান্ধীর উপর আমার শ্রদ্ধা ছিল, তবু, সে সময় খুব বড় আঘাত পাইয়াছিলাম, নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইলেন। তখন, কেমন যেন আবছাভাবে মনে হইল, মহাত্মাজী একটি অবাঙালী

দলের নেতা এবং সে দলে বাঙালীদের প্রভুত্ব চলিবে না। গান্ধীজির এই দলটিই পরে ভারতকে দুই ভাগ করিয়া ইংরেজদের নিকট হইতে স্বাধীনতা ভিক্ষা লইয়াছিলেন। এই দলই পরে গদিতে বসিয়া সীতারাম পট্টভিকে দিয়া যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস লিখাইয়াছেন, তাহাতে বাঙালী শহীদদের সম্মানের স্থান নাই। স্বাধীন গভর্ণমেন্টের অর্থানুকূল্যে যে সরকারী ইতিহাস লেখা হইয়াছে, তাহাতেও অগ্নিযুগের সম্মানজনক বিবরণ নাই—ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এই কারণে ওই ইতিহাসের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে থাকিতে চাহেন নাই। তিনি নিজে আলাদা একটি তথ্যপূর্ণ সত্য ইতিহাস লিখিয়াছেন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় তখন মনটা আচ্ছন্ন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু নেতাজীর প্রতি কংগ্রেসের এই দুর্ব্যবহারে মনটা প্রসন্নও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ আমাকে বারবার মানা করিয়াছিলেন—পলিটিকসে ঢুকো না। ওর ভিতর সাহিত্যিক টিকতে পারে না। আমি কিছুদিন ছিলাম। তখনই আমার শিক্ষা হয়ে গেছে।

না, পলিটিকসে আমি ঢুকি নাই। কিন্তু, তবু পলিটিকাল খবর মনকে বিচলিত করিত। কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইবার পরই সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গৃহবন্দী করিয়া রাখিলেন। ইহারই কাছাকাছি সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে, সুভাষচন্দ্র পুলিসের চোখে ধূলা দিয়া অন্তর্ধান করেন এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ঠিক আগে সজনীর একটি চিঠি পাইয়াছিলাম। সজনী লিখিয়াছে —রবীন্দ্রনাথ খুব অসুস্থ। আমাকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইতেছে। তুমি শীঘ্র কলিকাতায় চলিয়া এস। চিঠি পাইবার পরদিনই তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইলাম। সমস্ত দিন কোনও কাজ করিতে পারিলাম না। সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না। কি যে করিব, কি যে করা উচিত, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। ভোরের দিকে একটি কবিতা লিখিয়া 'প্রবাসী'তে পাঠাইয়া দিলাম, তাহার পর আর একটি লিখিয়া পাঠাইলাম 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। তাহার পর মনে পড়িল, রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে লইয়া যেন আমি একটা নাটক লিখি। কি লিখি ? আমার মনের মধ্যে যে নাটকটা রূপ-পরিগ্রহ করিল, তাহা লিখিতে হইলে পড়াশোনা করিতে হইবে। ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজের লাইব্রেরি বেশ বড়। কলেজের প্রিন্সিপালের সহিত দেখা করিয়া লাইব্রেরিটি ব্যবহার করিবার অনুমতি চাহিলাম। তিনি অনুমতি তো দিলেনই, একটি ভালো চেয়ার এবং টেবিলেরও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। হরলালবাবু তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন। ইংরাজির অধ্যাপক নিশানাথবাবুও আমাকে সাহায্য করিলেন অনেক। ল্যাবরেটরির কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া আমি লাইব্রেরিতে বসিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিলাম। উপকরণ সংগ্রহ করিতে তিন চার দিন লাগিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরই 'শনিবারের চিঠি'-র একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সেই সংখ্যায় 'অন্তরীক্ষে' নাম দিয়া এই একাঙ্ক নাটকটি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই নাটকে আমি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছিলাম।

ইহার ঠিক পরেই যে বৃহৎ ঘটনাটি আমার চিত্তকে বিচলিত করিয়াছিল—'সেটি বিয়াল্লিশের আন্দোলন; যাহার ইংরাজি নাম August Disturbance। Quit India প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পরই বৃটিশ সরকার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সকলকে জেলে পুরিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হইল, তাহা বিস্ময়কর। লোকেরা বহু জায়গায় রেল লাইন উপড়াইয়া ফেলিল। টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের তার কাটিয়া দিল। অনেক জায়গায় থানা আক্রমণ করিয়া তাহার উপর জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দিল। অনেক রেলওয়ে গুদামে লুটপাট শুরু হইল। গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি নষ্ট করিয়া গভর্ণমেণ্টকে অচল করিয়া দেওয়াই লক্ষ্য হইল এই আন্দোলনকারীদের। সাধারণ লোকদের উপর কেহ কিন্তু কোনরকম অত্যাচার করে নাই। গভর্ণমেণ্ট অবশ্য বেশিদিন নিষ্ক্রিয় রহিল না। রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ মিলিটারি অবতরণ করিল। সে সময় গ্রামে গ্রামে যে অত্যাচার শুরু হইল, তাহা অকথ্য। আমার 'অগ্নি' বইটিতে সে অত্যাচারের কিছু বর্ণনা আছে। আমি কোনও রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত ছিলাম না। কিন্তু, অনেক স্বদেশী বিহারী যুবক আমাকে শ্রদ্ধা করিত। তাহাদের মুখেই সব খবর পাইতাম। তাহারা রোজ রাত্রে আমার নিকট আসিয়া সব খবর দিয়া যাইত। সে সময় বাহিরের পৃথিবী হইতে আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। চিঠি নাই, কাগজ নাই। একমাত্র যোগাযোগ ছিল রেডিওর মাধ্যমে। তখন ব্রিটিশরা যুদ্ধে হারিতেছিল। সেই খবর রেডিওতে প্রচারিত হইত। সুভাষবাবুর বক্তৃতা শুনিব বলিয়া কিছুদিন আগে আমি একটি রেডিও কিনিয়াছিলাম। আমার রেডিও কেনার ইতিহাসটিও আশ্চর্য। বাজারে শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের শিশির মিউজিক হল ছিল। সেখানে তিনি রেডিও বিক্রি করিতেন। সন্ধ্যা হইতেই সেখানে রেডিও বাজিত। আমি প্রতিদিন রাত্রি নয়টার সময় তাঁহার দোকানে রেডিও শুনিতে যাইতাম। একদিন শিশিরবাবু বলিলেন—আপনি একটি রেডিও বাড়িতে লইয়া যান। আমি বলিলাম—এখন রেডিও কিনিবার পয়সা আমার নাই। একদিন আমি রেডিও শুনিয়া বাড়ি ফিরিতেছি, দেখিলাম, একটি লোক একটি রেডিও লইয়া আমার পিছু পিছু আসিতেছে। আমি বাড়ি পৌঁছাইতেই সেই লোকটি থামিল এবং বলিল—বাবু আপনার এখানে পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন শিশিরবাবুর সঙ্গে দেখা হইলে বলিলেন—আপনার কাছেই ওটা থাক। যখন খুশী, দাম দেবেন। প্রায় বছরখানেক পরে রেডিওর দাম দিয়াছিলাম। গভর্ণমেণ্ট সকলের রেডিও বাজেয়াপ্ত করিলেন। আমাদের সকলের রেডিও গভর্ণমেণ্ট অফিসে জমা দিয়া আসিতে হইল। বাহিরের কোনও খবর পাইবার উপায় আর রহিল না। তখন, আমি কতকগুলি কল্পিত খবর সৃষ্টি করিয়া সেগুলি বিহারী কংগ্রেসকর্মীদের দিতাম। তাহারা সেগুলি সাইক্লোস্টাইল করিয়া চতুর্দিকে বিতরণ করিত এবং ল্যাম্প-পোস্টে, পোস্টে সাঁটিয়া দিত। একটা খবর ছিল—Churchill has been shot dead. কিছুদিন এইরূপ করার পর, গভর্ণমেণ্ট আমাদের রেডিওগুলি ফেরৎ দিলেন। তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন,

সত্য খবরের পথ বন্ধ করিলে নানারকম মিথ্যা গুজব শহরে ছড়াইয়া পড়িবে এবং তাহাতে ভালো ফল হইবে না।

আমরা তখন পটলবাবুর ছোট বাড়িটি ছাড়িয়া পটলবাবুর বাড়িতেই ভাড়াটে হিসাবে উঠিয়া আসিয়াছি। কিছুদিন আগে পটলবাবু মারা গিয়াছিলেন। আমার ছোট কন্যা করবীর ছোট বাড়িতেই জন্ম হইয়াছিল। বাড়িটি বড়ই ছোট ছিল, আমার সংসার বড় হইতেছিল। চারিটি সন্তান, ভাইরা থাকিত, তা ছাড়া বাবা মা আসিতেন, অভ্যাগতরাও আসিতেন। আমার ওই ছোট বাড়িতেই অনেক সাহিত্যিকের পদধূলি পড়িয়াছে। মোহিতলাল মজুমদার, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ওই বাসায় গিয়াছিলেন। সজনী তো প্রায়ই যাইত, অনেক সময় সপরিবারে। ব্রজেনদাও সপরিবারে একবার আসিয়াছিলেন। বিভূতিবাবুও (শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়)—এই ছোট বাড়িতেই আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। ওই ছোট বাড়িতেও লীলা একা হাতে অনেক ঝঞ্ঝাট সামলাইয়াছে। এমন সময় খবর পাইলাম —নিরুপমবাবুর একটি বড় বাড়ি খালি আছে। বাড়িটির সামনে প্রকাণ্ড মাঠ। দেখিয়া পছন্দ হইল, চলিয়া গেলাম। সেখানেই কয়েকমাস ছিলাম। কিন্তু, বাড়িওয়ালার সহিত বনিল না। শুনিলাম, পটলবাবুর বড় বাড়ির নীচের তলাটা নাকি ভাড়া দেওয়া হইবে। তখন, সেই বাড়িতেই চলিয়া গেলাম। আগস্ট-আন্দোলনের সময়ে আমরা পটলবাবুর বড় বাড়িতেই ছিলাম। অনেক সুবিধাই হইয়াছিল, কারণ, পটলবাবু আমাকে ল্যাবরেটরি করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ঠিক তাঁহার বাড়ির পাশেই। ল্যাবরেটরিটিকে আমি বৈঠকখানার মতো ব্যবহার করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পর সেইখানেই বসিয়া লিখিতাম। এই সময় আমি 'রাত্রি' লিখিয়াছি, 'বিদ্যাসাগর' লিখিয়াছি, 'আহবনীয়' বলিয়া কয়েকটিও এই সময় লিখিয়াছিলাম দেশের যুবকদের উদ্দেশ্যে। শনিবারের চিঠিতে এই সময় 'ভূয়োদর্শন'ও লিখিতেছিলাম প্রতিমাসে। এই সময় আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। যখন 'বিদ্যাসাগর' লিখিতেছি, তখন হঠাৎ একদিন বন্ধু প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত আসিয়া হাজির। সে তখন একজন ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার। অথচ সাহিত্য-রসিক। সে আসিয়া বলিল, 'বলাইদা, আপনি শ্রীমধুসূদন 'ভারতবর্ষে' লিখেছেন, এটা কিন্তু প্রবাসীতে দিতে হবে।' বলিলাম,—'আমার আপত্তি নেই। কিন্তু 'প্রবাসী' কি নেবেন এ লেখা? তাঁরা না চাইলে আমি দেব না। চাইলে নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু পারিশ্রমিকও চাই।' প্রদ্যোৎ বলিল, 'আমি রামানন্দবাবুকে চিঠি লিখেছি। তিনি তোমাকে পত্র দেবেন।'

প্রদ্যোৎ চলিয়া গেল। আমি বিদ্যাসাগর লিখিতে লাগিলাম এবং প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, কবে রামানন্দবাবুর চিঠি আসিবে। আমার লেখা শেষ হইয়া গেল, তবু রামানন্দবাবুর চিঠি আসিল না। বিদ্যাসাগর লিখিবার পূর্বে সজনীকান্তের কাছে বিদ্যাসাগর-সম্পর্কিত কিছু বই লইয়াছিলাম। সজনী একটি পত্রে জানিতে

চাহিল—বই কতদূর লেখা হইল ? উত্তর দিলাম, বই শেষ হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সজনীর উত্তর পাইলাম—সাতদিনের মধ্যেই আমি ভাগলপুর যাইব। বইটি শুনিয়া আসিব। তাহার পর চিঠি পাইলাম—আমি ভোর চারটের ট্রেনে ভাগলপুর পৌছিব। সাড়ে চারটে হইতে বইটি শুনিব। সেইদিনই সকালের ট্রেনে ফিরিব। তুমি প্রস্তুত থাকিও। নির্দিষ্ট দিনে ভোরে স্টেশনে গিয়া সজনীকে লইয়া আসিলাম। এক কাপ চা খাইয়া ল্যাবরেটরিতে গিয়া 'বিদ্যাসাগর' পড়া শুরু হইল। শেষ হইল সাড়ে আটটা নাগাদ। সজনী সঙ্গে সঙ্গে পকেট হইতে একশত টাকা বাহির করিয়া বলিল—চমৎকার হয়েছে। এটা আমি শনিবারের চিঠিতে ছাপব। এই নাও সামান্য প্রণামী।

পাণ্ডুলিপি লইয়া সজনী চলিয়া গেল। ঠিক তাহার দুইদিন পরেই রামানন্দ-বাবুর চিঠি পাইলাম। তিনি নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাই সময়মতো পত্র দিতে পারেন নাই। লিখিয়াছেন, আমি যেন বিদ্যাসাগর নাটকটি অবিলম্বে পাঠাইয়া দিই। মুশকিলে পড়িয়া গেলাম। পাখি তো উড়িয়া গিয়াছে। তখন আমি ক্লিফোর্ড ব্যক্সের পোয়েটেস্‌টার্স অব ইস্পাহান বইটি পড়িতেছিলাম। ওটি একটি চমৎকার একাঙ্ক নাটক। এটির ভাবানুবাদ করিবার ইচ্ছা হইতেছিল। অবিলম্বে শুরু করিয়া দিলাম। রামানন্দবাবুকে জানাইলাম, আপনার চিঠি না পাইয়া 'বিদ্যাসাগর' অন্যত্র দিয়াছি। তবে, অন্য একটি বিদেশী একাঙ্ক নাটকের ভাবানুবাদ করিতেছি, সেটি যদি আপনি ছাপেন, পাঠাইয়া দিব। তিনি উত্তর দিলেন —ছাপিব, পাঠাইয়া দাও। 'কবয়ঃ' বইটি কিছুদিন পরে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্বে 'শনিবারের চিঠি'র জন্য আমি মাঝে মাঝে 'একাঙ্ক' নাটক লিখিতেছিলাম। একঘেয়ে ব্যঙ্গকবিতা লিখিতে লিখিতে আর ভালো লাগিতেছিল না। এই নাটকগুলি পরে 'দশ ভান' নামে প্রকাশিত হয়। বইটির নামকরণ করেন পরশুরাম রাজশেখর বসু মহাশয়। পরশুরামের প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার কল্পনা, তাঁহার অঙ্কিত সমসাময়িক সমাজের নিখুঁত চিত্র, তাঁহার গল্পের গঠন-পারিপাট্য, তাঁহার হিউমার, তাঁহার ব্যঙ্গ, তাঁহার লেখায় বিজ্ঞানী, বিদগ্ধ শিল্পীমনের সমন্বয় বাঙালী রসিকমহলে সাড়া তুলিয়াছিল। আমি যখনই কলিকাতায় আসিতাম, তাঁহার বকুলবাগানের বাড়িতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতাম। তাঁহার সহিত খুব একটা হৃদ্যতা হইয়াছিল। তিনি আমাকে অনেক চিঠি লিখিয়া-ছিলেন; চিঠিগুলির অধিকাংশই হারাইয়া গিয়াছে। কয়েকটি চিঠি বোধহয় কুমারেশ তাহার 'যষ্টিমধু' কাগজে প্রকাশ করিয়াছিল। আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া একটি কবিতাও লিখিয়াছিলেন তিনি। সে কবিতাটিও হারাইয়াছি। কবিতাটির প্রথম লাইন ছিল—'হে ডাক্তার, চিরিয়াছ বহু কলেবর' এবং শেষের খানিকটা—

বঙ্কিম ডেপুটি যথা রবি জমিদার
তেমনি ভিষক্ তুমি বিধির বিধানে

নেশা ভয় মানিল না পেশার বাঁধন
বনফুল দিল চাপা বলাই ডাক্তারে।

রাজশেখর বসুর বন্ধু বিখ্যাত চিত্রকর যতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ও আমার 'আকাশবাণী' নামক ব্যঙ্গ-কবিতাটি পড়িয়া দুইটি নর্তকীর ছবি আঁকিয়া আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। ছবি দুটির নাম আমারই রচনার একটি ছত্র 'এ ছাড়া বাজারে মাল নাই'—ছবি দুটি বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলাম, এখনও আমার কাছে আছে। নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আর বেশিদিন থাকিবে না।

এই সময়ে ভাগলপুরে ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় আসিয়াছিলেন। তিনি আমার 'মাস্টারমশাই'। তিনি বগুড়ায় সিভিল সার্জন ছিলেন। এখান হইতে রিটায়ার করিয়া ভাগলপুরে আসিয়া থাকিবেন ঠিক করিয়াছেন। আমি যেন তাঁহার জন্য একটি বাসা ভাড়া করিয়া রাখি। আমি ভাগলপুরে আছি—এইটাই তাঁহার ভাগলপুরে আসিবার প্রধান কারণ। আমি তাঁহার জন্য ভাগলপুরের আদমপুর মহল্লায় গোলকুঠি নামক বাড়িটি ভাড়া করিলাম। বাড়ির মালিক ছিলেন শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসুর ভাইপো। তিনি দিল্লীতে থাকিতেন। প্রেমসুন্দরবাবু থাকিতেন ভাগলপুরে। তিনি আমার কাকাবাবুর সহপাঠী ছিলেন। আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তাঁহার নিকট হইতেই আমি বনবিহারীবাবুর জন্য বাড়িটি ভাড়া করিলাম।

ইহার পরই গভর্ণমেন্ট একটি 'ইমারজেন্সি' চালু করিলেন। কোনও বাড়ি ভাড়া লইতে গেলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুম লইতে হইবে। ম্যাজিস্ট্রেটের বিনা হুকুমে কোনও বাড়ি ভাড়া লওয়া যাইবে না। কাপড়ের বেলাতেও এই ইমারজেন্সি বিপদ বিস্তার করিয়া ক্রেতাদের সম্মুখীন হইল। নিয়ম হইল—গভর্ণমেণ্ট যে দোকান নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, সেই দোকান হইতেই কাপড় কিনিতে হইবে। এই দুর্গতি আমাদের বেশ কিছুদিন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এই সময় আমার মা অসুখে পড়িলেন। পেটের অসুখ। সে অসুখ আমরা কিছুতেই সারাইতে পারি নাই। অনেক বড় বড় ডাক্তার, কবিরাজ তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য ভাগলপুর আনিয়াছিলাম। মা যখন খুব অসুস্থ, তখন আমার জীবনেও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল।

ঘটনাটি শুধু উল্লেখযোগ্যই নয়, একটু বিস্ময়করও। গোড়া হইতে বলিতেছি। একদিন প্রেমবাবু আমার ল্যাবরেটরিতে আসিয়া বলিলেন—'আমার ভাইপো গোলকুঠি বাড়িটি বিক্রি করে দিতে চায়। সে দিল্লীতে বাড়ি করেছে। এখানে সে বাড়ি রাখবে না, তার টাকারও দরকার। তুমি একজন খরিদ্দার দেখ। আমরা একজন ভদ্রলোক খরিদ্দার চাই। আমার বাবা, মা ওই বাড়িতে বাস করেছিলেন। সুতরাং, যাকে-তাকে আমরা বাড়ি বিক্রি করব না। লোকটি ভদ্রলোক হওয়া চাই। তোমার কাছে তো অনেক লোক আসেন, তুমি একটু চেষ্টা কর।' আমি প্রতিশ্রুতি

দিলাম, করিব। করিলামও। কিন্তু, তাঁহাদের মনোমত খরিদ্দার পাওয়া গেল না। প্রেমবাবু তখন বলিলেন, 'তুমিই বাড়িটা কিনে ফেল।'

আমি বলিলাম—'আমার ব্যাংক-ব্যালান্স তো প্রায় নিল (Nil), যা রোজগার করি, সব খরচ হয়ে যায়। কিছু জমাতে পারি নি। তা ছাড়া আপনাদের হাতা-ওলী বাড়ি। সেখানে আর একটি বাড়িও আছে। জমি প্রায় দেড়-বিঘা। ও বাড়ি কেনবার সামর্থ্য আমার নেই। ও বাড়ির দাম কত?'

প্রেমবাবু বলিলেন—'আমি আমার ভাইপোকে চিঠি লিখছি। তারপর তোমাকে জানাব—।'

দিনদশেক পড়ে তিনি আবার আসিলেন এবং আমাকে তাঁহার ভাইপোর চিঠি দেখাইলেন। তাঁহার ভাইপো-ও ডাক্তার। তিনি লিখিয়াছেন—'বনফুল যদি এ বাড়ি কেনেন, তা হলে আমি পনেরো হাজার টাকা পেলেই তাঁকে দিয়ে দেব। ওই টাকাই আমার দরকার। তবে দাম কেবল বনফুলের জন্য। তিনি যদি না কেনেন, তবে যে ক্রেতা সর্বোচ্চ মূল্য দেবে, তাকেই বিক্রি করবেন।'

প্রেমবাবু বলিলেন—'একজন মাড়োয়ারি পঁচিশ হাজার টাকা দিতে চাইছে। কিন্তু, তুমি যদি কেন, আমি তোমাকেই পনেরো হাজার টাকায় দেব। তুমি কিনে ফেল—'

'ধার করেও কেন। দেড় বিঘে জমিশুদ্ধ দুখানা বাড়ি এত সস্তায় আর কখনও পাবে না। তোমাকে যখন এখানে থাকতেই হবে, তখন নিজের বাড়ি থাকা ভালো। তুমি ধার কর।'

আমি বলিলাম. 'আপনি তা হলে দিন পনেরো অপেক্ষা করুন। আমি কলকাতায় গিয়ে আমার প্রকাশকদের জিজ্ঞাসা করি, তারা টাকা দিবে কিনা।' পরদিন কলিকাতায় চলিয়া গেলাম এবং সজনীর বাড়িতে উঠিলাম। সজনী মাঝে একবার ভাগলপুরে গিয়াছিল এবং বনবিহারীবাবুর সহিত দেখা করিবার জন্য গোলকুঠিতে গিয়াছিল।

সজনী বলিল—'ও বাড়ি তোমাকে কিনতেই হবে। চমৎকার বাড়ি। তুমি তোমার প্রকাশকদের সঙ্গে কথা বল—'

প্রকাশকদের কাছে গিয়া খোঁজ করিয়া জানিলাম, তাহাদের নিকট ছয় হাজার টাকা আমার পাওনা আছে। আরও নয় হাজার টাকা ধার করিতে হইবে। একজন ধনী প্রকাশক (নামটা আর করিব না) বলিলেন—শুধু নয় হাজার কেন, পুরা পনেরো হাজার টাকাই তিনি দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু, একটি শর্তে। ভবিষ্যতে তাঁহাকে ছাড়া আমি আর কোনও প্রকাশককে বই দিতে পারিব না। তিনিই আমার গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ সব ছাপিবেন। রয়ালটি দিবেন ৩৩⅓%। তিনি তাঁহার শর্তটি Stamped Paper-এ টাইপ করিয়া লিখিয়া দিলেন এবং আমাকে বলিলেন, ইহাতে সই করিয়া দিলে আমি সব টাকা দিয়া দিব। সজনীকে দলিলটি

দেখাইলাম। সজনী বলিল—এ শর্তে তুমি রাজি হইও না। নয় হাজার টাকা যতদিন না শোধ হয়, ততদিন তুমি ওই শর্তে আবদ্ধ থাকিতে পার, কিন্তু, টাকা শোধ হইয়া যাইবার পর আর বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। প্রকাশক ভদ্রলোক কিন্তু এ শর্তে রাজি হইলেন না। সজনী বলিল, তুমি ভেব না, টাকা আমি জোগাড় করে দেব। শেষ পর্যন্ত সজনীই টাকাটা দিয়াছিল, একটি ব্যাঙ্ক হইতে ধার করিয়া। সজনীর সে ধার আমি বই দিয়া শোধ করিয়াছিলাম।

এই বাড়িকেনা আমার জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইহার জন্য আমি কয়েকটি সমস্যারও সম্মুখীন হইলাম।

প্রথম, আমার মাস্টারমশাই বনবিহারীবাবুর সহিত আমার একটু মনোমালিন্য হইয়া গেল। আমি অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার বাড়িওয়ালা হইয়া গেলাম, ইহাতে তিনি খুশীই হইয়াছিলেন প্রথমে। কিন্তু আমার মা জেদ ধরিয়া বসিলেন—আমি তোর বাড়িতে যাব। বাড়ি যখন কিনেছিস, তখন সেইখানেই আমাকে নিয়ে চল। খুব জেদ করিতে লাগিলেন তিনি। তখন আমি বনবিহারীবাবুকে গিয়া সব খুলিয়া বলিলাম। বনবিহারীবাবু একটু অসন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন—তা হলে কোথায় যাব? হঠাৎ বাড়ি কোথায় পাই। আমি বলিলাম—আমি আপনাকে বাড়ি খুঁজিয়া দিতেছি। আগেই বলিয়াছি, তখন বাড়ি পাওয়া শক্ত ছিল। সব বাড়ি গভর্ণমেন্টের দখলে। তাঁহারা ছাড়পত্র না দিলে বাড়ি পাইবার উপায় নাই। আমি একদিন গিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিয়া সব খুলিয়া বলিলাম। আমি যে বাড়িটি কিনিয়াছিলাম, তাহার নিকটেই একটি খালি পাকা বাড়ি ছিল। আর, তাহার পাশেই ছিল কয়েকটি খোলার ঘর। মাস্টারমহাশয়ের জন্য পাকাবাড়িটি চাহিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট আমার আবেদন মঞ্জুর করিলেন। মাস্টারমশাইকে আসিয়া খবর দিলাম, আমার বাড়ির কাছেই গঙ্গার ঠিক উপরে আপনার জন্তে একটি বাড়ি ঠিক করিয়াছি। মাস্টারমশাই বলিলেন—ধীরেনবাবুকে লইয়া আজ বাড়িটি দেখিয়া আসিব। ধীরেনবাবু মাস্টারমশাইকে লইয়া গিয়া সেই খোলার ঘরগুলি দেখাইয়া বলিলেন—বলাইবাবু আপনার জন্তে এই ঘরগুলি ঠিক করেছেন! মাস্টারমশাই ক্রোধান্ধ হইলেন। আমাকে হঠাৎ জানাইলেন—আমি এখানে থাকব না। বৌশিতে (মন্দার হিল) বাড়ি পেয়েছি। সেখানেই চলে যাচ্ছি। আমি তাড়াতাড়ি গেলাম তাহার কাছে।

'আপনি বাড়িটা দেখে এসেছেন?'

'এসেছি। ও বাড়িতে আমি থাকতে পারব না—।'

তিনি যে খোলার ঘরগুলি দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা আমার কল্পনাতীত ছিল।

বলিলাম—'ওর চেয়ে ভালো বাড়ি তো এখন খালি নেই—'

'আমি থাকব না এখানে। যেদিন তুমি এ বাড়ি কিনেছো, সেই দিনই বুঝেছি, আমার এখানকার চাকরি গেল।'

সহসা তাঁহার দুইচক্ষু জলে ভরিয়া গেল। আমি নির্বাক হইয়া রহিলাম। কয়েক দিন পরেই মাস্টারমশাই চলিয়া গেলেন।

মাকে লইয়া সন্ত-ক্রীত বাড়িতে আসিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু বিধাতার অন্যরূপ ইচ্ছা ছিল। মা এত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহাকে আনা সম্ভবপর হইল না। মা তখন আমার ভাই ভোলার কাছে বরারিতে ছিলেন। তাঁহার কবিরাজি চিকিৎসা হইতেছিল। চিকিৎসা করিতেছিলেন আজিমগঞ্জের কবিরাজ অনাথনাথ রায়। তাঁহার চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। মা বরারিতেই মারা গেলেন। মা যখন মারা গেলেন, তখন আমি তাঁহার মাথার শিয়রে বসিয়াছিলাম। মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে যে অদ্ভুত অনুভূতিটা হইয়াছিল, তাহা এখনও আমার মনে আছে। মনে হইয়াছিল, আমার বুকের ভিতর হইতে কে যেন কি একটা উপড়াইয়া লইয়া গেল। মা আমার ভাগ্যবতী ছিলেন, পুণ্যবতীও ছিলেন। অমন পবিত্র, উজ্জ্বল, শাণিত চরিত্র বড় একটা দেখা যায় না। তিনি স্কুলে বা কলেজে কখনও পড়েন নাই। সামান্য বাংলা জানিতেন। তাঁহার বয়স যখন এগারো বছর, তখনই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তখনই তিনি মণিহারী গ্রামে আসিয়া সংসারের হাল ধরিয়াছিলেন। সারাজীবন সুনিপুণ ধৈর্যের সহিত তিনি আমাদের সংসার-তরণীকে পরিচালনা করিয়াছেন। নিষ্ঠাবতী ধর্ম-প্রাণা হিন্দু রমণী ছিলেন। জগদ্ধাত্রী দেবী তাঁহার ইষ্টদেবতা ছিলেন। মনে হয়, কিছু অসাধারণ শক্তিলাভ করিয়াছিলেন তিনি। দুই একটি ঘটনা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। কেয়ার বয়স যখন পনেরো বছর তখন তাহার টাইফয়েড হইয়াছিল। ভাগলপুরের সিভিল সার্জন বিমলবাবু তাহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। ভাগলপুরের অন্যান্য বড় ডাক্তাররাও প্রত্যহ আসিয়া তাহার খবর লইত। কিন্তু, কেয়ার অসুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে কনভালশান শুরু হইল। খবর পাইয়া মা কেয়াকে দেখিতে আসিলেন। আসিয়া কেয়ার বিছানায় বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। তাহার পর যাওয়ার সময় আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন—তুই ভাবিস না বাবা। কেয়া ভালো হয়ে যাবে। আমি বলিলাম—এত বড় বড় ডাক্তাররা হতাশ হয়ে পড়েছেন, তুমি আশা দিচ্ছ কেমন করে? মা উত্তর দিলেন—'আমি তো জীবনে কোনও পাপ করিনি, আমি বেঁচে থাকব আর তোর মেয়ে মরে যাবে? এত বড় শাস্তি ভগবান আমাকে কেন দেবেন? দেখিস, ঠিক ও সেরে উঠবে।'

তার পর দিনই কেয়ার জ্বর কমিয়া গেল, কনভালশান বন্ধ হইল। কয়েক দিনের মধ্যেই ভালো হইয়া গেল সে।

মা ভাদ্রমাসে মারা গিয়াছিলেন। ভাদ্রের ভরা গঙ্গার জলে মাকে বিসর্জন দিয়া আসিলাম। শ্রাদ্ধের দিন আর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। মা গরীব দুঃখীকে খাওয়াইতে ভালোবাসিতেন। সে জন্য আমি কাঙালী-ভোজনের আয়োজন করিয়া-

ছিলাম। আমার বাড়ির পাশেই যে রাস্তাটি ছিল সেই রাস্তাটি মিউনিসিপালিটিকে বলিয়া দুদিক বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল, সেখানেই কাঙালীদের বসাইয়া খাওয়াইব। দুই মণ চাল-ডালের খিচুড়ি, তদপযুক্ত তরকারি, ভাজা, মিষ্টান্ন, দই-এর ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কিন্তু, তখন বর্ষাকাল। দুপুরের পর হইতেই আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল। আমি মনে মনে প্রমাদ গণিলাম। যদি বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া যায়, কাঙালীরা খাইবে কি করিয়া? অন্য পাড়া হইতে কয়েকজন আসিবে বলিয়াছিলেন পরিবেশন করিবার জন্য। তাঁহারাও কেহ আসিলেন না। আমি ঠিক করিলাম—কাঙালীদের বসাইয়া আমরাই পরিবেশন আরম্ভ করিয়া দিই। তাহার পর যাহা হইবার তাহা তো হইবেই। খাওয়ানো শুরু হইল। একটু পরে অন্য পাড়া হইতে যাহাদের আসিবার কথা ছিল, তাঁহারা আসিলেন। দেখিলাম তাঁহারা আপাদমস্তক ভিজিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন—চারদিকে প্রচুর বৃষ্টি হইতেছে। এখানে বৃষ্টি নাই ইহা তো বড় আশ্চর্য। যতক্ষণ কাঙালীভোজন হইল ততক্ষণ একফোঁটা বৃষ্টি পড়ে নাই। আকাশ থমথমে হইয়া রহিল, বৃষ্টি নাবিল না। তুমুল বৃষ্টি নামিল কাঙালী ভোজন শেষ হইবার পর। ঘটনাটা হয়তো কাকতালীয়বৎ কিন্তু ইহা আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

মাকে লইয়া নতুন বাড়িতে আসিতে পারিলাম না। বাড়িতে রান্নাঘরটি ভালো ছিল না। ঠিক করিলাম এই দুইটি করিয়া তবে গৃহে প্রবেশ করিব। তখন সিমেণ্ট ইঁট সবই দুর্লভ। গভর্ণমেণ্টের পারমিট ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় যিনি পি. ডব্লিউ-ডির কর্তা ছিলেন, তিনি ছিলেন আমার লেখার খুব ভক্ত। তিনিই আমার পারমিট জোগাড় করিয়া দিলেন। আমি আরও কিছু টাকা কর্জ করিয়া গৃহসংস্কারে লাগিয়া পড়িলাম।

এই বাড়ি প্রসঙ্গে একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। ঘটনাটি আশ্চর্যজনক। যখন আমার মনে বাড়ি কিনিবার কোনও কল্পনাও ছিল না, যখন প্রেমসুন্দরবাবু আমার নিকট আসিয়া বাড়ি বিক্রয় করিবার প্রস্তাবও করেন নাই তখন আমার ল্যাবরেটরিতে একজন পাঞ্জাবী সাধু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন একদিন। গেরুয়া আলখাল্লাপরা পাগড়িধারী বিশালকায় পুরুষ একজন। বলিলেন—আপনার ভাগ্যগণনা করিতে চাই।

বলিলাম—আপনার দক্ষিণা কত?

এক টাকা।

এ বিষয়ে আমার কৌতূহল ছিল। রাজি হইলাম।

তিনি বলিলেন—একটি ফুলের নাম করুন।

করিলাম।

আপনার হাতটা দেখান এবার।

দেখাইলাম।

তাহার পর আমার নাকের কাছে নিজের হাতটা রাখিয়া পরীক্ষা করিলেন, কোন্ নাসারন্ধ্র দিয়া বায়ু বেশী বাহির হইতেছে। তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাগজে কি অঙ্ক কষিলেন। তাহার পর বলিলেন—ঠিক এক বৎসরের মধ্যে আপনার একটি বাড়ি হইবে। বাড়ির সহিত কিছু জমিও থাকিবে। তাঁহার এই অসম্ভব ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া মনে মনে হাসিলাম এবং তাঁহাকে একটি টাকা দিয়া বলিলাম—আপনি যাহা বলিলেন তাহা অসম্ভব। কারণ বাড়ি কিনিবার মতো টাকা আমার নাই। এক বৎসরের মধ্যে হইবে এ আশাও নাই। তিনি টাকাটা লইলেন না। বলিলেন, আপনি যেদিন গৃহ-প্রবেশ করিবেন সেইদিন আসিব এবং সেইদিন টাকা লইব। তাহার পর নানারকম আশ্চর্য যোগাযোগে সত্যই আমি বাড়ি কিনিলাম এবং যেদিন গৃহ-প্রবেশ করিব ঠিক করিয়াছি, ঠিক তাহার আগের দিন জ্যোতিষী আবার আমার ল্যাবরেটরিতে আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলাম—'আপনার ভবিষ্যৎবাণী ফলিয়াছে। কি প্রণামী দিব, বলুন ?'

তিনি বলিলেন—আপনার বাড়িটি দেখিব। তাঁহাকে লইয়া গিয়া বাড়িটি দেখাইলাম। বাড়ির গেট ছিল দক্ষিণ দিকে। তিনি বলিলেন—দক্ষিণ দুয়ার যমের, সুতরাং এ গেট বন্ধ করিয়া বাড়ির পশ্চিম দিকে গেট করিতে হইবে। তাহার পর বাড়ির চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন। এ বাড়িতে একটি 'জিন' অর্থাৎ ভূত আছে। দুষ্ট ভূত নয়, ভদ্র ভূত। তাহাকে বিদায় না করিলে এ বাড়িতে টিকিতে পারিবেন না। আমি সব ব্যবস্থা করিব। আপনি কাল সকালে আমার জন্যে এক বাটি দুধ ও একটি আ-ছোলা নারিকেল কিনিয়া রাখিবেন। আমি খুব ভোরে আসিয়া পূজা-পাঠ করিব। পরদিন খুব ভোরে আসিয়া তিনি ছাদের চিলেকোঠায় গিয়া বসিলেন। এক জামবাটি দুধের ভিতর সেই গোটা নারিকেলটি বসানো হইল। তিনি চক্ষু বুঁজিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাহার পর আমাকে ও আমার স্ত্রীকে বলিলেন, আপনারাও আমার পাশে বসিয়া মনে মনে সেই 'জিন'কে অনুরোধ করুন, তিনি যেন এ বাড়ি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যান। এবং তিনি যখন চলিয়া যাইবেন, তখন যেন এমন কিছু করিয়া যান যাহাতে আমরা বুঝিতে পারি, তিনি চলিয়া গেলেন। আমরা তিনজনই পাশাপাশি চোখ বুঁজিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। একটু পরেই অলৌকিক ঘটনাটি ঘটিল। জামবাটির দুধটা টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। নারিকেলটি মাটিতে পড়িয়া গেল। সত্যই ব্যাপারটি বিস্ময়কর। ঠাণ্ডা দুধ যে অমন টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে, তাহা সত্যই কল্পনাতীত ছিল। জ্যোতিষী বলিলেন, 'জিন' চলিয়া গেলেন। এবার আপনারা স্বচ্ছন্দে এখানে বসবাস করুন। জ্যোতিষীকে আমি পঁচিশটি টাকা দিয়া প্রণাম করিলাম।

নতুন বাড়িতে আসিয়া কিন্তু কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হইলাম। ল্যাবরেটরি হইতে বাড়ির দূরত্ব প্রায় এক মাইলের কাছাকাছি। চারবার যাতায়াত করিতে

হইত। কখনও হাঁটিয়া যাইতাম, কখনও রিক্সায়, কখনও ঘোড়ার গাড়িতে। ঘোড়ার গাড়ি সব সময় পাওয়া যাইত না। বাজারও কাছে পিঠে তেমন ছিল না। সুজাগঞ্জ বাজারে রোজ যাইতে হইত। খরচ এবং অসুবিধা দুইই বাড়িল।

দ্বিতীয়, আমি বাড়ি কিনিয়াছি বলিয়া অনেকের চক্ষু টাটাইল। বিহারীদের নয়, বাঙালীদের। অনেক তথাকথিত বন্ধুদের আচার-আচরণে, কথা-বার্তায় তাহা প্রকাশ হইতে লাগিল। একটা ঈর্ষার আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া গেলাম। অনেক দেঁতোহাসি এবং মেকি অভিনন্দনের সম্মুখীন হইতে হইল।

আগেই বলিয়াছি, আমার বড় বাড়ির পাশে আর একটি ছোট বাড়ি ছিল। সে বাড়িতে ভাড়াটে ছিল একজন। বাড়ি কিনিবার সময় তাঁহাকে আমি আশ্বাস দিয়াছিলাম, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে তাঁহাকে আমি উঠাইব না। কিন্তু যাতায়াতের অসুবিধা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বর্ষাকালে অনেক সময় ল্যাবরেটরিতে যাইতে পারিতাম না। তখন ঠিক করিলাম, ওই পাশের বাড়িতেই আমার ল্যাবরেটরি করিব। ভদ্রলোককে নোটিশ দিলাম। তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন। অবশেষে যখন উঠিয়া গেলেন, তখন বাড়ির উঠানে যে ফলন্ত লেবুগাছটি ছিল, তাহার শিকড় কাটিয়া গাছটিকে নিধন করিয়া গেলেন। এবং আরও এমন সব কাণ্ড করিলেন, যাহার জন্য তাঁহার সহিত কলহ হইয়া গেল। মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল।

অবশেষে ল্যাবরেটরি বাড়িতে তুলিয়া আনিলাম। বাবা মানা করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার মানা আমি শুনি নাই। প্রত্যহ চারবার যাতায়াত করিয়া আমার মানসিক প্রশান্তি নষ্ট হইতেছিল, আমি লিখিতে পারিতেছিলাম না। তবু, রোজ রাত্রে যতটা পারিতাম, লিখিতাম। বাধ্য হইয়া লিখিতে হইত, কারণ ঋণ করিয়াছিলাম, তাহা যত শীঘ্র সম্ভব, শোধ করিতে হইবে। খুব ভোরে উঠিয়াও লিখিতাম। 'অগ্নি' বইটা ভোরে উঠিয়াই লিখিয়াছিলাম। এই বইটি লিখিতে কিছু পড়াশোনাও করিতে হইয়াছিল। এইসব কারণে ল্যাবরেটরি বাড়িতেই তুলিয়া আনিলাম। তাহাতে কিন্তু আর একটি অসুবিধে ক্রমশঃ দেখা দিতে লাগিল। আমার এই ল্যাবরেটরিতেও রোগী ভালই আসিত। ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিশ-নির্ভর, প্র্যাকটিশিং ডাক্তারদের উপর। তাঁহারা 'কেস' পাঠাইলে তবেই আমি 'কেস' পাই। কিন্তু, যেদিন আমার 'মন্ত্রমুগ্ধ' নাটকটি নিউ থিয়েটার্স লইবে বলিয়া স্থির করিল এবং আমাকে নগদ ছয় হাজার টাকা দিয়া গেল, সেইদিনই আমার সতীর্থ বাঙালী ডাক্তারদের সহানুভূতি আমি হারাইলাম। আমার রোগীর সংখ্যা কমিতে শুরু করিল। কিছু দরিদ্র রোগীকে আমি বিনা পয়সায় দেখিতাম। অনেকের ঔষধও বিনামূল্যে দিতাম। তাহারা অবশ্য আমাকে ছাড়িল না। আমি লিখিবার বেশি সময় পাইলাম এবং এই সময়ে লেখাপড়া লইয়াই থাকিতাম। লেখার চাহিদাও ক্রমশঃ বেশ বাড়িতে লাগিল। তাগাদার তাড়াতেই আমি এত লেখা লিখিয়াছি। তাগাদা না থাকিলে লিখিতাম না। আমার মনে হয়, সব লেখকের পক্ষেই বোধহয় এ কথা সত্য।

কিছুদিন পরে শুনিলাম, আমার ল্যাবরেটরির কাছেই আর একজন ডাক্তার ল্যাবরেটরি খুলিয়া বসিয়াছেন। তিনি যথারীতি ব্যবসায়িক রীতি অনুসারে ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। সুতরাং, আমার রোগীর সংখ্যা আরও কিছু কমিল। আমার নকল বন্ধুদের মেকিত্ব ক্রমশঃ বেশী প্রকট হইয়া পড়িল। ডাক্তারদের মধ্যে আমার প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু ছিলেন ক্ষিতিশবাবু। কিন্তু, তিনি কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছিলেন। আমার আর একটি বন্ধু, ডাক্তার মহীউদ্দিন আহমেদ। সে মুসলমান এবং বিহারী। আমার সহপাঠী ছিল। সে আমাকে বরাবর 'কেস' পাঠাইত। তাহার মতো বন্ধু ভাগলপুরে আমার বেশি ছিল না। একটা সত্য কথা না বলিয়া পারিতেছি না, ভাগলপুরে বিহারীদের এবং অন্য অবাঙালীদের নিকট আমি যে আন্তরিক ভালোবাসা পাইয়াছিলাম, বাঙালীদের নিকট হইতে তাহা পাই নাই। বাঙালীরা আমার খ্যাতির জন্য আমাকে কিছু খাতির করিত, কিন্তু, আমাকে বেশি ভালোবাসিত বিহারীরা। ভাগলপুরের ফটোগ্রাফার হরি কুণ্ডু এবং আনন্দ প্রেসের মালিক রাম আওতার আজও আমার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছে। আরও আছে অনেক কুলি, মুটে, মজুর, রিকসাওলা, মেছো, মেছুনি, দোকানদাররা। ইহারা আমার সাহিত্যের আস্বাদ পায় নাই, তবু কেন যে ভালোবাসিত আমাকে, তাহা জানি না। ইহাদের অনেকের কথা পরে আমি আমার 'হাটে বাজারে' গ্রন্থে লিখিয়াছি। আর একটি কথা মনে পড়িল। মনে হইতেছে, আমি 'মানদণ্ড' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এই লেখার একটু ইতিহাস আছে। কলিকাতায় গিয়াছিলাম। সজনীর বাসায় আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশ মজুমদার মহাশয়ের সহিত দেখা হইল। তিনি বলিলেন,—বনফুল, এবার পূজায় তোমার উপন্যাস চাই। আমি বলিলাম, লিখিব, কিন্তু পারিশ্রমিক একহাজার দিবেন তো? মজুমদার মহাশয় বলিলেন—দিব। তুমি লিখিতে শুরু করিয়া দাও। ভাগলপুরে ফিরিয়া গিয়া 'মানদণ্ড' আরম্ভ করিয়া দিলাম। বইটি লেখা সম্পূর্ণ করিয়া বন্ধুবর অমূল্যকৃষ্ণ রায়কে এবং অধ্যাপক গিরিধারী চক্রবর্তীকে পড়িয়া শুনাইলাম। লালা আগেই পাণ্ডুলিপিটি পড়িয়াছিল। তিনজনেই রায় দিলেন—বইটি ছাপিতে দিতে পার—আনন্দবাজারে পাঠাইয়া দিলাম। 'পূজা' সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইল। কিন্তু, সুরেশ এক হাজার টাকার বদলে সাত শত টাকার (৭০০৲) চেক পাঠাইলেন। সুরেশবাবুকে যখন প্রশ্ন করিলাম, কথার খেলাপ কেন? তিনি উত্তর দিলেন—আমরা সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক রবীন্দ্রনাথকে দিয়াছি—তাহা ৭০০৲। সুতরাং, তোমাকে আমাদের অফিস হইতে সাতশত টাকার বেশি দেওয়াটা অশোভন। বাকি ৩০০৲ আমি নিজের পকেট হইতে তোমাকে দিব। তুমি নগদ চাও, নগদ দিব, কিংবা ঐ মূল্যের কোনও জিনিস যদি চাও, তাহা কিনিয়া দিব! আমার তখন একটা পাখার দরকার ছিল। সুরেশবাবু আমাকে একখানি Tropical পাখা কিনিয়া দিয়াছিলেন। সে পাখাটি এখনও আমার কাছে আছে, এবং ভালোই চলিতেছে। এই সময়ে আমাদের দেশে রাজনৈতিকমহলে খুব একটা ডামাডোল চলিতেছিল। বৃটিশ

গভর্ণমেণ্ট পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবেন। কাহাকে দিবেন, কংগ্রেসকে, না মুসলিম লীগকে, ইহা লইয়া নানারূপ কল্পনা-জল্পনা, আলাপ-আলোচনা, সভা-মিছিল প্রভৃতি হইতেছিল। জিন্না দাবী করিতেছিলেন যে, তাঁহারা একটা আলাদা 'নেশন', সুতরাং, তাঁহারা আলাদা রাজত্ব চান। হিন্দু নেতারা বই লিখিয়া, বক্তৃতা কবিয়া প্রতিবাদ করিতেছিল তাহার। জওহরলাল নেহেরু, গান্ধীজী বলিলেন—হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া নাই, ইংরেজ আছে বলিয়াই এ ঝগড়া। ইহার পরই নোয়াখালিতে ভীষণ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধিল, তাহার পর বিহারে, তাহার পর অন্যান্য নানা জায়গায়। কলিকাতায় তখন মুসলিম লীগ গভর্ণমেণ্ট। সেখানে নিদারুণ ক্যালকাটা কিলিং হইয়া গেল। সুরাবর্দি তখন মুখ্যমন্ত্রী এবং মুজিবব রহমান তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। সারা দেশ ব্যাপিয়া হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার একটা ঝগডা বহিতে লাগিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাধা দিবার ভাণ করিলেন, কিন্তু প্রকৃত বাধা দিলেন না। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তখন 'স্বপ্নসম্ভব' নামে একটি বই লিখিয়াছিলাম আমি। পরে সেটি পুস্তকাকারেই রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশ করিয়াছিল। ইহাব অনেক পরে আমি বইটির ইংরাজি অনুবাদ করি। সে অনুবাদ হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড কাগজে প্রকাশিত হয়—Betwixt Dream and Reality—এই নামে এবং পরে রূপা এণ্ড সন্স তাহা বই হিসাবে প্রকাশ করেন। শুনিয়াছি, বইটি অস্ট্রেলিয়ার কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছিল। বি. এ. ইংরাজী অনার্স ক্লাসে।

এই সময়ে আমাব লেখার উৎসাহ তুঙ্গে উঠিয়াছিল। নানারকম লেখা লিখিতাম। শনিবারের চিঠির তাগাদায় লিখিতে হইত। ঋণশোধ করিবার তাগাদাও ছিল। এই সময়ের মধ্যেই আমার কয়েকটি গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল। বনফুলের গল্প—আমার প্রথম গল্পসংগ্রহের বই। তাহার পর বাহির হয় বনফুলের আরও গল্প। তাহার পর 'ভুয়োদর্শন' 'বিন্দু বিসর্গ' 'দশ ভান' নামে একাঙ্ক নাটক, সিনেমার গল্প (ব্যঙ্গ-নাটক) 'শ্রীমধুসূদন' এবং 'বিদ্যাসাগর' কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়েই আমি 'শনিবারের চিঠি'-তে 'সপ্তর্ষি' উপন্যাস আরম্ভ করি। এই সময় 'অঙ্গারপর্ণী' নামক একটি ব্যঙ্গকবিতার বইও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশ করেন। ইহার কিছু পূর্বে আমার 'রাত্রি' উপন্যাসটি তাহারা প্রকাশ করেন। পরে ইহা রঞ্জন পাবালিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত হয়। নির্ভুল তারিখ অবশ্য মনে নাই, তবে সময়টা মোটামুটি এই—আমাদের স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পূর্বে। তখন, দিবারাত্র যখনই সময় পাইতাম, লিখিতাম। এই সময়ই বাজারের নিকট আর একটি প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরি স্থাপিত হইল। আমার রোগীর সংখ্যা আরও কিছু কমিয়া গেল। লেখার অনেক সময় পাইলাম। লেখার চাহিদাও প্রচুর ছিল, লেখা লইয়াই মাতিয়া রহিলাম। রয়ালটি হইতে যাহা পাইতাম, তাহাও তখনকার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

তাহার পরেই ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট আমরা স্বাধীনতা পাইলাম। ভারতকে

বিখণ্ডিত করিয়া সর্বত্র বাঙালীর সর্বনাশের বীজ বপন করিয়া ইংরেজরা চলিয়া গেল। ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়ন করিবার আন্দোলন বাঙালীরাই প্রথমে করিয়াছিল। ইংরেজ তাহার শোধ লইয়া গেল। স্বাধীন ভারতে বাঙালীর গৌরবের স্থান কোথাও রহিল না। স্বাধীনতার পরই দেশে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া গেল। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ হিন্দু-মুসলমানের রক্তে ভিজিয়া গেল। পাঞ্জাব হইতে দলে দলে লোক এ দেশে আসিতে লাগিল। এ দেশ হইতে অনেক মুসলমান পাঞ্জাবী পশ্চিম পাঞ্জাবে চলিয়া গেল। ভারত গভর্ণমেণ্ট অর্থ দিয়া তাহাদের সাহায্য করিলেন। উদ্বাস্তু পাঞ্জাবীরা এখানে ভালোভাবেই নিজেদের স্থান করিয়া লইল। তাহারা দেশে যে সম্পত্তি ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাহার মূল্য পাইল, কিন্তু, হিন্দু বাঙালীদের বেলা গভর্ণমেণ্ট কিছু করিলেন না। করিলেন কেবল উদ্বাস্তু ক্যাম্প। সেখানে বাঙালী হিন্দুরা ভিখারীর মতো বাস করিতে লাগিলেন। স্বাধীন ভারতেও বাঙালীদের প্রতি এই বিমাতৃসুলভ আচরণ দেখিয়া মনটা বড়ই দমিয়া গেল। মনে হইল, এখনও আমরা, হিন্দু-বাঙালীরা, পরাধীন আছি। তফাৎ কেবল, আমাদের আগেকার প্রভুরা ইংরেজ ভাষাভাষী ছিলেন, এখনকার প্রভুরা হিন্দী-ভাষাভাষী। হিন্দু-বাঙালীরা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ, তাই শাসনব্যাপারে তাহাদের কোন হাত রহিল না।

কিছুদিন পরে মহাত্মা গান্ধী নিহত হইলেন। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে বড়ই মর্মাহত হইলাম। মনে হইল, আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষটি চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর বসিয়া লিখিতেছিলাম, এমন সময় আমার বড় ছেলে অসীম ছুটিয়া আসিয়া খবরটা দিল। গুজব রটিয়া গেল, একজন মুসলমান তাঁহাকে মারিয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে আতঙ্কের ছায়া নামিয়া আসিল। কিছুদিন পূর্বে ভাগলপুর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে মুসলমান হত্যা হইয়াছিল নোয়াখালির প্রতিশোধস্বরূপ। সকলের ভয় হইল, আবার একটা নিদারুণ খুনোখুনি শুরু হইয়া যাইবে। আমাদের বাড়ির পাশেই সি. এম. এস. (C. M. S.) স্কুলে একজন সাহেব পাদরি প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটি শোক-সভা আহ্বান করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আত্মার মঙ্গলকামনা করিয়া একজন সাহেব পাদরি সর্বপ্রথম তাঁহাকে যে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। একটু পরেই রেডিওতে পণ্ডিত জওহরলাল ঘোষণা করিলেন, ঘাতক মুসলমান নয়, একজন হিন্দু, নাম নাথুরাম গড্‌সে। পরদিন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে একটি শোকসভা হইল। সেই সভায় আমি স্বরচিত—'হে মহাপথিক, হে মহা পথ—' কবিতাটি পাঠ করি।

সে সময়কার রাজনৈতিক আবহাওয়া বড় গোলমেলে। তাহার বিশদ বিবরণ এ গ্রন্থের পক্ষে অবান্তর। তবে, আমার মনে হয়, আমার 'ত্রিবর্ণ' নামক গ্রন্থের মাল-মশলা তখনই আমার অজ্ঞাতসারে আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইতেছিল।

আমার ছেলে-মেয়েরা তখন বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে। আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান কেয়ার বয়স তখন ১৮/১৯ বছর। আই. এ. পরীক্ষা দিয়াছে। তাহার জন্য নানাস্থানে

পাত্র সন্ধান করিতেছি। বড় ছেলে অসীম ম্যাট্রিক ক্লাসে, ছোট ছেলে চিরন্তন সেকেণ্ড ক্লাসে এবং ছোট মেয়ে করবী মোক্ষদা গার্লস স্কুলে পড়িতেছে। তাহাদের পড়াশোনার ভার আমার গৃহিণীর উপর ছিল। সমস্ত সংসারের ভারই তিনি বহন করিতেন। আমি যাহা রোজগার করিতাম, তাহা তাহার হাতেই দিয়া দিতাম। সংসার তিনিই চালাইতেন, আমি যেন Paying guest-এর মতন সারাজীবন কাটাইয়াছি। একটু অবশ্য তফাৎ ছিল। আমি আগে খুব জেদি এবং রাগী ছিলাম। এই দুইটার ধাক্কা অবশ্য আমার গৃহিণীকে সামলাইতে হইত। তিনি অবশ্য কম জেদি বা রাগী ছিলেন না। তাই, সংঘর্ষটা মাঝে মাঝে খুব জমিয়া উঠিত। আমার ছোট ছেলে রনতু (চিরন্তন) হইবার পর গৃহিণী ঘরে পড়িয়া প্রাইভেটে বি. এ. পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন। যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন তিনি বেথুন কলেজে আই. এ. পড়িতেন। ভালো রাঁধিতে জানিতেন না। কিন্তু, আমি খাদ্যবসিক জানিতে পারিবার পর, নিজের চেষ্টায় রন্ধন-ব্যাপারে ক্রমশঃ পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। ছেলেমেয়েদের বাড়িতে তিনিই পড়াইতেন এবং আমার লেখার সময় মাঝে মাঝে আমাকে চা করিয়া দিতেন। আমার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। তাহারা আসিলে, তাহাদের আপ্যায়নের ভার তাঁহার উপরেই ছিল। আমার ভাইয়েদের অনেকেরই স্ত্রী ছেলে হইবার সময় আমার কাছে চলিয়া আসিতেন। তাঁহাদের আঁতুরের ভারও লীলাকে লইতে হইত। আমি টাকা রোজগার করিতাম এবং নিজের নানারকম খেয়াল লইয়া থাকিতাম। লেখা ছাড়া, ছবি আঁকা মাঝে মাঝে নূতন স্বাদের রান্না করা, গোলাপফুলের বাগান করা, বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানো, দিনে পাখি দেখা, রাত্রে আকাশচর্চা করা। অর্থাৎ, আমি আমাকে লইয়া এবং আমার খেয়াল লইয়া দিনরাত ব্যস্ত থাকিতাম। লীলাবতী সংসারের দৈনন্দিন ঝড়ঝাপটা আমার গায়ে লাগিতে দিতেন না। টাকার দরকার হইলে, টাকা চাহিতেন এবং আমি সেটা যোগাড় করিয়া দিতাম। যখন প্র্যাকটিশের টাকায় কুলাইত না, তখন প্রকাশকদের নিকট হইতে অগ্রিম টাকা চাহিতাম, এবং পরে বই লিখিয়া তাহা শোধ করিয়া দিতাম। যদি আমি বা লীলা মিতব্যয়ী হইতাম, তাহা হইলে প্রকাশকদের নিকট আমাকে টাকা ধার করিতে হইত না। ডাক্তারি হইতে যাহা রোজগার করিতাম, তাহাতেই আমাদের সংসার কষ্টে-সৃষ্টে চলিয়া যাইত—কিন্তু, আমাদের উভয়েরই প্রবণতা ছিল অমিতব্যয়িতার দিকে। অমিতব্যয়িতার একটা দরাজ আনন্দ আছে, সে আনন্দ আমরা প্রচুর ভোগ করিতাম। সেজন্যে ধার করিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু, সে ধার শোধ করিবার জন্যই আমি রাত জাগিয়া বই লিখিয়াছি এবং ভালো করিয়া লিখিবার জন্য অনেক পড়িয়াছি। পূর্বেই বোধহয় উল্লেখ করিয়াছি, একঘেয়ে এক ছাঁচের লেখা আমি লিখিতে পারি না। প্রতিটি লেখায় আমি নূতন স্বাদ পরিবেশন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কতটা সফল হইয়াছি, জানি না। সুতরাং, পরোক্ষভাবে আমাদের অমিতব্যয়িতাই আমাকে বই লিখিতে প্ররোচিত করিয়াছে। নক্ষত্র দেখার কৌতূহল আমার প্রথম জাগে, যখন আমি মেডিকেল কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। প্রথম বছর মেসে স্থান

পাই নাই, তাই সেওড়াফুলি হইতে ডেলি প্যাসেনজারি করিতে হইত। একদিন রাত্রি প্রায় দশটার সময় ফিরিতেছি, রেলের ওভারব্রিজে উঠিয়া দেখিলাম, এক ব্যক্তি চোখে বাইনাকুলার লাগাইয়া দক্ষিণ আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন। আমিও দাঁড়াইয়া পড়িলাম এবং প্রশ্ন করিলাম, কি দেখিতেছেন? তিনি উত্তর দিলেন—অগস্ত্য নক্ষত্র। অবাক হইয়া গেলাম।

'আপনি নক্ষত্র চেনেন?'

'যেগুলো খালি চোখে দেখা যায়, চিনি।'

'আমাকে চিনিয়ে দেবেন?'

'দেব না কেন? কিন্তু, রাত জাগতে হবে।'

ভদ্রলোক দীর্ঘাকৃতি। পরিচয় লইয়া জানিলাম, তিনি সেওড়াফুলি রেলওয়ে স্টেশনের অ্যাসিসটেন্ট স্টেশন-মাস্টার। পরদিন রবিবার ছিল। তাঁহার বাড়ি গেলাম। দেখিলাম, তাঁহার একটি ছোট টেলিস্কোপও আছে। আমাকে তিনি একটি ছোট বাংলা বইও দিলেন। এ বিষয়ে তিনিই আমার প্রথম গুরু। কিছুদিন পরে তিনি বদলি হইয়া গেলেন। আমার কিন্তু আকাশচর্চার নেশা জমিয়া উঠিতে লাগিল। আমিও নানারকম বই কিনিতে লাগিলাম। মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় যখনই সময় এবং সুযোগ পাইয়াছি, নক্ষত্রগুলি চিনিবার চেষ্টা করিয়াছি। আকাশের নক্ষত্রদের লইয়া আমাদের পুরাণে এবং গ্রীকদেশের পুরাণেও নানাবিধ উপাখ্যান আছে। তা ছাড়া নক্ষত্রগুলিকে ঠিক মতো চিনিতে পারিলেও ভারি আনন্দ হয়। এজন্য অবশ্য অনেক রাত জাগিতে হয়। বই পড়িয়া এবং আকাশের ছবি দেখিয়া নক্ষত্রদের সহিত মোটামুটি একটা পরিচয় করা খুবই সহজ। ভাগলপুরে আমার সাহিত্যচর্চাব সহিত আকাশ-চর্চাও পুরাদমে চালাইয়াছি। আমার পুত্র-কন্যারা এবং মাঝে মাঝে লীলাও আকাশ-চর্চায় যোগ দিয়াছে। আকাশ-চর্চার একটি প্রধান উপকরণ, ভালো একটি বড় টর্চ। সেই টর্চ দিয়া নক্ষত্রটিকে চিনাইয়া দেওয়া সহজ। শক্তিসম্পন্ন (পাঁচ সেলের বা আট সেলের) টর্চের আলো যেন আঙুলেব মতো গিয়া নক্ষত্রটিকে স্পর্শ করে। ভারি আনন্দজনক ব্যাপার এটা। এই সব লইয়া একটি বই লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু, সেটি হইয়া ওঠে নাই। পক্ষী-পর্যবেক্ষণও আমার একটা নেশা ছিল। তাহা লইয়া 'ডানা' লিখিয়াছি। পক্ষী-পর্যবেক্ষণের জন্য প্রদ্যোতের কাছে আমি ঋণী। তাহার সহায়তা না পাইলে, আমি পক্ষী বিষয়ে যতটুকু জ্ঞান আহরণ করিয়াছি, ততটুকুও পারিতাম না। নানারকম পাখী মাঝে মাঝে দেখিতাম, কিন্তু, তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতাম না। মনে কিন্তু কৌতূহল ছিল। এমন সময় একদিন প্রদ্যোৎ আসিয়া হাজির। দেখিলাম, তাহার গলায় একটি বাইনাকুলার ঝুলিতেছে। শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত একজন ইনকাম-ট্যাক্সের বড় অফিসার তখন। সাধারণের চক্ষে ভয়াবহ ব্যক্তি, কিন্তু, আমার খুব প্রিয়, আমার লেখার খুব ভক্ত।

প্রশ্ন করিলাম—'তোমার গলায় বাইনাকুলার কেন ?'

'আজকাল বার্ড ওয়াচিং করছি।'

'আমাকে চিনিয়ে দেবে ?'

'নিশ্চয়, এখনই চলো—'

তাহার মোটরে চড়িয়া বাহির হইয়া গেলাম। এবং, সেইদিনই অনেক পাখী চিনিলাম। আমার উৎসাহ দেখিয়া প্রদ্যোতের উৎসাহ বাড়িল। সে আমাকে সালিম আলির একখানা বই উপহার দিল। তাহার পর, ক্রমাগত বই পাঠাইতে লাগিল। তাহার নিকট হইতে বোধহয়, পক্ষীসংক্রান্ত সবরকম বইই পাইলাম। আমার বাবার একজন বন্ধু (আমাদের জ্ঞানবাবু কাকা) তাঁহার দূরবীণটি আমাকে উপহার দিলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সে দূরবীণটি চুরি হইয়া গেল। আমার উৎসাহ-কবিতায় শোচনীয় ছন্দ-পতন হইল। প্রদ্যোৎকে জানাইলাম—ভাই প্রদ্যোৎ, বাইনাকুলারটি চুরি গিয়াছে। একটি বাইনাকুলারের দাম কত এবং কলিকাতায় পাওয়া যাইবে কিনা, অবিলম্বে জানাও। প্রদ্যোৎ একটি বিলাতী বাইনাকুলার কিনিয়া উপহারস্বরূপ সেটি আমাকে অবিলম্বে পাঠাইয়া দিল। আবার আমার পাখী দেখা শুরু হইয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরেই আমার বড় মেয়ে কেয়ার বিবাহ হয়। বরপক্ষ ভাগলপুর যাইতে রাজি হইলেন না। আমাকেই সপরিবারে কলিকাতায় আসিতে হইল। আমাদের বড় পরিবার। আমরা ছয় ভাই, দুই বোন। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। তা ছাড়া, আমার বন্ধু-বান্ধব এবং বাবার বন্ধু-বান্ধবও আছেন। বাবা তখনও জীবিত। সুতরাং, বড় একটি বাড়ির প্রয়োজন। সজনী আমার সহায় হইল। তখনই আর একবার অনুভব করিলাম, সজনী আমার কত বড় বন্ধু। ভাগলপুর হইতে আসিয়া আমরা প্রথমে সজনীর বাড়িতে উঠিয়াছিলাম। সজনীর বাড়িতেই কেয়াকে দেখানো হইয়াছিল। একটা বড়ো বাড়ির সন্ধানে সজনীই চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। সে সময় গ্রীষ্মকাল (বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ ঠিক মনে নাই) —সেই দারুণ গ্রীষ্মে সজনী বাড়ি খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোথাও মনোমত বাড়ির সন্ধান পাওয়া যায় না, অবশেষে শোনা গেল, রাজা মণীন্দ্র নন্দী কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি আছে। কলেজবাড়িটি খালি আছে। তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন পঞ্চাননবাবু। সজনী আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার কাছে গেল। তিনি বলিলেন—'আমাদের কলেজের শাসন-পরিষদ ঠিক করিয়াছেন যে, বিবাহে ব্যবহার করিবার জন্য কলেজ ভাড়া দেওয়া যাইবে না। কিন্তু, আপনি দেখিতেছি, বিপদে পড়িয়াছেন। আপনাকে সাহায্য করিব। কাগজে-কলমে আপনাকে ভাড়া দিব না; আপনি বাড়িটি ব্যবহার করুন। ইহার ইলেকট্রিক বিল এ কয়দিনে যাহা হইবে তাহা দিবেন, এবং বিবাহ হইয়া গেলে, কলেজে আপনার সাধ্যমত কিছু ডোনেশন দিয়া যাইবেন।' নিশ্চিন্ত হইলাম।

বিবাহের টাকা আমি প্রকাশকদের নিকট হইতে অগ্রিম ঋণ লইয়াছিলাম। ডি. এম. লাইব্রেরীর মালিক গোপালদা আমাকে কিছু টাকা দিয়াছিলেন। আর একটি সিনেমা কোম্পানী আমাকে কিছু টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু, শেষ পর্যন্ত সব টাকাটা দেন নাই। তাঁহার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া গহনার অর্ডার দিয়াছিলাম, তিনি প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করাতে বড়ই বিপন্নবোধ করিতে লাগিলাম। দুই হাজার টাকা কম পড়িয়াছিল। সজনীর পরামর্শে আমি আনন্দ-বাজার পত্রিকার সুরেশ মজুমদারের সহিত দেখা করিলাম। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, দুই হাজার টাকার জন্তে তোমার মেয়ের বিয়ে আটকাইয়া যাইবে না। তিনি তৎক্ষণাৎ ভিতরে গিয়া আমাকে নগদ দুই হাজার টাকা বাহির করিয়া আনিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে একটি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতে গেলাম। তিনি বাধা দিলেন। বলিলেন, কিছু করিতে হইবে না। তুমি শুধু তোমার হাতটি আমার কাগজের উপর নাড়িও। তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। সেকালে প্রকাশকদের সহিত এবং কাগজের মালিকদের সহিত আমাদের যে হৃদ্যতা ছিল, তাহা এখন আছে কিনা জানি না। শুনিয়াছি, আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীমান অশোক সরকার তাঁহাদের এই গৌরবময় ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন।

বাড়ি তো ঠিক হইল, কিন্তু, একটা বিবাহের যে অনেক ঝঞ্ঝাট। কলিকাতা শহরে পয়সা ফেলিলে সবই পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু কোথায় পাওয়া যায়, তাহা আমার মতো আনাড়ির পক্ষে জানাও শক্ত। সজনীই সব ভার লইল। আমি সমস্ত টাকা সজনীর হাতে দিয়া দিলাম। সজনীই সব ব্যবস্থা করিল। বিবাহ শেষ হইয়া যাইবার পর, সমস্ত খরচের হিসাব সে একটি খাতায় লিখিয়া আমার হাতে দিল। রসিদও ছিল এক গোছা। কোন্ কোন্ দোকান হইতে কি কি কেনা হইয়াছে, তাহার ক্যাশমেমো। সেই খাতাখানি আর ক্যাশমেমোগুলি আমি কিছুদিন রক্ষা করিয়া-ছিলাম। এখন হারাইয়া গিয়াছে।

আমার মেয়ের বিবাহের বছরেই আমার বড় ছেলে অসীম ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিল। পরীক্ষায় ভালো ফল হইয়াছিল। স্কলারসিপ পাইয়াছিল। কিন্তু, বাঙালীর ছেলে বলিয়া তাহাকে স্কলারসিপ দেওয়া হইল না। আমি ঠিক করিলাম, ছেলেদের আর বিহারে পড়াইব না। তাহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢুকাইয়া দিলাম। তাহার নম্বর ভালো ছিল, বিশেষ অসুবিধা হইল না। একটু কিন্তু চাতুরী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। প্রিন্সিপাল সাহেব বলিলেন—আপনি যে ভাগলপুরে থাকেন, ইহা সুবিদিত। বিহারের ছেলেকে বাংলাদেশের কলেজে ভরতি করার অসুবিধা আছে। আপনি আপনার ছেলের গার্জেন হিসাবে নিজের নাম দিবেন না। বাংলাদেশে বাস করেন, এমন কোন আত্মীয়ের নাম দিন। তাহাই হইল। সেওড়াফুলী-নিবাসী আমার জেঠতুতো দাদা শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় অসীমের গার্জেন হইলেন। বাঙালীদের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য ইংরেজ বহু পূর্ব হইতেই প্রাদেশিকতার বিষ

প্রতি প্রদেশে বপন করিয়াছিলেন। কারণ, হিন্দু বাঙালীরাই স্বদেশী আন্দোলন শুরু করিয়াছিল। হিন্দু বাঙালীদের ধ্বংস করিবার জন্য ইংরেজ নানারকম আইন করিয়াছিল। বিহার ফর বিহারীজ, আসাম ফর আসামীজ—এই সব আইন আমাদের সর্বভারতীয় বোধকে বিনষ্ট করিয়াছে। ভারত স্বাধীন হইবার পরও এ সব আইনের প্রখরতা বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

অসীম প্রেসিডেন্সী কলেজে ভরতি হইল। মানে, আমার খরচ বাড়িল। মেয়ের বিয়ের ঋণ তখনও শোধ হয় নাই। আগেই বলিয়াছি, আরও দুইটি ল্যাবরেটরি বাজারে হইয়াছিল, সুতরাং আমার রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছিল। যে রোগীদের আমি বিনা পয়সায় দেখিতাম, তাহাদের সংখ্যা অবশ্য কমে নাই। কিন্তু, দূরে চলিয়া আসার জন্য আমার অর্থদায়ী রোগীর দল কমিতে লাগিল। সকলের পরামর্শে আমি আমার ল্যাবরেটরি আবার পূর্বস্থানে লইয়া গেলাম। অর্থাৎ, পটলবাবু আমার জন্য যে ল্যাবরেটরিটি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন সেইখানেই ফিরিয়া গেলাম। পটলবাবুর পুত্র সেখানে মোটরের যন্ত্রপাতির একটি দোকান করিয়াছিল। আমার অনুরোধে সে দোকান সরাইয়া লইল। কিন্তু, ভাড়াটি বাড়াইয়া দিল। পটলবাবুকে আগে ১৬ টাকা ভাড়া দিতাম—অরুণকে ৪০ টাকা দিতে হইল।

আমি কিন্তু দমিলাম না, সম্মুখসমরে অগ্রসর হইয়া গেলাম।

আদমপুর মহল্লায় বাঙালীটোলায় আমার 'গোলকুঠি' বাড়িটি ছিল গঙ্গার ধারে। সেখান হইতে আমার ল্যাবরেটরি প্রায় এক মাইল দূর। চারবার যাওয়া-আসা করিতে হইবে। প্রথম প্রথম হাঁটিয়াই যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু, দুই-একদিন হাঁটিয়াই বুঝিতে পারিলাম, পারিব না। ঘোড়ার গাড়ি কিংবা রিক্সার শরণাপন্ন হইতে হইল। খরচ আরো বাড়িল। আমার দ্বিতীয় বাড়িটি ভাড়া দিলে কিছু আর্থিক সাশ্রয় হইত। কিন্তু, আমি ওই বাড়িটিতে একা বসিয়া লিখিতাম, একা বসিয়া লেখার আনন্দ হইতে আমি নিজেকে বঞ্চিত করিলাম না। লেখা একটা তপস্যা, হট্টগোলের মাঝখানে তাহা বারবার বিঘ্নিত হয়। গোলকুঠির ওই খোলার বাড়িতে বসিয়া আমি আমার অনেক বই লিখিয়াছি। ওই ছোট্ট বাড়ির ঘরটিতে ঢুকিয়া খিল দিয়া টেবিলের সামনে বসিলেই অদ্ভুত এটা স্বপ্নলোক মূর্ত হইয়া উঠিত আমার মনে। আমি সমস্তদিন ল্যাবরেটরির কাজ করিতাম। রাত্রে ওই স্বপ্নলোকে গিয়া বিচরণ করিতাম।

ঋণশোধ করিবার তাড়ায় আমাকে অনেক বই লিখিতে হইয়াছিল। এ তাড়া না থাকিলে, আমি হয়তো এত বই লিখিতাম না। শুনিয়াছি, স্কট এবং আলেকজানডার ডুমাও ধার শোধ করিবার জন্য অনেক বই লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রকাশকদের সঙ্গে কি শর্তে আবদ্ধ ছিলেন জানি না। কিন্তু, আমার প্রকাশকদের সঙ্গে শর্ত ছিল, বই লেখা হইলে তাঁহাদের দিব। কিন্তু, কবে লিখিব, কি আকারে লিখিব, তাহা আমিই ঠিক করিব। প্রকাশক আমাকে তাড়া দিতে পারিবেন না। তাঁহারা রাজি হইয়াছিলেন এবং আমি আমার খেয়াল-খুশী-মতো

যখন যাহা ইচ্ছা, তাহাই লিখিয়াছি। আমি চেষ্টা করিতাম, যাহাতে আমার দুইটি বই যেন এক স্বাদের না হয়। নাম করিব না, তবে, অনেক বড় বড় নামজাদা লেখকের একঘেয়ে লেখা পড়িয়া মনে হইত, এরূপ চর্বিত-চর্বণ করিয়া লাভ কি। ইহাতে লেখকের হয়তো কিছু আয়বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। লেখকের একটু খ্যাতি হইয়া গেলে প্রকাশকরা তাঁহার বই লইতে আগ্রহী হন, বই ছাপা হইলেই কিছু অর্থাগম হয়—এই লোভ অনেক লেখক সংবরণ করিতে পারেন না। একই বিষয়ের একইরকম চরিত্রের পুনরাবৃত্তি করিয়া পুনঃপুনঃ বই লিখিতে থাকেন।

আমি সে লোভ সংবরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। লেখার বিভিন্ন বিষয়-বস্তু আহরণ করিবার জন্য আমি নানা বিষয়ের পুস্তক পড়িয়াছি। আমার অধ্যাপক বন্ধুবর্গ আমাকে নানা বইয়ের সন্ধান দিয়া উপকৃত করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া তিনজনের নাম মনে পড়িতেছে। একজন, ডক্টর সুশীল দে, আর একজন, নির্মল বসু। ইঁহারা আর ইহলোকে নাই। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও জীবিত নাই। এ প্রসঙ্গে সজনীর নামও বারবার মনে পড়িতেছে। কারণ, আমার কোনও বই-এর প্রয়োজন হইলে, তাহাকে চিঠি লিখিতাম, এবং, সে-ই আমাকে খবর দিত, কোথায়, কাহার কাছে সে বই পাওয়া সম্ভব। অনেক সময় সে নিজেও জোগাড় করিয়া বা কিনিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিত। কবি মোহিতলাল মজুমদারের নিকটও আমি অনেক প্রেরণা পাইয়াছি। তাঁহার সহিত আমার যে পত্রালাপ হইত, সে পত্রগুলিতে আমাকে তিনি যে সব উপদেশ দিতেন, তাহা আমাকে উদ্বুদ্ধ করিত।

আর একজনের কথা আমি একটু বিশদভাবে লিখিব। তিনি ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। আমার মাস্টারমহাশয়। মেডিকেল কলেজে তাঁহার নিকট আমি পড়িয়াছি। কিন্তু, তিনি আমার প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে। লেখার জন্যই আমাকে স্নেহ করিতেন তিনি। কিছু প্রশ্রয়ও দিতেন। সেই সাহসে আমি ভাগলপুরে থাকিতে আমার অনেক লেখা তাঁহাকে ডাকযোগে পাঠাইয়া দিতাম পড়িবার জন্য। স্কুলে মাস্টারমহাশয়েরা পূর্বে যেমন ছেলেদের Exercise-book সংশোধন করিয়া দিতেন তেমনি তিনি আমারও অনেক লেখা সংশোধন করিয়া পাঠাইতেন। সঙ্গে দীর্ঘ চিঠিও থাকিত। চিঠি নয়, যেন বেত। সাহিত্যের প্রকৃত সমজদার ছিলেন তিনি। অত্যন্ত কড়া সমালোচক, কোনওরকম শৈথিল্য সহ্য করিতেন না। আমার সাহিত্য-সাধনার পথে তিনি প্রথম শ্রেণীর 'গাইড' ছিলেন একজন। তাঁহার পরামর্শেই আমি অনেক ভালো ভালো বিদেশী লেখকদের গ্রন্থ পড়িয়াছিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি ভাগলপুরে গিয়া কিছুদিন ছিলেন। তখন তাহাকে আমার লেখা পড়িয়া শুনাইতাম। ভালো লাগিলে বলিতেন—নট্‌মল্লার জমেছে। না জমিলে, মৃদু হাসিয়া বলিতেন—সুর ঠিক বাঁধতে পার নি, বেসুরো ঠেকছে মাঝে মাঝে। আগাগোড়া ঢেলে লেখ। তিনি নিজেও একজন উঁচুদরের

লেখক ছিলেন। কার্টুনও আঁকিতেন চমৎকার। সে যুগের 'শনিবারের চিঠি'-তে ও 'ভারতবর্ষে' তাঁহার কার্টুন ও লেখা বাহির হইত। তাঁহার লেখা ছোটগল্প, 'নরকের কীট' এবং 'সিরাজীর পেয়ালা' বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। তাঁহার 'দশ চক্র' উপন্যাসটিও সেকালে রসিকসমাজে নাম করিয়াছিল। ব্যঙ্গরচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের আদর্শেই আমি 'অগ্নীশ্বর' লিখিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে প্রখরতা ও কোমলতার যে অদ্ভুত সমন্বয় ঘটিয়াছিল, তাহা বড় একটা দেখা যায় না। বাহিরে শাণিত তরবারি, অন্তরে কোমল পণির। বনবিহারীবাবুর কাছে আমার ঋণ অনেক।

এই সময় আমি আমার সমস্ত বই বেঙ্গল পাবলিশার্সদের দিতাম। আমার ছোট ছেলে রনতুও (চিরন্তন) ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সীতে ভরতি হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী হইতে অসীম কলিকাতা মেডিকেল কলেজে এবং রন্তু শিবপুরে ইনজিনিয়ারিং কলেজে ভরতি হইল। তাহাদের খরচ মাসে মাসে বেঙ্গল পাবলিশার্স দিত। তখন, মনোজ ও শচীন একসঙ্গে ছিল। বেঙ্গল পাবলিশার্সকেই তখন সব বই দিতাম। এই সময়, আমার বই সিনেমা-ওয়ালাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রথমে আসিয়াছিলেন বোম্বাই হইতে 'বম্বে টকিজ' কোম্পানী। তাহারা আমার 'দ্বৈরথ' বইটি কনট্রাক্ট করিয়া আমাকে ৫০০ টাকা দিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত তাহারা কিন্তু বইটি করিতে পারে নাই। তাহার পর কলিকাতার নিউ থিয়েটার্স আমার 'মন্ত্রমুগ্ধ' নাটকটি সিনেমায় রূপায়িত করেন। এই উপলক্ষে প্রখ্যাত ডিরেকটর শ্রীবিমল রায় (এখন স্বর্গীয়) সপরিবারে ভাগলপুরে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মেয়ে-দুইটি রেংকি এবং তাতন তখন খুব ছোট। রেংকি এখন বড় হইয়াছে এবং আমার গল্প ইংরেজীতে অনুবাদ করিতেছে। সময় কত দ্রুত চলিয়া যায়।

'মন্ত্রমুগ্ধ' সম্বন্ধে আর একটি কথাও মনে আঁকা আছে। সেটিও এখানে লিখিয়া রাখি। 'মন্ত্রমুগ্ধ' ছবি যখন প্রস্তুত হইয়া কলিকাতার প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হইতে লাগিল, তখন আমি একদিন কলিকাতায় গিয়া ছবিটি দেখিয়া আসিলাম। বইটি হাসির বই, দেখিলাম দর্শকরা সকলে হো-হো করিয়া হাসিতেছে। আমার বাবা তখন মণিহারীতে ছিলেন। তিনি কিছুদিন পরে আমার কাছে আসিয়াছিলেন। কাগজে তিনি 'মন্ত্রমুগ্ধ' ছবির প্রশংসা পড়িয়াছিলেন। আমাকে একদিন প্রশ্ন করিলেন—এখানেও ছবি আসিবে কি না। বলিলাম, এখানে বাংলা ছবি কম আসে। ঠিক বলিতে পারি না। বুঝিলাম, বাবার ছবিটি দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু, বাবার তখন শরীর খুব সমর্থ নয়। তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া গিয়া ছবি দেখানো সম্ভব নয়। আমি সেই থিয়েটার্সের মালিক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারকে একটি পত্র লিখিয়া জানাইলাম, আমার বৃদ্ধ পিতা ভাগলপুরে আছেন, তিনি 'মন্ত্রমুগ্ধ' ছবিটি দেখিতে চান। তাঁহার পক্ষে কলিকাতায় যাওয়া সম্ভব নয়। আপনারা কি ছবিটি একদিনের জন্য এখানে পাঠাইতে পারেন? আমি এখানে একটা প্রেক্ষাগৃহের ব্যবস্থা করিতে পারি,

যদি আপনারা ছবিটি পাঠান। ভাগলপুরের স্টেশন রোডের উপর যে বড় প্রেক্ষাগৃহটি ছিল, তাহার মালিক একজন বিহারী ভদ্রলোক আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি বলিলেন— সকালবেলা যে কোনও দিন আপনি আমার 'হল'-টি ব্যবহার করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ও ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি আমার পত্র পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—'আমি লোক দিয়া ছবিটি ভাগলপুরে পাঠাইয়া দিব। সে গিয়া আপনার বাবাকে ছবিটি দেখাইয়া আসিবে। আপনি একটি সিনেমা হল জোগাড় করুন।'

যথাকালে 'মন্ত্রমুগ্ধ' ভাগলপুরে আসিল এবং ভাগলপুরবাসী অনেক বাঙালী আমার বাবার সহিত বসিয়া বইটি উপভোগ করিলেন। আমার কম খরচ হইল না।

এইসময়ই আমার জীবনে আর একটা ঢেউ আসিয়া লাগিল। ভাগলপুরের বাহিরে নানাস্থান হইতে সাহিত্য-সভায় নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলাম। অনেক জায়গায় সম্বর্ধনা এবং মানপত্রও জুটিল। মুঙ্গের, জামালপুর, পাটনা, মজঃফরপুর, কানপুর, কাশী, নৈনিতাল, এমন কি বর্মাদেশে রেঙ্গুন পর্যন্ত গিয়াছি। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের একটি সভায় কন্যাকুমারিকাতেও গিয়াছিলাম এবং সেই সময় দক্ষিণভারতের বড় বড় তীর্থগুলি দেখিয়া আসিয়াছিলাম। লীলা সর্বত্র আমার সহগামিনী হইয়াছিল। দিল্লীতে যখন গভর্ণমেণ্টের সাহিত্য-আকাদমী ছিল, তখন তাহাতে আমিও একজন সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলাম। একটি সভাতে যোগদানও করিয়াছিলাম। তখন জওহরলাল নেহরু বাঁচিয়াছিলেন। কিন্তু, আমি দেখিলাম, আকাদমী যে পদ্ধতিতে প্রতি বছর বিভিন্ন লেখকদের পুরস্কার বিতরণ করেন, সে পদ্ধতিটি সাহিত্য অনুমোদিত পদ্ধতি নহে। গভর্ণমেণ্ট নিজেদের খুশীমতো নিজেদের নিয়োজিত কয়েকজন লোকের ভোট লইয়া ঠিক করেন, কে পুরস্কার পাইবার যোগ্য। আমি বলিলাম, গভর্ণমেণ্ট যাঁহাদের নিকট ভোট লইতেছেন, তাঁহারা যে সাহিত্যরসিক হইবেনই, তাহার স্থিরতা নাই। আর, দ্বিতীয় কথা—যেখানে ভোটের ব্যাপার, সেখানে গোপনে ধরাধরি, ক্যানভ্যাসিং প্রভৃতি চলিবেই। ভোটের জগতে লাল নীল হয়, ইন্দ্র হনুমান হোল—এ সব তো সুবিদিত। আমার মনে হইল, এই সব পুরস্কার-বিতরণ দ্বারা গভর্ণমেণ্ট একদল প্রসাদ-লোলুপ, ধরাধরি-পটু-সাহিত্য-পেশাদার সৃষ্টি করিবেন। স্বাধীনচেতা, আত্ম-সম্মানশীল সাহিত্যিকেরা হয়তো এ পদ্ধতিতে কচিৎ পুরস্কৃত হইতে পারেন, কিন্তু, না হইবার সম্ভাবনাই বেশি। আমি আমার এ কথাগুলি আকাদমীর সম্পাদক মহাশয়কে জানাইলাম। তাহার পর হইতে আর আকাদমীর সংস্পর্শে যাই নাই। আমার মতে, ওটা এখন একটা প্রহসন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি যত-দিন ভাগলপুরে ছিলাম, ততদিন কলিকাতার কোন সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য কেহ আমাকে আমন্ত্রণ জানান নাই। কলিকাতার অলিতে-গলিতে সাহিত্যিক, এখানে বাহির হইতে লোক ডাকিবার দরকার হয় না। এখন, এখানে আসিয়া কিন্তু, সভার ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। এখানে সাহিত্যিকরা সকলেই সভা করিতে ব্যস্ত। সে সব সভায়

কিন্তু সাহিত্য-চর্চা করিবার সুযোগ নাই। মন্ত্রী আসেন, গায়ক-গায়িকারা আসেন, বক্তারা আসেন, সভার উদ্যোক্তারা সভার বিবরণী পাঠ করেন এবং ইহার সহিত অনেক সময় থিয়েটার এবং নৃত্য থাকে। খবর-কাগজের রিপোর্টারদের খুব খাতির এ সব সভায়। অনেক সময় তাঁহারা সভাপতি বা প্রধান অতিথি হন। কারণ, তাহা করিলে সভার খবরটা ফলাও করিয়া (অনেক সময় সচিত্র) বাহির করিবার সুযোগ হয়।

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। আবার ভাগলপুরে ফিরিয়া যাই। ভাগলপুরে আমার জীবন সুখের জীবন ছিল। ডাক্তারি করিতাম, রাত জাগিয়া লিখিতাম, মাঝে মাঝে আকাশ-চর্চা করিতাম, দিনের বেলা সময় পাইলেই পাখীদের খবর লইতাম। পায়ে হাঁটিয়া গঙ্গার চরে চরে ঘুরিতাম, কিম্বা আমার বাড়ির সামনে শৈলেনবাবুদের যে প্রকাণ্ড বাগানটা ছিল, তাহার ভিতর ঢুকিয়া পড়িতাম। ওইখানেই একদিন কুলোপাখির দেখা পাইয়াছিলাম। অনেক ছোট ছোট পাখি দেখিতে পাইতাম, কিন্তু, সবাইকে চিনিতে পারিতাম না। বই দেখিয়া অচেনা পাখিদের স্বরূপ-নির্ণয় করা শক্ত। অপেক্ষা করিতাম, প্রদ্যোৎ কবে আসিবে, তাহার সাহায্যে চিনিয়া ফেলিব। আমার ছেলেমেয়েরাই আমার তারা-দেখা এবং পাখি-দেখার সঙ্গী ছিল।

পটলবাবুর বাড়িতে যখন ছিলাম, তখনই একটি গাভী কিনিয়াছিলাম। এ খবর বোধহয় পূর্বেই লিখিয়াছি। গাভীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। দুই একটি কুকুরও পুষিতাম। আমার ল্যাবরেটরির জন্য ভেড়া, খরগোস, গিনিপিগ তো ছিলই। সমস্ত ভার লীলাই সামলাইত। গোয়ালা ঠিক সময়ে দুধ দুহিতে আসিত না বলিয়া লীলা নিজে দুধও দুহিতে শিখিয়াছিল। দুধ, ক্ষীর, ছানা, পায়েস, সন্দেশ, পিঠার তাল সামলাইবার জন্য আমাকে ইনসিউলিন-এর ডোজ বাড়াইয়া দিতে হইল। আমার বাড়ির পাশেই অনেকটা জমি ছিল। সেখানে গোলাপগাছ লাগাইতাম। গোলাপ আমার ছেলেবেলার সঙ্গী, মণিহারীতে আমাদের বড় গোলাপবাগান ছিল। নিজের বাড়ি করিয়া এখানেও গোলাপবাগান করিলাম। করিয়া কিন্তু ফ্যাসাদে পড়িয়া গেলাম। ভাগলপুরে প্রচুর হনুমান। দেখিলাম, তাহারাও গোলাপরসিক। গোলাপের কচি পাতা বা কুঁড়ি হইলেই খাইয়া যাইত। একটা অশান্তির সৃষ্টি হইত বাড়িতে। এ জন্য আমার চাকর দুর্গা অনেক বকুনি খাইয়াছে আমার নিকট। একদিন দুর্গাকে খুব বকিতেছি, এমন সময় আমার একজন লোহার দোকানদার রোগী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে প্রশ্ন করিল, আমি এত চটিতেছি কেন? তাহাকে সব বলিলাম। সে বলিল—এক কাজ করুন। লোহার জাল বাগানের চতুর্দিকে ঘিরিয়া ফেলুন। অর্থাৎ, জালের একটা ঘর বানাইয়া ফেলুন। সেই ঘরের মধ্যে আলো, বাতাস সব ঢুকিবে, অথচ গাছগুলি নিরাপদ থাকিবে।

প্রশ্ন করিলাম—'এত জাল কোথায় পাইব?'

'আমি দিব। আমার দোকানে প্রচুর জাল আছে। বলেন তো, কালই পাঠাইয়া দিই।'

'কত দাম লাগিবে—'

'ঠিক বলিতে পারি না। তবে মনে হয়, শ'দুই টাকার মধ্যে হইয়া যাইবে—।'

'অত টাকা তো আমার এখন নাই।'

'আপনি যখন খুশী টাকা দিবেন। এখন আপনার বাগান তো বাঁচুক।'

আমার বাগান জাল দিয়া ঘিরিয়া দিলাম। হনুমানের হাত হইতে ফুলগুলি রক্ষা পাইল। কিন্তু, আর এক প্রকার উৎপাত শুরু হইল। দেখিলাম, মাকড়সারাও গোলাপফুল-বিলাসী। লোহার জালে তাহারাও জাল পাতিতে লাগিল এবং গাছের কুঁড়ি ও কচি পাতাগুলিকে জখম করিবার ব্যাপক আয়োজনে মাতিয়া উঠিল। আমি দমিলাম না। ঝাড়ু এবং Insecticide লইয়া তাদের তাড়া করিলাম। ফল ভালোই হইল। আমি দেওঘর হইতে গোলাপফুলের চারা আনাইতাম। Glory Garden-এর স্বর্গীয় বিজয়বাবু ধর্মপ্রাণ, পুষ্পরসিক ছিলেন। তিনিই আমাকে গোলাপফুল নির্বাচন করিয়া দিতেন। একবার কয়েকটা ফুল উপহারও পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আজ ইহলোকে নাই, কিন্তু তাঁহার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। হনুমান ও মাকড়সার হাত হইতে গোলাপফুলগুলিকে রক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু, মানুষের হাত হইতে পারি নাই। একবার, সরস্বতীপূজার সময় খুব ভোরে বাঙালীটোলায় ছেলেরা কাঁচি দিয়া জাল কাটিয়া আমার বাগানে প্রবেশ করিয়া ভালো ভালো গোলাপফুলগুলি চুরি করিল। কয়েকটি দামী গাছ উপড়াইয়া দিয়া গেল। সরস্বতীপূজার দিন সকালে উঠিয়া হতভম্ব হইয়া গেলাম। আমার ছোট মেয়ে করবী তখন পাড়ায় বাহির হইয়া পড়িল এবং খবর আনিল যে, একজনের বাড়িতে মা সরস্বতীর সামনে আমাদের বাগানের গোলাপফুলগুলি রহিয়াছে। রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তখন ভাগলপুরে পুলিশের বড় কর্তা একজন বাঙালী ছিলেন। আমার লেখার ভক্ত ছিলেন তিনি। আমি তাঁহার নিকট চলিয়া গেলাম। সব শুনিয়া বলিলেন, এখনই ব্যবস্থা করিতেছি। তিনি একজন পুলিশ ইনস্পেকটার পাঠাইয়া দিলেন। যে বাড়িতে আমার গোলাপগুলি পাওয়া গিয়াছিল, সে বাড়ি তিনি খানাতল্লাসী করিলেন এবং পুরোহিতটিকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া আসিলেন। তাহাকে বলিলেন চোরাই মাল আপনার নিকট পাওয়া গিয়াছে, তাই আপনাকে ধরিয়াছি। ফুলগুলি কাহারা আনিয়াছে এবং কোথা হইতে আনিয়াছে, তাহা নির্ণয় না করা পর্যন্ত আপনাকে থানায় আটক থাকিতে হইবে। তবে, বলাইবাবু যদি আপনাকে ক্ষমা করেন আপনাকে ছাড়িয়া দিব। পুরোহিত আসিয়া আমার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষমা করিতে হইল। গোলাপের সখের জন্য অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাইয়াছি। এখন কলিকাতায় ছাদের উপর গোলাপের গাছ করিয়াছি—টবে। ভালোই ফুল হইতেছে। ইংরেজরা গোলাপকে Queen of Flowers বলে। সত্যই, গোলাপ

ফুলের রাণী। আমার মনে হয় উহারা যেন অপরূপা অপ্সরী। এইসব লইয়াই আমার ভাগলপুরের জীবন সুখময় ছিল। পারিবারিক সুখেও আমি সুখী ছিলাম। ছেলেমেয়েরা পড়াশুনায় ভালো ছিল, আমার ভাইরা যদিও নিজ নিজ কর্মস্থলে থাকিত, তবু ছুটি পাইলেই মাঝে মাঝে আমার কাছে আসিত। এবং যখন আসিত বাড়িতে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যাইত। আমার চতুর্থ ভ্রাতা লালমোহন আসিলে গানের আবহাওয়া ফুটিয়া উঠিত বাড়িতে। সে সুগায়ক ছিল, ডাক্তার ছিল সে। মফঃস্বলে থাকিত এবং অনেক সময় অনেক গল্পের প্লট আনিয়া দিত আমাকে। মণিহারী হইতে বাবা আসিয়া মাঝে মাঝে আমার নিকট থাকিতেন। মায়ের মৃত্যুর পর তিনি বড় একা হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমার কাছে যখন থাকিতেন তখনও কেমন যেন স্বস্তি পাইতেন না। সঙ্গীর অভাব অনুভব করিতেন। গল্প করিবার মতো মনের মানুষ পাইতেন না। বই পড়িতেন, রেডিও শুনিতেন কিন্তু কতক্ষণ আর বই পড়া যায় বা রেডিও শোনা যায়। তিনি এককালে কর্ম-ব্যস্ত ডাক্তার ছিলেন, বৃদ্ধ এবং অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া আমিই তাঁহাকে জোর করিয়া প্র্যাকটিশ হইতে সরাইয়া আনিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম কর্মহীন হইয়া তিনি স্বস্তি পাইতেছেন না, তখন তাঁহাকে একটি কাজ দিলাম। বলিলাম—আমি আপনাকে খাতা কলম আনিয়া দিতেছি। আপনি আপনার জীবন-চরিত লিখুন। আপনার শৈশব হইতে যৌবন পর্যন্ত সবটা লিখিয়া ফেলুন বাবা হাসিয়া বলিলেন—আমার মতো সামান্য লোকের জীবনী কি লিখিবার যোগ্য? আমি বলিলাম—আমি আপনার চরিত্র লইয়া একটি বই লিখিব। আপনার শৈশব ও যৌবনের কথা আমার ভালো জানা নাই। সেটা আপনি লিখিয়া ফেলুন। ইহাতে আপনার সময়ও কাটিবে।

বাবা আমার এ অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা সে খাতাটি এখনও আমার নিকট আছে। বাবার চরিত্রটি অবলম্বন করিয়া পরে আমি 'উদয়-অস্ত' বইটি লিখিয়াছি। ওই বইটিতে অধিকাংশ চরিত্রই কাল্পনিক। কিন্তু সূর্যসুন্দরের চরিত্রটি আমার বাবারই চরিত্র। দুঃখের বিষয় বাবা আমার এ বইটি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। বাবার মৃত্যুর পরই আমি এ বইটি লেখা শুরু করিয়াছিলাম।

আমার ভাগলপুরের বাড়িতে লোকজন, অতিথি, অভ্যাগত, গরু-বাছুর, ভেড়া, কুকুর, গিনিপিগ, খরগোস, মুরগী ছিল, সংসার-সমুদ্রে যে সব ঢেউ অনিবার্যভাবে গায়ে আসিয়া লাগে সে-সবও আমি এড়াইতে পারি নাই। এইসব জটিলতার ভিতর আর একটি উপসর্গ জুটিল। আমি ধার করিয়া একজনের নিকট হইতে একটি থার্ডহ্যাণ্ড মোটর কিনিয়া বসিলাম। মনে হইল ইহাতে সময়ের সাশ্রয় হইবে এবং প্রত্যহ চারবার ল্যাবরেটরি হইতে আসা যাওয়া করিতে গাড়িভাড়া বাবদ যে অর্থব্যয় হয় সেই টাকাতেই মোটর চালাইতে পারিব। তখন পেট্রোলের দাম ছিল প্রতি গ্যালন চৌদ্দ আনা এবং ড্রাইভারের মাহিনা ছিল মাসে ত্রিশ বা চল্লিশ টাকা। মোটরটি যখন কিনিলাম তখন বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু কিনিবার পর দুই একদিন

ব্যবহার করিয়াই মোটরটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলাম। চলিতে চলিতে সে রাস্তার মাঝে হঠাৎ থামিয়া যায় এবং লোক দিয়া না ঠেলাইলে আর চলিতে চায় না। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াইল আমার মোটরটি যে রাস্তায় প্রবেশ করিত সে রাস্তা হইতে আমার পরিচিত লোকজনেরা গা-ঢাকা দিবার চেষ্টা করিত। তাহাদের ভয় হইত মোটর থামিবেই এবং থামিলেই ডাক্তারবাবু আমাদের ঠেলিতে অনুরোধ করিবেন আর সে অনুরোধ উপেক্ষা করা যাইবে না। মোটরটি শেষে জলের দরে বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইলাম।

মোটর প্রসঙ্গে আর একজন লোকের কথা মনে পড়িল। ডাক্তার স্থরপতি ঘোষ। তাঁহারই ভাগিনেয়ের নিকট হইতে মোটরটি কিনিয়াছিলাম।

ডাক্তার স্থরপতি ঘোষ একজন অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কর্ম হইতে অবসর লইয়া তিনি ভাগলপুরে নিজেদের বাড়িতে আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন। আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। আমার লেখা পড়িতে খুব ভালোবাসিতেন। চার পাঁচটি ভাষা জানিতেন তিনি। সর্বদা বই পড়িতেন। ডাক্তার হিসাবে তিনি আমার অনেক সিনিয়র ছিলেন. বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। সেই সময় পাহাড় হইতে তাঁহার মোটর উল্টাইয়া যায়। কয়েকটি হাড় ভাঙিয়া যায়। অসহ্য বেদনার জন্য তাঁহাকে 'মরফিন' ইন্‌জেকশন দেওয়া হইত। শেষে 'মরফিন' তাঁহার চিরসঙ্গী হইয়া পড়িল। ভাগলপুরে আমার সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন তিনি দুইবেলা 'মরফিন' ইন্‌জেকশন লইতেন। কাহার সহিত বড় একটা মিশিতেন না। প্র্যাকটিশও করিতেন না। দিনরাত বই লইয়া থাকিতেন। একদিন নিজেই তিনি আমার 'নির্মোক' বইটি পড়িয়া আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। সেই হইতেই আলাপ শুরু। আমি আমার সমস্ত বই তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলাম, তিনিও অনেক ভালো ভালো ইংরেজি বই আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতেই আমি প্রথমে কোনান ডয়ালের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি পড়িয়াছিলাম। শার্লক হোমসের স্রষ্টা তাঁহার ডিটেকটিভ গ্রন্থগুলির জন্য বিখ্যাত, তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও যে এত ভালো তাহা আমাদের জানা ছিল না। স্থরপতিবাবুর অনুগ্রহে অনেক ভালো ভালো বই আমি পড়িয়াছিলাম। পালিভাষায় তিনি স্থপণ্ডিত ছিলেন। বুদ্ধদেবের প্রগাঢ় ভক্তও ছিলেন একজন। পালিভাষায় রচিত বুদ্ধদেব বিষয়ে অনেক গ্রন্থ তাঁহাকে পাঠ করিতে দেখিয়াছি। আমার মনে শ্রদ্ধার পবিত্র পটভূমিতে তাঁহার ছবি আঁকা রহিয়াছে।

মাঝে মাঝে আমার ল্যাবরেটরির জিনিসপত্র কিনিবার জন্য আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইত। সেই সময় আমি আমার প্রকাশকদের সহিতও দেখা করিতাম। সেবার ডি. এম. লাইব্রেরীতে গেলাম। গোপালদাকে অনেকদিন বই দিই নাই। তখন বেঙ্গল পাবলিশার্সকেই সব বই দিতেছিলাম। গোপালদা অনুযোগ করিলেন আমি কেন তাঁহাকে বই দেওয়া বন্ধ করিয়াছি। বলিলাম বেঙ্গল পাবলিশার্স আমার

ছেলে দুইটির পড়ার খরচ জোগায়, তাই যাহা লিখি সেখানেই দিতে হয়। আর আজকাল ল্যাবরেটরি বাড়ি হইতে দূরে হওয়ায় সময়ও বেশী পাই না। একটি পুরাতন মোটর কিনিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম সে মোটর চলিতে চায় না, থামিয়া থাকিতে চায়। তাই সেটিকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছি।

গোপালদা সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, তোমাকে কালই একটি নতুন মোটর কিনিয়া দিব। তুমি মাঝে মাঝে বই লিখিয়া টাকাটা শোধ করিয়া দিও।

ইহা আমি প্রত্যাশা করি নাই। এখন তো বই লিখিয়া বেঙ্গল পাবলিশার্সকেই দিতে হইবে। তবে বেশী যদি লিখিতে পারি আপনাকে দিব।

গোপালদা সেই শর্তেই রাজি হইলেন। গোপালদা বলিলেন—কোন্ মোটর তুমি কিনিতে চাও।

বলিলাম, কোন্ মোটর কেমন আমার কোন ধারণা নাই। এ বিষয়ে আমি একেবারে অজ্ঞ। গোপালদা বলিলেন, অনেক মোটর ইনজিনিয়ারের সঙ্গে তাঁহার আলাপ আছে। তিনি তাহার নিকট খোঁজ করিবেন।

পরদিন আমাকে বলিলেন, তাঁহার মতে অস্টীন (Austin) ভালো। চলো অস্টীনের দোকানে যাওয়া যাক। দোকানে গেলাম। সেখানকার ম্যানেজার বলিলেন—অস্টীনের লেটেষ্ট মডেল Somerset A খুব ভালো গাড়ি। অস্টীনের আর একটা বড় গাড়িও আছে, কিন্তু আমার মতে Somerset গাড়িটাই আপনার পক্ষে ভালো হইবে। গাড়িটি দেখিয়া আমার খুব পছন্দ হইল। গোপালদা গাড়িটি আমাকে কিনিয়া দিলেন। দাম লাগিল সাড়ে চোদ্দ হাজার টাকা। কথা হইল তাহাদের ড্রাইভার আমার গাড়িটি ভাগলপুরে পৌঁছাইয়া দিবে। গাড়িটি লইয়া আমার বড় মেয়ে কেয়ার বাড়ি গেলাম। কেয়ার মেয়ে,—আমার জ্যেষ্ঠা দৌহিত্রী উর্মিকে লইয়া এক চক্কর বেড়াইয়া আসিলাম। তাহার পর গাড়িটি দোকানের জিম্মায় রাখিয়া ভাগলপুরে ফিরিয়া গেলাম। পরে আমার বড় ছেলে অসীম এবং সজনীর ছেলে খোকন আমার গাড়িটি লইয়া ভাগলপুরে আসিল।

নূতন ঋণভার মাথায় চাপিল। সুতরাং লেখার বেগও বাড়াইতে হইল। মোটর কিনিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে আরও কয়েকটি জিনিস লাভ করিলাম। প্রথম লাভ, অনেকের ঈর্ষা। অনেক তথাকথিত বন্ধুর মুখে বক্র হাসি, কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গি দেখিলাম। দ্বিতীয় লাভ হইল—আমি অপ্রত্যাশিতভাবে এমন একটা জগতে প্রবেশ করিলাম যাহাদের সম্বন্ধে আগে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। সে জগৎটি মোটরের জগৎ। যে জগতে মোটরের মিস্ত্রিরা এবং ড্রাইভাররা রাজত্ব করে; যাহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে মোটর চালানো সম্ভব নয়। এ জগতে আমার প্রথম এবং প্রধান গাইড হইল শ্রীমান অমল মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর মোটর ওয়ার্কসের মালিক। সে ভাগলপুরের ওস্তাদ মোটর-মিস্ত্রি ধনুয়া মিস্ত্রির নিকট হইতে হাতে কলমে কাজ শিখিয়া স্টেশন রোডের উপর নিজে একটি কারখানা খুলিয়াছিল।

তাহার দাদা দিব্যেন্দু আমার বন্ধু ছিল। তাহার বাবাকেও আমি পিতৃব্য শ্রদ্ধা করিতাম। এই অমলই আমার মোটরমিস্ত্রি হইল। তাহার পরামর্শেই চলিতাম। মোটর সারাইবার জন্য কখনও সে আমার কাছে কোন পারিশ্রমিক লয় নাই। বরাবর অনুজের মতো ব্যবহার করিত আমার সঙ্গে। ভালো বংশেব ছেলে। তাহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ আছি। মোটর ড্রাইভার নামক সম্প্রদায়টি আধুনিক সভ্যতার সৃষ্টি। রেলের বাবু, বা থানার দারোগার মতো ইহাদেরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কথাবার্তা, চাল-চলন, চরিত্রও একটু বিশেষ ধরনের। ইহাদের একটি বৈশিষ্ট্য, সাধারণতঃ ইহারা একজায়গায় বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। আমাকেও অনেক ড্রাইভার বদল করিতে হইয়াছে। মাঝে মাঝে দুই একটি এমন চরিত্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি যাহারা আমার শিল্পবোধকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। আমাব 'হাটে বাজারে' বইটির ড্রাইভার আলা একটি সত্য চরিত্র, কাল্পনিক নহে। মোটরমিস্ত্রিদের মধ্যে অনেক চরিত্র আমার মনে দাগ কাটিয়া গিয়াছে। তাহাদের চরিত্র আমার গল্পে, উপন্যাসে আসিয়া পড়িয়াছে।

মোটব কিনিয়া আমার তৃতীয় লাভ হইল পাখী দেখা। শহরের বাহিরে দূরে দূরে পাখী দেখিতে যাইবার সুযোগ পাইলাম। ভাগলপুর শহবের বাহিরে 'সুন্দরবন' নামে মাড়োয়ারিদের খুব বড় একটা বাগান ছিল। সেখানে অনেক গাছ, অনেক ঝোপ, অনেক পাখী। সেখানে গিয়া প্রায়ই ফটিকজল পাখীর সাক্ষাৎ মিলিত। সেখানে নানারকম পাখীর ভীড়। টুনটুনি, ভগীরথ, বসন্তবৌরি, বেনে বউ, দোয়েল, বুলবুলি, নীলকণ্ঠ, খঞ্জন, রাঙা-পরি,—নানারকম পাখীর দেখা পাইয়াছি সুন্দরবনে। ওই সুন্দরবনেই প্রথমে চোর-পাখী দেখি। তাহারা গাছের ডালে ডালে হামাগুড়ি দিয়া বেড়ায়। ডাহুকপাখীর কথা পড়িয়াছিলাম, কিন্তু পাখীটিকে কখনও দেখি নাই। একজনের মুখে শুনিলাম, শহব হইতে একটু দূরে মীরজান নামক একটি পল্লী আছে, সেখানে একটি পুকুরে না কি ডাহুক আছে অনেক। মোটরযোগে আমি এবং আমার ছোট ছেলে বন্ধু (চিরন্তন) একদিন বাহির হইয়া পড়িলাম। কিছুদূর গিয়া মোটর আর চলিল না। পদব্রজেই আমরা বাপ-বেটায় রওনা হইয়া পড়িলাম এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর পুকুরটি আবিষ্কার করিলাম। পুকুরের ধাবে ধারে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর ডাহুকপাখীর ডাক শুনিতে পাইলাম। একটু পরে পাখীটিকে দেখা গেল। অনেক সময় আমি ও লীলা ভোরে বাহির হইয়া মাঠে মাঠে, বাগানে বাগানে ঘুরিতাম। মনে পড়িতেছে একটা বাগানে অপ্রত্যাশিতভাবে হুতুমপ্যাচার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। প্রদ্যোৎ যখন আসিত তখন তাহার সহিতও মোটরে বাহির হইতাম। শহর ছাড়িয়া গ্রাম্য অঞ্চলে চলিয়া যাইতাম। মনে আছে, একদিন ভোরে এক গমের ক্ষেতে সে আমাকে ভরদ্বাজ পাখী চিনাইয়া দিয়াছিল। ইহার ইংরেজী নাম Skylark, সংস্কৃত নাম ব্যাম্রাট, হিন্দী নাম ভরথা। মোটর কিনিয়া পাখীদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অনেক বাড়িয়া গেল। 'ডানা' পুস্তকের অনেক উপকরণ সংগ্রহ হইল। 'ডানা'

পুস্তক গোপালদাকে (ডি.এম. লাইব্রেরী) দিয়াছিলাম, 'ডানা' দিয়া মোটরের কিছু ধার শোধ হইয়াছিল। মোটর কিনিয়া আমার চতুর্থ লাভ হইয়াছিল বাজারের লোকদের সহিত পরিচয় এবং হৃদ্যতা। আমি প্রত্যহ মোটর করিয়া বাজারে যাইতাম। মাছ, মাংস, তরিতরকারি কিনিতাম। ক্রমশঃ মেছোদের সহিত, মাংস-বিক্রেতাদের সহিত, এবং তরকারাওয়ালা ও তরকারী-উলীদের সহিত একটা ভালোবাসার বন্ধনেও আবদ্ধ হইলাম। একটা নতুন জগৎ আবিষ্কার করিলাম তাহাদের মধ্যে। ইহাদের লইয়াই আমি 'হাটে বাজারে' বইটি লিখিয়াছি। ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম যে যদিও ইহারা অশিক্ষিত, কিন্তু অমানুষ নয়। বরং তথাকথিত শিক্ষিতদের অপেক্ষা কম ভণ্ড, মনে মুখে এক, মুখোশের বা পালিশের ধার ধারে না। ইহারা মনে হয় বেশী স্নেহ-প্রবণ। শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করিতে ইহারা কখনও দ্বিধা করে না। ভারতের সংস্কৃতি ইহাদের মধ্যেই যেন এখনও বাঁচিয়া আছে। যাহারা শিক্ষিত তাহারা নানাদেশের সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া একটা খিচুড়ি-সংস্কৃতির দাস হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা অশিক্ষিত, ভারতীয় সংস্কৃতিই তাহাদের আশ্রয়। তাহারা পা ফাঁক করিয়া সিগারেটও খায় না, দিদিমাকে কাঁটা চামচে খাওয়াইবার চেষ্টা করে না। ইহাদের দোষও অনেক আছে, কিন্তু সেসব দোষ শিক্ষিতদের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণ বর্তমান। দুশ্চরিত্র, মাতাল, চোর, মিথ্যাবাদী, ঘোরতর স্বার্থপর লোক শিক্ষিতদের মধ্যেই বেশী দেখিয়াছি।

মোটর কিনিয়া আমার পঞ্চম লাভ হইয়াছিল লম্বা লম্বা ভ্রমণ। যখনই জীবন একঘেয়েমি মনে হইত তখনই বাহির হইয়া পড়িতাম। মন্দার হিল (বৌসি), দেওঘর, দুমকা অনেকবার গিয়াছি। ভাগলপুর হইতে কলিকাতাও কয়েকবার আসিয়াছি। মোটরে আসিবার বিশেষ আনন্দ যেখানে খুশি যাও, যেখানে খুশি, যতক্ষণ খুশি বিশ্রাম কর। মোটরে যান্ত্রিক কোনও গোলযোগ হইলে সে আর এক-রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ভয়, অনিশ্চয়তা, ক্রোধ, হতাশা, উৎকণ্ঠার সহিত রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিকতার (Adventure) রসও মিশ্রিত আছে তাহাতে।

পূর্বেই বলিয়াছি এ সময় আমার সাহিত্যসাধনার বেগ বাড়াইয়াছিলাম। দিনে সময় পাইলেই লিখিতাম। রাতে তো লিখিতামই। সেকালের অনেক শারদীয়া সংখ্যায় লিখিতে হইত। সেইজন্য অনেক ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছিলাম সেই সময়। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন আমি এতো গল্প ও উপন্যাসের প্লট কি করিয়া পাই। লেখক সতীনাথ ভাদুড়ীও আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলাম—নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লওয়ার মতো লেখাটাও আমার পক্ষে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাল্যকাল হইতে ক্রমাগত লিখিতেছি তো। প্লট কি করিয়া মাথায় আসে তাহা জানি না। ওটা বোধহয় ভগবানের লীলা বা অনুগ্রহ। সত্যই, আশ্চর্যভাবে নানারকম প্লট মাথায় আসিত। কি করিয়া আসিত জানি না। আর আসিলেই আমি কালবিলম্ব না করিয়া সেটি লিখিয়া ফেলিতাম। লিখিয়া দুই একদিন ফেলিয়া রাখিতাম। তাহার পর নিজেই

সেটি পুনরায় দেখিয়া কাটাকুটি করিতাম। তাহার পর পরিষ্কার করিয়া আবার লিখিতাম। আমার মাস্টারমশাই ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় আমাকে মাঝে মাঝে ভর্ৎসনা করিয়া চিঠি লিখিতেন—তুমি এত বেশী লিখিতেছ কেন? ধীরেসুস্থে লেখ। তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া যাইও না। কিন্তু আমি থামিতে পারিতাম না। আমি কেবল চেষ্টা করিতাম গতানুগতিক একঘেয়ে প্রেমের গল্প বা পল্লীজীবনের দুঃখময় নাকে-কান্না আমার লেখায় যেন না ফুটিয়া ওঠে। পল্লীসমাজের গল্প শুনিয়া শুনিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলাম।

এই প্রসঙ্গে আর একটি লোকের কথা মনে পড়িল। স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা। তিনি তখন আর্ট প্রেসের মালিক ছিলেন। তিনি কিছুদিন পূর্বে 'সচিত্র ভারত' নামে একটি চমৎকার সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। আর্ট পেপারে ছাপা সুদৃশ্য পত্রিকাটি। অনেক ছবি এবং কার্টুন। আমাকে বলিয়াছিলেন--তোমার গল্প চাই। দক্ষিণা পাঁচ টাকার বেশী দিতে পারিব না। কাগজটি ছাপিতেই অনেক ব্যয় হয়, তোমাদের দক্ষিণা তাই বেশী দিতে পারিব না। লেখা কিন্তু চাই। ও রকম একটা পরিচ্ছন্ন সুমুদ্রিত কাগজে লিখিতে পারাটাই একটা সৌভাগ্য, ইহাই আমার মনে হইয়াছিল। টাকাটা উপরি পাওনা। তাঁহার কাগজে অনেক গল্প লিখিয়াছি। পরিমল, সজনী, তারাশঙ্কর কাগজটির সংস্রবে আসিয়াছিল। নরেনবাবুর মতো অমন অভিজাত ভদ্রলোক বেশী দেখি নাই। তিনি স্যার আর. এন. মুখোপাধ্যায়ের ভাই ছিলেন। বিলাসীও ছিলেন খুব। শুনিয়াছি দাঁত তুলাইবার জন্য প্লেনে করিয়া তিনি জার্মানী গিয়াছিলেন, যাহাতে দাঁত তুলিতে একটুও কষ্ট না হয়। সর্বদাই সাহেবী পোশাকে থাকিতেন। কানে কিছুই শুনিতে পাইতেন না। সঙ্গে একটি নল থাকিত; তাহার এক প্রান্ত কানে লাগাইয়া দিয়া অন্য প্রান্তটি বাড়াইয়া দিতেন। সেখানে একটি ধাতুনির্মিত ফানেলের মতো ছিল। সেই ফানেলের ভিতর কথা বলিলে তিনি শুনিতে পাইতেন। আমাকে বারবার বলিতেন তোমার লেখার সম্মান-মূল্য দিতে পারি না বলিয়া আমি লজ্জিত। যখনই আমি কলিকাতা আসিতাম তখনই আমার সহিত আসিয়া দেখা করিতেন এবং কখনই শুধু হাতে আসিতেন না। কখনও সন্দেশ, কখনও কেক বা কোনও বই আনিতেন। মনে আছে একবার একটা ভেড়ার রাং আনিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়িতে অনেকবার নিমন্ত্রণ খাইয়াছি। তাঁহার স্ত্রীকে আমার খুব ভালো লাগিত। তিনি যেন সেকালের মা ছিলেন একজন। অত্যন্ত সুমিষ্ট আলাপ। রান্নাও জানিতেন অনেক রকম। দেশী রান্না তো জানিতেনই, বিদেশী রান্নাও জানিতেন বহু প্রকার।

বাঙালীরা কোনও ব্যবসা বজায় রাখিতে পারে না। নরেনবাবুর আর্ট প্রেসও ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া গেল। সচিত্র ভারতের সে চাকচিক্য আর রহিল না। তাহা আকারে ক্ষুদ্র এবং প্রকারে বিশেষত্বহীন হইয়া পড়িল। তবু কাগজটার কার্তিত ছিল। নরেনবাবুর অনুরোধে 'সচিত্র ভারতে' আমি 'কষ্টিপাথর' এবং 'ভুবন সোম' লিখিয়া

ছিলাম। 'কষ্টিপাথরে' কয়েকটি প্রেম-পত্র আছে। স্বামী স্ত্রীকে লিখিতেছে। পত্রগুলি পড়িয়া নরেনবাবু বলিয়াছিলেন—প্রথম যৌবনে যদি তোমার এই চিঠিগুলি পাইতাম স্ত্রীকে লিখিবার জন্য আমাকে দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না।

তাঁহার মৃত্যুর পর সচিত্র ভারতের ভার তাঁহার একমাত্র পুত্রের উপর ন্যস্ত হয়। তিনি কাগজটি চালাইতে পারেন নাই। কয়েকবার হস্তান্তরিত হইয়া অবশেষে কাগজটি উঠিয়া যায়।

যে 'প্রবাসী' পত্রিকায় আমার সাহিত্যজীবনের শুরু—সে প্রবাসী পত্রিকাও এখন মৃতপ্রায়। অতিশয় ক্ষীণাঙ্গ। মাঝে মাঝে বাহির হয়। সেকালের আরও কয়েটি মাসিকপত্রে আমি লিখিতাম। 'ভারতবর্ষ,' 'শনিবারের চিঠি', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'ভারতী', 'মাসিক বসুমতী'—ইহাদের একটিও আর বাঁচিয়া নাই। 'সবুজপত্র' কাগজে কখনও লিখি নাই। কিন্তু কাগজটি আমার সাহিত্য জীবনে ইহার পবিত্র অভিনবত্বের জন্য আমার মনে উদ্দীপনার সাড়া জাগাইয়াছিল। সবুজপত্রও বেশীদিন সবুজ থাকে নাই—কিছুদিন পরেই ঝরিয়া পড়িয়াছিল। আমরা যখন খুব ছোট তখন কয়েকটি কাগজ আমাদের বাড়িতে আসিত। 'বান্ধব,' 'সুপ্রভাত,' 'নব্যভারত,' 'কৃষক,' 'বঙ্গদর্শন' (রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত)—এসব কাগজ বহুদিন আগে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহাদের নামও অনেকের মনে নাই আজকাল। ছোটদের কাগজ ছিল শিশু, মুকুল, সখা ও সাথী—সবগুলিই আমাদের বাড়ি আসিত। প্রত্যেকটি কাগজই অতি চমৎকার ছিল। আজকাল এসব কাগজের মতো ছোট ছেলে-মেয়েদের কাগজ দেখি না। বাঙালী অনেক ভালো কাজ শুরু করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকাইয়া রাখিতে পারে না। ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বই এর দোকান, গিরিনদার বুক কোম্পানী, বটকৃষ্ণ পালের ঔষধের দোকান, নবীন ময়রার রসগোল্লার দোকান, দ্বারিকের সন্দেশের দোকান—সব উঠিয়া গিয়াছে। পুরাতন কয়েকটি দোকান এখনও নামে টিকিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহাদের সে গৌরব আর নাই। সে সততাও আর নাই। এই প্রসঙ্গে হঠাৎ বুক কোম্পানীর গিরিনদার কথা মনে পড়িল। আমি তখন মেডিকেল কলেজে পড়িতাম। তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটে আমার মেস ছিল। বুক কোম্পানী ছিল আমাদের মেসের খুব কাছে কলেজ স্কোয়ারের পশ্চিম দিকে। বুক কোম্পানী হইতেই আমার ডাক্তারী বইগুলি কিনিলাম। তাহার পর গিরিনদা কি করিয়া যেন জানিতে পারিলেন—আমি বনফুল ছদ্মনামে 'প্রবাসী'তে লিখি। আমাকে বলিলেন—আপনি সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও বই তো কেনেন না। বলিলাম, কিনিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু কিনিবার পয়সা নাই।

গিরিনদা তৎক্ষণাৎ বলিলেন—আপনি যদি পড়িতে চান আপনাকে বই দিব। মলাট দিয়া পড়িবেন, বইটিতে যেন ময়লা না লাগে। পড়া হইলেই ফেরৎ দিয়া যাইবেন। গিরিনদার দোকান হইতে অনেক বই প'ড়িয়াছিলাম। মনে হইতেছে কণ্টিনেন্টাল সাহিত্যের সহিত আমার পরিচয় গিরিনদার দাক্ষিণ্যের জন্যই হইয়াছিল। মনে

পড়িতেছে Maxim Gorky-র Mother গিরিনদাই আমাকে পড়াইয়াছিলেন। টলস্টয়ের ছোট গল্প, সিমেন্ট বলিয়া আর একটি রাশিয়ান উপন্যাসের অনুবাদ (গ্রন্থকারের নাম মনে নাই) মমের বই সবই গিরিনদার দোকান হইতে পড়িয়াছি। ক্রমশঃ তিনি ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অনুগ্রহে আমার নানা দেশের সাহিত্যের সহিত পরিচয় ঘটিল। গিরিনদার মতো পুস্তক-বিক্রেতা কি আজকাল আছে? সেকালের কথা ভাবিতে গিয়া এবং সেকালের সহিত একালের তুলনা করিতে গিয়া একটি কথাই মনে হইতেছে। চাকুরিজীবী এবং চাকুরি-সর্বস্ব বাঙালী আজ বড দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ আমলে বাঙালী অনেক চাকরি পাইত, বস্তুতঃ ইংরেজদের খোসামোদ করিয়া সে-ই শাসনকার্য চালাইত। এখন সে বড় দরিদ্র। সে দারিদ্র্যের প্রভাব তাহার মহত্ত্বকে নীচুতায় পরিণত করিয়াছে। বাঙালী আজ অন্তঃসারশূন্য বাহ্যাড়ম্বর বজায় রাখিতে গিয়া মিথ্যাচারী হইয়া পড়িয়াছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব, পরশ্রীকাতরতা, ঔদ্ধত্য, আত্ম-বিজ্ঞাপন, মিথ্যাভাষণ আজ তাহাদের মধ্যে প্রকট। পুরাতন মহত্ত্ব, মনীষা লোপ পাইতেছে। নূতন মহত্ত্ব ও মনীষা জন্মগ্রহণ করিতেছে না। এই চোঙ্‌প্যাণ্ট হাফশার্ট পরা ট্যাঁস সমাজে বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। কারণ ভারতীয় সভ্যতার প্রাণরস হইতে ইহারা বঞ্চিত। ইহাদের আদর্শ হয় আমেরিকা না হয় রাশিয়া। তাহাদের মতো শক্তি বা মনীষা ইহাদের নাই। ইহারা তাহাদের আঁস্তাকুড়ে দাঁড়াইয়া তাহাদের উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়। আমাদের দেশের ভালো ভালো ছেলেমেয়েরা খোলাখুলিভাবেই আজ আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মানী, ফরাসী দেশে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের স্বদেশ-প্রীতি নাই, তাহারা উপার্জনের লোভে সেখানে গিয়াছে এবং তাহাদের চোখ ধাঁধানো সভ্যতা দেখিয়া গদগদ হইতেছে। তাহাদের দো-আঁশলা সন্তান-সন্ততিদের যে কি গতি হইবে তাহা ভবিষ্যৎই জানে। তবে মনে হয় সু-গতি হইবে না, দুর্গতি হইবে। এখনই আমেরিকা ও ইংলণ্ড এইসব বেনোজল রোধ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পরোধর্ম যে ভয়াবহ এ কথা প্রাচীন ঋষিরা বারবার বলিয়া গিয়াছেন। আমরা অনেকদিন স্বাধীন হইয়াছি। আটাশ বছর পার হইয়া গেল। কিন্তু স্বাধীন ভারত এখনও তাহার স্বাধীন রাষ্ট্রে ভারতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না। যাহা সে করিয়াছে সবই বিদেশের নকল। অবশেষে কুমারীদের গর্ভপাতও আইন-সঙ্গত করিতে হইয়াছে। আমরা অত্যন্ত স্বার্থপর হইয়াছি। যে ধর্মের জন্য ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর শ্রদ্ধাভাজন সে ধর্ম আমাদের স্বাধীন ভারতে কোনও স্থান পায় নাই। যাঁহাকে 'জাতির জনক' আখ্যা দিয়া প্রতিবছর আমরা লোক-দেখানো শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি সেই ভদ্রলোক আমাদের 'ভারতীয়' হইতে বলিয়াছেন কিন্তু তাঁহাকে আমরা হত্যা করিয়াছি। ভোট-শিকারী, চোরাবাজারী এবং কৌশলী খলিফারা আজ দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতেছে। বাঙালীরা আজ তাঁহাদেরই মোসাহেবী করিতে ব্যস্ত। প্রকৃত গুণী এবং ভদ্রলোকেরা

আত্মগোপন করিয়া কোনক্রমে আড়ালে আবডালে টিকিয়া আছেন মাত্র। এই হতভাগা সমাজে 'পপুলার' হইবার জন্য অধিকাংশ সাহিত্যিক সাহিত্য-রচনা করিতেছেন। কিন্তু এ যুগে মহৎ সাহিত্য কতটুকু হইয়াছে তাহার বিচার ভবিষ্যৎ যুগের সাহিত্যরসিকেরা বিচার করিয়া হতাশই হইবেন সম্ভবতঃ।

কথায় কথায় প্রসঙ্গান্তরে চলিয়াছি। ভাগলপুরের কথায় ফিরিয়া যাই। ভাগলপুরে লেখা আর ডাক্তারী ছাড়া উল্লেখযোগ্য কথাও কিছু নাই। আমার ল্যাবরেটরির কাজ একঘেয়ে কাজ। তাহাতে বৈচিত্র্য কিছু ছিল না। বৈচিত্র্য ছিল আমার রোগীগুলির মধ্যে। মেথর, ডোম, চামার, গয়লা, মেছো, কশাই, রিক্‌শাওলা, ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান—ইহারাই আমার রোগী ছিল। মুসলমান কশাইরা, তরকারী-উলীরা, চাল, ডাল বিক্রেতারা খুব ভক্ত ছিল আমার। মাড়োয়ারি রাম-অওতার এবং ফটোগ্রাফার হরি কুন্‌জর কথা কখনও ভুলিব না। হরি কুন্‌জ হিন্দী সাহিত্যের চর্চা করিত, সেটি ছিল তাহার নেশা। পেশা ছিল ফোটোগ্রাফি। আমার সাহিত্যের হিন্দী অনুবাদ পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিল সে। প্রায়ই আমার বাড়িতে আসিত। লীলাকে 'মাতাজি' বলিত। ফোটোগ্রাফার হিসাবেও সে প্রথম শ্রেণীর ছিল। আমাদের অনেক ফোটো তুলিয়াছে সে। তাহারই তোলা আমার একটা 'Enlarged' রঙীন ফোটো সে আমাকে উপহার দিয়াছিল। ফোটোটি এখনও আমার কাছে আছে, আর আছে তাহার মধুময় স্মৃতি। রাম-অওতার ধনা মাড়োয়ারি। 'আনন্দ প্রেস' নামে একটি বড় প্রেস আছে তাহার। সে একজন সাহিত্য প্রেমিকও। বাংলা পড়িতে পারে না, কিন্তু বুঝিতে পারে। আমার লেখার হিন্দী-অনুবাদ পড়িয়াই সে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। অযাচিতভাবে সে যে আমার কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। অযাচিতভাবে সে আমাকে লেখার প্যাড দিয়া যাইত, লিখিবার জন্য ভালো কাগজের খাতা বাঁধাইয়া দিয়া যাইত, মানা করিলে শুনিত না। তাহার দেওয়া খাতায় অনেক বই লিখিয়াছি। আমি যখন ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসি তখন আমার যাবতীয় জিনিসপত্র গুছাইয়া প্যাক করিয়া যে সাহায্য সে আমাকে করিয়াছিল তাহা নিকট আত্মীয়রাও করে না। ভাগলপুরের অবাঙালীদের স্মৃতিই আমার মনে রঙীন এবং মধুর হইয়া আছে। প্রেমের চাবি দিয়া সব তালাই খোলা সম্ভব। বাঙালীদের উন্নাসিকতা এবং ভুয়া উচ্চমন্যতা বাঙালীদের বৃহত্তর বিহারী-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বাঙালীরা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ বলিয়া সেখানে চাকুরি পাইতেছে না, বাঙালীরা শিক্ষার ক্ষেত্রেও নিজেদের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছে না। এই সব কারণে বাঙালীদের অবস্থা বিহারে দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। কিন্তু আমরা তিন-পুরুষ বিহারে বাস করিয়াছি, আমরা বিহারীদের মধ্যে অনেক মহৎ গুণ লক্ষ্য করিয়াছি। বাঙালীরা যেখানে কৃতী, যেখানে সে নিজের গুণের পরিচয় দিয়াছে, যেখানে সে বিহারীদের আপন করিয়া লইতে পারিয়াছে—সেখানেই সে বিহারীদের ভক্তি শ্রদ্ধা

অর্জন করিয়াছে। বিহারপ্রবাসী বাঙালীরা পূর্বে সকলেই স্বনামধন্য কৃতী পুরুষ ছিলেন। বিহারীরা আজ তাহাদের নাম শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করে। কিন্তু 'আমি অমুক রাজার নাতি' বলিলেই খাতির পাওয়া যাইবে না, যদি নাতিটি অপদার্থ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর কীর্তিমান বাঙালীদের নাম ভাঙাইয়া আমাদের আর কতদিন চলিবে? আমরা কিন্তু তাহাই করিয়া চলিয়াছি। আমাদের বিবেকানন্দ, আমাদের রবীন্দ্রনাথ, আমাদের জগদীশচন্দ্র, আমাদের প্রফুল্লচন্দ্র, এইসব বারবার আওড়াইলে আমাদের উন্নতি বা প্রগতি হইবে না। ইঁহাদের লইয়া বার বার সভা আর জয়ন্তী করিয়া আমরা যে আস্ফালন করিতেছি তাহা হীনমন্যতারই পরিচায়ক। খোঁজ করিলে দেখা যাইবে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ বসু বা প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে অজ্ঞ। ইঁহাদের নাম লইয়া হুজুকে মাতিবার প্রবণতাই আমাদের বেশী। তাঁহাদের বাণী, তাঁহাদের জীবনের আদর্শ আমাদের একটুও উদ্বুদ্ধ করে নাই। করিলে এ দুর্দশা আমাদের হইত না।

আত্ম-নিন্দা অনেক করিলাম—এইবার অন্য কথা বলি। আমার জীবনে নানা ধরনের চাকর জুটিয়াছে। তাহাদের কয়েকজনের পরিচয় দিব। অধিকাংশ চাকরই চোর হয়। আমি যখন আজিমগঞ্জে ছিলাম তখন একটি বিশেষ ধরনের চোর চাকর আমার ভাগ্যে জুটিয়াছিল। সে কেরোসিন তেল চুরি করিয়া খাইত। প্রথম প্রথম ধরিতে পারি নাই। তাহাকে বহাল করার পর হইতে কেরোসিন বড় তাড়াতাড়ি ফুরাইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় রোজই বলিত, কেরোসিন ফুরাইয়াছে। প্রায় রোজই সে কেরোসিন কিনিতে যাইত। একদিন কেরোসিন কিনিতে গিয়া সে ফিরিল না। তখন তাহাকে খুঁজিবার জন্য আমিই বাহির হইলাম। কিছুদূর গিয়া দেখি সে রাস্তায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। সেদিন মাত্রা একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল। কাছে গিয়া দেখি মুখ হইতে কেরোসিনের গন্ধ বাহির হইতেছে। পাশে বোতলটা পড়িয়া আছে, তাহাতে একটুও কেরোসিন নাই। লোক ডাকিয়া স্ট্রেচার করিয়া তাহাকে হাসপাতালে লইয়া গেলাম। স্টমাক পাম্প করিয়া যাহা বাহির করিলাম তাহার অধিকাংশই কেরোসিন তেল। পরে সে স্বীকার করিল যে সে নেশার জন্য রোজ কেরোসিন তেল খায়। তাহার আর একটি গুণ ছিল। বাড়িতে অতিথি অভ্যাগত আসিলে প্রশ্ন করিত আপনারা কয়দিন থাকিবেন? আমার বাবাকেই সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল একদিন। বাবা বলিলেন—আমি অনেকদিন থাকিব। এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? সে বলিল—তাহা হইলে আমার মাহিনা বাড়াইয়া দিতে হইবে। কারণ বাড়িতে লোক বাড়িলেই কাজ বাড়ে। তাহার নাম ছিল বিরজু।

আর একটি চাকরের কথা মনে পড়িতেছে। তাহার নাম ছিল 'ধরাসন'। অত্যন্ত বাক্যবাগীশ ছিল লোকটা। অভিভাবকের মতো নানা রকম উপদেশ দিত। আমার একটি কুকুর ছিল। লীলা তাহাকে রোজ দুধ-ভাত দিত। ইহা দেখিয়া ধরাসন বলিল—আপনাদের এ কেমন দুর্বুদ্ধি। মানুষ দুধ পায় না, আপনারা একটা কুত্তাকে

দুধ খাওয়ান রোজ। এ তো চক্ষে দেখা যায় না। সে নিজেও প্রচুর খাইত। আধ সের চালের ভাত এবং তদুপযুক্ত ডাল ও তরকারি তাহার রোজ চাই-ই। একটু কিছু কম হইলে রাগারাগি করিত।

ভাগলপুরে অনেক রকম ঝি, চাকর এবং ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। অধিকাংশই চৌর্যাপরাধে ধরা পড়িয়া বিতাড়িত হইত। একটি মৈথিল চাকরের কথা মনে পড়িতেছে। মাথায় তাহার প্রকাণ্ড টিকি। লোকটি বেঁটে। আমি তখন তিন-বার মাংস খাইতাম। সকালে বাসী মাংস দিয়া লুচি, দুপুরে গরম মাংসের ঝোল ভাত, রাত্রেও তাই। মৈথিল ঠাকুরটিকে বহাল করিবার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি মাংস খাও তো? যদি খাও বেশী মাংস কিনিতে হইবে। সে জিভ কাটিয়া বলিল—না বাবু, হামি মোংস্ (মাংস) খাই না। কিন্তু কয়েকদিন পরেই লক্ষ্য করিলাম খাওয়ার সময় রোজ মাংস কম পড়িতেছে। একদিন ঠাকুরটি হাতে-নাতে ধরা পড়িল। দেখিলাম সে একবাটি মাংস সরাইয়া রাখিয়া গপ্‌গপ্ করিয়া খাইতেছে। তাহাকে টিকি ধরিয়া টানিয়া বাহির করিলাম এবং বেদম প্রহার দিলাম। তখন আমার দ্বিতীয় রিপুটা অশোভনরকম প্রবল ছিল। আর একটি চাকরের কথা মনে পড়িতেছে। তাহার নাম ছিল কারু। নিজেকে সে খুব বুদ্ধিমান মনে করিত। কিন্তু ও রকম বোকা লোক আমি দেখি নাই। বিছানা তখন চৌকিতে হইত। মশারি টাঙাইতে হইত দড়ি দিয়া। এই মশারি টাঙাইতে কারুর প্রায় একঘণ্টা লাগিত। চারকোণা কিছুতেই সমান হইত না। একটা কোণা ঠিক করিলে আর একটা কোণ উঁচু হইয়া যায়। মশারি টাঙাইবার পর সে একটা দিক খুলিয়া রাখিত। শুইতে গিয়া দেখিতাম মশারির ভিতর প্রচুর মশা। কারুকে প্রশ্ন করিলাম—তুমি একটা দিক তুলিয়া রাখ কেন? কারু বিজ্ঞের মতো হাসিয়া জবাব দিল—তাহা হইলে আপনি ঢুকিবেন কি করিয়া। কারু লোক খুব খারাপ ছিল না। তাহার বিবাহে কিছু অর্থসাহায্য করিয়াছিলাম। তাহার ন'বছরের 'কনিয়া' (বধূ) আনিয়া সে একদিন আমাদের দেখাইয়া গিয়াছিল। কারুর আর একটি কীর্তি আমার মনে পড়িতেছে। তখন লীলা আমার কাছে ছিল না। বি. এ. পরীক্ষা দিবার জন্য বাপের বাড়ি কলিকাতায় গিয়াছিল। ইক্‌মিক্ কুকারে আমার ভাত ও মাংস রান্না হইত। কারু একটি তরকারী ও ডাল রাঁধিত। মাছ মাংস খাইত না সে। ভাগলপুরে শুক্রবার দিন মাংস পাওয়া যাইত না। মাছ কিনিতাম। একদিন বড় একটি শিলং মাছের টুকরো কিনিলাম। ওজন প্রায় তিন-পোয়া হইবে। খাইবার সময় দেখিলাম কারু মাছটি কাটে নাই। তিন-পোয়া মাছের গোটা টুকরাটাই সে একটা প্লেটে রাখিয়া আমাকে দিয়া গেল। আমি বলিলাম—এ কি করিয়াছ? মাছ কাটো নাই কেন? কারু জবাব দিল—কুটিয়া লাভ কি? সবটা তো আপনিই খাইবেন। কাটাকুটি করিয়া আর কি হইবে? বলিলাম, মাছের ভিতরটা কাঁচা নাই তো। সে বলিল এক কড়াই জলে অনেকক্ষণ সিদ্ধ করিয়াছি তাহার পর তেল মশলা পেঁয়াজ দিয়া

ভাজিয়াছি। তাহাতেও যদি সিদ্ধ না হয়, আমি নাচার। লঙ্কা এবং পেঁয়াজ প্রচুর দিয়াছিল, খাইতে মন্দ হয় নাই। মাছটাও ভালো ছিল। সুতরাং সেদিন ভাত কম খাইয়া মাছ দিয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। কারুর কিছু জমি ছিল, সে কিছুদিন পরে গ্রামে গিয়া চাষবাসে মন দেয়।

জীবনে যত চাকর পাইয়াছি তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আমার মেথর চাকর সিতাবী। ভাগলপুরে প্রথম ল্যাবরেটরি খুলিয়াই মুন্নিকে বহাল করিয়াছিলাম। মুন্নি মারা গেলে তাহার পুত্র সিতাবীকে বহাল করি। আমি যতদিন ভাগলপুরে ছিলাম সে আমার কাছে ছিল। চাকার হিসেবে সর্বগুণান্বিত ছিল সে। চোর ছিল না, কথা খুব কম বলিত। সবরকম কাজ কবিত। মেথর ছিল, সুতরাং সবরকম কাজ করিত। মল-মূত্র পরিষ্কার তো করিতই, আমার বাজার করিত, মুরগী কাটিয়া দিত, আমার ছেলেমেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। আমার 'ফি' অনেক সময় আমি টেবিলে ফেলিয়া যাইতাম। একদিনও তাহা এদিক ওদিক হয় নাই। আমার গোলাপগাছ-গুলিরও তদারক কবিত সে। তাহাব বিধবা মা প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসিত। লীলার নিকট হইতে খাবার এবং প্রয়োজন হইলে পুরাতন শাড়ি লইয়া যাইত। আমার কাছে চাকরি করিতে কবিতে সিতাবীর বিবাহ হয়। কয়েক বছরের মধ্যে সন্তান-সন্ততিও হইল কয়েকটি। একটিমাত্র ছেলে (বীরুয়া) আর বাকী সব মেয়ে। সিতাবাব কথা কখনও ভুলিব না। তাহার স্ত্রী যক্ষ্মারোগে মারা যায়। কিছুদিন তাহাকে আমি টাটকা খাসির রক্ত খাওয়াইয়াছিলাম। ছাগলের যক্ষ্মা হয় না। আমার মনে হইল ছাগলের রক্তে যক্ষ্মা-প্রতিষেধক কিছু আছে নিশ্চয়। খাসির রক্ত খাইয়া কিছুদিন সে ভালো ছিল। তখন যক্ষ্মার আধুনিক চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নাই। খাসির রক্ত কিন্তু শেষরক্ষা করিতে পারিল না। একদিন হঠাৎ তাহার ফুসফুস হইতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হইল। তাহাতেই মারা গেল সে। ইহার পরই সিতাবী উধাও হইয়া গেল কিছুদিন। সিতাবীর মা এবং বড় ছেলেটা আসিয়া আমার ল্যাবরেটরির কাজকর্ম করিয়া দিত। মাসতিনেক পরে সিতাবী আর একটি বিবাহ করিয়া ফিরিল। এ বউটি বিধবা ছিল, তাহার একটি মেয়েও ছিল। সবৎসা গাভী লইয়া আবার সংসার পাতিল সিতাবী। আবার তাহাকে বহাল করিলাম। তাহার পর হইতে বরাবর সে আমার কাছে ছিল। আমার দক্ষিণ হস্ত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সব কাজ করিতে পারিত সে। আমার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তখন ডাকযোগে পাঠাইতে হইত, নিপুণভাবে পার্শেল করিয়া দিত সিতাবী। একবার লীলা ছিল না, লক্ষ্মী-পূজার সব আয়োজন সিতাবীই করিয়াছিল। বাড়িতে ঝি অনুপস্থিত হইলে সিতাবীর মা বা বউ আসিয়া বাসনও মাজিয়া দিত। ঠাকুর বা ঝি পলাতক হইলে সিতাবীই নূতন ঝি বা ঠাকুর জোগাড় করিয়া আনিত। এই প্রসঙ্গে একটি কবিরাজের কথা মনে পড়িল। তিনি আমার ল্যাবরেটরির কাছেই থাকিতেন। মাঝে মাঝে আমার ল্যাবরে-টরিতে আসিয়া গল্প-গুজব করিয়া আমার সময় নষ্ট করিতেন। ভদ্রতার খাতিরে

তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিতাম না। সেকালে পার্কার কলম খুব প্রসিদ্ধ ছিল। এই পার্কারের হলুদ রং-এর চমৎকার কলম ছিল একটি। পরিমলের নিকট প্রথম দেখিলাম কলমটি। খুব পছন্দ হইল, পরিমল বলিল আমি তোমাকে পাঠাইয়া দিব। কিছুদিন পরই কলমটি আসিল এবং আমি মহানন্দে তাহা দিয়া পরিমলের কাগজের জন্যই একটি লেখা লিখিতে লাগিলাম। যখন লিখিতেছি তখন কবিরাজ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বলিলেন—বাঃ, চমৎকার কলমটি তো। অতি সুন্দর রং।

বলিলাম, পার্কার পেন। রংটি হলদে পাখীর রঙের মতো। পরিমল আমাকে পাঠাইয়াছে কলিকাতা হইতে।

'সুন্দর কলম—' তাহার পর অন্যান্য কথা পাড়িলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাড়ির খবর সব ভালো তো?

বলিলাম—'বাড়ির খবর ভালো। তবে কয়েকদিন পূর্বে আমার ঠাকুরটি দেশে গিয়াছে। বোধহয় আর ফিরিবে না। কারণ সাতদিনের ছুটি লইয়া গিয়াছে, পনেরোদিন কাটিয়া গেল। মনে হয়, আর আসিবে না। আপনার সন্ধানে কি ভালো ঠাকুর আছে?'

কবিরাজ মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—'খুব ভালো ঠাকুর আছে একটি। আজই পাঠাইয়া দিব।'

বৈকালে দিব্যকান্তি একটি যুবক আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে বহাল করিয়া ফেলিলাম। খাইবার সময় দেখিলাম, শুধু তাহার চেহারাটাই ভালো নয়, রান্নাও অতি চমৎকার। মাছ, মাংস, নিরামিষ রান্না—সবই সুন্দর। বেশ চটপট, চালাক চতুর অথচ বিনয়ী। কয়েকদিন পর আমার হলদে কলমটি চুরি হইয়া গেল। তাহার কয়েকদিন পরেই ঠাকুরটিও অন্তর্ধান করিল সহসা। সখের কলমটি হারাইয়া বড়ই মর্মাহত হইয়াছিলাম। একদিন স্টেশনে একজনকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে গিয়াছিলাম। খুব ভিড় ছিল সেদিন। ভাবিলাম, সেই ভিড়ে কলমটি কেহ পকেট হইতে তুলিয়া লইয়াছে। কয়েকদিন পরে কবিরাজ মহাশয় আসিলেন। দেখিলাম, তাঁহার পকেটে সেই হলদে কলম। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কলম কোথায় পাইলেন? তিনি দন্তবিকশিত করিয়া উত্তর দিলেন, কলিকাতা হইতে আনাইয়াছি। আপনার কলমটি দেখিয়া খুব পছন্দ হইয়াছিল।

নির্বাক হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

প্রশ্ন করিলাম—ঠাকুরটি কোথা গেল?

কবিরাজ উত্তর দিলেন—সে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। সেখানে একজন বড়-লোক তাহাকে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়াছে।

আমার আর একটি পাচকের কথা মনে পড়িতেছে। কমবয়সী গৌরবর্ণ ছোকরা একটি। সে যখন আমার কাছে কাজ করিতেছিল তখন একটি হাসিখুশী আধাবয়সী

দাই জুটিল। দাইটি দেখিতে সুন্দরী নয়, রোগা চেহারা, তবু দেখিলাম আমার ঠাকুরটি তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। আমার ঠাকুরটি গৌরবর্ণ, তাহার উপর তাহার রক্তাল্পতা ছিল। একদিন শুনিলাম দাইটি তাহাকে সাদা ভালু (শ্বেত ভল্লুক) বলিয়া সম্বোধন করিতেছে এবং ঠাকুরটি মুচকি মুচকি হাসিতেছে। ইহার পরই আমি সপরিবারে মণিহারী চলিয়া যাই। ফিরিয়া আসিয়া পাড়াপড়শীর মুখে যাহা শুনিলাম তাহাতে অবাক হইয়া গেলাম। সকলে বলিল—আপনারা যখন ছিলেন না তখন আপনার ঠাকুরটি ছাতের উপর আপনার বেতের চেয়ারটিতে বসিত এবং আপনার দাই তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিত। দাইটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কি নাচ নাকি? সে মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেল, আর ফিরিল না। ঠাকুরটিও অন্তর্ধান করিল একদিন। ঠাকুরটি পরে অবশ্য আবার আমাব কাছে আসিয়াছিল—Hook-worm হইয়াছিল তাহার পেটে। তাহার মল পরীক্ষা করিয়া তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলাম। সে আমার বাড়িতে আবার কাজ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু হুক্‌-ওয়ার্ম-গ্রস্ত লোককে পাচক-রূপে বহাল করা সঙ্গত মনে করি নাই। ভাগলপুরে শেষদিকে আমার বাড়িতে দুর্গা চাকব, তেতরার মা দাই ছিল। দুর্গা জাতে ছিল দোষাদ। তাহার দোষও ছিল কিছু কিছু। কিন্তু চাকব হিসেবে সে ছিল দক্ষ। সিতাবীর মতোই সে ছিল অনেকটা। তেতরার মাকে আমরা দাই বলিতাম। মাতৃবৎ ছিল সে। অনেকগুলি মেয়ে, একটি ছেলে তেতরা। তেতরা তাহার দ্বিতীয় পুত্র। বড ছেলেটি মারা গিয়াছিল। স্কুলে পড়িত। ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত উঠিয়াছিল, তাহার পর মারা যায়। একদিন সে তাহার মৃত পুত্রের স্মৃতি-চিহ্ন একটি কাঁচের পেপার-ওয়েট্ (Paper-weight) আমাকে আনিয়া দিল। বলিল—"বাবু, আপনি সব সময় লিখা পঢ়ি' করেন এটি আপনার কাছে থাক। এটি যদি আপনি ব্যবহার করেন আমার 'দিল' ভরে যাবে। আপনি এটা রাখুন বাবু।" দাইয়ের দেওয়া সেই পেপার-ওয়েট্টি এখনও আমার কাছে আছে। আমার লেখাব টেবিলের উপব থাকে। দাইয়ের মেয়েরা, নাতি-নাতনীরা প্রায় সমস্তদিনই আমার বাড়িতে থাকিত। তেতরার একটি ছেলে হইয়া বউটি মারা যায়। তেতরার সেই ছেলে বিজয় আমাদেরই বাড়িতে মানুষ হইয়াছিল। আমার ছোট মেয়ে করবী তাহার দেখাশোনা করিত। সে যখন একটু বড় হইল সরস্বতীপূজার দিন তাহার হাতে-খড়ি দিলাম। করবী তাহার গার্জেন-টিউটার হইল। বিজয় ক্রমশঃ আমাদেরও সঙ্গী হইয়া উঠিল। নানারকম ফাইফরমাস খাটিত। মুরগীগুলিকে ঘরে ঢুকাইত, খাইতে দিত, আমার খরগোস ও গিনিপিগদের তত্ত্বাবধান করিত। আমার ভুটান, জুলু, জাম্বু, রকেট এই চারিটি কুকুরেরও সঙ্গী ছিল সে। অর্থাৎ সে আমাদের বাড়িরই একজন পরিজন হইয়া গিয়াছিল। আমরা যখন কলিকাতায় চলিয়া আসি তখন তাহাদের ছাড়িয়া আসিতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। তাহাদের ক্রন্দনরোল আজও আমার কানে বাজিতেছে। আসিবার সময় আমার মঙ্গল গাভীটি দাইকে দিয়া আসিয়াছিলাম। দাই একটি সোনার হার লীলার কাছে

রাখিয়া দিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হারটি যেন বিজয়ের বৌকে দেওয়া হয়। লীলার কাছে থাকিলে সুরক্ষিত থাকিবে এই বিশ্বাসে সে হারটি জোর করিয়া লীলার কাছে রাখিয়া গিয়াছে। তাহাদের সহিত এখনও সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই। গতবার আমের সময় বিজয় এক বোরা ভাগলপুরী ল্যাংড়া আম লইয়া আমাদের সহিত দেখা করিয়া গিয়াছে। ইহারা শিক্ষিত নয়, কিন্তু ইহাদের হৃদয়ের আলো শিক্ষিত লোকদের তথাকথিত enlightenment অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নাই। দাইয়ের খবর এখনও মাঝে মাঝে লই। সে খুব বুড়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও বাঁচিয়া আছে। দাই লীলার কাছে রান্না শিখিয়াছিল। চমৎকার বাঙালী রান্না রাঁধিতে পারিত। সুকতো চমৎকার রাঁধিত। আলুর ছেঁচকিও সুন্দর উৎরাইত তাহার হাতে। বিহারী রান্নাও মাঝে মাঝে খাওয়াইত সে। তাহার হাতের বেগুনের সুলকার স্বাদ এখনও ভুলি নাই।

অনেকরকম ড্রাইভারও আমাকে রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু 'আলি'-ই আমার মনে দাগ রাখিয়া গিয়াছে। আলীর চরিত্রে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। এ চরিত্রটি আমি আমার 'হাটে বাজারে' গল্পে অঙ্কিত করিয়াছি। তাহার চরিত্রে বিলাতী বাটলার (Butler) গোছের একটা ছাপ দিল। সে কখনই প্রভুর কথার উপর কথা বলিত না। তাহার মধ্যে একটা হৃদয়গ্রাহী মুসলমানী আদবকায়দাও আমাকে মুগ্ধ করিত। তাহার দোষ ছিল—নানারকম নেশা করিত। দাই বলিত সে নাকি 'কোকিন' ও (অর্থাৎ কোকেন) খায়। সেইজন্য প্রায়ই কামাই করিত এবং সেই-জন্যই সে শেষ পর্যন্ত চাকরি বজায় রাখিতে পারে নাই।

আমার সাহিত্যিক-জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম সাহিত্য-সভাগুলি হইতে। পূর্বেই বলিয়াছি আমার একটু খ্যাতি হইবার পর হইতেই আমি বিহারে এবং বিহারের বাইরে (বাংলাদেশ ছাড়া) নানা স্থানে সভাপতিরূপে নিমন্ত্রিত হইতাম। অসম্ভব না হইলে আমি সে নিমন্ত্রণগুলি প্রায়ই গ্রহণ করিতাম। আমার যাতায়াতের ভাড়া তাঁহারা দিতেন, লীলাকেও আমি লইয়া যাইতাম এবং তাহার ভাড়া নিজেই দিতাম। আমার কর্মব্যস্ত জীবনে অবকাশ ও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিত ইহারা। এই ছোটখাটো ভ্রমণগুলি প্রায়ই খুব উপভোগ করিতাম আমরা। আমার ছেলেমেয়েরা যখন ছোট ছিল—অর্থাৎ ভাগলপুর স্কুলেই পড়িত—তখন বেশি দূরে যাইতে পারিতাম না। দুই একবার আমার ছোট ভাই ভোলার বাসায় বরারিতে ছেলেমেয়েদের রাখিয়া গিয়াছিলাম। মনে পড়িতেছে, মুঙ্গের, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়া সেইদিনই ফিরিয়া আসা সম্ভব ছিল। কখন কোন্ সভায় গিয়াছি তাহার তারিখ আমার মনে নাই। তবু যে কয়টি স্থানে গিয়াছি সেখানকার স্মৃতি মনে আছে। সেই সব সভা উপলক্ষে কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তির সহিতও আলাপ হইয়াছিল, তাহাদের আজও ভুলি নাই।

প্রথমে ভাগলপুরের কথাই বলি। ভাগলপুর কলেজে তখন অধিকাংশ অধ্যাপকই বাঙালী ছিলেন। হরলালবাবু, গিরিধারীবাবু, অমলাপদবাবু, নারায়ণবাবু (আমরা তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতাম), রাখালবাবু, মোহিনীবাবু, নীলমণিবাবু, নিশানাথ-বাবু, কমলবাবু, ব্রজবাবু। হরলালবাবু (কেমিস্ট্রির অধ্যাপক) গোঁড়া গুরুভক্ত ছিলেন। তাঁর মেয়ের টাইফয়েড অসুখে পাদোদকের উপর নির্ভর করিয়া কোন ডাক্তারি ঔষধ খাওয়ান নাই। মেয়েটিকে পাদোদক কিন্তু বাঁচাইতে পারে নাই। ইঁহাদের সকলের সহিত আমার বেশ হৃদ্যতা ছিল। অনেকের পরিবারবর্গের সহিতও বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। অনেকের সহিত সে ঘনিষ্ঠতা এখনও বজায় আছে। অধ্যাপক হিসাবে ইঁহারা প্রত্যেকেই কৃতী ছিলেন। বাংলা-সাহিত্যের প্রতি ইঁহাদের শ্রদ্ধা ছিল প্রগাঢ়। অনেকের বাংলা-সাহিত্যে পড়াশোনাও প্রচুর ছিল। ইহা ছাড়া অনেকের আবার কিছু কিছু বিশেষ গুণপনা ছিল। রাখালবাবু কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু স্বহস্তে কাঠের আসবাবপত্রও প্রস্তুত করিতেন চমৎকার। তাঁহার স্বহস্তনির্মিত একটি কাঠের বাক্স আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। সেটি এখনও আমার কাছে আছে। নারায়ণদা অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু ইংরেজি-সাহিত্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। ইংরেজিতে চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারিতেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি, পূজা-আহ্নিক প্রত্যহ করিতেন। স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় গুরু ছিলেন তাঁহার। আমাকে নিজের ছোট ভাইয়ের মতোই স্নেহ করিতেন। গিরিধারীবাবু ছিলেন ইকনমিক্সের অধ্যাপক, কিন্তু তাঁহার বাংলা-সাহিত্যে, ইংরেজি-সাহিত্যে এবং ইতিহাসে গভীর জ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। শৌখীন লোক ছিলেন। ভালো ভালো আতর কিনিতেন। বাড়ির সামনে চমৎকার একটি গোলাপবাগানও করিয়াছিলেন। উঁচুদরের সাহিত্যরসিক ছিলেন একজন। তাঁহার আর একটি বিশেষত্ব ছিল, সমস্ত শীতকাল তিনি স্নান করিতেন না। মাঝে মাঝে তেল মাখিতেন কেবল। আমার লেখার অনেক পাণ্ডুলিপি ছাপিতে দিবার পূর্বে তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছি। আমার সঙ্গে যখন আলাপ হয়—তখন তিনি অবিবাহিত ছিলেন। কিছুদিন পরে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া নিজেই পত্নীসংগ্রহ করেন। তাঁহার সহিতও আমাদের খুব বন্ধুত্ব হইয়া গেল। তিনি বেশ সুশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। রাঁধিতেন ভালো। সাহিত্য-রসিকাও ছিলেন। এম. এ. পাশ করিয়াছিলেন বাংলায়, ভালো প্রবন্ধ লিখিতেন। ইঁহারও 'ধর্ম-বাই' ছিল। হঠাৎ একবার এক গোপালমূর্তিকে কোলে করিয়া আনিয়া কিছুদিন তাঁহার পূজা করিলেন। কিছুদিন পরে গোপালকে ত্যাগ করিয়া তারাদেবীর সাধনায় মাতিয়া উঠিলেন। শেষ পর্যন্ত তারাদেবীকে লইয়াই ছিলেন। এই পরিবারটির সহিত আমাদের বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তাহাদের পুত্রকন্যা হইল, আমাদের চোখের সামনে তাহারা বড় হইয়া উঠিল। গিরিধারী এবং তাঁহার পুত্র মারা গিয়াছে। ছেলেমেয়েরা ভাগলপুর ছাড়িয়া অন্যত্র চাকুরি করিতেছে। গিরিধারীবাবুর ছাত্রেরা তাঁহাকে দেবতার মতো ভক্তি করিত। তাহাদের মধ্যে অনেকে

প্রফেসারও হইয়াছিল। তাহারা চাকরের মতো সেবা করিত তাঁহার। বাজার করিয়া দিত, জল ভরিয়া আনিত, গিরিধারীবাবু অসুস্থ হইলে দিবারাত্রি তাহারা কাছে বসিয়া সেবা করিত। প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন গিরিধারী চক্রবর্তী। তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন দুইটি বই সযত্নে রক্ষা করিয়াছি। গোলাপ-বিষয়ক একটি বই, এবং ফ্রেজার সাহেবের লেখা Golden Bough বইটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ একটি। তাঁহার একটি ফটোও আমার কাছে আছে। নীলমণিবাবু ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। শিবতুল্য লোক। সদা-হাস্যময়, সদা-প্রফুল্ল। ইতিহাসে সুপণ্ডিত, কিন্তু তাঁহার অন্য গুণ ছিল। ভালো প্রতিমা গড়িতে পারিতেন। পূজাও করিতেন। আধ্যাত্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন নীলমণি-বাবু। ভাগলপুরে ভূতনাথ পণ্ডিত মহাশয় নামে প্রকৃত সাধক ছিলেন একজন। তিনি মুখ দেখিয়া অনেক আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিতেন। অনেক সময় অনেকের মনের নিগূঢ় বার্তাও বলিয়া দিতেন। তাঁহার কুষ্ঠ হইয়াছিল, শুনিয়াছি, তিনি সূর্য-পূজা করিয়া সে ব্যাধি সারাইয়াছিলেন। তাঁহার ডান পায়ের বুড়া আঙুলটি খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার পর কিন্তু আর কোথাও কিছু হয় নাই। নীলমণিবাবু তাঁহার প্রগাঢ় ভক্ত ছিলেন। প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় সেখানে যাইতেন এবং গীতাপাঠ করিতেন সেখানে। সেখানে প্রত্যহ গীতাপাঠের সভা বসিত একটি। ভূতনাথ পণ্ডিত মহাশয় আমার কাকাবাবুর শিক্ষক ছিলেন। আমার সঙ্গে ঠাকুর্দা-নাতির সম্পর্ক ছিল। খুব স্নেহ করিতেন আমাকে। আমার সম্বন্ধে এমন অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, যাহা মিলিয়াছে। তাঁহার চক্ষু দুটি খুব উজ্জ্বল ছিল। নীলমণিবাবু বলিতেন—তাঁহার অনেক ক্ষমতা। প্রকাশ করেন না। মানবজাতির প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে অপার অনুরাগ ও কৌতূহল ছিল। নীলমণিবাবু এ বিষয়ে আমাকে অনেক বই পড়াইয়াছেন। তাঁহার একটি উপহার—ব্রেস্টেড্-এর ইজিপ্টের ইতিহাস—এখনও আমার কাছে আছে। নীলমণি-বাবু এখনও বাঁচিয়া আছেন শুনিয়াছি। কিছুদিন আগে দেখা হইয়াছিল, দেখিলাম, গোঁফগুলি সব পাকিয়া গিয়াছে। এই অধ্যাপকরা সকলেই সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন। তাই তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে (T. N. J. College) প্রতি বৎসর খুব জাঁকজমকসহকারে সাহিত্যসভা হইত। শহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা সকলেই নিমন্ত্রিত হইতেন এবং অনেকেই সে সভায় যোগদান করিতেন। ছাত্ররা তো ছিলই। তাহাদেরও উৎসাহ অফুরন্ত। আমি প্রায় প্রতি বছর সভাপতি নির্বাচিত হইতাম। ওই সভার জন্যই অনেক প্রবন্ধ, অনেক কবিতা লিখিয়াছি। মনে পড়িতেছে, এক বছর আমি আমার 'আহবনীয়' কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছিলাম। আমি মাসিক-পত্র বা সাময়িক-পত্রের জন্য খুব কম প্রবন্ধ লিখিয়াছি। কারণ একটি ভালো প্রবন্ধ লিখিতে যে পরিমাণ শ্রম করিতে হয় সে পরিমাণ পারিশ্রমিক মেলে না, পাঠকও জোটে না। বাংলাদেশের অধিকাংশ লেখক তাই প্রবন্ধ লেখেন না। আমি সভাপতির ভাষণের জন্যই সাহিত্য ও সমাজ-বিষয়ক নানা প্রবন্ধ লিখিতাম। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতেও দুইবার প্রবন্ধ পড়িবার জন্য আহূত হইয়াছিলাম। আমার 'শিক্ষার

ভিত্তি' 'মনন' 'দ্বিজেন্দ্র-দর্পণ' বই তিনটি বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত ভাষণগুলির সমষ্টি। এখনও অনেক ভাষণ গ্রন্থাকারে গ্রথিত হয় নাই।

একবার আমি কলেজের কর্তৃপক্ষকে বলিলাম প্রতিবারই আমাকে সভাপতি করিতেছেন কেন? বাহিরের সাহিত্যিকদেরও আমন্ত্রণ করুন। তাঁহারা বলিলেন, আপনি যদি তাঁহাদের এখানে আনিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, আমাদের আপত্তি নাই। আমরা তাঁহার আসা-যাওয়ার ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছি। কিছুদিন পরে এখানে একটি মাড়োয়ারি কলেজ স্থাপিত হইল। এখানেও আমি কয়েকবার সভাপতিত্ব করিয়া বাহির হইতে সাহিত্যিকদের আনাইবার ব্যবস্থা করিলাম। তাহারও কিছুদিন পরে মহিলা কলেজ হইল। সেখানেও ওই ব্যবস্থা করিলাম আমি। ভাগলপুর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদও আমার পরামর্শে প্রতি বছর তাঁহাদের বার্ষিক উৎসবে বাহির হইতে সাহিত্যসেবীদের আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। আমিই পরিষদের সভাপতি ছিলাম। এইভাবে ভাগলপুরে বসিয়াই আমি কলিকাতার প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলাম। প্রায় সকলেই আসিয়া আমার বাড়িতেই আতিথ্যগ্রহণ করিতেন। সজনীকান্ত আর পরিমল আমার বাসায় ইতি-পূর্বেই একাধিকবার আসিয়াছিল। কিন্তু তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী এবং আরও অনেকে আসিয়াছিলেন সভা উপলক্ষেই। তারাশঙ্কর একাধিকবার আসিয়াছিল। পেটরোগা লোক ছিল সে। গুরুপাক কিছু হজম করিতে পারিত না। ঘন ঘন চা আর সিগারেট খাইত। তাহার জন্য লীলা সুকতো-জাতীয় তরকারি, পাতলা মুগের ডাল, মাছভাজা প্রভৃতি রাঁধিয়া দিত। পলতার বড়া, পোস্ত, কাঁচা মাছের টক খুব প্রিয় খাদ্য ছিল তাহার।

ভাগলপুরের এই সভা-সমিতি প্রসঙ্গে একটি অদ্ভুত স্মৃতি আমার মনে আঁকা আছে। সেটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে। মনে পড়িতেছে না এ কাহিনী আমি আর কোথাও লিখিয়াছি কি না। তবু আবার লিখিতেছি। ইহাতে বিভূতি-চরিত্রের একটি বিশিষ্ট পরিচয় আছে। ভাগলপুর কলেজে সভা হইতেছে। বিরাট সভা। বিভূতি সভাপতি, আমি প্রধান অতিথি। এ সব কলেজের সভায় ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথমে নিজেদের রচনা পাঠ করে। গান হয়, আবৃত্তি হয়। সব শেষে সভাপতির অভিভাষণ। বিভূতি দেখিলাম কেমন যেন একটু উস্‌খুস করিতেছে। আমার ভাগলপুরে আসিবার কয়েক বছর আগে বিভূতি কিছুদিন ভাগলপুরে ছিল। কলিকাতার কোন ধনী জমিদারের ম্যানেজার-রূপে কাজ করিত। ভাগলপুরে বুঢ়ানাথ শিবমন্দিরের নিকট যে 'বড় বাসা' আছে সেখানেই থাকিত বিভূতি। বাড়িটি ঠিক গঙ্গার উপরই। প্রকাণ্ড ছাদ ছিল একটি। ছাদের এক কোণে একটি ঘরও ছিল। শুনিয়াছি, বিভূতি এই বড় বাসায় বসিয়াই 'পথের পাঁচালী' লিখিয়াছিল। বিভূতি নিজেই এ কথা

বলিয়াছিল আমাকে। গঙ্গার ওপারে জমিদারি—সেখানেও সে গিয়া মাঝে মাঝে থাকিত। তাহার এই অভিজ্ঞতার ফল—'আরণ্যক' বইটি। মোট কথা ভাগলপুর সম্বন্ধে তাহার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। চেয়ারে কিছুক্ষণ উস্‌খুস্ করিয়া বিভূতি অবশেষে আমার কানে কানে বলিল—আমি একটু বাইরে যাব। সঙ্গে সঙ্গে একটি ছেলেকে ডাকিয়া বলিলাম—ইহার সঙ্গে যাও। ছেলেটিকে লইয়া বিভূতি সভা হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু গেল তো গেলই, আর ফেরে না। যখন আধঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া গেল তখন আমি একটু উদ্বিগ্ন হইলাম। তখন সভায় প্রবন্ধপাঠ চলিতেছে, তাহার পর একটি আবৃত্তি এবং তাহার পরই সভাপতিকে ভাষণ দিতে হইবে। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইয়া আবৃত্তি শুরু হইল, তখনও বিভূতির দেখা নাই। মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। এ অবস্থায় কি করা উচিত ভাবিতেছি। এমন সময় দেখিলাম বিভূতি হন্ত-দন্ত হইয়া আসিতেছে। আমার কাছে আসিয়া কানের কাছে মুখ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কতদূর হল ?'

'সভা শেষ হয়ে এসেছে। এবার তোমাকে ভাষণ দিতে হবে।'

'কি বলব বল দেখি—'

'সাহিত্য বিষয়ে যা হোক কিছু বল—'

বিভূতি মিনিটপাঁচেক কিছু বলিল। সভা শেষ হইয়া গেল।

তাহাকে একা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এতক্ষণ ছিলে কোথা ?

সে যাহা বলিল তাহা বিস্ময়কর। সে বলিল—এই কলেজের কাছে রেললাইনের ধারে একটি ডিস্‌টাণ্ট সিগ্‌নাল আছে। তাহার তলাটি সিমেণ্ট দিয়া বাঁধানো। আমি যখন ভাগলপুরে ছিলাম তখন প্রায়ই ওই ডিস্‌টাণ্ট সিগনালের তলায় আসিয়া বসিতাম। উহারই তলায় বসিয়া অনেক সূর্যোদয়, অনেক চন্দ্রোদয় দেখিয়াছি। উদার আকাশে মেঘ দেখিয়াছি, সন্ধ্যার পর নক্ষত্র উঠিতে দেখিয়াছি। স্থানটি আমার বড় প্রিয় ছিল। সভায় আসিয়া সেই ডিস্‌টাণ্ট সিগ্‌নালের কথা মনে পড়িল। সে যেন আমাকে বার বার বলিতে লাগিল—তুমি এতদিন পরে এত কাছে আসিয়াছ, আমার সহিত দেখা করিয়া যাইবে না ? আমি তাই সেই সিগনালটি দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার তলায় মাত্র পাঁচ মিনিট বসিয়াছি। বিশ্বাস কর পাঁচ মিনিটের বেশি বসি নাই। কিন্তু জায়গাটা যত কাছে ভাবিয়াছিলাম তত কাছে নয়। এখান হইতে প্রায় এক মাইল। আসিবার সময় আমি মাঠামাঠি আসিয়াছি।

দেখিলাম তাহার কাপড়ে অনেক চোরাকাঁটা লাগিয়া রহিয়াছে। পা ভরতি ধুলো। বিভূতি অপ্রস্তুতমুখে অপরাধীর মতো আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি এক নূতন বিভূতিকে দেখিলাম।

তারাশঙ্কর অনেক সময় সভায় মেজাজ ঠিক রাখিতে পারিত না। এই উপলক্ষে ভাগলপুরের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্বর্ণ-জয়ন্তীর কথা মনে পড়িতেছে। স্বর্ণ-জয়ন্তী পরিচালনা করিবার জন্য একটি পরিচালক-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। আমি ছিলাম

সে সমিতির সভাপতি। ঠিক হইল দুইদিন উৎসব হইবে। কলিকাতার খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের, গায়কদের এবং গুণীদের নিমন্ত্রণ করিব আমরা। পরিষদের আর্থিক অবস্থা খারাপ বলিয়া আমরা টিকিট করিয়া সভা করিব স্থির করিলাম। অর্থাৎ বিনা টিকিটে কেহ সভায় যাইতে পারিবে না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাড়ির ছাদে ফাটল দেখা দিয়াছিল, অর্থাভাবে বই কেনা হইতেছিল না, চাঁদা ছিল নামমাত্র, তাহাও আদায় হইত না। তাই আমরা ঠিক করিয়াছিলাম টিকিট করিয়া কিছু টাকা তুলিয়া পরিষদের কিছু অভাব মিটাইব। আমাদের কার্যকরী সমিতিই ইহা স্থির করিলেন। কিন্তু বিনা পয়সায় মজা দেখিতে অভ্যস্ত অনেক বাঙালীরা ইহার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাইতে লাগিল। ওখানকার সি. এম. এস. স্কুলের অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের কার্যকরী সমিতির একজন সদস্য ছিলেন। তিনিই প্রস্তাবটি করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন 'হল'-টি যাহাতে আমরা পাই সে ব্যবস্থা তিনি করিবেন। সভার কয়েকদিন পূর্বে হঠাৎ তিনি আমাকে একটি পত্র লিখিলেন, শহরের কয়েকজন লোককে বিশেষ নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইবার জন্য। আমি উত্তর দিলাম, যে কমিটি এই অনুষ্ঠানের পরিচালনা করিতেছেন, সেই কমিটির সমর্থন না পাইলে আমি ইহা করিতে পারিব না। এ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য বিশেষ একটি সভা ডাকা হোক। সে সভা যদি নির্দেশ দেন ওই লোকগুলিকে নিমন্ত্রণ করা হোক আমি আপত্তি করিব না। সভায় অনেকে আপত্তি করিলেন। সম্পাদক মহাশয়, ডাক্তার ভাদুড়ী বলিলেন—কাহাকে বাদ দিয়া আপনি কাহাকে নিমন্ত্রণ করিবেন? বাছিয়া বাছিয়া নিমন্ত্রণ করিলে আমাদের বদনাম হইবে। সুতরাং কাহাকেও বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা হইল না। সি. এম. এস. হলে সভা হইবে ঘোষণা করিয়া আমরা চারিদিকে বিজ্ঞাপন দিলাম। কিন্তু বাঙালী চরিত্রের মহিমা শেষ পর্যন্ত প্রকটিত হইল। সি. এম. এস. স্কুলের প্রিন্সিপাল মহাশয় সহসা আমাকে পত্রযোগে জানাইয়া দিলেন যে, রবিবার তিনি সি. এম. এস. হল দিতে পারিবেন না। আমরা অকূল পাথারে পড়িয়া গেলাম। কাছেই মাড়োয়ারিদের একটি বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। তাহার মালিক আমাকে শ্রদ্ধা করিতেন খুব। তাঁহাকে গিয়া ব্যাপারটা বলিলাম। তিনি তাঁহার স্কুলের 'হল'-টি আমাদের শুধু ব্যবহারই করিতে দিলেন না, সভায় পাতিবার জন্য বড় বড় শতরঞ্চি প্রভৃতিও দিলেন।

যতদূর মনে পড়িতেছে সে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন তারাশঙ্কর, বীরেন ভদ্র, পঙ্কজ মল্লিক, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (মোহর), বাউল পূর্ণ দাস, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (আমাদের উপীনদা), আশালতা দেবী, সুরকার নচিকেতা ঘোষ এবং তাঁহার সহকারী তবলচি। তবলচির নামটি মনে পড়িতেছে না। সজনী আসিতে পারে নাই। আমার বাড়িতেই সকলে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। হাসিতে, গল্পে, গানে আমার বাড়ি মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। রান্নাঘরে লীলা রান্না

লইয়া ব্যস্ত। রান্নাঘরের ঠিক পাশেই আমাদের খাবার ঘর। সেইখানেই আড্ডাটা বসিত। লীলা আমাদের চা দিয়া, খাবার দিয়া আপ্যায়িত করিত। বীরেনের জমাটি গল্প, পঙ্কজের গান মুখর করিয়া তুলিত আমাদের খাওয়ার ঘরটিকে। লীলা রান্নাঘরে বসিয়াই উপভোগ করিত সব। উদ্বোধনী-সভা হইল গার্লস স্কুলের হলে। আমার বন্ধু শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ রায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ভাগলপুরের পূর্বগৌরব কীর্তন করিলেন এবং শেষে বলিলেন—এখন সে আলো আর নাই, সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে, তবু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিব—যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে, সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া—তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

পরবর্তী বক্তা তারাশঙ্করের চোখের দৃষ্টিতে দপ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে দাঁড়াইয়া প্রথমেই বলিল—যেখানে বনফুল এখনও মধ্যাহ্নদীপ্তিতে বর্তমান সেখানে অমূল্যবাবু সন্ধ্যার অন্ধকার কি করিয়া দেখিলেন বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি তারাশঙ্করের জামা ধরিয়া টান দিলাম এবং চুপি চুপি বলিলাম, আমাকে বাদ দিয়া অন্য কথা বল।

দ্বিতীয় দিন সি. এম. এস.-এর অধ্যক্ষ মহাশয় জানাইলেন—আজ সভা আমাদের হলে হোক। দ্বিতীয় দিনের সভা গানের সভা। পঙ্কজ, মোহর এবং উপীনদা গান গাহিলেন। ভাগলপুরের দুই একজন গায়ক-গায়িকার গানও শোনা গেল। পূর্ণদাস বাউল নাচিয়া গাহিয়া আসর মাৎ করিয়া দিলেন।

তারাশঙ্করকে দ্বিতীয়বার চটিয়া আত্মবিস্মৃত হইতে দেখিয়াছিলাম পুরুলিয়ার এক সাহিত্য-সভায়। সে সভায় আমিও নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। আমরা সভায় প্রবেশ করিতেছি এমন সময় একজন ভদ্রলোক তারাশঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, আপনি কি তারাশঙ্করবাবু?

তারাশঙ্কর বলিল—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বলিলেন—আপনার 'জঙ্গম' পড়ে আমি মুগ্ধ। সত্যি, মুগ্ধ—

তারাশঙ্কর তখন কিছু বলিল না। কিন্তু সভায় উঠিয়া প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়া প্রথমেই সে বলিল—বুঝিতে পারিতেছি, আপনারা বড়লোক, আপনাদের পয়সা খরচ করিবার সামর্থ্য আছে, আপনাদের উদ্দেশ্য খানিকক্ষণ মজা উপভোগ করা। আপনারা বাইজি আনাইলে বেশী মজা পাইতেন। আমরা সাহিত্যিকরা আপনাদের মতো লোককে তো মজা দিতে পারিব না।

আমি পিছন হইতে তাহার কামিজ ধরিয়া ঈষৎ টান দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার ইঙ্গিত সে বুঝিল এবং এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া গেল।

আমার সহিত তারাশঙ্করের একটা গোপন অন্তরঙ্গতা ছিল। বাহিরে অনেক সময় তাহার সহিত আমার নানা বিষয়ে ঝগড়া হইত, বিশেষ করিয়া যখন সে হুজুগে মাতিয়া কোন রাজনৈতিক দলের পাল্লায় পড়িয়া তাহাদের মনোমত রচনা লিখিতে

উদ্ধত হইত। তাহাকে চিঠিও লিখিয়াছি একাধিকবার এই সব প্রসঙ্গে। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমাদের অন্তরঙ্গতা নিবিড় ছিল। আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করিতাম—সেও আমাকে শ্রদ্ধা করিত। ইহার একটা প্রমাণও পাইয়াছিলাম একটা সভায়। নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের পাটনা শাখা আমাকে একবার সম্বর্ধনা দিয়াছিল। আমি পাটনা গিয়াছিলাম। তাঁহারা অন্যান্য সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তারাশঙ্করকেও করিয়াছিলেন। অসুস্থতার জন্য তারাশঙ্কর আসিতে পারে নাই। সভা চলিতেছে—এমন সময় একটি ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। বলিলেন—তারাশঙ্কর-বাবু এই অভিনন্দনপত্রটি পাঠাইয়া দিয়াছেন। এটি যেন সভায় পড়া হয়। সে অভিনন্দন-পত্রে তারাশঙ্কর যাহা লিখিয়াছিল, তাহা শুধু তারাশঙ্করই লিখিতে পারে। তাহাতে আমার অনেক প্রশংসা তো সে করিয়াছিলই, কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে গুণ-গ্রাহী উদার তারাশঙ্করের ছবিও আঁকিয়াছিল সে।

আমি যখন ভাগলপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম তখন তারাশঙ্কর মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে আসিত। একদিন সে বলিয়াছিল, তুমি ভাগলপুর ছাড়িয়া এখানে আসিয়া ভুল করিয়াছ। এখানে কেহ তোমাকে বিশ্রাম দিবে না, খালি সভা করিতে হইবে। লেখা-পড়া এখনও একেবারে ছাড়ি নাই, কিন্তু তাহার কথাটা যে মিথ্যা নহে তাহাও বুঝিতেছি। ভাগলপুরের কাছেই মুঙ্গের ও জামাল-পুর। এই দুইটি স্থানে সভা উপলক্ষে একাধিকবার যাইতে হইয়াছিল।

মুঙ্গেরে ছিল আমার বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। মুঙ্গের কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক কালীকিঙ্কর সরকার যদিও নিজেকে আমার ভক্ত বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকেও সত্যই খুব শ্রদ্ধা করিতাম। সত্যই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন তিনি। ভাগলপুরেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ। তাঁহার ভগ্নীপতি ভাগলপুর জিলা স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি তাঁহার দিদির কাছে আসিয়াছিলেন। সেই সময় আমার সহিত তাঁহার আলাপ হয়। আলাপ হইবার পর দেখিলাম অদ্ভুত তাঁহার স্মৃতি-শক্তি। আমার 'জঙ্গম' উপন্যাস হইতে পাতার পর পাতা মুখস্থ বলিতে পারিতেন। আমার কবিতা এবং গল্পও কণ্ঠস্থ ছিল তাঁহার। রবীন্দ্রনাথের কবিতা গড়-গড় করিয়া বলিয়া যাইতেন। ইংরেজ কবি ও লেখকদের লেখাও সব মুখস্থ। শেলি, কীট্স্, বায়রণ, ব্রাউনিং, ইয়েটস্, ডিকেন্স, বার্ণার্ড-শ—কেহ বাদ নাই। তাঁহার পাণ্ডিত্যের বহর ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। তখন শনিবারের চিঠি-র সজনী আমাকে একটি উপন্যাস লিখিবার জন্য তাগাদা দিতেছিল। আমি ভাবিয়া পাইতেছিলাম না কি বিষয় লইয়া লিখি। নতুন বিষয় মনে না আসিলে আমার লেখার প্রেরণাই জাগে না। কালীকিঙ্করবাবু বলিলেন—আপনি শিকারের পটভূমিকায় একটা নূতন ধরনের বই লিখিয়া ফেলুন। মৃগয়া শুরু করিয়া দিলাম। রোজ যতটুকু লিখিতাম কালীকিঙ্করবাবু আসিয়া শুনিয়া যাইতেন এবং আমাকে প্রচুর উৎসাহ দিতেন। মৃগয়া বইটি তাঁহার নামে উৎসর্গ

করিয়াছি। কালীকিঙ্করবাবু শুধু পণ্ডিত ছিলেন না, মহৎ লোক ছিলেন। বিবাহ করেন নাই। ছাত্রদের লইয়াই থাকিতেন। অনেক গরীব ছাত্রকে পড়াইতেন, অনেকের ব্যয়ভার বহন করিতেন। হঠাৎ অকালে হার্টফেল করিয়া মারা গেলেন।

তাঁহারই আমন্ত্রণে মুঙ্গের কলেজে সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলাম। জামালপুরের সভাতেও তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছিল। তাঁহার চিঠিতে ঠিকানা লেখার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি খামের বাঁ দিকের উপরের কোণে ঠিকানাটা লিখিতেন। জিজ্ঞাসা করিয়য়াছিলাম কেন এমন করেন? তিনি বলিলেন—আপনার নামের উপর পোষ্টাফিসের ছাপ পড়ুক, এটা আমি চাই না। এই মহৎ লোকটি অকালে চলিয়া গেলেন।

একবার জামালপুরের এক সভায় একটা কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। কথাটা হঠাৎ মনে পড়িল। সেই সভায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হইয়াছিল এবং আমিই তাহার বিচারক ছিলাম। আমি সব শুনিয়া প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার কে কে পাইবে তাহাদের নাম লিখিয়া দিলাম। একটু পরে এক ভদ্রলোক আমার কানে কানে বলিলেন—আপনি তো আমাদের মহা মুশকিলে ফেলিলেন।

'কেন?'

আমাদের বড়বাবুর মেয়ে প্রতি বছর আবৃত্তিতে প্রথম হয়। আপনি তো তাহাকে কোনও পুরস্কার দেন নাই। বড়বাবু চটিয়া যাইবেন এবং সে ধাক্কা আমাদের সামলাইতে হইবে। তিনি আমাদের একজন বড় পেট্রন। আমি বলিলাম—আমাকে কি করিতে হইবে বলুন। আমি যাহাদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় করিয়াছি, তাহার কিন্তু বদল করিতে পারিব না।

তিনি হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, আপনি বড়বাবুর মেয়েকে স্পেশাল প্রাইজ দিন। সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙিবে না। ভদ্রলোকের মুখের কাঁচুমাচু ভাব দেখিয়া বড়ই করুণা হইল। শেষে তিনি যাহা বলিলেন তাহাই করিতে হইল। বড়বাবুর মেয়েকে বেশ মোটা একটি ছবি-ওলা বই প্রাইজ দেওয়া হইল।

নানা সভার নানা টুকরা-টুকরা খবর মনে পড়িতেছে। একবার এলাহাবাদে প্রখ্যাতা কবি ও চিত্রকর মহাদেবী বর্মণের নিমন্ত্রণে এলাহাবাদে গিয়াছিলাম। তিনি আমাদের প্রচুর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। অন্যান্য ভাষায় কবি ও লেখকরাও আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন সে সভায়। অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি ছিল না। কেবল একটি বিষয়ে আমাদের অসুবিধা হইয়াছিল। আমরা মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি খাইতে অভ্যস্ত। কিন্তু সেখানে সবই নিরামিষ ব্যাপার।

একদিন আমরা খাইতে বসিয়াছি এমন সময় কবি নিরালা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হিন্দী সাহিত্যিক, কিন্তু বাংলাদেশে বহুদিন ছিলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁহার কবিতা রবীন্দ্র-প্রভাবিত। হিন্দী সাহিত্যে 'ছায়াবাদী' কবিতার প্রবর্তক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি শুনিয়াছি।

তিনি আসিয়াই আমাদের সামনে মাটিতে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

"খেতে বসেছেন? দেখি মহাদেবী আপনাদের কি খাওয়াচ্ছেন। মাছ কই?"

বলিলাম—"এখানে সব নিরামিষ। তবে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে না—।"

"অসুবিধা নিশ্চয়ই হচ্ছে। মাছ না হলে যে বাঙালীর খাওয়া হয় না।"

এই সময় মহাদেবী প্রবেশ করিলেন।

নিরালা বলিয়া উঠিলেন—"মহাদেবী, এ তোমার কেমন ভদ্রতা? বাঘকে নিমন্ত্রণ করে শাক খেতে দিয়েছ? আমি ওঁকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।"

এলাহাবাদের ডাক্তার মুখার্জির বাড়িতে খবর গেল যে এখানে আমরা নিরামিষ-ভোজীদের পাল্লায় পড়িয়াছি। তিনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমাদের নিজেদের বাড়িতে লইয়া গেলেন। মাছ, মাংসের প্রাচুর্যে অভিভূত হইয়া গেলাম আমরা। ডাক্তারবাবুর নামটি মনে নাই। কিন্তু তাঁহার মতো ভদ্র, অমায়িক লোক এক প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যেই দেখা যায়। শুধু তিনি নন, বাড়ির সকলেই ভদ্র। তিনি নূতন বাড়ি করিয়াছিলেন। বোধ হয় আমি তাঁহার বাড়ির নামকরণ করিয়াছিলাম—"সুদক্ষিণা।"

এই প্রসঙ্গে আর একটি সভার কথা মনে পড়িতেছে। কানপুর। সেখানে স্বর্গীয় ডাক্তার সুরেন সেন মহাশয় বিখ্যাত লোক। বহু জনহিতকর কার্য করিয়াছেন। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুলের হীরক-জয়ন্তী উপলক্ষে গিয়াছিলাম। স্কুলের বিশেষত্ব এই যে ছেলেরা সেখানে প্রথম ভাগ হাতে করিয়া ভরতি হয় এবং বি. এ. পাশ করিয়া বাহির হয়। স্কুল বদল করিবার প্রয়োজন হয় না। অন্য কোনওরকম ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না। এই সভায় আমার ভাষণে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা লইয়াও গোলমাল হইয়াছিল। কাগজে খুব গালাগালি দিয়াছিল আমাকে। আমি বলিয়া-ছিলাম—আমাদের নৈতিক অধঃপতন আরম্ভ হয় পাল রাজত্বের শেষের দিকে, যখন বৌদ্ধধর্ম সহজিয়া সাহিত্যের ছদ্মবেশে অশ্লীল সাহিত্য প্রচার করিতে লাগিল। তাহার পর মুসলমান রাজত্বের সময় দুর্নীতির প্রবল বন্যায় দেশ ভাসিয়া গেল। আর একটি কথা বলিয়াছিলাম যে, বিহারীরা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয় বলে হিন্দীকে খুব উঁচুদরের সাহিত্য বলিয়া মনে করেন। হিন্দীর সহিত আমাদের কোনও ঝগড়া নাই, কিন্তু কয়েকটি সত্য এবং ঐতিহাসিক ঘটনা মনে রাখা উচিত। প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র বাঙালীরাই বাহির করেন, বিহারে বাঙালী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টার জন্যই কোর্টে উর্দুর বদলে হিন্দী প্রচলিত হয়। বাঙালী বিদ্যাসাগরই হিন্দী 'বেতাল পচিশি' হইতে বাংলা বেতাল পঞ্চবিংশতি অনুবাদ করেন। বর্তমান হিন্দী সাহিত্য প্রধানতঃ পুষ্ট হইয়াছে প্রাচীন এবং বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের অনুবাদ করিয়া। এইখানেই এক ভদ্র-লোকের বাড়িতে আমরা রাত্রিতে খাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলাম। সেদিন খাবার কি ছিল মনে নাই, কিন্তু একটি কথা মনে আছে। তাঁহারা ছোট একটি মধুপর্কের বাটিতে ছোট মার্বেলগুলির মতো কি একটা দিলেন। খাইয়া ফেলিলাম—ক্ষীর—

নটক্ষীর। অতটুকু ক্ষীর যে কাহাকেও দেওয়া সম্ভব তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না।

আর একটা সভাব কথা মনে পড়িতেছে। কটকে নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন। সেবার মূল সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞান-শাখায় ছিলাম আমি। আমার সঙ্গে লীলা তো ছিলই, আমার ছোট-মেয়ে করবীও ছিল। সভায় ছিলেন হেমলতা ঠাকুব (সাহিত্য-জগতের মেজ মা)। সভা বেশ ভালো হইয়াছিল। কিন্তু তাহার বিবরণ তেমন মনে নাই। মনে আছে চাল, ডাল এবং মেথি সাজাইয়া সভার মাঝখানে চমৎকার একটি আলপনার মতো ছবি আঁকা ছিল। আর মনে আছে পারুল নামে ছোট একটি কালো মেয়েকে। দশ বারো বছর বয়স। সভায় গান গাহিয়াছিল কি না মনে নাই, কিন্তু আমাদের খুব সেবা করিয়াছিল। সে এখন কলিকাতায় থাকে। গৃহিণী হইয়াছে। সেই ছোট পারুল হারাইয়া গিয়াছে।

প্রদ্যোতের ভগ্নীপতি তখন উড়িয্যাব মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আমাকে বলিলেন—আপনি আমাদের ষ্টেট গেস্ট্। আপনাকে আমরা একটি গাড়ি দিব এবং একজন 'গাইড'ও দিব। আপনি পুরী, কোনারক দেখিয়া আসুন। তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে তিনি আমাদেব 'গাইড' স্বরূপ দিলেন। ঠিক করিলাম পুরী এবং কোনারক যাইব। চিল্কা-হ্রদ দেখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার ডাক্তারী পেশায় খুব বেশী কামাই করিবার উপায় ছিল না। তাই চিল্কা দেখিবার বাসনাটা ত্যাগ করিলাম। প্রদ্যোৎও কটকে আসিয়া হাজির হইল। সে বলিল—আমার চাকব বুদ্ধকেও তুমি সঙ্গে লইয়া যাও। ও চমৎকাব রাঁধিতে পারে। একটু পরে মুখ্যমন্ত্রীর পি. এ. মহাশয় আমার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন যে তাঁহার স্ত্রীও জগন্নাথ দর্শন করিতে চান। তাঁহাকে যদি সঙ্গে লই আমার আপত্তি আছে কি? আমি বলিলাম, গাড়িতে যদি স্থান সঙ্কুলান হয় আমার আপত্তি নাই। তিনি আশ্বাস দিলেন একটি বড় গাড়িরই ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন। সমুদ্রের ঠিক ধারেই গভর্ণমেণ্টের ডাক-বাংলো। সেখানে গিয়া উঠিলাম। স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম, কয়েক মুহূর্ত বসিয়া রহিলাম। কারণ সেই আমার প্রথম সমুদ্র-দর্শন। তাহার পর সমুদ্রের ধারে নামিয়া গেলাম। দেখিলাম, জেলেরা সামুদ্রিক মাছ বিক্রয় করিতেছে। বুদ্ধের পরামর্শে দুই-তিনরকম সুস্বাদু মাছ কিনিয়া ফেলিলাম। দুই টাকায় অনেক মাছ পাওয়া গেল। বাটা মাছের মতো একরকম মাছ (মুখটি কিন্তু লাল নয়, সবুজ) দেখাইয়া বুদ্ধ বলিল—এ মাছের ঝাল নাকি অমৃতোপম, বেশি করিয়া কিনুন। কিনিলাম। কিন্তু ডাক-বাংলোর একটি ঘরে সেক্রেটারি মহাশয়ের গোঁড়া স্ত্রী বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—পুরীতে আসিয়া প্রথমে জগন্নাথের প্রসাদ খাইতে হয়। সেক্রেটারি মহাশয় কটক হইতে 'ফোন' করিয়া আমাদের জন্য 'কণিকা'-ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গাড়ি লইয়া তিনি সে ভোগ আনিতে গিয়াছেন। ভোগ না খাইয়া অন্য কিছু খাওয়া অনুচিত। সুতরাং মাছগুলি পড়িয়া রহিল। বুদ্ধ আশঙ্কা করিতে লাগিল—তখনই রাঁধিয়া না ফেলিলে

মাছ পচিয়া যাইবে। আমি বলিলাম—তীর্থস্থানে যখন আসিয়াছি তখন সেখানকার নিয়ম মানিয়া চলাই উচিত। মাছগুলি ঝোলাতেই রহিল। বেলা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। যখন দুইটা বাজিল তখনও সেক্রেটারি মহাশয়ের দেখা নাই। সকলেই ক্ষুধিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। বেলা আড়াইটা নাগাদ সেক্রেটারি ফিরিলেন। বলিলেন—আজ ভোগ হইবে না। একজন অচ্ছুৎ নাকি ভোগের হাঁড়িটা ভোগ দিবার পূর্বেই দেখিয়া ফেলিয়াছে। সে ভোগ পুঁতিয়া ফেলা হইয়াছে। সুতরাং আজ আসুন আমরা এখানেই রান্না করিয়া খাই। আমি বাজার হইতে চাল-ডাল-তরি-তরকারি গুঁড়া মশলা কিনিয়া আনিয়াছি। ঘি, তেল, মাখনও। তাই এত দেরি হইয়া গেল। এখানে ডাক-বাংলোতে বাসন-পত্র সব আছে। বৃদ্ধ মাছের ঝাল চমৎকার রাঁধিয়াছিল। আমার মনে হইল ইহা বোধ হয় স্বয়ং জগন্নাথদেবেরই ষড়যন্ত্র। তিনি অন্তর্যামী, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন মনে মনে আমি সমুদ্রের মাছ খাইতে ইচ্ছুক। তিনি কৌশল করিয়া আমার ইচ্ছাটা পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সরকারী মুলিয়াদের সহায়তায় সমুদ্রস্নান করিলাম। সরকারী হেড-পাণ্ডা আমাদের জগন্নাথমূর্তিও দর্শন করাইলেন। পাণ্ডাদের সাহায্য ব্যতীত জগন্নাথের দর্শন পাওয়া অসম্ভব। মন্দিরের ভিতর অন্ধকার এবং নানা জায়গায় নানা মাপের সিঁড়ি। সুতরাং মনে মনে বারম্বার আওড়াইতেছিলাম—হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা। জগন্নাথদেবের সামনা-সামনি গিয়া সুভদ্রা-বলরামকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলাম। আমার হঠাৎ মনে হইল, এদেশে কুষ্ঠরোগ এবং ফাইলেরিয়া খুব বেশি হয় বলিয়াই বোধহয় এখানকার দেবতাদের এই বীভৎস মূর্তি। আমরা দুরারোগ্য ব্যাধিকেও যে দেবতারূপে পূজা করি তাহার প্রমাণ 'মা শীতলা' এবং 'ওলাবিবি'। জগন্নাথদেব, সুভদ্রা এবং বলরামের কপালে মূল্যবান দামী পাথর আছে। এত বড় নীলা আগে কখনও দেখি নাই। পুরীর অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলিও একে একে দেখিলাম। জগন্নাথদেবের মাসীর (?) বাড়িতে প্রচুর বাঁদরের ভিড়। পুরীতে জাতি-বিচার নাই। নানাস্থানে নানা জাতের দোকানদার 'ভাত' বিক্রয় করিতেছে দেখিলাম। ভাতের এমন ফলাও কারবার অন্য কোথায় দেখি নাই।

পরদিন 'কোনারক' অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বৃদ্ধ সঙ্গে ছিল, খাদ্যের ভাণ্ডারও পূর্ণ ছিল, বৈচিত্র্যের অভাব হয় নাই। আমরা সরকারী 'অতিথি' বলিয়া সেখানকার হোটেল হইতেও 'ভালো-মন্দ' কিছু পাওয়া গেল। স্তম্ভিত হইয়া গেলাম 'কোনারক' দেখিয়া। অতীত মহিমার এ কি বিরাট প্রতীক। যদিও অনেক জায়গা ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তবু এখনও যাহা আছে তাহা বিস্ময়কর। শুনিলাম এটি সূর্যমন্দির ছিল। মন্দিরটি সূর্য-দেবতার সপ্তাশ্ববাহিত রথ। অশ্বগুলি সব নষ্ট হয় নাই, যেগুলি হয় নাই, সেগুলি বিস্ময়কর ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। অন্যান্য অনেক হিন্দু মন্দিরে যেমন, এখানেও তেমন যৌন-ক্রীড়া-রত নর-নারীর ছড়াছড়ি। মনে হইল মূর্তিগুলি যেন নীরব ভাষায় বলিতেছে—বাপু হে, সারাজীবন তো এই সব করিয়া কাটাইয়াছ—এবার

মন্দিরের ভিতর ঢুকিয়া আসল দ্রষ্টব্যটি দেখিয়া যাও। আরও শুনিলাম, কোনারক মন্দিরের ভিতর আগে নাকি একটি শক্তিশালী চুম্বক বসানো ছিল। লৌহনির্মিত কোন জাহাজ ইহার কাছাকাছি আসিতে পারিত না। চুম্বকের টানে লোহার জোড় খুলিয়া যাইত। হয়ত এ সূর্যমন্দির পুরাকালে দুর্গের স্থান অধিকার করিয়াছিল। অসম্ভব কিছুই নয়, সবই হইতে পারে। ডানিকেন সাহেব হয়ত বলিবেন পৃথিবীতে আশ্চর্য-জনক যাহা কিছু আছে সবই নাকি গ্রহান্তরের মানুষের তৈরি। তাঁহার কল্পনাকে বাহাদুরি দিই। কিন্তু এই মানুষই যে একদা অসাধ্যসাধন পটিয়সী শক্তির অধিকারী ছিল এইরূপ কল্পনা তিনি কেন করিলেন না বুঝিতে পারি না। এই মানুষই আকাশ-বিহার করিতেছে, এটম্‌ বম্‌ বানাইতেছে—সে যুগেও হয়তো তাহারা প্রতিভা ও শক্তির যে পরিচয় দিয়াছিল তাহারই কিছু চিহ্ন আমরা দেখিতে পাইতেছি। গ্রহান্তর হইতে লোক আমদানি করিবার কি প্রয়োজন? মানুষ অসীম শক্তিধর। সে সব করিতে পারে।

হঠাৎ মনে হইল সভা-সমিতির কথা যদি ক্রমশঃ লিখিয়া যাই বই তো মহাভারত হইয়া যাইবে। জীবনে অনেক সভা-সমিতিতে যোগ দিয়াছি। সব সভার সব কথা মনে নাই। তবে সব মিলাইয়া মনে যে অনুভূতিটা জাগিয়া আছে তাহা একরঙা। স্বস্থান ত্যাগ করিয়া সভার ভিড়ে বসিয়া সময় নষ্ট করিতে ভালো লাগে না। যেখানে যেখানে গিয়াছি সনির্বন্ধ অনুরোধের জবরদস্তিতে গিয়াছি। একবার কেরলে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েসনের এক সভায় গিয়াছিলাম। আমার বড় ছেলে অসীম তখন ভেলোরে মেডিকেল অফিসার ছিল। লীলাও আমার সঙ্গে গিয়াছিল। সভাটা উপলক্ষ্য। আমাদের আসল লক্ষ্য ছিল এই সুযোগে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলটা একবার দেখিয়া আসা। অসীম হাসপাতাল হইতে ছুটি লইয়া মাদ্রাজ স্টেশনে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। আমরা কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ মেলে একটি 'কূপ' পাইয়াছিলাম। সুতরাং মাদ্রাজ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে আসা গেল। মাদ্রাজে আসিয়া আমরা নিজেদের অসীমের হাতে সঁপিয়া দিলাম। সেই সব ব্যবস্থা করিতে লাগিল। মাদ্রাজী কুলিগুলি খুব ভালো। যে মাদ্রাজী নিরামিষ হোটেলে আমবা উঠিলাম সে হোটেলটিও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খাওয়ার সঙ্গে দুধ বা দই দেয়। খাওয়ার পর এক টুকরা নারিকেল ও পান-সুপারি দেয়। পানে চুন থাকে না। আমরা কোথায় কি কি দেখিব অসীমই হোটেল-ওলার সহিত বসিয়া এবং গাইড-বুক দেখিয়া তাহা ঠিক করিল। অতঃপর আমরা যাহা করিলাম—তাহাকে ভ্রমণ বলে না, ঝটিকা-ভ্রমণ বলা যাইতে পারে। যাহা দেখিলাম মনে নাই। 'কাজাগাম'-পন্থী লোকেরা শত চেষ্টা করিয়াও এ দেশের লোকের মন হইতে আর্য প্রভাব মুছিয়া ফেলিতে পারিবেন না। সমস্ত দেশ জুড়িয়া বিষ্ণু, শিব, ষাঁড় এবং গণেশের মূর্তি। নীলা দিয়া প্রস্তুত যে মূর্তিটি বিশ্ববিখ্যাত সেটিও নটরাজের মূর্তি। মনে হইল প্রাচীন আর্য-সভ্যতাকে যেন দাক্ষিণাত্যই ধরিয়া রাখিয়াছে। ত্রিবান্দ্রামে আমাদের ডাক্তারি

মীটিং কোনক্রমে সারিয়া আমরা কন্যাকুমারীতে গিয়া হাজির হইলাম। গিয়াই মনে হইল জীবন সার্থক হইয়া গেল। বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর এবং আরব সাগর—এই তিন সমুদ্রের মিলন-পারাবারে সূচ্যগ্র হইয়া প্রবেশ করিয়াছে আমাদের ভারত-ভূমি। জলে নামিয়া কুমারিকা অন্তরীপের শেষ প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলাম একবার। মনে হইল মা বোধহয় সমুদ্রে স্নান করিবেন বলিয়া নামিতেছিলেন, কিন্তু কোন কারণে যেন নামা হয় নাই। বাধা পড়িয়াছে। এখানকার কন্যাকুমারীর বিবাহও বিঘ্নিত হইয়াছে। হিমালয় হইতে স্বয়ং মহাদেব তাঁহাকে বিবাহ করিতে আসিতে-ছিলেন, দেবতাদের চক্রান্তে পথে আটকাইয়া পড়িয়াছেন। কন্যাকুমারী কিন্তু আজও মালা হাতে তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বিবাহের মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সমুদ্রের জলে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কন্যাকুমারী হইতে ধনুষ্কোটিতে গিয়াছিলাম। ধনুষ্কোটি একটি দ্বীপ। অসংখ্য ঝিনুক ও ঝিনুক-জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীর খোলায় পরিপূর্ণ দ্বীপটি। দ্বীপকে ঘিরিয়া উত্তাল তরঙ্গমালা। সত্যই এক একটি তরঙ্গ তালগাছেব মতোই উঁচু। অবাক হইয়া সমুদ্রের তাণ্ডব-নৃত্য দেখিলাম।

সভা উপলক্ষে নানা স্থানে গিয়াছি। সব সভার বর্ণনা দিলে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবে। সুতরাং সব সভার কথা লিখিব না। রেঙ্গুনের প্রবাসী বাঙালীদের আমন্ত্রণে একবার রেঙ্গুন গিয়াছিলাম, সেখানকার সভার মূল সভাপতি হইয়া। আমি আমার অভিভাষণটি লিখিয়া পূর্বেই সজনীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। সে সেটি ছাপাইয়া রাখিয়াছিল। আমি ও লীলা নির্দিষ্ট দিনে ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় পৌছাইলাম এবং কলিকাতায় আসিয়া রেঙ্গুনযাত্রী প্লেনটি ধরিলাম। ইহার পূর্বে কখনও প্লেনে চড়ি নাই। যখন আকাশে উড়িলাম ভয়-ভয় করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া গেলাম। মনে হইল নীচে একটি সুনীল কাপড় যেন পাতা রহিয়াছে।

তিন ঘণ্টায় রেঙ্গুন পৌছাইয়া গেলাম। মনোজবাবু এবং আরও কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মনোজবাবু গাড়ি আনিয়াছিলেন, তাঁহার গাড়িতেই তাঁহার বাসায় গেলাম। তাঁহার বাসাতেই আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। মনোজবাবু রেঙ্গুনে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের এজেন্ট ছিলেন। তাঁহার সহিত আমাদের আত্মীয়তাও ছিল। তিনি আমার তৃতীয় ভ্রাতা লালমোহনের মামাশ্বশুর। বিখ্যাত সাধু মোহনানন্দ তাঁর দাদা। মনোজবাবু আমাদের যে যত্ন করিয়াছিলেন তাহা অবর্ণনীয়। নানারকম সুখাদ্যের সহিত আন্তরিক ভদ্রতার যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি আমাদের জন্য একটী বর্মিনী চাকরাণী রাখিয়াছিলেন। মেয়েটির কর্মতৎপরতা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। আসিয়া একটি কথা বলিত না। কেবল কাজ করিত। আমাদের বিছানা তুলিয়া পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিত, আমাদের জুতা পরিষ্কার করিত, আমাদের কাপড় কাচিয়া শুকাইয়া ইস্ত্রি করিয়া দিত। নীরবে আমাদের ফাই-ফরমাস শুনিত।

তাহার এই নীরব নিপুণতা মুগ্ধ করিয়াছিল আমাদের। মনোজবাবুর গাড়িতে চড়িয়াই রেঙ্গুনের যাহা কিছু দ্রষ্টব্য তাহা দেখিয়াছিলাম। রেঙ্গুনের প্রধান দ্রষ্টব্য সেখানকার গোল্ডেন প্যাগোডা—যেখানে প্রকাণ্ড একটি বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত আছে। মূর্তিটি উচ্চতায় প্রায় একতলা বাড়ির সমান। শাদা মূর্তি। চোখ দুটি অদ্ভুত। সেদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে মনে হয় মূর্তিটি যেন জীবন্ত, এখনই কথা কহিবে। মনটা কেমন যেন তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া যায়। প্যাগোডায় ছোট বড় অনেক মূর্তি আছে। প্রত্যেক মূর্তির সম্মুখেই ধূপ জ্বলিতেছে। এই প্যাগোডাই রেঙ্গুনের প্রাণ-কেন্দ্র। রেঙ্গুন শহরের মধ্যে যেখানেই যান—এই স্বর্ণ-প্যাগোডার চূড়াটি দেখিতে পাইবেন। এই প্যাগোডাকে কেন্দ্র করিয়া উহাদের হাটবাজারও বসে। তরিতরকারি মাছমাংস সব পাওয়া যায়। যে সব বর্মী বৌদ্ধ তাঁরা অহিংস বলিয়া মাছ, পাঁঠা, ভেড়া, মুর্গি, ছাগল, গরু কাটেন না। অবৌদ্ধদের পয়সা দিয়া কাটাইয়া নেন এবং পরে মৃত মাছ-মাংস বিক্রয় করেন এবং খানও। এক জায়গায় দেখিলাম—জমা-রক্ত (Blood Clots) বিক্রয় হইতেছে। উহা নাকি বর্মীদের নিকট সুখাদ্য। বর্মীদের পচা জিনিস খাইবার দিকেও একটা প্রবণতা আছে। পচা মাছ-মাংসও বিক্রয় হইতেছে দেখিলাম। রেঙ্গুনের দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য ইরাবতী নদী। প্রকাণ্ড চওড়া নদী। স্বচ্ছ জল। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ওখানকার সভা। কলিকাতা শহরে ওরকম সভার কথা কেহ বোধহয় ভাবিতেও পারেন না। টিকিট করিয়া সভা। টিকিটের দাম ১০·০০ হইতে ১০০·০০ পর্যন্ত। বিরাট 'হলে' সভা। সে 'হল'-এ দর্শকের এত 'ভীড়' যে অনেকে টিকিট কিনিয়াও স্থান পায় নাই। দাঁড়াইয়া আছে। এ রকম সভা বঙ্গবাসীরা কল্পনা করিতে পারে না। কারণ তাহারা সব জিনিসই 'ফোকটে' করিতে চায়। ট্রেনেও টিকিট কাটিয়া চড়ে না অনেক সময়। আমি মূল সভাপতি ছিলাম। প্রবোধ সান্যাল ছিলেন সাহিত্য শাখার সভাপতি আর সঙ্গীত বিভাগে ছিলেন আব্বাসউদ্দীন। তিনি দ্বিতীয় দিন আসিয়াছিলেন এবং পল্লীগীতি গাহিয়া সভা মাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আমি পুলকিত হইলাম। বলিলেন—আপনার আমি একজন ভক্ত, আপনার সব বই কিনিয়া পড়ি। তাঁহার গাওয়া সব রেকর্ড আমি কিনিয়াছি, এ কথা প্রত্যুত্তরে বলিতে পারিলে আমার মুখরক্ষা হইত। কিন্তু মিথ্যা কথা বলিতে পারিলাম না। তবে আব্বাসউদ্দীনের পল্লীগীতির সত্যই আমি একজন ভক্ত। পল্লীগীতির মধ্যে তিনি প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিতেন। রেঙ্গুনে তাঁহার সান্নিধ্যলাভ করিয়া সত্যই বড় ভালো লাগিয়াছিল।

রেঙ্গুনে বহু প্রবাসী বাঙালী পরিবার আমাকে খাওয়াইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সকলের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইলে আমাকে আরও কয়েকদিন রেঙ্গুনে থাকিতে হইত। তাহা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই অধিকাংশ বাড়িতেই আমি যাইতে পারি নাই। একটা বাড়িতে কিন্তু যাইতে হইয়াছিল। সভা হইতে মোটরে করিয়া ফিরিতেছিলাম, একজন ভদ্রলোক হাত তুলিয়া মোটর থামাইলেন।

তিনি আমাকে বলিলেন—পাশেই আমার বাড়ি। আপনি পাঁচ মিনিটের জন্য আমাদের বাড়িতে চলুন। আমি বলিলাম, আমি কিন্তু কিছুই খাইব না। এখনই খাইয়াছি। তিনি বলিলেন—আপনি শুধু একবার চলুন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার বাড়িতে গেলাম। তিনি আমাকে একটি ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে দেখিলাম একটি টেবিলের উপর একটি যুবকের ফটো রহিয়াছে। ফটোতে একটি মালাও রহিয়াছে। ঘরের মধ্যে একটি ক্রন্দমানা মহিলাও রহিয়াছেন। ভদ্রলোক বলিলেন—এটি আমার ছেলের ফটো। সে আপনার খুব ভক্ত ছিল। সে রেঙ্গুনের বাহিরে গিয়াছিল, আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য, আজ তাহার আসিবার কথা। পথে কম্যুনিষ্ট গুণ্ডারা কাল তাহাকে খুন করিয়াছে। তাহার আত্মা হয়ত এখানে আসিয়াছে। তাই পাঁচ মিনিটের জন্য আপনাকে এখানে আসিতে বলিলাম। এই বলিয়া ভদ্রলোক হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সভা-প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করি। সভায় প্রায় একই ধরনের কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি হয়। নূতন বড় একটা কিছু থাকে না। আমি সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য আমার বক্তৃতা লিখিয়া লইয়া যাইতাম। আমার ভাষণগুলি দুইটি পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে—'শিক্ষার ভিত্তি' ও 'মনন' গ্রন্থে। 'শিক্ষার ভিত্তি' ভাষণটি আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে দিয়াছিলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে আমি দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধেও চারটি বক্তৃতা দিয়াছিলাম। সেগুলিও 'দ্বিজেন্দ্র-দর্পণ' গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। এমনই প্রবন্ধ কেউ পড়ে না, তাই প্রবন্ধ বড় একটা লিখি না। নাটকও অভিনীত না হইলে বড় একটা বিক্রয় হয় না। নাটক অভিনয় করাইতে হইলে যে শ্রেণীর লোকেদের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিতে হয়, সে শ্রেণীর লোকেদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার সুযোগ বড় একটা পাই নাই। চেষ্টা করিলে অবশ্য সুযোগ করিয়া লইতে পারিতাম, কিন্তু সে প্রবৃত্তিও হয় নাই। তবু আমি নিজের প্রেরণার তাগিদেই অনেক নাটক লিখিয়াছি। মনে যখন একটা গল্পের প্লট আসে তখন যে আঙ্গিকে লিখিলে তাহা সর্বোৎকৃষ্টভাবে বলা যায় আমি সেই আঙ্গিকেই লিখিয়াছি। এজন্য আমার অনেক গল্প নাটকের আঙ্গিকে লেখা, যদিও সে সব নাটক কচিৎ অভিনীত হইয়াছে। আমার অনেক গল্প অবশ্য সিনেমায় হইয়াছে। আমার শ্রীমধুসূদন এবং বিদ্যাসাগরের নকলে অনেকে মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত লইয়া নাটক লিখিয়াছেন। আমার সংলাপ এবং আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলি অপহরণ করিয়া তাঁহারা কিছু অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। মধুসূদন এবং বিদ্যাসাগর ছাড়াও অনেক বড়লোক এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও লইয়া উক্ত নাট্যকারগণ নাটক লেখেন নাই। কারণ প্রকৃত নাটক লিখিতে হইলে যে প্রতিভার প্রয়োজন তাহা তাঁহাদের নাই। অপহরণেই তাঁহারা দক্ষ। আমাদের দেশের এই প্রবৃত্তি দেখিয়া আমি আর জীবনী-নাটক লিখি নাই। ভাগলপুরে আমি ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত

ছিলাম এবং সেখানে আমার জীবন-ধারা প্রায় একই গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। ডাক্তারি, সাহিত্য এবং নিজের খেয়াল-খুশী লইয়া থাকিতাম। রোগীর চাপে ডাক্তারি করিতাম এবং প্রকাশকদের চাপে লিখিতাম। অনেক প্রকাশক আমাকে অগ্রিম টাকা দিতেন। তাঁহাদের সহিত শর্ত থাকিত পরবর্তী বই লিখিলে তাঁহাদের দিব। ইহার বেশী কোনও শর্তে আমি আবদ্ধ হই নাই। বেঙ্গল পাবলিশার্স আমার দুই ছেলের পড়ার খরচ মাসে মাসে দিতেন। তাহারা প্রেসিডেন্সী কলেজে I.Sc. পড়িয়াছিল। তাহার পর একজন মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ে, ইহার নাম অসীম। আমার ছোট ছেলে চিরন্তন শিবপুর কলেজে B. E. পড়িবার জন্য ভর্তি হয়। ইহাদের পড়ার খরচ বেঙ্গল পাবলিশার্স দিয়াছিল এবং সে সব টাকা বই লিখিয়া শোধ করিয়াছিলাম। ডি. এম. লাইব্রেরীর গোপালদাও আমাকে অনেক টাকা অগ্রিম দিয়া অসময়ে আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। আমার দুই মেয়ে কেয়া আর করবী। তাহাদের বিবাহ কলিকাতাতেই দিয়াছিলাম। তাহাদের বিবাহের খরচের অনেক টাকা গোপালদা দিয়াছিলেন। তাঁহাকেও বই দিয়াই সব টাকা শোধ করিয়াছি। টাকা শোধ করিতে হইবে এ চাপ যদি না থাকিত তাহা হইলে হয়তো আমি এত বই লিখিতাম না। শুনিয়াছি বিখ্যাত ইংরেজী উপন্যাস-লেখক স্কটও নাকি ঋণের চাপে পড়িয়া বই লিখিয়াছিলেন। তাগিদ না থাকিলে সত্যই বেশি লেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথকেও অর্থের তাগিদে বই লিখিতে হইয়াছে। আমি অবশ্য যা তা আবোল-তাবোল লিখিয়া আমার ঋণশোধ করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা আমি করি নাই। আমি প্রতিটি বইতে নূতন স্বাদ পরিবেশন করিয়া ভালো বই লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। পারিয়াছি কি না তাহা মহাকাল বিচার করিবেন। আমার সমসাময়িক কালের বিচারে আমার তেমন আস্থা নাই, কারণ তাহা পক্ষপাতদুষ্ট হইতে পারে।

আমার এই জীবনচরিতে আমার পারিবারিক খবর বিশেষ দিই নাই। আমার লেখক-জীবনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিয়াছেন আমার স্ত্রী লীলাবতী। তিনি আমার অধিকাংশ পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠিকা। তাঁহার মনোমত হইলে আমি লেখা ছাপিতে দিতাম। না হইলে দিতাম না। এই বিষয়ে আমার আরও দুই বন্ধু সহায়ক ছিলেন—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ রায় এবং অধ্যাপক গিরিধর চক্রবর্তী।

আমার পিতা আমার সাহিত্য লইয়া বিশেষ কোনও আলোচনা করেন নাই। শুধু আমার 'দ্বৈরথ' সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—বইটি ভালো হয়েছে। আমার বাবার মৃত্যু হয়—১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে, বোধহয় ফেব্রুয়ারি মাসে। তারিখটা ঠিক মনে পড়িতেছে না। বাবা তাঁর শেষ জীবনটা মণিহারীতেই কাটাইয়াছিলেন। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া একবছর শয্যাশায়ী ছিলেন। আমরা মাঝে মাঝে গিয়া দেখিয়া আসিতাম। তাঁহার শরীর একটু খারাপ হইয়াছে খবর পাইলেই আমরা সপরিবারে মণিহারী চলিয়া যাইতাম। মণিহারীতে বাবার যেরূপ সেবা-যত্ন হইয়াছিল ভাগলপুরে তাহা হওয়া সম্ভব ছিল না। মণিহারীতে আমাদের চাষের বাড়িতে অনেক চাকর, প্রচুর স্থান,

শহরের গোলমাল নাই। আমার ভাই কালুর কিছুদিন আগেই বিবাহ হইয়াছিল। কালুর বউ বাসন্তী সর্বদা বাবার মাথার শিয়রে বসিয়া থাকিত। বাবার মৃত্যুর সময় আমি কাছে ছিলাম। মনে হইল একটা প্রদীপ যেন ধীরে ধীরে নিভিয়া গেল। বাবার এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া 'উদয়-অস্ত' উপন্যাসটি লিখিয়াছি। তাহাতে বাবার পুত্র-কন্যাদের চরিত্রগুলি কাল্পনিক। অন্যান্য চরিত্রগুলি কাল্পনিক নয়। বাবার মৃত্যুর সময়ই আমি অনুভব করিয়াছিলাম আমরা কত বড় মহৎ ব্যক্তির সন্তান। সামান্য গ্রাম্য ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু তিনি যে এত লোকের হৃদয়-সিংহাসনে রাজকীয় মহিমায় আসীন ছিলেন তাহা আমরা জানিতাম না। তাঁহার শ্রাদ্ধে সাতদিন ধরিয়া লোক খাইয়াছিল।

আমার ছেলেমেয়েরা যখন নিজ নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইল আমরা তখন ভাগলপুরে একা হইয়া গেলাম। করবীর যখন বিবাহ দিয়া ভাগলপুরে ফিরিলাম তখন সেই শূন্য গৃহে আমাদের মন হাহাকার করিতে লাগিল। আমিও সাহিত্য এবং ডাক্তারি একসঙ্গে আর চালাইতে পারিতেছিলাম না। তাই ঠিক করিলাম একটা ছাড়িতে হইবে। ভাগলপুরে থাকিয়া ডাক্তারি ছাড়া যাইবে না। তাই ঠিক করিলাম—ভাগলপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিব। আমার দুই মেয়ে কলিকাতায় থাকে, দুই ছেলেও কলিকাতায় বা কলিকাতার আশেপাশে থাকে। আমাদের এই বাসনা ফলবতী হইতে অবশ্য বিলম্ব হইয়াছিল। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি (জুন মাসে) আমি ভাগলপুর ত্যাগ করি। ভাগলপুরবাসীরা আমাকে যে কত ভালবাসিয়াছিল তাহার প্রমাণ তখন পাইয়াছিলাম, নানা সভায় এবং যেদিন চলিয়া আসি সেদিন স্টেশনে লোকের ভীড় দেখিয়া।

ভাগলপুরের বাড়িটি আমি বিক্রয় করিয়া আসিয়াছিলাম এবং সেই টাকা দিয়া লেকটাউনে বাড়ি কিনিয়াছি। কিনিবার আগে কিছুদিন একটি ভাড়াটে বাসায় ছিলাম। তখন অনুজ সাহিত্যিক শ্রীকুমারেশ ঘোষ আমাকে খুব সাহায্য করিয়াছিল। এ সময় তাহারই সাহায্যে কলিকাতায় আসিয়া তাহারই বাড়ির নিকট একটি বাসা ভাড়া লইয়াছিলাম মাসিক ছয় শত টাকা ভাড়া দিয়া। কুমারেশ সর্ববিষয়ে আমার সাহায্য করিয়াছিল। সর্ববিষয়ে সে আমার এখনও সহায়ক। সজনীর স্থান এখন কুমারেশই অধিকার করিয়াছে।

কলিকাতায় আসিয়া আমি অলস হইয়া থাকি নাই। ছবি আঁকিয়াছি এবং লিখিয়াছি। ভাগলপুরেও আমি ছবি আঁকিতাম। কিছু কিছু প্রকাশিতও হইয়াছিল। এখানে আসিয়া বেশ কিছু ছবি আঁকিয়াছি। আমাকে তেলরঙের ছবি আঁকিতে শিখাইয়াছিল বন্ধুবর হরিপদ রায়। সে একজন উঁচুদরের শিল্পী ছিল। সে আর ইহলোকে নাই। নানারকম লেখা লিখিয়াছি কলিকাতায় আসিয়া—ছোট গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, ব্যঙ্গ রচনা, রম্য রচনা, সবরকম। সভাপতিত্বও করিয়াছি অনেক সভায়। এখানে অনেক ভালো লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া ধন্য হইয়াছি। আমাদের দাদা ডাক্তার কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, অধ্যাপক ডঃ সুকুমার

সন, ডঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, ডাক্তার বিনোদবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু বেদজ্ঞ, শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবিবাসর', 'পূর্ণিমা সম্মেলন' এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্যরা, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত জীবনতারা হালদার, শ্রীযুক্ত তারাপদ সাউ, নাট্যকার মন্মথ রায়, লেখক শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার রচনাবলীর প্রকাশক শ্রীমান নিরঞ্জন চক্রবর্তী এবং সম্পাদক ডঃ সরোজমোহন মিত্র, লেখক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়,'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, উদ্বোধনের স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, কল্যাণীর শ্রীমান জয়দেব মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেক মনীষী আলোকবর্তিকার ন্যায় আমার জীবন-সন্ধ্যাকে আলোকিত করিয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি।

কলিকাতায় আসিবার পর আমার অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ছ-খণ্ড 'মর্জিমহল' (১৯১৬ থেকে ১৯১১), 'রঙ্গতুরঙ্গ', 'অসংলগ্না', 'সন্ধিপূজা', 'আশাবরী', 'নবীন দত্ত', 'প্রথম গরল', 'কৃষ্ণপক্ষ', 'তুমি', 'রূপকথা ও তারপর', 'রৌরব', 'ত্রি-নয়ন' (ঠুংরি, চ-বৈ-তুহি এবং কৈকেয়ী—এই তিনটি একাঙ্ক নাটক এই পুস্তকে আছে), 'বহুবর্ণ', 'সাত সমুদ্র তেরো নদী', 'লী', 'বনফুলের নূতন গল্প' প্রকাশিত হইয়াছে। এ ছাড়া আমি 'চূড়ামণি রসার্ণব' লিখিয়াছি—'ষষ্ঠিমধু' পত্রিকায়। 'পাপড়ি' লিখিয়াছি উর্দু 'শের' কবিতার ধরনে—অনেক পত্রিকায়। আমি কিশোর-কিশোরীদের জন্য একটি 'অলংকারপুরী' উপন্যাসও লিখিয়াছি। 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' নামক একটি উপন্যাসও লিখিয়াছি। এটিও বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য একটি রূপকথা। তা ছাড়া 'মর্জিমহল' লিখিয়াছি ছয়-খণ্ড। ১৯৭০খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমার বড় দৌহিত্রী ঊর্মি আমাকে একটি চমৎকার ডায়েরি উপহার দিল। বলিল—দাদা, তুমি এবার ডায়েরি লেখ। তাহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে 'মর্জিমহল' লিখিতে শুরু করিলাম। একখণ্ড 'মর্জিমহল' গ্রন্থাকারে বাহির হইয়াছে। 'ষষ্ঠিমধু' পত্রিকায় 'দ্বিতীয় খণ্ড' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছে। এই 'মর্জিমহল' বর্তমান জীবনের পটভূমিকায় আমার নানা মেজাজ, নানা আমেজ, নানা খুশী, অখুশী, নানা খামখেয়ালির আলেখ্য। এক হিসাবে এটা আমার জীবন-চরিত্রেরই একটা অংশ, যদিও তাহা ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা। এগুলি পুস্তকাকারে এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ঢুলু আমার 'অগ্নীশ্বর' বইখানি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করিয়াছে। বইটি রসিকমহলে খুব সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। এদেশে গাঁয়ে-মানে-না-আপনি-মোড়ল গোছের কয়েকটি স্বয়ম্ভু প্রাইজ-দাতা প্রতিষ্ঠান আছেন, তাহাদের সভ্যেরা তদ্বির-প্রভাবিত, স্তাবক-তোষক সবজান্তা জাতীয় লোক। 'অগ্নীশ্বর' তাঁহাদের প্রশংসালাভ করিতে পারে নাই। শৃগাল, কুকুর, গরু, ভেড়ারাও বইটি সম্বন্ধে নীরব। দেশের রসিকসমাজ কিন্তু বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ঢুলু এখন আমার একটি প্রহসন 'মন্ত্রমুগ্ধ' চিত্রে রূপ দিতেছে। কেমন হইয়াছে এখনও দেখি নাই।

হঠাৎ আমার জীবনে এই সময় একটি নিদারুণ বজ্রাঘাত হইল। ২৭শে জুলাই ১৯২৭ সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটের সময় লীলা চিরতরে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তাহার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল। সেদিন মৃত্যুদিন পর্যন্ত তাহার সহিত আমার কচিৎ ছাড়াছাড়ি হইয়াছে। সে আমার সহধর্মিণী ছিল, সহমর্মিণী ছিল। আমার সাহিত্য-জীবনের নেপথ্যে লীলাবতী যে কি ছিল, তাহা সাধারণ লোকে জানে না। বর্ণনা করিয়া বুঝাইবারও উপায় নাই। আমার ন্যায় খামখেয়ালি পাগলকে দিয়া সে যে কী মন্ত্রবলে সাহিত্য-সৃষ্টি করাইয়াছে তাহা জানি না। সংসারের কোনও আঁচ সে আমার গায়ে লাগিতে দেয় নাই। আমার প্রতিটি রচনা সে আগ্রহভরে পড়িত, কোথাও ছন্দপতন হইলে দেখাইয়া দিত। আমাব সমস্ত রচনার সে-ই ছিল প্রথম পাঠিকা, প্রথম সমালোচক। বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল তাহার। রস-বোধও ছিল নিখুঁত। তাহার পরামর্শে আমি অনেক লেখার অনেক অদল-বদল করিয়াছি। তাহার উপর বড় নির্ভর ছিল। এখন সে নির্ভর চলিয়া গেল।

প্রায় বছরখানেক আগে হইতে পক্ষাঘাত রোগ তাহাকে ধীরে ধীরে আক্রমণ করিতেছিল। কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসকরা তাহার চিকিৎসা করিতেছিল। কোন ফল হয় নাই। গত কয়েক মাস সে একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিল। কথা পর্যন্ত বলিতে পারিত না। এ সব রোগ সাধারণতঃ দীর্ঘস্থায়ী হয়। দশ, বারো, চোদ্দ, এমন কি কুড়ি বাইশ বছর এ রোগে ভুগিতেছে এ রকম অনেক খবর আমি জানি। লীলা পুণ্যবতী ছিল, ভগবান তাহাকে বেশী কষ্ট দেন নাই। তাহার বাল্যকাল শ্রীশ্রীসারদামায়ের কাছে কাটিয়াছিল। তিনিই সস্নেহে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। আমি কিন্তু বড়ই অসহায় হইয়া পড়িলাম।

কাহার কাছে নিজেরে বল
আনিয়া দিব সাঁঝে
নিজেরে ফের খুঁজিয়া পাব
এবে কাহার মাঝে।

বিরাট একটা শূন্যতা অনুভব করিতেছি। জানি না তাহা আর পূর্ণ হইবে কিনা। তাহা আর পূর্ণ হইবে না।

বই এবার শেষ করি।

পরিশেষে একটি কথাই নিবেদন করিব। তাহা বাঙালী পাঠক-পাঠিকা-সমাজের উদ্দেশ্য আমার সশ্রদ্ধ ও সকৃতজ্ঞ অভিবাদন। আমার লেখার প্রতি তাঁহাদের একান্ত আগ্রহ না থাকিলে এত দীর্ঘকাল ধরিয়া সাহিত্য-সেবা করিতে পারিতাম না। তাঁহাদের বহু পত্র, বহু অভিনন্দন, বহু বিচিত্র সান্নিধ্য আমাকে শুধু পুরস্কৃতই করে নাই, আমাকে নিত্য-নব গ্রন্থ-প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

উপন্যাস

ত্রিবর্ণ

উৎসর্গ

শ্রীমান অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু

গণেশ হালদার ডায়েরি লিখছিলেন।

"যে দেশে আমাদের বাড়ি ছিল, যে দেশের ক্ষেত-খামার, পুকুর-বাগান, যে দেশের আকাশ-বাতাস, ফুল-ফল, পশু-পক্ষী, নদী-প্রান্তর, যে দেশের লোকজন (এমন কি মুসলমানরাও) আমাদের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিল, সে দেশ এখন আমাদের দেশ নয়। আমরা সে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছি। ভারতবর্ষের গণ্যমান্য লোকেরা একদিন আমাদের ভালোর জন্যেই নাকি দেশ ভাগ করে নিজেরা গদিতে বসেছিলেন। তাঁরা এখনও গণ্যমান্যই আছেন, কিন্তু আমরা, যারা নগণ্য, তারা আরও নগণ্য হয়ে গেছি। এমন কি আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষায় কারও সঙ্গে কথা বলি, সবাই হাসে, ঠাট্টা করে। তাই আপনাদের ভাষাতেই আমার ডায়েরি লিখছি, আপনাদের যদি কেউ কখনও এ ডায়েরি পড়েন সহজে বুঝতে পারবেন।

আমাদের দুঃখ-দুর্দশার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে আপনাদের মনে অনুকম্পা সঞ্চার করবার বাসনা আমার নেই। লিখছি সময় কাটাবার জন্যে, আর কিছু করবার নেই বলে। স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতা করি। সকাল-সন্ধ্যা হাতে অনেক সময় থাকে। যা মনে আসে লিখে যাই। আমাদের দুর্দশার অনেক বিবরণ কাগজে বেরিয়েছে, আমাদের সম্বন্ধে সহানুভূতিপূর্ণ অনেক প্রবন্ধও আমি পড়েছি, আমাদের মতো গৃহহারাদের পুনরায় গৃহস্থ করবার জন্য সদাশয় গভর্নমেণ্টেরও চেষ্টার অন্ত নেই, খরচও নাকি অনেক করছেন তাঁরা এ সবাই জানে, এ-ও জানে যে, তবু আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই আছি। এ দেশের উপর যেন আমাদের কোনও দাবি নেই আমরা সকলেরই কৃপা-পাত্র, আমরা কারও আপন-জন হ'তে পারি নি, এমন কি যাঁরা আমাদের রক্তসম্পর্কের আত্মীয় তাঁরাও আমাদের আপন-জন বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন। তাঁরাও আমাদের দূর থেকে দয়া করেন, কাছে টেনে নিতে চান না। না, কারও মনে করুণা উদ্রেক করবার ইচ্ছা আর আমার নেই। ওই সব লোক-দেখানো বা কর্তব্য-প্রণোদিত করুণার উপর ঘৃণা জন্মে গেছে। গাছের ফুলকে বৃন্তচ্যুত করে শৌখীন ফুলদানিতে যাঁরা তাদের জলে ডুবিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চান, তাঁরা শৌখীন দয়ালু লোক হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁরা ফুলের আপন লোক নন। কিন্তু তবু এই অনাত্মীয় শত্রুভাবাপন্ন আত্মীয়দের মধ্যেই বাস করতে হচ্ছে। প্রাণপণে চেষ্টা করতে হচ্ছে আমার যোগ্যতা প্রমাণ করবার, এ দেশের উপর আমারও যে একটা দাবি আছে, আমি যে কতকগুলো খামখেয়ালী বা স্বার্থপর লোকের হস্তের ক্রীড়নকমাত্র নই—এই বোধটা জাগ্রত রাখবার।

হ্যাঁ, আমি যে যোগ্য সেইটে প্রমাণ করবার জন্যেই উন্মুখ হয়ে আছি। এ যোগ্যতার প্রমাণ সংগ্রহ করা সহজ নয়। জমিটা যে উর্বর তা প্রমাণ করবার জন্যে যুক্তির দরকার

হয় না। যখনই সে জমিতে সবুজ ঘাস গজায় তখনই বোঝা যায় সে জমির উর্বরতা আছে, ভালো সার দিলে সে জমিতে ভালো ফসলও ফলানো যাবে। কিন্তু আমার জীবনের মরুভূমিতে একটি তৃণাঙ্কুরও গজায় নি এখনও। বিস্মিত হয়ে ভাবি, কেন গজায় নি! আমার জীবনের সব রস কি নিঃশেষে শুকিয়ে গেছে? আমার জীবন তো সত্যই মরুভূমি ছিল না। অনেক আশা, অনেক আকাজ্ঞা, অনেক স্নেহ, অনেক ভালবাসা, অনেক বিশ্বাস, অনেক স্বপ্ন···না, মনে হচ্ছে আমি যেন নিজের উপর রাশ টেনে রাখতে পারছি না।

আমার জীবন কেমন ছিল তার একটু নমুনা দিচ্ছি। পদ্মার ধারে একটি ছোট গ্রামে বাড়ি ছিল আমার। গ্রামের নাম না-ই জানলেন। আমাদের বাড়ি পাকা ছিল না। মাটির দেওয়াল, টিনের ছাদ। বাড়ির উঠান ছিল প্রকাণ্ড। উঠানের চারধারে ঘর। পুবের কোঠা, পশ্চিমের কোঠা, দক্ষিণের কোঠা আর উত্তরের কোঠা। তা ছাড়া ছিল ঠাকুরঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর। রান্নাঘর দু'রকম—আমিষ এবং নিরামিষ। বাড়ির চারিধারে অনেকখানি জমি। সামনে পুকুর, পিছনে পুকুর। তা ছাড়া একটা বাগান। সে বাগানে না ছিল কি! আম, জাম, কাঁঠাল, গোলাপজাম, জামরুল, গাব, কাউ, চালতা, লেবু, সফেদা, সাপটু, পেয়ারা সব ছিল। সেই বাগানে জন্মাত নানা জাতের অজ্ঞাত-কুল-শীল লতা, আর তাতে ফুটত কত অদ্ভুত সুন্দর ফুল। সেই বাগানে কত নিস্তব্ধ দুপুর কাটিয়েছি, আমি আর আমার বোন বুলি। গাছে উঠে ফল পেড়ে খেয়েছি, অজানা বন্যলতা ফুল গুঁজে দিয়েছি বুলির খোঁপায়। পাখির বাসার সন্ধানে ফিরেছি উদ্‌গ্রীব হয়ে। জলে নেমে গামছা দিয়ে ছোট ছোট মাছ ছেঁকে তুলেছি খালের জল থেকে, ছোট ছোট মাছও ধরেছি পুকুরে বসে ছিপ দিয়ে। বুলি যখন একাগ্র দৃষ্টিতে নীরবে ফাৎনাটার দিকে চেয়ে বসে থাকত তখন তাকে মনে হত যেন মাছরাঙা পাখি। জামদানী ঢাকাই শাড়ি আঁটসাঁট করে পরা, খোঁপায় একগোছা মৌরী ফুল, ভুরু আর নাক ঈষৎ কোঁচকানো, একাগ্র তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফাৎনার উপর, তারপর ছিপ ধরে আকস্মিক টান এবং বঁড়শির মুখে জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব—বাটা বা পুঁটিমাছের ছটফটানি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। ওর নাম ছিল বুলবুলি, কিন্তু ওকে আমি মাছরাঙাই ভাবতাম মনে মনে। আর একটা কথাও মনে পড়ছে। বেতবন থেকে পাকা বেত-ফল এনে সে জাঁকাতো নানারকম মসলা দিয়ে। খিড়কি পুকুরের ঘাটে বসে তাই তারিয়ে তারিয়ে খেতাম দুজনে। বুলি পা নাচিয়ে নাচিয়ে খেত, আর খেতে খেতে চোখমুখ কুঁচকে যেভাবে চাইত আমার দিকে ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে তা এখনও ভুলি নি।

আর মনে পড়ছে মা-কে। স্বয়ং লক্ষ্মীকে কখনও দেখি নি, আমার মায়ের সঙ্গে লক্ষ্মীর তুলনা চলবে কি না জানি না। কিন্তু আমার মা যা ছিলেন তা বর্ণনার সীমায় ধরবার ক্ষমতা আমার নেই। টকটকে লাল-পেড়ে গরদ পরে তিনি যখন ঠাকুরঘরে রাধাবল্লভের সামনে পুজো করতেন—তাঁর চারপাশে পূজার উপচার আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি—নানারকম ফুলের মালা, চন্দন, ধূপ, শ্বেতপাথরের থালায় নৈবেদ্য,

রুপোর ছোট ছোট থালায় কতরকম ফল, রুপোর গ্লাসে গ্লাসে জল, মধু আর দুধ, চকচকে তামার পরাতে অজস্র ফুলের রাশি--সে যে কি অবর্ণনীয় মহিমা—সে মহিমা রাধাবল্লভের, না মায়ের, না আমার কল্পনার তা জানি না—কিন্তু তা অপরূপ। হাঁ, যদিও এই প্রসঙ্গে অবান্তর বলে মনে হবে, কিন্তু এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সেটা --গোয়ালন্দগামী স্টীমারের ভোঁ। মা যখন পূজা করতেন তখন পদ্মার উপর দিয়ে স্টীমারখানা যেত, ভোঁ দিয়ে যেত, সাড়া দিয়ে যেত, মাকে যেন অভিনন্দন জানিয়ে যেত। যেন বলে যেত, আমিও বন্দরে চলেছি, তুমিও চলেছ, আবার দেখা হবে। রোজই ডাক দিয়ে যেত স্টীমারটা। গভীর নিশীথে ঘুমের ঘোরেও তার ডাক শুনেছি। এখনও হয়তো ডাকে সে। আমরা আর শুনতে পাই না। মা কি শুনতে পান? কে জানে। মা এখন কোথায়? বুলিই বা কোথায়? এই দুটো প্রশ্ন অনেক দিন আমার দিবসের শান্তি এবং রাত্রের নিদ্রা হরণ করেছে, কিন্তু এখন আর করে না। মনের সে শাণিত ভাবটা ভোঁতা হয়ে গেছে। একদিন যা এক কোপে মানুষের মাথা কেটে ফেলতে পারত এখন তা সামান্য তরকারিও কাটতে পারে না। সব যেন অসাড় হয়ে গেছে। যারা আমাদের দেশের সর্বনাশ করেছে তাদেরই অধীনে চাকরি করছি, যে দেশের লোকেরা পর ভেবে আমাদের বারবার পায়ে ঠেলছে সেই দেশের লোকেদের সঙ্গেই আত্মীয়তার দাবি করছি এবং আমার এই দাবিটা যে মুখোশের দাবি নয়, অন্তরের দাবি, তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছি নিজের কাছেও। কিন্তু দাবি কি নেই? ভালবাসার দাবিই তো - কিন্তু না, এ দাবির কথা মুখ ফুটে বলবার নয়। যে অতীত আমার জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে পুড়ে গেছে, যার দগ্ধাবশেষের সম্বলও আমার কাছে আর নেই, যার কয়লা আর ছাইগুলো পর্যন্ত নিঃশেষে গ্রাস করেছেন মহাকাল—আমার সেই অতীত জীবনে যখন বাস করতাম তখন তো এ ধরনের দাবির কথা মনেও হয় নি কখনও --মাছেদের যেমন মনে হয় না জলের উপর দাবির কথা যতক্ষণ তারা জলের ভিতর থাকে, জল থেকে টেনে তুললেই তাদের মনে হয়, এ কি হ'ল—এ কি দুর্দৈব—এ কি চক্রান্ত! ডাঙায় উঠে ছটফট্ করতে করতে হয়তো কিছুক্ষণের জন্য তার মনে হয়, যেখানে এসে পড়েছি, সেখানে কি আমার কোনও দাবি আছে এবং এ প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর পাওয়ার আগেই হয়তো তার মৃত্যু হয় এবং ঝাল ঝোল অম্বল কাটলেট ফ্রাই চপে রূপান্তরিত হয়ে হয়তো সে - না খেই হারিয়ে ফেলেছি। দাবির কথা আর তুলব না। একটা কথা মনে হচ্ছে—যখন আমার বাড়িতে পিশাচদের তাণ্ডব চলছিল তখন আমি সেখানে ছিলাম না। বিলেতে তখন আমি ডিগ্রি-অর্জনের চেষ্টা করছিলাম। বিধবা মায়ের সমস্ত গয়না বিক্রি করে বিলেত যাওয়ার দুর্মতি আমার কেন হয়েছিল বারবার এই কথাটাই মনে হয় এখন। কিন্তু যদি সে সময়ে আমি বাড়িতে থাকতাম তা হলে কি হ'ত? ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিতাম? ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতাম? না, কোথাও পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতাম? ঠিক জানি না, কি করতাম। আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে কে কি করবে তা আগে থাকতে কেউ ঠিক করতে পারে কি?

অনেকগুলো সম্ভাবনা থাকে, যে-কোনও একটাকে সে আঁকড়ে ধরে। আঁকড়ে ধরে শেষ পর্যন্ত বাঁচবে বলেই। কখনও বাঁচে, কখনও বাঁচে না। বুলি কি বেঁচে আছে? আমার মা? কোথায় অবলুপ্ত হয়ে গেল তারা। আমিও তো অবলুপ্ত হয়ে গেছি আমার গ্রামের লোকদের কাছে। হরি, আবদুল, ফজলু, মিঠি, বদা এরা কি আমার খবর রাখে আর? মিঠিকে আমি যে বাঁশিটা দিয়েছিলাম সেটা বাজাবার সময় আমার কথা কি তার মনে পড়ে? কিন্তু আমি তো দিব্যি বেঁচে আছি। বুলি আর মা কি তেমনি কোথাও...সহসা মনে হচ্ছে, বেঁচে আছে কি না তা জানবার জন্যে আমার ততটা আগ্রহ নেই, আমার কৌতূহল কেমন করে বেঁচে আছে তাই জানবার জন্য। অর্থাৎ তারা · না, কথাটা স্পষ্টভাবে ভাবতেও ভয় করে। অথচ কেউ যদি প্রশ্ন করে ভয়টা কিসের, ওসব ঝুটো কুসংস্কার যে কতটা মূল্যহীন তা কি তুমি জান না, বিলেতে তুমি কি দেখ নি যে, যে সমাজকে আমরা আদর্শ করেছি, হিন্দুরা যাকে সতীত্ব বলে সে জিনিসের কোনও কদর নেই সে সমাজে? সেখানে রাস্তায় ঘাটে পার্কে গার্ডেনে নর-নারীর মিলনের অবাধ সুযোগ কি দেখে আস নি তুমি? জাত নিয়ে, সতীত্ব নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা কি প্রাদেশিকতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার মতো হাস্যকর জিনিস নয় একটা? এসব নিয়ে কিছু ভাবা অনর্থক, কিছু লেখা বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র। এ বিষয়ে একটিমাত্র সত্যই আমার কাছে একমাত্র সত্য—কাঁটার মতো বিঁধে আছে কথাটা বুকের ভিতর। সে কাঁটা তোলবার উপায় নেই, কাউকে দেখাবারও উপায় নেই।

...হঠাৎ চীনে মুরগী দুটো ডেকে উঠল তারস্বরে। চীনে মুরগীরা যখন ডাকে মনে হয় আর্তনাদ করছে। অন্য মুরগীরাও ডাকতে শুরু করেছে, কোলাহল করছে, বিশেষ করে লাল বড় মোরগটা। তারপর খুব সরু গলায়—"বাবু, মুল্‌গি আণ্ডা দেলকে, আণ্ডা দেলকে—"

ডাক্তারবাবুর বুড়ী দাইয়ের নাতি বিজয়ের গলা। উঠতে হল। মুরগীর ঘরের চাবি আমার কাছে। উঠে বেরিয়ে এলাম আর একটা জগতে, বাইরের জগতে, যে জগতে এখন আমি আছি।

এ জগৎটা খারাপ নয়। অতি সুন্দর। শহর থেকে দূরে, গঙ্গার তীরে। ছেলেবেলা উদ্দাম পদ্মার তীরে কেটেছে, যৌবনে টেমসের সুসজ্জিত সৌন্দর্য উপভোগ করেছি, জীবনের আসন্ন অপরাহ্ণে এসেছি গঙ্গার তটে। আমি যেখানে আছি সেখানে গঙ্গা দুকূল-প্লাবিনী নয়, সন্ন্যাসিনী। তার বিরাট খাতে কখনও জল থাকে, কখনও থাকে না। শীতকালেই সে বৈরাগিনীর মূর্তি ধারণ করে। সামান্য শীর্ণধারা বইতে থাকে এদিকে-ওদিকে, তবু তারই চারধারে নামে শীতের অতিথি পাখিরা। খঞ্জন, কাদাখোঁচার দল, সোনালোর ঝাঁক, কখনও কখনও ছোট-বড় হাঁসও নানারকম। এই হাঁসেরা আসে

গভীর রাত্রে। অন্ধকারে-শিহরণ-জাগানো তাদের ডাক শুনে সেটা বুঝতে পারা যায়। কাছাকাছি মানুষ এলেই কিন্তু উড়ে যায় অদ্ভুত পাখার শব্দ করে। বন্দুকধারী মাংসাশী মানুষদের ওরা চিনে ফেলেছে। মানুষরাই মানুষদের কাছ থেকে পালায়, পাখিরা তো পালাবেই। জলের স্রোতে অসংখ্য ছোট ছোট মাছ, প্রতিবেশী বালকবালিকাদের মনের এবং দেহের খোরাক জোগায়। ওদের দেখে মনে পড়ে যায় আমার ছেলেবেলার কথা। মনে পড়ে যায় মাছরাঙাকে। গঙ্গার চরে শুধু বালি নয়, পলিমাটিরও প্রাচুর্য খুব। শীতকালে জমি চষে, গম যব বুট বুনে দেয়, কিছুদিন পরেই ধূসর চর শ্যামল হয়ে ওঠে। তারপর যখন শস্য পাকে তখন চরের আর এক রূপ। দিগন্তের নীলে গিয়ে মিশেছে পাকা ফসলের তরঙ্গিত স্বর্ণ-কান্তি। সকালে-বিকালে ভরদ্বাজ পাখির আকাশ-বন্দনা, কৃষকের কণ্ঠে প্রাণ-খোলা গান, আশ-পাশের গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েদের লুকিয়ে ফসল চুরি করা, স্তূপীকৃত কাটা ফসলের রূপ, গরু দিয়ে ফসল মাড়ানো, তার চারধারে শুধু মানুষ নয়, শালিক-কাক-ফিঙেদের ভিড়, মাথার উপর নীলকণ্ঠের কর্কশ-কণ্ঠের প্রেয়সী-বন্দনা, নিঃশব্দ দুপুরে চিল আর শকুনদের নিঃশব্দ আকাশ-পরিক্রমা— এই সমস্তটা মিলিয়ে গঙ্গার চরের যে শোভা আমার মনে আঁকা হয়ে গেছে, তা গঙ্গারই শোভা, কিন্তু সে গঙ্গা প্রবলা প্রত্যক্ষবর্তিনী নয়, তা রহস্যময়ী নেপথ্যবাসিনী, গঙ্গা এখানে যেন উদাসিনী সন্ন্যাসিনী, কর্মচঞ্চলা তরুণী নয়। তার রাজত্ব সে যেন ছেড়ে দিয়েছে চরকে, তার চিরপরিচিত রূপ লুকিয়ে দেখা দিয়েছে যেন নূতন রূপে। দেখা দিতেই হবে, রূপ লুকিয়ে রাখা যায় না। চরের ওপারেই কিন্তু গঙ্গার সাবেক রূপ, তরঙ্গমুখর স্রোতস্বিনী। লোকে সেখানে স্নান করছে, পান করছে তার জল, পূজার অর্ঘ রচনা করছে, সাঁতার কাটছে, নৌকা ভাসাচ্ছে। একই গঙ্গার দুই রূপ। গঙ্গার ওই তরঙ্গমুখর রূপ মাঝে মাঝে দেখব বলে বেরিয়ে পড়ি, হেঁটে চর পার হয়ে যাই। শুধু গঙ্গা দেখব বলে নয়, মাছরাঙা দেখব বলে। ওখানে মাঝে মাঝে মাছরাঙা দেখা যায়।

বিজয় সরু গলায় আবার বললে, "বাবু, আণ্ডা দেলকে মুলগি।"

"চল, কোথায় দেখি।"

বিজয়ের বয়স চার বছর। তার দৈনন্দিন কর্মসূচী বিবিধ এবং বিচিত্র। যে-কোনও ছুতোয় জল ঘাঁটা, ধুলো ঘাঁটা, বারবার গুলি আর বল হারানো, তার বোন শালিয়ার সঙ্গে খুনসুটি করা, লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে তার পিসি রুকমিনিয়ার কাছে খাবার খেয়ে আসা (কখনও কখনও মারও), ডাক্তারবাবুর মোটরটা যখন তাঁর ড্রাইভার বার করে পরিষ্কার করে তখন তার চারদিকে ঘুরঘুর করা এবং সুযোগ পেলেই তাতে চড়ে বসা, গিনিপিগ আর খরগোশের খাঁচার কাছে বসে তাদের সঙ্গে আলাপ করা এবং তাদের উচ্ছিষ্ট ছোলা পেলে এদিক-ওদিক চেয়ে সেটা মুখে পুরে দেওয়া, একটা ভাঙা তোবড়ানো ছোট টিনের মোটরে দড়ি বেঁধে সেটা টেনে নিয়ে বেড়ানো, কিন্তু তার সবচেয়ে বড় কর্তব্য মুরগীর ঘর থেকে ডিমটি সংগ্রহ করে মাইজিকে দিয়ে আসা।

মাইজি মানে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী। মুরগীর ঘরের চাবিটা থাকে আমার কাছে, কারণ তার সঙ্গে গেটের চাবিটাও থাকে এক রিং-এ।

ডাক্তারবাবুর বাড়ির প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের এক ধারে যে 'আউট-হাউস'টা আছে তাতেই আমি থাকি। কিছুদিন আগে যখন এখানে চাকরি নিয়ে এসেছিলাম, তখন বাড়ি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ডাক্তারবাবু তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁর 'আউট-হাউস'টাতে। আমি ভাড়ার কথা তুলেছিলাম, কিন্তু ডাক্তারবাবু বললেন, আমি বাড়িভাড়া দিই না। তবে আপনি যতদিন খুশি থাকতে পারেন। আমি বললাম, এভাবে কি থাকা যায়! তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, তা হলে থাক'বন না। তাঁর চোখে একটা চাপা কৌতুকহাস্য যেন লক্ষ্য করেছিলাম, কিন্তু তখন আর কিছু বলতে সাহস পাই নি।

ডাক্তারবাবু লোকটি একটু অদ্ভুত ধরনের। তাঁর সঙ্গে বেশী কথা কইতে সাহস হয় না। প্রায় সমস্ত দিনই বাইরে থাকেন। রোগীর সন্ধানে ঘোরেন না, রোগীরাই তাঁর সন্ধানে ঘোরে, তিনি থাকেন ঘাটে মাঠে পথে প্রান্তরে। ডিস্‌পেন্সারিতে যান অবশ্য খনিকক্ষণের জন্য, যদি দৈবাৎ সে সময় রোগী থাকে, তার চিকিৎসাও করেন, কিন্তু রোগীর জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে তাঁকে কেউ কখনও দেখে নি। প্রথম প্রথম আমার অবাক লেগেছিল, কিন্তু, কারণটা কখনও জিজ্ঞাসা করতে সাহস করি নি। একদিন তাঁরই এক বন্ধু এসে এ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। আমি তখন তাঁর ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে আলোচনাটা শুনেছিলাম। শুনে আরও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল ইনি বোধ হয় আমাদের মতো লোকের নাগালের বাইরে থাকেন। বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি প্র্যাকটিস্ যখন ছেড়ে দাও নি তখন রোগীদের অমন করে অবহেলা কর কেন? ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, রোগীদের মধ্যে চিকিৎসা-ক্রেতা খুঁজি না, খুঁজি প্রণয়ী বা প্রণয়িনী। আমার মনের কথা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অনেক আগে বলে গেছেন—'যে জন আমার লাগি উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষিয়া থাকে, সেই ধন্য করিবে আমাকে'। যারা ঠং ঠং করে ডাক্তারের ফি গুনে দিয়ে মনে করে ডাক্তারের মাথা কিনে নিলুম, তারা কখনও আমার রোগী হবে না। যেসব ঘাটে হাজার হাজার ডাক্তার বিত্তের বুদ্ধির ডিগ্রীর ছিপ ফেলে নিজের নিজের ফাৎনার দিকে সাগ্রহে চেয়ে আছে সেসব ঘাটের ত্রিসীমানাও আমি মাড়াব না। ছিপ ফেলার ইচ্ছেই নেই আমার। রোগী আমাকে খুঁজবে, প্রয়োজন তার। বন্ধু বললেন, কিন্তু এ মনোভাব নিয়ে বসে থাকলে ব্যবসা চলে না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন ডাক্তারবাবু, আমি ডাক্তার, বেনে নই। আমার ডাক্তারির উপর যাদের আস্থা আছে, তারা আমার জন্য অপেক্ষা করবে, অপেক্ষা করেও যদি না পায়, আবার ফিরে আসবে। এতে টাকা কম পাওয়া যায়, কিন্তু আনন্দ অজস্র। ওইটেই আমি চাই। আমার বাবার কাছে এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার দৈনন্দিন সংসারযাত্রার সম্বল তিনি

রেখে গেছেন। উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে আমাকে চাল ডাল কেনবার পয়সা রোজগার করবার জন্য বেরুতে হয় না। আমি সারা জীবন যদি কিছুই না রোজগার করি তা হলেও আমার চলে যাবে। তাঁর বন্ধু তখন প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তোমার সময় কাটে কি করে? বাড়িতে তো তোমাকে পাওয়া যায় না। আবার হেসে উত্তর দিলেন ডাক্তারবাবু. ঘুরে বেড়াই মনের আনন্দে, চোখ কান খোলা রেখে। তাতে কি যে আনন্দ তা তোমাদের বোঝাতে পারব না।

এই অদ্ভুত প্রকৃতির খামখেয়ালী লোকটির আওতায় আমি বাস করি। দশটা পাঁচটা স্কুল করি, বাকী সময়টা এখানেই কাটাই। কারও সঙ্গে আলাপ করতে সাহস পাই না। ভয় হয় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু বলে পাছে কেউ করুণা করে। কিন্তু কয়েকদিন পরেই করুণা তাড়া করে এসে আমার ঘরে ঢুকল। প্রথম প্রথম হোটেলে খেয়েছিলাম কয়েকদিন · কিন্তু একদিন ডাক্তারবাবুর বুড়ী ঝি এসে বললে, মাইজি বললেন, আপনি আজ থেকে এখানেই খাবেন। হামি আপ্‌নের খানা দিয়ে যাব। কুছ তক্‌লিফ হোবে না। আপনি হোটেলে খাবেন না. ওখানে তর্কারিতে খুব মশালা দেয়. ভাত ভি শকত্‌ থাকে। ওখানে নীরদবাবু খেতেন, পেটের অসুখে তিনি খতম হয়ে গেলেন। আপনি ওখানে আর খাবেন না, মাইজি মানা করে দিয়েছে।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রীকে আমি কখনও দেখি নি। তিনি বোধ হয় আধুনিকা নন, বাইরে কখনও বেরোন না। অসূর্যম্পশ্যা হয়তো নন, কিন্তু গোঁড়া অন্তঃপুরিকা। তাঁর ছেলেমেয়ে হয় নি। বিয়েও শুনেছি অল্পদিন হয়েছে। আপাতত বুড়ী ঝিয়ের মাতৃহারা নাতি-নাতনীদের নিয়েই তাঁর সংসার। তা ছাড়াও আছে জন দু'য়েক চাকর। তারাও বাড়ির পরিজনের শামিল। আর আছে মুরগী, কুকুর, গিনিপিগ, খরগোশ, ভেড়া আর গরু। গিনিপিগ. খরগোশ আর ভেড়া ডাক্তারবাবুর ল্যাবরেটরির। তিনি মাঝে মাঝে এদের রক্ত নেন রোগীদের রক্ত পরীক্ষা করবার জন্য। অবশ্য তা ক্বচিৎ। কারণ, রোগীরা প্রায়ই তাঁর নাগাল পায় না।

বুড়ী ঝিয়ের মারফত ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর প্রস্তাব শুনে আমি প্রথমে অবাক এবং পরে ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। আত্মসম্মান-শজারুর কাঁটাগুলো খাড়া হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিলাম ডাক্তারবাবুকে বলব. 'আমার আর এখানে থাকা পোষাচ্ছে না। আপনি বাড়িভাড়াও নেবেন না, তার উপর বিনা পয়সায় খেতেও দেবেন. এত দয়া আমি বরদাস্ত করতে পারব না। আপনি আমার জন্য যা করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এভাবে চিরকাল চলতে পারে না। আপনি হয় আমাকে পেইং গেস্ট করে রাখুন, না হয় আমাকে ছেড়ে দিন, আমি অন্য একটা আস্তানা খুঁজেনি। এখানে 'চন্দ্রগুপ্ত' হোটেলে একটা ঘর খালি আছে শুনেছি।'

কিন্তু দেখলাম এ কথা ভাবা যত সহজ, কাজে পরিণত করা তত সহজ নয়। ডাক্তারবাবু সকালের দিকে অবশ্য বাড়িতে থাকেন, দশটার আগে বেরোন না কোথাও, যতক্ষণ থাকেন বাড়ির বাইরে মাঠেই থাকেন, কিন্তু তাঁর চতুর্দিকে এমন একটা অদৃশ্য

দুর্ভেদ্য দেওয়াল সর্বদা তাঁকে ঘিরে থাকে যে, সে দেওয়াল পেরিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া শক্ত। সাধারণতঃ এ সময় তিনি তাঁর জন্তুজানোয়ারদের নিয়েই থাকেন। তাদের সঙ্গে কথা কন। প্রায়ই ইংরেজীতে।

"Hallo Jamboo, what is your opinion about things in general ?"

'কি হে জাম্বু, দুনিয়ার হাল-চাল সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি রকম ?'

তাঁর উচ্চকণ্ঠের এ উক্তি প্রায়ই শোনা যায়। জাম্বু তাঁর পোষা কুকুর। স্প্যানিয়েল জাতের। গা ভরতি কুচকুচে কালো লোম। ভালুকের মতো দেখতে ছিল বলে ডাক্তারবাবু নাকি ওর নাম রেখেছিলেন জাম্বুবান। শুনেছি জাম্বুবানের এককালে খুব প্রতাপ ছিল। কিন্তু এখন ও স্থবির। বোধ হয় কানেও শুনতে পায় না। কিন্তু ডাক্তারবাবু যা বলেন তা বুঝতে পারে। কারণ, দেখা যায় ওর মুখে অদ্ভুত একটা স্মিত হাস্য ফুটে উঠেছে, ধীরে ধীরে ল্যাজ নাড়ছে। ডাক্তারবাবু যখন ওর মাথা চাপড়ে আদর করেন—"জাম, জাম, জামটু জামলিশ"—তখন ও যেন বিগলিত হয়ে যায়, চোখের দৃষ্টি থেকে স্নেহ যেন ঝরে পড়ে, তারপর হঠাৎ মাথাটা নেড়ে কান চট্‌পট্ করে হেঁচে ফেলে সে। ওইটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিশেষ ভঙ্গি। ডাক্তারবাবু যখন জাম্বুকে আদর করেন তখন ভুটানটা তাঁর মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তার ভাবটা যেন, আমার দিকে মন দেবে কখন। ভুটান ছোট্ট কুকুর, কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর। খাঁদা নাক, চ্যাপ্টা মুখ, গা ভরতি সাদায় কালোয় লোম। ল্যাজটি ঠিক ক্রিসানথিমাম্ ফুলের মতো, সর্বদাই নড়ছে।

ডাক্তারবাবু এই সব নিয়ে এমন তন্ময় হয়ে থাকেন যে, তাঁর কাছে গিয়ে নিজের কথা বলতে সঙ্কোচ হয়। একদিন তাঁর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু মনে হল তিনি যেন আমাকে দেখতেই পেলেন না, মনে হল তিনি যেন অনেক দূরে আছেন। এইটেতেই আমার আরও বেশী কষ্ট হয়। আমি যে তাঁর বাড়িতে তাঁরই আমন্ত্রণে তাঁর কাছাকাছি আছি, তাঁর আশ্রয়ে নিজেকে সার্থক ক'রে তুলতে চেষ্টা করছি, সেটা যেন তিনি লক্ষ্যই করেন না। আমার অস্তিত্বই তিনি যেন স্বীকার করতে চান না. এইটেতেই আমার আত্মসম্মানে আরও আঘাত লাগে। যে দেশ একদিন আমার নিতান্ত আপন ছিল আজ দেখছি তা আর আমার নয়, তা পরের। অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকাতে গিয়ে বরং বাস করতে পারি, কিন্তু পাকিস্তানে গিয়ে বাস করা আর সম্ভব নয়। কোথায় কি যেন ছিঁড়ে গেছে, আর জোড়া লাগবে না। যে মুসলমান-দের কখনও পর ভাবতে পারি নি, তারা আজ পর। বিতাড়িত হয়ে এখন আমরা যে হিন্দুস্থানের লোকদের আপন করে নিতে চাইছি তারা যদি ভদ্রভাবে আশ্রয় না দেয় তা হলে আমরা যাবো কোথায় ? ডাক্তারবাবুর মতো লোক কুকুরের সঙ্গে গল্প করেন, কিন্তু আমার দিকে একবার ফিরে চাইতেও তাঁর ইচ্ছা হয় না। যে অনুকম্পাভরে তিনি রাস্তায় ভিখারীকে একটা পয়সা ছুঁড়ে দেন বোধ হয় তার চেয়ে বেশী অনুকম্পাভরে তিনি আমাকে থাকতে দিয়েছেন, খেতে দিতেও চাচ্ছেন। অথচ আমার সঙ্গে একটা

কথাও বলেন না। আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে এটা কি সহ্য করা যায়? আমিও তো শিক্ষিত লোক, তাঁর মনোযোগের উপর আমার একটু দাবিও কি নেই!

একদিন মরিয়া হয়ে এগিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি তখন ভুটান নামক ছোট্ট জাপানী কুকুরটাকে নিয়ে মেতে ছিলেন।

'ভুটুন্, ভুটুন্, ভুট্‌নি ভুটুন্' বলে টুসকি দিচ্ছিলেন। আর ভুটান তার পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে নাচছিল।

"আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।" সসঙ্কোচে এগিয়ে গিয়ে বললাম। তিনি এমনভাবে আমার দিকে চাইলেন যেন আমাকে এর আগে আর কখনও দেখেন নি। খানিকক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, "ও আপনি! কি বলবেন বলুন।"

এর পর খানিকক্ষণের জন্য বাক্‌সঙ্কট হল আমার। কিভাবে কথাটা বলব তা সহসা ঠিক করতে পারলাম না।

"কি বলবেন, বলুন।"

একটু ইতস্তত করে বললাম, "আপনার এখানে এরকমভাবে কতদিন থাকব?"

"কি রকম ভাবে?"

"আপনার অনুগৃহীত হয়ে। বিনামূল্যে আপনার বাড়িতে থাকবার খাবার দাবি তো আমার কিছু নেই—"

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তারবাবু। মনে হল তাঁর কণ্ঠ থেকে শব্দের তুবড়ি বিস্ফোরণ হল যেন। আমি হকচকিয়ে গেলাম। এত জোরে তাঁকে আর কখনও হাসতে শুনি নি।

হাসি থামিয়ে তিনি পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ দুটো মুছে ফেললেন। হাসতে হাসতে তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। তারপর বললেন, "আপনি দাবিদাওয়া নিয়ে খুব মাথা ঘামান দেখছি। ওকালতি পড়েছিলেন না কি?"

সত্যিই আমি ওকালতি পড়েছিলাম। কিন্তু তাতে শেষ পর্যন্ত সুবিধা হবে না ভেবে অন্য পথ ধরেছি। বিলাতী বি-এ ডিগ্রিটার জোরে এখানে চাকরি করছি। মাস্টারি।

"ওকালতি পড়েছিলাম। কিন্তু যারা উকিল নয় তাদেরও তো আত্মসম্মান থাকা উচিত।"

"তাই শুনেছি। শুদ্ধ ভাষায় ছেলেবেলায় প্রবন্ধ রচনা করেছিলাম, মনুষ্যত্বের সহিত আত্মসম্মান ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কিন্তু বড় সন্দেহ জেগেছে। মনে হয়েছে আমি কি এমন একটা রাজা-উজির যে নিজেকে ক্রমাগত সম্মান করে যাব? ওই যে শালিক-দম্পতি আমার বারান্দায় বাসা বেঁধেছে ওরা আমার অনুমতি নেয় নি, আত্মসম্মান নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না, ওরা নিজেদের ধান্দাতেই ব্যস্ত, ওরা সুখী। আপনি শুধু শুধু আত্মসম্মানের ঝামেলা তুলে কেন কষ্ট পাচ্ছেন তা আমার মাথায় ঢুকছে না। এখানে যদি আপনার কোন অসুবিধা থাকে বলুন, সেটা দূর করবার চেষ্টা করতে পারি।"

"আমি শালিক পাখি নই, মানুষ। তাই আপনার বাড়িতে বিনা ভাড়ায় থাকতে আর বিনা খরচায় খেতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে।"

"টাকা আমি নিতে পারব না আগেই বলেছি। এতে আপনার যদি অসুবিধা হয় অন্যত্র যেতে পারেন। কিন্তু যাবেনই বা কেন আমি ভেবে পাচ্ছি না।"

"আমার অস্বস্তি হচ্ছে। আমাকে দিয়ে অন্তত কিছু কাজ করিয়ে নিন। সকালবেলা আর বিকেল পাঁচটার পর আমার ছুটি। সে সময় আপনার কোনও কাজে যদি লাগতে পারি তা হলে আমার সঙ্কোচের কারণ থাকবে না।"

"আপনাকে কি কাজে লাগাব? কাজ বলতে লোকে যা বোঝে তা তো আমি কিছু করি না। আমি যা করি তাকে লোকে বলে অকাজ। এই যে এখন কুকুরদের সঙ্গে আলাপ করছি ওর মধ্যে আপনাকে কাজে লাগাব কি করে?"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ডাক্তারবাবু বললেন, "তা ছাড়া আমি সমস্ত দিন যে-সব জায়গায় ঘুরি, যেখানে যাই, যা করি, সেখানে দ্বিতীয় লোকের স্থান নেই। আমার ড্রাইভার বেচুও সেখানে থাকে না।"

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "আপনার ডিস্‌পেন্সারির হিসাবপত্র আমি রাখতে পারি। যদি বলেন—"

আবার তাঁর গলায় হাসির তুবড়ি ছুটল।

"আমার ডিস্‌পেন্সারি নেই, আমি ওষুধ বিক্রি করি না। যা আছে তা বেহিসাবী ব্যাপার। ওর জন্য কোনও হিসাব-রক্ষক দরকার নেই। এই রকেট, রকেট, ডোণ্ট ডু ছাট। কাম্ হিয়ার।"

প্রকাণ্ড অ্যাল্‌সেসিয়ান কুকুর রকেট ছুটে এল। তার মুখে একটা কাঠের টুকরো, চক্ষু উদ্ভাসিত। প্রকাণ্ড ল্যাজ নাড়াতে নাড়াতে কাছে এসে দাঁড়াল, যেন কাঠের টুকরো কুড়িয়ে এনে মহা কৃতিত্ব করেছে একটা।

"ফেল্ ফেল্, ওটা ফেলে দে।"

কাঠের টুকরোটা রকেট কিছুতে ফেলবে না। ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ছুটে ছুটে বেড়াতে লাগল। এমন সময় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হল চার বছরের বিজয়। সে কিন্তু রকেটকে তর্জনী তুলে শাসন করে যেই বলল, "লকেট লকেট কাম্ কাম্ ছিট্ (sit) ছিট্"—কি আশ্চর্য অমনি রকেট তার সামনে এসে বসল আর তার সামনের পা-টা তার কাঁধের উপর তুলে দিল। কাঠের টুকরোটাও পড়ে গেল তার মুখ থেকে। হঠাৎ ডাক্তারবাবু তাঁর পকেট থেকে একটা টেনিস বল বার করে ছুঁড়ে দিলেন সেটা। বিদ্যুৎবেগে রকেট ছুটল সেটার পিছু পিছু এবং নিমেষে সেটাকে নিয়ে এল।

"দে, আমাকে দে ওটা।"

কিছুতেই দেবে না রকেট। ডাক্তারবাবু তাকে খোশামোদ করতে লাগলেন। রকেট দুষ্টু ছেলের মতো বলটা মুখে করে ছুটে বেড়াতে লাগল।

বিজয় চোখ পাকিয়ে তর্জনী তুলে এবারও বলল, "লকেট কাম্ ছিট" কিন্তু এবার রকেট বিজয়ের কথাও শুনলে না। কারণ সে জানে ওই বলটার উপর বিজয়েরও লোভ আছে, বিজয়ের হাতে পড়লে বলটা হয়তো ও আর দেবে না। হঠাৎ ডাক্তারবাবুর খেয়াল হ'ল বিজয়কে তিনি যে স্যাণ্ডাল-জোড়া দু দিন আগে কিনে দিয়েছিলেন সেটা তো ওর পায়ে নেই।

"বিজয়, তোর জুতো কই?"

আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে বিজয় বলল, "হালা গেলে।" অর্থাৎ হারিয়ে গেছে। এর জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত নয় সে।

"এই পেটুকি, এই পেটুকি, কোথা যাচ্ছিস্?"

একটা লেগ হর্ন মুরগী ছুটতে ছুটতে যাচ্ছিল। ডাক্তারবাবুর ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল একবার, ঘাড়টা একবার কাত করে চাইল তাঁর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে, তারপর ছুটতে লাগল।

ডাক্তারবাবু আমার দিকে সহাস্য দৃষ্টি মেলে জিজ্ঞাসা করলেন, "ও কি বললে বুঝতে পারলেন?"

"না—"

"ও বললে আমি ডিম দিতে যাচ্ছি, আমাকে পিছু ডাকছ কেন? এখনই ও ডিম দেবে?" বিজয়, যা।"

বিজয় চলল মুরগীর পিছু-পিছু। এই সব ছেলেমানুষি কাণ্ড-কারখানার মধ্যে আমি আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব, চলে যাচ্ছিলাম। ডাক্তারবাবু ডাকলেন।

"আপনাকে নিয়ে মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি। আপনার আহত আত্মসম্মানে কি মলম দিলে সুফল ফলবে তা তো মাথায় আসছে না। আপনাকে যদি ঝি-চাকরের কাজ করতে বলি তা হলে তো আপনার আত্মসম্মান আরও কাহিল হয়ে পড়বে—"

"কি কাজ?"

"ধরুন যদি আপনাকে সুপুরি কুঁচুতে বা তরকারি কুটতে বলি?"

"মাপ করবেন, তা আমি পারব না।'

"আমি জানতাম। আমিও পারি না ওসব।"

ভুরু কুঁচকে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "আপনাকে কাজ দিতে হলে আমাকেও কাজ করতে হয় কিছু। কখনও করি নি, কিন্তু আপনার যদি সুবিধা হয় করা যাবে না হয়।"

"কি রকম কাজ সেটা—

"পাঠোদ্ধার। আমি সমস্ত দিন যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই তখন নানারকম আইডিয়া মাথার মধ্যে আসে। আসে আর উড়ে যায়। কখনও তাদের কথার খাঁচায় বন্দী করবার চেষ্টা করি নি। আপনার যদি সুবিধা হয় করব। লিখে ফেলব না হয়। কিন্তু

আমার হাতের লেখা এমন যে পরদিন হয়তো নিজেই আমি পড়তে পারব না। আপনি যদি পারেন, পরিচ্ছন্ন করে লিখতে পারেন সেগুলো—"

"তাতে কি হবে?"

"আপনি একটা কাজ পাবেন। আপনাকে একটা কাজ দেওয়াই লক্ষ্য। আপনার আত্মসম্মানকে সজীব রাখবার আর তো কোনও উপায় ভেবে পাচ্ছি না। লিখবেন?"

ভদ্রলোককে হঠাৎ খুব ভাল লেগে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনটা আনন্দে ভরে উঠল।

"লিখব। কিন্তু পরিষ্কার করে লিখে তারপর কি করব ওগুলো?"

"আপনার যা খুশি। রেখেও দিতে পারেন, যদি আপনার ভাল লাগে। অনেক ফোটোগ্রাফার নিজের তোলা ফোটোর কপি রেখে দেন, আমার মনের নানা মেজাজের ফোটো যদি পরিচ্ছন্ন করে রাখতে পারেন, রাখুন, আমার আপত্তি নেই। ভাল যদি না লাগে, ফেলে দেবেন, ফেলেই বা দেবেন কেন, দাইকে দিয়ে দেবেন সে বাজে কাগজ দিয়ে ঘুঁটে ধরায়। দেখুন, দেখুন, ওটাকে চেনেন?"

একটা সবুজ রঙের ছিপছিপে পাখি এসে টেলিফোনের তারের উপর বসল।

"না, আমি চিনি না।"

"বাঁশপাতি। ওদের সঙ্গে ভাব করুন না। ওরা লোক ভাল।"

মুচকি হেসে চলে আসছিলাম। আবার ডাকলেন ডাক্তারবাবু।

"রাঘব ঘোষালের সঙ্গে আলাপ আছে আপনার?"

"না। কে তিনি?"

"তিনিও একজন ডাক্তার। এবং একজন উদ্বাস্তু। সে হিসাবে আমার সম-গোত্র। আমার বাড়ির পশ্চিমে ওই যে ছোট্ট বাড়িটা দেখছেন, ওতেই উনি থাকেন। তাঁর চেহারা দেখে মাঝে মাঝে আলাপ করতে ইচ্ছে হয়—বোধ হয় একবার এসেওছিলেন আমার কাছে—কিন্তু আমি সময় করে উঠতে পারি নি। আলাপ-টালাপ করা আমার ধাতে নেই। আপনাদের দেশের লোক, আলাপ করলে হয়তো ভালো লাগবে। আলাপ করুন না গিয়ে একদিন। আর কিছু না হোক, সময় তো কাটবে—"

"তাঁর কপালের উপর কি একটা আব আছে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোক।"

"আচ্ছা, গিয়ে আলাপ করব একদিন।"

চলে এলাম ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে। একটা অপরূপ সুর যেন বাজতে লাগল মনের তন্ত্রীতে।"

গণেশ হালদার সেদিন পর্যন্ত লিখে তাঁর ডায়েরি বন্ধ করলেন। নিয়মিতভাবে না হলেও প্রায়ই তিনি তাঁর ডায়েরি লেখেন, আর এই ডায়েরিতেই তাঁর স্বরূপ চেনা যায়। বাইরে তিনি ভীরু, স্বল্পবাক্ এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

॥ ২ ॥

হিন্দী ভাষায় যাকে বলে 'চালতা পুরজা', রাঘব ঘোষাল লোকটি তাই। বলিষ্ঠ-গঠন দীর্ঘাকার ব্যক্তি। মাথার সামনের দিকটা কেশবিরল, পিছনের দিকে গোছা-গোছা চুল, কটা রঙের। চোখের তারাও কটা। আর একটা বৈশিষ্ট, চোখের পলক কম পড়ে। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকবার পর একবার মাত্র পলক পড়ে, তখন অন্য দিকে তাকান। কপালের উপর আবটা প্রকাণ্ড। গায়ের রং তামাটে। গোঁফ দাড়ি কামানো। বেশ ভারী-ভরাট মুখ। মিলিটারি ছাঁটের খাঁকি কোট-প্যাণ্ট পরতে ভালবাসেন। পায়েও মিলিটারি বুট। যৌবনে নাকি মিলিটারিতে কাজও করেছিলেন। এখন তাঁর বয়স প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায়, পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। এ শহরে কিছুদিন আগে এসেছেন। এসেই জমিয়ে ফেলেছেন বেশ। ভাল ডাক্তার বলে নয়, নিরঙ্কুশ ব্যক্তি বলে। পয়সা রোজগার করবার কোন উপায়কেই তিনি হেয় মনে করেন না। মিথ্যা সার্টিফিকেট দেন, অবৈধ গর্ভপাত করেন জুয়া খেলেন, ফ্লাশ খেলাতে দক্ষতা আছে, অনেক চোরা-কারবারে টাকা খাটান। তা ছাড়া, ডাক্তারির জোরে যতটা উপায় করা সম্ভব তা তো করেনই। যে অসুখ তিন দিনে সারার কথা, সেটা সারাতে তাঁর প্রায় তিন সপ্তাহ লেগে যায়, প্রেস্‌ক্রপশনের পর প্রেস্‌ক্রপশন বদলান। লোকে বলে, ডাক্তারবাবুর ওষুধের দাম নাকি সস্তা, কিন্তু রোগীরা বুঝতে পারে না যে তিনি অনেকদিন ধরে চিকিৎসা করে ওষুধের দাম শেষপর্যন্ত অনেক বেশী নিয়ে নেন। কিন্তু তবু তিনি জনপ্রিয়, তার কারণ তাঁর নাটকীয় ধরণ-ধারণ। ডিসপেন্সারিতে যখন অনেক রোগীর ভিড় তখন হয়তো শুনলেন শহর থেকে দশ মাইল দূরে কোন লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছে, গরীব লোক, ফি দেবার সামর্থ নেই, আসতে পারছে না। অমনি রাঘব বলে উঠলেন, কুছ পরোয়া নেই। আমি গিয়ে দেখে আসছি। ঝরঝরে সেকেলে ফোর্ড গাড়িটা বের করে চলে গেলেন সেখানে। তার চিকিৎসা করলেন, একটি পয়সাও নিলেন না। অন্তরঙ্গ বন্ধু বিসুকে আড়ালে মৃদু হেসে বললেন, একটু পাবলিসিটি হল। বিসু হিন্দু নয়, মুসলমান। পুরো নাম বিসমিল্লা। মোটর মেকানিক। রাঘব ঘোষালের গাড়িটা ওই সচল রেখেছে। তবে এটা বললেও অন্যায় হবে যে, তিনি সব সময়ে পাবলিসিটির জন্যেই উদারতার ভান করেন। বিলুবাবুর মেয়ের বিয়ের জন্য হাজার টাকা তিনি লুকিয়েই দিয়েছিলেন তাঁকে। বিলুবাবু তাঁর তাস খেলার সঙ্গী, প্রায়ই হেরে যান ঘোষালের কাছে—এইটুকুই তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক। ঘোষালের মধ্যে সত্যিই দিলদরিয়া ভাব আছে একটা। শুধু দিলদরিয়া নয়, বেপরোয়া মরিয়া ভাব। যখন ঠিক করেন কিছু একটা করবেন, একেবারে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েন তার মধ্যে, তা সে ভাল মন্দ যাই হোক। অনেক সময় প্রাণ তুচ্ছ করেও। এইজন্যেই বোধহয় স্ত্রীলোকেরা আকৃষ্ট হতেন তাঁর দিকে। ডাক্তার ঘোষালের গৃহিণী নেই। পরকীয়া নিয়েই সারা জীবন কাটিয়েছেন।

তাঁর জীবনে একাধিক নারী এসেছে। কেউ দু-চার দিন থেকেছে, কেউ দু-চার মাস, কেউ বা দু-চার বছর। ঘোষাল যদিও এখানে নিজেকে উদ্বাস্তু বলে পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু উদ্বাস্তু বলতে ঠিক যা বোঝায়, তিনি তা নন। তিনি দাঙ্গার সময় কিছুদিন পূর্ববঙ্গে ছিলেন অবশ্য, আর দাঙ্গার ঠিক পরেই এ-দেশে চলেও এসেছিলেন তা সত্য, কিন্তু তবু তিনি উদ্বাস্তু নন। কারণ পূর্ববঙ্গে তাঁর কোন বাস্তু নেই। শোনা যায়, তিনি অনেক দেশে ঘুরেছেন। রেঙ্গুনে ছিলেন, মালয়ে ছিলেন, চীনদেশেও নাকি ছিলেন। আসলে তিনি ভবঘুরে লোক। হোটেলে হোটেলে কিংবা বড় জোর বাসা ভাড়া করে কাটিয়েছেন সারা জীবন। কিন্তু হিন্দুস্থানে এসে উদ্বাস্তুদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা তিনি আদায় করেছেন। কোথায় কি পৈরবী করলে কাজ হাঁসিল হবে তা তিনি ভাল করেই জানেন। এখানকার যে অফিসারটি উদ্বাস্তুদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা সেই মিস্টার সেনের সঙ্গে ঘোষালের গলায় গলায় ভাব। সুতরাং উদ্বাস্তুদের প্রাপ্য সমস্ত সুবিধাই তিনি পেয়েছেন। এখানকার উদ্বাস্তু কলোনীর ডাক্তার তিনি। তার জন্যে কিছু ভাতা পান এবং তাই দিয়েই একটি বাসা ভাড়া করে আছেন শহরে। তিনি উদ্বাস্তু কলোনীর ভিতরে থাকতে চান না। কেন চান না, সেটা একটা রহস্য। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, ও কলোনীতে যারা থাকে তাদের সঙ্গে মেলে না আমার। তিনি শহরে যে বাসাটি ভাড়া নিয়েছেন সেটি ডাক্তারবাবুর বাসার কাছেই। ছোট বাসা, একখানি শোবার ঘর। সেইটেই আসবাবপত্রে ঠাসা। দ্বিতীয় ঘরটি বড়, সেটি আড্ডাঘর। এক ধারে একটি গোল টেবিল আর তার চারপাশে চেয়ার, আর এক ধারে দেশী ব্যবস্থা, প্রকাণ্ড একটা তক্তাপোশ পাতা, তার উপর একটা শতরঞ্চি আর গোটাকতক তাকিয়া। এখানেই সাধারণতঃ তাস-পাশা খেলা হয় বাজি ধরে। শোনা যায় শহরের অনেক গণ্যমান্য লোকও নাকি আসেন এখানে। ডাক্তার ঘোষালের নিজের কোনও ডিস্‌পেন্সারি নেই। শহরের একটি ডিস্‌পেন্সারির সঙ্গে তাঁর 'বন্দোবস্ত' আছে। সেই-খানেই তিনি সকাল-বিকাল বসেন। সেইখান থেকেই তাঁর সমস্ত প্রেস্‌ক্রপশন বিক্রি হয়। ডাক্তার ঘোষালের নির্দেশ অনুসারে তাঁর প্রেস্‌ক্রপশনের দাম বাজারদরের চেয়ে কিছু কম নেওয়া হয়। ডাক্তার ঘোষাল এ শহরে এসেই তাঁর প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করেছিলেন। খামখেয়ালী ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়েছিলেন প্রথমেই, কিন্তু তাঁর ধরণ-ধারণ কথাবার্তা শুনে আর দ্বিতীয়বার যাননি। বুঝেছিলেন এঁর পালক অন্যরকম, এঁর সঙ্গে মেশা যাবে না। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গণেশ হালদার থাকেন, এ তিনি জানতেন। গণেশ যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু এ-ও তাঁর অবিদিত ছিল না। কিন্তু তবু তিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেননি। বোধ হয় পূর্ববঙ্গের লোক বলেই করেননি (পূর্ববঙ্গের লোককে পারতপক্ষে তিনি এড়িয়ে চলতে চান), কিংবা শিক্ষক বলেই তাঁকে এড়িয়ে গেছেন। শিক্ষকদের সান্নিধ্য সাধারণতঃ তিনি সহ্য করতে পারেন না। বলেন, ওরা এক অদ্ভুত তিদ্‌ভিদে জাত, নাইদার ফিশ্‌ নর ফ্লেশ (neither fish nor flesh)। সমাজের সম্মানিত এই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে রাঘব ঘোষালের এই ধারণা গণেশ

হালদারের জানা ছিল না, থাকলে তিনি তাঁর সঙ্গে যেচে আলাপ করতে যেতেন না। তিনি প্রথমত মুখ-চোরা লোক, দ্বিতীয়ত, বিলেতে কিছুদিন বাস করার ফলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যে বিলিতি ছাপটা তাঁর মনে বসে গেছে তাতে যখন তখন যার তার সঙ্গে যেচে গিয়ে আলাপ করা শক্ত তাঁর পক্ষে। কেউ পরিচয় করিয়ে না দিলে (ইংরেজীতে যাকে introduce করিয়ে দেওয়া বলে) কারও সঙ্গে আলাপ করতে পারেন না তিনি। স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষককেই এড়িয়ে চলেন। ভাব একমাত্র ভবতোষ গাঙ্গুলীর সঙ্গে। তা-ও খুব মন-খোলা ভাব নয়। পরস্পর দেখা হলে মুচকি হাসেন কেবল। তবু গণেশ হালদার রাঘব ঘোষালের সঙ্গে যেচে আলাপ করতে গেলেন একদিন। যাওয়ার আসল কারণটা তাঁর মনে স্পষ্ট হয়নি সম্ভবত। গেলেন খামখেয়ালী ডাক্তারবাবুকে তাঁর হঠাৎ ভাল লেগে গিয়েছিল বলে। নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল তিনি যখন ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে আলাপ করতে বলেছেন তখন সেটা করা উচিত। তাঁর কথাটা অমান্য করাটা ঠিক হবে না।

হালদার মশায় সন্ধ্যার পর ডাক্তার ঘোষালের কাছে গেলেন। গিয়ে দেখলেন বাইরের ঘরটা খোলা রয়েছে, আর ঘোষাল এক প্যাকেট তাস নিয়ে নিবিষ্টচিত্তে প্রত্যেক তাসের পিছনগুলো পর্যবেক্ষণ করছেন। সন্তর্পণে উঁকি দিলেন হালদার মশায়, তারপর গলা-খাঁকারি দিলেন, তাও খুব আস্তে। ঘোষাল তাসের পিছন দিকে চেয়ে এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি ছোট্ট গলা-খাঁকারিটা শুনতে পেলেন না। আর একটু জোরে কাশলেন হালদার। বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ লাফিয়ে উঠলেন ঘোষাল এবং বলে উঠলেন, 'কাউ'! হালদার মশায়ের মনে হল একটা বাঘ যেন 'হাঁউ' করে উঠল। 'কাউ' ঘোষাল ডাক্তারের অনুচর। ঠিক ভৃত্য নয়, অনুচর। সে চাকরি করে অন্য জায়গায়, কিন্তু থাকে ঘোষাল ডাক্তারের বাড়িতে। ঘোষাল ডাক্তার ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ঘুরেছেন। গৌহাটি, লখিমপুর, শিলং, কাঁথি, সম্বলপুর, পাটনা, দিল্লি অনেক জায়গায় টোপ ফেলে ফেলে বেড়িয়েছেন তিনি। আর সর্বত্রই 'কাউ' তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছে। রেঙ্গুন থেকে এসে প্রথমে তিনি কলকাতায় ছিলেন কিছুদিন। বেশ কিছুদিন, প্রায় এগারো বছর। কিন্তু কলকাতায় তিনি সুবিধা করতে পারেননি। কলকাতাতেই 'কাউ'য়ের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। তখন তার বয়স দশ বছর। কলকাতার এক রেস্তোরাঁয়, কাজ করত। ডাক্তার ঘোষাল থাকতেন একটা একতলা ফ্লাটে। একদিন অনেক রাত্রে তিনি ফিরে এসে দেখলেন বারান্দার এক কোণে একটা ছেলে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে। জিজ্ঞেস করে জানলেন, তার নাম কালু। তার মা নাকি তাকে এখানে বসিয়ে রেখে গেছে। রাত্রে তার মা আর ফিরল না। তার পরদিনও না। ঘোষালই কালুকে খেতে শুতে দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোর মা কোথায় উধাও হল? কি নাম তোর মায়ের? কালু বললে, সবাই তাকে সুখী বলে ডাকত। মা আর ফিরবে না। মা যে বস্তিতে থাকত সে বস্তির লোকেরা মাকে তাড়িয়ে

দিয়েছে। তার মা কোথায় গেছে তা কালু বলতে পারলে না। বললে, কেউ জানে না মা কোথা গেছে। মা বোধ হয় আর আসবে না। আমাকে এইখানে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। ডাক্তার ঘোষাল তখন তাকে বললেন, তা হলে এইখানেই থেকে যা তুই। তবে চাকরিটা ছাড়িস না। সেই থেকে কালু, ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তখন ডাক্তার ঘোষাল যে যুবতী চাকরানীটিকে রেখেছিলেন তার একটি ছোট ছেলে ছিল, আধো-আধো কথা বলত। সে-ই কালুকে 'কাউ' 'কাউ' বলে ডাকত। সেই থেকে তার নামই হয়ে গেল কাউ। তারপর ঘোষাল যখন কলকাতা থেকে গৌহাটি গেলেন, কাউও গেল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। গৌহাটিতেও অন্য জায়গায় একটি কাজ জুটিয়ে নিলে সে, থাকত কিন্তু ঘোষালের বাসায়। এইভাবেই বরাবর চলেছে। ঘোষাল মশায় আপাত-দৃষ্টিতে অবিবাহিত ব্যক্তি। বহুকাল আগে, তাঁর প্রথম যৌবনে, তিনি বিবাহ করেছিলেন। বিবাহ করলেও সংসার পাততে পারেননি, কারণ বিয়ের কিছুদিন পরেই তাঁর স্ত্রী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছিল। এর পর ঘোষাল আর বিবাহের পাকা পথে পা বাড়াননি। গলি-ঘুঁজির স্বল্পালোকিত রাস্তাতেই এর পর থেকে চালিয়েছেন তাঁর দাম্পত্যজীবনের দ্বিচক্রযান। সে যানে কখনও আলো ছিল, কখনও ছিল না। তাতে কখনও ঘণ্টা বাজত, কখনও বাজত না। নিঃশব্দেই পার হয়ে যেতেন তিনি গলি। তাঁর পদ্ধতি—ইংরেজীতে যাকে বলে 'টেকনিক'—এই রকম : যেখানে যেতেন সেইখানেই কমবয়সী একটি ঝি বহাল করতেন· সেই ঝি ক্রমশ উন্নীত হত গৃহিণী পদে। তারপর সে জায়গা যখন ছেড়ে যেতেন তখন খেসারত-স্বরূপ কিছু টাকা দিয়ে দিলেই অতীতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকে যেত। এই টেকনিকটা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বর্মা থেকে। এ-দেশে এসেও ওতে ভালই ফল পাচ্ছিলেন, কিন্তু এখানে এসে প্রথম বাধা পেলেন তিনি! 'ঝুক্' বেঁকে দাঁড়িয়েছে। ঝুকের পুরো নাম ঝিনুক। ডাক্তার ঘোষাল ওটাকে সংক্ষেপ করে নিয়েছেন। এর কাহিনী পরে বলব। তার আগে হালদার মশায়ের সঙ্গে ঘোষাল ডাক্তারের প্রথম সংঘর্ষটা বিবৃত করা যাক। সংঘর্ষ কথাটা ইচ্ছে করেই লিখলাম, কারণ সংঘর্ষই হয়েছিল।

'কাউ' বলে চীৎকার করে উঠেই নির্নিমেষ হয়ে গেলেন ডাক্তার ঘোষাল। ঘাড় একটু নীচু করে চেয়ে রইলেন হালদারের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন।

"কে মশাই আপনি? হু আর ইউ?"

বাংলা বলে সঙ্গে সঙ্গে সেটার ইংরেজী তর্জমা করা ডাক্তার ঘোষালের মুদ্রা-দোষ বা বৈশিষ্ট্য। সব সময়ে না হলেও প্রায়ই এটা করেন।

"আমার নাম গণেশ হালদার। ডাক্তার মুখার্জির বাড়িতে আমি থাকি।"

"বুঝেছি, আই সি। আই হ্যাভ গ্লেস্‌ড ইউ।"

হাসলেন। নীরব হাসি, কিন্তু ভয়ানক। প্রায় কান পর্যন্ত বিস্তৃত হল সে হাসি, বেরিয়ে পড়ল হলদে রঙের বড় বড় দাঁতগুলো। ঘাড় ঈষৎ নিচু করে হাসিমুখেই রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর কথা বললেন।

"বসুন। আপনাকে অন্য নামে চিনতাম। আপনার আসল নামটা আজ প্রথম শুনলাম।"

গণেশ হালদার বসলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করলেন, "আমার তো দ্বিতীয় নাম নেই। কি নাম শুনেছেন আমার?"

ঘোষাল আবার তাঁর সেই হাসি হাসলেন।

"রাগ যদি করেন বলব না। আই শ্যাল কিপ মাম্।"

"না, রাগ করব কেন?"

"এখানে সকলে আপনাকে 'ফোর্থ ডগ্' বলে ডাকে।"

"তার মানে?"

"ডাক্তার মুখার্জির তিনটে আসল কুকুর আছে, লোকে বলে আপনি তাঁর মনুষ্যবেশী চতুর্থ কুকুর।"

হালদারের মনে হল কে যেন তাঁর গালে ঠাস্ করে চড় মারলে একটা। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ব্যাপারও ঘটল, নিজের অজ্ঞাতসারেই। ডাক্তার মুখার্জিকে যেন আরও ভালোবেসে ফেললেন তিনি, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন যেন আরও দৃঢ় হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন গণেশ হালদার। তাঁর মনে হল তিনি যেন জমে গেছেন। হাত-পা নড়ছে না, কথা বেরুচ্ছে না মুখ দিয়ে। কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু জাগ্রত হল তাঁর স্বাভাবিক আত্মসম্মানবোধ, তাঁর গভীর গোপন সত্তা থেকে যেন উৎসারিত হল একটা উষ্ণ প্রস্রবণ, গলে গেল যেন অপমানজনিত হিমশীতলতা। তিনি সুস্থ হলেন; শুধু তাই নয়, তাঁর মনে রসিকতা জাগল।

বললেন, "আপনারা আমাকে এ সম্মান দিয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ। কুকুর-প্রেমিক একজন বিখ্যাত লোক বলে গেছেন—The more I See of men, the more I love my Dog. (মানুষের যত পরিচয় পাচ্ছি আমার কুকুরটাকে তত বেশী ভালো লাগছে)। যে দেশের মানুষেরা অধঃপতিত সে দেশে কুকুর নামে পরিচিত হওয়া সৌভাগ্য মনে করি। স্বাধীনতা পাওয়ার পর মানুষেরা কুকুরের চেয়েও অনেক নীচে নেমে গেছে।"

"আরে মশয়, আপনি দেখছি গুণী লোক। বসুন, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

ডাক্তার ঘোষাল এগিয়ে এসে হালদারের দুই কাঁধে হাত দিয়ে জোর করে তাঁকে বসিয়ে দিলেন একটা চেয়ারে। গণেশ হালদারকে অনুভব করতে হল রাঘব ঘোষাল শক্তিমান ব্যক্তি। তাঁর হাত দুটো যেন বাঘের থাবা।

"কাউ কাউ, জলদি এস। Put in your appearance immediately, please."

কাউ আসতেই বললেন, "পাঠানী হালুয়া আর কফি নিয়ে এস এক পেয়ালা। আমার জন্যে কিছু আনতে হবে না।"

কাউ চলে গেল ভিতরের দিকে।

"কফির চেয়ে উগ্রতর কিছু চলে নাকি আপনার? জানি না হয়তো ভুল করে সিংহকে হুক্কো খেতে দিচ্ছি, I wonder, if I am offering fodder to a lion—স্কচ্ হুইস্কি আছে, যদি অনুমতি করেন—"

"না, ওসব আমার চলে না। আমি নিরামিষ মানুষ—"

"বাই জোভ, তাই নাকি? পাঠানী হালুয়া মুরগীর মাংস আর ডিম দিয়ে তৈরী যে—"

"মাংস ডিম আমি খাই। পাঠানী হালুয়ার নাম কিন্তু আগে শুনিনি।"

"শোনবার কথা নয়। ও জিনিস আমারই সৃষ্টি, অনাসৃষ্টিও বলতে পারেন। More a carricature than a creation—পাঠানকোটে একটা হোটেলে খেয়েছিলাম, ওঃ, সে এক স্বর্গীয় ব্যাপার! কিন্তু বাবুর্চিটা কিছুতেই রান্নার সিক্রেটটা আমাকে বললে না। কিন্তু আমি তো যেটা ধরি ছাড়ি না, নিজেই মাথা খাটিয়ে বানিয়ে ফেললাম। তবে সেটা ওর মতো 'বেহেস্তি' খানা হয়নি। দেখুন, আপনার কেমন লাগে—"

কাউ ফিরে এসে বললে, "ঝিনুক দিদি হালুয়া দিচ্ছে না। বলছে অল্প একটু আছে, সেটা আপনি খাবেন, আপনি তো খান নি।"

লাফিয়ে উঠে পড়লেন ঘোষাল এবং ভিতরের দিকে ছুটে চলে গেলেন।

পরমুহূর্তেই নারীকণ্ঠের এক তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা গেল।

"আমি দেব না, দেব না, কিছুতেই দেব না।"

তারপরই দড়াম করে শব্দ একটা।

"ওগো মাগো—"

করুণ আর্তরবটা হঠাৎ থেমে গেল।

গণেশ হালদার আর বসে থাকতে পারলেন না। উঠে পড়লেন। দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগলেন ভিতরে ঢোকা সমীচীন হবে কি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়াই স্থির করলেন। গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। দেখলেন একটি অপরূপ রূপসী মেয়ে মেঝেতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে, আর ডাক্তার ঘোষাল হাঁটু গেড়ে তার মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছেন।

"এ কী ব্যাপার? কী হল?" গণেশ হালদার বললেন।

ঘোষাল ঘাড় ফিরিয়ে হাসলেন, তারপর নিম্নকণ্ঠে বললেন' "টেবিলের উপর প্লেটে হালুয়াটা আছে, আপনি আগে খেয়ে নিন তো মশাই। এ রাক্ষুসীর জ্ঞান হলে আর আপনাকে খেতে দেবে না। টপ্ করে খেয়ে নিন।"

অবাক্ হয়ে গেলেন গণেশ হালদার।

"এ অবস্থায় কি খাওয়া যায় মশাই! কি যে বলছেন—"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন ঘোষাল।

"আপনাকে খেতেই হবে। ইউ মাস্ট্। মাই ওয়ার্ড ইজ্ ল ইন্ মাই হাউসহোল্ড। আমার বাড়িতে আমি ডিক্টেটর—"

গণেশ হালদারের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে তাকে বসিয়ে দিলেন একটা চেয়ারে। তারপর হালুয়ার প্লেটটা ঠেলে দিয়ে বললেন, "খান।"

"কি যে করছেন আপনি!"

"ঠিকই করছি।"

তারপর তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "খেয়ে নিন। না খেলে স্নুকের কাছে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না খান—"

নিজেই খানিকটা হালুয়া তুলে গুঁজে দিলেন হালদার মশায়ের মুখে।

"চিবুন। চিউ। বাঃ, দ্যাট্‌স্ গুড।"

হালুয়াটা মুখে ঢুকতেই খুব ভালো লেগে গেল হালদারের। তিনি যন্ত্রচালিতবৎ চিবুতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর বিবেকও দংশন করতে লাগল খুব।

"আপনিও খান একটু।"

"বেশ, আপনার অনুরোধ ঠেলব না। চলুন প্লেটটা নিয়ে বাইরে যাই। কাউ, বাইরে কফি নিয়ে এস।"

"কিন্তু এ ভদ্রমহিলাকে এরকমভাবে ফেলে রেখে—"

"স্নুককে ভদ্রমহিলা বলে অপমান করবেন না। ডোণ্ট ইন্‌সাল্ট্‌ হার প্লীজ, শী ইজ এ ফিমেল রাইনো। ওই ছিপছিপে সুন্দর চেহারার তলায় একটি গণ্ডার লুকোনো আছে। ওর সঙ্গে প্রায়ই আমার মার-পিট হয়। আমার সঙ্গে পারে না। অজ্ঞান হয়ে পড়লেই একটা কোরামিন্‌ ইনজেক্‌শন দিয়ে দি। আজও দিয়ে দিয়েছি। ওর জ্ঞান হবার আগে হালুয়াটা শেষ করে ফেলুন। এখনই ও উঠে বসবে।"

কাউ লোকটি নীরব। এত যে কাণ্ড হল সে একটি কথা বলে নি, একটু বিচলিত হয় নি। নীরবে এসে কফির খালি পেয়ালা আর খালি প্লেট নিয়ে গেল। তারপর বেরিয়ে এসে বললে, "আজ আমার রাতে ডিউটি পড়েছে। এখন চললুম।"

"খেয়েছিস কিছু?"

"দোকানে খেয়ে নেব।"

"পয়সা নিয়ে যা। সস্তা হোটেলে খেয়ে যেন শরীর নষ্ট ক'রো না।"

পকেট থেকে দশ টাকার নোট বার করে দিলেন। গণেশ হালদার উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলেন। এরকম লোক তিনি আগে কখনও দেখেননি। এরকম লোক যে থাকতে পারে তা-ও তাঁর কল্পনায় ছিল না। তাঁর মনে হচ্ছিল ডিকেন্স বা স্টিভেন্‌সনের নভেলের কোনও আজগুবি চরিত্র বুঝি হঠাৎ মূর্ত হয়েছে এসে। মনে মনে খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন, বাইরে সহজ হবার চেষ্টা করলেন তবু।

"এ লোকটি বুঝি অন্য জায়গায় চাকুরি করে? আমি ভেবেছিলাম আপনারই চাকর।"

"না, ও আমার চাকর নয়, আমার ছেলে। হি ইজ্‌ মাই সন। তবে ও সেটা জানে না। বহুকাল আগে ওর মা ওকে আমার কলকাতার বাসার বারান্দায়

বসিয়ে দিয়ে পালিয়েছে। ভেগেছে বোধ হয় কারও সঙ্গে হারামজাদী। মহা বজ্জাত ছিল।"

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, ঘাড় ফিরিয়ে দেওয়ালের দিকে চেয়ে নিষ্পলক হয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, "কাউ খুব ভালো ছেলে, ওয়াণ্ডারফুল বয়। কিন্তু ও যদি জানতে পারে আমি ওর বাবা, তা হলে আর ওয়াণ্ডারফুল থাকবে না। বাই দি বাই, কথাটা আপনাকে বললাম। দেখবেন কাউ যেন না জানতে পারে।"

গণেশ হালদার হেসে বললেন, "কথাটা তা হ'লে আমাকে না বললেই পারতেন। আমি অবশ্য কাউকে বলব না। কিন্তু এ কথা আমাকে জানিয়ে লাভ কি—"

"আপনাকে আপনার করে নেওয়া। অন্তরের গোপন কথা বললেই ফট্ করে তার সঙ্গে আত্মীয়তা হয়ে যায়। এ এক আজব তামাশা। তবে আসল কথাটা কি জানেন?"

"কি?"

"আমি কিছু চেপে রাখতে পারি না। আরও অনেককে বলেছি কথাটা। কাউ সম্ভবত শোনেনি কখনও। ওর চাল-চলনে অন্তত সেটা প্রকাশ পাচ্ছে না।"

"যদি প্রকাশ পায় তখন কি করবেন?"

"দূর করে দেব। আই শ্যাল সিম্প্লি টার্ন হিম আউট।"

নির্বিকারভাবে কথাগুলি বলে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তিনি। গণেশ হালদারের মুখের দিকে, তারপর অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে পলক ফেলে শিস্ দিলেন একটু। তারপর আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে বললেন, "মায়া-টায়া কিছু নেই। কঠিন প্রস্তর দিয়ে গড়া এ হৃদয়। আমার আপন লোক, আই মীন ব্লাড্ রিলেশনস্, কেউ নেই। বন্ধুরাই আমার আপন। আমিও তাদের জন্যে জান দি, তারাও আমার জন্যে জান দেয়। আপনি কি রেফিউজি?"

"হ্যাঁ। শুনেছি আপনিও তাই।"

"হ্যাঁ, খাতায়পত্রে তাই বটে। কিন্তু আসলে আমি হোমলেস্ ভ্যাগাবণ্ড। আফ্রিকাতেও গিয়েছিলাম। কিন্তু থাকতে পারলুম না। পূর্ববঙ্গে আমি দাঙ্গার সময় ছিলাম। তারপর এখানে পালিয়ে এসেছি, আর মিস্টার সেনের দৌলতে যতটা টাকা টানা সম্ভব তা টেনে নিয়ে গ্যাঁট্ হয়ে বসে আছি।"

তারপর নিষ্পলক দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে বললেন, "আপনার তাই করা উচিত। ওই পাগল ডাক্তারটার পিছু-পিছু ঘুরে মরছেন কেন? ওর দ্বারা কিছু হবে না। ও খালি কাব্যি করে। আপনি আমার দলে ভিড়ে যান। তাস খেলতে জানেন? তাস মানে অবশ্য জুয়া। ওর অনেক গুণ। যদি ইচ্ছে করেন আসতে পারেন আমার আড্ডায়। নানারকম পংখী আসে এখানে। মিস্টার সেন, যিনি উদ্বাস্তুদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তিনিও আসেন। তাঁর নেক-নজরে যদি পড়ে যেতে পারেন, বাজি মাত করতে পারবেন। গভর্নমেণ্ট অজস্র টাকা ধার দিচ্ছে। ইজি ইনস্টলমেণ্ট। জমি কিনুন। স্বনামে কিনুন, বেনামে কিনুন। বাড়ি করুন। যতটা পারেন আদায় করে নিন ওদের

কাছ থেকে। ওরা আমাদের পথে বসিয়ে নিজেরা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে, আমরাও যতটা পারি কেড়ে-বিগড়ে নিয়ে নি আসুন। উচিত নয়? শুড্ উই নট্?

চোখ দুটো বিস্ফারিত করে ঈষৎ-ব্যায়ত আননে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রাঘব ঘোষাল।

গণেশ হালদার মৃদু হেসে কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, "আমি তো তাস খেলতে জানি না—"

"শিখুন। শুধু তাস খেলা শিখলেই হয় না। তাস খেলে কি করে টাকা রোজগার করতে হয় তা-ও শিখতে হবে। ইউ জাস্ট জয়েন মাই গ্যাং—আমার দলে চলে আসুন—আমি আপনাকে ওস্তাদ বানিয়ে ছেড়ে দেব। এটা ভুলবেন না, আমরা উদ্বাস্তু, দয়াটয়া কেউ করবে না, আমাদের লড়তে হবে। লড়বার প্রধান অস্ত্র টাকা—তর্জনীর উপর বুড়ো-আঙুলের টোকা দিয়ে টাকা বাজাবার মুদ্রাটা দেখিয়ে দিলেন—"ছাট উই মাস্ট্ আর্ন, সেটা রোজগার করতে হবে সৎ অসৎ যে-কোন উপায়ে হোক। মরালিটির ছুঁচিবাই নিয়ে যদি ধানাই-পানাই করেন, 'মৃত্যুরেব ন সংশয়'। ভিড়ে যান আমার দলে—"

গণেশ হালদার কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু পারলেন না।

সেই সুন্দরী মেয়েটি (যে মূর্ছা গিয়েছিল) পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে ঝনাৎ করে চাবির একটা গোছা ফেলে দিল টেবিলের উপর।

"আমি চললাম।"

বলেই বেরিয়ে গেল সে।

তার প্রস্থান-পথের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে রাঘব ঘোষাল বললেন, "হারামজাদী—"

বলা বাহুল্য, গণেশ হালদারও কম বিস্মিত হননি। কিন্তু এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে স্বভাবতই তিনি ইতস্তত করছিলেন।

রাঘব ঘোষাল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "মনটা উস্‌খুস্ করছে, না? বয়লিং?"

গণেশ স্মিত হেসে তখন সসঙ্কোচে জানতে চাইলেন, মেয়েটি কে। রাঘব হাসিমুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, "ও হচ্ছে আমার রাখনি, শুদ্ধ ভাষায় রক্ষিতা, কাব্যের ভাষায় প্রেয়সী। রাম র‍্যাজলা এবং হাড়-হারামজাদা। এরকম স্যাম্পল্ আমি আর জীবনে পাইনি।"

বাইরে একটা গাড়ি আসার শব্দ হল এবং পরমুহূর্তেই "ঘোষাল আমরা এসে গেছি" বলে এক বেঁটে ফরসা ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন, তাঁর পিছু পিছু আরও দু'জন।

"আসুন আমি রেডি হয়ে বসে আছি।" তারপর গণেশের দিকে চেয়ে বললেন, "এইবার আমরা মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হব। অর্থাৎ তাস খেলব। আপনি কি বসবেন?

"না।"

"তা হলে আলাপ করিয়ে দি আসুন। ইনি মিস্টার সেন—আমাদের ভাগ্য-বিধাতা, ইনি দরবেশ পাণ্ডা—এখানকার স্টেশন-পতি, আর ইনি সুবেদার খাঁ—ইঞ্জিন-চালক। আর ইনি হচ্ছেন, কি নাম মশাই আপনার ?"

"গণেশ হালদার।"

গণেশ, দি গ্রেট সিদ্ধিদাতা। কিন্তু এঁর আসল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় ইনি উদ্বাস্তু। গণেশ ইজ হোমলেস্।

মিস্টার সেন এবং দরবেশ পাণ্ডা মুচকি হাসলেন। কিন্তু হো হো করে উঠলেন সুবেদার খাঁ "আমি মুসলমান, উদ্বাস্তু দেখলেই একটু অস্বস্তি বোধ করি। মনে হয়, আমার জাত-ভাইরা এঁদের দুর্দশার কারণ। বিহারে অনেক মুসলমানও মারা গেছে, অনেকে উদ্বাস্তু হয়েছে। তাদের দেখলে আপনাদেরও মনের অবস্থা বোধ হয় এইরকমই হয়। কিন্তু আমি সান্ত্বনা পেয়েছি স্পেনের বুল-ফাইটের গল্প শুনে। ষাঁড়ে আর মানুষে লড়াই হয় সেখানে। দুর্বল মানুষেরাই সাধারণতঃ মরে। অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে মরে। এর জন্যে ষাঁড়েরা দায়ী নয়, যারা দায়ী তারা সমাজে সভ্য বলে পরিচিত এবং সম্মানিত। এই কথাটা মনে রাখলে হালদার মহাশয়ের আমার উপর রাগ থাকবে না। আদাব—"

এই বলে তিনি হাতটা বাড়িয়ে উদ্ভাসিত মুখে করমর্দন করলেন গণেশ হালদারের।

"এখনই চলে যাচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ। পরে আবার দেখা হবে।

নমস্কারাদি বিনিময় করে চলে এলেন হালদার মশায়।

॥ ৩ ॥

ডাক্তার মুখার্জির পুরো নাম স্থঠাম মুখোপাধ্যায়। একটু অদ্ভুত গোছের নাম। তাঁকে এ নামে এখানে কেউ কোনদিন ডাকেনি। তাঁর বিহারী এবং মারোয়াড়ী রোগীদের কাছে তিনি সুটোম ডাক্তার নামে পরিচিত। কেউ কেউ পাগলা ডাক্তারও বলে। বাঙালীরা তাঁকে ডাক্তার মুখার্জি বলেই ডাকেন। নিজের লোকেরা কেউ থাকলে হয়তো তাঁকে স্বনামে ডাকতে পারতেন, কিন্তু, তাঁর তিন কুলে কেউ ছিল না। বিবাহ করেছেন মাত্র কিছুদিন আগে, দেশ স্বাধীন হবার পর। শ্বশুরকুলের পরিচয়ও কেউ জানে না। বস্তুত তাঁর সম্বন্ধে কোনও কথাই কেউ জানে না। তিনি নিজের কথা কাউকে বলেন নি, নিজের কথা বলতে তিনি ভালবাসেন না। তাই তাঁর সম্বন্ধে সত্য খবর জানা নেই কারও। সেইজন্য নানারকম গুজব প্রচলিত আছে। সবাই বলে তিনি বিলেত-ফেরত ডাক্তার। এখানকার এক সাহেব সিভিল সার্জন নাকি একবার প্রকাশ করেছিলেন যে, ডক্টর মুখার্জি বিলেতে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ধাত্রীবিদ্যায় এবং

প্যাথলজিতে তিনি পারঙ্গম। অথচ তাঁর ছাপানো প্যাডে শুধু লেখা আছে ডক্টর এস মুখার্জি। কোনও ডিগ্রীর ল্যাজ নেই। এ-ও শোনা যায়, তাঁর ব্যাংক ব্যালান্স নাকি কয়েক লক্ষ টাকা। এ খবরটা সম্ভবত মিথ্যা নয়, কারণ ব্যাংকেরই এক কর্মচারী কথাটা প্রচার করেছেন। এত টাকা তিনি কোথা থেকে পেলেন তা নিয়েও লোকে মাথা ঘামাতে কসুর করেনি। এ বিষয়ে সর্ববাদিসম্মত যে মতটি জনসাধারণ মেনে নিয়েছে সেটি এই: কলকাতায় তাঁর যে পৈতৃক সম্পত্তি ছিল (খান কয়েক বাড়ি এবং প্রায় পনর বিঘা জমি) সেইটে দাঁও মাফিক বিক্রি করেই তিনি নাকি লক্ষপতি হয়েছেন। তাঁর বাবা ব্যারিস্টার ছিলেন। তাঁরও ব্যাংক ব্যালান্স নিন্দনীয় ছিল না। এই শহরে তাঁর পিতৃবন্ধু হরিশঙ্করবাবু থাকতেন। তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলেন ডাক্তার মুখার্জি। যে বাড়ীতে ডাক্তার মুখার্জি এখন থাকেন সেটা হরিশঙ্করবাবুরই বাড়ি। হরিশঙ্করবাবু দারপরিগ্রহ করেন নি। তিনি এই শহরে ওকালতি করতে এসেছিলেন। বেশ ভালো পসার ছিল তাঁর। তিনি এই বাড়িতে সারা জীবন ঝি চাকর নিয়ে কাটিয়ে গেছেন। ডাক্তার মুখার্জি যখন এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন (তাঁর বুড়ো চাকর রঘুবীরের রিপোর্ট এটা) তিনি নাকি বলেছিলেন, 'এই বাড়িটা আমার মৃত্যুর পর কে ভোগ করবে তা নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা হয়েছে আমার · আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী ভাইপো থাকে বম্বেতে। তার সেখানে সিনেমার কারবার। সে এখানে এসে বাস করবে না। সে এ বাড়ি বিক্রি করে দেবে। যে সবচেয়ে বেশী দাম দিতে রাজী হবে সে-ই নেবে বাড়িটা। কাবুলী, মারোয়াড়ী, মুচি' মুদ্দফরাস যে কেউ ক্রেতা হতে পারে, কিন্তু আমার ইচ্ছে এ বাড়িতে ব্রাহ্মণ বাস করুক। এটা আমার কুসংস্কার বলতে পার, কিন্তু এইটেই আমার ইচ্ছে।' এ কথা শুনে ডাক্তার মুখার্জি নাকি বলেছিলেন, 'আপনি যদি অনুমতি করেন এবং আমার সাধ্যে যদি কুলোয় বাড়িটা এখনই আমি কিনে নিতে পারি। কথা দিচ্ছি আপনার মৃত্যুর পর আমি এসে বাস করব এখানে। আপনার আগে যদি আমার মৃত্যু হয়, বাড়িটা রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে দেবেন, কারণ আমার উত্তরাধিকারী কেউ নেই।' হরিশঙ্করবাবু নাকি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আর আমি কি তোমার বাড়িতে অমনি থাকব?' সুঠামবাবু উত্তর দিয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ—'নিশ্চয়, আপনি আমার বাবার বন্ধু, পিতৃতুল্য, আমার বাড়িতে আপনার থাকবার ষোলআনা অধিকার আছে।' সেই সময় হরিশঙ্করবাবু জলের দামে বাড়িটা বিক্রি করে দেন সুঠাম ডাক্তারকে। বাড়ি বিক্রি করবার পর তিনি বছর দুই বেঁচে ছিলেন। তারপর একদিন হঠাৎ মারা যান। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে এক ইঞ্জিনিয়ার এসে বাড়িটার মেরামত করে, রং ফেরায়। তারও প্রায় বছরখানেক পরে সুঠামবাবু এসে এ বাড়িতে বসবাস আরম্ভ করেন। যেদিন তিনি প্রথম এলেন, একাই এলেন, তখনও তিনি বিয়ে করেন নি। শোনা যায়, তিনি নাকি দেশ-ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন। বহু স্থান বেড়িয়ে তারপর এখানে এসে প্র্যাকটিস শুরু করেন। তিনি এসে যখন বাজার থেকে কুলি এনে বাড়িঘর পরিষ্কার করাচ্ছিলেন তখন

দেখলেন গেটের সামনে একটি বলিষ্ঠাকৃতি কালো-কোলো আধবয়সী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পিছনে দু-তিনটি ছোট ছেলে-মেয়ে আর একটি লম্বা গোছের ছোকরা। সুঠামবাবু গেটের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কে, কি চায়। সেই লম্বা ছোকরাটি বললে, 'এ হচ্ছে রঘুবীরের বউ আর আমি হচ্ছি রঘুবীরের শালা। আর এ দুটি হচ্ছে রঘুবীরের নাতি আর নাতনী, এদের মা নেই। আর এইটি হচ্ছে আমার ছেলে।' পরিষ্কার বাংলায় বললে কথাগুলি। বিহারীর মুখে এরকম বাংলা শুনবেন প্রত্যাশা করেন নি ডাক্তার মুখার্জি। রঘুবীরের স্ত্রীও বাংলা ভাষাতেই কথা বলল। তবে তার ভাষা যদিও বাংলা কিন্তু উচ্চারণে বিহারী টান আছে। সে বলল, 'হর্‌রিবাবুর কাছে হামরা ছিলাম। হামি পাকাতাম। হর্‌রিবাবু মরে গেল, হামাদের আশা-ভরোসা চলে গেল।' সুঠামবাবু তৎক্ষণাৎ বললেন, 'আমারও তো লোক দরকার। তোমরা ইচ্ছে কর তো আমার কাছেও থাকতে পার হরিবাবুর কাছে যেমন ছিলে।' সেইদিন থেকেই দাই, তার নাতি-নাতনী (বিজয় আর শালিয়া) এবং ভাই রংলাল ডাক্তার মুখার্জির পরিবারভুক্ত হয়ে গেল। রংলালই দিনকতক পরে দুর্গাকে জুটিয়ে আনলে। বহাল হয়েই দাই প্রশ্ন করেছিল, 'মাইজি কোথায়, কবে আসবে?' ডাক্তার মুখার্জি একটু দ্ব্যর্থবোধক উত্তর দিয়েছিলেন, 'মাইজি এখনও আসেন নি। এইবার আসবেন।' তখনও তিনি যে বিবাহ করেন নি এ কথা স্পষ্ট করে জানান নি দাইকে। প্রথম প্রথম তিনি ব্যস্ত ছিলেন। নিজের ল্যাবরেটরি নিয়ে। এসেই তাঁর খুব নাম হয়ে গেল, কারণ তিনি ল্যাবরেটরির সাহায্য না নিয়ে কোনও রোগী দেখতেন না। এসেই তিনি যে ক'টা রোগী দেখেছিলেন, সবগুলোই ভালো হয়ে গিয়েছিল। হৈ হৈ নাম হয়ে গেল তাঁর। তিনি কিন্তু হৈ হৈ করে সাড়া দিলেন না। তাঁর নিজস্ব গয়ংগচ্ছ চালে চলতে লাগলেন। দশটায়, কখনও কখনও এগারটার আগে ল্যাবরেটরিতে যেতেন না। মেরে-কেটে ঘণ্টা দুই থাকতেন সেখানে। তারপর বেরিয়ে পড়তেন মোটর নিয়ে। জেলের ডাক্তার প্রিয়বাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে পেলেন জাম্বুবানকে। ক্রমশ ভুটানও এসে জুটল এবং সবশেষে রকেট। ল্যাবরেটরির জন্য ভেড়া, গিনিপিগ আর খরগোশও তাঁকে কিনতে হয়েছিল। মুরগী আর গরু তখন তিনি কেনেন নি, কিনেছিলেন স্ত্রী আসার পর। তারপরই গোয়াল আর মুরগী রাখবার ঘর তিনি তৈরি করান। তিনি তাঁর স্ত্রীকে হঠাৎ একদিন নিয়ে এলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। তাঁর আসার কথা কাউকে বলেন নি, এমন কি দাইকেও না। তিনি দাইকে বলে গিয়েছিলেন কলকাতায় ওষুধ কিনতে যাচ্ছেন। ফিরবার সময় ওষুধের সঙ্গে স্ত্রীকেও নিয়ে এলেন। দাই চমকে গিয়েছিল বউয়ের রূপ দেখে। এমন রূপসী সে আগে কখনও দেখে নি। ডাক্তারবাবু কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন সে বিষয়ে। দাই অবাক হয়ে যেত। বোসবাবু যখন নতুন বিয়ে করে এনেছিলেন তখন কত কাণ্ড। বাজনা বেজেছিল, ভোজ হয়েছিল, আত্মীয়-স্বজন এসেছিল কত। কিন্তু ডাক্তারবাবু বউ নিয়ে এলেন, কিছুই হল না, সব 'শূনশান্‌' (ফাঁকা)। বাইরের

লোকেও এই পাগলা ডাক্তারের মতি-গতি বুঝতে পারেনি, ঘরের লোকেও পারেনি। তবে একটা জিনিস দেখে দাইয়ের খুব ভালো লেগেছিল। ডাক্তারবাবু মাইজিকেই শুধু গয়না-কাপড়ে মুড়ে দেন নি, তাদেরও দিয়েছিলেন। তাকে, তার নাতনীকে কিনে দিয়েছিলেন রূপোর গয়না, দামী জামা-কাপড়ও। খেলো সস্তা জিনিস কেনা পছন্দই করেন না ডাক্তারবাবু। অন্য বাড়িতে এমন জামা-কাপড় দাই-চাকরকে কেউ দেয় না। আর একটা জিনিসও তিনি করেছিলেন মাইজিকে আনবার সঙ্গে সঙ্গে। মঙ্গলা গাইকে ঘরে এনেছিলেন। তখনও মঙ্গলা গাই হয়নি, বকনা ছিল। একটা কসাইয়ের হাত থেকে চতুর্গুণ দাম দিয়ে নাকি কিনেছিলেন তাকে। মঙ্গলা যখন ঘরে আসে তখন তাকে তেল সিঁদুর জল দিয়ে বরণ করেছিলেন ডাক্তারবাবুর স্ত্রী, তাকে ভিতরের উঠোনে নিয়ে এসে। বাইরে তিনি বড একটা বেরুতে চান না। সেইদিন বাড়িতে শাঁকও এসেছিল। মঙ্গলার মাথায় তেল সিঁদুর আর খুরে জল দিয়ে শাঁক বাজিয়েছিলেন ডাক্তারবাবুর স্ত্রী। দাই আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করেছে। মাইজির যদিও জাতবিচার নেই, মুরগী-টুরগী সবই খান, কিন্তু ঠাকুরদেবতায় তাঁর খুব ভক্তি। একটা ঘরে নানারকম ঠাকুরদেবতার পট টাঙিয়ে, লক্ষ্মীর আসন বসিয়ে সেটাকে চমৎকার ঠাকুর-ঘরে রূপান্তরিত করেছেন তিনি। সেইখানেই অধিকাংশ সময় হাতজোড করে চোখ বুঁজে থাকেন। ধূপ-ধুনো আর ফুলের গন্ধ আমোদিত করে রাখে ঘরখানাকে।

এখানে আসবার কিছুদিন পরেই ডাক্তারবাবু এখানকার স্কুলে দশ হাজার টাকা দান করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে কিছু সম্মান লাভ করেছিলেন। স্কুলের ভালো লাইব্রেরী ছিল না, লাইব্রেরী করবার জন্যেই তিনি টাকাটা দিয়েছিলেন। মাসে দশ টাকা করে চাঁদাও বরাবর দিচ্ছেন। তাঁকে স্কুল কমিটির মেম্বার এবং প্রেসিডেন্ট করবার প্রস্তাব করেছিলেন স্কুলের কর্তৃপক্ষ। কিন্তু রাজী হন নি তিনি। বলেছিলেন, আমি নেপথ্যেই থাকতে চাই। মাসে মাসে নিয়মিত স্কুল কমিটির মিটিং-এ আমি যেতে পারব না। আমার সময় নেই, ওসব ব্যাপারে সামর্থ্যও নেই তেমন। তবে মাঝে মাঝে যদি কোনও সাহায্যের দরকার হয় বলবেন, তখন যতটা পারি করে দেব। স্কুলের ইংরেজী পডাবার মাস্টারের যখন দরকার হল, তখন স্কুলের কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিলেন। তারপর স্কুলের সেক্রেটারি তুলসীবাবু একদিন একগোছা দরখাস্ত এনে ডাক্তারবাবুকে বললেন, কাকে বহাল করা উচিত এ নিয়ে আমাদের মধ্যে মত-ভেদ হয়েছে, মিস্টার সেন তাঁর একজন আত্মীয়কে ঢোকাবার চেষ্টা করছেন। আমাদের তাতে আপত্তি আছে। শেষে কাল মিটিং-এ ঠিক হয়েছে আপনি যাকে বেছে দেবেন, তাকেই আমরা বহাল করব। ডাক্তারবাবুও এ গোলমেলে ব্যাপারে মাথা গলাতে চান নি। কিন্তু সকলের আগ্রহাতিশয্যে শেষকালে তাঁকে রাজী হতে হল। ডাক্তারবাবু কিন্তু নিজে নির্বাচন করেন নি। নির্বাচন করতে দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে। খুব বিদুষী না হলেও তাঁর স্ত্রী মোটামুটি বাংলা ইংরেজি জানতেন। তিনিই নির্বাচন করেছিলেন গণেশ

হালদারকে। এ কথা অবশ্য স্কুলের কর্তৃপক্ষ বা গণেশ হালদার কেউ জানতে পারেন নি। গণেশ হালদার অবশ্য যোগ্যতম প্রার্থীই ছিলেন। মফস্বলের স্কুলে যে একজন অক্‌স্‌ফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট আসবেন এবং এসে টিকে থাকবেন এ আশা স্কুলের কর্তৃপক্ষেরা করেন নি, তাই তাঁরা গণেশ হালদারকে বহাল করতে ইতস্তত করেছিলেন প্রথমে। কিন্তু ডাক্তারবাবু যখন তাঁকে মনোনীত করলেন তখন আর কেউ আপত্তি করেন নি। ডাক্তারবাবু বললেন, ইংরেজী পড়াবার জন্য এই লোকই ভাল হবে। মাইনেটা অবশ্য কম। আচ্ছা, আসুন তো ওঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা না-হয় আমার ওখানেই হবে। আমার আউট হাউসটা তো খালিই পড়ে থাকে।

এসব খবর গণেশ হালদার কিছুই জানতেন না। প্রথম প্রথম তাই তিনি একটু সঙ্কোচ অনুভব করেছিলেন। কিন্তু খামখেয়ালী ডাক্তারবাবুকে ভাল লেগে যাবার পর এ ভাবটা আর থাকে নি, বিশেষ করে তাঁর স্বরচিত খামখেয়ালী রচনাগুলি পরিষ্কার করে লেখার সুযোগ পেয়ে তিনি আরও যেন ভালবেসে ফেলেছিলেন এই লোকটিকে। গণেশ হালদার ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র। শুধু তাই নয়, তিনি সাহিত্যরসিকও। তাই তিনি স্থঠাম ডাক্তারের দুষ্পাঠ্য লেখার পাঠোদ্ধার করে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এ লোকটি কেবল ডাক্তার নন, কবিও। পেপিস-এর (Pepys) লেখা ডায়েরি এখন যেমন ইংরেজী সাহিত্যের আসরে সমাদৃত হয়েছে, ওঁর লেখাও হয়তো তেমনি একদিন হবে। অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লেখা, কিন্তু ওর উপর শাশ্বতের আলো পড়েছে।

সেদিন সকালে গণেশ হালদার ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়েছিলেন একটা কথার পাঠোদ্ধার করবার জন্যে। একটি রোগীর জরুরি দরকারে সেদিন ডাক্তারবাবুকে একটু সকাল সকালই ডিস্‌পেন্সারিতে যেতে হয়েছিল। লোকটি বাইরে থেকে এসেছিল, রক্ত-পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে ট্রেন ধরবে। সেদিন রবিবার গণেশ হালদারেরও ছুটি ছিল। তিনি এগারোটা নাগাদ ডিস্‌পেন্সারিতে যখন গেলেন তখন ডাক্তারবাবু রিপোর্ট লিখছিলেন। গণেশবাবুকে দেখে বিস্মিত হলেন।

"কি খবর ?"

"একটা কথা পড়তে পারছি না।"

"ও। আচ্ছা, বসুন।"

তারপর চোখে-মুখে হাস্য বিকীর্ণ করে বললেন—"আমিও পারব কি না সন্দেহ।" গণেশ হালদার বসলেন। তারপরই ঢুকলেন একটি অপরিচিত লোক। রোগা-রোগা লম্বা চেহারা, মুখখানা ধূর্ত শৃগালের মতো। ডাক্তারবাবুকে সেলাম করে সে বললে, "বসন্তলালের রিপোর্টটা নিতে এসেছি।"

"বসন্তলাল কই ?"

"সে আসতে পারল না। আমাকেই রিপোর্টটা নেবার জন্য পাঠাল। এই চিঠি দিয়েছে।"

ডাক্তারবাবু চিঠিটা পড়ে রেখে দিলেন একধারে। তারপর রিপোর্টটা শেষ করে দিলেন তার হাতে। সে লোকটা ফি দিয়ে বলল, "একটা টাকা কম আছে।"

"কম কেন? বসন্তলাল তো গরীব নয়। তার অনুরোধে তাকে চার টাকা ছেড়েও দিয়েছি। আবার কমাচ্ছে কেন? আর কমাব না।"

"একটা টাকা ছেড়ে দিন।"

"আর এক পয়সাও ছাডব না।"

"ছেড়ে দিন একটা টাকা। আমি হিলসাপুরে প্র্যাক্‌টিস করি। আপনাকে অনেক রোগী পাঠাব।"

বোমার মতো ফেটে পড়লেন ডাক্তারবাবু।

"আমি রোগী চাই না। আপনি বাকি টাকাটা দিয়ে তবে রিপোর্ট নিয়ে যান।"

লোকটার চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

"ছাড়বেন না একটা টাকা?"

"না। বসন্তলাল আমাকে বারো টাকা দেবে বলে গেছে।"

"আমি চেয়ে নিচ্ছি একটা টাকা।"

"তোমাকে চিনি না, তোমাকে দেব কেন? তোমার চেয়ে গরীব লোকের অভাব নেই, দিতে হলে তাদের দেব।"

লোকটা গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বিড়বিড় করে কি যেন বললে। তারপর টাকাটা বের করে দিয়ে রিপোর্টটা নিয়ে চলে গেল।

সে চলে গেলে ডাক্তারবাবু গণেশ হালদারের দিকে মুচকি হেসে বললেন, "আমাকে চামার মনে হচ্ছে না? কিন্তু এ লোকটা দালাল। ডাক্তারের টাউট, দু'একটা কেস এনে দিয়ে মনে করে মাথা কিনে নিলুম। ওদের আমি কখনও প্রশ্রয় দিই না। ওই টাকাটা ও নিজেই গাপ করত। কই দেখি কোনখানটা পডতে পাচ্ছেন না?"

গণেশ হালদার দেখালেন।

ডাক্তারবাবুও অনেকক্ষণ ধরে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে রইলেন লেখাটার উপর। তারপর হাসিমুখে চোখ তুলে বললেন, "আপনার কি মনে হচ্ছে কথাটা?

গণেশ সসঙ্কোচে বললেন, "যা পড়তে পারছি তার থেকে তো কোন মানে হচ্ছে না। ল, জ, ভু ও কনিথবং, কোনও ডাক্তারি কথা নাকি?

"না, সংস্কৃত কথা।—গজভুক্তকপিত্থবৎ। আমার নিজেরই পড়তে একটু সময় লেগে গেল। মোটর যখন চলছিল তখনই লিখেছিলাম। কলমের কালি ফুরিয়ে যেতে পেন্সিল দিয়েই লিখেছি ওখানটা। আমার 'গ'-গুলো প্রায়ই 'ল'য়ের মত হয়ে যায়, আর 'প'-গুলো দন্ত্য 'ন'য়ের মতো। আবার 'ল'য়ে আর তালব্য 'শ'য়ে অনেক সময় কোনও তফাত থাকে না।"

বলেই তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

গণেশ হালদার বললেন, "এখানটাও এবার পরিষ্কার হল তা হলে। 'অহঙ্কারের লজ' আমি বুঝতে পারছিলাম না। ওটা হবে 'অহঙ্কারের গজ'। এইবার ঠিক হয়েছে।—"

আর একটি লোক এসে প্রবেশ করল। দীন-দরিদ্র চেহারা, মাথার চুল উস্কখুস্ক, জামা কাপড় তালি দেওয়া। বললে, "আমার উরুতে, আর হাতের অনেক জায়গায় অসাড় হয়ে গেছে। সাদাও হয়ে গেছে অনেক জায়গায় জায়গায়। ঠাণ্ডার আর গরমের তফাতও বুঝতে পারি না।"

ডাক্তারবাবু তাকে পরীক্ষা করে বললেন, "মনে হচ্ছে কুষ্ঠ হয়েছে। রক্তটক্ত পরীক্ষা করতে ষোল টাকা খরচ হবে।"

সে তখন একটি চিঠি বার করে ডাক্তারবাবুর হাতে দিলে। চিঠিটা পড়ে তিনি বললেন, "ও, তাই না কি ? আচ্ছা, তোমাকে কিছু দিতে হবে না। কাল দশটার পর এসো।"

ডাক্তারবাবু উঠে পড়লেন। গণেশ হালদারও উঠলেন।

"চলুন, বাড়ি যাওয়া যাক। এখুনি খেয়েই আমাকে বেরুতে হবে।"

খেয়েই বেরিয়ে এলেন।

"বেচু, রেসকোর্সে যাব।"

"চলুন।"

বেচু ডাক্তারবাবুর ড্রাইভার। এ-দেশের লোক নয়। কলকাতা থেকে এনেছিলেন। সে-ও বাড়ির পরিজনদের মধ্যে। তবে সে বাড়িতে খায় না। সে মাইনে ছাড়া নগদ দু' টাকা করে খোরাকি পায়। তাই নিয়ে পথেঘাটে যখন যেখানে যেমন সুবিধা পায় খেয়ে নেয়। তাতেই ও খুশী। বেচুর প্রধান গুণ নির্বাক। ডাক্তারবাবু বাক্যবাগীশ চাকর পছন্দ করেন না। ডাক্তারবাবু সাধারণতঃ লোকালয়ের বাইরে যান। মাঠে, গঙ্গার তীরে, জঙ্গলে যেখানে যখন খুশি। জায়গাটা জনবিরল হলেই হল। বেচু তাঁকে সেই জায়গায় নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা একটু দূরে নিয়ে চলে যায়। যতক্ষণ ডাক্তারবাবু না ফেরেন ততক্ষণ সে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বসে থাকে ধৈর্যভরে। সব সময় ঘুমোয় না। অনেক সময় পড়ে। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। বেচু ম্যাট্রিক পাস, ইংরেজী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়বার মত বিদ্যে তার আছে। সে দিনকতক কলকাতায় ট্যাক্সি চালিয়েছিল। এক ট্যাক্সিতেই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তার আলাপ হয়। তারপর ডাক্তারবাবুকে চিঠি লিখেছিল সে একটা। ডাক্তারবাবুর প্রয়োজন আর মাইনের বহর শুনে সে ট্যাক্সির চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে। সুখেই আছে।

ডাক্তারবাবু গিয়ে নামলেন পীরবাবার সমাধিটার কাছে। অনেককাল আগেকার

সমাধি, কতকালের কেউ তা জানে না। হিন্দু মুসলমান সকলেরই ভক্তি আকর্ষণ করেছে পীরবাবা। সমাধিটিকে ছায়া করে আছে দুটি গাছ। অদ্ভুত গাছ দুটি। চিরশ্যাম। ভাল করে দেখলে তবে বোঝা যায় দুটি গাছ দু' জাতের, কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে তারা যেন সহোদর। একটি গাছ ভগ্ন-কাণ্ড. কুব্জদেহ, বিধ্বস্ত। শোনা যায় একবার নাকি বাজ পড়েছিল তার উপরে। কিন্তু পীরবাবার সেবক বলে তার মৃত্যু হয় নি। বস্তুত, গাছটি তার খণ্ডিত ন্যুব্জ দেহ নিয়ে কি করে যে বেঁচে আছে তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার। ডাক্তারবাবু যখনই এখানে আসেন তখনই গাছ দুটোকে বারবার পরিক্রমণ করেন। তাঁদের সঙ্গে কথাও কন। সেদিন এসে বললেন, "কি ভায়ারা, কেমন আছ ? না, ঠিকই আছ দেখছি, দমে যাও নি। কিন্তু যা যুগ পড়েছে, তোমাদের আদর্শ সব বানচাল হয়ে গেল। এখন মুখোশেরই আস্ফালন। তোমরা কেউ হিন্দুও নও, মুসলমানও নও, অথচ সেবা করে চলেছ এক মুসলমান পীরের। যাই হোক্, বেড়ে আছ তোমরা। আমিও যদি তোমাদের দলে ভিড়তে পারতুম! কিন্তু তা অত সহজ নয়।"

গাছের পাতায় পাতায় হাত দিয়ে আদর করলেন তাদের। তারপর চেয়ে রইলেন পাশের সর্ষে ক্ষেতটার দিকে। রেলের লাইন চলে গেছে মাঠের ধার দিয়ে। দুটো লাইন। ছোট লাইন, বড় লাইন। তারপরই ছোট একটি সর্ষে ক্ষেত। সেটির দিকে ডাক্তারবাবু এমনভাবে চেয়ে রইলেন যেন কোন আত্মীয়কে দেখছেন। বড় ভালো লাগে তার জায়গাটি। চলে গেলেন ক্ষেতের মধ্যে। ক্ষেতের মাঝখানেই একটি ছোট অশ্বত্থ গাছ। সেও ডাক্তারবাবুর বন্ধু। গিয়ে তাকেও একবার পরিক্রমণ করলেন। কচি কচি পাতাগুলো থেকে আলো যেন পিছলে পড়ছে। তারপর একটা বসবার জায়গা খুঁজতে লাগলেন। একটা পাথর ছিল। তার উপরই গিয়ে বসলেন। প্রথমে কিন্তু তেমন জুত হল না। তাঁকে লিখতে হবে, চাই একটা ঠেস দেওয়ার মতো জায়গা। তিনি ইচ্ছা করলেই ভালো করে বসবার এবং লেখবার সাজসরঞ্জাম আনতে পারেন, বেচু একটা ভালো জায়গা দেখে তাঁর বসবার এবং লেখবার বন্দোবস্তও করে দিতে পারে, কিন্তু এ ব্যবস্থা স্থঠাম মুখুজ্যের মনোমত নয়। তিনি যখন প্রকৃতির কোলে এসে বসতে চান, এক জামা কাপড় ছাড়া মানবসভ্যতার অন্য কোন আড়ম্বর তিনি সঙ্গে আনতে চান না। তাঁর মনে হয় ওগুলো যেন প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগের বাধা। ওসব আনলে প্রকৃতির ঠিক কোলটিতে বসা যাবে না। এতদিন তিনি কোনও অসুবিধা ভোগ করেন নি, কিন্তু যেদিন থেকে গণেশ হালদারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, প্রতিদিন তাঁর জন্যে কিছু লিখবেন সেদিন থেকে একটু অসুবিধা বোধ করছেন। সর্ষে ক্ষেতের মাঝে তিনি টেবিল চেয়ার আনতে রাজী নন। অথচ লিখতেই হবে। প্রতিশ্রুতিভঙ্গ তিনি করতে পারবেন না। হঠাৎ চোখে পড়ল রেলের ওপারে একটা কাটা গাছের গুঁড়ি রয়েছে। তাতে ঠেস দিয়ে বসলে লেখার খুব অসুবিধা হবে না। সেইখানেই গেলেন। গিয়েই দেখতে পেলেন কয়েকটা ঘেঁটু-গাছও রয়েছে সেখানে,

আর আশে-পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। 'বাঃ!' বলে বসে পড়লেন তিনি সেইখানেই চাপটালি খেয়ে। তাঁর পায়জামা খুব ঢিলা-ঢালা, সেজন্য বসবার কোনও অসুবিধা হল না। পকেট থেকে বার করলেন কয়েক টুকরো কাগজ—ওষুধের বিজ্ঞাপন। উত্তোলিত জানুর উপর সেগুলো রেখে ভাবতে লাগলেন কি লিখবেন। বিজ্ঞাপনের ভালো ভালো কাগজে অনেক সাদা জায়গা থাকে। সেই সব ফাঁকগুলোই ভরিয়ে ফেলবেন ঠিক করলেন। লেখার বিষয় আগে থাকতে ভেবে আসেন না। ওখানে বসে যা মনে হয় লেখেন। খানিকটা লেখা নিয়ে কথা। এদিক ওদিক চেয়ে ভাবতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ ঘেঁটুগাছগুলোর দিকে চেয়ে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। আর একটু এগিয়ে গেলেন সেদিকে এবং অনেকক্ষণ ঝুঁকে কি যেন দেখলেন। তারপর ফিরে এসে লিখতে শুরু করলেন।

"এতক্ষণ ধরে যা দেখলুম, তা আগেও দেখেছি, পরেও দেখব। কিন্তু এখন যে কথাটা মনে উদ্ভাসিত হল তা হয়তো আর কখনও মনে হবে না। তাই লিখে রাখাই ভালো। হালদার মশায়ও হয়তো এর থেকে চিন্তার খোরাক পাবেন কিছু। ব্যাপারটা কিছু নয়, একটা মাকড়সার জাল। ভোরে বেড়াতে এসে আগে এরকম জাল অনেক দেখেছি। জালের উপর শিশিরবিন্দু পড়ে অপরূপ দেখায় তখন ওগুলো। মনে হয় মণি-মাণিক্য-খচিত ওড়নার টুকরো পথে-ঘাটে ফেলে গেছে বোধ হয় রাতের পরীরা। কিন্তু এখন, দুপুরে, দেখছি ওটা সত্যিই জাল। দুপুরে রোদে শুধু ওর একটা নয় দুটো রূপ খুলেছে। স্বচ্ছ সুতো দিয়ে তৈরী গোল চাকার উপর মোটা সাদা সুতোর তৈরী কারুকার্যও এখন দেখা যাচ্ছে। বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত সোজা চলে এসেছে এই মোটা সুতোর কাজ তির্যক রেখায়। একটি চমৎকার সুতোর চাকা, যার শুদ্ধ বাংলা চক্র। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে শুধু চক্র নয়, চক্রান্তও। সকাল বেলায় শিশিরের পরিমণ্ডলে যে জীবটিকে দেখতে পাওয়া যায় না, আমি অন্তত আগে দেখি নি, এখন রৌদ্রকিরণে তাঁর তিনটি রূপ দেখলাম। তিনি জাল সৃষ্টি করেছেন তাই তিনি ব্রহ্মা, তিনি ছোট ছোট পোকাকে ধ্বংস করছেন তাই তিনি মহেশ্বর এবং ওই পোকাগুলি খেয়ে নিজেকে তিনি পালন করছেন, সুতরাং তাঁকে পালনকর্তা বিষ্ণু বললেও অন্যায় হবে না। হঠাৎ মনে হল সকলের মধ্যেই এই ত্রয়ী বিরাজ করছেন। তা হলে আমরা কি সকলেই ভগবান। একটু তফাৎ অবশ্য আছে। একটু নয়, মস্ত তফাত। এই সব ক্ষুদে ভগবান ত্রয়ী হয়েছেন স্বার্থের প্রেরণায়। বৃহৎ ভগবানের প্রেরণা আনন্দ। একটু আগে জালে নিপাতিত ছোট পোকাটাকে যখন ছটফট করতে দেখলাম, আর তার সঙ্গেই যখন দেখলাম জালাধিপতি মাকড়সাটার বিপুল আনন্দ—তখন হঠাৎ, কেন জানি না, পোকাটার দুঃখে মনটা গল-গল হয়েছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনের আর একটা অংশ প্রথম অংশটার গালে এক চড় মেরে বললে, ওরে বেকুব, গল-গল হবার কি আছে এতে? প্রকৃতির ওই নিয়ম, ওরা নিয়ম পালন করে চলেছে;

ওরা ল-অ্যাবাইডিং, সুতরাং সাত-খুন-মাপ। তা ছাড়া আর একটা ব্যাপারও আছে, নিয়মভঙ্গ করবার ক্ষমতাই ওদের নেই। কোটি কোটি খুন-জখম হচ্ছে প্রকৃতির লীলা-নিকেতনে এ নিয়ে খবরের কাগজে লেখালেখি হয় না। তবু এটা সত্য।

এই পর্যন্ত লিখে ডাক্তারবাবু হঠাৎ দেখতে পেলেন দুটো বুলবুলি পাখি উড়ে এসে সামনের একটা নাম-না-জানা গাছের সরু ডালে বসে ডাকছে—কুষ্ট প্রিয়। দেখে ডাক্তারবাবু সন্তর্পণে একটি ঠোঙা বার করলেন পকেট থেকে। তাতে পাঁউরুটির গুঁড়ো, লজেন্সের গুঁড়ো, বুট ভাজা, বাদাম ভাজা, নানারকম ডাল, ধান একসঙ্গে মেশানো আছে। তিনি তার থেকে একমুঠো বার করে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলেন বুলবুলি দুটোর দিকে। একটু এগিয়েই ছুঁড়ে ছড়িয়ে দিলেন গুঁড়োগুলো। তাঁর ইচ্ছে বুলবুলিরা ওগুলো খাক। বুলবুলিরা কিন্তু খেল না, উড়ে গেল। বিমর্ষ হয়ে বসে রইলেম সুঠাম মুখুজ্যে। খানিকক্ষণ বসে থেকে পকেট থেকে একটা হুইস্‌ল্‌ বার করে বাজালেন সেটা। এটা বেচুকে গাড়ি আনবার সঙ্কেত। একটু পরেই দেখা গেল, বেচু গাড়ি আনছে। গাড়ি আসতেই চড়ে বসলেন তাতে।

"চল গঙ্গার ধারে কোথাও। যে দিকটায় ইঁটের ভাটাগুলো আছে, সেই দিকে চলো।"

গণেশ হালদার যে আউট-হাউসটাতে থাকেন তার সঙ্গে ছোট্ট একটা দরজা দিয়ে বাইরের রাস্তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে। বাইরের দিকে ছোট একটা ঘরও আছে। সেইটেতেই একটা ছোট টেবিল আর চেয়ার পেতে গণেশ হালদার নিজের পড়াশোনার ঘর করেছেন। খুব ভোরে ওঠেন তিনি। উঠেই ছোট একটা স্টোভ জেলে চায়ের জল চড়িয়ে দেন তাতে। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে স্বহস্তে প্রস্তুত এক কাপ চা খেয়ে তিনি খানিকক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকেন ধ্যানাসনে। ঠোঁটগুলো নড়তে থাকে। মনে হয় কোনও স্তোত্র পাঠ করছেন। একটু পরেই তাঁর ঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে ওঠে। ঠিক পাঁচটার সময় হালদার মশায় টেবিলে এসে বসেন। শীতকালে আলো জ্বালতে হয়, গ্রীষ্মকালে সামনের ছোট জানালাটি খুলে দিলেই আলো আসে। প্রথমেই হালদার মশায় স্কুলের ছেলেদের খাতাগুলি সংশোধন করেন। তিনি এখানে এসে 'হোম টাস্ক' (home task) ব্যাপারটা পুনঃপ্রবর্তন করেছেন। খাতাগুলো দেখে সময় থাকলে তিনি নিজের ডায়েরি লেখেন। সম্প্রতি ডাক্তারবাবুর লেখাগুলো পরিষ্কার করে টোকাও তাঁর আর একটা কাজ হয়েছে। প্রথমে তিনি নিজের ডায়েরিই লেখেন। তারপর ডাক্তারবাবুর লেখাটার পাঠোদ্ধার করেন। তবে এটা অনেক সময় রাতে খাওয়ার পরও করেন।

সেদিন তিনি ডায়েরিতে লিখছিলেন :—"এক দেশ থেকে উন্মূলিত হয়ে দলে দলে মানুষ অন্য দেশে গেছে, ইতিহাসে একথা নূতন নয়। কিন্তু আমাদের বেলায় একটু নতুন ধরনের ব্যাপার হয়েছে। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে গভর্নমেণ্টের তদারকে এক্সচেঞ্জ অব পপুলেশন হল, পাকিস্তানের হিন্দুরা তাদের বিষয়সম্পত্তির মূল্যও পেল, কিন্তু বাংলা দেশের ক্ষেত্রে সেটা হল না। বাংলা দেশের উদ্বাস্তরা জলে-স্থলে অনলে-অনিলে ছড়িয়ে পড়ল অসহায় গরু-ভেড়ার মতো। কেন? এ কেন'র উত্তর কর্তৃপক্ষেরা দিয়েছেন কি না আমার জানা নেই। আর একটা কথাও মনে হচ্ছে। এই ব্যাপারটার সঙ্গে আমি নিজে জড়িত তাই আমার কষ্ট হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমাদের মর্মের উপর দিয়ে এই যে তপ্ত লোহার রোলার চালানো হল এর কি কোনও প্রতিকার নেই? কিন্তু ইতিহাস পডতে পড়তে এ-সব কথা মনে হয় নি, এত কষ্ট পাইনি। কোটি কোটি মানুষ নিহত হয়েছে মানুষেরই হাতে, এই তো মানুষের ইতিহাস। আমি যখন ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম, তখন চেঙ্গিস খাঁ বা তৈমুরলঙ্গের রক্তাক্ত কাহিনী পড়ে কি শিউরে উঠতুম? ইজিপ্টের ফারাও যখন 'জু'-দের ইজিপ্ট থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তা পড়ে কি মনে কোনও শিহরণ জেগেছিল আমার? ওল্ড্ টেস্টামেণ্টের এ সব কাহিনী তো উপন্যাসের মতো পড়েছি। আমাদের নিয়ে কি কোন ওল্ড্ টেস্টামেণ্ট রচিত হবে? আমাদের মধ্যে কি মোজেস্ আছে কেউ? কে জানে! ইতিহাসের স্তরে স্তরে কিন্তু জমা হচ্ছে অনেক জিনিস। এই ইহুদীদের উপর কি কম অত্যাচার হয়েছে? হয়ে শেষ হয়ে যায়নি, যুগে যুগে হচ্ছে। কিন্তু কি বিচিত্র ঐশ্বর্যপূর্ণ ওদের জাতীয় ইতিহাস! মানব সভ্যতার এমন কোন বিভাগ আছে কি, যা ওদের দানে সমৃদ্ধ নয়? সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্প, নৃত্যকলা, খেলাধূলা এমন কি সার্কাসে পর্যন্ত ওদেরই কৃতিত্ব। অথচ হিটলার ওদের উপর কি পাশবিক অত্যাচারই না করেছিল! আজ হিটলার কোথায়? কিন্তু জর্মন-সভ্যতার অঙ্গে অঙ্গে আজ ওদের দেওয়া মণি-মাণিক্য ঝলমল করছে। তা কি কেউ কখনও মুছে দিতে পারবে? পারবে না। কিন্তু কথায় কথায় আমি প্রসঙ্গান্তরে চলে এসেছি। যে কথাটা আমি এখনি ভাবছিলাম তা হচ্ছে ইহুদী নরনারীর উপর নাৎসী জার্মানীর যখন অকথ্য অত্যাচার চলছিল, তখন আমি কি মুষড়ে পড়েছিলাম? হিরোশিমায় জাপানীদের উপর যখন মার্কিনী অ্যাটম্‌বোমা পড়ল সে খবর পড়ে কি আমার রাত্রির নিদ্রা বিঘ্নিত হয়েছিল? লজ্জার সহিত স্বীকার করতে হচ্ছে, হয়নি। সে খবর শোনার পরও আমি ঘুমিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়। আমার চোখের সামনে একবার একটা ছেলে মোটর চাপা পড়েছিল, তার রক্তাক্ত দেহটা আমি দেখেছিলাম। তাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। তার ঘাড় লটকে পড়েছিল, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল, ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল তার গালটা তার কপালটা। কিন্তু এসব প্রত্যক্ষ করেও আমি তেমন বিচলিত হইনি। তারপর বাড়ি গিয়ে স্নান করেছিলাম, খেয়েছিলাম, একটি ফুটবল ম্যাচও দেখেছিলাম এবং তার দু দিন পরে সব ভুলেও গিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ তার কথা মনে পড়ছে। আর একটা জিনিসও

লক্ষ্য করেছিলাম তখন। মোটর চাপা পড়তেই খুব ভিড় হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে, রাস্তার কয়েকটা গুণ্ডাগোছের ছোকরা ড্রাইভারটাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নৃশংসভাবে মারধোর করেছিল, পুলিশ এসেছিল. কিন্তু যে-ই এটা নিঃসংশয়ে জানা গেল যে ওই ছেলেটি কারও আত্মীয় নয়, তখনই ভিড় কমে গেল. আস্তে আস্তে সরে পড়ল সবাই। এখন মনে হচ্ছে ছেলেটির কি মা বাবা ছিল? ভাই বোন ছিল? কোথায় ছিল তারা তখন? তাদের বুক-ফাটা আর্ত হাহাকার শুনতে পাইনি বলে মনে হচ্ছে সেই দুর্ঘটনার মধ্যে যেন একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল, যা হওয়া উচিত ছিল যেন হয়নি। একরকম ঘটনা পৃথিবীতে অহরহ ঘটছে. কিন্তু এ কথা কি আমাদের অহরহ মনে থাকে যে অত্যন্ত নিকট আত্মীয় ছাড়া কেউ হাহাকার করে না? অনাত্মীয়ের বিয়োগে কেউ আন্তরিক শোকপ্রকাশ করে না এইটেই নিয়ম। তবু আমি আশা করছি কেন যে, আমাদের শোকে ভারতবর্ষ-সুদ্ধ লোক হাহাকার করবে? করা তো নিয়ম নয়। কিন্তু তবু আশা করছি, কামনা করছি, দাবি করছি, আন্দোলন করছি ওরা আমাদের নিতান্ত আপন লোক, আমাদের ক্ষতিপূরণ করুক। ওরা করছেও, তবু আমরা সন্তুষ্ট হচ্ছি না। হচ্ছি না, করণ মনে করেছিলাম ওরা আমাদের আত্মীয়, ওরা আমাদের নিতান্ত আপন লোক, আমাদের দুঃখের সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে. কিন্তু এখন আবিষ্কার করেছি ওরা আমাদের অনাত্মীয়, ওরা পর, ওরা যা করছে তা বাইরের শোভনতা বজায় রাখবার জন্য করছে, অভিনয় করছে (আমাদের নেতাদের মধ্যে যে অনেক উঁচুদরের অভিনেতা আছেন তাতে সন্দেহ কি) সত্যিকার দরদ ওদের মধ্যে নেই, থাকতে পারে না, থাকা নিয়ম নয়। আসলে ওরা মনে মনে জানে আমরা সব অবাঞ্ছিত জঞ্জাল, কিন্তু বাইরে ভান করছে অন্যরকম। সাপ ছুঁচোকে ধরেছে, গিলতেও পারছে না, ফেলতেও পারছে না। এ রকম ধরনের নানা কথা মনে হয়। আবার এ-ও মনে হয়, আমার এ সব ধারণা হয়তো ভুল। হয়তো ওরা · কিন্তু আমার এই মনে হওয়াটাকে আবৃত করে ফেলে একটা নিদারুণ ছবি। শিয়ালদহ স্টেশনের উদ্বাস্তুদের ছবি। বুলিকে আর মাকে খোঁজবার জন্যে অনেকদিন সেখানে ঘুরেছি। যে সব মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখেছি তা ভোলবার নয়। মনুষ্যত্বের এত বড় লাঞ্ছনা, এত বড় অপমান যারা নির্বিকার হয়ে সহ্য করছে তাদের আপন লোক বলে ভাবি কি করে? একদল অসহায় নরনারী. শিশু, পীড়িত, জলে ভিজছে. রোদে পুড়ছে, শীতে কাঁপছে. উঞ্ছবৃত্তি করছে সুসভ্য কলকাতা শহরের বুকে। লোকে যেমন সার্কাসের জন্তু-জানোয়ার দেখতে যায়, তেমনি তাদের দেখে দেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদল দর্শক। মুখে সহানুভূতি প্রকাশ করছে, কিন্তু কেউ ক্ষেপে উঠছে না, কেউ জোর গলায় বলছে না, আমরা এ অত্যাচার সহ্য করব না—যতক্ষণ না এর প্রতিকার হচ্ছে ততক্ষণ আমরা কলকাতাবাসীরা অন্নজল ত্যাগ করব, আমরাও ওদের সঙ্গে মরব। দেখেছি, উপহাসও করছে অনেকে! এরা কি সভ্য? এরা কি আপনার লোক? প্রথম বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় রাখী বন্ধন উৎসব হয়েছিল শুনেছি, সেই ইংরেজ রাজত্বের আমলেও অচেনা লোকের হাতে রাখী বেঁধে দিয়ে একান্ত আত্মীয়তার

দাবি জানিয়েছিল বাঙালী। কবি গান গেয়েছিলেন, 'বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন, এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান'। এ সব কি স্বপ্ন? ভাঙা বাংলা জোড়া লেগে আবার ভেঙে গেল। বিদেশী রাজনৈতিকের চালে হেরে গেল আমাদের শিক্ষিত প্রতিভাবান আদর্শবাদী নেতারা? অস্বীকার করবার উপায় নেই, হেরেই গেছে। ডিভাইড অ্যাণ্ড রুলের শাণিত খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে আমাদের আদর্শ, আমাদের স্বপ্ন, আমাদের আশা-ভরসা। আমরা পথের ভিখারী হয়ে গেলাম, আর সেই ভিখারীর ভিড়ে হারিয়ে গেল আমার মা আর বুলি···একই কথা রোজ নানাভাবে লিখি, একই রহস্যের সমাধানের চেষ্টা করি নানা পথ দিয়ে, কিন্তু সমাধান করতে পারি না কিছু। মনে হয় সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। যা সরল ছিল, তা কুটিল থেকে কুটিলতর হচ্ছে প্রত্যহ। একদিন যাকে ভালো মনে করেছিলাম, সুন্দর মনে করেছিলাম, তার বীভৎস কুৎসিত রূপ আজ দেখতে পেয়েছি। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে, অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তলিয়ে যেতে যেতেও ভাবছি তল একটা মিলবে। এ আশার, এ ভাবনার শেষ নেই। মস্তিষ্ক এখনও দেউলিয়া হয়ে যায় নি, এখনও তাই আশা করছি আমাদের এই গাঢ় তমিস্রাকে ছিন্নভিন্ন করে উদিত হবে সুস্থ-বুদ্ধির প্রদীপ্ত সূর্য। এখনও আশা করছি। কিন্তু খুব বেশী হতাশ হবার কারণ আছে কি? আমরা চেয়ে থাকি রাজনৈতিক নেতাদের দিকে, দেশের লোকের দিকে তাকাই কি? এ-দেশে কি সবাই খারাপ? তা তো নয়। যে ডাক্তারবাবুর আশ্রয়ে আছি, তিনি তো খারাপ লোক নন। তিনি পূর্ববঙ্গের বাঙাল, না, পশ্চিমবঙ্গের 'ঘটি' তা জানি না, তা জানবার প্রয়োজনও হয় না। তিনি রাজনীতির ধার ধারেন না, খবরের কাগজ একটা আসে বটে, কিন্তু সেটা তিনি পড়েন কি না সন্দেহ, কোন 'ইজ্‌ম্'-এরও দাস নন। তিনি মানুষ, মনে হয় কোন দেশেই তাঁকে বেমানান মনে হবে না। তাঁর বিশাল সহৃদয়তা, তাঁর প্রবল প্রাণপ্রাচুর্য, তাঁর সহজ জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁকে সর্বত্রই সুশোভন করবে। কোথাও তিনি বেসুরো হবেন না। তাঁর যে বৈশিষ্ট্য আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে তা তাঁর নিত্য নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি রোজই যেন নূতন করে আত্ম-আবিষ্কার করছেন, নূতন করে প্রকাশ করছেন নিজেকে। তিনি কবে যে কোথায় যাবেন, কি করবেন, কি ভাববেন, কি লিখবেন তা আগে থাকতে নিজেও জানেন না বোধ হয়। কিন্তু যখনই যেখানে যান পরিবেশের সঙ্গে মিশে যান একেবারে। তাঁর লেখার বিষয়ও অদ্ভুত। আকাশের মতো তাঁর মন। কখন কোন্ রূপে সে যে সাজবে তা সে নিজেও জানে না। ”

গণেশ হালদার এই পর্যন্ত লিখেছিলেন, এমন সময় বাধা পড়ল। টোকা পড়ল বাইরের দরজায়। বিস্মিত হলেন একটু। এ সময়ে তাঁর কাছে কেউ তো আসে না। কপাটে খিল বন্ধ ছিল, উঠে গিয়ে খুলে দিলেন। দেখলেন, দাঁড়িয়ে আছে এক অর্ধ-অবগুণ্ঠিতা নারী। তার পর চিনতে পারলেন। ডাক্তার ঘোষালের ঝুক। সে কিছু

বলল না, নমস্কার করে একটা খামের চিঠি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। বিস্মিত হালদার মশাই দেখলেন চিঠির উপর তাঁরই নাম লেখা, গোটা গোটা মুক্তোর মতো অক্ষরে। চিঠিটা পড়ে আরও বিস্মিত হলেন।

সবিনয় নিবেদন,

সেদিন ডাক্তার ঘোষাল আপনাকে আমার সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা সর্বৈব মিথ্যা। আপনি যদি সে কথা বিশ্বাস করেন বড়ই দুঃখিত হব। আপনি যেদিন এ-শহরে এসেছেন, তার আগে থেকেই আপনার নাম শুনেছিলাম। আপনাকে এখানে স্কুলে চাকরি দেওয়া নিয়ে নানারকম আলোচনা হ'ত আমাদের বাসায়। ডাক্তার ঘোষালের কাছে যে মিস্টার সেন আসেন তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে, আপনি এখানে আসেন। ডাক্তার স্ঠাম মুখার্জির জোরে আপনি এখানে এসেছেন। আগে মিস্টার সেন আপনাদের স্কুল কমিটিতে ছিলেন, আপনাকে নেওয়া হল বলে সেখান থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছেন। আপনাকে নিয়ে ডাক্তার ঘোষালের বাড়িতে প্রচুর আলোচনা হ'ত। তাই আপনার কথা আমি জানতাম। তার পর আপনি যখন এলেন তখন কনকের মুখে আপনার অজস্র প্রশংসা শুনলাম। কনক আমার ভাই-পো, আপনার ছাত্র। তার চোখে আপনি দেবতা। স্কুলের সব ছাত্রই আপনাকে ভক্তি করে। সেদিন আপনি যখন ডাক্তার ঘোষালের বাড়িতে এসেছিলেন, তখন আমি জানতাম না যে, আপনি এসেছেন। আপনি যে ও-বাড়িতে আসতে পারেন এ আমি ভাবতেই পারিনি। সেদিনকার ঘটনার জন্য আমি লজ্জিত। আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার মতো লোক যে আমার সম্বন্ধে হীন ধারণা পোষণ করে থাকবেন, এ আমি সহ্য করতে পারব না, তাই এই চিঠি লিখলাম। যদি বিরক্ত হয়ে থাকেন, ক্ষমা চাইছি। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি— ঝিনুক

চিঠিটা পড়ে ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন গণেশ হালদার। রূপ মানুষকে অভিভূত করে। অভিভূত হয়েই বসে রইলেন খানিকক্ষণ। এ রকম রূপ আগে কখনও দেখেন নি তিনি। বুলবুলিও দেখতে সুন্দর ছিল, তার সৌন্দর্যের মধ্যেও একটা শিকারীভাব ছিল যার জন্যে তিনি তার নাম দিয়েছিলেন মাছরাঙা, কিন্তু ঝিনুকের সৌন্দর্য আরও তীক্ষ্ণ, ও যেন আসল ইস্পাতের একখানা ঝকঝকে তলোয়ার, আর সেই তলোয়ারের উপর প্রতিফলিত হয়েছে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। গণেশ হালদার কৌতূহলী হলেন। এ মেয়ে ঘোষালের পাল্লায় পড়ল কি করে? সেদিন তো চাবির গোছা ফেলে দিয়ে চলে এসেছিল, আবার কি ফিরে গেছে? পর পর এই ধরনের চিন্তার ঢেউ তাঁর মনে এসে লাগতে লাগল খানিকক্ষণ। তারপর যে কথাটা বিদ্যুৎ-চমকের মত অভিভূত করে ফেলল তাঁকে তা ঝিনুকের চিঠির একটি লাইনেই ছিল—'ডাক্তার মুখার্জির জোরে আপনি এখানে এসেছেন।' ডাক্তার মুখার্জির জোরে? তিনি তো স্কুল কমিটিতে নেই। তাঁর টাকাতেই যে স্কুলের লাইব্রেরিটি হয়েছে, এ খবরও তিনি জানতেন না।

লাইব্রেরিতে ডাক্তার মুখার্জি নিজের নাম দিতে দেন নি। স্কুল কমিটির একটা অধিবেশনে এই দানের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছিল কেবল। কিন্তু এ-সব খবর হালদার জানতেন না। ডাক্তার মুখার্জিও তো তাঁকে কিছু বলেন নি। অন্য লোক হলে আস্ফালন করত, নানা ছুতোয় প্রকাশ করত আমিই তোমার চাকরিটা করে দিয়েছি। কিন্তু উনি ঘুণাক্ষরেও এ প্রসঙ্গ তোলেন নি একদিনও। উনি এত অন্যমনস্ক থাকেন যে, সে কথা হয়তো ওঁর মনেও নেই। হঠাৎ গণেশ হালদারের ইচ্ছা হল ডাক্তার মুখার্জিকে একটা প্রণাম করে আসেন। কিন্তু তা সম্ভব নয়। উনি এখন তাঁর কুকুর-মুরগী-বাগান-আকাশ নিয়ে এমন একটা নিশ্ছিদ্র পরিবেশে বসে আছেন যে, তার মধ্যে ঢোকা শক্ত, ঢোকা উচিতও নয়, কারণ হালদার মশায়ের ধারনা, এ সময়ে কেউ গেলে তিনি বিরক্ত হন। তাই তিনি তাঁর সেই খাতাটা বার করলেন যাতে তিনি তাঁর লেখা টোকেন। ওই লেখার মধ্যেই তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করেছেন, ওইগুলো পডলেই তাঁকে যেন ঠিক চেনা যায়, এই তাঁর ধারণা। তাঁর ইচ্ছে খাতাটার একটা নামকরণ করেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনও পছন্দসই নাম তাঁর মাথায় আসে নি। মাত্র তিনটি লেখাই তিনি দিয়েছেন এ পর্যন্ত, তিনটি লেখা তিন রকম। সেইগুলোই আবার পড়তে লাগলেন তিনি। সেই পড়ার ভিতর দিয়েই যেন তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করতে লাগলেন। লেখাগুলো তিনি সাজিয়েছেন, 'অ', 'আ' প্রভৃতি বর্ণমালা দিয়ে। তিনি ভেবে রেখেছেন শেষ পর্যন্ত বইটার নাম 'বর্ণমালা'ই দেবেন। নানা রঙের খেলা আছে লেখাগুলোর মধ্যে। তা ছাড়া আর একটা মানেও হয়। ওঁর রহস্যময় চরিত্রগ্রন্থ এই সব বর্ণমালাতেই বিধৃত হয়ে আছে। পডতে লাগলেন।

মানুষ বিদ্যায় বুদ্ধিতে অনেক বড হয়েছে, সে মাটির নীচে শহর বসাবার কল্পনা করেছে, আকাশে উঠে চাঁদের সঙ্গে মিতালি জমাবার চেষ্টায় আছে, তার এ ক্ষমতাও নাকি হয়েছে যে, সে নিজের ঘরে বসে সুইচ টিপে আর একটা দেশ ধ্বংস করে দিতে পারে। সবই হয়েছে, কিন্তু বিনয়ের বড়ই অভাব। আমাদের এখানকার পণ্ডিতজীর অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি সংস্কৃতে সপ্ত-তীর্থ তো বটেনই, ইংরেজী, বাংলা এমন কি উর্দুতেও তাঁর প্রচুর জ্ঞান। কিন্তু বাইরে তার কোনও প্রকাশ নেই। মুখে সর্বদাই স্নিগ্ধ মধুর হাসি। তাঁর সঙ্গে কথা কইলে মনে হয় গঙ্গায় অবগাহন করলাম। সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই বিনয়ী। কেন জানি না, ইংরেজী-নবীসরা একটু যেন উদ্ধত। তাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ একটু যেন বেশী কঠোর। তারা আঙুরের মত নয়, বেলের মত। বেলটিকে কিন্তু অহঙ্কারের গজ গ্রাস করেছেন। এ শিক্ষার বাইরের চেহারাটা হয়তো বজায় থাকবে কিছুকাল, কিন্তু সেটা থাকবে গজভুক্তকপিত্থবৎ। অন্তঃসারশূন্য। এই কথা লিখলাম একটি লাল সুতোর জন্য। সেদিন মাঠে একপাল শালিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করেছিলাম। ওরা সমাজবাসী মানুষের সঙ্গে অনেকটা পরিচিত। ভাবছিলাম, হয়তো আমল দেবে, কিন্তু দিলে না। দেখলাম, ওদের

সঙ্গে আলাপ করাও সহজ নয়। শুনেছি দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে পাখিদের সঙ্গে ভাব করেছিলেন, কিন্তু আমি পারলাম না। দেখলাম, একটু কাছাকাছি এলেই ওরা 'পিড়িং' করে উড়ে পালাচ্ছে সদলবলে। তবু কিন্তু আমি হাল ছাড়ি নি, ওদের পিছু-পিছু সন্তর্পণে যাচ্ছিলাম ধান গম ছড়াতে ছড়াতে, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা লাল সুতো এঁকেবেঁকে পড়ে আছে মাঠের মধ্যে। কুড়িয়ে নিলাম। দেখলাম শুধু লাল নয়, হলদে এবং জরির সুতোও জড়িয়ে আছে ওর সঙ্গে। আর সুতোর দুই প্রান্তে দুটি রঙিন থোপ্না। বুঝতে বাকি রইল না যে, এটা রাখী, এর আড়ালে লুকিয়ে আছে অনেক শ্রদ্ধা-স্নেহ-ভালবাসা, অনেক ঐতিহ্য মনে হল কোথা থেকে এল এটা এখানে? এমন সময় সুট্ করে পাশ দিয়ে চলে গেল একটা সাইকেল। দেখলাম, তরুণ প্রফেসার হরেন চট্টখণ্ডী যাচ্ছেন। পরনে সাহেবী পোশাক, চোখে কালো গগল্স্। কিছুদূর গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন আমার দিকে, তারপর যেমন যাচ্ছিলেন যেতে লাগলেন। একটা নমস্কার করলেন না, আমাকে যে চেনেন তারও কোনও আভাস ফুটল না তার মুখে। অথচ উনি আমাকে খুব চেনেন, ওঁর ছেলেমেয়ের চিকিৎসা করেছি বিনা পয়সায়, কিন্তু তাঁর ব্যবহার থেকে মনে হল, আমি তাঁর অপরিচিত। মনে হল দেখতে পান নি। তবু আমি ডাকলাম। সাইকেল ঘুরিয়ে ফিরে এলেন তিনি। সবিস্ময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে ডাকছিলেন? কণ্ঠস্বরে আত্মীয়তার সুর একটুও বাজল না, বরং মনে হল বিরক্তই হয়েছেন। বললাম, 'এই রাখীটা এখানে কি করে এল বলুন তো?' শুনে তিনি বিলিতী কায়দায় শ্রাগ (shrug) করলেন, তারপর বললেন, 'এ বিষয়ে কোনও আলোকপাত করতে পারলাল না, সরি।' এই বলে আর একবার শ্রাগ্ করে চলে গেলেন। তাঁর কথার মধ্যে কোনও অভদ্রতা নেই, কিন্তু কেমন যেন সহৃদয়তার অভাব। ব্যবহারটা অনাত্মীয়সুলভ। অথচ, ভগবান জানেন, ওঁর সঙ্গে আমি বরাবর আত্মীয়সুলভ ব্যবহারই করে এসেছি। অনেকক্ষণ সাইকেলটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখি শালিকগুলো ফিরে এসে আমার ছড়ানো খাবারগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। আমি সেদিকে চাইতেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলে গেল। ওরা চুরি করে খাচ্ছিল। আমার সঙ্গে ওদের কোন আত্মীয়তার বন্ধন হয় নি। আত্মীয়তা হওয়া সত্যিই সহজ নয়। তার জন্যে তপস্যা করতে হয়। দস্যু রত্নাকর যতদিন দস্যু ছিল, কেউ তার কাছে আসে নি। কিন্তু যেই সে তপস্যা শুরু করল অমনি বল্মীকরা এসে বাসা বাঁধল তার চারদিকে, আপন লোক মনে করে। বাল্মীকি সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে। বল্মীকরা তাঁর মধ্যে বেসুরো কিছু পায় নি, পেলে আসত না। একটু দূরেই দেখতে পাচ্ছি কাক, শালিক আর ফিঙেরা এক-সঙ্গে চরে বেড়াচ্ছে, একটুও ঝগড়া করছে না। কেউ কারো কাছ থেকে পালাচ্ছে না। সকলেই নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত, কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে ঝগড়া করছে না। এইসব ভাবছিলাম, এমন সময় দেখতে পেলাম পণ্ডিতজী আসছেন মাঠামাঠি। মাঠের ওপারেই তাঁর বাড়ি। হেঁটে রোজ শহরে আসেন। স্কুলে পড়ান, নানা জায়গায়

টিউশনি করেন। সব পায়ে হেঁটে। তাঁর দাড়ি-গোঁফ কিছুদিন বেশ পরিষ্কার কামানো থাকে, কিছুদিন পরেই আবার দেখা যায়, তাঁর সারা মুখ কাঁচা-পাকা দাড়ির জঙ্গলে ভরে গেছে। এর অর্থ, নাপিতের যখন দেখা পান তখনই কেবল কামিয়ে নেন। স্থান কালের বিচার নেই। কখনও বা ঘোর দুপুরে রাস্তার ধারে কারও বারান্দায় বসে, কখনও বা কোনও সকালে রাস্তার ধারে ইঁটের উপর বসে, কখনও বা সন্ধ্যার সময় কোনও গাছতলায়। নাপিত পেলেই তাকে ধরে ফেলেন। কিন্তু যে নাপিত তাঁর প্রিয় নাপিত—বিষুণ ঠাকুর—তার দেখা কালে-ভদ্রে পান। যোগাযোগটা প্রায়ই হয় না। আমাকে দেখেই নমস্কার করে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন তিনি। তাঁকেও রাখী সমস্যার কথা বললুম। তিনি হেসে উত্তর দিলেন, 'রাখী কোথা থেকে এল তা ভেবে আর কি হবে। রাখী পেয়েছেন, রাখী বেঁধে দেবার লোকও পেয়ে গেলেন, আসুন আপনার হাতেই বেঁধে দি ওটা।' বললাম, 'যদি বাঁধতেই হয় আমিই আপনার হাতে বাঁধব। তিনি যাবার জন্য পা বাড়ালেন। তাঁর দাঁড়াবার সময় নেই। তিনি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে এম-এ ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পর্যন্ত পড়ান। বললেন, 'মাপ করবেন, দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে গল্প করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অনেক জায়গায় যেতে হবে।' নমস্কার করে চলে গেলেন। পণ্ডিতজীর সঙ্গে হরেনবাবুর তফাত আছে। তবে আর একটা কথাও গোপনে লিখে রাখছি। পণ্ডিতজী শিক্ষিত, সহৃদয়, সদাহাস্যমুখ, কিন্তু সংস্কার-মুক্ত নন। আমাকে অবশ্য খাতির করেন খুব, কিন্তু আমি 'মচ্ছিখোর' বাঙালী বলে আমার প্রতি তাঁর ঈষৎ বিরূপতা আছে। মুখে সেটা বলেন না কখনও, কিন্তু বুঝতে পারি।

তিনটি ছোট ছোট গাছ, পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে, যেন তিনটি যমজ ভাই। দেখছিলাম নহরপুর মাঠে। প্রথমে দেখতে পাই নি, পরে দেখেছিলাম। সেদিন দুপুরবেলা মাঠে গিয়ে প্রথমেই তাক লেগে গিয়েছিল আকাশে মেঘের কাণ্ডকারখানা দেখে। যত রকম মেঘের কথা বইয়ে পড়েছি সব সেদিন হাজির ছিল আকাশে। স্তর মেঘ, স্তূপ মেঘ, পালক মেঘ, ফড়িংয়ের মতো হালকা মেঘ, পাহাড়ের মতো ভারী মেঘ, ঝরনার মতো মেঘ, প্রপাতের মতো মেঘ, সব ছিল। এ ছাড়া ছোট ছোট তুলোর টুকরোর মতো দুষ্টু মেঘও ছিল কয়েকটা, তারা ছটফট করে বেড়াচ্ছিল। মেঘ নিয়েই আত্মহারা হয়ে ছিলাম, গাছ তিনটিকে দেখতেই পাই নি। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম, হোঁচট খেলাম হঠাৎ, ওই গাছ তিনটেতেই হোঁচট খেলাম। ওরা যেন নিজেদের দিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে নিলে। দেখলাম, বাঃ, কি চমৎকার! ছোট ছোট তিনটি গাছ, কিন্তু কি রূপ তাদের! কতদিন নহরপুর মাঠে এসেছি, এদের তো দেখতে পাইনি। চোখেই পড়ে নি। দেখলাম ভাল করে। মনে হল, ওরা যেন মুচকি হেসে বলছে, আকাশের দিকে সমস্তক্ষণ চেয়ে চেয়ে বেড়াচ্ছ, মাটির দিকেও দৃষ্টি নামাও একটু, আমাদের সঙ্গেও আলাপ কর, আমরা কি ফেলনা? এতদিন এদের দেখতে পাইনি বলে অনুতাপ হল। ঝুঁকে ভাল করে দেখলাম। পাতার

রং শুধু সবুজ নয়, সবুজের ভিতর থেকে সোনালী আভাও বেরুচ্ছে। পাতাগুলি গোল গোল, অনেকটা সেকালের দু-আনির মতো। পাতা দিয়ে গাছগুলি আপাদমস্তক ঢাকা। পাতাগুলির ধারে ধারে খুব সরু সরু দাঁতের মতো। কিন্তু দাঁত মনে হয় না। মনে হয় যেন গানের গিটকিরি। প্রত্যেক পাতার মাঝখানে একটি করে সাদা ফোঁটা আর তার থেকে পাঁচটি করে সরু শির সরল রেখায় চলে গেছে পাতার ধারের দিকে। মনে হয় যেন ছোট ছোট সোনালী-সবুজ জাপানী ছাতা। তিনটি গাছ ভরতি এক রকম জাপানী ছাতা। অবাক্ লাগল এ জিনিস আগে দেখতে পাইনি কেন। এর নাম কি? কি এর পরিচয়? জানবার চেষ্টা করলাম। দেখলাম, একটু দূরে মাঠে চাষারা জমি চষছে। তাদের একজনকে ডেকে এনে দেখালাম গাছগুলো। বললে, জংলী গাছ। এর বেশী আর কৌতূহল নেই তাদের। আমরা নিজেদের শিক্ষিত বলে মনে করি, তাই জ্ঞানের পরিধি আরও বাড়াতে চাই। আমি তাই গাছের ছোট একটি ডাল কেটে নিয়ে গেলাম বোটানির প্রফেসার হর্ষনাথবাবুর কাছে। তিনি উল্টে-পাল্টে দেখলেন, তারপর বললেন, এর ফুল ফল না দেখলে বলা যাবে না এটা কোন্ ন্যাচারাল অর্ডারের। শুধু ডাল বা পাতা দেখে বলা যাবে না। আমার কেমন যেন রোখ চড়ে গেল, গাছটার নাম জানতেই হবে। তার পরদিন আবার গেলাম সেখানে। দুর্গাকে নিয়ে গেলাম। পচা গোবর আর পাতার সারও নিয়ে গেলাম সঙ্গে করে। দুর্গা গাছ তিনটির গোড়া বেশ ভাল করে খুঁড়ে সার দিয়ে দিলে। মনে হল গাছ তিনটি খুশী হয়েছে, তাদের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা তৃপ্তির স্নিগ্ধ ভাতি বিকীর্ণ হচ্ছে। আশা হল, এইবার তাড়াতাড়ি ফুল ফুটবে। প্রায় রোজই যেতাম গাছ তিনটিকে দেখতে। সানন্দে লক্ষ্য করতাম সার পেয়ে বেশ সতেজ হচ্ছে। পাতাগুলো আরও সুন্দর হয়েছে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতাম, বড় ভাল লাগত। ক্রমশ কেমন যেন স্নেহ জন্মে গেল গাছ তিনটের উপর। রোজ যেতে আরম্ভ করলাম। মাস খানেক পরে মনে হল কুঁড়ি হয়েছে যেন। আনন্দে অধীর হয়ে পড়লাম। কিন্তু হায়, আমার ভাগ্য লাউথার সাহেবের ভাগ্যের মতো নয়। লাউথার সাহেব এ-দেশে চাকরি করতে এসে অনেক পাখির ছবি তুলেছেন। শুধু পাখির নয়, পাখির বাসার, ডিমের আর বাচ্চার। সহজ কাজ নয়, খুবই কঠিন। এর জন্যে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন ভদ্রলোক। একবার মানভূমে গিয়ে তিনি 'ক্রেস্টেড সুইফট' নামক পাখিটি দেখতে পেলেন। এ পাখির ছবি তুলতে হবে। শুধু ছবি নয়, পাখি ডিমে বসে তা দিচ্ছে—এই রকম একটি ছবি। পাখিটি তাল-চোঁচ জাতীয় পাখি, মাথায় কিন্তু বুলবুলির মতো ঝুঁটি আছে, খুব ছটফটে ছোট্ট পাখি। অনেক খুঁজে খুঁজে, হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন একটা গাছের ডালে ওর বাসা রয়েছে, একটা পাখি বসে তা-ও দিচ্ছে। কাছেই মাচা বাধলেন। অনেক উঁচু মাচা বাঁধতে হয়েছিল, পাখিটাকে ক্যামেরার নাগালের মধ্যে আনতে। ভয় ছিল এই সব তোড়জোড় দেখে পাখিটা না উড়ে যায়। কিন্তু সে উড়ল না। সাহেব ঠিক করলেন, তার পরদিন এসে ফটো তুলবেন। কিন্তু তার পরদিন এসে দেখলেন পাখি নেই, ভাঙা ডিমটি নিচে পড়ে

রয়েছে। তাঁর শিকারী 'সকরু' আরও বাসার খবর নিয়ে এল, কিন্তু সে-সব জায়গায় মাচা বাঁধবার সুবিধা নেই। কিন্তু তিনি থামলেন না, ক্রমাগত সন্ধান করে যেতে লাগলেন। এক বছর সন্ধানের পর তবে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছিল। চমৎকার ফটো তুলেছিলেন তিনি, ফটোটা তাঁর বইয়ের প্রথমেই আছে। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল না। একদিন গিয়ে দেখলাম কুঁড়িগুলি প্রায় ফোট-ফোট হয়েছে, পাপড়িগুলির স্বর্ণাভা ফুটে বেরুচ্ছে সবুজের ধার দিয়ে দিয়ে। আশা করলাম, কাল এসে নিশ্চয়ই পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলগুলি দেখতে পাব। কিন্তু পেলাম না এসে দেখি গাছ নেই। সেখানে কতকগুলি মহিষ চরে বেড়াচ্ছে। বুঝলাম, গাছগুলি তাদের উদরে গেছে। খুব কষ্ট হয়েছিল। অনেক দিন আগের ঘটনা এটা, তখন কষ্ট হয়েছিল, এখন হাসি পায়। নিজেকেই বলি, গাছকে দেখে আনন্দ পেয়েছিলে এই যথেষ্ট, যতটুকুক পেয়েছিলে ততটুকুতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল। তুমি ওর নাম জানবার চেষ্টা করতে গেলে কেন? তাইতেই কষ্ট পেলে। জ্ঞানের কি শেষ আছে? কত জানবে? তারপর, তারপর…এ যে অশেষ!

মাস্টার মশাই, আমার এই সব রাবিশ টুকে যাচ্ছেন এ কথা ভেবে আমি বড়ই সঙ্কোচ বোধ করছি। কিন্তু কি করব, যা করছি তা আপনারই অনুরোধে। আপনাকে কাজ দেবার জন্যে আমাকে এই অকাজ করতে হচ্ছে।

আজ একটা বড় মজার লোক দেখেছি। আমি যা দেখব বলে মাঠে আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে গিয়েছিলাম, সেটাও দেখেছি, অগস্ত্য নক্ষত্রকে, এ লোকটা ফাউ। আমার বাড়ি থেকে অগস্ত্য নক্ষত্রকে দেখা যায় না। কারণ, আমার বাড়ির দক্ষিণ দিকটায় লম্বা লম্বা গাছ থাকাতে দক্ষিণ আকাশটা ঢাকা থাকে। তাই অগস্ত্যকে দেখবার জন্য আমি মাঠে যাই মাঝে মাঝে। এ নক্ষত্রটির উপর আমার পক্ষপাতিত্ব আছে। এর কারণ, ওর সঙ্গে ইতিহাস জড়িত আছে খানিকটা। পাথুরে-প্রমাণ-ওলা, ইতিহাস নয়, পুরাণ-কথা। শোনা যায়, অগস্ত্য মুনির শিষ্য বিন্ধ্য পর্বতের নাকি খুব বাড় বেড়েছিল, সে নাকি আকাশ ছোঁয়ার বাসনায় ক্রমাগত মাথা উঁচু করে চলেছিল। যখন সূর্য-চন্দ্রের গতি রুদ্ধ হবার মতো হল তখন অগস্ত্য ঋষি তাঁর শিষ্যের কাছে গেলেন। এখন ভাল শিষ্যেরাও সবাই গুরুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে না, তখন উদ্ধত শিষ্যরাও গুরুর পায়ের কাছে মাথা নোয়াত। গুরুদেবকে দেখে প্রণাম করলেন বিন্ধ্য মাথা নুইয়ে। অগস্ত্য বললেন, আমি দক্ষিণে যাচ্ছি, যতদিন সেখান থেকে না ফিরি ততদিন তুমি মাথা নত করেই থাক। অগস্ত্য আর দক্ষিণ থেকে ফেরেন নি। বিন্ধ্য পর্বতের উচ্চ শিরকে চিরকালের মতো অবনত করে দিয়ে গেছেন তিনি। এই পৌরাণিক গল্পের সঙ্গে তাল রেখে অনেকে কল্পনা করেন যে, অগস্ত্য নামক ঋষি দাক্ষিণাত্যে আর্যসভ্যতা প্রচার করতে গিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে দুরারোহ বিন্ধ্য পর্বত লঙ্ঘন করতে হয়েছিল। এখন এভারেস্ট লঙ্ঘনকারীকে আমরা যে মর্যাদা দিই,

তখন তাঁকে সেই মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। তিনি দাক্ষিণাত্য থেকে আর ফিরতে পারেন নি, তাই দক্ষিণ আকাশের ওই উজ্জ্বল নক্ষত্রটার নাম দেওয়া হয়েছিল অগস্ত্য। কিংবা এ-ও হতে পারে, বিন্ধ্য পর্বত নামে কোনও শক্তিমান অনার্য নেতা ছিলেন, অগস্ত্যের কাছে হার মেনেছিলেন তিনি। এ সব সত্য কি মিথ্যা তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না কখনও। এ কাহিনী আমার মানসকাননে কল্পনার ফুল ফোটায়, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। শিশুরা যেমন ঠাকুমাদের মুখে রূপকথা শুনে আত্মহারা হয়, আমিও তেমনি পুরাণের রূপকথা শুনে হই! আমি যেন একজন পিঙ্গলকেশ নীল-চক্ষু গৌরবর্ণ যুবককে কল্পনা-নেত্রে দেখতে পাই। তিনি বিরাট বিদ্বান, নিপুণ বিচারক, ক্লান্তিহীন পর্যটক। দাক্ষিণাত্যের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে প্রচার করছেন আর্য ধর্মের মহিমা। যে দাক্ষিণাত্যকে আজ আমরা দেখছি কন্যাকুমারীতে, মীনাক্ষী মন্দিরে, চিদম্বরমে, যার অপরূপ প্রকাশ মূর্ত হয়ে আছে অসংখ্য মন্দিরে, যে বাণী পরে নূতন ভাষা পেয়েছিল শঙ্করাচার্যের জীবনে—এ সবের আদি জনক হয়তো অগস্ত্য, তিনি যে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তাই পরে মূর্ত হয়েছে এক নূতন সভ্যতায়। অগস্ত্যের দিকে চেয়ে চেয়ে সেদিন এই সব কথাই মনে হচ্ছিল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল বেচুর হয়তো শীত করছে। বেচুকে মোটরটা রবিনসন সাহেবের বাড়িতে রাখতে বলেছিলাম। রবিনসন অনেকদিন আগে মারা গেছে। এখন তার প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা বাড়িটা একজন মারোয়াড়ীর বাগানবাড়ি। কয়েকটা মালী ছাড়া আর কেউ থাকে না। বেচু সঙ্গী পাবে বলে ওইখানে গাড়িটা রাখতে বলেছিলাম। হুইসল্ বাজিয়ে পা চালালাম রবিনসনের বাড়ির দিকে। অনেক দূর চলে এসেছিলাম আকাশ দেখতে দেখতে, মনে হল বেচু হয়তো হুইসল্ শুনতে পাবে না এতদূর থেকে। অগস্ত্যের কথা ভাবতেই ভাবতেই পথ চলছিলাম।...হঠাৎ অনুভব করলাম আমার সামনে আরও দুটো লোক যাচ্ছে। অন্ধকারে তাদের দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। প্রথমে যার কথা শুনতে পেলাম তার গলা খুব মোটা। মনে হল হিসেব দিচ্ছে। বলছিল, এই শোন না, টিকে দু' আনার, তামাক ছ' আনার, আলু আধ সের চার আনার, কপি একটা পাঁচ আনার। হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় লোকটি সরু গলায় বলে উঠল—আরে, হয়েছে, হয়েছে, অত হিসেব দিতে কে বলেছে তোকে। তোর কাছ থেকে আমি সাড়ে তিন টাকা পাব, বাস্ সোজা কথা। মোটা গলা প্রতিবাদ করল তৎক্ষণাৎ—কি করে সাড়ে তিন টাকা পাবে তুমি! দিয়েছিলে তো চার টাকা। হিসেবটা শোন না: টিকে দু' আনার, তামাক ছ' আনার, আলু চার আনার, এই তো বারো আনা হল। তাছাড়া কপি একটা পাঁচ আনার, সতেরো আনা হল, বুটের ডাল এক পো ছ' আনা, তেইশ আনা হল, এক আনা পালং শাক, চব্বিশ আনা, তার মানে দেড় টাকা। আবার সরু-গলা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, আরে বাপু কে চাইছে তোর কাছে হিসেব, তুই আমার আপন লোক, তুই কি ঠকাবি, না, তোকে আমি অবিশ্বাস করছি? অত হিসেবে কাজ কি, আমি তোর কাছে সাড়ে তিন টাকা পাব—

এই তো সোজা হিসেব বাপু। তোর কাছে হিসেব চাইছে কে? কেন ব'কে মরছিস? মোটা গলার তখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বলে উঠল, এ শালার কাণ্ড দেখেছ! এর পর লোক দুটো রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হল। তাদের কথা আর শুনতে পেলাম না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার মোটরের আলোও দেখা গেল। এতদূর থেকে বেচু হুইস্‌লের শব্দ শুনেছে দেখে মনে মনে তার শ্রবণশক্তির প্রশংসা করলাম। বেচু যখন পড়ে না, অপেক্ষা করে, তখন দুটো হাঁটুর মধ্যে তার মুণ্ডটা ঢুকিয়ে দিয়ে তার উপর একটা চাদর ঢাকা দিয়ে কূর্মাকৃতি হয়ে বসে থাকতে ভালবাসে। কিন্তু এই অবস্থাতেও ও সব দেখতে পায়, সব শুনতে পায়। পাতলা রোগা লোক শরীরটাকে যেমন খুশি দোমড়াতে মোচড়াতে পারে। সার্কাসে ও অনায়াসে ভাল চাকরি পেতে পারত। সেদিন মোটরে যেতে যেতে অগস্ত্য এবং সাড়ে তিন টাকার হিসাব দুটোই পাশাপাশি মনে ফুটে উঠতে লাগল। মনে হল এই আমাদের জীবন। গাম্ভীর্য এবং হাস্যরস, উচ্চ এবং তুচ্ছ, জীবন এবং মৃত্যু, সুখ এবং দুঃখ পাশাপাশি ফুটে উঠেছে সর্বদা। কখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি, কখনও পাচ্ছি না। আর একটা মজাও আছে। যেটাকে আমরা হাস্যরস ভাবছি, তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করছি সেটা আসলে হয়তো হাস্যরসও নয়, তুচ্ছও নয়। তা হয়তো খুব করুণ, খুব গম্ভীর গভীর ব্যাপার। ওই সাড়ে তিন টাকার সম্পূর্ণ রহস্য যদি উদ্ভেদ করতে পারতাম তা হলে হয়তো দেখা যেত যে, ওই সরু-গলার কাছে সাড়ে তিন টাকা হয়তো জীবন-মরণ সমস্যা, লোভে পড়ে নানারকম জিনিস কিনে ফেলেছে, কিন্তু সাড়ে তিনটে টাকা ওর নিতান্ত প্রয়োজন। তাই সাড়ে তিন টাকা যে নেই, থাকতে পারে না এ কথাও কিছুতেই স্বীকার করতে চাইছে না, স্বীকার করতে ওর বুক ফেটে যাচ্ছে।

আমি একজন লোকের কথা জানি, তার একমাত্র ছেলে বিদেশে হঠাৎ মারা গিয়েছিল। সে লোকটি কিন্তু কোনদিন স্বীকার করেনি যে তার ছেলে মারা গেছে। বলত, আমার ছেলে মরেনি, মরতে পারে না, ওসব ভুল খবর। একদিন-না-একদিন সে ফিরে আসবেই এ বিশ্বাসকে সে প্রাণপণে অাঁকড়ে ছিল। উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকত বাড়িতে। বাড়ির সামনে গাড়ি কিংবা রিক্‌শা থামলে দৌড়ে বেরিয়ে আসত, ভাবত ছেলে এসেছে। সবাই তাকে পাগল ভাবত। কিন্তু সে যদি পাগল হয় আমরা অনেকেই তা হলে পাগল; কারণ আমরা অনেকেই এমন অনেক অসম্ভব আশা অাঁকড়ে বসে আছি। শুধু বসে নেই, উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছি। তাকেই কেন্দ্র করে ঘুরে মরছি নানান জটিল পথে। তারই প্রেরণা অদ্ভুতভাবে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে। আগেকার যুগের অ্যাল্‌কেমিস্টরা বহু রকম জিনিস ফুটিয়ে গলিয়ে সোনা তৈরি করবার চেষ্টা করেছিলেন। এ যুগের হিটলার নিজেকে আর্য মনে করে আর্য-রাষ্ট্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন বহু-আঁসলা (শুধু দো-আঁসলা নয়) নাৎসীদের নিয়ে। এঁরা বিপক্ষ দলের যুক্তি শুনতে চান না, হিসাব মানতে চান না, এঁরা সবাই ওই সরু-গলা লোকটার দলে, সে তার সাড়ে তিন টাকার দাবি কিছুতেই ছাড়তে চায় না। এই সূত্র ধরে আরও অনেক এলোমেলো দর্শন, অনেক আগড়ম-বাগড়ম কথা মনে আসছে। এমন কি,

আমাদের আত্মসম্মান বলিদান দিয়ে এই মূর্খ দেশে যাঁরা আদর্শ ডেমক্রাসি প্রবর্তন করবেন বলে আশা করে আছেন, তাঁদের সম্বন্ধেও দু-চার কথা বলতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু আপনার ধৈর্যের একটা সীমা আছে এ কথা মনে পড়াতে থেমে গেলাম।

এগুলো আবার পড়ে প্রচুর আনন্দ পেলেন হালদার মশায়। তাঁর মনে হল ডাক্তারবাবুর কাছে একবার যাই। তাঁর শেষ যে লেখাটা তিনি কাল দিয়েছেন সেটা যদিও তিনি সব পড়তে পেরেছেন, তবু পড়তে পারেননি এই ছুতো করে তাঁর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। কাগজটা হাতে করে বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়েই মনে হল, না মিথ্যার আশ্রয় নেব না, এমনিই যাই। কিন্তু যেতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত। গোয়ালের থামটার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন ডাক্তারবাবুর কাণ্ডকারখানা। অনুভব করলেন, ওর মধ্যে গেলে ছন্দ-পতন ঘটবে।

ডাক্তারবাবু মুরগীগুলোকে খাওয়াচ্ছিলেন। ওদের প্রত্যেকের নাম আছে। পেট্‌কি, ছুটকি, সাঁওতালনী আর রেজলি। পেট্‌কি আর ছুটকি লেগহর্ন, সাঁওতালনী আর রেজলী দেশী। এই চারটি মুরগী, আর মোরগটার নাম পুরো ইংরেজী, মিস্টার চ্যান্টিক্লিয়ার (Chanticleer), সংক্ষেপে চ্যান্টি। বিজয় একটা ছোট টুকরিতে ধান-গম-মকাই একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে এসেছিল মাইজির কাছ থেকে। ডাক্তারবাবু সেগুলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন আর ধমক দিচ্ছিলেন সাঁওতালনী আর রেজলিকে, ওরা পেট্‌কি আর ছুটকির কাছ থেকে কেড়ে খাচ্ছিল বলে। এই এক অদ্ভুত স্বভাব ওদের —বিশেষ করে দেশী মুরগীগুলোর—নিজেদের সামনে খাবার থাকতেও ওরা অপরের কেড়ে খাবে। ডাক্তারবাবু নীতি উপদেশ দিতে দিতে এমনভাবে ধমকাচ্ছিলেন, যেন ওরা মানুষ। চ্যান্টিকেও ধমকাতে হচ্ছিল। সে নিজে না খেয়ে—কোঁ-কোঁ-কোঁ-কোঁ করে আহ্বান করছিল তার প্রেয়সীদের। নিজে না খেয়ে ওদের খাওয়াবে! ডাক্তারবাবু বললেন, তুই আগে নিজে খা, ওদের খাবার তো রয়েছে। বিজয় বিজ্ঞের মতো বললে, বলা বাদমাছ্‌ ছে (বড় বদমাশ)। ডাক্তারবাবু বললেন, তুমিও কম বদমাশ নও। কাল আমার খবরের কাগজ ছিঁড়েছ কেন? বিজয় ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাববার চেষ্টা করল। তারপর হেসে ফেলল দাঁত বার করে। বললে, ওকৃলামে ছবি ছেপে (ওতে ছবি ছিল)। ডাক্তারবাবুর কাছেও এ যুক্তিটা অকাট্য মনে হল। বললেন, ও।

তারপর ছুটে এল রকেট উন্মত্ত ঝড়ের মতো, তাড়া করে গেল মুরগীগুলোকে। তারা কলরব করে ছুটে পালাল। এতেই রকেটের আনন্দ। সে ওদের কামড়াতে চায় না, ওদের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করতে চায়। ডাক্তারবাবু গর্জন করে উঠলেন, রকেট, রকেট। রকেট থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর ঘাড়টা ঈষৎ নীচু করে সম্ভবত মুচকি হাসিটাই গোপন করে ফেলল। 'কাম হিয়ার'—তর্জনী তুলে আদেশ করল বিজয় চোখ বড় বড় করে। কাম হিয়ার, কাম হিয়ার, ডাকতে লাগলেন ডাক্তারবাবু। রকেট একছুটে চলে এল ডাক্তারবাবুর কাছে আর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এমন করতে লাগল যেন কিছুই হয়নি। কাম হিয়ার এণ্ড সিট—আবার আদেশের সুরে গর্জন করে উঠলেন ডাক্তারবাবু।

ছিট ছিট,—বিজয়ও বলল। তারপর আড়চোখে চেয়ে দেখল ডাক্তারবাবুর দিকে। তাঁর গর্জনে সেও একটু ভয় পেয়েছিল। রকেট মাথা হেঁট করে বসল এসে ডাক্তারবাবুর সামনে। তার কান ধরে ডাক্তারবাবু বললেন, মুরগীদের তাড়া করেছিলি কেন ? অ্যাঁ ? কুঁই কুঁই করতে লাগল রকেট ল্যাজ নেড়ে নেড়ে। ভুটান আর জাম্বুও এল ছুটে। ভুটান বিস্মিত। জাম্বু একটু যেন খুশী। রকেটের চ্যাংড়াপনা তার ভাল লাগে না। রকেটের উপর তার হিংসাও আছে একটু। ডাক্তারবাবু রকেটের কান ছেড়ে দিলেন।

"শেক্ হ্যাণ্ডস্।"

রকেট থাবা তুলে ধরল ডাক্তারবাবুর দিকে। ডাক্তারবাবু তার সঙ্গে শেক্‌হ্যাণ্ড করলেন। আনন্দের আভা ফুটে উঠল রকেটের চোখে মুখে। সে বুঝল বিপদ কেটে গেছে। তারপর যা করল তা সে প্রায়ই করে, ডাক্তারবাবুর কোলে মাথা গুঁজে লম্বা ল্যাজটা নাড়তে লাগল। ডাক্তারবাবুও তার কানে পিঠে ল্যাজে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন তাকে। তাঁর আদরের ভাষা অদ্ভুত।

"মখমল কেনো, বাঘ-নেজু, নাক-ভিজে, গুণ্টু-মুখো, পাজি, পাজি—পাজকু।"

এত আদর খেয়েও রকেট কোল থেকে মুখ তোলে না। তার ভাবটা যেন এত বকেছ, কান মলে দিয়েছ, আরও আদর চাই। ডাক্তারবাবু আর এক প্রস্থ আদর করলেন।

"রকেট, রকটি, রক, রকাই, রুকলি-রু, রুকি রুম—"

রকেট খুশী হল এবার। আর, একবার শেক্‌হ্যাণ্ড করে কাছেই বসল। ভুটানও মহাখুশী, কৃতিত্বটা যেন তারই। সে পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে একবার নেচে নিলে। জাম্বু কিন্তু সন্তুষ্ট নয়। সে ছোট্ট একটু হেঁচে গা দুলিয়ে চলে গেল অন্যদিকে, তার ভাবটা যেন এসব আদিখ্যেতা আমার ভালো লাগে না। এমন সময় ডাক্তারবাবু দেখতে পেলেন মাস্টার মশাইকে। এমনভাবে চাইলেন যেন অচেনা লোককে দেখছেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিই ওই রকম, কেউ যেন তাঁর চেনা নয়, কেউ যেন আপন নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি যা বললেন তার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টির মিল পাওয়া গেল না।

"আসুন মাস্টার মশাই। কি খবর ?"

গণেশ হালদার এগিয়ে এসে হেসে বললেন, "আপনি রকেটকে যে সব নামে আদর করছিলেন তা বড় অদ্ভুত লাগল। মখমল-কেনো, বাঘ-নেজু এসব কথা তো আগে শুনিনি কোথাও।"

তুবড়ি ছুটল ডাক্তারবাবুর কণ্ঠে।

"সমাস করে ওসব আমি নিজেই তৈরি করেছি। মখমলের মতো কানের স্পর্শ যার সে মখমল-কেনো, বাঘের মতো লম্বা লেজ যার সে বাঘ-নেজু, গুণ্টু-মুখো মুখ যার সে গুণ্টু-মুখো। আরও কত তৈরি করি যখন যা মনে হয়—"

"চমৎকার হয়েছে কথাগুলো।"

"অবর্ণনীয়কে বর্ণনা করবার হাস্যকর প্রচেষ্টা। কিন্তু কিছু হয়নি। যাক ও কথা।

একটু আগে আমাদের পাড়ায় এক রোমাঞ্চকর কাণ্ড ঘটে গেল, তার খবর পাননি নিশ্চয়। রীতিমত দাঙ্গা—"

"দাঙ্গা? না কোনও সাড়াশব্দ পাইনি তো।"

"সাড়াশব্দ পাওয়া উচিত ছিল, কাকগুলো ডাকছিল তো খুব।"

"কিসের দাঙ্গা?"

"একটা বাজ এসে বসেছিল ওই ইউক্যালিপটাস গাছের উপর। আর যায় কোথা! যত কাক আর ফিঙে লেগে পড়ল তার বিরুদ্ধে। বাজটাও কিছুতে যাবে না, কখনও এ গাছে বসছে, কখনও ও গাছে বসছে, কিন্তু ওরাও না-ছোড়। শেষ পর্যন্ত তাকে পাড়া-ছাড়া করে তবে ছাড়লে। বহিঃশত্রুকে বিতাড়ন করে ওই দেখুন না, বিজয়গর্বে বসে আছে সব।"

ডাক্তারবাবু উদ্ভাসিত চক্ষে একদল কাককে দেখালেন। টেলিগ্রাফের তারের উপর সার বেঁধে বসে আছে বিজয়ী বীরের মতো। একটু দূরে ফিঙেও বসে আছে দুটো।

ডাক্তারবাবু ফিঙে দুটোকে দেখিয়ে বললেন, "ওই যে ফিঙেদের দেখছেন, ওরা মহা ওস্তাদ লোক। বিখ্যাত ভিংরাজ পাখি ওদের আত্মীয়। ওরা শুধু যোদ্ধা নয়, বড় আর্টিস্টও। চমৎকার গান করে। অবশ্য কান পেতে না রাখলে ওদের গান শোনা যায় না। একদিন শোনাব আপনাকে।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, "ওরা তো ফরমাশ মতো গাইবে না। যখন গাইবে তখন হয়তো আপনাকে পাওয়া যাবে না। পাখিদের গান শুনতে হলে কান পেতে থাকতে হয়। হলদে পাখিগুলো আরও দুষ্টু, লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়, তারপর পাতার আড়াল থেকে হঠাৎ এমন একটা মিষ্টি স্বর ছাড়ে যে, চমকে যেতে হয়।"

পাখির বিষয়ে আরও হয়তো বলতেন। কিন্তু বাধা পড়ল।

কাউ এসে হালদার মশায়কে নমস্কার করে একটা চিঠি দিয়ে চলে গেল।

"কার চিঠি?"

"ডাক্তার ঘোষালের।"

"আলাপ করেছেন নাকি?

"গিয়েছিলাম একদিন।"

"কি লিখেছেন?"

"ওঁর সঙ্গে দেখা করতে লিখেছেন আজ সন্ধ্যার সময়।"

"লোকটি করিৎকর্মা। ও রকম লোকের সঙ্গে ভাব-সাব রাখা ভালো।"

গণেশ হালদার নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। চিঠিটা পড়লেন আর একবার। চিঠিটির লেখবার ধরন অদ্ভুত।

প্রিয় হালদার মশায়,

টু কোট দ্বিজেন্দ্রলাল—আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে যদি মদীয় কুটিরে আপনার পবিত্র

পদরজঃ ঝাড়েন আমার চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার পাইবে। টু কোট ঘোষাল—প্লীজ কাম টু মাই প্লেস দিস ইভনিং, ও ডার্লিং। ঘোষাল।

॥ ৫ ॥

সন্ধ্যার একটু পরেই গণেশ হালদার ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির দিকে গেলেন। একটি সরু গলির মধ্যে ডাক্তার ঘোষালের বাড়ি। আশেপাশে আর বাড়ি নেই তেমন। ফাঁকা পড়তি জমি পড়ে আছে দু'দিকে। নির্জনতার জন্তেই সম্ভবত বাড়িটি পছন্দ হয়েছিল ডাক্তার ঘোষালের। শহরের মধ্যে অথচ কেমন যেন পাড়াগাঁ পাড়াগাঁ ভাব। গলির মধ্যে ঢুকেই হালদার মশায় উচ্চকণ্ঠের বাদ-প্রতিবাদ শুনতে পেলেন। ঘোষালের বাইরের ঘরে বসে কারা যেন তর্ক করছে। হালদার দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওই তর্ক-বিতর্কের মধ্যে ঢুকতে তাঁর প্রবৃত্তি হল না। ভাবলেন, ফিরে যাই। কিন্তু ফেরা হল না, বাইরের কপাটটা খুলে গেল এবং কাউ ছুটে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার ঘোষাল এবং ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার উপর। তারপর তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন ঘরের ভিতর।

কাউ চেঁচাতে লাগল, "আমার পাওনা আমাকে চুকিয়ে দিন। যদি না দেন, আমি যেমন করে পারি আদায় করে নেব।"

তার চেয়েও উচ্চকণ্ঠে গর্জন করে উঠলেন ঘোষাল, "চোপ রও হারামজাদা। হালদার মশায় এলে, তিনি যা দিতে বলবেন তাই দিয়ে দেব। তার আগে তুমি এক পাও নড়তে পাবে না এখান থেকে। তোমার পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে নিয়ে রসিদ লিখে দিয়ে তবে যাবে। কে দাঁড়িয়ে ওখানে?"

হালদার মশায়ের অস্পষ্ট মূর্তিটা দেখতে পেয়েছিলেন ঘোষাল।

"আমি—"

আমতা আমতা করে হালদার মশায় বললেন।

"আমি কে? হু ইজ আই?"

"আমি হালদার।"

"ও আসুন, আসুন।"

সঙ্গে সঙ্গে সুর করে গেয়ে উঠলেন, "তোমারি পথ চেয়ে বসে আছি বঁধু হে, জানালার কিনারে।"

তারপর হালদার কাছে আসতেই ফিসফিস করে বললেন, "সব ফাঁস হয়ে গেছে। The cat is out of the bag. কাউ জানতে পেরেছে যে, সে আমার ছেলে এবং যা বলেছিলাম, as I predicted, একদম বদলে গেছে। বনবেড়াল এখন টাইগারের প্লে করছে। আসুন, ভিতরে আসুন।"

হালদার মশায় ভিতরে গিয়ে দেখলেন কাউ শুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওষ্ঠাধর দৃঢ়নিবদ্ধ, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, চোখ দুটো জ্বলছে।

"কী ব্যাপার ?"

হালদার মশাই সহজ হবার চেষ্টা করে মুচকি হেসে চাইলেন কাউ-এর দিকে। ঘোষালও নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। কাউ কোন জবাব দিলে না।

ঘোষাল বললেন, "ব্যাপার হচ্ছে এই, কাল থেকে ওঁর ধারণা হয়েছে উনি কাউ নন, উনি কর্ণ। আসল কর্ণ সূর্যের সম্পত্তি ক্লেম করেননি, উনি করছেন। ওঁর এক মা—কুন্তী বলতে পারেন তাঁকে—হাজির হয়েছেন হঠাৎ শূন্য থেকে। She has materialised from nowhere, ছেলেকে এসে এই মন্ত্রণা দিয়েছেন। Well, I am game, আমার কিছু আপত্তি নেই। আপনি দু' পক্ষের কথা শুনে যা বলে দেবেন তাই আমি দিয়ে দেব। আপনাকেই আমরা সালিস মানছি।"

"আমাকে! আমাকে এসবের মধ্যে টানছেন কেন!"

"আমি টানিনি, নুক টেনেছে। আমি বলেছিলাম মিস্টার সেন আর পাণ্ডা যা ঠিক করে দেবে, আমি তাই মেনে নেব। কাউ তাতে রাজী নয়, ওরা নাকি আমার পেটোয়া লোক। তখন নুক ওকে পরামর্শ দিয়েছে আপনাকে সালিস মানতে। ও তাতে আপত্তি করেনি। It is Nook's selection."

এই বলে তিনি হাঁটু নাচাতে নাচাতে শিস দিতে লাগলেন এবং টেবিলে আঙুলের টোকা দিয়ে তাল রাখতে লাগলেন শিসের সঙ্গে সঙ্গে।

হালদার বললেন, "নুকই বা আমাকে এসবের মধ্যে টানছে কেন ?"

"নুকের বদ্ধ ধারণা হয়েছে আপনি মহাপুরুষ। হয়তো সত্যিই আপনি মহাপুরুষ। মহাপুরুষরা প্রায়ই আপনার মতো ভীতু লোক হয়। কিন্তু মহাপুরুষ অর নো মহাপুরুষ, কাজটি আপনাকে করে দিতে হবে।"

গণেশ হালদার বড়ই বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন। মাথা চুলকোলেন একবার, তারপর কাসলেন। শেষে বললেন, "আচ্ছা, ভেবে দেখি।"

"ভেবে দেখবার তো সময় নেই। ও মাগীকে আজই বিদেয় করতে হবে। I must drive her out to-day."

যদিও গণেশ হালদারের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, তবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কাকে ?"

"ওই কুন্তীকে। কাউ, তোমার গর্ভধারিণীকে ডাক। এখুনি ফয়সালা হয়ে যাক।"

কাউ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এইবার বলল, "আমার মায়ের সম্বন্ধে মুখ সামলে কথা বলবেন তা বলে দিচ্ছি।"

বলেই বেরিয়ে গেল সে।

কাউ-এর ভাব-ভঙ্গী দেখে বেশ একটু অবাক হয়ে গেলেন গণেশ হালদার। প্রথম

দিন তাকে খুব নীরব নিরীহ মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন মনে হ'ল ঠিক উলটো। একটা আগ্নেয়গিরি যেন এতদিন চুপচাপ ছিল। এইবার নিজ মূর্তি ধরেছে।

একটু পরেই কাউ-এর পিছু পিছু একটি আধঘোমটা দেওয়া লম্বা মেয়ে-মানুষ এসে ঘরে ঢুকল। রাঘব ঘোষাল গণেশ হালদারের দিকে চেয়ে ভুরু দুটো ঈষৎ নাচালেন। ভাবটা এইবার আপনার কাজ শুরু করে দিন। ইতস্তত করতে লাগলেন হালদার, কিন্তু এটাও বুঝলেন কিছু একটা করতে হবে, ফাঁদে পড়ে গেছেন, পালাবার উপায় নেই।

জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কি চান, খুলে বলুন।"

মেয়েটির উত্তর শুনে চমকে যেতে হল তাঁকে। মেয়েটি খোনা।

বলল, "শুঁনেচিঁ. রাঁঘব এঁক লাঁখ টাঁকা জঁমিয়েছে। আঁমি ওঁর স্ত্রীঁ, কাঁলুঁ ওঁর ছেঁলেঁ। আঁমাদেঁর দুঁ জনের সঁব সুঁদ্ধ পঁচাত্তর হাঁজাঁর টাঁকাঁ পাঁওয়াঁ উঁচিঁত। কিঁন্তু আঁমরাঁ পঁঞ্চাশ হাঁজাঁর পেঁলেই চঁলেঁ যাঁব।"

রাঘব ঘোষালের মুখে একটা নীরব হাসি ফুটে উঠল। গণেশ হালদার কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার আর কিছু বলবার আছে?"

"নাঁ। আঁমি টাঁকাঁ পেঁলেঁই চঁলে যাঁবঁ।"

রাঘব ঘোষাল তখন বললেন, "এইবার আমার কথা শুনুন। আমার প্রথম কথা, আমি উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তুরা যে এ-দেশে কি দুর্দশায় আছে তা আপনার অবিদিত নেই। সবাই জানে মিস্টার সেনের অনুগ্রহে এখানে কোনরকমে টিঁকে আছি। আমার একটা ডাক্তারি পেশা আছে বটে, কিন্তু আমি সাব-অ্যাসিস্টেণ্ট সার্জন, মাসে দুশো টাকাও রোজগার করতে পারি না. আপনি খোঁজ করলে বুঝতে পারবেন অধিকাংশ লোকই আমাকে ফি দেয় না। উদ্বাস্তু কলোনীর ডাক্তার হিসেবে শ' খানেক টাকা মাইনে পাই। সব মিলিয়ে কোনক্রমে দিন গুজরান করি। আমার মতো দরিদ্র লোক এক লাখ টাকা জমাবে এ কি সম্ভব? আমার ব্যাঙ্কের খাতা দেখলেই বুঝতে পারবেন কোনরকমে চালাচ্ছি আমি—হ্যাণ্ড টু মাউথ। আমার দ্বিতীয় কথা, এই মেয়েটি কালুর মা নয়। একে আমি কখনও দেখিনি। কালুর মা খোনা ছিল না। সে অনেকদিন আগে কালুকে আমার কাছে রেখে চলে গিয়েছিল। কালুকে আমি চ্যারিটি বয় হিসেবে মানুষ করেছি একে আমি চিনি না।"

"সঁব মিছেঁ কঁথাঁ। আঁমিই কাঁলুঁর মাঁ। আঁমিঁ আঁগেঁ খোঁনাঁ ছিঁলুঁম না। এঁক বঁছঁর আঁগে আঁমাঁর টাঁগঁরা ছ্যাঁদাঁ হঁয়ে এঁই রঁকঁম হঁয়ে গেঁছিঁ সঁবই কঁপাঁলেঁর নেঁকঁন।"

ঘোষাল বললেন, "সিফিলিটিক ওম্যান।"

কালুর চোখ দুটো জলজল করে উঠল। কি একটা বলতে গিয়ে সে থেমে গেল হঠাৎ। হাত দুটো মুঠো করে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গণেশ হালদার কাউকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইনিই তোমার মা?"

"ইনিই আমার মা।"

কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল কাউ।

রাঘব ঘোষাল দাঁড়িয়ে উঠলেন এবার। মুখে কপালে একবার হাত বুলিয়ে গির্জায় পাদ্রীরা যেভাবে বক্তৃতা দেয়, সেইভাবে বলতে লাগলেন কাউকে উদ্দেশ করে:

'দেখ কাউ, তুমি যে আমার ছেলে, তার কোন প্রমাণ নেই। আর এই মেয়েটি যে কোন কালে আমার স্ত্রী ছিল, তা-ও প্রমাণসাপেক্ষ। এ যা বলছে, তা ডাহা মিথ্যে কথা, আনডাইল্যুটেড লাই। তবে একটা কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আমি তোমাকে নিজের ছেলের মতই মানুষ করেছি, ছেলের মতই ভালবেসেছি এবং শেষ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে বাপের মতই ব্যবহার করে যাব, তুমি যদি ওই স্ত্রীলোকটির ভাঁওতায় না ভোল। তুমি যদি ওর সঙ্গে জুটে আমাকে চোখ রাঙাও, আমি একটি আধলা দেব না তোমায়। কিন্তু তুমি আগে যেমন ছিলে, তেমনি যদি থাকো তা হলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, I solemnly promise, তোমাকে আমার উত্তরাধিকারী করে যাব। ওর পাল্লায় পড়ো না তুমি। ও এতদিন কোথায় ছিল? কে তোমাকে এতদিন খিদের খাবার আর তেষ্টার জল জুগিয়েছে? অসুখের সময় কে তোমাকে ওষুধ খাইয়েছে, সেবা করেছে? এখানে আসবার কিছুদিন আগে আমি পাটনায় ছিলাম, কিন্তু সেখানে তুমি একটা ছুঁড়ির সঙ্গে লটপটিয়ে পড়লে তোমাকে বাঁচাবার জন্মেই তোমাকে নিয়ে সেখান থেকে পালাতে হল আমাকে, যদিও সেখানে আমার প্র্যাকটিস বেশ জমে উঠেছিল। সমস্ত কথা ভাল করে ভেবে দেখ। তুমি এর সঙ্গে জুটেছ কেন?"

ওঁ জুঁটবেঁ কেঁন, আঁমিই জুঁটেছিঁ ওঁর সঁঙ্গে। আঁমি খেঁতে পাঁই না, ওঁ আঁমার ছেঁলে, তাঁই ওঁকেঁ খুঁজে বাঁর কঁরেঁছিঁ। ওঁকে পেঁটেঁ ধঁরেঁছিলুঁম, ওঁ আঁমাঁকে আঁসঁমঁয়ে দেঁখবেঁ নাঁ? বিঁষয়ের অঁর্ধেক নাঁ নিঁয়ে আঁমি নঁড়ব নাঁ এঁখান থেঁকেঁ।"

গণেশ হালদারের মনে হচ্ছিল অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি যেন একটা পূতিগন্ধময় নোংরা নর্দমার মধ্যে পড়ে গেছেন। শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল তাঁর। নর্দমাকে কি করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা যায়, এ কথা ভাবছিলেন না তিনি, তাঁর মনে হচ্ছিল, কি করে এখন উদ্ধার পাওয়া যায়।

রাঘব ঘোষাল তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, "কি করা উচিত বলুন তো এখন।"

গণেশ হালদার ইতস্তত করতে লাগলেন।

"কিছু বলুন. Please say something, don't shut up like a troubled snail. বিপন্ন শামুকের মতো মুণ্ডু টেনে নেবেন না। Thats not manly, ওটা কি মানুষের মতো কাজ?"

হালদার বললেন, "কালু যখন একে নিজের মা বলছে, তখন এর ভারও আপনাকে নিতে হবে। ওকে তো কালু ফেলতে পারবে না। একসঙ্গে যদি দিতে না পারেন, মাসে-মাসে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিন না-হয়।"

"বেশ, বলুন কত দেব? Name that sum।"

"মাসে পঞ্চাশ টাকার কম কি চলবে আজকাল ?"

"বেশ, মাসে পঞ্চাশ টাকাই দেব, কিন্তু ওকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। কাউকে প্রত্যেক মাসে আমি টাকাটা দিয়ে দেব, ও পাঠিয়ে দেবে।"

"আমি অর্ধেক বিষয় না পেলে নড়ব না এখান থেকে।"

রাঘব ঘোষাল নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর উঠে গিয়ে কোণের আলমারিটা খুলে তার ভিতর থেকে বন্দুক বার করলেন। তারপর হঠাৎ সেটা তুলে চীৎকার করে উঠলেন, "বেরিয়ে যাও এখান থেকে, গেট আউট।" তারপরেই দড়াম করে শব্দটা হল। চীৎকার করে ছুটে পালাল খোনা মেয়েটা। কাউ দাঁড়িয়ে রইল গুম হয়ে। তারপর সে-ও চলে গেল। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল মুক।

"কি হল!"

"তাড়িয়ে দিলুম মাগীকে।"

সঙ্গে সঙ্গে মুকও বেরিয়ে গেল

গণেশ হালদার উঠে দাঁড়ালেন।

"বসুন, বসুন, আপনি যাচ্ছেন কেন, আমাকে এমন বিপদে ফেলে চলে যাওয়াটা কি উচিত হবে ? বাঙালীকে বাঙালী না দেখলে আর কে দেখবে ! তা ছাড়া আপনিও উদ্বাস্তু, আমিও উদ্বাস্তু, ডবল বন্ধন। বসুন, যাবেন না। হিম্মত করিয়ে।"

ঘাড়ের উপর প্রকাণ্ড থাবার মতো হাত রেখে জোর করে বসিয়ে দিলেন।

হালদার বললেন, "মাপ করবেন আমাকে, এসব খুন-জখমের ব্যাপারে আমি থাকতে চাই না।"

"খুন-জখম কোথা দেখলেন ! ব্লাংক ফায়ার করলাম, ওকে ভয় দেখাবার জন্যে, just to scare her away—একবিন্দু রক্তপাত হয়নি, not a drop of blood has been shed ! ফায়ার না করলে ও মাগী যেত না। সমানে ঘ্যান ঘ্যান করে অতিষ্ঠ করে তুলত, would have whined and whined till your patience collapsed."

এই বলে ঘোষাল হলদে দাঁত বার করে তাঁর সেই আকর্ণবিস্তৃত হাসিটি হাসলেন।

হালদার জিজ্ঞেস করলেন, "ও আপনার স্ত্রী নয় ?"

"না। তবে আমার রক্ষিতা ছিল কিছুদিন। কাউ ওর ছেলে এ-ও ঠিক। ও যদি বরাবর ফেথফুল থাকত, ওকে আমি ছাড়তাম না। কিন্তু তা রইল না। একদিন গিয়ে দেখি, গজু গাড়োয়ান ওর ঘরে ঢুকেছে। সেই দিনই বললাম, মাপ কর, গজু গাড়োয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারব না। জগৎসিংহ বা ওসমান হলেও বা কথা ছিল। সেই দিনই I washed my hands, মাগীর প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে চলে এলাম। তারপর ও কাউকে আমার বারান্দায় বসিয়ে রেখে কোথায় যে ভেসে গেল আর টের পাইনি। এখন বারো বছর পরে ফিরে এসে আমার অর্ধেক সম্পত্তি দাবি করছে। Silly—। শুনেছি ওর original বাড়িও এখানে নাকি !"

কিছু একটা বলা উচিত এই ভেবে হালদার বললেন, "কিছু দিয়ে মিটিয়ে নিন—"

"তাই নিতে হবে। কিন্তু সোজায় হবে না। মাসে পঞ্চাশ টাকা দিতে তো রাজী হলাম, নিলে? সোজা আঙুলে ঘি বেরুবে না। আঙুল বেঁকাতে হবে। পাণ্ডার সঙ্গে এখানকার দারোগার খুব দহরম মহরম। সে লোকও খুব জবরদস্ত। কথায় কথায় হাণ্টার হাঁকরায়। তাঁর কাছে একদিন পিটুনি খাক, তবে ঠিক হবে।"

এমন সময় নুক ফিরে এল।

ঘোষাল সোৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন—"তোমার সঙ্গে কিছু কথা হল নাকি?"

নুক জবাব দিল না।

"এ কি, তোমার হাতের চুড়ি আর গলার হার কোথা?"

এ কথারও কোন জবাব না দিয়ে নুক ভিতরে চলে গেল।

"দেখলেন, কি কাণ্ড করে এল! এই কিছুদিন আগেই ওকে চুড়ি আর হার গড়িয়ে দিয়েছি তিন হাজার টাকা খরচ করে। স্বচ্ছন্দে দিয়ে চলে এল! নাঃ, অনেক রকম মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করেছি, কিন্তু এরকমটা আর দেখি নি। She is a problem girl, ও মানুষ নয়, মূর্তিমতী হেঁয়ালি একটা—"

হঠাৎ ডাক্তার ঘোষালের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। দাঁত কিড়মিড় করে ঘুঁষি পাকিয়ে তিনি বললেন, "হারামজাদীকে ঠেঙিয়ে পস্তা উড়িয়ে দেব আজ।"

তিনি ছুটে ভিতরের দিকে যাচ্ছিলেন, গণেশ হালদার তাঁকে আটকালেন।

"না, না, মারধোর করবেন না। বসুন, একটু স্থির হোন—"

রাঘব ঘোষালের মতো বলিষ্ঠ লোককে জোর করে বসাবার সাধ্য হালদার মশায়ের ছিল না। কিন্তু তিনি নিজেই বসে পড়লেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠল সবিস্ময় কৌতুক-হাস্য। তিনি ভুরু দুটো কপালে তুলে চোখ বড় বড় করে বললেন, "হোয়া—ট্! আপনিও গুড় খেয়েছেন নাকি?"

"গুড় খেয়েছি, মানে?"

সত্যিই কথাটা বুঝতে পারেন নি গণেশ হালদার।

"আমাদের সারকেলে গুড় খাওয়ার একটি মানেই হয়। প্রেমে পড়া! আপনি জানতেন না বুঝি? আপনি একেবারে ভিন্ন জাতের লোক দেখছি! হা-হা-হা! ওর প্রতি হঠাৎ দরদ দেখে সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, খবরদার, ও প্যাঁচে পড়বেন না। কিন্তু সাবধান করা বৃথা। আপনার ভিতর লোহা থাকলে, I mean base metal, ও আপনাকে টানবেই। ও একটি সাংঘাতিক চুম্বক, she is a powerful magnet."

তারপর নিম্নকণ্ঠে বললেন, "সুবেদার, পাণ্ডা দুজনেই হাবুডুবু খাচ্ছে। নুকই এদের ফাঁসিয়ে রেখেছে এখানে। Nook has hooked them here। তাতে আমাদের ব্যবসার সুবিধে হয়েছে খুব। পরে আপনাকে—এই দেখুন, আবার আমি একটা টপ সিক্রেট আপনাকে বলে ফেললুম। বলা উচিত ছিল না।"

তারপর অন্দরমহলের দিকে তাকিয়ে আবার ফিসফিস করে বললেন, "আশা করি ঝুক শুনতে পায় নি। শুনলে এখনি ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপর। ও একটা বাঘিনী। She is a tigress."

গণেশ হালদার সত্যিই বিস্মিত এবং অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

বললেন, "আমি এ রকম মেয়ে দেখি নি - "

"আমি সারা জীবন মেয়েমানুষ চরাচ্ছি মশাই, আমিই কি দেখেছি? দেখি নি। ও না জানে কি, না পারে কি! ইংরিজী জানে, বাংলা জানে, সংস্কৃত জানে, গান গাইতে পারে, মোটর চালাতে পারে, ছোরা খেলতে পারে। তার উপর ওই রূপ! মানুষের কলজের ভিতর বসে যায় একেবারে। হীরের তৈরী বাঘ-নখ একটি।"

অপ্রত্যাশিতভাবে কাউ এসে প্রবেশ করল ভিতর দিক থেকে।

মাসীমা বলছেন, "খাবার দেওয়া হয়েছে, খেয়ে নিতে—

কাউ প্রথমে ঝিনুককে দিদি বলত। ইদানীং কিছুদিন থেকে কেন জানি না, 'মাসীমা' বলছে।

"তোমার মা কোথা গেলেন?"

"আমি জানি না, মাসীমা জানেন।"

"তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে গেলে না?"

"না। মাসীমা এখানে থাকতে বললেন।"

"মাসীমা কি এ বাড়ির মালিক নাকি?"

কাউ এ কথার কোন জবাব না দিয়ে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

"এ তো আচ্ছা জবরদস্তি দেখছি। আমার বাড়িতে আমি কেউ নই। I am a cipher in my household. কান্‌ট বি।"

এক লম্ফে ঘোষাল ভিতরের দিকে চলে গেলেন। হালদার ভাবলেন এই সুযোগে সরে পড়ি। কিন্তু তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারলেন না. তাঁর মনে হতে লাগল কে যেন তাঁকে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিয়েছে চেয়ারটার সঙ্গে। উৎকর্ণ হয়ে বসে রইলেন। ঘোষাল কি বললেন তা শুনতে পাওয়া গেল না। কিন্তু ঝুকের তীক্ষ্ণকণ্ঠ শোনা গেল একটু পরেই।

"আমার গয়না আমি যাকে খুশি দিয়েছি, তোমার তাতে কি।"

তারপর, "হ্যাঁ, কাউ এখানে থাকবে। ওকে নইলে আমার চলবে না। তোমার ভালোর জন্যেই ওকে যেতে দিই নি। ও এখানে থাকবে, থাকবে, থাকবে—"

এর পরই দড়াম্ করে একটা শব্দ হল। এবং তারপরই আর একটা বিরাট শব্দ হল, মনে হল একটা হাঁড়ি চুরমার হয়ে গেল বুঝি। গণেশ হালদার তড়াক করে উঠে ভিতরে ছুটে গেলেন। গিয়ে যা দেখলেন তা দেখবেন বলে প্রত্যাশা করেন নি। দেখলেন, ডাক্তার ঘোষাল সর্বাঙ্গে ডাল মেখে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কোট প্যান্ট ডালে মাখামাখি. মাথা থেকে কপাল থেকে টপটপ করে ডাল পড়ছে। তাঁর হাতে

একটা মোটা লাঠি। ঘরের আর এক প্রান্তে ঝুক দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে বঁটি। কাউ নেই। গণেশ হালদারকে দেখেই ঝুক বঁটিটা ফেলে দিয়ে বাইরে চলে গেল।

গণেশ হালদারের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ঘোষাল হেসে ফেললেন, তারপর জিব বার করে ঠোঁটের উপর যে ডালটা পড়েছিল, সেইটে চাটতে চাটতে বললেন, "অদ্ভুত মেয়ে, না ? Isn't she interesting ?"

গণেশ হালদারও হাসলেন একটু।

"যান, স্নান করে ফেলুন।"

"তা তো ফেলবই। আহা, ডালটার চমৎকার টে-স-ট হয়েছিল। সমস্ত বরবাদ করে ফেললে হারামজাদী।"

"আপনি স্নান করুন। আমি আজ যাই।"

"একটু বসুন না বাইরে। আমি চট করে আসছি—"

"এখন আমার একটু কাজ আছে। কাল না হয় আসব।"

"কাল ? জানেন না, কাল always পলাতক ? বিশেষ করে আগামী কাল ? Tomorrow is very elusive. যাক, আপনি যখন থাকবেন না, যান। Many thanks. Good night "

গণেশ হালদার বেরিয়েই দেখলেন একটা মোটর এসে দাঁড়াল। মোটর থেকেই সুবেদার খাঁ হাঁক দিলেন—"ডাক্তার ঘোষাল, মাল এসে গেছে। আনিয়ে নিন। শ্রীমতী ঝিনুক কোথায় ?'

এইটুকু শুনেই গণেশ হালদার চলে গেলেন। তিনি ভাবছিলেন গিয়ে একটু লেখাপড়া করবেন। কিন্তু বিধাতা সেদিন জ্ঞানার্জনের অন্য রকম ব্যবস্থা করেছিলেন। গিয়ে দেখলেন তাঁর বাইরের দরজার কাছে ঝুক দাঁড়িয়ে আছে।"

ঝুকই এগিয়ে এসে বললে, "আমার দুর্ভাগ্য যে, যখনই আপনি আমাদের ওখানে যাচ্ছেন, তখনই এমন একটা কিছু ঘটছে যাতে আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার জীবনকাহিনী যদি শোনেন আমাকে অত খারাপ মনে হবে না। আজই আপনাকে শোনাতাম. কিন্তু দেখতে পেলাম মোটর আমাদের বাড়িতে ঢুকল. এখনই আমার খোঁজ পড়বে। তাই এখন আর দাঁড়াতে পারছি না। কিন্তু আপনাকে আমার জীবনের সব কথা বলবার ভারি ইচ্ছে, কখন আপনার সুবিধা হবে বলুন তো ?"

"কি করব আমি আপনার জীবনকাহিনী শুনে ? শুনে লাভ কি বলুন ?"

"আমার তৃপ্তি। হয়তো অন্য লাভও আছে, কিন্তু সে কথা এখন বলা যাবে না। আগে সব শুনুন, পরে বিচার করবেন।"

একটু ইতস্তত করে গণেশ হালদার শেষে বললেন, "আমি এখানকার স্কুলের শিক্ষক। আমাকে কেন্দ্র করে কোন খারাপ গুজব রটে এটা আমি চাই না। কিন্তু

আপনাদের সংস্রবে এলেই গুজব রটবে। নানা লোকে নানা কথা বলবে। আমি কার মুখ চাপা দেব? সেইজন্য আমি এসবের মধ্যে যেতেই চাইছি না। আমাকে মাপ করবেন।"

"আপনাদের গাঁয়ের গিরিশ বিত্তার্ণবকে মনে আছে?"

"হ্যাঁ, খুব ছেলেবেলায় তাঁকে আমি দেখেছি। তিনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। তাঁর কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

"তিনি আমার বাবা। বাবা আর দাদা রায়টে মারা গেছেন। ডাক্তার ঘোষাল আমাদের দুই বোনকে, এক কাকাকে আর ভাইপোকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। সে সময় ওঁর যে সাহস দেখেছিলাম তা অপূর্ব।"

"আপনি আমাদের গাঁয়ের মেয়ে? আপনাকে কখনও গাঁয়ে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।"

"আমি গাঁয়ে খুব কম থেকেছি। কলকাতায় বোর্ডিংয়ে থেকে পড়তাম। গাঁয়ে বিশেষ যেতাম না, ওই দাঙ্গার ঠিক আগে গিয়ে পড়েছিলাম। আপনার বোন বুলি আমাকে চেনে। তার মুখেই আপনার কথা প্রথম শুনি, তখন আপনি বিলেতে। এখানে আপনি যখন এলেন তখন আপনার নাম শুনে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু প্রথমে বুঝতে পারি নি যে, আপনি আমাদের গাঁয়েরই গণেশ হালদার। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি—"

"মা আর বুলি কোথায় জানেন?" ঝিনুকের কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন গণেশ হালদার।

"আপনি শোনেন নি?"

"না, আমি কিচ্ছু জানি না। তাদের কোন খবর যোগাড় করতে পারি নি।'

"আপনার মা গুণ্ডাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছেন। রাধাবল্লভজীর মূর্তিকে কাপড় দিয়ে বুকে বেঁধে দু হাতে দুখানা দাও নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধ করেছিলেন বলেই বুলি বেঁচেছে।"

"বুলি এখন কোথায়?"

"ঠিক জানি না। কার সঙ্গে যেন কলকাতার দিকে চলে এসেছিল শুনেছি। আমি ঠিক জানি না।"

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন গণেশ হালদার। ঠিক সেই সময় মোটরের হর্নটা খুব জোরে জোরে বাজতে লাগল।

"ওরা আমাকে ডাকছে, আমি যাই।"

ঝিনুক চলে গেল। হালদার দাঁড়িয়েই রইলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে এ সংবাদটা শোনার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। মনে হল দাঙ্গা হয়ে যাওয়ার অনেকদিন পরে তিনি বিলেত থেকে ফিরেছিলেন। দেশেও গিয়েছিলেন, কিন্তু একটাও চেনা মুখ দেখতে পান নি। গ্রামে পুরোনো লোক কেউ ছিল না। এমন কি, পুরোনো

মুসলমানরাও না। গ্রামে পাঞ্জাবী আর বিহারী মুসলমানরা বসবাস করছিল। হঠাৎ একটা বিপুল গর্বে তাঁর মনটা ভরে উঠল। মা যুদ্ধ করতে করতে মারা গিয়েছিলেন! তিনিই বুলিকে রক্ষা করেছেন! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুমূর্ষু বাবার মুখটাও মনে পড়ল। মৃত্যু-শয্যায় শায়িত তাঁর সমস্ত চেহারাটাই ভেসে উঠল চোখের উপর। চোখ বুজেছিলেন তিনি, চোখের দু' কোণ বেয়ে জল পড়ছিল। ছেলেবেলায়-দেখা এই ছবিটাই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল তাঁর চোখে। তিনি নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

॥ ৬ ॥

ঝিনুক ফিরে গিয়ে দেখল সুবেদার খাঁ, পাণ্ডা আর ঘোষাল তিনজনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার প্রত্যাশায়। ঘোষাল স্নান করে কাপড়-চোপড় বদলেছেন। ঝিনুককে দেখে উদ্ভাসিত মুখে এগিয়ে এলেন তিনি, যেন কিছুই হয় নি।

"হ্যালো নুক, কোথায় গিয়েছিলে তুমি? সুবেদার সাহেব অস্থির হচ্ছেন তোমার জন্যে। লালপুরের মাঠে যেতে হবে তোমাকে। এবার জালে অনেক মাছ উঠেছে। It is a big catch this time."

সুবেদার খাঁ, সাগ্রহে এগিয়ে এলেন। চুপি চুপি বললেন, "লালপুর মাঠের কাছে যে গুমটিটা আছে, তার থেকে কিছু দূর পশ্চিমেই ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগনালটা। সেই সিগনালের নীচেই যে ঝোপটা আছে সেইখানেই ব্যাগটা ফেলেছি। গিয়ে নিয়ে এস এক্ষুনি। এত রাত্রে যদিও ওখানে অন্য লোক যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, তবু এখনই নিয়ে আসা ভাল। সাবধানের বিনাশ নেই। তুমি গাড়িটা নিয়ে এখনই চলে যাও।"

ঝিনুক চুপ করে রইল ক্ষণকাল। তারপর বলল, "গতবারের অংশ আমি এখনও পাই নি। তা না পেলে আমি যাব না।"

ঘোষাল আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে বললেন, "ওকে ফাঁকি দেওয়া চলবে না, she is a tough nut, ও বড় শক্ত ঘাঁটি। পাণ্ডা, দিয়ে দাও ওর প্রাপ্যটা—"

পাণ্ডা তৎক্ষণাৎ কোটের ভিতরের পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে দিলেন নুককে।

"দশখানা নম্বরী নোট আছে, গুনে নিন।"

ঝিনুক গুনলে না, নোটের তাড়াটা বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিল।

"আমরা তা হলে তাসে বসি। সেনও এক্ষুণি আসবে। তুমি আর দেরি ক'রো না। সেন আসবার আগেই তুমি বেরিয়ে পড়।"

ঝিনুক ভিতরে গিয়ে একটা বেঁটে কোট পরে এল। তারপর সোজা গিয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসল এবং চমৎকার দক্ষতার সঙ্গে গাড়িটা ব্যাক করে বোঁ করে বেরিয়ে গেল।

ঝিনুক চলে যাওয়ার খানিকক্ষণ পরেই মিস্টার সেন এলেন আর একটা গাড়ি করে, আর তাঁর সঙ্গে তাঁর মেয়ে তনিমা।

তনিমাকে দেখে বিগলিত হয়ে পড়লেন ঘোষাল।

"আরে আসুন, আসুন, আসুন। সূর্য আজ পশ্চিম দিকে উদিত হয়েছে দেখছি, the sun has preferred the west today, what a wonder. কি সৌভাগ্য আমার।"

মুচকি হেসে নমস্কার করলে তনিমা। ঘোষাল প্রতি-নমস্কার করে আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

"আপনাকে দেখে আনন্দও যেমন হচ্ছে, ভয়ও তেমনি করছে। আপনি যদি আমার বিরুদ্ধে খেলতে বসেন তা হলে তো নির্ঘাত নিঃস্ব হয়ে যাব আজ। You will suck me outright."

মুচকি হেসে তনিমা ঘাড় দুলিয়ে বললে, "তা হলে খেলব না। বাপি, আমি বরং ফিরে যাই, ফিরে গিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দিই তোমাকে। কেমন ?"

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন ঘোষাল।

"আরে না, না, সে কি হয়! আপনার সঙ্গে খেলব, হেরে যাব জেনেও খেলব, আপনার সঙ্গে হেরে যাওয়ার একটা সুখ আছে যে। আজ শুধু আপনার সঙ্গে খেলব না, সর্বস্বপণ করে খেলব। I shall stake everything today."

বক্র দৃষ্টিতে মুচকি হেসে ঘোষালের দিকে চেয়ে রইল তনিমা সেন ঘাড় বেঁকিয়ে। মিস্টার সেনের চক্ষে এসব মোটেই অশোভন ঠেকল না। মিস্টার সেন জাতীয় লোকের কাছে ঠেকে না। তাঁর ডায়োসেসনে-পড়া মেয়ের তিনি ইয়ার। বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ের সঙ্গে পিতার গাম্ভীর্য রক্ষা করাটা তিনি সেকেলে কুসংস্কার মনে করেন। তনিমার গত জন্মদিনে তাকে এক সেট হ্যাভেলক এলিস কিনে উপহার দিয়েছেন। কিছুদিন আগে লোলিটা (ললিতা ?) নামক বইটা কিনে নিজে পড়েছেন, মেয়েকেও পড়িয়েছেন, আধুনিক সাহিত্য-কৃতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে।

তনিমা তাস খেলায় নাকি সিদ্ধ-হস্ত। ঠিক তার বাপের উল্‌টো। মিস্টার সেন খেলতে বসলেই হেরে যান। ডাক্তার ঘোষালের কাছে তাঁর নাকি দেড় হাজার টাকার উপর ধার হয়ে গেছে। তাস খেলার ধার! সেই ধার শোধ করবার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে তনিমাকে নিয়ে আসেন।

"বাপি থাকব ?"

"থাকো না। এসেইছ যখন দু হাত খেলে যাও।"

ঘোষাল দু হাত জোড় করে বললেন, "দয়া করুন, প্লীজ স্টে।"

মিস্টার সেন হেসে উঠলেন। তিনি সাধারণতঃ মুচকি হাসেন, জোরে হাসেন না। কিন্তু যখন হাসেন তখন অদ্ভুত শব্দ হয় একটা। সে শব্দ প্রায় অবর্ণনীয়। মনে হয় কুলকুচো করার শব্দের সঙ্গে হেঁচকি ওঠার শব্দ মিশছে।

পাণ্ডাও অনুরোধ করলেন তনিমা সেনকে। দরবেশ পাণ্ডা বেঁটে মোটা লোক। মনে হয় যেন একটা চতুর্ভুজের উপর তাঁর মুণ্ডু গলা হাত পা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। পিতলের বোতামওলা ঢিলে কালো বা নীল রঙের গলাবন্ধ কোট গায়ে দেন। মুখটাও চতুষ্কোণ, কান দুটোও প্রায় সেই রকম, মনে হয় যেন মুখের অনুকরণ করবার চেষ্টা করছে। দু থাক চিবুক, ভুঁড়ো নাক, ঝাঁকড়া ভুরু। তাঁর কথাবার্তার মধ্যে একটু যেন হুকুমের সুর থাকে। যখন অনুরোধ করেন তখনও সেই সুরটা বাজে। প্রচুর ঘুষ এবং খোশামোদ পেয়ে পেয়ে এই অবস্থা হয়েছে।

তনিমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "আমাদের সুখী করতে যদি আপনার অনিচ্ছা থাকে, যেতে পারেন।"

তনিমা ঘাড়টি একদিকে কাত করে চোখে মুখে নিরুদ্ধ হাসির আভা বিকীর্ণ করে বললেন, "আচ্ছা. থাকব।"

সুবেদার খাঁ যাবার জন্যে উস্‌খুস করেছিলেন, এ সুযোগ তিনি উপেক্ষা করলেন না।

"আপনারা তো চারজন হয়েই গেলেন। আমাকে ছেড়ে দিন তা হলে আজ। আমি সমস্ত দিন ডিউটিতে ছিলাম, বড় ক্লান্ত লাগছে, বসতে ইচ্ছে করছে না। ডাক্তারবাবুর 'বাইক'টা কি ঠিক আছে? পেতে পারি?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, সারটেনলি।"

সুবেদার খাঁ বাইকে চড়ে বেরিয়ে গেলেন। সবাই ভিতরে ঢুকে টেবিলের চারধারে বসলেন।

"কাউ, আমাদের কফি দাও।"

ঘোষাল চীৎকার করে দ্বারের দিকে চাইলেন। কাউকে দেখা গেল না।

"কাউ নেই নাকি?"

ঘোষাল ভিতরের দিকে চলে গেলেন।

তারপরই ফিরে এসে বললেন, "নো কাউ, নো মুক। আমিই জলটা চড়িয়ে এলাম ইলেকট্রিক কেতলিতে। কফি না খেলে জমবে না। মুক খানিকটা শিককাবাব বানিয়ে রেখেছে দেখছি। আনব?"

মিস্টার সেন মুচকি হেসে বললেন, "শুধু মাংস কুকুরে খায়। মানুষ মাংসের সঙ্গে আরও কিছু চায়, কি বলেন মিস্টার পাণ্ডা। আমি অবশ্য বাড়িতে এক পেগ চড়িয়ে এসেছি।"

ঈষৎ নাকিসুরে তনিমা বললে, "বাপি, তুমি আজকাল বড্ড বেড়েছ। মাম্মি যদি যদি জানতে পারে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবে।"

ঘোষাল কিছু না বলে আলমারি থেকে এক বোতল হুইস্কি বার করে বললেন, "হিয়ার ইউ আর"—বলেই টেবিলের উপর রাখলেন সেটা ঠক্ করে। তারপর গ্লাস বার করতে লাগলেন।

সকলেরই চোখে মুখে বেশ একটা প্রফুল্ল ভাব ফুটে উঠল।

সেদিন হঠাম মৃত্যুঞ্জয়ের অভিযান একটু নূতন ধরনের হয়েছিল। তিনি সেদিন দিনে না বেরিয়ে অনেক রাত্রে বেরিয়েছিলেন। রেল লাইনের ধারে যে উঁচু টিলাটা ছিল সেইখানেই গিয়ে উঠেছিলেন তিনি। রাত্রে বেরুলে রকেটকে সঙ্গে নিয়ে বেরোন তিনি। রকেট বাধ্য কুকুর, চুপ করে থাকে তাঁর কাছে, থাবার উপর মুখ রেখে। টুঁ শব্দটি করে না। ডাক্তার মুখার্জির একটা ছোট টেলিস্কোপ আছে। সেইটে নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে বেরোন, রাতের আকাশ দেখতে। মাঝে মাঝে এর থেকে তিনি প্রচুর আনন্দ আহরণ করেন। অনেক দিন আগে সন্ধ্যার আকাশে বৃহস্পতি গ্রহের একটা চাঁদকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। যদিও একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো, তবু এটা যে বৃহস্পতিরই চাঁদ তাতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। আনন্দে মেতে উঠেছিলেন সেদিন। তার কিছু দিন পরে একটা বইয়েও পড়েছিলেন যে, ছোট টেলিস্কোপ দিয়েও বৃহস্পতির চাঁদ দেখা যায়। তখন থেকে বৃহস্পতি গ্রহ আকাশে উঠলেই তিনি টেলিস্কোপটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কিছুদিন আগে আর একটি জিনিস দেখেও তিনি প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলেন।

টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে একজায়গায় তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো একটা জ্যোতিষ্ক দেখতে পান। তাঁর মনে হল এ জায়গায় তো এ রকম নক্ষত্র আগে দেখিনি। তাহলে বোধ হয় ওটা ধূমকেতু, আমাদের পৃথিবীর দিকে আসছে। দুই দিন পরেই ঠিক দেখা গেল একটা ছোট ধূমকেতু দেখা দিয়েছে আকাশে।

সেদিন তিনি গিয়েছিলেন অ্যানড্রোমিডা (Andromeda) নক্ষত্রপুঞ্জে যে নীহারিকাটা আছে সেইটে দেখতে। এর সম্বন্ধে সেদিন একটা বইয়ে অনেক নূতন খবর পড়েছিলেন, তাই এটাকে আর একবার দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর। অ্যানড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল দুটি কারণে। প্রথম কারণ অ্যানড্রোমিডার সঙ্গে আমাদের রেবতী নক্ষত্র জড়িত। দ্বিতীয় কারণ অ্যানড্রোমিডার সম্বন্ধে গ্রীক উপাখ্যানটি। গ্রীক পুরাণে অ্যানড্রোমিডা সিফিউস রাজার সুন্দরী কন্যা। কিন্তু সে কন্যার জীবনে নিদারুণ অভিশাপ নেমে এসেছিল তার মায়ের জন্য। তার মা বড়াই করে বেড়াতেন যে, তাঁর মেয়ে Neireidesদের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। এই কথা শুনে সমুদ্রাধিপতি Poseidon ক্রুদ্ধ হয়ে সিফিউসের রাজ্যে বিরাট ভয়াবহ এক সামুদ্রিক দানবকে পাঠিয়ে দিলেন। সে সিফিউসের (Cepheus) রাজত্ব ধ্বংস করতে লাগল। শেষে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ভবিষ্যদ্বাণী হল যে, সিফিউস যদি তাঁর মেয়েকে ওই দানবের কবলে দিয়ে দেন, তা হলে তাঁর দেশ রক্ষা পাবে। নিরুপায় সিফিউস শেষে তাঁর মেয়ের হাতে পায়ে শিকল বেঁধে তাকে টাঙিয়ে দিলেন এক সামুদ্রিক পাহাড়ের উপর। সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন বীর পারসিউস। এ গল্পটা

যখন প্রথম পড়েন (কিছু দিন আগেই পড়েছিলেন গল্পটা) তখন কেন জানি না, তাঁর হঠাৎ মনে হয়েছিল আমাদের দেশবিভাগের কথা। মনে হয়েছিল পাকিস্তানই বুঝি ভারতবর্ষের অ্যানড্রোমিডা। যে সর্পিল কুণ্ডলিত নীহারিকাটাকে নিয়ে জ্যোতির্বিদেরা এত গবেষণা করেছেন সেটাকে তিনি কল্পনা করে রেখেছিলেন ওই সামুদ্রিক দানবটার সঙ্গে। পরে অবশ্য তাঁর ভুল ভেঙেছিল যখন পড়লেন এবং প্রত্যক্ষ করলেন যে, সামুদ্রিক দানবটাকে নিয়েও আর একদল নক্ষত্রপুঞ্জ চিহ্নিত হয়ে আছে আকাশে।

সেদিন ওই ছোট সাদা মেঘের মতো নীহারিকাটার দিকে চেয়ে তিনি মনে মনে আকাশ-ভ্রমণ করছিলেন। কয়েকদিন আগেই তিনি গ্রহনক্ষত্রের বই পড়েছিলেন একটা। তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি মনে মনে এমন একটা যানে চড়েছিলেন, যার গতি-বেগ মিনিটে এগারো মিলিয়ন মাইল। চলেছিলেন তিনি অ্যানড্রোমিটার ওই নীহারিকার উদ্দেশে। অঙ্কের হিসাব অনুসারে পৌঁছতে প্রায় দেড় মিলিয়ন বৎসর লাগার কথা। কিন্তু কল্পনায় কি এত সময় লাগে? চাঁদ নিমেষের মধ্যে পার হয়ে গেলেন, তারপরই দেখা গেল আমাদের সুদূরতম গ্রহ প্লুটো, সেটাও পার হলেন। তারপর আমাদের সৌরজগতের এলাকা ক্রমশঃ পার হতে লাগলেন, দেখলেন সৌরজগতের সীমানার কাছাকাছি নানা চেহারার একদল ধূমকেতু ঘোরাফেরা করছে, সময় হলেই পৃথিবীর সীমানায় এসে চমৎকৃত করে দেবে সকলকে। কিছুক্ষণ পরেই লুব্ধক নক্ষত্রের কাছাকাছি এসে পড়লেন, তারপর স্বাতীর, তারপর জ্যেষ্ঠার। চেনা অনেক নক্ষত্রপুঞ্জ পেরিয়ে যেতে যেতে শুধু নক্ষত্রই দেখলেন না, অনেক জ্যোতির্বাষ্পও দেখলেন, জ্যোতির্ময় মেঘের মতো ঝলমল করছে সব, তারপর... ·

হঠাৎ রকেটের চীৎকারে তাঁর স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। রকেট এক ছুটে টিলা থেকে নেমে চলে গেল ডিসট্যাণ্ট সিগনালের কাছে। আর তারপরই ঝিনুকের আর্ত চীৎকার।

ডাক্তার মুখার্জি কল্পনায় অনেকদূর চ'লে গিয়েছিলেন, তাই ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁর কিছু সময় লাগল। করবামাত্রই তিনিও উঠে দ্রুতপদে নেমে গেলেন। রকেট ঝিনুককে কামড়ায় নি, কিন্তু তার চারধারে চীৎকার আর দাপাদাপি করে এমন কাণ্ড করছিল যে, তা কামড়ানোর বাড়া। ডাক্তারবাবু ডাকতেই থেমে গেল রকেট। বিস্রস্তবাসা ঝিনুকের দিকে চেয়ে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন তিনি। ঝিনুক যে ভদ্রলোকের মেয়ে, তা বুঝতে তাঁর দেরি হয়নি। ঝিনুককে তিনি আগে দেখেননি, চিনতে পারলেন না। ঝিনুক কিন্তু তাঁকে চিনেছিল। ডাক্তার মুখার্জি এ শহরে বিখ্যাত ব্যক্তি।

ডাক্তার মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এ সময়ে এখানে কি করছিলেন? আমার মতো আপনারও নক্ষত্র-দেখার বাতিক আছে নাকি?"

ঝিনুক সপ্রতিভভাবে বলল, "না, আমি নক্ষত্র দেখতে আসি নি। একটা ব্যাগ

খুঁজতে এসেছি। আমার এক আত্মীয় একটু আগে ট্রেনে আসছিলেন, তাঁর হাত থেকে একটা ব্যাগ পড়ে গেছে এইখানে। সেইটেই খুঁজছি, যদি পাওয়া যায়—"

"ও, তাই নাকি ? পেয়েছেন ?"

"না, এখনও পাইনি। এইখানেই ঝোপে-ঝাপে আছে কোথাও।"

ডাক্তার মুখার্জি পকেট থেকে টর্চ বার করে দেখতে লাগলেন এদিকে ওদিকে আর রকেট শুঁকতে লাগল ঝিনুককে। একটু পরেই ডাক্তার মুখার্জি বেশ বড একটা ব্যাগ দেখতে পেলেন।

"এই তো রয়েছে একটা ব্যাগ। এইটে কি ?" সুঠাম মুকুজ্যে তুলে নিলেন সেটা।

"এ তো বেশ ভারী দেখছি। এ ব্যাগ তো হাতে ঝুলিয়ে নেবার নয়। কি আছে এতে ?"

কি আছে, তা ঝিনুক জানতো না। সোনা-রূপো, হীরে-জহরত, আফিং-কোকেন যে-কোনও জিনিস থাকতে পারে। যারা বেআইনীভাবে সুবেদার খাঁয়ের মারফত জিনিস পাঠায়, তারাই বলতে পারে, কি আছে ওর মধ্যে। ঝিনুক একজন বাহক মাত্র।

"আমি ঠিক জানি না।"

এর পরই ঝিনুকের গাড়িটা দেখতে পেলেন তিনি। একটু দূরে ছিল সেটা, গাছের আড়ালে।

"ও গাড়িটা কি আপনার ?"

"হ্যাঁ।"

"অত দূরে দাঁড় করিয়েছেন কেন ? সঙ্গে ড্রাইভার আছে ?"

"তবে চলুন, আমিই তুলে দি এটা আপনার গাড়িতে। আচ্ছা দাঁড়ান, বেচুকে ডাকি, বেশ ভারী এটা।"

তিনি পকেট থেকে হুইস্‌ল বার করে ফুঁ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারের আওয়াজ হল একটা। গুলিটা ডাক্তার মুখার্জির বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। লাগল না।

"এ কি কাণ্ড !"

সবিস্ময়ে বলে উঠলেন তিনি। ঝিনুকও অবাক হ'য়ে গেল। প্রথমে সে ঠিক বুঝতে পারেনি। তারপরই পারল। অন্ধকারে সুবেদার খাঁর লম্বা চেহারাটাও দেখতে পেল সে। সুবেদার খাঁ বাইকে চড়ে ঝিনুকের কাছেই এসেছিলেন। এসেই তিনি যখন দেখতে পেলেন যে ঝিনুকের সঙ্গে অপরিচিত কে একজন কথা কইছে, তখনই তাঁর মনে হ'ল, বামালসুদ্ধ ঝিনুক ধরা পড়েছে নিশ্চয়। সম্ভবত পুলিসের কোন লোক। হয়তো সন্ধ্যেবেলা থেকেই লুকিয়েছিল আশেপাশে। অন্য কোন সম্ভাবনা কল্পনাই করতে পারলেন না তিনি। তারপর যখন হুইস্‌ল বাজল, তখন তাঁর আর কোন সন্দেহ রইল না। বুঝলেন পুলিসই এসেছে। তিনি অনায়াসে নিঃশব্দে সরে যেতে পারতেন,

কিন্তু ঝিনুককে পুলিসের কবলে ফেলে আর যে-ই পালাক, সুবেদার খাঁ পালাবেন না। তিনি নিমেষের মধ্যে ঠিক করে ফেললেন, এই পুলিসটাকে জখম করে ঝিনুককে নিয়ে পালাবেন তিনি মোটরে করে। সাইকেলটাও তুলে নেবেন মোটরের কেরিয়ারে। তাঁর সঙ্গে একটা লোডেড রিভলবার সর্বদা থাকে।

ঝিনুক তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সুবেদার খাঁর দিকে। কাছাকাছি এসে বললে, "কি করলেন কি করবেন আপনি! উনি ডাক্তার মুখার্জি। ভাগ্যে গুলিটা লাগেনি ওঁকে। ছি, ছি, কি কাণ্ড করলেন বলুন তো—"

রকেট এতক্ষণ চুপ করেছিল, কিন্তু সুবেদার খাঁকে দেখে আবার তেড়ে গেল সে।

"নো রকেট, কাম্ হিয়ার।"

স্থিরকণ্ঠে আদেশ করলেন ডাক্তার মুখার্জি। রকেট চুপ করল। এগিয়ে এলেন সুবেদার খাঁ।

"আমি খুবই দুঃখিত ডাক্তার সাহেব। আমি আপনাকে ঠিক দেখতে পাই নি। আমি খরগোশ শিকার করতে এসেছিলাম। সন্ধ্যার পর এদিকটায় খরগোশ বেরোয় —আমি প্রায়ই শিকারে আসি। আপনার লাগে নি তো?"

"বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা একটু ছড়ে গেছে। বিশেষ কিছু নয়।"

বেচু গাড়ী নিয়ে হাজির হ'ল। ঝিনুকের দিকে চেয়ে প্রশান্ত হাসি হেসে ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "বেচু আপনার জিনিসটা তুলে দিয়ে আসুক।"

ঝিনুক ডাক্তারবাবুর প্রশান্ত হাসি দেখে অবাক হ'য়ে গিয়েছিল। তার ভয় হচ্ছিল কি কাণ্ডই না উনি করবেন। কিন্তু কিচ্ছু করলেন না তিনি।

"বেচু, এই ব্যাগটা ওই গাড়িতে তুলে দিয়ে এস।"

বেচু ব্যাগ নিয়ে চলে গেল।

ডাক্তার মুখার্জি তখন সুবেদার খাঁকে বললেন, "আপনি কেন গুলি চালিয়েছিলেন তা আমি জানি না। কিন্তু একটা কথা জানি—"

শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন সুবেদার খাঁ।

"কি কথা?"

"এ অঞ্চলে খরগোশ নেই। আমি এ অঞ্চলে প্রায়ই আসি, খরগোশ কখনও চোখে পড়ে নি।"

হাসিমুখে চেয়ে রইলেন সুবেদার খাঁর দিকে। তারপর আর একটু হেসে বললেন, "তবে চোখের দৃষ্টি প্রখর থাকলে হয়তো দেখা যায়। আমার চোখের দৃষ্টি হয়তো তত প্রখর নয়।"

বেচু ফিরে আসতেই বললেন, "আমার ওষুধের বাক্সটা বার করে নিয়ে এস আর বড় টর্চটা।"

ওষুধের বাক্স থেকে টিঞ্চার আয়োডিন বার করে আঙুলে লাগালেন। তারপর

নিজের রুমালটা ছিঁড়ে বললেন, এখানটা ব্যাণ্ডেজ করে দে।" সেটাও আয়োডিন দিয়ে ভিজিয়ে দিলেন।

নীরব বেচু এবার সরব হল।

"কি করে লাগল ওখানে ?"

"টিলা থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম পা হড়কে।"

সুবেদার খাঁ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ডাক্তারবাবুর গাড়ী চলে যাবার পর ঝিনুক বলল, "উনি বুঝতে পারেন নি বোধ হয়।"

"তুমি যে এত বোকা তা তো জানতাম না। উনি সবই বুঝেছেন, কিন্তু কিছু বললেন না। এখন বলে তো কোন লাভও নেই। কিন্তু ওঁর উপর নজর রাখতে হবে। ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমাদের।"

"কি আছে ওর ভিতর ?"

"আমি ঠিক জানি না। তবে খবর পেয়েছি, সোনা রূপা আর জুয়েলারি আছে। হংকং থেকে আসছে। আমার মনে হয় আজ রাত্রেই এগুলোকে বিক্রি করে ফেলা উচিত। ধরা পড়ে গেলেই সর্বনাশ। আমরা হংকং-এর এজেন্ট দুজনকে দশ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছি। অন্তত সে টাকাটা আমাদের পাওয়া দরকার। হরিবোলের মারফত নম্বর ওয়ান বলে পাঠিয়েছিল সোনা রূপা জহরত এলে ভালো দাম দেব। চল, সোজা আমরা হরিবোলের কাছেই যাই।"

ঝিনুক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ?

"চল যাই—"

ঝিনুক তবু নড়ে না।

"ভয় পেয়েছ নাকি ?"

"না ভয় পাই নি। ভাবছি—"

"কি ভাবছ ?"

"ভাবছি আমরা না হয় নরকে নেমেছি নিজেদের স্বার্থের জন্য। একটা আদর্শের জন্যও বলতে পারেন। কিন্তু আপনি নেমেছেন কেন। আপনার স্বার্থ কি শুধু টাকা ?"

"হঠাৎ এ কথা আজ জানতে চাইছ কেন ? এতদিন তো চাও নি"

"হঠাৎ মনে হল কথাটা—"

"মনে হল কেন জান ? আমি মুসলমান এই কথাটা কিছুতে ভুলতে পারছ না, এই তো ?"

"সত্য কথাটা ভুলব কি করে ?"

"মুসলমান হলেও আমি ভদ্র হতে পারি এ বিশ্বাসটাও কি নেই ? বিশ্বাস কর তোমারও যেমন একটা আদর্শ আছে, আমারও তেমনি আছে।"

চুপ করে রইল ঝিনুক।

সুবেদার খাঁ বললেন, "আমি এই উপায়ে যত টাকা রোজগার করি তা তোমাদের

জন্যই খরচ করি। তোমাদের মানে হিন্দু উদ্বাস্তুদের। অনেক ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ দি, অনেকের মেয়ের বিয়ের খরচ দিয়েছি। এ খবর এতদিন কেউ জানত না, আজ তোমাকে এখন বলছি। তোমাকেও বলতাম না, কিন্তু দেখছি, তোমার মনে সন্দেহ জেগেছে। আমাকে সন্দেহ করো না ঝিনুক। আমি মুসলমান হলেও তোমাদের হিতৈষী।'

সুবেদার খাঁর গলার স্বর একটু কেঁপে গেল। এই কম্পনটা অনেকক্ষণ থেকে আশা করছিল ঝিনুক।

বলল, "আপনি হিন্দু উদ্বাস্তুদের ভালবাসেন তা জানি। কিন্তু যে কথাটা জানি না সেইটেই স্পষ্টভাবে এখন জানতে চাইছি। আপনার এ ভালবাসায় কি কোনও স্বার্থ নেই ?"

সুবেদার খাঁ চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "এর উত্তর আর একদিন দেব। হয়তো আমাকে দিতেও হবে না, তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। এখন চল যাই। এখন কথা শুধু বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি, আমি নীচ নই, কোনও বিশেষ মতলব নিয়ে আমি এ কাজে নামি নি।"

ঝিনুক কোনও উত্তর না দিয়ে গাড়িটার দিকে অগ্রসর হল।

ডাক্তার মুখার্জি সেদিন মাঠ থেকে বাড়ি ফিরলেন না। সোজা নিজের ল্যাবরেটরিতে গেলেন। গিয়েই প্রথমে তাঁর আঙুলটা ড্রেস করে নিলেন ভালো করে। রুমাল খুলে স্টিকিং প্লাসটার দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলেন ক্ষতটা। বিশেষ লাগে নি, রক্তও তেমন পড়ছিল না। এ নিয়ে বেশী হৈ-চৈ হয় তা তিনি চাইছিলেন না। কি ভেবে ইন্‌জেক্‌শনও নিয়ে নিলেন নিজেই নিজের পেটে ছুঁচ ফুটিয়ে। বেচু একটু বিস্মিত হচ্ছিল, কিন্তু তার বিস্ময় বাঙ্ময় হল না। ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে তার কৌতূহলের অন্ত ছিল না বলেই বোধ হয় সে কৌতূহলের ধারও ছিল না আর তার কাছে। অতি-ব্যথায় যেমন নির্ব্যথা হয়, অনেকটা তেমনি। ডাক্তারবাবু লিখতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অত রাত্রেও এক রোগী এসে হাজির। বললে, দুবার আপনাকে খুঁজে গেছি। যদি এখন—। ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "কাল দশটার পর এস। এখন কিছু হবে না।"

"এখানে সমস্ত রাত থাকার অসুবিধা আছে ডাক্তারবাবু, ধরমশালায় জায়গা নেই।"

"তুমি হোটেলে থাক গিয়ে। যা খরচ লাগে আমি দেব। তাড়াহুড়ো করে চিকিৎসা হয় না।"

লোকটি চলে গেল।

ডাক্তারবাবু লিখতে শুরু করলেন।

"সঙ্গে সঙ্গে লিখে না ফেললে হয়তো মনের ভাব অনেকখানি উবে যাবে। আমাদের মনের ভাব ইথারের চেয়েও ভলাটাইল (volatile)। আমরা অহরহ মৃত্যুর মুখোমুখি

হচ্ছি, মৃত্যুর অসংখ্য সম্ভাবনার ভিতর দিয়ে সর্বদাই পার হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু সর্বদা সে খবর আমরা পাই না। সামনে একটা বাঘ বা সাপ দেখলে আমরা ভয়ে চমকে উঠি, কিন্তু অসংখ্য মারাত্মক ব্যাকৃটিরিয়া যে সর্বদা আমাদের আচ্ছন্ন করে আছে, এ খবর জেনেও আমাদের তত ভয় করে না। প্রত্যক্ষ দর্শনের জোর অনেক বেশী। স্থান কালের উল্লেখ করবনা, কিন্তু আজ প্রত্যক্ষ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমাকে লক্ষ্য করে রিভলবার ছুঁড়েছিল একটা লোক। পরমায়ু ছিল তাই লাগে নি। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় তার সঙ্গে জড়িত ছিল একটি নারী, যেনারী মা হয়, মেয়ে হয়, প্রেয়সী হয়, তাদেরই একজন। আমি অন্ধকারে পরিষ্কার দেখতে পাই নি, কিন্তু তবু মনে হল মেয়েটি রূপসী। সে বলল সে নাকি ট্রেন থেকে পড়ে যাওয়া একটা ব্যাগ কুড়োতে এসেছে ডিস্‌ট্যান্ট সিগনালের কাছে। কেন সে ওখানে ব্যাগটা নিতে এসেছিল তা জানবার দরকার নেই, যে দরকারের কথা সে বলল তাও যাচাই করবার চেষ্টা আমি করি নি, কারণ সে যা বলল তা যে মিথ্যা তা বোঝবার জন্মে খুব বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না। এই জন্মেই যেন বেশী ভালো লেগে গেল মেয়েটিকে। নিজের কাজ হাঁসিল করবার জন্মে অনায়াসে কেমন অভিনয়টা করে গেল। ওর কথা ভেবে হঠাৎ মনে পড়ল একটি ছোট ছেলের কথা। সে তখন খুবই ছোট ছিল। বছর চার পাঁচের বেশী নয়। চা খাচ্ছি, সে এসে বলল, আমাকে চা দাও। বললাম, একটুকু ছেলে চা খায় না, বড় হলে চা খায়। সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে। তার দৃষ্টির ভাবটা বেশ স্পষ্ট। বড়, মানে কত বড়? আমি তখন পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বললাম, যখন গোঁফ হবে তখন চা খেও। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল এবং একটু পরেই ঘুরে এসে বললে, এইবার দাও। গোঁফ হয়েছে। দেখি সে কালীর দোয়াতে আঙুল ডুবিয়ে ঠোঁটের উপর গোঁফ এঁকে এনেছে। তখন এ দেখে খুব হেসেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি সবই ওই রকম কালী দিয়ে গোঁফ এঁকে কাজ হাঁসিল করবার চেষ্টা করছে। সেটা যে হাস্যকর হচ্ছে তাও বুঝতে পারছে না অনেকে। একটু দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে বেশ মজা লাগে। এই মজার আস্বাদ আজ কিছুটা পেয়েছি—ওই মেয়েটিকে দেখে। তারপরই করুণা হয়েছিল, মনে হয়েছিল, উঃ, জীবনযুদ্ধ কি নিদারুণ ব্যাপার! মানুষকে কোথায় থেকে কোথায় নিয়ে যায়। অনেকে নিপুণভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে, অনেকে পারে না। প্রাণিজগতে এবং উদ্ভিদ্‌জগতেও এ ছদ্মবেশ ধারণের নানারকম বিস্ময়কর নমুনা দেখা যায়। এক বিশেষ জাতের গিরগিটিই শুধু বহুরূপী নামে পরিচিত, কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে—প্রধানতঃ পেটের তাগিদে—অনেককেই বহুরূপ ধারণ করতে হয়। যখন বায়োলজি পড়তাম তখন ওদের নানা কাহিনী পড়ে বিস্মিত হয়েছি। সেদিন একটা দেখলামও। মাঠে বসেছিলাম। পাশেই শুকনো কাঠির মতো পড়ে ছিল কি একটা। অনেকক্ষণ সেটাকে লক্ষ্যই করিনি। হঠাৎ কানের ভিতরটা চুলকে উঠল, আমার কানে কাঠি দেওয়ার অভ্যাস আছে। একটা কাঠির খোঁজে এদিক-ওদিক চাইতেই দেখতে পেলাম সেটাকে। হাত দেওয়া মাত্রই কিন্তু লাফিয়ে চলে গেল। কাঠি নয় ফড়িং। বিজ্ঞান

আমাদের শিখিয়েছে আত্মরক্ষা করবার জন্যই জীবজগতে ছদ্মবেশের প্রয়োজন। উপনিষদ বলেছে, অরূপই আনন্দের প্রেরণায় বহুরূপ ধারণ করেছেন। কি সত্য, তা জানি না। কিন্তু এটা দেখছি বহুরূপ ধারণ না করলে সংসারে চলে না। পিতার কাছে আমার যে রূপ, পুত্রের কাছে সেই রূপেই নূতন রঙের আমেজ লাগাতে হয়। প্রভুর কাছে আমি যে রূপে থাকি, ভৃত্যের কাছে সে রূপে থাকি না। বন্ধুকে যে রূপে দেখা দিই. শত্রুকে সে রূপে দিই না। প্রত্যেকেই আমরা বরাবর রূপ বদলাচ্ছি। অনেক সময় টেরও পাই না যে, বদলাচ্ছি। আজ সন্ধ্যায় যে মেয়েটি চোরাই মাল সরাতে এসে অতগুলো মিথ্যা কথা বলে গেল, সে কি মিথ্যাভাষিণী ছাড়া আর কিছু নয়? আমি জানি সে অনেক-কিছু। সে নিশ্চয় সত্য কথাও বলে, আবার ছলনাও করে। সে প্রাণভরে ভালও বাসে, ঘৃণাও করে। একরূপে থাকবার উপায় নেই আমাদের, আমরা সবাই বহুরূপী। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওই বহুরূপী মেয়েটা যদি ধরা পড়ে তা হলে আর একজন বিচারকবেশী বহুরূপী তাকে সাজা দেবেন। যে সমাজ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না, সেই সমাজকে রক্ষা করতে হলে চোর-ডাকাতকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। চোর-ডাকাতদেরও নিজেদের স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি আছে। যে লোকটি আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল সে সম্ভবতঃ ওই মেয়েটিরই দলের লোক। মেয়েটিকে নিরাপদ করবার জন্যেই গুলি করেছিল আমাকে। নিজের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য কে না গুলি চালিয়েছে পৃথিবীতে? পৃথিবীর সভ্য লোকেরাই তো এ কাজ করে, অনেক সময় তারা এজন্য বীর বলেও গণ্য হয়, খবরের কাগজে তাদের খবর ছাপা হয়, আমরা তাদের ছবি টাঙিয়ে রাখি, ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম ওঠে। আমি যদি ওই লোকটার সঙ্গে যুদ্ধ করে ওকে পেড়ে ফেলতে পারতাম, যদি ওকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতে পারতাম থানায়, তা হলে আমারও জয়-জয়কার হ'ত। হয়তো আমারও নাম কাগজে ছাপা হ'ত। কিন্তু এসব ব্যাপার আমার কাছে বড়ই হাস্যকর মনে হয়। পৃথিবীতে অহরহ যুদ্ধ হচ্ছে, আমিও একজন যোদ্ধা. শুধু শুধু আর একজন যোদ্ধাকে বিপর্যস্ত করা কি উচিত? আমি যাদের বিরুদ্ধে সুযোগ পেলেই গুলি-গোলা ছুঁড়ছি সেই ব্যাকৃটিরিয়াগুলো যদি কোনও মন্ত্রবলে মনুষ্যরূপ ধারণ করে' আমাকে টানতে টানতে থানায় নিয়ে যায়, কেমন হয় তা হলে; তারা যদি বলে আমরা আমাদের নিজেদের বাস্তভূমিতে সুখ-স্বচ্ছন্দে ছিলাম, এই লোকটা নানাভাবে আমাদের উৎখাত করবার চেষ্টা করছে? ও লোকটা আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল, আমি বেঁচে গেছি এইটেই আমার পক্ষে যথেষ্ট, আমি আবার পাল্টা আক্রমণ করবার চেষ্টা করলে ও আবার আক্রমণ করবে এবং এই হৈইও হৈইও ব্যাপার অনেক দূর গড়াবে। আমিও একজন যোদ্ধা, প্রত্যেকেই যোদ্ধা হ'তে বাধ্য, যোদ্ধা না হলে বাঁচা যায় না, কিন্তু আমার মনের কথা হচ্ছে আমি যোদ্ধা হতে চাই না। আমি চাই সবায়ের সঙ্গে যথাসম্ভব বনিবনাও করে দূর থেকে দাঁড়িয়ে যুদ্ধটা দেখি। কিন্তু তা অসম্ভব। কিছুতেই হচ্ছে না। এত চেষ্টা করেও বনিবনাও হয় না কারও সঙ্গে। কেউ কাছে আসে না,

সবাই পালিয়ে যায়, কিংবা অতর্কিতে আক্রমণ করবার চেষ্টা করে। আকর্ষণের যে সূত্রে সবাইকে কাছে টানা যায় সে সূত্র এখনও খুঁজে পাই নি, এইটেই বোধ হয় আমার জীবনের ট্র্যাজেডি, হয়তো অনেকেরই জীবনের ট্র্যাজেডি কিন্তু অধিকাংশ লোক সেটা বুঝতে পারে না, অনুভব করে না। আমিই বুঝেছি সকলের সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা না পড়তে পারলে আনন্দ নেই, কিন্তু সে আনন্দ পাওয়ার যোগ্যতাও আমার নেই বোধ হয়। আমি কাছে এলেই সবাই পালায়, আমাকে দেখতে পেলে কেউ বা গুলি ছোঁড়ে, কেউ বা নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে, অনেকেই আড়ালে নিন্দে করে, কিংবা চক্রান্ত করে, আমাকে অপ্রস্তুত করবার। মানে, আমাকে কেউ চায় না, হয় আমাকে দিয়ে নিজেদের কাজ উদ্ধার করাতে চায়, কিংবা তাদের স্বার্থ-সিদ্ধির অন্তরায় হ'লে সরিয়ে দিতে চায়। সুসভ্য মানবসমাজেও একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের অন্য সম্বন্ধ নেই। আমার পক্ষে এটা মর্মান্তিক। আরও মর্মান্তিক এই জন্যে যে, সকলেই মনে করে আমি খুব সুখী।"

এই পর্যন্ত লিখে চুপ করে বসে রইলেন সুঠাম মুকুজ্যে। অনেকক্ষণ বসে রইলেন। তারপর হাঁক দিলেন, বেচু, চল এবার বাড়ি যাই।

॥ ৮ ॥

ঝিনুক সেদিন রাত্রে ঘোষাল ডাক্তারের আড্ডায় ফিরবার আগে নিজের বাড়ি গেল। ডাক্তার ঘোষালই ঝিনুকের পরিবারের জন্য একটা আলাদা আস্তানা ক'রে দিয়েছিলেন। ঝিনুক অবশ্য প্রায় অধিকাংশ সময়ই ডাক্তার ঘোষালের বাসায় থাকত, কিন্তু তার ছোট বোন শামুক, কাকা যতীশবাবু আর ভাইপো কনক থাকত আলাদা একটা বাড়িতে। সে বাড়ির সমস্ত খরচ চালাত ঝিনুক। কেমন ক'রে চালাত যতীশ-বাবু সে খবর রাখা প্রয়োজন মনে করতেন না। তিনি যেন ধরেই নিয়েছিলেন সংসার চালাবার দায়িত্ব তাঁর নয়। তিনি এমন একটা ভাব দেখাতেন যে, দেশ ছেড়ে তিনি আসতে চাননি, ঘোষালের ধাপ্পায় আর ওই মেয়ে দুটোর জেদে তাঁকে তাঁর জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে চলে আসতে হয়েছে। সুতরাং তারাই সংসার চালাক। তাঁর কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, তিনি যেন কোনও পলাতক রাজা, বাধ্য হয়ে নিজের রাজত্ব ছেড়ে বিদেশে বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে বাস করছেন; বাস করতে হচ্ছে তাঁকে। যারা তাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে এনেছে তারাই তাঁর ভরণ-পোষণ করবে, করতে বাধ্য তারা। তিনি নিজে কিছু কাজ করতেন না, বলতেন—আমি কাজ করতে অভ্যস্ত নই। কাজ করবার দরকার হয়নি কখনও। দেশে খাওয়ার অভাব ছিল না। জমিতে ধান ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, গাছে নারকেল ছিল, দুধের বান ব'য়ে যেত বাড়িতে, তরি-তরকারি প্রচুর হ'ত নিজেদেরই বাগানে। দেশে তাঁর কাজ ছিল থিয়েটার করা, যাচ

খেলা, মাছ ধরা আর মোড়লি ক'রে বেড়ানো। তাঁর এখনও ধারণা, দেশে যদি তিনি থেকে যেতেন তা হলে ওই হৈ-হল্লার তুফানটা কেটে গেলে আবার সাবেকভাবে থাকতে পারতেন তিনি। মুসলমানরা সবাই খারাপ নয়। অনেকেই তাঁকে ভালবাসত। হল্লাটা কেটে গেলে আবার তিনি তাঁর সাবেক আসন ফিরে পেতেন। একটা কথা অবশ্য তিনি চেপে যান। মুসলমানরা যখন তাঁদের বাড়ি আক্রমণ করেছিল, তাঁর দাদাকে এবং ভাইপোকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল, মেয়ে দুটোকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন তিনি যে পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিলেন, ডাক্তার ঘোষাল নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে গুলি চালিয়ে ওই ক্ষিপ্ত জনতার সম্মুখীন না হলে যে এখানে এসে এইসব বাহাদুরি করবার সুযোগও তিনি পেতেন না—এসব কথা যতীশবাবু উল্লেখ করেন না। ঝিনুক এখানে তাঁকে বেশ ভালোভাবেই রেখেছে। তিনি দেশে প্রত্যহ একটা মাছের মাথা খেতেন, এখানেও তাই খান। বাজারের সেরা তরি-তরকারি ঝিনুক তাঁর জন্যে কেনবার ব্যবস্থা করেছে। খাওয়ার পর দই পায়েস মিষ্টান্ন খাওয়া তাঁর অভ্যাস, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় না। খুব সরু আলো চালের ভাত, মুগের ডাল, একদিন অন্তর মাংস (হয় খাসি, না হয় মুরগি, না হয় কাছিম)—কোনরকম অভাব রাখে নি ঝিনুক। তিনি প্রতিদিন যখন খেতে বসেন তখন মনে হয় বাড়ির জামাই খেতে বসেছেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদও জামাইয়ের মতো। ফিতে-পাড় কাঁচি ধুতি, পেটেণ্ট লেদারের পাম-শু, গ্রীষ্মকালে ভালো আদ্দির পাঞ্জাবি, শীতকালে দামী গরম জামা, শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, এমনকি বালাপোশ পর্যন্ত কিনে দিয়েছিল তাঁকে ঝিনুক। কিন্তু তবু তিনি ঝিনুকের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সন্তুষ্ট হতেন যদি বাড়ির কর্তৃত্বটা হাতে থাকত। কিন্তু ঝিনুক সেটা দেয়নি। তাঁর ইচ্ছা ঝিনুক শামুক দুজনে যা রোজগার করবে, সব তাঁর হাতে এনে দেবে, তিনিই যাকে যা দেবার দেবেন। বলতেন, আমি পোষা-ময়না হ'য়ে থাকতে চাই না। আমি ওদের গুরুজন, আমিই বাড়ির কর্তা, আমাকে সেইরকম ভাবে রাখতে হবে। না হলে—। না হলে তিনি যে কি করবেন তা আর খুলে বলতেন না। কিন্তু সর্বদাই একটা চোখ-রাঙানির ভাব নিয়ে থাকতেন। প্রথম চোখ-রাঙানি—আমাকে কেন দেশ থেকে জোর ক'রে আনা হয়েছে। দ্বিতীয় চোখ-রাঙানি—এখানে কেন আমাকে বাড়ির সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি। তাঁর কথাবার্তা শুনলে মনে হ'ত তিনি এসব লাঞ্ছনা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত সহ্য করবেন না। সকালে যখন গরম চায়ের সঙ্গে মাখন-লাগানো টোস্ট আর ডিম-ভাজা আসত, সুট সুট ক'রে খেয়ে নিতেন। তারপর খবরের কাগজ নিয়ে পড়তেন, বর্তমান গবর্নমেণ্টকে গালাগালি দিতেন খানিকক্ষণ, তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করতেন। ওঠ-বস করতেন কয়েকবার, তারপর পার্কে গিয়ে চক্কর দিতেন অবশেষে। এখানে শরীরটাই হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন। কি ক'রে শরীরটা ভাল থাকবে এই নিয়ে ক্রমাগত খুঁতখুঁত করতেন। নানারকম খুঁতখুঁতুনি ছিল তাঁর। তেষ্টা পেয়েছে, এক গ্লাস জল চাইলেন। জল পেয়ে চোঁ চোঁ করে খেয়ে

ফেললেন, তারপর বললেন জলটা ভারি মিষ্টি লাগছে। তার মানেই শরীর খারাপ হয়েছে। আর একদিন সেই একই জল খেয়ে বললেন, জলটা বিস্বাদ লাগছে আজ। এরও ওই এক সিদ্ধান্ত, শরীর খারাপ হয়েছে। সকাল বেলা প্রায়ই পেট চাপড়াতেন। বলতেন, পায়খানা পরিষ্কার হয় না। বলতেন, এদেশের জলই এমন কষা যে পায়খানা পরিষ্কার হওয়া অসম্ভব। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি নানারকম ওষুধ খেতেন। বলতেন, কিছুতে কিছু হয় না। দেশে না ফিরলে শরীর ভালো থাকবে না। পনরো দিন অন্তর ওজন নিতেন। ফিতে দিয়ে নিজের বুক, পেঠ, কব্জি মাপতেন। একটু উনিশ-বিশ হলেই দুশ্চিন্তা। মাথা নেড়ে বলতেন, এ দেশে শরীর টিকবে না। দেশেই ফিরে যেতে হবে। কিন্তু দেশে যাওয়ার কোনও চেষ্টা করতে কেউ কখনও দেখেনি তাঁকে। সকলকে কেবল শাসাতেন, আর নয়, এইবার চলে যাব। পাড়ায় একটা চায়ের দোকান ছিল, সেখানে চপ কাটলেটও পাওয়া যেত, সেখানে প্রায়ই যেতেন যতীশবাবু। রোজ চপ কাটলেট খেতেন আর ফলাও ক'রে গল্প করতেন দেশের। এ দেশের সঙ্গে ও দেশের তুলনামূলক সমালোচনা ক'রে চায়ের দোকানের মালিক গোষ্ঠবাবুর দিকে চোখ পাকিয়ে বলতেন, যথেষ্ট হয়েছে, এ দেশে আর থাকব না মশাই, এ দেশে আমাদের শরীর টেঁকে না।

এরকম একটা বাঁধা খদ্দের বেহাত হয়ে যাবে ভেবে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে নিরস্ত করবার প্রয়াস পেতেন গোষ্ঠবাবু। বলতেন, এ দেশে যখন এসেই পড়েছেন, এইখানেই মন বসিয়ে থাকুন, কোথাও যাবেন না। ক্রমশঃ এ দেশের জল-হাওয়া আপনার সয়ে যাবে। শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়। আমাদের বাড়িও শুনেছি পদ্মার ধারে ছিল এককালে। আমার ঠাকুরদা সেখান থেকে এসেছিলেন। আমরা তিনপুরুষ এ দেশে বাস করছি। খাসা আছি। এ দেশের জল-হাওয়া বেশ বরদাস্ত হয়ে গেছে আমাদের। দেখুন আমার বুকের ছাতি আর হাতের গুলি। রোজ আধ সের চালের ভাত হজম করছি। তোফা আছি। থেকে যান, যাবেন না। যতীশবাবু সাময়িকভাবে বোধ হয় আশ্বস্ত হতেন। দু-চার দিন আর যাওয়ার কথা তুলতেন না। তারপর আবার তুলতেন কিছুদিন পরে। এই প্রসঙ্গটা নিয়ে বারবার আলোচনা করাও তাঁর সময় কাটাবার একটা উপায় ছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত হয়তো চলেই যেতেন, কিন্তু একটা ব্যাপারের জন্য তিনি এ দেশ থেকে নড়তে পারছিলেন না। আর সেটা এমন ব্যাপার যে, কাউকে বলাও চলে না। তিনি যদিও কোনও প্রমাণ পাননি কিন্তু তিনি এটা বুঝতে পারছিলেন যে, ঝিনুক-শামুক দুজনেই দেদার টাকা রোজগার করছে। কিভাবে রোজগার করছে তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে চাইতেন না, কিন্তু তিনি যে সে উপার্জনের কোনও অংশ পাচ্ছেন না, এতেই তিনি বড় ক্ষুব্ধ হয়ে থাকতেন মনে মনে। পাকিস্তান থেকে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন, প্রচুর টাকা নিয়ে এখানে যদি আসতে পার তা হলে এখানেও বেশ সুখে থাকতে পারবে। টাকা ছাড়তে পারলে এখানেও বেশ আরামে থাকা যায়। যতীশবাবু প্রচুর টাকার আভাস পাচ্ছিলেন,

কিন্তু তা ধরতে ছুঁতে পারছিলেন না, সেইটে হস্তগত করবার আশাই ছিল তাঁর এখানে থাকার প্রধান আকর্ষণ।

সেদিন অনেক রাতে ঝিনুক যখন এল তখনও তিনি জেগে বসে আছেন। ঝিনুক শামুক বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত তাঁর ঘুম হয় না। বাড়িতে তিনি একা থাকেন, কনককে পর্যন্ত ঝিনুক বোর্ডিংয়ে দিয়ে দিয়েছে। তাঁর ঘুম আসে না। ডিটেকটিভের মনোভাব নিয়ে জেগে থাকেন যতীশবাবু। ভাবেন, ওরা রোজই নিশ্চয় কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে আসে। টাকাটা রাখে কোথায়? কত টাকা আনে? এইসব চিন্তায় তাঁর ঘুম হয় না। তিনি ওত পেতে বসে থাকেন।

ঝিনুকের সঙ্গে সত্যিই সেদিন অনেক টাকা ছিল। ওরা যে চোরা-কারবারে লিপ্ত তার থেকে মাঝে মাঝে বেশ দমকা টাকা পাওয়া যায়। সেদিন সন্ধ্যার সময়ই ঝিনুক পাণ্ডার কাছে থেকে হাজার টাকা পেয়েছিল। তারপর ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছ থেকে যে ভারী ব্যাগটা তারা তুলে নিয়ে গিয়েছিল তাতে অনেক দামী মাল ছিল। সুবেদার খাঁ মালটাকে নিজের হেফাজতে রাখতে ভরসা পান নি। ডাক্তারবাবুর আপাতনিরীহ ব্যবহারে তাঁর সন্দেহ ঘোচেনি। যে ধনী ব্যবসায়ীটি সাধারণতঃ তাঁদের মাল গোপনে কেনেন, সুবেদার খাঁ সেইদিন রাত্রেই ব্যাগটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কাছে। এই ক্রেতার সঙ্গে এঁদের কারো প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। পরিচয় রাখাটা নিরাপদ নয়। এদের কারবারটা চলে বড় অদ্ভুত উপায়ে। শহরের প্রান্তে হরিবোল নামে এক অন্ধ বৈরাগী থাকে। তার বাড়িতেই চোরা মালটা আনা হয় প্রথমে। সেইখানেই মালটার একটা দামও ঠিক করে ফেলেন সংগ্রাহকরা। তারপর সেই জিনিসগুলো আর দামের বার্তা নিয়ে একটা রিক্শায় চড়ে হরিবোল যায় সেই ধনী ক্রেতার কাছে। ধনী ক্রেতা হরিবোলের মারফতই একটু দর-দস্তুর করেন। তারপর মালটা কিনে নেন। হরিবোলই রিক্শায় করে মাল নিয়ে যায়, টাকাও নিয়ে আসে। এরজন্য প্রতিবারে সে এক শ' টাকা নগদ পায়। হরিবোল ঠিক করেছে ওই টাকা জমিয়ে সে ছোট-খাটো একটি মন্দির করবে তার কুঁড়েঘরের পাশে, আর সে মন্দিরের নাম দেবে হরিবোল মন্দির। সুবেদার খাঁ তাকে প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন এই ব্যবসার কথা যদি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পায় তা হলে তার মৃত্যু হবে। আর সে যদি ভালোভাবে কাজ করতে পারে তা হলে তার মজুরি ছাড়াও পরে আরও কিছু টাকা "বোনাস" স্বরূপ তাকে দেওয়া হবে। হরিবোল যে শুধু টাকার লোভেই এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল তা নয়, এর সঙ্গে কৃতজ্ঞতার আমেজও ছিল কিছু। ডাক্তার ঘোষালের রোগী সে। প্রায়ই পেটের অসুখে ভোগে এবং ডাক্তার ঘোষাল বিনা পয়সায় তার চিকিৎসা করেন। ডাক্তার ঘোষালই ওকে এই কাজের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। দিনের বেলা হরিবোল নাকি ঠকঠক করে হরিনাম গেয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে বেড়ায়। এই লোকই যে এত বড় একটা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে তা কল্পনা করা সত্যই শক্ত। তা ছাড়া সে অন্ধ বলে আরও সুবিধা হয়েছিল। কারও মুখ দেখতে পেত না।

সেদিন ব্যাগের ভিতর ছিল সোনারূপোর বাট আর কিছু জহরত, চুনি পান্না হীরে, এই সব। সুবেদার খাঁ এর দাম ঠিক করেছিলেন পঁচাত্তর হাজার টাকা। কিন্তু ধনী ক্রেতাটি এ দাম দিতে রাজী হন নি। জিনিসগুলি দেখে তিনি বললেন, এসব পাচার করতে আমাকে আরও অনেক খরচ করতে হবে, বেগও পেতে হবে প্রচুর। তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশী দিতে চান নি। সুবেদার খাঁ রাজী হলেন না এ টাকায়। অবশেষে ষাট হাজার টাকায় রফা হয়। হরিবোলকে সেদিন কয়েকবারই রিক্‌শায় করে যাতায়াত করতে হয়েছিল। অবশ্য প্রত্যেকবারই আলাদা রিক্‌শায়। সুবেদার খাঁ এসব ব্যাপারে খুব-সাবধানী। এ ব্যবসায়ের বারোজন অংশীদার। এই শহরে চারজন —ঘোষাল, পাণ্ডে, সুবেদার খাঁ আর ঝিনুক। বাইরের আটজন। সকলেই সমান অংশ পায়। হংকং-এর দুজন অংশীদারকে দশ হাজার টাকা আগেই দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। ঝিনুকের অংশে যে পাঁচ হাজার টাকা হয়েছিল, সে টাকাটা সে তো, পেয়েই ছিল, সুবেদার খাঁ নিজের অংশের টাকাটাও সেদিন দিয়েছিলেন তাকে। ঝিনুক প্রথমে নিতে চায়নি। সুবেদার খাঁ কিন্তু যখন বললেন যে না নিলে তিনি এ ব্যবসার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখবেন না, তখন ঝিনুককে রাজী হতে হল। কারণ সুবেদার খাঁর সাহায্য না পেলে এ ব্যবসা অচল। ঝিনুক জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনার অংশের টাকা আমাকে দিতে চাইছেন কেন ? সুবেদার খাঁ উত্তর দিয়েছিলেন, তোমার আদর্শের সঙ্গে যে আমার আদর্শের কিছুমাত্র অমিল নেই সেইটে প্রমাণ করবার জন্য। আগেই তোমাকে বলেছি, এই ব্যবসায়ের সব টাকা আমি হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্যই খরচ করছি, ও টাকা আমি নিজের কাজে লাগাই না, আমি যা মাইনে পাই তাতেই আমার স্বচ্ছন্দে চলে যায়। বিহার রায়টে আমার পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আমি এখন একা। আমার বেশী টাকার দরকার নেই। টাকাতে আমার লোভও নেই। এভাবে আমি এ টাকা রোজগার করছি কেবল দুঃস্থ উদ্বাস্তুদের সাহায্য করবার জন্য, রূপকথার রবিনহুড আমার আদর্শ। গরীব মুসলমান উদ্বাস্তুদেরও সাহায্য করতে হবে। কিন্তু আপাতত তার সুযোগ নেই। তা ছাড়া যারা নিপীড়িত অত্যাচারিত অসহায় তাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান নেই, তারা সব এক জাত, তারা গরীব। তাদের কারও উপকারে এ টাকা লাগলে তা সার্থক হবে। তুমি যখন এ পথে নেমেছ তুমিই এ টাকা নাও। এর পর ঝিনুক আর কিছু বলতে পারে নি। কিন্তু তার সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে এত টাকা সে রাখবে কোথায় ? ব্যাংকে বা পোস্টাফিসে রাখবার উপায় নেই, পুলিস ধরবে। বাড়িতে রাখা আরও বিপজ্জনক, যতীশবাবু শ্যেনদৃষ্টি মেলে বসে আছেন। অবশেষে আধুনিক-মনা ঝিনুক তাই করতে বাধ্য হয়েছিল যা প্রাচীন-পন্থীরা করতেন। একটা বড় শিশিতে নোটগুলো পুরে সেটা পুঁতে রেখে এসেছিল একটা মাঠের প্রান্তে। লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য জায়গাটা ঢেকে দিয়েছিল ঘাসের চাপড়া আর ইটপাটকেলের স্তূপ দিয়ে। এ কাজ সহজসাধ্য নয়। তাই প্রত্যহ সেখানে সে যেতে পারত না। হাতে বেশী কিছু টাকা জমলে যেত। তাও গভীর রাত্রে। অন্য সময়ে টাকাটা সে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে

ঘুরত। এবার ভাবছিল অন্য আর এক জায়গায় পুঁতে রাখবে। কিন্তু এত রাত্রে তা করবার সুবিধা ছিল না।

সুবেদার খাঁ যখন ঝিনুককে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেলেন, তখন গভীর রাত। ঝিনুকের সাড়া পেয়ে যতীশবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। বাড়িতে ওঁদের কথাবার্তা খাঁটি পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় হয়। সেই ভাষাতেই তিনি ঝিনুকের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কলকাতার ভাষায় অনুবাদ করলে তা নিম্নলিখিতরূপ হয়।

"কি রে ঝিনুক, ফিরলি? আজ বড় রাত হল। এত রাত অবধি কোথায় ছিলি? ঘোষালবাবুর বাসায়? সেখানে তাসের আড্ডা খুব জমেছিল বুঝি?"

"সে তো রোজই জমে।"

আজ তা হলে এত বেশী দেরি হল কেন, তা জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না তাঁর, যদিও ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। বেশী দেরি হওয়া মানেই যে বেশী টাকা রোজগার করা এ তিনি ধরেই নিয়েছিলেন। ও মেয়ে যে বিনা মজুরিতে বেশী কাজ করবে এ তিনি বিশ্বাসই করতেন না, কিন্তু কথাটা প্রকাশ করতে পারছিলেন না তিনি। কোনদিনই পারেন না। একটু থেমে তাই বললেন, "শামুকও আজ আসেনি এখনও।"

শামুক মিস্টার সেনের বাড়িতে কাজ করে। সে বাহাল হয়েছিল মিস্টার সেনের পক্ষাঘাতগ্রস্ত পত্নীর শুশ্রূষা করবার জন্য, কিন্তু ক্রমশঃ সে মিস্টার সেনের বাড়িতে কর্ত্রী হয়ে উঠেছে। মিস্টার সেনের উত্থান-শক্তি-রহিতা পত্নীর নির্দেশে বাড়ির সব কাজই করে। এমন কি মিস্টার সেনের 'টাই'ও বেঁধে দেয়। মিসেস সেন নাকি রোজ বেঁধে দিতেন। মিসেস সেন অসুস্থ হয়ে পড়ার পর মিস্টার সেন নিজেকে নাকি বড়ই অসহায় মনে করতেন। বন্ধুদের বলতেন, আমি এখন কোথায় আছি জান? যে নৌকো ডুবছে তার উপর দাঁড়িয়ে আছি। সে নৌকো থেকে পালাবার উপায় নেই, আমার পা দুটো নৌকোর পাটাতনের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে, কর্তব্যের দড়ি দিয়ে। বলতেন আর হাসতেন। তাঁর সেই কুলকুচো-হেঁচকি হাসি।

ঝিনুক বলল, "হয়তো আজ মিসেস সেনের অসুখ বেড়েছে। প্রায়ই তো তাঁর ফিট হয়। হয়তো রাত্রে থাকতে হবে—"

যতীশবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "বেশী কাজ করলে তোরা ওভারটাইম পাস না? কত করে দেয়?"

ঝিনুক কোনও জবাব না দিয়ে হেঁট হেঁট হয়ে তার বাক্সটা খুলছিল টাকাগুলো রেখে দেবে বলে। হঠাৎ সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে নিঃশব্দ চরণে যতীশবাবু তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

"আপনি উঠে এলেন কেন?"

"না, এমনি। জিজ্ঞাসা করছিলাম তোরা কত ক'রে ওভারটাইম পাস।"

সর্পিণীর মতো ফোঁস ক'রে উঠল ঝিনুক।

"তা জেনে আপনার লাভ কি ?"

"লাভ-লোকসানের কথা নয়, আমি তোমাদের কাকা, তোমাদের বিষয় সব কথা জানবার অধিকার আমার নেই কি ?"

"না। সে অধিকার আপনি অনেক আগেই হারিয়েছেন। আপনি যদি কাকার কর্তব্য করতেন আমরা অন্যরকম হতাম। আপনি আমাদের গুণ্ডার মুখে ফেলে দিয়ে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছিলেন। ডাক্তার ঘোষাল না থাকলে আমাদের যে কি হ'ত তা ভাবতেও পারি না। তবু আপনাকে আমরা ত্যাগ করিনি। শুধু তাই নয়, যতটা সম্ভব সুখে রাখবার চেষ্টা করেছি।"

"তা না করলেই পারতে। এভাবে বসে বসে ভাল লাগে নাকি ?"

"বসে না থেকে আপনি করবেন কি ? আপনি ম্যাট্রিকও পাশ করেন নি, এক মজুরগিরি ছাড়া অন্য কাজ আপনার জুটবে না, আত্মসম্মান থাকলে তাই করতেন। তা তো পারেন না, সুতরাং আপনাকে বসেই থাকতে হবে। যতদিন আমাদের সামর্থ্যে কুলুবে আপনার খাওয়া-পরার কষ্ট হবে না। এর বেশী আমাদের কাছে দাবি করবেন না কিছু।"

"আমি দেশে ফিরে যেতে চাই। জলিল মিঞা খবর পাঠিয়েছে যে, সেখানে ফিরে গেলে আমাকে তার মাছের ব্যবসার অংশ দেবে, আর আমাকে ব্যবসার ম্যানেজার ক'রে দেবে।"

"বেশ, আপনি ফিরে যান। আমরা ফিরব না।"

"ফিরতে হলে টাকা চাই। অন্তত হাজার কয়েক টাকা না হলে তার ব্যবসার অংশীদার হতে পারি না। তোমরা দুই বোনে ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা রোজগার করছ, আমাকে একটি পয়সাও দাও না, আমাকে পোষা ময়না বানিয়ে রেখেছ। এ আমি আর সহ্য করতে পারি না।"

একটু থেমে তারপর কোমল কণ্ঠে মিনতির সুরে বললেন, "আমাকে রোজ কিছু কিছু করে দে, তাই জমিয়েই আমি দেশে ফিরে যাব। তোরা যা রোজগার করিস তার অর্ধেক দিলেই এক বছরের মধ্যেই আমি দেশে ফিরতে পারি। রোজ কিছু কিছু করে দে। আজ কত এনেছিস দেখি—"

হঠাৎ যতীশ ঝিনুকের হাতটা ধ'রে ফেললেন।

"দেখি, লক্ষ্মীটি কত পেয়েছিস আজ, দেখি—"

ঝিনুক এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে দেখলে যতীশের গায়ে অসুরের শক্তি। সহজে হাত ছাড়ানো যাবে না।

"আমার হাত ছেড়ে দিন। জোয়ান মেয়ের গায়ে হাত দিতে লজ্জা করে না আপনার! ছেড়ে দিন।"

"যতক্ষণ না আমায় টাকা দিবি, ছাড়ব না হাত। আমাকে পর মনে করছিস কেন ঝিনুক ? এত টাকা রোজগার করছিস, শেষ পর্যন্ত তা নিয়ে কি করবি ? আমার সঙ্গে

পরামর্শ করিস না কেন, আমি তোর কাকা, আমাকে পোষা ময়না করে রেখেছিস কেন? শোন, শোন, কথা শোন।"

"আমার হাত ছেড়ে দিন।"

যতীশবাবুর হাতের মুষ্টি দৃঢ়তর হল। চোখে মুখে লোভ মূর্ত হয়ে উঠল কুৎসিত-ভাবে। ঝিনুকও হার মানবার পাত্রী নয়। ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। ঝিনুকের কাপড়-চোপড় বিস্রস্ত হয়ে পড়ল। তার ভয় হতে লাগল, বুকের ভেতর থেকে নোটের বাণ্ডিলগুলো না পড়ে। হঠাৎ সে কামড়ে ধরল যতীশের হাতটা। তার ধারালো দাঁত করকর করে বসে গেল যতীশের হাতের মাংসে।

"উঃ, কি করিস রাক্ষুসী! ছাড় ছাড়, ছাড়—"

নিমেষের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল ঝিনুক। রাস্তায় বেরিয়ে ছুটতে লাগল। চীৎকার করে উঠল একটা পেঁচা, ডেকে উঠল একদল শেয়াল। ঝিনুক ছুটতে লাগল। কিছুদূর গিয়েই তার মনে হল এভাবে কোথায় চলেছি। এখনি তো পুলিসের হাতে পড়ে যেতে পারি। দূরে একটা চৌকিদারের হাঁকও শোনা গেল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে একটা বট গাছের তলায়। ভাবতে লাগল কোথায় যাব এখন? ডাক্তার ঘোষালের বাড়ি? সেখানেই রাখব টাকাগুলো? তৎক্ষণাৎ মনে হল, না, ওখানে রাখা নিরাপদ নয়। ডাক্তার ঘোষালের টাকার প্রতি লোভ নেই তা ঠিক, কিন্তু তিনি জুয়াড়ী মানুষ, টাকা হাতে পেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। তা ছাড়া মিস্টার সেনের ওই মেয়েটা, রং-মাখা কাজল-পরা, পেট-কাটা কাঁধ-কাটা ব্লাউস-পরা ওই প্রেতিনীটা এখন ভর করে আছে ওঁর উপর। ও এলেই ঘোষালের চোখের দৃষ্টিতে যে ভাষা ফুটে ওঠে তার অর্থ ঝিনুকের অবিদিত নেই। আবেগের মাথায় এক নিমেষে ওর হাতে সব তুলে দিতে পারে ঘোষাল। না, ঘোষালের কাছে টাকা রাখা চলবে না। পরমুহূর্তেই মনে হল 'কাউ'কে কি বিশ্বাস করা চলবে? সে তো তাকে ভক্তি করে। তার সাহায্য নিয়ে কি দু-একদিনের জন্য টাকাটা কোথাও লুকিয়ে রাখা যায় না? পরমুহূর্তেই মনে পড়ল তার মায়ের কথা। ঝিনুক তাকে নিজের হার আর চুড়িগুলো দিয়ে বলেছিল, এইগুলো নিয়ে তুমি এখন চলে যাও। পরে তোমাকে আরও কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব। সে কি চলে গেছে? অত সহজে চলে যাওয়ার পাত্রী সে নয়। তার হাতে যদি কোন রকমে টাকাটা পড়ে যায় তাহলে টাকাটা আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু এ টাকা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না ঝিনুক। এই টাকার জোরেই তার স্বপ্নকে সফল করে তুলবে সে। এর থেকে একটি আধলা সে কাউকে দেবে না। সুবেদার খাঁর কথা মনে হল। তাঁর হাতে গিয়ে টাকাটা তুলে দিলে অবশ্য ভয় নেই। কিন্তু তাঁর বাসাটা কোথায় তা সে ঠিক জানে না। তিনি এক ঠিকানায় বেশী দিন থাকেন না, প্রায়ই বাসা বদল করেন। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ঝিনুক ভাবতে লাগল। নিজেকে হঠাৎ বড় অসহায় মনে হল তার।

॥ ৯ ॥

ঝিমুকের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে নিদারুণ খবরটা পেয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন গণেশ হালদার। কিছুক্ষণের জন্য তিনি যেন সমস্ত সুখদুঃখের অতীত হয়ে নিথর নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দেহটা দাঁড়িয়েছিল মাটির উপর কিন্তু তাঁর অদেহী নির্বিকার সত্তা যেন দেহ ছেড়ে চলে গিয়েছিল দূর আকাশলোকে, কিছুক্ষণের জন্য সেই মহাশূন্য থেকে তিনি যেন উপলব্ধি করছিলেন বিরাট বিশ্বের বিশালত্ব আসক্তি-শূন্য হয়ে। তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি যেন একটা অতি ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মতো ভেসে বেড়াচ্ছেন মহাশূন্যে। তিনি যেন মানুষ নন, মনুষ্যত্বের উপর সমস্ত দাবি যেন হারিয়ে ফেলেছেন চিরকালের জন্য।

হঠাৎ দাইয়ের গলার স্বর শুনে সংবিৎ ফিরে পেলেন তিনি।

"মাস্টারবাবু কাঁহা গেল, আপনের পুড়ি (লুচি) এনেছি। গরম গরম খেয়ে লেন। মাস্টারবাবু—"

ভিতরে ঢুকতে হল গণেশ হালদারকে। দাই টেবিলের উপর সব সাজিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"গরম গরম খেয়ে লেও বাবু। হাঁথ মুখটা আগে ধুয়ে লিন্। বালতিতে জল আছে বারান্দায়, এই যে গামছা—"

তাড়াতাড়ি গামছা এগিয়ে দিলে দাই। "এই ডিমের ডালনা আর গোরবা (চিংড়ি) মাছের মালাইকারি মাইজি নিজে হাতে বানিয়েছেন আপনের জন্যে। যদি ভালো লাগে বলবেন, আরও এনে দেব। এই ডাল আলুর দম হামি বানিয়েছি। পেট ভরে খেয়ে লেন বাবু। আপনার শরীরটা দুবলা, ভাল করে খেয়ে শরীরটা ঠিক করে লেন। বাবুর এখানে খাবার কোন দুখ নেই।"

গণেশ হালদার দাইয়ের দিকে চেয়ে দেখলেন। মনে হ'ল, মাকেই যেন মূর্ত দেখলেন ওর মধ্যে। ওই কালো চেহারা, জরাগ্রস্ত মুখ, কিন্তু সমস্তকে উদ্ভাসিত উজ্জ্বল করে তুলেছে অন্তরের আলো, ভালবাসার আলো। দাই তাঁকে রোজ দাঁড়িয়ে খাওয়ায়, মা যদি থাকত ঠিক এমনিভাবেই নিশ্চয় খাওয়াত, হঠাৎ মনে হ'ল তাঁর। মায়ের কথা তাঁর রোজই মনে পড়ে, যে মা তাঁর একলার নিজস্ব এতদিন মনের কোণে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, মা নিশ্চয়ই কোথাও বেঁচে আছেন, একদিন হয়তো দেখা হবে। সেই আশার ক্ষীণ আলোটা হঠাৎ নিবে গেল। নিবে গিয়ে কিন্তু অন্ধকারে ছেয়ে গেল না চারদিক, একটা নূতন ধরনের আলো যেন জ্বলে উঠল কোথায়। যে শিখা থেকে এ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা তিনি দেখতে পেলেন না, কিন্তু যে স্নিগ্ধ নূতন আলোতে তাঁর অন্তর প্লাবিত হল সেই আলোতে তিনি দেখতে পেলেন দাইকে আর দাইয়ের পিছনে আর একটি অবগুণ্ঠিতা নারীকে, কুয়াশায় ঢাকা এক রহস্যময়ী মূর্তিকে, ডাক্তার মুখার্জির স্ত্রীকে। তিনি তাঁকে হোটেলে খেতে দেন নি।

"আরও গরম পুড়ি এনে দি—"

কোনও উত্তর দেবার আগেই দাই ছুটে গেল থত্‌পত্‌ করে। গণেশ হালদার আর পারলেন না. টপটপ করে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তাঁর মনের মধ্যে একটা অনুচ্চারিত ভাব মন্ত্রের মতো ধ্বনিত হ'তে লাগল, কিছু হারায় নি, কিছু হারায় না।

সাধারণতঃ খেয়েই তিনি শুয়ে পড়েন। সেদিনও অভ্যাসমতো শুয়েছিলেন, কিন্তু ঘুমুতে পারলেন না। অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে শুয়ে রইলেন, ঘুম এল না। মায়ের চেহারাই বারবার ফুটে উঠতে লাগল মনে। মায়ের নানা চেহারাই। ছেলেবেলায় মা তাঁকে পদ্মার পাড়েই স্নান করিয়ে দিতেন, পদ্মার জলে নামতে দিতেন না। গামছা দিয়ে জোর করে তাঁর মুখ আর কানের পাশ ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে দিতেন. তারস্বরে কাঁদলেও ছাড়তেন না। জোর করে' ঘাড় ধরে' ভাত খাইয়ে দিতেন তাঁকে. বড় বড় ডেলা পাকিয়ে ভাতের গ্রাস মুখে পুরে দিতেন ; অনেক বড় বয়স পর্যন্ত কাপড়-জামা পরিয়ে দিতেন তাঁকে. চুল আঁচড়ে দিতেন। যেদিন সরু চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে মাথার ময়লা বার করতেন সেদিন কি প্রাণান্তকর ব্যাপার হত। সব আজ মধুময় স্মৃতি রয়ে গেল এক নিমেষে। সত্যি মা নেই? ঝিনুক যা বলল হঠাৎ মনে পড়ল মা একদিন মেরেছিলেন তাঁকে, খেতেও দেন নি, তারপর গোবর খাইয়ে পদ্মায় স্নান করিয়ে তবে খেতে দিয়েছিলেন। অপরাধ ছিল, মিথ্যাভাষণ। বারবার তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল কখনও মিথ্যা কথা বলব না। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন তিনি এ-যাবৎ। কিন্তু কি লাভ হয়েছে তাতে? মিথ্যাবাদী, মুখোশ-পরা ভণ্ড পাজিদেরই তো জয়জয়কার। সত্য তো তাঁকে বাঁচাতে পারল না। তিনি তো তলিয়ে গেলেন। তখন বিদেশে গিয়েছিলেন প্রতি ডাকে মাকে চিঠি লিখতে হ'ত। তিনি কিন্তু খুব কম চিঠি লিখতেন, বুলি লিখত প্রায়ই। তাঁর শেষ চিঠিতে লিখেছিলেন বাবা, পড়াশুনা মন দিয়ে কোরো, ধর্মে মতি রেখো. এর চেয়ে বড় আর কোন কামনা নেই আমার। তুমি মানুষ হও, দেশের দশের মুখ উজ্জ্বল কর, তা হলেই আমার বুক ভরে উঠবে তোমাকে পেটে ধরা সার্থক হবে। মায়ের এ চিঠি তাঁর কাছে নেই। বিলেত থেকে আসবার সময় অনেক তুচ্ছ ফোটোগ্রাফ, পিক্‌চার পোস্টকার্ড সংগ্রহ করে এসেছিলেন, কিন্তু এ চিঠিখানা যত্ন করে' রাখবার কথা তাঁর মনে হয়নি। এ চিঠির যে একদিন এত মূল্য হবে তা কে ভেবেছিল তখন। মায়ের ফোটোও নেই। সেকালের মেয়েরা ফোটো তোলাতে চাইতেন না। বাইরে মায়ের সব চিহ্ন অবলুপ্ত হয়েছে। যে ঘরে তিনি রাধাবল্লভের পূজা করতেন সে ঘর পুড়ে গেছে। যে গ্রাম তাঁর নিজের ছিল. যে গ্রামের নদী ঘাট মাঠ বাগান খাল বিলের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন তিনি. বদলে গেছে সে গ্রামের চেহারা। যুগ যুগান্তরে পরিণত হয়েছে। তবু কি মা মরেছেন? না, মরেন নি। তিনি প্রবলভাবে বেঁচে আছেন তাঁর সারা হৃদয় জুড়ে। সেখানে তিনি শুধু জীবন্ত নন, তিনি মহীয়সী। অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে শুয়ে রইলেন তিনি।

অনেকবার এপাশ ওপাশ করলেন। বাইরের একটানা ঝিল্লী-ঝঙ্কারের দিকে কান পেতে রইলেন। ঘুম এল না। শেষে উঠে আলো জেলে ডায়েরি লিখতে লাগলেন।

"মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে আজ অনেক কথা মনে হচ্ছে। তিনি যে মরেন নি, এই কথাই কেবল মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে তিনি আরও বেশী করে বেঁচে আছেন। সারা বিশ্বে তাঁর স্নেহ ছড়িয়ে পড়েছে। একটু আগে যে বুড়ী দাইয়ের স্নেহ আকুলতা দেখলাম তার মাঝে তিনি আছেন, যে মহিমময়ী রমণী অন্তঃপুরের অন্তরাল থেকে আমার মঙ্গল চিন্তা করছেন, যাঁকে কখনও দেখি নি, হয়তো কখনও দেখব না, তাঁর মাঝেও তিনি আছেন। মায়ের কখনও মৃত্যু হয় না। তিনি জগদ্ধাত্রী, চিরকাল তিনি জগৎকে ক্রোড়ে ধারণ করে রক্ষা করেন, তাঁর যেদিন মৃত্যু হবে সেই দিনই মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে জগৎ। তিনি নানারূপে অহরহ সর্বত্র আছেন বলেই জগৎ টিকে আছে, তিনি যেদিন থাকবেন না জগৎও থাকবে না। আমাদের শাস্ত্রে যে শক্তিকে দেবী বলে' কল্পনা করা হয়েছে, তাঁর অনেক রূপ। দুর্গা, চণ্ডী, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী সবই তাঁর রূপ। নানা রূপে তিনি আমাদের চালিত করছেন জীবনের নিত্য নূতন পথে, যে পথ অনাদি অনন্ত, যে পথের বাঁকে বাঁকে নিত্য নূতন লীলা। শুধু তিনি আমাদের চালিত করছেন না, মঙ্গলকে রক্ষা করছেন অমঙ্গলের হাত থেকে, পাঁকের ভিতর থেকে ফোটাচ্ছে পদ্ম, পশুকে রূপান্তরিত করছেন সহৃদয় মানুষে। এর জন্যে প্রয়োজন হলে ভীষণাও হতে হয়েছে তাঁকে, অস্ত্রও ধারণ করতে হয়েছে। নিবীর্য কাপুরুষের অন্তরে শৌর্য সঞ্চার করবার জন্য তিনিই তো যুগে যুগে বর্ষণ করেছেন অগ্নিবাণী। মনে পড়ছে বিদুলার কথা, মনে পড়ছে লক্ষ্মীবাঈয়ের কথা, মনে পড়ছে প্রীতি ওয়াদ্দারের কথা। অনুভব করছি এঁদের সঙ্গে আমার মা-ও একাসনে বসে আছেন। আমার গর্বের আজ অন্ত নেই। শুধু যে এঁদের সঙ্গেই বসে আছেন তা নয়, পৃথিবীর সব বীরপুরুষদের সঙ্গেও বসে আছেন। পৃথিবীতে নীচতা, হীনতা, পাশবিকতা, মূর্খতার বিরুদ্ধে যাঁরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা নারী কি পুরুষ এ প্রশ্ন অবান্তর। বানার্ড শ'য়ের সেন্ট জোয়ান নামক বিখ্যাত নাটকে জোয়ানের মুখ দিয়ে এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন, 'আমি সুন্দরী ছিলাম না, আমি কাঠখোট্টা গোছের ছিলাম, আমি সৈনিক ছিলাম। আমি পুরুষ হলেও ক্ষতি ছিল না। পুরুষ হ'তে পারি নি বলে আমার দুঃখ হয়। তবে আমি পুরুষ হলে হয়তো তোমরা আমাকে নিয়ে এতটা মাততে না। কিন্তু আমি যাই হই, আমার মাথা আকাশ স্পর্শ করেছিল, ঈশ্বরের মহিমা নেমে এসেছিল আমার উপর, সেইজন্য নারীই হই বা পুরুষই হই যতক্ষণ তোমরা কাদায় মুখ গুঁজড়ে পড়েছিলে ততক্ষণ আমি তোমাদের রেহাই দিতাম না, বিব্রত করতামই।' আমার মা যখন ওই গুণ্ডাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন তখন তাদের কি বলেছিলেন? সে কথা কেউ লিখে রাখেন নি, কিন্তু আমি জানি, যা-ই তিনি বলে থাকুন, তার সঙ্গে সেন্ট জোয়ানের কথার খুব অমিল ছিল না। সে কথার মর্মার্থ—তোমরা যতক্ষণ পশু থাকবে আমি তোমাদের ততক্ষণ মানুষ করবার চেষ্টা করব। দরকার হলে তার জন্যে প্রাণ দেব। সে

চেষ্টা আপাতত নিষ্ফল জেনেও আমি থামব না, থামবার অধিকার আমার নেই, শক্তিও নেই, কারণ ঈশ্বরের পরোয়ানা আমার হাতে আছে। ভালবাসা দিয়ে যে পাথরের বুকে ফসল ফলাতে পারি না, ডিনামাইট দিয়ে তাকে উড়িয়ে দিই। সে ডিনামাইটের নিষ্ঠুর আর্তনাদ সঙ্গীত হয়ে জন্মগ্রহণ করে ভবিষ্যতের জঠরে। তখন ডিনামাইট থাকে না, পাথর থাকে না, থাকে শুধু সঙ্গীত, থাকে শুধু সুন্দর। তাই চিরন্তন। তার বিনাশ নেই। প্রাণ দিয়ে একেই আমরা আহ্বান করি। দক্ষিণে যখন দুর্যোগ ঘনায়, পূর্বাকাশে তখন গান জমে, সুর ফোটে, রং জাগে। মনে পড়ছে এলিয়টের কবিতা: দক্ষিণে কি পাখীরা গান গাইছে? ঝঞ্ঝাহত সিন্ধু-শকুনদের চীৎকার ছাড়া তো শব্দ নেই। বসন্তের পদচিহ্ন কি দেখা যাচ্ছে? না, পুরাতনের মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই, কোন সাড়া নেই, তৃণাঙ্কুর নেই, হাওয়া নেই। দিন কি বাড়ছে? দিন যত বাড়ছে আঁধার তত বাড়ছে, রাত্রি তত ছোট হচ্ছে, তত ঠাণ্ডা হচ্ছে। বাতাস বইছে না, রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে প্রকৃতি। বাতাস কিন্তু অপেক্ষা করে আছে পূর্বাকাশে। ক্ষুধার্ত কাকের দল একাগ্র হয়ে বসে আছে মাঠে: বনের অন্ধকারে পেচকেরা সাধছে প্রলয়ের সঙ্গীত। এ কোন্ নিদারুণ বসন্তের আভাস? বাতাস কিন্তু অপেক্ষা করছে পূর্বাকাশে। মায়ের মৃত্যু কি সেই বাতাস হয়ে অপেক্ষা করছে পূর্বাকাশে? যে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর চক্রান্ত আমাদের দেশকে দ্বিধাবিভক্ত করে রক্তের স্রোত বইয়ে দিলে, মায়ের মৃত্যু কি ঝড়ের মতো এসে সে চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে ভাঙা দেশকে আবার জুড়ে দেবে? নিষ্ঠুর গ্রীষ্মের পর বর্ষা কি নামবে না? জানি না, কিন্তু আশা করি। এখন কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশী আনন্দ হচ্ছে যে আমার মা এখন কেবল আমার মা নন। একটা ছোট গ্রামের ছোট গৃহস্থের ছোট-খাটো গৃহস্থালি কাজকর্ম বেঁধে রাখতে পারে নি তাঁকে সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে। তিনি এখন উত্তীর্ণ হয়েছেন অসীমের মধ্যে, সঙ্গীতের মধ্যে, কবিতার মধ্যে। এখন তিনি সকলের, এখন তিনি মানুষ নন, মহৎ ভাবের প্রতীক। এখন তিনি ইতিহাসের নমস্য বীরদের সঙ্গে একাসনে সমাসীন। তিনি এখন আমার একার নন, তিনি সর্বকালের, সবার।···এই পর্যন্ত লিখে অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। মনে হচ্ছিল আমার মা সকলের মা হয়ে গেছেন, এতে কি আমি সত্যিই খুশী হয়েছি? হওয়া উচিত হয়তো, কিন্তু অকপটে সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, হইনি। আমার মা আজ নেই বলে সত্যি এইসব কথা ভেবে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করছি। আমার মা বিশ্বের মা হয়ে গেছেন এই ভেবে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করবার প্রয়াস পাচ্ছি, তা ঝুটো, তা অন্তঃসারশূন্য। আমার মাকে আমার জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে একান্তভাবে না পেলে তাঁকে পাওয়া হয় না। তাঁকে ছোট করে অত্যন্ত স্বার্থপরের মতো কেবল নিজের জন্যে পেলেই তবে তৃপ্তি। তার জন্যে আমার মায়ের মহৎ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার স্নেহে অন্ধ হয়ে তিনি যদি পরশ্রীকাতর হন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হন, আমার মঙ্গলের জন্য তিনি যদি মিথ্যা ভাষণ করেন, চুরি করেন, তাহলে তাতেই আমার বেশী সুখ। মায়ের হাতের আলোনা পোড়া রান্না খেয়েও আমার যে তৃপ্তি,

মহার্ঘ হোটেলে নিখুঁত খাদ্যপানীয়ে আমার সে তৃপ্তি নেই। মায়ের ব্যাপারে আমি স্বার্থপর। মায়ের ভালোবাসার, মনের, মনোযোগের, সেবার সবটা আমিই দখল করতে চাই। কাউকে ভাগ দেওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি না। আমার জন্মের বেশ কিছুদিন পরে বুলির জন্ম হয়। আমার বয়স যখন চার বছর তখন বুলির জন্ম। আঁতুড়ঘর থেকে বেরিয়ে মা ওকে যখন প্রথম কোলে নিয়ে বারান্দায় বসলেন, আর আমি কোলে উঠতে গেলে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, এখন নয় বাবা, পরে তোমাকে কোলে নেব, এখন বোনটিই কোলে থাক, কেমন ? মনে আছে সেদিন যে গভীর দুঃখ, যে প্রবল আঘাত আমি পেয়েছিলাম তা বর্ণনাতীত। সেই আমার জীবনের প্রথম সত্যকার দুঃখ। আমার মা আর আমার একার নয়, আর একজন মায়ের কোলে জুড়ে বসেছে। আমার চোখ দিয়ে জল পড়েনি, আমি সঙ্গে সঙ্গে সরে গিয়েছিলাম। হয়তো আমার মুখে একটু ম্লান হাসিও ফুটেছিল, কিন্তু আমার সেই হাসির অন্তরালে যে গভীর বেদনা লুকিয়েছিল তা মায়ের চোখ এড়ায়নি। তিনি তৎক্ষণাৎ বুলিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কোলে টেনে নিয়েছিলেন আমাকে। তখুনি চুমু খেয়েছিলেন। এরপর আমি আর আত্মসংবরণ করতে পারিনি, মাযের গলা জড়িয়ে, তাঁর বুকে মুখ গুঁজে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার বোন বুলির বদলে যদি সারা বিশ্ব এসে মাকে ঘিরে দাঁড়ায় তাহলে কি সহ্য করতে পারব আমি তা ? না, পারব না। এতক্ষণ আমি নিজেকে ছলনা করছিলাম, ভোলাচ্ছিলাম, ঠকাচ্ছিলাম। অভিনয় করছিলাম। মা নেই, মাকে আর কখনও দেখতে পাব না এ শোকের সান্ত্বনা নেই, কিন্তু এই নিদারুণ সত্যটার সঙ্গে আমি নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছি না। অথচ এ কথাও তো সত্য, মানুষ যখন অমর নয় তখন মায়ের একদিন না একদিন মৃত্যু হতই। কিন্তু সে মৃত্যু আর এ মৃত্যু কি এক ? স্বাভাবিক মৃত্যু তো রোজ হয়, ঘরে ঘরে হয়, অনাদিকাল থেকে হয়ে আসছে। কিন্তু সে মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বিনিদ্র রজনীর উৎকণ্ঠা, জড়িয়ে থাকে আসন্ন শোকের অন্ধকারে অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে চিরবিচ্ছেদের আশঙ্কা, জড়িয়ে থাকে আশা-হতাশার দ্বন্দ্ব, জড়িয়ে থাকে অসংখ্য স্মৃতি, অসংখ্য আকুতি, ভালবাসার অসংখ্য অবর্ণনীয় ইতিহাস, প্রেমের স্পর্শে সে মৃত্যু মহৎ হ'য়ে ওঠে। গুণ্ডা আর কষাইয়ের হাতে মায়ের যে মৃত্যু হয়েছে, পশুত্বের কাছে মনুষ্যত্বের এই শোচনীয় পরাভব—না, আমার মা পরাভব স্বীকার করেননি, যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছেন, শ্রীমতী ঝিনুকের দেওয়া এই সংবাদটুকুর জন্য আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমার মা অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন নি, এটা বহুমূল্য সংবাদ আমার কাছে। এইটে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে থাকতে হবে। আশা করি বুলিও নিজের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছে। হঠাৎ একটা কথা মনে হচ্ছে, নিদারুণ কথা সেটা! ঝিনুক মায়ের খবর জানে, কিন্তু বুলির বেলায় বললে, ঠিক জানি না। সত্যি কি ঠিক জানে না ? না, অপ্রিয় সংবাদ বলে চেপে গেল সেটা আমার কাছে ? ঝিনুক কি ধরনের মেয়ে ? সেদিন ডাক্তার ঘোষালের মুখে তার যে পরিচয় শুনেছি তা তো

ভয়ানক! গিরিশ বিদ্যার্ণবের মেয়ে ডাক্তার ঘোষালের রক্ষিতা হ'য়ে আছে! একথা ভাবা যায় না। ঝিনুকও এ কথা বিশ্বাস করতে মানা করেছে। বলেছে, ডাক্তার ঘোষাল যা বলেছেন তা সর্বৈব মিথ্যা, কিন্তু একথাও তো অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ডাক্তার ঘোষালের মতো লোকের কাছে ও টি'কে আছে। ডাক্তার ঘোষালের মতো বে-পরোয়া দুর্ধর্ষ লোকের কাছে কি সসম্মানে থাকা যায়? বিশ্বাস করা কঠিন। তা ছাড়া আর একটা মেয়েকেও দেখেছি ওদের আড্ডায়। মনে হয় মানবীর বেশে সর্পিণী। ও মেয়ের সঙ্গে ঝিনুকের ঘনিষ্ঠতা আছে না কি! একটা কথা কিন্তু আমাকে স্বীকার করতেই হবে, ঝিনুকের চোখে মুখে আমি এমন একটা ভাব লক্ষ্য করেছি যা খেলো নয়. সস্তা নয়, যার মধ্যে অনন্যতা আছে, যা মনকে কলুষিত করে না, পবিত্র করে, কিন্তু—না, যে কথাটা এখনি মনে হল তা আমি মানব না। ঝিনুক আমাকে বিচলিত করেনি, আমার বিবেককে অপবিত্র করেনি। তবে এটা অবশ্য ঠিক যে, আমি চাই ওর বাইরেটা যেমন সুন্দর, ভিতরটাও তেমনি সুন্দর হোক। আশা করি ভিতরটা ওর সুন্দরই। তনিমা সেনকে দেখামাত্র সমস্ত শরীরটা যেমন ঘিনঘিন করে ওঠে, ঝিনুককে দেখে তা ওঠে না। মনে হয় ওর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা আবিষ্কারযোগ্য, যা আবিষ্কার করতে পারলে আনন্দ পাওয়া যাবে। কিন্তু সে আবিষ্কার করবার জন্যে আমি কি উৎসুক? অস্বীকার করতে পারব না, ঔৎসুক্য আছে—"

হঠাৎ গণেশ হালদার থেমে গেলেন। বাইরের দুয়ারে কে কড়া নাড়ছে। রকেট ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল ও বাড়িতে। কড়া নাড়ার সামান্য আওয়াজ পেলেই ও চীৎকার করে। গণেশ হালদার ভ্রূকুঞ্চিত করে চাইলেন বাইরের দিকে। আবার কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টাওয়ার ক্লকের ঘণ্টা বাজল টং, টং। দুটো বেজেছে? গণেশ হালদার নিজের ঘড়িটা দেখলেন, হ্যাঁ, দুটোই তো। এত রাত্রে কে আসবে তাঁর কাছে? উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি বাইরের দিকে। আবার কড়া নাড়ল। তিনি কপাট খুলে বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। বাইরের উঠোনটা পার হয়ে তবে বাইরের দরজাটা। তিনি এতক্ষণ ঘরে খিল দিয়ে লণ্ঠনের আলোয় বসে লিখছিলেন। বাইরের উঠোনে পা দিয়েই তিনি যেন একটা রূপকথালোক আবিষ্কার করলেন। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে, আর তার আলোটা পড়েছে শিরীষ গাছের উপর। সেই শিরীষ গাছের ছায়াটা পড়েছে তাঁর উঠোনে। মনে হচ্ছে যেন একটা কালো মখমলের উপর রূপোর বিচিত্র কাজ করা রয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে গণেশ হালদারের মনের রং বদলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে, নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি যেন কবি হয়ে গেলেন। তিনি যেন উপলব্ধি করলেন আপাতদৃষ্টিতে যে দেখা যায় তা দর্শন নয়। বিশেষতঃ যে আপাতদৃষ্টি বহু নরনারীর দৃষ্টির সাক্ষ্য মানতে অভ্যস্ত সে আপাতদৃষ্টির ভুল সহজেই ধরা পড়ে যদি সে ভুলকে ভুল বলে চেনবার চোখ খুলে যায়। সেই চোখ যেন তাঁর সহসা খুলে গেল। তাঁর বাড়ির পাশের নিতান্ত তুচ্ছ শিরীষ গাছটাকে সকলের সাক্ষ্য মেনে এতদিন তিনি শিরীষ গাছ বলেই মেনে এসেছেন। আজ তাঁর

মনে হল ওটা কেবল শিরীষ গাছ নয়, ওটা এমন একটা জিনিস যা ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাতে পারে। প্রখর দিবালোকে তার যে রূপ, ম্লান জ্যোৎস্নায় তার সে রূপ থাকে না। সে তখন শিল্পী। জ্যোৎস্নার সাহায্যে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে সে রূপোর কাজ-করা অপূর্ব কালো মখমলের অপূর্ব গালিচা সৃষ্টি করতে পারে। দিনের বেলায় ঘন গুচ্ছ পত্রপল্লবের ফাঁকে ফাঁকে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়ে সে যা করে তাতো সবাই জানে, সবাই দেখেছে। কিন্তু তার এই কীর্তিটা! মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। হয়তো আরও খানিকক্ষণ থাকতেন। কিন্তু আবার কড়া নড়ল। এগিয়ে গিয়ে কপাটটা খুলে দিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুক ঢুকল এসে। কপাটটায় খিল দিয়ে চাপা গলায় বলল, আমি ঝিনুক। ঘরের ভিতর চলুন। গণেশ হালদার কোন প্রশ্ন করলেন না। ঘর থেকে বেরিয়েই তিনি যে রূপকথার অঙ্গ বলে মনে হল তাঁর। তিনি যন্ত্রচালিতবৎ ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন, ঝিনুকও তাঁর পিছু পিছু ঘরে এসে ঢুকল।

"আমাকে এ সময়ে দেখে খুব আশ্চর্য হয়েছেন, না ?"

গণেশ হালদার আশ্চর্য হয়েছিলেন। কিন্তু মুখে যা বললেন তা অন্যরকম।

"না, আশ্চর্য হবার কি আছে এতে। এসেছেন কেন, দরকার আছে কিছু ?"

"এইগুলো রেখে দিন।"

ঝিনুক কাগড়ে মোড়া কয়েক বাণ্ডিল নোট বার করে হালদারের হাতে দিয়ে বলল, "আপাততঃ এগুলো আপনার কাছে থাক, আমি পরে এসে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাব। কথাটা কিন্তু গোপন রাখবেন। কেউ যেন জানতে না পারে।"

"কি এগুলো ?"

"টাকা। এগার হাজার টাকা আছে ওতে—"

"এত টাকা কোথায় পেলেন আপনি এত রাত্রে ?" গণেশ হালদারের বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল। একটু আতঙ্কিত হলেন তিনি।

"এত টাকা কোথায় পেলেন ?"

আবার প্রশ্ন করলেন তিনি।

"সে-সব পরে বলব। আমার সব কথাই বলব আপনাকে। মুখে না বলতে পারি চিঠি লিখে জানাব। সব জানাব আপনাকে।"

ঝিনুক সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে চলে গেল। গণেশ হালদারের ভয় করতে লাগল। তাঁর মনে হল অনিবার্যভাবে তিনি এদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন, এটা ভালো হচ্ছে কি ?

ঝিনুক নিজের বাড়ি গেল না, গেল ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির দিকে। সে জানত নিজের বাড়িতে তার কাকা জেগে বসে আছেন। ওই নপুংসক লোকটাকে তার ভয় ছিল না, কিন্তু চীৎকার চেঁচামেচিতে একটা গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে এই ভয়ে সে আর গেল না সেখানে। যতীশবাবু তাঁর আপন কাকা নন। গিরিশ বিদ্যার্ণব তাঁর পিসতুতো ভাই। বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হয়ে তিনি গিরিশ বিদ্যার্ণবের স্ত্রীর কাছে

মানুষ হন। কুটুম্বের ছেলে বলে কেউ তাঁকে কিছু বলত না। কুটুম্বের বাড়িতে পোষ্য হ'য়ে মানুষ হলে সাধারণতঃ যা হয় এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যতীশবাবু সুস্থ সবল মানুষ হ'তে পারেন নি, হয়েছেন কুটিল কুচক্রী স্বার্থপর অমানুষ। গ্রামের বিস্তৃত পরিবেশে তাঁর সঙ্গ তত পীডাদায়ক মনে হত না, ঝিনুক শামুক তো কলকাতার বোর্ডিং-এ থাকত বেশীর ভাগ সময়, তাই যতীশবাবুর সত্য পরিচয়ও তারা ঠিক ধরতে পারেনি। দাঙ্গার সময় তাঁর স্বরূপ বেরুল। তারপর এখানে এসে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি বাস করে' তাঁর আসল পরিচয় আরও পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। যতীশবাবু টাকা চান। যেভাবেই হোক ঝিনুক শামুক রাশি রাশি টাকা রোজগার করে আনুক, যেমন করে পারে আনুক, তিনি সেটার উপর কর্তৃত্ব করবেন। তিনি যে নিজেকে পূর্ববঙ্গের একজন বড জমিদার বলে পরিচয় দিয়েছেন, চায়ের দোকানে বসে' রং চডিয়ে নানা গল্প বলে আস্ফালন করেছেন, সেটা হাতে-কলমে প্রমাণ করবার চেষ্টা করবেন, এবং অবশেষে পাকিস্তানে চলে গিয়ে সেখানে টাকা ছডিয়ে আরামে থাকবেন, এইটেই আপাততঃ তাঁর লক্ষ্য। সত্যিই তিনি ঝিনুকের ফিরবার আশায় জেগে বসে ছিলেন। ঝিনুক কিন্তু গেল না। সে গেল ডাক্তার ঘোষালের বাডি। সেখানে যাওয়ার অন্য একটা কারণও ছিল। ডাক্তার ঘোষালের প্রাপ্য টাকাটা নিশ্চয়ই তাঁকে দিয়ে গেছেন সুবেদার খাঁ। সুবেদার খাঁ সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিয়ে দেন সবাইকে, কারও টাকা তিনি নিজের কাছে রাখেন না। ডাক্তার ঘোষাল টাকাটা নিয়ে কি করলেন, কোথায় রাখলেন, এই চিন্তাও ছিল ঝিনুকের। ঘোষাল সাধারণতঃ যখন যা পান ঝিনুককেই দিয়ে দেন, এমন কি জুয়া খেলে যে টাকা রোজগার করেন সে টাকাও। গত কয়েকদিন থেকে কিন্তু ঝিনুককে কোন টাকা তিনি দিচ্ছেন না। মুদির দোকানে ধার জমে গেছে, দুধওলা দাম চাইছে, মদের দোকানেও অনেক ধার··· আজকের এ টাকার খানিকটা অন্তত ঝিনুকের পাওয়া নিতান্ত দরকার। তা না হ'লে চালানো যাবে না।

ঝিনুক গলির মধ্যে ঢুকেই সোজা বাড়ির দিকে গেল না। উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। সে আশঙ্কা করেছিল তাস খেলার হুল্লোড় তখনও বোধ হয় থেমে যায়নি। কিন্তু কোন শব্দ শোনা গেল না। আর একটু এগিয়ে দেখল বাড়ির সামনে কারো গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই। বাডির সামনের দরজাটা খোলা। তারপর নজরে পডল দরজার পাশে কে যেন বসে আছে।

"কে ?" এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল ঝিনুক।

"আমি কাউ।"

"ওখানে অমনভাবে বসে কেন ?"

"আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি।"

"ডাক্তার ঘোষাল কোথায় ?"

"তিনি একটু আগে বেরিয়ে গেছেন।"

"খেয়ে গেছেন ?"

"ডিম পাঁউরুটি খেয়ে গেছেন। আজ তো রান্না হয়নি। মিস্টার সেনের ওখানেই উনি বোধ হয় খাবেন।"

ঝিনুক আর একটু এগিয়ে এল। ঝিনুক আসতেই একটা কাগজের পুলিন্দা বার করে কাউ বললে, "এই নিন।"

"কি আছে এতে।"

"আপনার চুড়ি আর হার!"

"সে কি! ওগুলো তো তোমার মাকে দিয়েছিলাম। তিনি ফিরিয়ে দিলেন ?"

"না, আমি কেড়ে এনেছি। আপনার গয়না আমি ওকে নিতে দেব না।

"তোমার মা কোথায় ?"

কাউ এ কথার কোন উত্তর দিল না। দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

॥ ১০ ॥

ডাক্তার সুঠাম মুখোপাধ্যায় সেদিন গঙ্গার ধারে গিয়েছিলেন। গঙ্গার যেসব জায়গায় সবাই যায়, পরিচিত জনতার প্রতিদিনের পদক্ষেপে যেসব জায়গা ঘাটে পরিণত হয়েছে তিনি সেখানে যাননি। তিনি আঘাটায় গিয়ে বসেছিলেন একটা ভাঙা বাড়ির চত্বরে। বহুকাল পূর্বে শহর থেকে দূরে জনতার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে যে লোকটি এখানে কেবল সুরধুনীর সঙ্গ লাভ করবার জন্য বাড়ি করিয়াছিলেন, তার নামও অনেকে ভুলে গেছে। দু-একজন বৃদ্ধ লোক বলেন, ওটা ফুদিবাবুর বাড়ি। তিনি কলকাতা থেকে এসে এখানে জমি কিনে এই বাড়ি অনেক শখ করে করিয়াছিলেন বাস করবেন ব'লে। প্রথম কিছুদিন তাঁর পরিবারবর্গও ছিলেন এখানে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেননি। সমাজের বাইরে নির্জন স্থানে থাকবার জন্য যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ সংস্কৃতির প্রয়োজন তা তাঁদের ছিল না। অধিকাংশ মানুষেয় স্বভাব লতার মতো, তা অপরকে আশ্রয় করে' অপরের সঙ্গে জড়িয়ে না থাকতে পেলে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে। তাদের জন্য সমাজের মাচা চাই। নিজের জোরে খাড়া একা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বনস্পতি। এ রকম বনস্পতি মানুষের মধ্যে খুব বেশী নেই। ফুদিবাবু সেই রকম বনস্পতি ছিলেন। তাঁর পরিবারবর্গ এখানে থাকতে পারেননি, কিছুদিন থেকেই কলকাতা চলে গিয়েছিলে তাঁরা। ফুদিবাবু যাননি। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবরটাও আশ্চর্যজনক। তিনি যেদিন হৃদয়ঙ্গম করলেন শরীর অপটু হয়েছে সেদিন তিনি ডাক্তার ডাকেননি, গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আর ওঠেননি। এখানকার লোকের ধারণা, তিনি এ বাড়ি ছেড়ে যাননি। অনেকে তাঁকে এ বাড়িতে ঘোরা-ফেরা করতে দেখেছে। এই জন্যেই এ বাড়ি কিনতে চায় না কেউ। ফুদিবাবুর

ছেলেরা বিক্রি করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ক্রেতা পাওয়া যায়নি। বাড়িটা এমনই পড়ে আছে। লোক কপাট জানালা খুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু রেকতার গাঁথুনি ভেঙে ইঁটগুলো নিয়ে যেতে পারেনি এখনও।

গঙ্গার দিকে যে বিরাট বারান্দাটা আছে তাতেই বসে ছিলেন সুঠাম মুখুজ্যে। একদল খঞ্জন পাখির দিকে চেয়ে চুপ করে বসে ছিলেন তিনি। ওপারের বালুচরে গৃধিণীও ছিল কয়েকটা। বেশ হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছিল তারা। মনে হচ্ছিল তারাও যেন প্রাতভ্রমণে বেরিয়েছে। এপারে বাঁশের উপর বসে ছিল একটা মাছরাঙা পাখি। গঙ্গার জল কমে গিয়েছিল, জলের ধারে ধারে সাদা বক ঘুরে বেড়াচ্ছিল দু-একটা। আর ঘাপটি মেরে বসে ছিল একটা কোঁচ বক। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার রং এমন মিলে গিয়েছিল যে, চেনা যাচ্ছিল না তাকে। হঠাৎ ডাক্তারবাবু সেটাকে দেখতে পেলেন। তাঁর মুখে কৌতূকের মৃদু হাসি ফুটে উঠল। পকেট থেকে কাগজ বার করে লিখতে শুরু করলেন।

"আজ আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছি। ভেবেছিলাম কিছু করব না, তার স্মৃতি নিয়ে বসে থাকব চুপ করে। কিন্তু দেখলাম চুপচাপ বসে থাকা যায় না। দেহটাকে জোর করে এক জায়গায় বসিয়ে রাখলেও মন বসে থাকে না। আর মনকে ঠিক যে জিনিসটা ভাবতে বলা যায় তাও সে ভাবে না। চঞ্চল শিশুর মতো ছুটোছুটি করে বেড়ায় সর্বত্র। যোগীরা হয়তো মনকে বাগ মানাতে পারেন, আমি পারলুম না। তাই চুপচাপ বসে থাকার সঙ্কল্প ত্যাগ করে ফুদিবাবুর বাড়ির চালাতে এসে বসেছি। এখানে এই নির্জনে এসে একটা জিনিস আবিষ্কার করে অবাক হ'য়ে গেলাম, মন নিগূঢ়ভাবে বন্ধুর কথাই ভাবছে। ওই কোঁচ বকটার মতো বন্ধুর ভাবনাটাও আত্মগোপন করে বসে ছিল এতক্ষণ মনেরই ভিতর। আমি দেখতে পাইনি। সেই ভাবনাটাকেই প্রণিধান করতে লাগলাম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। ওই বকটার সূত্র ধরেই মনে পড়ছে মহাভারতের বিখ্যাত বকের কথা, যে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেছিল—পৃথিবীতে সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস কি। যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন, দিবারাত্রি আমরা দেখছি যে সবাই একে একে মরে যাচ্ছে, তবু আমরা একবারও ভাবি না যে, আমরাও মরে যাব। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি হতে পারে? যুধিষ্ঠির যা বলেছিলেন তা খানিকটা সত্য বটে, কিন্তু আমরা যে নিজেদের মৃত্যুর কথা একেবারে ভাবি না, তা সত্য নয়। আমরা প্রত্যেকেই জানি, অনুভব করি যে, আমাদের মরতে হবে, মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়েই আমরা সবাই জন্মগ্রহণ করেছি। ক্রিশ্চানদের মতে আমরা পাপী হয়েই জন্মগ্রহণ করি। এটা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তা জানি না, কিন্তু এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আমরা মরব বলেই জন্মেছি। কিন্তু এই নিদারুণ সত্যটা মনে রাখলেই কি আমরা মৃত্যুর হাত এড়াতে পারব? তা যদি না পারি তা হলে এ নিয়ে বেশী মাতামাতি করে লাভই বা কি? আমার বন্ধু জীবনে অনেক কীর্তি রেখে গেছে, সে যদি সর্বদা মরণের ভয়ে ভীত হয়ে বসে থাকত তা হলে সে কি কিছু করতে পারত? মানুষের ওইখানেই তো

মহত্ত্ব, সে জানে যে, তাকে মরতে হবে, তবু জীবনকে ভোগ করতে সে বিরত হয় না, জীবন নশ্বর জেনেও জীবনকে তারা ভালবাসে, মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনেও সে অমৃতের সন্ধান করে ভঙ্গুর জীবন-লীলায়। ওই যে খঞ্জনের দল লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে ওরা কি আমাদের মতোই জানে যে, মৃত্যুকে এড়াবার উপায় নেই ? ওদের মৃত্যু-ভয় আছে, কিন্তু হবেই এ দৃঢ় প্রত্যয় আছে কি ? জানি না। কোন কিছুর সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলতে ভয় পাই। কে জানে, একদিন হয়তো আবিষ্কৃত হবে পাখিরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান। মানুষ একদিন মনে করত পৃথিবী চতুষ্কোণ এবং স্থির, এখন প্রমাণিত হয়েছে পৃথিবী গোল এবং অস্থির। পাখিদের সম্বন্ধে হয়তো চমকপ্রদ অনেক অবিশ্বাস্য তথ্য প্রকাশ পাবে ভবিষ্যতে। তবে একটা কথা জানি, মৃত্যুর সম্বন্ধে না হলেও জীবন সম্বন্ধে ওরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশী পটু। ওরা প্রাণ ভরে বাঁচতে জানে। মানুষের তৈরী খাঁচায় বন্দী হয়ে যারা বাঁধা বুলি কপচাতে শেখেনি তারা অনবদ্য। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তারা ডানা মেলে ওড়ে, গান গায়, জীবনের উৎসবে মেতে ওঠে, নেচে, গেয়ে, পক্ষবিস্তার করে' সঙ্গিনীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। ওদের ডাক্তার নেই, উকিল নেই, রাজনীতি নেই, স্বাদেশিকতা নেই, ফ্রন্টিয়ার নেই। জীবনের আনন্দেই ওরা ভরপুর। আমার যে বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েছি সেও অনেকটা ওই পাখিদের মতোই ছিল। তার প্রাণ-প্রাচুর্যের অকালপরিণতিতেই তার মৃত্যু। সে পাখি ছিল না, সভ্যতার আওতায় মানুষ হ'তে হয়েছিল তাকে, তাই নানা-রকম রোগ ঢুকেছিল তার শরীরে। কিন্তু সে ছিল প্রাণের খর-বেগে বেগবান অমিতবীর্য চির-যুবা। রোগের হুমকি সে মানেনি, ডাক্তারের উপদেশ শুনে জীবনের সুরকে বেসুরো করে ফেলেনি। যখন যা খুশি করেছে, তাই মরে গেল। সে জানত মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু সাবধান হয়নি তবু, সাবধান হতে সে জানত না। খুব অসুস্থ হলে কিছুদিন বিছানায় শুয়ে থাকত, ডাক্তারদের বলত এবার আপনাদের কথা শুনব। কিন্তু ভাল হলে আবার যে-কে সেই। অনিবার্যকে নিবারণ করবার চেষ্টা করেনি সে, তাই হঠাৎ একদিন থেমে গেল। মনে হয় ঠিক সময়ে এসেই থেমেছে। এই সূত্রে কেন জানি না মনে পড়ছে সেদিনকার সেই রূপসী মেয়েটিকে, সেদিন রাত্রে ডিসট্যান্ট সিগনালের কাছে ব্যাগ কুড়োতে গিয়েছিল। সেও বেপরোয়া, সেও জীবনকে ভোগ করতে চায় বলে মরণকে ভয় করে না। যে লোকটি গুলি চালিয়েছিল তার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কি ? কিন্তু এটা লিখেই সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে—ওরে উৎসুক, এসব জেনে কি হবে ? কতটুকু বা জানতে পারবি ? তার চেয়ে কল্পনা কর। কল্পনায় অনেক রং ফুটবে, অনেক দূর যেতে পারবি, শেষ পর্যন্ত হয়তো যে সিদ্ধান্তে পৌঁছবি তা দুনিয়ার নিরিখ-প্রমাণ অনুসারে হয়তো ভুল, কিন্তু তাতেই তুই সুখ পাবি। ওরা দুজনে প্রণয়-প্রণয়ী এ কথা ভেবে আনন্দ করতে ক্ষতি কি ? আমাদের দেশের পুরাণকাররা এর চেয়ে ঢের বেশী দুঃসাহসিক কল্পনা করেছেন। স্বয়ং ভগবানকে নিয়ে গেছেন বৃন্দাবনের গয়লাপাড়ায় আর তাঁকে দিয়ে যেসব প্রণয়-লীলা করিয়েছেন তা

আধুনিকতম ফরাসী সমাজে এ বোধ হয় বেমানান হবে না। শুধু তাই নয়, তাঁদের কল্পনা এত প্রবল, এমন বর্ণাঢ্য, এমন মর্মস্পর্শী যে তা সত্য কি মিথ্যা তা যাচাই করবার প্রশ্নও আমাদের মনে জাগেনি, আমরা পুজো করেছি সে লীলা-উৎসবকে যুগ-যুগান্ত ধরে…”

এই পর্যন্ত লিখে ডাক্তারবাবু দেখতে পেলেন বালুর চর ভেঙে কে যেন আসছে এবং তাকে দেখেই মাছরাঙা পাখিটা উড়ে গেল। ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন। কে আসছে চর ভেঙে এ সময়ে? কাছে আসতে চিনতে পারলেন গণেশ হালদারকে। তিনি ওপারের চরে গেলেন কি করে? তারপর তাঁর মনে পড়ল, তাঁর বাড়ির সামনে যে চরটা আছে সেটা দিয়ে এখানে আসা যায়। আজ রবিবার ছুটি আছে, তাই মাস্টার মশাই বেড়াতে বেরিয়েছেন। অনেক দূর হেঁটেছেন তো। বালির চরের উপর দিয়ে প্রায় পাঁচ-ছ মাইল হাঁটতে হয়েছে। মাস্টার মশাই ওপারে এসে যে বাঁশটার উপর মাছরাঙাটা বসে ছিল সেইটের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মুখ তুলে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পরেই পাখিটা হঠাৎ আবার ফিরে এল। ফিরে এসে নদীর মাঝখানে শূন্যে নিজেকে স্থির রেখে পাখা দুটো নাড়তে লাগল ঘন ঘন, তারপরই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে একটা মাছ তুলে নিয়ে উড়ে গেল। মাস্টার মশাই সাগ্রহে চেয়ে রইলেন পাখিটার দিকে, আর ডাক্তারবাবু নদীর ওপারে একটা ভাঙা বাড়ির চাতালের উপর বসে সকৌতুকে দেখতে লাগলেন তাঁকে। গণেশ হালদারের যে পাখি দেখার এত ঝোঁক তা তিনি জানতেন না। জেনে খুশী হলেন। তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা একটু যেন বেড়ে গেল। এই মাছরাঙাদের সম্বন্ধেই অনেক গল্প শোনাতে পারেন তিনি তাঁকে। এককালে তিনিও ওই মাছরাঙাদের পিছু-পিছু ঘুরেছেন। হঠাৎ গণেশ হালদার দেখতে পেলেন ডাক্তারবাবুকে। হাত তুলে নমস্কার করলেন। তারপর মুখের দু পাশে হাত রেখে চীৎকার করে বললেন, “ওদিকের পারঘাটা পেরিয়ে আমি আসছি। আসব?”

ডাক্তারবাবুও চেঁচিয়ে উত্তর দিলেন, ‘আসুন।’ মাস্টার মশাই নদীর ওপারে বালুর চরে হাঁটতে লাগলেন পারঘাটার দিকে, আর ডাক্তারবাবু তাঁর দিকে চেয়ে বসে রইলেন। তিনি যেমন ঔৎসুক্যভরে পাখি বা প্রজাপতি দেখেন, ঠিক তেমনিভাবেই তিনি দেখতে লাগলেন গণেশ হালদারকে। তাঁর মনে হল ওই লোকটিও একটি পর্যবেক্ষণীয় জীব যাঁর সম্বন্ধে তাঁর তেমন কোনও জ্ঞান নেই, শুধু এইটুকু আভাষ পেয়েছেন, লোকটির মন দামী ঘড়ির হেয়ার-স্প্রিং-এর মতো স্পর্শকাতর, ইংরেজীতে যাকে বলে sensitive। তারপর তাঁর, মনে হল পাখি প্রজাপতি জন্তু-জানোয়ারদের সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা সহজ, তারা কখনও কিছু গোপন করে না, কিন্তু যে মানুষ সর্বদা ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকে, তাকে চেনা সহজ নয়। অ্যালেক্সিস্ ক্যারেলের মতো বিখ্যাত ডাক্তার সারাজীবন মানুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে বই লিখেছেন—Man, the unknown। প্রত্যেকটি মানুষ শুধু চেহারায় নয়, ব্যক্তিত্বে আলাদা। পাখির

বা প্রজাপতির সম্বন্ধে বই পড়ে তাদের চেনা যায়, কিন্তু মানুষের অ্যানাটমি ফিজিওলজি পড়ে মানুষ চেনা যায় কি ? শুধু বোঝা যায় ও মানুষ,—বাঁদর বা বাঘ নয়। কিন্তু ওই বোঝাটাই কি যথেষ্ট ? মনুষ্য-রূপী লোকটার মধ্যে যে বাঁদর বা বাঘ, সাপ বা শকুন, দানব বা দেবতা প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে সেটার চেহারা তো মানুষের বাইরের চেহারা দেখে ধরা যায় না। মনে পড়ল, কিছুদিন আগে কতকগুলো খুনের ফটো দেখেছিলেন। প্রত্যেকটা চেহারা দেব-দুর্লভ। কারও মুখে শিশুর সরলতা, কারো চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, কারও দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর ঔদাসীন্য। কেবল চেহারা দেখে তাদের খুনে বলে চেনা অসম্ভব। চিন্তার এই সূত্র ধরে তিনি আর একটা সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হল, পাখি বা প্রজাপতির সম্বন্ধে বই পড়ে যে জ্ঞান আমরা আহরণ করি সেটা কি সম্পূর্ণ জ্ঞান ? একটা পাখি ঠিক কি আর একটা পাখির মতো ? পৃথিবীর সব প্রজাপতিই কি একরকম ? তাদের কি আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব নেই ? তাদের সকলের মনই কি একরঙা ? কোনও বৈচিত্র্য নেই ? মনে পড়ল, তাঁর বাড়ির করবী গাছে একটা দোয়েল এসে বসত বহুকাল আগে। তাকে লক্ষ্য করলে মনে হত, তার যেন একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, বিশেষ মেজাজ আছে। করবী গাছটার ডালপালায় সে যখন ঘোরাফেরা করত, মনে হত না যে, সে পোকার সন্ধানেই ঘুরছে খালি। মনে হত, সে যেন করবী গাছে এমন কিছু সন্ধান করছে যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, এ কথা সে জানে, তবু খুঁজছে। মানুষের মধ্যে যে মানসিকতা থাকলে সে কবি বা বিজ্ঞানী হয়, ওই পাখিটার মধ্যে তারই অভাস যেন ছিল। কিছুদিন পরে দোয়েলটাকে আর দেখতে পাননি তিনি। আরও কিছুদিন পরে আবার দেখতে পেলেন তাকে ওই করবী গাছেরই ডালে। দেখে একটু আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিলেন, পাখিটা নড়ছে না। ডানা দুটো ঈষৎ খোলা, যেন এখনই উড়বে। কিন্তু উড়ছে না। কাছে গিয়ে দেখলেন মরে গেছে। দেহের এতটুকু বিকৃতি হয়নি, গায়ের সেই আশ্চর্য সুন্দর মসৃণ কালো-সাদা রং তেমনি আশ্চর্য সুন্দরই আছে, মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি শিস দেবে, সর্বাঙ্গে জীবন্ত প্রাণের আকৃতি, চোখের দৃষ্টিতে অনন্ত কৌতূহলের আভাস, সব ঠিক আছে, কেবল প্রাণ নেই। এখনও তিনি ঠিক করতে পারেননি, পাখিটা কেন মরেছিল। পাখিদের সাধারণতঃ 'হিট্ স্ট্রোক' (Heat stroke) হয় না। কাছাকাছি কোন ইলেকট্রিক তারও ছিল না। এখন তাঁর হঠাৎ মনে হ'ল, সে বোধ হয় চরম সত্যের দেখা পেয়েছিল। মৃত্যুর ঠিক আগেই চরম সত্যের দেখা পাওয়া যায়। তারপর তার কাছে সব মিথ্যা হয়ে যায়। ডাক্তারবাবুর মনে হল তাঁর এ চিন্তাগুলোও লিখে ফেললে হয়। হয়তো সবই রাবিশ, তবু হালদার মশাই কাজ পাবেন। পকেট থেকে বিজ্ঞাপনের কাগজ বার করে রাখলেন হাঁটুর উপর, তারপর লিখতে শুরু করলেন।

গণেশ হালদার যখন এসে পৌঁছলেন তখনও তিনি লিখছেন। তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, একটু বসুন, এটা শেষ করে নিই। গণেশ হালদার ওধারে গিয়ে বসলেন একটা বেঞ্চিতে। মোজায়েকের কাজ করা চমৎকার বেঞ্চি। সমস্ত চাতালটাই তাই।

সবিস্ময়ে তিনি চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। এই ভাঙা বাড়িটার ভিতর এ সৌন্দর্য দেখবেন তা তিনি প্রত্যাশা করেননি। তারপর তাঁর হঠাৎ চোখে পড়ল, মাছরাঙাটা আবার এসে বসেছে বাঁশের উপর। সেই দিকেই চেয়ে রইলেন তিনি।

"তারপর, কি খবর ? প্রতি রবিবারেই আপনি বেড়াতে বেরোন নাকি ?"

"হ্যাঁ, প্রায়ই বেরোই। আজ সকালে আপনার লেখাটা টুকে ভাবলাম আপনার সঙ্গে সে-বিষয়ে একটু আলাপ করি। কিন্তু বেরিয়ে দেখি আপনি চলে গেছেন। আজ একটু সকাল সকাল বেরিয়েছেন, না ?"

"হ্যাঁ, আমার এক বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। নিজেকে ভোলাবার জন্যে তাই বেরিয়ে পড়েছি—"

তারপর হেসে বললেন, "অনেকে শোকের সময় গীতা পড়ে। কিন্তু আমি দেখেছি ওতে কোন সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। আসলে শোকের কোনও সান্ত্বনা নেই। বাইরে বেরিয়ে প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করলে তবু যেন একটু ভুলে থাকা যায়। আহত শিশু মায়ের কোলে গিয়ে যেমন ভোলে অনেকটা তেমনি।"

গঙ্গার দিকে চেয়ে হঠাৎ চুপ করে গেলেন তিনি। তারপর হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেল তাঁর। বললেন, "আমাকে কি বলবেন, আমার লেখা নিয়ে ? খুব ভালো হচ্ছে না, না ?"

"চমৎকার হচ্ছে। না, আমি বলছিলাম অন্য কথা। আপনি কাল যে ঘটনাটির কথা লিখেছেন, তা সত্য, না কল্পনা ?"

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। "যদি সত্য হয়, আপনি কি করবেন ? পুলিসে খবর দেবেন ?"

"উচিত বই কি। আপনার দিকে গুলি চালিয়েছিল। যদি লেগে যেত ?"

"একটু লেগেওছিল।"

ডাক্তারবাবু নিজের বাঁ হাতটা তুলে দেখালেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, "বেঁচে গেছি।"

"অথচ আপনি তো কাউকে কিচ্ছু বলেননি !"

'বলে কি করব ! মৃত্যুর হাত থেকে তো প্রতি মুহূর্তে বেঁচে যাচ্ছি। অসংখ্য বিষাক্ত ব্যাকটিরিয়া অহরহ ঢুকছে বেরুচ্ছে শরীর থেকে। কিছুদিন আগে নাককাটিয়ার জঙ্গলে গিয়েছিলাম 'ফটিক জল' পাখি দেখবার জন্যে। একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে ছিলাম। গুঁড়িটা ফাঁপা পুরোনো। হঠাৎ দেখলাম ঠিক আমার পাশ দিয়ে বিরাট একটা গোখরো সাপ বেরিয়ে গেল। প্রথমে সে বুঝতেই পারেনি আমি ওখানে বসে আছি। একটু দূরে গিয়ে বুঝতে পারল আর সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল ফণা তুলে। আর একবার আর এক মাঠে পড়েছিলাম বুনো শুয়োরের পাল্লায়। একটু দূরে একটা জঙ্গলে দোসাদরা বর্শা নিয়ে শুয়োর শিকার করছিল। একটা শুয়োর ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল বন থেকে। তার সামনে পড়লে ঠিক আমাকে চিরে দিয়ে চলে যেত।

আর একবার একটুর জন্যে বজ্রাঘাতের পাল্লা থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। ঘোর দুর্যোগে দাঁড়িয়েছিলাম একটা গাছতলায়, দূরের একটা গাছে বজ্র পড়ল, আমার গাছটায় পড়ল না। আমি বেঁচে গেলাম। আমরা সবাই প্রত্যহ মৃত্যুর কবল এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, যেদিন ধরা পড়ব সেদিন আর পালাতে পারব না। এই তো হল ব্যাপার। এর মধ্যে দারোগা পুলিস এনে কি করব!"

"সেদিন রাত্রে যে মেয়েটিকে দেখেছিলেন তাকে দিনের আলোয় চিনতে পারবেন?"

"এ জেরা করছেন কেন? তাকে আমি পুলিসে দেব না। তার সম্বন্ধে আমার আর বিশেষ কৌতূহলও নেই। তবে একেবারে যে নেই তা নয়, কিন্তু সেটা সে চোর বলে নয়।"

ডাক্তারবাবু হাসলেন।

"তবে?"

"সে রূপসী বলে। সেদিন অন্ধকারে টর্চের আলোয় তার যে চেহারা দেখেছি তা সচরাচর পথে-ঘাটে দেখা যায় না। চুরি ডাকাতি করবার মতোই চেহারা মেয়েটির। দিনের আলোয় দেখা হলে আলাপ করতাম।"

এ উত্তরের জন্য গণেশ হালদার প্রস্তুত ছিলেন না। একটু চুপ করে রইলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, "আপনার কি এটা দৃঢ় বিশ্বাস ও চোরাই মাল পাচার করবার জন্যেই ওখানে গিয়েছিল?"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "কোন কিছু দৃঢ় বিশ্বাস করবার মতো বিদ্যে-বুদ্ধির সিমেণ্ট কি আছে? নেই। তবে সেদিন ওদের ভাবভঙ্গী দেখে সন্দেহ হয়েছিল ওরা চোরাই মালই বোধহয় পাচার করছে। থলিটি বেশ ভারী ছিল, ওরকম ভারী থলি জানালা দিয়ে হাত ফসকে পড়ে গেছে একথা মন মানতে চায় না। দ্বিতীয়তঃ, ওই গুলি-ছোঁড়া ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকেছিল। তিনি বললেন একটা খরগোশ লক্ষ্য করে' উনি গুলি ছুঁড়েছিলেন। কিন্তু খরগোশ তো ওখানে দেখিনি কোনদিন। তাছাড়া রিভলভার দিয়ে খরগোশ শিকারের কথা শুনিইনি কখনও।"

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন ডাক্তারবাবু। তারপর বললেন, "হঠাৎ আপনার ও মেয়েটির সম্বন্ধে এ কৌতূহল কেন?"

গণেশ হালদার একটু ইতস্তত করতে লাগলেন বলবেন কি না। কিন্তু শেষে বলেই ফেললেন।

"আমার মনে হচ্ছে আমি মেয়েটিকে চিনি।"

"চেনেন? আগে আলাপ ছিল?"

"আমার কাছে এসেছিল কাল রাত্রে—"

"এসেছিল? কি রকম?"

এইবার গণেশ হালদারের মনে হল কাজটা অনুচিত হচ্ছে। বিষ্ণুকের অনুমতি

না নিয়ে তার কথাটা প্রকাশ করা কি উচিত হবে? ঝিনুক বলেছিল কথাটা গোপন রাখবেন। কেউ যেন জানতে না পারে। ঝিনুক যে চিঠি লিখবে বলেছিল সে চিঠি এখনও আসেনি। অতগুলো টাকা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁরও এ সন্দেহ হয়েছিল যে টাকাটা নিশ্চয় চুরির টাকা। অত রাত্রে হঠাৎ এত টাকা পেল কোথায় সে? তারপর ডাক্তার মুখার্জীর লেখায় সেদিনের ঘটনার বিবরণ পড়ে' চমকে গেলেন তিনি। তাঁর মনে হল যে মেয়েটির কথা লিখেছেন তিনি নিশ্চয়ই সে ঝিনুক। এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে তিনি নিশ্চয় পারবেন। ঝিনুকের সঙ্গে যে লোকটি ছিল, যে ডাক্তারবাবুকে লক্ষ্য করে' গুলি ছুঁড়েছিল, সে হয়তো তার সহকারী এবং (এই কথাটা ডাক্তারবাবুর মনে হয়েছিল, তাঁরও হয়েছিল) হয়তো সে তার প্রণয়ী। ব্যাপারটা কাল থেকে মনের শান্তি বিঘ্নিত করছিল তাঁর, তারপর ডাক্তারবাবুর শেষ লেখাটা পড়বার পর তিনি স্থির করে' ফেলেছিলেন ডাক্তারবাবুকেই বলতে হবে ঘটনাটা। তাঁর মনে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল। ঝিনুককে তিনি কিছুতেই খারাপ ভাবতে পারছিলেন না। তার বিরুদ্ধে যে-সব প্রমাণ অনিবার্যভাবে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল তা সত্ত্বেও তাঁর বারবার মনে হচ্ছিল, না, কোথায় যেন ভুল হচ্ছে। ডিটেকটিভ উপন্যাসে যেমন আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ লোককেও দোষী বলে' মনে হয়, এও হয়তো তাই হচ্ছে। ঝিনুকের মতো মেয়ে কখনও চোর হতে পারে না, কখনও সে একটা খুনের প্রণয়িনী হতে পারে না।

"চুপ করে আছেন কেন?"

ডাক্তারবাবুর কথায় যেন চমক ভাঙল হালদারের। বললেন, "আমি একটা কথা ভেবে ইতস্তত করছি। সে মেয়েটিকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে কথাটা গোপন রাখব। তাই ভাবছি—"

"এতে আর ভাবনার কি আছে। প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছেন তখন তা রাখতেই হবে। আমার শোনবার কোনও আগ্রহও নেই তেমন। ও সুন্দর, এইটুকুর জন্যেই ওর সম্বন্ধে আমার ঔৎসুক্য। একটা সুন্দর ফুল, সুন্দর পাখি, সুন্দর গাছ, সুন্দর মাঠ বা সুন্দর জঙ্গল দেখবার জন্য আমি মাইলের পর মাইল ছুটোছুটি করি। সুন্দরকেই দুচোখ ভরে' দেখতে চাই। সেদিন মেয়েটি অন্ধকারে চকিতে দেখা দিয়ে চলে গেল, আর হয়তো দেখা হবে না। মনে হচ্ছিল একটা লোকসান হয়ে গেল।"

"ও যদি খারাপ হয়, ও যদি চোর হয়, তাহলেও ওর সম্বন্ধে আপনার এ মনোভাব থাকবে শেষ পর্যন্ত?"

"থাকবে বই কি। আমরা সংসারে যে যা হয়েছি তা ঘটনার চাপে দায়ে পড়ে হয়েছি, বাধ্য হয়ে হয়েছি, We are dumb driven cattle—ভালোমন্দ নিয়ে খুব বেশী মাতামাতি করবার অধিকার আমাদের নেই। আপনি সেই গ্রীক গল্পটা জানেন?

"কোন গল্পটা বলুন তো? নাম কি?"

"নামটাম আমার মনে থাকে না, গল্পটা মনে আছে। এক পরমাসুন্দরী মেয়ে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে একটা লোককে খুন করে' ফেলেছিল। ধরাও পড়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। দোষও স্বীকার করেছিল। কারো আর সন্দেহ রইল না বিচারের ফল কি হবে। তার পক্ষের উকিল তাকে কিন্তু এক অদ্ভুত পরামর্শ দিলে। বললে, তুমি যদি একটা কাজ কর, তাহলে তোমার বাঁচবার আশা আছে। কি করতে হবে? জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি। উকিল বলল, তোমাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। মেয়েটি রাজী হল। পরদিন সে যখন উলঙ্গিনী হ'য়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে তখন বিচারককে সম্বোধন করে উকিল বললেন, ক্রোধের বশে আমরা অনেকেই অন্যায় কাজ করি। করাটাই স্বাভাবিক, স্বয়ং জিউসও (Zeus) এ কাজ করেন। এ মেয়েটি নিজের দোষ স্বীকার করেছে। সে শাস্তি নেবার জন্যও প্রস্তুত। আমি কেবল আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি, এই নিতান্ত স্বাভাবিক অপরাধের জন্য আপনি এমন একটা সুন্দরীকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন? সামান্য একটা কারণে ভগবানের এমন একটা অসামান্য সৃষ্টিকে নষ্ট করা কি উচিত হবে? ওর দিকে ভালো করে চেয়ে দেখুন। বিচারক রসিক ছিলেন, মেয়েটিকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন না। সভ্যজগৎ থেকে কালক্রমে মৃত্যুদণ্ড উঠে যাবে। হয়তো জেলখানাও যাবে। ভবিষ্যতে সমাজকে এমনভাবে গড়তে হবে যাতে সবাই সুখে থাকতে পারে। এটম বম তৈরি করে' অবশ্য তা হবে না, এমন পরিবেশ, এমন মানসিকতা তৈরি করতে হবে যাতে মানুষের খারাপ হওয়ার প্রবৃত্তি এবং প্রয়োজন কমে যাবে।"

ডাক্তারবাবু হঠাৎ চুপ করে' গেলেন। তারপর হেসে বললেন, "এই দেখুন, কি কাণ্ড করছি· আপনার মতো পণ্ডিত লোকের কাছে শফরীর মতো ফরফর করছি—"

গণেশ হালদার লজ্জিত হলেন।

"না, না, কি যে বলছেন, আমি মোটেই পণ্ডিত নই। বিলিতী ডিগ্রী থাকলেই কি পণ্ডিত হয়?"

হালদার মশায়ের এই কথায় ডাক্তারবাবু যেন আর একটা প্রমাণ পেলেন যে তিনি সত্যিই শিক্ষিত লোক। কিন্তু সে কথা বললেন না, অন্য প্রসঙ্গে উপনীত হলেন।

"আমার একটা বিষয়ে বড় আশ্চর্য লাগে, আপনার মতো বিলিতী ডিগ্রীওলা লোক, কোন ভাল জায়গায় চাকরি পেলেন না কেন?"

হালদার মশায় হাসিমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "কারণ বোধহয় আমি উচ্চবর্ণের গরীব হিন্দু এবং বাঙালী। বাংলার বাইরে পারতপক্ষে নূতন কোনও বাঙালীকে চাকরি দেওয়া হয় না। এঁরা মুখে যতই বলুন, সভায় যতই বক্তৃতা দিন যে আমাদের প্রাদেশিকতা নেই, কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় সবাই সঙ্কীর্ণমনা। সব প্রদেশেই কেবল প্রাদেশিকতাই নয়, আত্মীয় পোষণ করবার জন্যেও সবাই ব্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গে আমার পৃষ্ঠপোষক কেউ ছিল না, তাই চাকরি পাইনি। তাছাড়া বাঙালী

হিন্দুদের উপর আমাদের সরকারেরও যেন একটা বিশেষ রাগ আছে, মুখে যদিও সে কথা কখনও বলেন না, কিন্তু আচরণে বোঝা যায়।"

"এ রাগের কারণ কি—"

"এর উত্তর রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে দিয়ে গেছেন দু'লাইন কবিতায়। 'ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে, ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।' সে ব্যঙ্গের প্রথম শুরু স্বাধীনতার নামে গদি পাওয়া আর বাংলাদেশকে দু'ভাগ করে' দেওয়া। আমি একটা লোকের কথা জানি সে জন্তুজানোয়ারদের কষ্ট দিয়ে আনন্দ পেত। তার প্রধান আনন্দ ছিল পাখির একটা ডানা কেটে দিয়ে সেটা ছেড়ে দেওয়া। সেটা ছিন্ন রক্তাক্ত ডানা নিয়ে মাটিতে ঝটপট করতো আর তাই দেখে আনন্দ পেত লোকটা। এদের ব্যবহার দেখলে তার কথা মনে হয়।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "তবে এটাও কি ঠিক নয় যে বাংলা আর পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলমানরা মিলে মিশে থাকতে পারেনি, থাকতে চায়নি ?"

"জানি, কিন্তু সেটা উগ্র কুৎসিৎ রূপ ধারণ করেছিল বিদেশী শাসক ছিল বলে। মানুষে মানুষে ভাবও হয়, ঝগড়াও হয়। তার জন্যে দেশ ভাগ করবার দরকার হয় না। একদিন লণ্ডনের রাজনৈতিক ঝগড়াও ঠিক আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গারই রূপ নিয়েছিল। এর আভাস পাবেন ডিকেন্সের লেখা বার্নাবি রুজ (Barnaby Rudge) বইটাতে। প্রায় প্রত্যেক দেশেই দুটো তিনটে করে রাজনৈতিক দল থাকে, তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটিও কম হয় না, কিন্তু তার জন্যে কেউ দেশকে ভেঙে দু'তিন টুকরো করেনি। অখণ্ড ভারতে মুসলিম লীগ একটা রাজনৈতিক পার্টি হয়ে অনায়াসে থাকতে পারত, ওর জন্যে পাকিস্তান করবার দরকার ছিল না।"

কিন্তু জিন্না সাহেবের ভয় ছিল brute majority তার পার্টিকে গ্রাস করে ফেলবে—"

"এরকম ভয় আজকাল অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই হয়েছে।

সবাই হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের ভয়ে আতঙ্কিত। সবারই মনে হচ্ছে বান এলো বলে, সবাই নিজের নিজের ঘটিবাটি সামলাতে ব্যস্ত। ভাষার ভিত্তিতে সবাই এখন আলাদা হতে চাইছে। গভর্নমেণ্ট প্রতি প্রদেশে সীমানা নির্দেশ করবার জন্য যে কমিটি করে-ছিলেন, তার বিচার বাংলাদেশের বেলায় ন্যায়সঙ্গত হয়নি। তারা সবাই ভীত এবং অসন্তুষ্ট। পাঞ্জাবেও তাই। এঁরা জিন্নার দাবিকে মেনে নিয়েছিলেন. কিন্তু এঁদের দাবিকে মানতে চাইছেন না, এঁদের দাবিকে লিঙ্গুইজম বলে' ব্যঙ্গ করছেন। এঁদের দাবির যুক্তি কি জিন্নার দাবির যুক্তির চেয়ে কম জোরালো ?"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "থাক, ওসব রাজনৈতিক তর্কের আবর্তে পড়লে থই পাব না। আমি স্রোতের কুটো, ভাসতে পেলেই সন্তুষ্ট। জলটা ঘোলাটে না পরিষ্কার, গঙ্গার না ব্রহ্মপুত্রের তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।"

"আপনি ঠিক কুটো নন, আপনি পালক, আপনার গায়ে জল লাগে না, লাগলেও

সঙ্গে সঙ্গে পিছলে পড়ে সে জল। কিন্তু আমি সত্যিই কুটো, জলে আমার সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, তাই জলের সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারি না। রাজনীতির স্রোত কোন্ খাতে বইছে তার সঙ্গে আমাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আমরা ঘর-পোড়া গরু, আসামের কাণ্ড দেখে আরও আতঙ্কিত হয়েছি। নিজেদের দেশ থেকে উৎখাত হয়েছি, এরপর কোথায় যাব, বিহারে না দণ্ডকারণ্যে, আন্দামনে না উড়িষ্যায় তা নির্ভর করছে ওই রাজনৈতিকদের খেয়াল-খুশির উপর, যাঁরা আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। তাই রাজনৈতিক আবহাওয়া আমাদের কাছে উপেক্ষার জিনিস নয়। এখানে শুনেছি আপনার দয়ায় আমার চাকরিটা হয়েছে, আপনি—"

গণেশ হালদার আর বলতে পারলেন না। তিনি উত্তেজিত হয়েছিলেন হঠাৎ তাঁর বাক রোধ হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবুও কোন কথা বললেন না সঙ্গে সঙ্গে। একটু চুপ করে' থেকে বললেন, "একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন, কারো উপর কেউ দয়া করতে পারে না, সে সামর্থ কারো নেই। আপনি চাকরি পেয়েছেন আপনার যোগ্যতার জোরে। চলুন, এবার ওঠা যাক। এই নিন আজকের লেখাটা। দেখুন, দেখুন ওই খঞ্জনটা, ওই যে একা বাঁ ধারে চরছে। বুকটা হলদে, ডানায় চকোলেট রং। দেখতে পেয়েছেন? শীতের অতিথি হিসাবে এসেছিল, কিন্তু এখনও ফেরেনি দেখছি। এদেশের উপর মায়া বসে' গেছে নাকি! সাধারণতঃ মায়া বসে না ওদের। ওরা নির্মম। এক জাতের পাখি আছে তারা বছরে তিন-চারবার বাচ্ছা তোলে। কিন্তু শেষের বাচ্ছাগুলোকে অনেক সময় ফেলে পালায়। যেই মাইগ্রেশনের সময় হয়, যেই অজানা বাইরের ডাক তাদের অন্তরকে আকুল করে' তোলে, তখন আর তারা পিছন ফিরে তাকায় না। কচি বাচ্ছাগুলোকে ফেলেই চলে যায়। চলুন, এবার বেরিয়ে পড়ি। এখানকার সুন্দরবন দেখেছেন? চলুন সেইখানেই যাওয়া যাক।"

গণেশ হালদার মৃদু হেসে বললেন, "দেখেছি সুন্দরবন। বড়লোকের সাজানো বাগান। অনেক রকম গাছ আছে, দেখলে মনে হয় বাগানের মালিক বেশ বড়লোক।"

"আপনি যে চোখ নিয়ে বাগানটা দেখেছেন সে চোখ নিয়ে দেখলে আনন্দ পাওয়া যায় না। বাগান বড়লোকের না ছোটলোকের, বাঙালীর, বিহারীর না মারোয়াড়ীর—এসব অতি অবান্তর ব্যাপার। বাগানে গিয়ে রূপ দেখবেন, গাছের রূপ, ফুলের রূপ, পাখির রূপ, প্রজাপতির রূপ। নানারকম অদ্ভুত অচেনা পোকা দেখবেন নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাতায় পাতায়, অভিজাত গাছের পাশে প্রোলিটারিয়েট গাছের ভিড় দেখবেন, চন্দন গাছের বা নাগালিঙ্গম গাছের পাশে দেখবেন ঘেঁটুকে কিচ্ছু বেমানান দেখাচ্ছে না, দেখবেন নানারকম ছোট বড় সুন্দর পাথরের টুকরো ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করে আছে রসিকের স্নেহস্পর্শ লাভ করবার জন্য, মাকড়শার জাল দেখবেন নানারকম। বাগানটার মালিক কে, তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। পৃথিবীর সমস্ত বাগানের এক এবং

অদ্বিতীয় মালিক প্রকৃতি, ভগবানও বলতে পারেন তাকে। আমরা মানুষরা দু-চার দিন কপরদালালি করি মাত্র। আমাদের এই আবদার প্রকৃতি হাসিমুখে সহ্য করেন, এও এক মজার জিনিস। উঠুন, সুন্দরবনে না যান, অন্য জায়গায় যাই চলুন। চোখ থাকলে দেখবার জিনিসের অভাব নেই। বেচুকে ডাকি—"

ডাক্তারবাবু পকেট থেকে হুইস্‌ল বার করে বাজালেন। বেচু কাছেই ছিল, এসে পড়ল।

॥ ১১ ॥

সেদিন রাত্রে কাউ'কে নিয়ে মহা বিপদে পড়েছিল ঝিনুক। সত্যিই সে রাত্রিটা তার জীবনের একটা স্মরণীয় রাত্রি। দেশের বাড়ীতে যে রাত্রে গুণ্ডারা হানা দিয়েছিল, সে রাত্রির কথা বাদ দিলে এমন রাত্রি তার জীবনে আর আসেনি।

কাউ তার পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল শেষে।

"কি হয়েছে বল না, কাঁদছ কেন?"

কাউ কোন জবাব দেয়নি।

"তোমার মায়ের কাছ থেকে এগুলো কেড়ে আনলে কেন, তাকে তো আমি দিয়েছিলাম এগুলো, এ-ও বলেছিলাম দরকার হলে তাকে আরও কিছু টাকা পাঠাব, কিন্তু তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।"

হঠাৎ কাউ লাফিয়ে উঠল। মনে হল, কে যেন কশাঘাত করল তাকে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, "সে জন্মের মতো চলে গেছে, আর কখনও আসবে না তোমাদের টাকা নিতে।"

"সে কি!"

"হ্যাঁ।"

কাউয়ের চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবার মত হলো।

"কি হয়েছে কি! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

কাউ কিন্তু কিছু বলল না, চোখ বড় বড় করে সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল কেবল, যেন সেখানে কিছু একটা দেখছে।

"জন্মের মতো চলে গেছে মানে? কি হয়েছে বলছ না কেন?"

কাউ হঠাৎ অনুনয়ের সুরে বলল, "তুমিই বল, তোমার গয়না ছোঁবার কি যোগ্যতা ছিল ওর"—তারপরই চীৎকার করে উঠল সে—"পচা গলা বুড়ী বেশ্যা একটা। ওর এত বড় আস্পর্ধা হবে কেন! বেশ হয়েছে, বেশ করেছি।"

"কি করেছ—"

"তাকে ফেলে দিয়েছি কুয়োয়"—তারপর আবার চীৎকার করে উঠল—"খুন করেছি, খুন করেছি, নিজের মাকে খুন করেছি। বাপকেও করব, তারপর ফাঁসি যাব।"

অন্ধকারে হাত দুটো তুলে উর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

শিউরে উঠল ঝিনুক। কিন্তু বিপদে পড়ে আত্মহারা হবার মেয়ে নয় সে। সে কাউয়ের গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল।

"ছি, ওসব পাগলামি করে না। ওই মাঠের ধারে যে ন্যাড়া ই'দারাটা আছে, তাতেই পড়ে গেছে তোমার মা? চল, এখুনি তুলতে হবে তাকে। ছি, ওরকম মাথা গরম করতে নেই।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কাউ।

"চল, দেরি কোরো না। লোকজন ডেকে তোমার মাকে তোলবার চেষ্টা করি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে এখনও হয়তো বাঁচবেন তিনি।"

"না বাঁচবেন না। তার গলা টিপে মেরে ফেলে দিয়েছি।"

হঠাৎ কাউ ঝিনুকের হাত দুটো ধরে মিনতির সুরে বলে উঠল, "মাসিমা, চলুন আমরা পালাই। ওই পাষণ্ড ডাক্তার ঘোষালের কাছে আপনি আছেন কেন? ও কি একটা মানুষ? ও পিশাচ, ও জানোয়ার।"

"চুপ কর।"

ধমক দিয়ে উঠল ঝিনুক।

"আমি পাগল হয়ে গেছি মাসিমা, ক্ষেপে গেছি, আমি—"

"আর একটা কথা বোলো না। আমার সঙ্গে এস।"

"আমি—"

"না, আর একটি কথা নয়, এস আমার সঙ্গে।" কঠিন কণ্ঠে এবার আদেশ করল ঝিনুক। সে আর ভিতরে ঢুকল না। ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির কাছেই যে ভাঙা পোড়ো ই'দারাটা ছিল, সেই দিকেই অগ্রসর হল।

কাউও তার পিছু পিছু গেল।

ই'দারার কাছে তারা যখন গিয়ে দাঁড়াল, তখন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদটা পশ্চিম আকাশের দিকে হেলে পড়েছে। চাঁদটার দিকে চেয়ে শিউরে উঠল ঝিনুক। মনে হল, কামড়ে কে যেন খানিকটা ছিঁড়ে নিয়েছে, চাঁদ কিন্তু নির্বিকার, তবু হাসছে। তার পাশের তারাটাও হাসছে। আমাদের হাসিই থেমে যাবে? হঠাৎ মনে হল তার। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো পাখি ডেকে উঠল একযোগে। ঝিরঝির করে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠল একটা, তার পরই চতুর্দিক সচকিত করে কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করতে করতে উড়ে গেল একটা পেঁচা, একযোগে ডেকে উঠল শেয়ালগুলো। ঝিনুক বুঝতে পারল সকাল হচ্ছে। যা করবার এখুনি করতে হবে।

"আমি থানায় খবর দিতে যাচ্ছি। তুই এখানে বসে থাক। আমাদের সাড়া পেলে

তুইও কুয়োর ভিতরে নেমে যাস। তারপর আমরা এসে তোকে তুলব। আমি একটা দড়ি জোগাড় করে আনব।"

"আমি কুয়োয় নেমে যাব ? কেন !"

"আমি গিয়ে থানায় বলব তোর মা হঠাৎ পড়ে গেছেন, তাকে তোলার জন্য তুইও লাফিয়ে পড়েছিস।"

"আমি পারব না ওর মধ্যে নামতে, আমি পারব না, কিছুতেই পারব না। আমাকে ওর মধ্যে নামতে বোলো না মাসিমা, আমি পারব না।"

"তোমাকে পারতেই হবে। পুলিসের চোখে ধুলো দেবার এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এস, আমার সামনেই নাম তুমি।"

কাউ কিছুতেই নামবে না। তারপর ঝিনুক যা করলে তা অবিশ্বাস্য। কাউ ঠিক ইঁদারাটার ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে এক ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে ঝিনুক। চপাৎ করে একটা শব্দ হল।

আর্তনাদ করতে লাগল কাউ ইঁদারার ভিতর থেকে।

"এ কি করলে মাসিমা, বাঁচাও বাঁচাও আমাকে।"

ঝিনুক ঝুঁকে আশ্বাস দিলে তাকে, "এক্ষুনি আসছি। ভয় নেই—"

ঝিনুকের প্রথমেই থানায় যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সে গেল মিস্টার সেনের বাড়ি। ঘোষালের গাড়িটা নিয়েই বেরিয়ে গেল। যতীশবাবুর কথা সে ভোলেনি। কিন্তু যে কথাটা প্রবলভাবে তার মনে হচ্ছিল, সে কথাটা এই—কাউয়ের মা মারা গেছে। সে আর ঘোষালকে বিরক্ত করতে আসবে না। তার অজ্ঞাতসারেই একটু আনন্দের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছিল তার মনে। তারপরই মনে হল, তনিমার সঙ্গে ঘোষালের ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে? কিছুদূর যে গড়িয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কতদূর? নিজের বাড়ি ছেড়ে এত রাত্রে ওখানে যাওয়ার মানে কি। কাউয়ের কথাগুলো তার কানে বাজছিল, ও কি একটা মানুষ? ও পিশাচ, ও জানোয়ার। গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিলে সে, দৃঢ় মুষ্টিতে স্টিয়ারিংটা চেপে ধরে সে বসে রইল, চোখের দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে উঠল।···মিস্টার সেনের বাড়ি থেকে কিছুদূরে থামাল সে গাড়িটা। তারপর গাড়ি থেকে নেমে চোরের মতো নিঃশব্দচরণে সে গিয়ে দাঁড়াল সেনের বাড়ির সামনে। সমস্ত বাড়িটাই অন্ধকার। হঠাৎ নজরে পড়ল নীচের দিকে একটা ছোট ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। জানালাটা বন্ধ। বন্ধ খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। খড়খড়িটা সন্তর্পণে তুলে ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করল সে। বিশেষ কিছু দেখা গেল না। তারপর সামনের দুয়ারে গিয়ে সে কপাটটা নাড়ল। কোন সাড়া এল না ভিতর থেকে। ঠেলতেই কিন্তু কপাটটা খুলে গেল। সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকেই আলোকিত ঘরটা দেখতে পেল সে। সে ঘরের কপাটটাও খোলা। সেই খোলা কপাট দিয়ে সে দেখতে পেল ডাক্তার ঘোষাল মদে চুর হয়ে একটা সোফায় হেলান

দিয়ে রয়েছেন, আর তাঁর পাশেই তনিমা, সেও চুর। তার একখানা হাত ঘোষালের ঘাড়ের উপর ঝুলছে। বাঘিনীর মতো একলম্ফে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল সে। এক ঝটকায় তনিমার হাতখানা সরিয়ে দিলে ঘোষালের কাঁধ থেকে। তারপর ঘোষালকে ঝাঁকি দিয়ে বলল, "ওঠ, ওঠ, চল। গাড়ি এনেছি। সর্বনাশ হয়ে গেছে। কাউয়ের মা আত্মহত্যা করেছে, শিগগির চল—"

ঘোষাল খুব প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, তবু তিনি খাড়া হয়ে বসলেন। চোখ বড় বড় করে বললেন, "আত্মহত্যা করেছে ? হোয়াট !"

তারপর একটু ভেবে বললেন, "লাশটা কোথা !"

"মাঠের ধারে যে পোড়ো ইঁদারাটা আছে, তার মধ্যে। শীগ্‌গির চল, ওটাকে এখনি তুলতে হবে।"

তনিমার সাড় ছিল না। তার কাপড়জামাও বিস্রস্ত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঝিনুক দেখতে পেলে তার আলুলায়িত ব্লাউসের মধ্যে এক তাড়া নোট রয়েছে। বিনা দ্বিধায় নোটের তাড়াটা তুলে নিলে সে।

বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইলেন ডাক্তার ঘোষাল। তারপর তাঁর মুখে সেই আকর্ণ বিস্রান্ত হাসিটি ফুটল।

"ওটা কি ঠিক হল নুক ? Isn't that a bit shady ?"

নুক একথার কোন উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। তার চোখের দৃষ্টি আরও জলন্ত হয়ে উঠল কেবল। তারপর ঘোষালের হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, "নষ্ট করবার মতো সময় এখন নেই। যদি না যাও, আমি নিজেই থানায় যাচ্ছি—"

থানার নামে ঘোষাল চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। ঝিনুক তাঁর অনেক দুষ্কৃতির খবর জানে, রাগের মাথায় যদি ফাঁস করে দেয় কিছু !

"থানায় কেন !"

"বললাম না, কাউয়ের মা মারা গেছে কুয়োয় পড়ে। কাউও লাফিয়ে পড়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে। থানায় খবর দিতে হবে না ? চল, চল।"

টানতে টানতে ডাক্তার ঘোষালকে নিয়ে মোটরে তুলল সে।

থানায় খবর দিয়ে অকুস্থলে পৌঁছে তারা দেখল অত ভোরেও ওই ফাঁকা মাঠের মাঝে এঁদো কুয়োটাকে ঘিরে লোক জমে গেছে বেশ। দড়ি ফেলে কাউকে তুলেওছে তারা। কাউ সর্বাঙ্গে কাদা জল মেখে মাথা হেঁট করে একধারে বসে কাঁদছে, আর কাঁপছে। কপালের একধার দিয়ে রক্তও পড়ছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ল পুলিশের গাড়ি।

॥ ১২ ॥

গণেশ হালদার ঝিনুকের চিঠি পড়ছিলেন। সেদিন স্কুলে যাবার আগে স্নান করে বাইরের ঘরে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন চিঠিটা পড়ে আছে। ঝিনুক কখন যে চিঠি ফেলে গেছে তা তিনি জানতেই পারেননি। ঝিনুক ডাক্তার ঘোষালের বাড়িতে বা নিজের বাড়িতে বসে এ-চিঠি লেখেনি। এ-চিঠি লেখার সুযোগ এ দুটো বাড়ির কোনও বাড়িতেই ছিল না। শুনে আশ্চর্য মনে হবে, ঝিনুক এ-চিঠি লিখেছিল মিস্টার সেনের বাড়িতে বসে। তনিমার সঙ্গে পরদিনই গিয়ে সে দেখা করেছিল। ফিরিয়ে দিয়েছিল তাকে টাকা। মৃদু হেসে বলেছিল, "কাল একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলে ভাই। ভাগ্যে আমি এসে পড়েছিলাম, তা না হলে অতগুলো টাকা মারা যেত।" তনিমা লজ্জিত হয়নি. বিগলিত হয়ে পড়েছিল। একটু আশ্চর্যও হয়েছিল। টাকাই তার জীবনের ধ্যান জ্ঞান মোক্ষ মুক্তি—সব। টাকাটা হারিয়ে যাওয়াতে বড়ই হতাশ হয়ে পড়েছিল সে। ফিরে পেয়ে সে যেন আকাশের চাঁদই হাতে পেল অপ্রত্যাশিতভাবে। সর্বাঙ্গ দুলিয়ে হেসে উঠেছিল হি-হি করে। শুধু তাই নয়, ঝিনুকের গালে একটা চুমু খেয়ে বলেছিল, 'তুই যে এত উদার, এত নির্লোভ তা তো জানা ছিল না ভাই। আর কেউ হলে অতগুলো টাকা ফিরিয়ে দিত কি? কক্ষনো দিত না। তোর কি উপকারে লাগতে পারি বল।'

ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে তাকে অমনভাবে দেখেও ঝিনুক তাকে কিছু বললে না, এতেও ভারী আশ্চর্য লেগেছিল তার। ঝিনুকের সঙ্গে ডাক্তার ঘোষালের যে সম্পর্ক সে আন্দাজ করেছিল, তার সঙ্গে তার এ-আচরণের কোন মিল খুঁজে পাচ্ছিল না সে। সত্যিই অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। ঝিনুক এর পর যা বলল, তাও সে প্রত্যাশা করেনি।

ঝিনুক বলল, "আমি মাঝে মাঝে একলা থাকতে চাই ভাই। তোমাদের বাড়িতে তো অনেকগুলো ঘর। মাঝে মাঝে পালিয়ে এসে একটা ঘরে খিল দিয়ে যদি থাকি খানিকক্ষণ, তা হলে তোমার অসুবিধা হবে কি? সব সময় কচকচি ভালো লাগে না।"

তনিমা বলল, "অসুবিধা কিসের? স্বচ্ছন্দে এস। তবে দোতলায় যেও না। সেখানে শামুকের রাজত্ব। আমিও যেতে সাহস পাই না। একতলায় পূর্ব দিকের ঘরটার চাবিই দিয়ে দেব তোমাকে। যখন খুশী এস। বাপিও খুশী হবেন এতে।" এই বলে যে অর্থ-পূর্ণ হাসিটা হেসেছিল তনিমা. তা অন্য লোকের কাছে কদর্য মনে হত, কিন্তু ঝিনুকের কাছে হয়নি। অন্তত তার মুখভাবের কোন পরিবর্তন দেখা দেয়নি। তনিমার মতো মেয়ের মুখে এই ধরনের হাসিই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল তার। সে বলল, "বেশ, তাই আসব। চাবিটা দাও তা হলে—"

এই ঘরে বসেই চিঠিটা লিখেছিল ঝিনুক।

শ্রীচরণেষু,

আপনাকে যে এ-চিঠি লিখছি, তা আমাদের দলের কেউ জানে না। তাদের অনুমতি নিয়ে লেখাও সম্ভব নয়, কারণ জানি তারা অনুমতি দেবে না। আমাদের দলের কথা কাউকে বলবার হুকুম নেই। এ-হুকুম অমান্য করলে প্রাণ দিয়ে জবাবদিহি করতে হয়। এত বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও আপনাকে এ-চিঠি লিখছি কেন, এ-কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে হবে। লিখছি প্রাণের তাগিদে। যে প্রাণ ভঙ্গুর দেহ-পিঞ্জরে শশকের প্রাণের মতো ধুকধুক করছে, সেই ক্ষুদ্র প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যে বৃহৎ প্রাণের তাগিদে আজ আপনাকে চিঠি লিখতে বসেছি, তারই কিছু পরিচয় এই চিঠিতে দিতে চেষ্টা করব। আমি যা বলব, তা হয়তো ছোট মুখে বড় কথার মতো শোনাবে। কিন্তু যা অনুভব করছি, তা কাউকে বলতে না পারলে আমি পাগল হয়ে যাব। বলবার মতো কোনও লোককে কাছে পাইনি। আপনাকে কাছে পেয়ে আমি যেন বর্তে গেছি। এর জন্য যদি আমাকে মৃত্যুও বরণ করতে হয়, তা হলেও আমার ক্ষোভ থাকবে না। এই সান্ত্বনা নিয়ে আমি অন্তত মরতে পারব যে, একজন আদর্শবাদী লোকের কাছে আমি আমার কথাটা বলবার সুযোগ পেয়েছি। আমার এ-আদর্শে নূতন কথা কিছু নেই। এ-আদর্শের মূল কথা আমাদের বাঁচতে হবে, পশুর মতো নয়, মানুষের মতো বাঁচতে হবে। আমি পৃথিবীর বৃহৎ মানবগোষ্ঠীকেও আমার আদর্শের গণ্ডিতে টেনে আনতে চেষ্টা করিনি। আমাদের অনেক বড় নেতা এই কাজ করে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অনেক হাততালি কুড়িয়েছেন। কিন্তু আমার সে যোগ্যতা নেই, সে স্পর্ধাও নেই এবং সত্যি কথা বলতে কি, সে ইচ্ছেও নেই। যেসব বড় অভিনেতা রঙ্গমঞ্চের উপর যুধিষ্ঠিরের অভিনয় করেন, আমি জানি রঙ্গমঞ্চের বাইরে তাঁরা সবাই যুধিষ্ঠির নন। এমন কি, অনেক সাধারণ মানুষের চেয়েও নীচু স্তরের লোক তাঁরা। তাঁদের একমাত্র মূলধন তাঁদের অভিনয়-দক্ষতা। বুদ্ধ, যীশু, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আরও অনেক মহাপুরুষের বাণী থেকে এইটুকু বুঝেছি যে, আত্মজ্ঞানই মানুষের চরম এবং পরম জ্ঞান। আত্মরক্ষাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যীশুখৃষ্ট ক্রুশের উপরে প্রাণদান করে আত্মরক্ষাই করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুই তাঁকে অমরত্বের অক্ষয় কবচ পরিয়ে দিয়ে গেছে। আমাদের আদর্শও এই আত্মরক্ষা এবং আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানের আধ্যাত্মিক পর্যায়ে পৌঁছবার যোগ্যতা এখনও হয়নি আমার। আর তা না হলে তা নিয়ে আস্ফালন করা ভণ্ডামিই হবে আমাদের পক্ষে। যেটুকু আত্মজ্ঞান আমাদের হয়েছে, তাতে বুঝেছি নিজের পায়ে নিজের জোরে দাঁড়াতে না পারলে আমরা পড়ে যাব। আর আমাদের নিপতিত দেহের উপর দিয়ে নিষ্ঠুর জনতার মিছিল নির্বিকারভাবে আমাদের দলে' পিষে দিয়ে চলে যাবে। অনেকেই চেষ্টা করছেন যাতে আমরা পড়ে যাই, অনেকে ধাক্কা মারছেন, অনেকে লেংগি দিচ্ছেন, অনেক মুখোশধারী হিতৈষী উপদেশ দিচ্ছেন, শুয়ে পড়, শুয়ে পড়, এদের কাছে নির্বিচারে আত্মসমর্পণ করলেই সুফল ফলবে। আর এটাও সত্যি কথা, আমরা অনেক শুয়ে পড়েছি, ভীষণ প্রভঞ্জনের দাপটে অনেক বিশাল বিশাল

মহীরুহও আজ ধারাশায়ী। এদের তুলতে হবে। সবাইকে তোলবার সামর্থ্য আমার নেই। আমাদের গাঁয়ের যে ক'জনের খবর আমি পেয়েছি, তাদের কথাই আমি ভাবছি কেবল। আমি নিজেও পড-পড় হয়েছি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছি, পড়ব না। যেমন করে পারি দাঁড়িয়ে থাকব। তেলিপাড়ার মোহিনীকে মনে আছে? সে আজকাল দেহ বেচে পয়সা রোজগার করছে কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ছবি পিক্‌পকেট হয়েছে। শাপলা বাধ্য হয়ে বিয়ে করেছে একটা কসাইকে। বাবার বন্ধু তিনকড়ি শিরোমণি এখানে পালিয়ে এসে একটা তৃতীয় শ্রেণীর নেতার মোসায়েব হয়েছেন পেটের দায়ে। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উজ্জ্বল মেধা এখন নিযুক্ত হয়েছে চাটুকার বৃত্তিতে। তাঁর মতো পণ্ডিত লোক এখন 'জল উঁচু, জল নীচু' করছেন। আমরাও পালিয়ে এসে যে-নরক ঘাঁটছি যে-অপমান সহ্য করছি, মাঝে মাঝে মনে হয়, তার চেয়ে মৃত্যুও ভালো ছিল। আমি পণ করেছি, যখন মরিনি, তখন বাঁচার মতো বাঁচতে হবে। এবং সেই বাঁচার উপকরণ সংগ্রহ করতে হলে যদি সূক্ষ্ম নীতির পথ ত্যাগ করতে হয়, তা-ও করতে হবে। আমাদের যাঁরা ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেছিলেন, তাঁরা নীতির পথে চলেননি। আপনাকে সব কথা যখন খুলেই বলছি, তখন সবই বলব। বাঁচবার প্রধান উপকরণ টাকা আমরা সংগ্রহ করেছি অসদুপায়ে। তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আপনি না-ই জানলেন, আমিও সব জানি না। আমাদের দলে ক'জন লোক আছে, তা-ও আমি ঠিক জানি না। শুনেছি আট-দশজন। সবই হচ্ছে ডাক্তার ঘোষালকে কেন্দ্র করে। ওঁর মতো লোক আমি আর দেখিনি। অসুরের মতো লোক, পাহাড়ের মতো লোক, বজ্রের মতো লোক। প্রবল, অনড়, দুর্বার। যখন গুণ্ডারা আমাদের বাড়ি ঘিরে ফেলেছিল, তখন উনি আমাদের বাড়িতে ছিলেন। কয়েকদিন আগে এসেছিলেন বাবাকে দেখতে। বাবার জ্বর হয়েছিল। যখন এসেছিলেন, তখন অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ ওঁর সঙ্গে আমাদের কোন আলাপ ছিল না। পরে বলেছিলেন, আসলে উনি আমাকেই দেখতে এসেছিলেন নাকি, বাবার অসুখটা নাকি ছুতো। ডাক্তার ঘোষালের সরলতা, অকপটতা আর সত্য ভাষণের স্পষ্টতা ভয়াবহ। তিনি কোন কিছু রেখে ঢেকে বলেন না, বলতে পারেন না। তাঁর মনের নগ্নতা আর পাশবিক লুব্ধতার পরিচয় পেলে তাঁকে ঘৃণ্য জীব মনে করাই স্বাভাবিক। তাঁর আচরণও অনেকটা পশুর মতোই, কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর কাছে আমি আছি কেবল তাঁর সরল আন্তরিকতার জন্য। উনি নিজের জীবন বিপন্ন করে, নিজের সর্বস্ব ব্যয় করে আমাদের বাঁচিয়েছেন। উনি সে সময় না থাকলে আমরা কেউ বাঁচতাম না। অদ্ভুত ওঁর চরিত্র। ওঁর সঙ্গে রাত্রে পশুর মতন আমরা যখন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সন্তর্পণে পথ হেঁটেছি, তখন ওঁর চরিত্রে দেবতার মহত্ত্ব দেখেছি আমি। যে সময় উনি আমাদের সর্বনাশ করতে পারতেন, সে সময় উনি আমাদের গায়ে হাত পর্যন্ত দেননি। ওঁর চোখে কোনও কু-দৃষ্টি তখন দেখিনি। তারপর যখন সব বিপদ পার হয়ে এখানে এসে পৌঁছলাম, তখন উনি আমাকে একদিন

বললেন, 'তোমাকে আমার কাছে থাকতে হবে। আমি অসহায় লোক, আমার কেউ নেই, কিছু নেই। এমন কি, সচ্চরিত্রও নই। সারা জীবন নানা স্রোতে ভেসেছি, অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করেছি, বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি, কিন্তু কখনও হার মানিনি। ধাক্কা খেয়ে খেয়ে তুবড়ে গেছি, কিন্তু ভাঙিনি। একটা বিশ্বাস আমার আছে; আমি এখানেও জমিয়ে ফেলব। যেমন করে হোক টাকা রোজগার করব। কোথাও আমার টাকার অভাব হয়নি, এখানেও হবে না। কিন্তু যে জিনিসের অভাব আমার সারা জীবনে মেটেনি, সেই অভাবটা তুমি মেটাও। তুমি আমার ভার নাও। কিন্তু এ-ও বলে দিচ্ছি, আমার মতো বুনো শুয়োরের ভার নেওয়া সহজ নয়। আমি বারবার তোমার বাধানিষেধ চুরমার করে তছনছ করে দেব আমি এত বর্বর যে, তোমার গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা হবে না আমার, যত কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দেওয়া সম্ভব, তা-ও আমি দেব, তোমার চোখের সামনেই হয়তো এমন সব কাণ্ড করব, যা কোনও সাধারণ মেয়েমানুষ সহ্য করতে পারে না। অনেকে এসেছে, কিছুদিন থেকে সরে পড়েছে। আমাকে কেউ বুঝতে পারেনি, বুঝতে চায়ওনি। আমি আমার স্বভাব বদলে ভদ্র ভণ্ড হতে পারিনি, যদিও জানি, ওই ভদ্র ভণ্ডামির মুখোশটা সবাই পছন্দ করে। তোমার মতো মেয়ের অনেক ভালো পাত্র জোটা উচিত, কিন্তু আমি জানি জুটবে না। তুমি পাকিস্তানের রিফিউজি, এই তোমার সবচেয়ে বড় কলঙ্ক। আর এ-কথাটাও তো মিথ্যে নয় যে, আমি তোমাকে একটা মুসলমান গুণ্ডার আলিঙ্গন থেকেই উদ্ধার করেছিলাম। এই ঘটনার পর তুমি নিজেও কি কোনও ভদ্র পরিবারে গিয়ে স্বস্তি পাবে? আর এমন ভদ্র পরিবার কি এ দেশে আছে, যারা সব জেনেও তোমাকে সানন্দে বরণ করে নেবে? এ-দেশের পণ্ডিতরা নানারকম উদার বিধান দেন, কিন্তু সে-বিধান মানে না কেউ। এদেশের রাজনৈতিক পণ্ডিতরাও বক্তৃতার আসরে বড় বড় ফতোয়া দেন, কিন্তু কার্যকালে কোনটাই ফল প্রসব করে না। এ-দেশে ছুঁচিবাই বড় প্রবল। যদিও অবশ্য মজা, অধিকাংশ অশুচি জিনিসই গোবর, গঙ্গাজল স্পর্শে শুদ্ধ হয়, কিন্তু যে-স্ত্রীলোক পরপুরুষ স্পর্শ-দুষ্ট, তার আর শুদ্ধি নেই। সমাজে তাদের ভদ্রভাবে স্থান কিছুতেই হয় না।' অবশ্য ডাক্তার ঘোষাল ঠিক এই ভাষাতেই কথাগুলো বলেননি আমাকে। তাঁর ইংরেজী বাংলা মেশানো ভাষা তো আপনার জানা আছে, সেই ভাষাতেই বলেছিলেন। একটা ইংরেজী বাক্য মনে পড়েছে—

—The blessed cowdung and Ganges water purify every unholy objects in our country, except a ravished woman!

তাঁর কথা শুনে আমি চুপ করে ছিলাম খানিকক্ষণ, তারপর প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি কি আমাকে বিয়ে করতে চান? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন—বিয়ের বাঁধনটা কি খুব শক্ত বাঁধন? তা যে নয়, তার প্রমাণ সর্বদেশে, সর্বকালে অসংখ্য, অগণিত। বিয়ের একমাত্র সার্থকতা বংশধরদের পিতৃ-পরিচয়টায় পাকা সামাজিক দলিল করা। বিয়ে করা সত্ত্বেও অনেক সময় সে-পরিচয় পাকা হয় না, যিনি 'ক' বাবুর ছেলে বলে

পরিচিত, আসলে তিনি 'খ' বাবুর ছেলে। তা ছাড়া পিতৃ-পরিচয়ই কি সব সময়ে সুপরিচয়? মাতাল, চোর, চরিত্রহীন, অমানুষ বাবার ছেলেমেয়েরা কি পিতৃ-পরিচয়ে গৌরবান্বিত হয়? মানুষের গৌরব নিজের পরিচয়ে। আমি কয়েকটা মাত্র নাম করছি—যীশু খৃষ্ট, লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চি, আলেকজান্দার ডুমা—এঁদের পিতৃ-পরিচয় কুয়াশায় ঢাকা, কিন্তু তবু এঁরা নিজেদের আকাশে প্রদীপ্ত সূর্যের মতো জ্বলছেন। আইনসঙ্গত পিতৃ-পরিচয় নেই বলে' এঁদের কেউ অবহেলা করতে সাহস করেনি। মানবসভ্যতাকে অলঙ্কৃত করেছেন এঁরা। পুরাণেও এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে। সূতপুত্র কর্ণ, দাসীপুত্র বিদুর, ঘটোদ্ভব দ্রোণ, এঁরা কি হেয়? আমি বললাম, 'এসবের উত্তর যুক্তি দিয়ে দেওয়া কঠিন। ওটা ব্যক্তিগত রুচি আর সংস্কারের কথা। আপনি আমাকে আপনার ভার নেওয়ার কথা বলছেন, কিন্তু যে আইনের জোর থাকলে সে-ভার নেওয়া যায়, সেটা আপনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন। আপনার সঙ্গে ভবিষ্যতে যদি না বনে, আর আপনি যদি আমাকে দূর করে দেন, তখন কয়েকটা জারজ সন্তান নিয়ে আমি কোথায় যাব, কে আমাকে আশ্রয় দেবে? কর্ণের কথায় এখানে যাত্রা-থিয়েটারে হাততালি পড়তে পারে, কিন্তু কর্ণের নজিরে কেউ আমার জারজ সন্তানদের সুচক্ষে দেখবে না।' ডাক্তার ঘোষাল লাফিয়ে উঠলেন—'বিয়ে করার পরও তোমাকে যদি দূর করে দি, সমাজ তোমাকে ঠাঁই দেবে'কি? কোর্টে গিয়ে তুমি মকদ্দমা লড়তে পারবে? বেশ চল, এক্ষুনি তোমাকে বিয়ে করে ফেলছি। তিন আইনে বিয়ে হবে কিন্তু। পুরুত টুরুত ডাকতে পারবে না।' বলেই তিনি আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলেন বাইরে। আমি বললাম, 'দাঁড়ান, এত তাড়াতাড়ি এসব জিনিস হয় না। আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন। আমার বাবা-মা যদি সম্বন্ধ করে প্রাচীন প্রথায় আপনার সঙ্গে বিয়ে দিতেন, তা হলে আমার কিছু বলবার থাকত না। চোখ বুজে অদৃষ্টকে মেনে নিতাম। কিন্তু তা যখন হচ্ছে না, তখন আমাকে ভাবতে সময় দিন একটু। একবার দুবার নয়, দশ-দশবার আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে ভেঙে গেছে। আমি দশবার নীরবে নতমুখে অপরিচিত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে রূপের পরীক্ষা দিয়েছি, 'দশবার আমার ঠিকুজি-কুষ্ঠি নিয়ে পণ্ডিতেরা বিচার করেছেন, দশবার দশটা চামার এসে পণ নিয়ে বাবার সঙ্গে দর-কষা-কষি করেছে, আমি বাবার মুখ চেয়ে কিছু বলিনি, কিছু ভাবিনি। আজ আমার জীবনে এই প্রথম সুযোগ এসেছে ভাববার, আমি বিয়ে করব কি না, করলেও আপনাকে করব কি না। আমাদের জন্য আপনি যা করেছেন, তা আমাদের পরমাত্মীয়েরাও করেনি, এজন্য আপনার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার গৃহস্থালির সমস্ত ভারও আমি বইব, কিন্তু আপনাকে বিয়ে করব কি না, তা ঠিক করতে একটু সময় চাই। আর একটা কথাও এইসঙ্গে বলে রাখছি—আমি প্রত্যাশা করব, আপনি আমার নারীত্বের সম্মান অক্ষুন্ন রাখবেন।' ডাক্তার ঘোষাল হাসিমুখে চুপ করে রইলেন একটু। তারপর বললেন, 'আমি ভণ্ডামি করতে পারি না, I am incapable of wearing a mask। আমি শিশুর মতো লোভী, পশুর মতো

নিরঙ্কুশ। আমি যে নিজেকে সংবরণ করে রাখতে পারব, এ-ভরসা তোমায় দিতে পারি না খুব সম্ভবত বারবার তোমার so-called নারীত্বকে ক্ষুণ্ণ করবার চেষ্টাই আমি করব। কিন্তু তোমাকেও আত্মরক্ষা করবার অধিকার দিলুম। তুমি আমার বেচাল দেখলে যেমন করে পার নিজেকে বাঁচিও। আমাকে লাথিও, জুতিও, দরকার হলে গুলি চালিও। আমি এ বিষয়ে তোমাকে blank cheque দিয়ে দিচ্ছি। আমি নিজেকে বদলাতে পারি না, পারো যদি তুমি আমাকে বদলে দাও, it is for you to do and that will be a great act if you can. আমি খানিকটা কাদার তাল, আমাকে বলা বৃথা তুমি হেন হও, তুমি তেন হও। আমি কাদা, আমি কিছুই হতে পারি না, যতক্ষণ না কেউ আমার ভার নিচ্ছে। তুমি আমাকে নিয়ে যা খুশি বানাও —পুতুল, প্রতিমা, মূর্তি, হাঁড়ি, কলসী, সরা—যা খুশি তোমার।' ওই দুর্ধর্ষ লোকটার মুখে এ-কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, 'আপনাকে কাদা বলে কখনও ভাবিনি, ভাবতে পারি না।, ডাক্তার ঘোষাল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'না, না, ভুল বলেছি, কাদা নয়, পাঁক। তুমি যদি আমার ভার নাও, পঙ্কোদ্ধার করতে হবে।' সেই থেকে ডাক্তার ঘোষালের কাছে আছি এবং তাঁর সমস্ত ভার নিয়েছি। আর জানি না এ-কথাটা বললে বিশ্বাস করবেন কি না, তবু বলছি, এ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পেরেছি। ডাক্তার ঘোষাল মহিশাসুরের মতো দুর্দান্ত, যা মুখে আসে বলেন, অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেন, কথায় কথায় তেড়ে যান, গায়ে হাত দিতেও কসুর করেন না, কিন্তু তবু বিশ্বাস করুন, আমার আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ আছে। ওঁকে আমি ছেড়ে যেতে পারিনি, তার কারণ শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, তার কারণ আরও গভীর। ওঁর মধ্যে সকল পৌরুষের প্রবল প্রকাশ লক্ষ্য করেছি, তা নগ্ন হলেও বিরল। ওঁকে যদি সত্যি ভালো করে' গড়তে পারি, তা হলে তা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হবে। ওঁকে ছেড়ে না যাবার গভীরতর কারণও কিছু আছে, কিন্তু তা নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি, কারণ তা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। কারও সঙ্গে আলোচনা করে ও বিষয়ে কেউ কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি, আমিও পারব না। ও কথা থাক। যেজন্য বিশেষ করে আপনাকে এই চিঠিটা লিখছি, সেই কথাটা এইবার বলি। আপনি আমাদের দলে আসুন। আমাদের দল কিসের দল, তা দলে যোগ না দিলে ঠিক বোঝাতে পারব না আপনাকে। আপনাকে যে টাকা দিয়ে এসেছি, তা ওই দলের টাকা, কোথাও নিরাপদে রাখবার সুযোগ না পেয়ে আপনার কাছে দিয়ে এসেছি, আপনি আপনার কাছে কিছুদিন রেখে দিন ওটা। পরে আপনার কাছ থেকে নিয়ে আসব। আমাদের দল কিসের দল, তার একটু ইঙ্গিত দিচ্ছি আপনাকে উপমার সাহায্যে। আমাদের দল পিপাসিতের দল। তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে তাদের, কিন্তু নির্মল জল কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না তারা তাই নালা-নর্দমা থেকে আজলা আজলা জল তুলে খাচ্ছে, আর সবাই হাসছে তাই দেখে। আমাদের আদর্শ হচ্ছে ওদের জন্য নির্মল জল সংগ্রহ করা। ওই মোহিনীকে, শাপলাকে, ছবিকে, তিনকড়ি

শিরোমণিকে, আমার বোন শামুককে, আমার যতীশ কাকাকে নির্মল জলের সন্ধান দিতে হবে। ভেবেছিলাম, এ-দেশেই সে-জলের সন্ধান পাওয়া যাবে, কিন্তু দেখছি—যাবে না। এখানে সমস্তই কলুষিত। ধর্ম-মন্দির, বিদ্যামন্দির, ন্যায়প্রতিষ্ঠান, সমস্তই অন্যায়ে পরিপূর্ণ। এ ঘুষের দেশ, খোশামোদের দেশ, স্বার্থপর পশুর দেশ. এ-দেশে প্রতি পদে আত্মসম্মান বলি না দিলে কোন কিছু পাওয়া যায় না। তাই ঠিক করেছি, এ-দেশে আর থাকব না আমরা। ভারতবর্ষের অনেক লোক আজ বিদেশে গিয়ে বাস করছে, সেখানে সসম্মানে আছে তারা, নির্মল জলের সন্ধান পেয়েছে অনেকে। আমাদের বর্তমান সভ্যতার আসল উৎস যেখানে, সেইখানে যাওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ। এ-দেশে এঁরা 'হিন্দী হিন্দী' বলে বাইরে যতই আস্ফালন করুন, মনে-প্রাণে সকলেই সাহেব, নকল সাহেব, যাঁদেরই পয়সায় কুলিয়েছে, তাঁরাই তাঁদের নিজেদের ছেলে-মেয়েদের বিদেশে পাঠিয়েছেন শিক্ষার জন্য। এই স্বদেশী হিন্দুস্থানের প্রতি দপ্তরে আজও বিলিতি ডিগ্রীর বেশী কদর। এ-দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাওয়ার জন্য এ-দেশী ভাষারও ডিগ্রী আনতে ছুটতে হয় লণ্ডনে, জার্মানীতে, আমেরিকায়। তবে ভালো চাকরি জোটে। সংস্কৃতের আসনে কাশী বা নবদ্বীপের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা কলকে পান না, সে-আসন অলঙ্কৃত করেন বিদেশী ডিগ্রীধারীরা। অতি মূর্খ হিন্দী ভাষার লণ্ডনী ডি-লিটরা এ-দেশের বড় বড় পণ্ডিতদের মাথায় পা দিয়ে উপরে উঠে গেছেন। বিদেশে সংস্কৃতির আঁস্তাকুড় ঘেঁটে এসে এ-দেশের কৃতী সাহিত্যিক শিল্পীরা কৃতার্থ। বিদেশের মোহ আমাদের যায়নি, বেড়েছে। নূতন নাগপাশে বাঁধছে আমাদের সে-মোহ। গান্ধী বা রবীন্দ্রনাথের গঙ্গাজল ছিটিয়ে বিদেশী ছাঁচেই ঢালা হচ্ছে এ-দেশের সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সব। শুধু যে যন্ত্রের জন্যই আমরা ওদের কাছে ঋণী তা নয়, ওদের পায়ে আমরা আমাদের আত্মা, সত্তা সব বিকিয়ে দিচ্ছি ক্রমশ। বড় বড় পণ্ডিতেরাও বলছেন—সীমান্ত সব ভেঙে দাও। কবির স্বপ্ন সফল হোক—জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে-জাতির নাম মানব জাতি। এই যদি আদর্শ হয়, তা হলে আমরা পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে এ-দেশের বনে-বাদাড়েই বা শিয়াল-কুকুরের মতো থাকব কেন। আমরা ইংলণ্ডে যাব, জার্মানীতে যাব, আমেরিকায় যাব, অস্ট্রেলিয়ায় যাব, জাপানে যাব, চীনে যাব, রুশে যাব। যেখানে নির্মল জলের সন্ধান পাব, সেইখানেই যাব। 'জু'দের কথা, 'জিপ্‌সি'দের কথা নিশ্চয়ই আপনি জানেন। তাদের উপর কি পাশবিক অত্যাচার হয়েছে, তাও নিশ্চয় আপনার অবিদিত নেই। 'জু'রা, 'জিপসী'রা আজ সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে। শুধু ছড়িয়ে নেই, তারা তাদের সম্মান আজ পৃথিবীর সভ্য-সমাজের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। বাঙালীরা যদি ভদ্রভাবে বাঁচতে চায়, তা হলে তাদেরও তাই করতে হবে। এ-দেশে তাদের কোন আশা নেই। ভালো হবার, বড় হবার সুযোগই পাবে না তারা। আর সুযোগ না পেলে যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলবে ক্রমশ। এখন কথা হচ্ছে, বিদেশে আমাদের থাকতে দেবে কেন? পাসপোর্ট ভিসা কিছুই পাওয়া যাবে না। আমাদের দলের একজনের সঙ্গে বিদেশগামী এক জাহাজের

ক্যাপটেনের আলাপ আছে। তিনি খানিকটা আশ্বাস দিয়েছেন। তবে তিনি এ-ও বলেছেন, এর জন্তে টাকা চাই। এক-আধ টাকা নয়, অনেক টাকা। বিদেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে ভিখারীর বেশে গেলে চলবে না। ভিক্ষুকের সম্মানিত স্থান কোনও সভ্য দেশে নেই। নিজেদের খাওয়া-পরার সম্বল নিয়ে যেতে হবে। তাই আমরা টাকা সংগ্রহ করছি। এই টাকারই কিছুটা আপনার কাছে রেখে এসেছি সেদিন। ইতিহাসে পড়েছি, বাঙালীরা একদিন ভারতবর্ষের বাইরে নিজেদের কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। বিজয় সিংহ লঙ্কা জয় করেছিলেন—'শ্যাম, কম্বোজ, ওঙ্কারধাম, মোদেরই প্রাচীন কীর্তি' লিখে গেছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ। এসবের ঐতিহাসিক প্রমাণও আছে অজস্র। আমরা এ-যুগের গৃহহারা বাঙালীর দল কি ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে কোনও কীর্তির বুনিয়াদ গাঁথতে পারব না? পারি আর না পারি, চেষ্টা করে দেখতে হবে। এ-স্বপ্ন হয়তো হাস্যকর, এ অবাস্তব কল্পনা হয়তো উপহাসেরই খোরাক যোগাবে, তবু ঠিক করেছি, দুঃসাধ্য হলেও একেই সফল করবার চেষ্টা করব। কারণ এটা নিঃসংশয়ে বুঝেছি, যে বাঙালীর ছেলেমেয়েরা বুকের রক্ত দিয়ে 'অসহ্য কষ্ট বরণ করে' একদিন স্বাধীনতা-যজ্ঞের হোমাগ্নি জ্বেলেছিল, তাদের বংশধরদের স্বাধীন ভারতে কোনও সম্মানের স্থান নেই। তারাই আজ সবচেয়ে বেশী আহত, সবচেয়ে বেশী অপমানিত। দুঃখ-দারিদ্র্য অপমান-অবহেলার চাপে তারা আত্মসম্মানও হারিয়ে ফেলেছে। সম্মানের আসন না পেলে বাঙালী বাঁচতে পারে না। সে-আসন আপাতত এ-দেশে আর নেই, যা আছে তা ভণ্ডামির ন্যাক্কারজনক মুখোশ। বিদেশে আছে কি না, সেইটে খুঁজে দেখতে হবে। আপনাকেও আমাদের দলে চাই। আপনি আমাদেরই, আপনাকে আমি ছাড়ব না। বুলিকে খুঁজে বার করতে হবে। তারপর সবাই মিলে আমরা যাত্রা করব নূতন শ্যাম-কম্বোজের সন্ধানে, ভাসব অজানা সমুদ্রে, আবার প্রতিষ্ঠিত করব নিজেদের হয়তো অখ্যাত কোনও দ্বীপে বা বিখ্যাত কোনও শহরে। কিন্তু এদেশে আর নয়। আপনার সঙ্গে আবার একদিন দেখা করব এসে। আজ এইখানেই থামি। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন। ইতি— ঝিনুক

চিঠিটা পড়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন গণেশ হালদার। তাঁর মনে হতে লাগল তিনি যেন একটা নূতন দেশে গিয়েছিলেন, নূতন পরিবেশে নিশ্বাস নিচ্ছিলেন, নূতন আশার রঙীন আলোয় রঙীন স্বপ্ন দেখছিলেন। চিঠিটা শেষ হওয়া মাত্রই যেন সব শেষ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, ক্রমশ তাঁর মনে হতে লাগল ঝিনুক যা লিখেছে তা কি অসম্ভব কল্পনা-বিলাস মাত্র? তা কি সম্ভব হতে পারে না? তারপর হঠাৎ মনে হল এ বিষয়ে ডাক্তার সুঠাম মুখার্জির সঙ্গে পরামর্শ করলে কেমন হয়। তিনি হয়তো আমাদের পথ দেখাতে পারবেন। ঝিনুক ঠিকই লিখেছে এ-দেশে থাকলে আমাদের উন্নতির আশা নেই, brute mejority-র পায়ের তলায় আমাদের গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে আপত্তি নেই, যদি সবাই সব প্রদেশে সমান মর্যাদা পায়, কিন্তু তা তো হচ্ছে না, বাংলার বাইরে বাঙালীর স্থান নেই, বাংলার

ভিতরেও নেই। আমরা কোথায় যাব তা হলে? তখনই, তার মনে হল প্রাচীন কালের বাঙালী আর আধুনিক বাঙালী কি এক? পোশাক-পরিচ্ছদে আহারে-বিহারে সাহিত্যে-শিল্পে তারা কি বদলায় নি? নূতন যুগের নূতন উপাদান নিয়ে সে যদি আরও বদলায় তাতেই বা ক্ষতি কি? পরিবর্তনই তো জীবনের লক্ষণ।

তারপর ঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে তিনি উঠে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে দাইয়ের গলা শোনা গেল—"মাস্টারবাবু, ভাত এনেছি, আসেন। ইস্কুলের টাইম হয়ে গেলো।" গণেশ হালদার বাইরের ঘরে বসে ছিলেন, ভিতরের দিকে গেলেন। দাই টেবিলের উপর খাবার সাজিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মাস্টার মশাই খেতে বসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিজয়ও এসে প্রবেশ করল। তার হাতে একটা বাটি।

"ফুফু মাস্টালজিকে বাস্তে তলকালি ভেজি দেলকে।"

(পিসি মাস্টারজির জন্ম তরকারি পাঠিয়ে দিয়েছে।)

দাই একমুখ হেসে বললে, "আমার বেটী ভালো পাকায় (রাঁধে)। খাবেন? মটর শাগের ভুঁজি আছে।"

"দাও।"

অন্যমনস্কভাবে খেতে লাগলেন গণেশ হালদার। কিছু মন্তব্য করলেন না মটর শাকের ভুঁজির বিষয়ে। ঝিনুকের চিঠির কথাই তাঁর মাথায় ঘুরছিল। দাই কিন্তু অন্যরকম ভেবে বসল।

"কেন যে মেয়েটা তরকারি ভেজে দেয় (পাঠিয়ে দেয়) বুঝি না। বাবু ভেইয়ার কি ইসব পসিন (পছন্দ) হয়? ঝুটমুট ঝঞ্ঝাট।"

দাইয়ের অভিমানাচ্ছন্ন মুখের দিকে চেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন হালদার। বললেন, "শাকভাজা তো চমৎকার হয়েছে। তোমার মেয়ে চমৎকার রাঁধতে পারে দেখছি।"

হাসি ফুটল দাইয়ের মুখে।

"হাঁ আচ্ছাই রিনে (রাঁধে), হামারদের তো খুব ভালো লাগে।"

"আমারও ভাল লাগছে। কি করে তোমার মেয়ে?"

"বাড়িতেই থাকে। বিধবা হোয়ে গেল সেদিন। এখন ভাইয়ের সংসার সামহারছে (সামলাচ্ছে)। আর কি করবে? সবই নসিব।"

হঠাৎ মুর্গি ডেকে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটল বিজয়। মুর্গি ডিম দিয়েছে, ডিমটা তাকে সংগ্রহ করতে হবে।

দাই বেরিয়ে ডাকতে লাগল, 'রকেট, রকেট।'—রকেট ছুটে এল। রকেট দাইকে খুব ভালবাসে।

"রকেটকে ডাকলে কেন?" হালদার মশাই জিজ্ঞাসা করলেন।

"বড় বদমাশ যে, এখনি বিজয়ের হাত থেকে আণ্ডাটা ছিনে নেবে। বৈঠ, বৈঠ বদমাশ!"

রকেট বসল। মাস্টার মশাই খেতে লাগলেন।

॥ ১৩ ॥

ডাক্তার সুঠাম মুখোপাধ্যয়ের নিজের একটি ছোট গোলাপবাগান আছে। বেশী গাছ নেই। পঁচিশটি মাত্র. কিন্তু সেই বাগানেই অনেকক্ষণ সময় কাটে তাঁর। সেদিন সকালে তিনি বাগানে ঘুরে ঘুরে কুঁড়িগুলির উপর পোকা-তাড়ানো ওষুধ দিচ্ছিলেন। রকেটও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল, যেন সে-ও এসবের খুব বড় সমজদার। ডাক্তার মুখার্জি তাকে মাঝে মাঝে ধমকাচ্ছিলেন।

"তুই ঢুকেছিস কেন এখানে, ছোট গাছগুলো মাড়িয়ে দিবি।"

দিন সাতেক আগে নূতন গাছ এনে পুঁতেছিলেন তিনি কয়েকটা। নিতান্তই ছোট্ট, ভয় হচ্ছিল রকেটের থাবার চাপে সেগুলো জখম না হয়। রকেট কিন্তু খুব সন্তর্পণে গাছগুলো বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ঘুরছিল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। ডাক্তার মুখার্জির এ ভয়ও হচ্ছিল বড় গাছগুলোর লম্বা লম্বা ডালপালার কাঁটায় ও ক্ষত-বিক্ষত না হয়ে যায়। কিন্তু রকেট তাও বাঁচিয়ে চলছিল বেশ। কুকুর নয়, যেন মানুষ। বেশ মজা লাগছিল সুঠাম মুকুজ্যের। এই নিয়েই মশগুল হয়ে ছিলেন তিনি। জাম্বু বা ভুটানের এসব বিষয়ে তেমন আগ্রহ নেই। জাম্বু বুড়ো হয়ে গিয়ে সব বিষয়ে যেন উদাসীন হয়ে পড়েছে। ডাক্তার মুখার্জি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন সিঁড়ির উপর যেখানে রোদটি এসে পড়েছে সেইখানে বেশ আরামে শুয়ে আছে সে। আর ভুটান গেটের ফাঁকে মুখটি লাগিয়ে দেখছে নিবিষ্ট চিত্তে বাইরের রাস্তাটা, যদি দৈবাৎ কোন প্রণয়িনীর আভাস পায়। সে জানে ডাক্তার মুখার্জি তাকে রাস্তায় বেরুতে দেবেন না, সে যা করছে তা-ও বে-আইনী, তবু ডাক্তারবাবুর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিতে সে ছাড়ে না। যখনই সুবিধা পায় গেটের ফাঁকে মুখটি লাগিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে পথের দিকে।

"ভুটান, ভুটান, এদিকে আয়।"

হাঁক দিলেন ডাক্তারবাবু। ভুটান ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একবার, কিন্তু এল না।

"আয়, এদিকে আয়।"

ধমকে উঠলেন ডাক্তারবাবু। তখন সে কেঁচোর মতো এঁকেবেঁকে আসতে লাগল ঘাড় নীচু করে।

"আয়, আয়—"

রকেট দৌড়ে চলে গেল তার কাছে। আলতোভাবে তার কানটা ধরে টানতে লাগলো।

খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল ভুটান। জাম্বু সামান্য একটু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলে ব্যাপারটা, তারপর যেমন শুয়ে ছিল, তেমনি শুয়ে রইল।

"রকেট, কাম হিয়ার। ভুটানকে বিরক্ত ক'রো না।"

রকেট দু-একবার অবাধ্যতা করবার চেষ্টা করল বটে কিন্তু ডাক্তারবাবুর হাঁকা-হাঁকিতে শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে হল তাকে।

ডাক্তারবাবু বাগান থেকে বেরিয়ে মাঠে গিয়ে বসলেন চেয়ারে। আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। দেখলেন একটা অদ্ভুত জিনিস। কয়েকটা সাদা মেঘ মিলে একটা ময়ূরপঙ্খী রচনা করেছে, পাল তুলে ভেসে চলেছে বিরাট একটা নৌকো আকাশ-সমুদ্রে। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন সেদিকে।

"গুল্‌লি দে নি।"

(গুলি দাও না।)

চেয়ারের পিছনে বিজয় কখন এসে দাঁড়িয়েছে তা তিনি টের পাননি। প্রায়ই তাকে কাঁচের গুলি কিনে দেন তিনি, আর প্রায়ই সে হারিয়ে ফেলে।

"সেদিন যে বারোটা গুলি কিনে দিলাম, কি করলি ?"

"হেলা গেলে।"

(হারিয়ে গেছে।)

ধমকে উঠলেন ডাক্তারবাবু।

"রোজ রোজ তোকে গুলি কিনে দেব আর রোজ তুই হারিয়ে ফেলবি ? আর দেব না, যা—"

রুকমিনীর মেয়ে (দাইয়ের মেয়ে রুকমিনী) পাকিয়াও দাঁড়িয়েছিল এসে। সে সরু গলায় বললে, "উ জংগল মে গুললি ফেকি দেইছে বাবু—"

(ও জঙ্গলে গুলি ফেলে দেয়, বাবু।)

বিজয়ের উপর পাকিয়ার হিংসে আছে একটু। বিজয় নির্বাক হয়ে চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইল পাকিয়ার দিকে। সে যে এত বড বিশ্বাসঘাতিকা হতে পারে এ তার ধারণার অতীত ছিল।

গুলিগুলোকে জঙ্গলের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার খুঁজে বার করা এই ছিল খেলা, পাকিয়াও সে খেলায় যোগ দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব গুলিগুলোই হারিয়ে গেল, একটাও খুঁজে পাওয়া গেল না। পাকিয়া যে এ-কথাটা ডাক্তারবাবুকে বলে দেবে তা বিজয় ভাবতেই পারেনি। অথচ ডাক্তারবাবুর কাছে সব কথা খুলে বলবারও উপায় নেই। সে চোখ পাকিয়ে রইল পাকিয়ার দিকে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে। তারপর ডাক্তারবাবুর পিছনে গিয়ে ছোট্ট ঘুঁষি তুলে পাকিয়াকে জানিয়ে দিল যে, এর প্রতিশোধ সে নেবে যথাসময়ে।

ডাক্তারবাবু বললেন, "পিছনে কি করছিস, সামনের দিকে আয়।"

বিজয় সামনে এল। ডাক্তারবাবু ছদ্মক্রোধে চেয়ে রইলেন তার দিকে। হঠাৎ তাঁর মনে হল বিজয়ের গাল দুটো বেশ চকচক করছে। এ সময়ে তেল মেখেছে নাকি ?

"গালে কি মেখেছিস ?"

"কিলিম।"

"কিলিম কি ?"

পাকিয়া ব্যাখ্যা করল, "কিরিম, কিরিম।"

তখন ডাক্তারবাবু বুঝতে পারলেন ক্রীম লাগিয়েছে।

"ক্রীম কোথা পেলি ?"

বিজয় তখন বুক ফুলিয়ে বললে, "মাইজি লাগা দেলকে।"

(মাইজি লাগিয়ে দিয়েছে।)

পাকিয়া বলল, "হাম কো ভি দেলকে।"

(আমাকেও দিয়েছে।)

এগিয়ে এসে ঘাড় বেঁকিয়ে গালটা দেখাল। ডাক্তারবাবু দেখলেন তার গালেও ক্রীম লাগানো। তারপর পাকিয়া জিনিসটাকে আরও বিশদ করে বলল—"জাড়ো মে গাল ফাট যাইছে নে ? ওহি বাস্তে লাগা দেলকে।"

(শীতকালে গাল ফেটে যায় কিনা, তাই লাগিয়ে দিয়েছে।)

ডাক্তারবাবু রোজ বিজয়ের দৈনন্দিন খবর নেন।

"বিজয় কাল দুপুরে কি করেছিলি ?"

পাকিয়া উত্তর দিলে, "কাদো গিঁজে ছেলে, বাবু।

(কাদা ঘাঁটছিল বাবু।)

বিজয় চোখ বিস্তারিত করে চেয়ে রইল তার দিকে, তারপর বলে উঠল, "ঝুঠ্‌ঠা। হাম্‌ কালী মুর্‌তি বানাইছেলে, বাবু।"

(মিছে কথা। আমি কালী মূর্তি বানাচ্ছিলাম, বাবু।)

"কই দেখি, কি রকম মুর্তি বানিয়েছিস ?"

সমস্যাটার যে এত সহজে সমাধান হয়ে যাবে বিজয় তা ভাবেনি। সে ছুটে গিয়ে লিলির ঝোপের পিছন থেকে তার মূর্তি নিয়ে এল। একটা বড় কাদার ডেলার উপর আর একটা ছোট্ট ডেলা। ছোট্ট ডেলাটার দুপাশ থেকে আঙুলের মতো লম্বা লম্বা কি নেমে এসেছে। কালী মূর্তির সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য নেই, কিন্তু বিজয় বলল বড় ডেলাটা কালী মুর্তির ধড়, ছোট ডেলাটা মাথা আর ওই আঙুলের মতো জিনিস দুটো হাত।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "চোখ কই ? আঁখ কাঁহা ? কালী মাই কি অন্ধী ছে ?"
(কালি মা কি অন্ধ ?

"দেখো নি আচ্ছা করি কে। ছে আঁখ।"

(ভালো করে দেখ না। চোখ আছে)

ডাক্তারবাবু ভালো করে দেখলেন। সত্যিই ছোট ডেলাটার দু-পাশে ছোট ছোট দুটো গর্ত রয়েছে।

সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন ডাক্তারবাবু, "বাঃ, চমৎকার হয়েছে। তুই তো দেবী-প্রসাদকে হার মানিয়ে দিবি দেখছি। আচ্ছা, তোকে গুলি এনে দেব আজ।"

পাকিয়াও ফরমাশ করল।

"হামারা বাস্তে ভি কুছু লাইও। হামরা কঢ়াই আর হাঁড়িয়া টুটি গেলছে।"

(আমার জন্যেও কিছু এনো। আমার কড়াই আর হাঁড়ি ভেঙে গেছে।)

ডাক্তারবাবু কিছুদিন আগে পাকিয়াকে এক সেট খেলা-ঘরের বাসন কিনে দিয়েছিলেন।

বিজয় এবার সুযোগ পেল।

"ওকলা, হাঁলিয়া, কলহাই, চুলহা, খনতি, সব হলায় গেলে।"

(ওর হাঁড়ি, কড়াই, উনুন, খুনতি সব হারিয়ে গেছে।)

"তোহি তো সব ফেক ফেক দেইছে।"

(তুই তো সব ফেলে ফেলে দিস।)

ফোঁস করে উঠল পাকিয়া।

মৃঠাম মুকুজ্যে আর মীমাংসার মধ্যে গেলেন না। তিনি বুঝলেন, গুলি আর খেলনা আবার কিনে আনতে হবে। পাছে ভুলে যান সেজন্য বেচুকে ডেকে বলে দিলেন। তারপর এক হৈ হৈ কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। ভেড়াটা খুলে গেল হঠাৎ আর রকেট গেল তাকে তাড়া করে। ভেড়াটার নাম ভেটুক। সে ভালো মানুষ লোক, গায়ে হাতটাত বুলিয়ে দিলে আপত্তি করে না। সর্বাঙ্গে বড বড লোম। মুনি ঋষির মতো চেহারা। দেখলে সমীহ করতে ইচ্ছে করে। রকেট তাড়া করে গেল বটে কিন্তু একটু এগিয়েই থেমে যেতে হল তাকে। দ্রুত ছন্দে দুবার খটখট শব্দ করে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ভেটুক। রকেট আর এগোতে সাহস করল না। ঘাড়টা নীচু করে একটু দূর থেকে লম্বা ল্যাজটা নাড়তে লাগল কেবল।

"রকেট, কাম হিয়ার।"

"কাম হিয়াল"—বিজয়ও বলল।

"হিঁয়া পর আ বিজৈয়া। ভেড়োয়া বড়া মারখুণ্ডা ছে।" (বিজয় এখানে চলে আয়, ভেড়াটা বড় গুঁতুনে।)

ডাক্তারবাবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন পাকিয়া টপ করে পেয়ারা গাছটায় উঠে পড়েছে। এই ছোট পেয়ারা গাছটায় ফল হলে সেগুলো মুড়িয়ে খায় ওরা দুজনেই। শালিয়া, মালিয়াও (বিজয়ের বোন) জোটে। হনুমানরাও লুটপাট করে যখনই সুযোগ পায়। গাছটার একটা ডাল খুব নীচু বলে গাছটাতে ওঠাও যায় সহজে।

পাকিয়াকে দেখে ডাক্তারবাবু হেসে ফেললেন। বিজয় কিন্তু গম্ভীর। সে সবিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে বলল, "দেখলো, দেখলো ?"

(দেখলে, দেখলে ?)

তার ভাবটা যেন দেখলে আমাদের বিপদের মুখে ফেলে ও কেমন স্বচ্ছন্দে গাছে উঠে বসে আছে।

"রকেট, কাম হিয়ার।"

"কাম হিয়ার, রকেট—"

বিজয় একটা ছোট কঞ্চিও তুলে নিল, কি জানি ভেড়াটা যদি তেড়ে আসে!

"কাম হিয়ার রকেট—"

রকেট কিন্তু অবাধ্যের মতো দাঁড়িয়ে রইল। একটা ভেড়ার কাছে পরাজয় স্বীকার করে তাকে ফিরে যেতে হবে এতে অপমানে যেন তার মাথা কাটা যাচ্ছিল। ঘেউ ঘেউ করতে করতে আর একটু এগোবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভেটুক আবার খটাখট শব্দ করে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়াল। সামনের পা দুটোর খুরে খুরে ঠোকাঠুকি করেই সে শব্দটা করছিল সম্ভবত। বেশ মজা লাগছিল ডাক্তারবাবুর। তিনি আর রকেটকে ডাকলেন না। ভাবলেন এই দ্বন্দ্বে কে জয়ী হয় দেখা যাক। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটল আর এক কাণ্ড। মুংলি (মঙ্গলা) গাইটা হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে এসে আক্রমণ করল রকেটকে পিছন থেকে। রকেট রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুটে পালাল। হাততালি দিয়ে হেসে উঠল বিজয়, হাসির একটা ঝরনা বয়ে গেল যেন। মুংলি ভেটুকের খুব বন্ধু। দু'জনা এক গোয়ালে থাকে। দৈবাৎ যদি মুংলি দড়ি খুলে বাইরে চলে যায়, ভেটুক ডাকতে থাকে। যতক্ষণ মুংলিকে আবার গোয়ালে ফিরিয়ে না আনা হয়, ততক্ষণ তার ডাক থামে না। মুংলির কাণ্ড দেখে ডাক্তার মুখার্জির মনে পড়ল গত যুদ্ধে আমেরিকার যোগদানের কথা। আমেরিকা যোগ না দিলে হিটলারকে হারানো সম্ভব হত কি? হঠাৎ ভয় হল ডাক্তার মুখার্জির। মুংলি আসন্ন-প্রসবা। এ অবস্থায় এত লাফালাফি করা কি ভালো? এসব ব্যাপারে দুর্গাই একমাত্র সহায়।

"দুর্গা—দুর্গা—"

রোগা পাতলা দুর্গা ছুটতে ছুটতে এল বাড়ির ভিতর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে 'সিচুয়েশন' 'কন্‌ট্রোলে' এসে গেল। রকেট ছুটে আত্মরক্ষা করছিল।

"এই রকেট—ইধার আ।"

দুর্গা প্রথমেই তাকে নিয়ে বেঁধে ফেললে। তারপর মুংলির দিকে ফিরে বললে, "আ, চল।" এগিয়ে গিয়ে তার গলার দড়িটা ধরে ফেলল। দাঁড়িয়ে রইল মুংলি, আপত্তি করল না। তার পর ভালমানুষের মতো তার সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালঘরের দিকে চলল। ভেটুকও চলল পিছু-পিছু। শান্তি পুনঃস্থাপিত হল।

ডাক্তারবাবু হেঁকে বললেন, "দুর্গা, অনেকদিন গোলাপবাগানে ঢোকা হয় নি। ওকে বেঁধে আয়।"

দুর্গা আসতেই তিনিও তার সঙ্গে বাগানে ঢুকলেন।

"সব গাছগুলো আজ খুঁড়ে দে ভালো করে। কাল জল দিস।"

দুর্গা এসেই ত্বরিত হস্তে খুঁড়তে আরম্ভ করে দিয়েছিল একটা গাছ।

"আচ্ছা—"

ডাক্তারবাবু একটা গোলাপকুঁড়ির দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। একটা কথা তাঁর মনে হল যা আগে কখনও হয়নি। একটা কুঁড়ি ফুটতে কত সময় লাগে? কেউ কি এর খবর রেখেছে কখনো? প্রতি গাছই কি এক সময় নেয়? এর সঙ্গে আলোবাতাসের সম্বন্ধ আছে কি? উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর কল্পনা। তিনি বাগান থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা খাতা নিয়ে এলেন। অনেক ডায়েরি পান তিনি। এই বাঁধানো চমৎকার খাতাটা তিনি কি কাজে লাগাবেন ভাবছিলেন। কাজে লেগে গেল। তাতে তিনি টুকতে লাগলেন প্রত্যেক গাছের নাম। আর যে-সব গাছে ক্ষুদ্রতম কুঁড়ি দেখতে পেলেন সেই গাছের নামের তলায় তলায় দিলেন তারিখ আর সময়। তারপর দুর্গাকে বললেন, দেখ, যে-সব ডালে এই ছোট কুঁড়িগুলো আছে সেইসব ডালে আলতো করে সুতো বেঁধে দিস একটা করে।

"কাহে বাবু?"

সুঠাম মুকুজ্যে তখন সোৎসাহে বাগানের মোড়াটায় বসে ব্যাপারটা বোঝাতে লাগলেন তাকে। দুর্গা গাছ খুঁড়তে খুঁড়তে শুনতে লাগল। দুর্গা তার মনিবটির নানা ছেলেমানুষিতে অভ্যস্ত, সুতরাং বিস্মিত হলো না।

"আজই বেঁধে দিস, কেমন?"

"আচ্ছা।"

সুঠাম মুকুজ্যের এই ধরনের নানা উদ্ভট খেয়ালের সে সহকারী আর এই জন্যেই সম্ভবত বাবুকে সে ভালও বাসে। শুধু তাই নয়, এই ধরনের ব্যাপারে নানারকম ছোটখাটো খবরও সে সংগ্রহ করে এনে দেয়। বাবুই পাখীর বাসা সে-ই পেড়ে এনে দিয়েছিল তাঁকে। রেড়ির গাছে যেসব গুটিপোকা ঘুরে বেড়ায়, তাও ধরে এনে দিয়েছিল তাঁকে একবার। জন্তু জানোয়ার সম্বন্ধে দুর্গারও ঔৎসুক্য কম নয়। পাড়ার নেউল ইঁদুর ছুঁচোর খবরও সে রাখে কিছু-কিছু। কয়েকদিন আগে বলেছিল এ পাড়ায় 'খিরখিন' (বোধহয় খেঁকশিয়াল) এসেছে একটা। সাপ দেখলেই ধরে ফেলে। সাপের ল্যাজটা ধরে এক ঝটকা দিলেই সাপটা কাবু হয়ে পড়ে। গাছ খুঁড়তে খুঁড়তে দুর্গা অদ্ভুত খবর দিলে একটা। ঘোঘার কাছে এক জায়গায় সিহাই-এর (শজারুর) খোঁজ পেয়েছে সে। তার শালা নাকুটা তার 'মান'টাও (গর্তটাও) দেখে এসেছে। বাবু যদি যান,সে নিয়ে যেতে পারে। রাত বারোটার পর শজারুটা গর্ত থেকে বেরোয় নাকি।

"সেখানে মোটর যায়?"

"ঘোঘা নালা পর পুল নেইছে। ট্রেন সে যাইলে পড়তে।"

(ঘোঘা নালার উপর পুল নেই। ট্রেনে যেতে হবে।)

"সন্ধ্যে সাতটার ট্রেনটাই ভালো হবে। কি বলিস?"

"হাঁ"

সোৎসাহে মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ালেন সুঠাম মুকুজ্যে।

"তুই যাবি ?"

"যা-ই পারেছি। মগর হামরা কি কিছু জরুরৎ ছে ? নাকৃটা সব কার দেতে।"

(যেতে পারি। কিন্তু আমার যাবার কি দরকার ? নাকৃটাই তো সব করে দেবে।')

"কিন্তু আমি যে রকেটকে নিয়ে যাব। তুই না গেলে ওকে সামলাবে কে ?"

চুপ করে রইল দুর্গা। দুর্গা সাধারণতঃ সন্ধ্যার পর নিজের বাড়িতে চলে যায়। ওর একটা আড্ডা আছে, সেইখানে গিয়ে ও খঞ্জনী বাজিয়ে ভজন গায়। জনশ্রুতি, নাচেও নাকি।

"কি রে, যাবি ?"

"বোলেছে তো, যাইলেই পড়তে।"

(বলছ যখন, যেতেই হবে।)

ডাক্তার মুখার্জি উৎফুল্ল মুখে যে যে গাছে ছোট ছোট কুঁড়ি আছে তাদের নাম টুকতে লাগলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন বাগান থেকে।

"বেচু, গাড়ি বার কর। আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরুব।"

ল্যাবরেটরিতে এসে ডাক্তার মুখার্জি দেখলেন তাঁর অপেক্ষায় দুটি লোক বসে আছে। একটি খুব রোগা, আর একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট।

রোগা লোকটি তার রোগের বর্ণনা করতে লাগল।

"অনেক দূর থেকে আপনার নাম শুনে এসেছি। সকাল থেকে বসে আছি। শুনলাম আপনি এগারোটার আগে আসবেন না। বারোটায় আমার ট্রেন ছেড়ে যায়, তা যাক, আমি না-হয় সন্ধ্যের ট্রেনটাই ধরব। আপনি দয়া করে আমার চিকিৎসার ভারটা নিন।"

"কি হয়েছে আপনার ?"

"দুর্দশার চরম সীমায় এসে পৌঁছেছি, ডাক্তারবাবু। কিচ্ছু হজম হয় না, যা খাই সব গ্যাস হয়ে যায়। পেট চব্বিশ ঘণ্টাই দমসম। কখনও কখনও ব্যথাও করে। কখনও খাবার পরে, কখনও খাবার আগে। কখনও ডান পাশটা, কখনও বাঁ পাশটা, কখনও কখনও মাঝখানে। কখনও সামনের দিকে, কখনও পিছনের দিকে। বুকেও ঠেলে ওঠে মাঝে মাঝে। আর মাথাতেও অসহ্য যন্ত্রণা, নানারকম যন্ত্রণা। কখনও টিপটিপ করছে, কখনও ঝনঝন করছে, কখনও ঘুরছে, মনে হয় এখুনি বুঝি পড়ে যাব। গত দশ বৎসর থেকে এই কাণ্ড। চিকিৎসার ত্রুটি করি নি। সব প্রেস্‌ক্রপশন আছে আমার কাছে। কলকাতার অধিকাংশ বড় ডাক্তারকে দেখিয়েছি। ওষুধ খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে, এই দেখুন।"

একবাণ্ডিল প্রেসক্রপসন্‌ তিনি ডাক্তার মুখার্জিকে দিলেন। ডাক্তারবাবু উলটে-পালটে দেখলেন। তারপর বললেন, "আমি আপনার চিকিৎসা করতে পারব না।"

"পারবেন না ? কেন ?"

"আপনার অসুখ সারবে না। আমি কারো কাছ থেকে ঠকিয়ে টাকা নিই না।"

"তা হলে আমার এত কষ্ট করে এত দূর আসা বৃথা হল ? আপনি কোন প্রেস্‌ক্রিপশন্‌ দেবেন না ?"

"না।"

লোকটি হঠাৎ হাত জোড় করে বলে উঠল,—দয়া করুন ডাক্তারবাবু। আমাদের গ্রামের একটি লোক সেরে গেছে আপনার ওষুধ খেয়ে। তার কথাতেই এখানে এসেছি। আপনি কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিন।"

স্থঠাম মুকুজ্যে হেসে বললেন, "যে ব্যবস্থার কথাটা আমার মনে হচ্ছে সেটা কি আপনার পছন্দ হবে ?"

"বলুন। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব।"

"আপনাকে জপ করতে হবে।"

"জপ ? কোনও মন্ত্র ?"

"না, মন্ত্র নয়। রোজ সকাল সন্ধ্যে অন্তত একশ' বার করে আপনি জপ করবেন, আমি ভাল হয়ে যাব, আমি ভাল হয়ে যাব। লোকে যেমন পুজো করতে বসে, তেমনি আসন করে বসবেন আর চোখ বুজে জপ করে যাবেন।"

"কোনও ওষুধ দেবেন না ?"

"না। ওষুধ তো অনেক খেয়ে দেখলেন।"

"কি খাব আমি ?"

"কি খান রোজ ?"

"পুরোনো চালের পোরের ভাত, সিদ্ধ তরকারি. তেল ঘি মসলা কিচ্ছু দিই না। গাঁদাল পাতার ঝোলটা রোজ খাই। তা-ও হজম হয় না।"

"ঘি-ভাত খেয়ে দেখেছেন কখনও ?"

"না। ওসব কল্পনাতেও আনতে পারি না।"

"খেয়ে দেখুন না। এতকাল অখাদ্য খেয়েছেন, এবারে একটু সুখাদ্য খেয়ে দেখুন। হয়তো হজম হতে পারে। সামান্য একটু তেল বা ঘিয়ের সঙ্গে দু'এক কুঁচি আদা পেঁয়াজ নিয়ে ভাতটা ভেজে নেবেন ভাল করে।"

"ওরে বাস্‌, ও কি আমার হজম হবে ?"

"না হয় ছেড়ে দেবেন। সব রকমই তো করেছেন, এবার এটাও করে দেখুন।"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন ভদ্রলোক।

"আপনার ফি—"

"দিতে হবে না। যদি ভাল থাকেন আবার এসে দেখা করবেন, কিংবা খবর দেবেন।"

ভদ্রলোক এ ধরনের চিকিৎসা প্রত্যাশা করেন নি। তাঁর গ্রামের যে লোকটি সেরে গিয়েছিল তাকে ডাক্তারবাবু খুব দামী একটা ইন্‌জেক্‌শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই একটু ইতস্তত করে বললেন, "কোন ইন্‌জেক্‌শন টিন্‌জেক্‌শন দিলে যদি—

"না, সে-সব দরকার নেই। যা বললুম, তাই করুন গিয়ে। নমস্কার।"

নমস্কার করে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন। তিনি যাবার পর হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোকটি এলেন। একটু থপ্‌থপে গোছের চেহারা। বেশ সপ্রতিভ হাসি-হাসি মুখ।

"নমস্কার ডাক্তারবাবু, আমি আমার পরিবারবর্গকে ধরমশালায় বসিয়ে এসেছি। আনব ?"

"অসুখ কার ?"

"তা তো ঠিক বুঝতে পারছি না, সেইটি আপনাকে ঠিক করতে হবে।"

"ব্যাপারটা কি আগে শুনি।"

"আমার ছেলে হচ্ছে না। চার চারটে বিয়ে করেছি, কিন্তু ভাগ্য এমন খারাপ যে, চারটেই বাঁজা। আপনি ওদের পরীক্ষা করে বলে দিন ওদের একজনেরও ছেলে হবার চান্স আছে কি না। নিয়ে আসি ওদের, কেমন ?"

"না। এখন আনতে হবে না। আমার মনে হচ্ছে ছেলে না হওয়ার কারণ আপনার মধ্যেই আছে। আপনাকেই আগে পরীক্ষা করতে হবে।"

"আমাকে ? আমার তো কোনও অসুখ নেই !"

"আপনার শুক্রটা (semen) পরীক্ষা করা দরকার : খুব সম্ভবত সন্তান হওয়ার বীজ আপনার শুক্রে নেই। তাই ছেলে হচ্ছে না। আগে সেইটে পরীক্ষা করতে হবে।"

আমি সব লিখে দিচ্ছি। যা লিখে দিচ্ছি ঠিক তেমনি করবেন। তারপর কাল ঠিক এই সময়ে 'সিমেন'টা নিয়ে আসবেন।

"কত ফি দিতে হবে ?"

"ষোল টাকা।"

"ষোল টাকা দিতে আপত্তি নেই। কিন্তু ছেলে হবে তো ?"

"সেটা তো পরীক্ষা না করে বলা যাবে না "

ভদ্রলোক ষোল টাকা বার করে দিলেন। ডাক্তারবাবু একটা কাগজে লিখতে লাগলেন কি কি করতে হবে।

ঘণ্টা খানেক পরে নদীর ধারের একটা গাছতলায় বসে ডাক্তারবাবু লিখছিলেন :

"আজ শজারু দেখব বলে মনটা খুব উৎসুক হয়ে আছে। বন্য অবস্থায় শজারু কখনও দেখি নি। ওরা নিশাচর প্রাণী। দিনের বেলায় সাধারণতঃ দেখা যায় না। শুধু নিশাচর নয়, ওরা অসাধারণ প্রাণী। অসাধারণ বলছি, কারণ ওদের সম্বন্ধে নানা গুজব প্রচলিত আছে। এ দেশের চাষীরা মনে করে শজারুরা ওদের ফসল নষ্ট করে। আলুর ক্ষেত খুঁড়ে আলু খেয়ে যায় নাকি। বিদেশেও ওদের নানা রকম বদনাম প্রচলিত। অসাধারণ ব্যক্তিদের নামেই সাধারণতঃ বদনাম রটে, তাই বলছি শজারু অসাধারণ প্রাণী। ও-দেশে অনেকের ধারণা শজারু নাকি তার পিঠের কাঁটায় বিঁধিয়ে ডিম, আপেল প্রভৃতি নিয়ে পালায়। ওরা নাকি আপেল গাছতলায় বা ডিমের ঘরে গিয়ে গড়াগড়ি দেয়, আর ডিম আপেল সব বিঁধে যায় ওদের গায়ের কাঁটায়। একটু ভেবে দেখলেই

বোঝা যায় ব্যাপারটা গুজব মাত্র। গায়ের কাঁটা খাড়া করে গড়াগড়ি দেওয়া সহজসাধ্য কি? ধরলুমই না হয়, কোনরকম দুঃসাধ্য কসরত করে ওরা ডিম বা আপেল বিঁধিয়ে নিয়ে গেল, কিন্তু খাবার সময় ওদের সেগুলি খুলে দেবে কে? তবে কি ওরা পরস্পরের সাহায্যে অপহৃত জিনিসগুলির সদ্ব্যবহার করে? একজনের পিঠ থেকে আর একজন খায়? কিন্তু এরকম পরস্পরহিতৈষী নিখিল-বিশ্ব-শজারু-সমবায় সমিতির কোনও চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় নি এ পর্যন্ত। শেয়ালরা শুনেছি পরস্পরের সাহায্যে আখ খায়। একটা শেয়াল আখটা চিবোয়, আর একটা শেয়াল নীচে শুয়ে থাকে মুখ হাঁ করে। তার খাওয়া হয়ে গেলে সে আবার চিবোতে থাকে, অন্যটা তখন নীচে মুখ হাঁ করে শোয়। একজন চাষী আমাকে বলেছিল সে নাকি এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছে। শজারু সম্বন্ধে আর একটা গুজব আছে, সেটা আরও অদ্ভুত। বিলেতের অনেক গোয়ালাদের ধারণা শজারুরা নাকি গরুর বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ খেয়ে ফেলে। এ দেশে ঢেমনা সাপের বিরুদ্ধে এ নালিশ অনেকে করে। একজন বিদেশী গোয়ালা বলেছে, শজারু এসে তার গরুর বাঁট থেকে প্রায় আড়াই গ্যালন দুধ খেয়ে ফেলেছিল! শজারুর মতো একটা সর্বাঙ্গ-কণ্টকিত জানোয়ার গরুর বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ খাচ্ছে সেটা বিনা প্রতিবাদে সহ্য করছে এরকম লক্ষ্মী গরুর কথা ভাবা যায় না। একজন প্রকৃত পর্যবেক্ষক (Naturalist) এ শুনে বলেছেন, তিনি একটা মরা শজারুর পেট চিরে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, একটা শজারুর পেটে ½ পাইণ্টের বেশী জল ধরে না। উক্ত গোয়ালার উক্তি যদি সত্য হয় তা হলে বুঝতে হবে, ও অঞ্চলে যত শজারু ছিল সবাই এসেছিল দুধ খেতে, এবং তারা একের পর এক যখন দুধ খেয়ে যাচ্ছিল তখন গরুটি চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, কিছু বলে নি। শজারুদের এরকম সম্মিলন বা গরুর এরকম শজারু-বাৎসল্য কল্পনা করাও শক্ত। তবু এ গুজব প্রচলিত আছে। সেইজন্যই বলছিলাম শজারু অসাধারণ জানোয়ার, তা না হলে ওকে কেন্দ্র করে এতরকম গল্প-গুজব আবর্তিত হত না। শেক্সপীয়রের নামে নানারকম গুজব ছিল। আমাদের দেশে বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধিজী, এমন কি নেহেরুর সম্বন্ধেও নানারকম অদ্ভুত গল্প অনেকেই শুনেছেন নিশ্চয়। আমি একজন ক্ষত্রিয় জমিদারের কথা জানি! তাঁর মতো সুদর্শন পুরুষ আমি আর দেখি নি। অসাধারণ রূপবান ছিলেন তিনি, সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে নানারকম গুজবও প্রচলিত ছিল। লোকে বলত তিনি অত সুন্দর দেখতে, তার কারণ তাঁর সমস্ত খাবার জ্যোৎস্না উঠলেই নাকি ছাতে সাজিয়ে দেওয়া হত। সেগুলো দু' ঘণ্টা জ্যোৎস্নায় থাকত, তারপর তিনি খেতেন। এইজন্য কৃষ্ণপক্ষের শেষের দিকে শেষ-রাত্রে খেতে হত তাঁকে। অমাবস্যার কাছাকাছি খেতেনই না কিছু। কেবল দুধ আর কলা খেয়ে থাকতেন। বর্ষাকালে নাকি রাজপুতানার দিকে চলে যেতেন, কারণ ওসব অঞ্চলে বর্ষার ঘন-ঘটায় নাকি চাঁদ তত ঢাকা পড়ে না, যত পড়ে এ দেশে। তবু যেদিন চাঁদ উঠত না, সেদিন খেতেন না। প্রতাপ সিং অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, তাই তাঁর সম্বন্ধে এ গুজব প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর বিখ্যাত সুন্দরীদের সম্বন্ধেও গুজব কম নেই।

কেউ নাকি দুধে স্নান করতেন, কেউ নাকি গোলাপজলে। এসব গুজব সত্য কি মিথ্যা তা নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু যে সত্যটা অতি স্পষ্ট সেটা হচ্ছে, যাদের সম্বন্ধে গুজব রটে তারা অসাধারণ লোক। মাঝে মাঝে আমার এ কথাও মনে হয় যে, আসল লোকটাকে আমরা হয়তো দেখতেই পাই না কখনও, যে গুজবগুলো তাকে ঘিরে ময়ূখমালা রচনা করে সেইগুলোকেই লোকটার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করি। আমরা আসল সূর্যকে দেখতে পাই না, আসল চন্দ্রকেও না। আমরা যা দেখি তা বিচ্ছুরিত বা প্রতিফলিত রূপ, আসল রূপ নয়। ইতিহাসের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিকে এই গুজব অদ্ভুত রূপদান করেছে। আলেকজান্দার দি গ্রেট, নেপোলিয়ন, মোজেস্, মার্টিন লুথার—এদের সম্বন্ধে বহু গুজব প্রচলিত। শেক্স্পীয়রের কথা আগেই বলেছি, আলেকজান্দার ডুমা, বায়রন—এদের সম্বন্ধেও গুজবের অন্ত নেই। জি. বি. এস. একবার রহস্য করে বলেছিলেন, আমার সম্বন্ধে প্রচলিত বহুরকম গুজব আমাকে যে দানবের রূপ দিয়েছে, বিশ্বাস করুন আমি সে দানব নই। আমি আপনাদের মতো মানুষ। নানারকম গুজব শজারুকেও অসাধারণের পর্যায়ে ফেলেছে। একটা শুয়োর-মুখো জানোয়ার সর্বাঙ্গে কাঁটার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে, কেউ আক্রমণ করতে গেলে সর্বাঙ্গ গুটিয়ে গোল হয়ে প্রকাণ্ড একটা কদম ফুলের মতো হয়ে যায়—এর সম্বন্ধে গুজব তো রটবেই। এ দেশে অবশ্য ওর নামে তত বেশী গুজব নেই, অনেকে কেবল আলুচোর বলে' বদনাম দেয় ওর। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেছেন ওরা নিরামিষ জিনিস বড় একটা খায় না। আমিষ জিনিসের উপরই ওদের লোভ বেশী। মড়া পর্যন্ত নাকি খায়। নানারকমই পোকা-মাকড়ই ওদের ভোজ্য, বিশেষ করে গুব্‌রে পোকা জাতীয় পোকা খুব প্রিয় খাদ্য ওদের। আলুর ক্ষেতে ওরা সম্ভবত পোকার খোঁজেই আসে। আলুর আলগুলো খোঁড়াখুঁড়ি করে পোকারই সন্ধানে। ডিম আর পাখির ছানা পেলেও ছাড়ে না। আর এসবই বেচারাদের সংগ্রহ করতে হয় রাতের অন্ধকারে গোপনে গোপনে। এই জন্যেই সম্ভবত ওরা আন্‌পপুলার। কিন্তু ওই চেহারা নিয়ে দিনের আলোয় বেরুলে তো লোকে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলবে। তাই ওদের নিশাচর হতে হয়েছে। মানুষের মধ্যেও যাঁরা অসাধারণ তাঁদেরও রাত্রিচর বললে অত্যুক্তি হয় না। প্ল্যাটফর্মবিহারী রাজনৈতিক নেতাদের আমি অসাধারণ ব্যক্তি বলে মনে করি না, তাঁদের মধ্যে যাঁরা অসাধারণ তাঁরা রাজনীতি বা প্ল্যাটফর্মের দৌলতে অসাধারণ হন নি, হয়েছেন নিজস্ব প্রতিভাবলে। সাধারণতঃ রাজনৈতিক নেতারা ফেরিওলা জাতীয় লোক, নিজেদের ঢোল নিজেরাই শোরগোল করে বাজিয়ে বেড়ান, সুতরাং দিনের হাটেই তাঁদের হট্টগোল বেশী শোনা যায়। কিন্তু যেসব কবি, যেসব বিজ্ঞানী, যেসব তপস্বী অজানা পথ আবিষ্কার করে অচিন লোকের সন্ধান করেন, যাঁদের নিরন্তর সাধনায় মানবসভ্যতা সমৃদ্ধ, তাঁরা প্রায়ই রাত্রিচর, তাঁদের সাধনার সাক্ষী আকাশের তারা আর রাত্রির দীপ। অন্ধকারের গহনেই আলোর সন্ধান করেন তাঁরা। আমি শজারুকে ওঁদের সঙ্গে একাসনে বসাতে চাই না (সেটা হাস্যকর হবে। কেবল বলতে চাই রাত্রিচর বলেই জীবটি হেয় নয়।

আর একটা কথা ভেবেও আমার এতদিন খুব আশ্চর্য লাগতো। লোকে সব রকম জানোয়ারই পোষ মানিয়েছে। বহুকাল আগে একটা ছবিতে দেখেছিলাম এক মেম-সাহেব কুমীর-টানা গাড়িতে চড়ে বেড়াচ্ছেন। দুটো কুমীরকে পোষ মানিয়েছিলেন তিনি। তারা তাঁর গাড়ি টেনে বেড়াত। সাপ পোষ মানিয়েছে একরম লোকের খবর ও বাঘভালুক সিংহের পোষ মানার কথা তো আপনিও শুনেছেন নিশ্চয়। ভাবতাম কেউ শজারু পোষে না কেন? সেদিন একটা ইংরেজী প্রবন্ধে এর উত্তর পেয়ে গেলাম। সজারুদের গায়ে নাকি ছোট বড় অসংখ্য মাছি থাকে, ঠিক মাছি নয়, ফ্লি (flea), এর বাংলা কি জানি না। এইজন্যেই ওরা গর্তের ভিতর লুকিয়ে থাকে দিনের বেলা। লুকিয়েও নিস্তার পায় না বেচারারা। ছোট ছোট ফ্লি-রা গর্তের ভিতরও আক্রমণ করে ওদের। অসাধারণত্বের লক্ষণ কিন্তু। বড় বড় প্রতিভাবানদেরও এইরকম অসংখ্য ফ্লির জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়। এরা মানুষ-ফ্লি, চাটুকারের দল। প্রতিভাবানদের ঘাড়ে চড়ে ওরাও নিজেদের জাহির করতে চায় সমাজে। · ···এই পর্যন্ত লিখে শজারু-প্রসঙ্গ থামিয়ে দিতে হয়েছিল। হঠাৎ গাছের উপর থেকে একটা পাখির বাসা পড়ে গেল আমার সামনে। বাসাটার ভিতর দেখি তিনটি বাচ্চা রয়েছে। শালিক পাখির বাচ্চা। তাদের মা-বাবা আত্মীয়স্বজনরা তারস্বরে মহা চীৎকার জুড়ে দিলে। উঠতে হল। হুইস্‌ল্‌ বাজিয়ে বেচুকে ডাকলাম। বললাম বাসাটা গাছের উপর তুলে দিতে হবে। বেচু কলকাতার ছেলে, ট্রামে বাসে উঠতে পারে, গাছে উঠতে পারে না। বললে, "এর আগে গাছে চড়ি নি।" বললাম, "এর আগে তো তুমি অনেক কিছুই কর নি। আজ তেসরা বৈশাখ সকালে যেখানে এসেছ সেখানে কি আগে এসেছিলে? আস নি। এসে তো বেশ দিব্যি আছ। চেষ্টা করলে গাছেও উঠতে পারবে। এক কাজ কর। তোমার ওই গামছাটায় পাখির সমস্ত বাসাটা তুলে আলতোভাবে বেঁধে ফেল। তারপর আমার কাঁধে পা দিয়ে ওই নীচের ডালটা ধর। ওটা ধরতে পারলে ওঠা সহজ হবে। তারপর বাসাটা গাছের উপরে কোথাও বসিয়ে দিয়ে নেমে এস। কিছুই শক্ত নয়। এস।" বেচু তবু ইতস্তত করতে লাগল। আবার বললাম, "ওঠ, নিশ্চয়ই পারবে। ভয় কি, আমি ধরে ফলব তোমাকে যদি পড়ে যাও।" তখন বেচু আসল কথাটি কুণ্ঠিতভাবে ব্যক্ত করল। আমার কাঁধের উপর পা দিয়ে সে গাছে উঠতে চায় না। অনেক কষ্টে তাকে অবশেষে রাজী করালাম। বললাম, "নিজের ছেলেকে তো লোকে কাঁধে দাঁড় করায়। তুমি তো ছেলেরই মতো। তা ছাড়া, তুমি তো অবজ্ঞা করে আমার গায়ে পা দিচ্ছ না। এই তিনটি অসহায় প্রাণীকে বাঁচাতে হবে তো। এর মানে যে অন্য।" অনেক বলা-কওয়ার পর অবশেষে রাজী হল। গাছে উঠে পাখির বাসাটাকে দুটো ডালের ফাঁকে রেখে নেমে এল সে। কিন্তু কাজ হল না। সে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার পড়ে গেল বাসাটা। তখন বেচুকে বললাম, "তুমি এক কাজ কর তা হলে, মোটর নিয়ে চলে যাও। বাজার থেকে একটা খাঁচা কিনে নিয়ে এস। খাঁচার ভিতর বাচ্চাগুলোকে পুরে টাঙিয়ে দেওয়া যাক, তা হলে আর পড়বে না।" বেচুর মনেও একটু উৎসাহ

সঞ্চারিত হয়েছিল, সে মোটর হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি বাচ্চাগুলোকে আগলে বসে রইলাম। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি, চারিদিকের প্রকৃতি সম্পূর্ণ উদাসীন, যে গাছটায় বাসাটা ছিল সে এতটুকু বিচলিত হয় নি, ঘাসের ফুলগুলোর হাসিও অম্লান, একদল শালিক পাখি চীৎকার করছে কেবল, আর আমি প্রতীক্ষা করে বসে আছি কখন বেচু ফিরবে। শালিক পাখিগুলোর ভাবভঙ্গী থেকে মনে হচ্ছিল আমি যে ওদের ভালোর জন্যেই চেষ্টা করছি, এ বোধ ওদের নেই। আমি কেন তাদের বাচ্চাকে আগলে বসে আছি এই তাদের রাগ। দু-একটা পাখি এসে আমাকে ঠোকরাবার চেষ্টাও করতে লাগল। এটা আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি, আমি যে ওদের বন্ধু, আমি যে ওদের বন্ধুত্ব কামনা করি এটা ওরা কিছুতেই বুঝতে পারে না। সর্বদা আমাকে সন্দেহের চোখে দেখে। একটু পরে বেচু ফিরল খুব ভালো একটা খাঁচা নিয়ে। খাঁচার মুখটা বড় ছিল। আমি সমস্ত পাখির বাসাটাকেই পুরে দিলাম খাঁচার ভিতর। ওরা খড়কুটো দিয়ে যেমন নরম বিছানা তৈরী করে আমরা তেমন পারি না। বাসাটা সুদ্ধ দেওয়াতে বাচ্চাগুলো বেশ আরামেই থাকবে মনে হল। খাঁচার কপাটটা খুলে দিলাম বেশ ভাল করে। খুলে বেঁধেও দিলাম, যাতে বন্ধ না হয়ে যায়। তারপর বেচু আবার আমার কাঁধে চড়ে খাঁচাটা টাঙিয়ে রেখে এল গাছে। তখন বেচুকে বললাম, "বেচু, চল এইবার আমরা সরে পড়ি। আমরা এখানে থাকলে ওদের মা-বাপ ওদের কাছে ভিড়বে না। চল, আমরা একটু দূরে সরে গিয়ে দেখি ওরা কি করে। দূরবীনটা গাড়িতে আছে, তাই দিয়ে বেশ দেখা যাবে।" তাই করলাম। একটু দূরে গিয়ে দূরবীন দিয়ে দেখতে লাগলাম খাঁচাটাকে। প্রথম কিছুক্ষণ পাখি দুটো (মা-বাবা) খাঁচাটাকে একটু সন্দেহের চক্ষে দেখতে লাগল, ভাবতে লাগল, ফাঁদ বুঝি। উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগল আশেপাশে। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে দেখলাম একটা পাখি ঢুকেছে খাঁচার মধ্যে। আর একটু পরে দেখলাম বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে। নিশ্চিন্ত চিত্তে বাড়ি ফিরে গেলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর সাধারণতঃ একটু বিশ্রাম করি। কিন্তু সেদিন আর বিশ্রাম করা হল না। বেচুকে বললাম, চল দেখে আসি ওদের নূতন গৃহস্থালি কি রকম চলছে। প্রায় দশ মাইল পথ আবার মোটরে করে গেলাম। গিয়ে হতাশ হতে হল। গিয়ে দেখি খাঁচা নেই, কে নামিয়ে নিয়ে গেছে। পাখিগুলোও নেই, একটা রুক্ষ নীরবতা আচ্ছন্ন করে আছে চারিদিক। গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। যে ছোট তিনটি গাছের কথা আগে লিখেছি সেইগুলির কথা মনে পড়ল। ডাক্তারী জীবনে এটা বরাবর উপলব্ধি করেছি, সেদিন আবার একবার করলাম, আমি কাউকে বাঁচাব ইচ্ছে করলেই সে বাঁচে না, সে যদি বাঁচবার হয়, তবেই বাঁচে। তবু হতাশ হলে চলবে না, যখনই সুযোগ পাব তখনই বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে আর একটা কথা মনে হল। আমি এতক্ষণ ধরে যা করলাম, খবরের কাগজের ভাষায়, তা উদ্বাস্তু-সমস্যা-সমাধান-প্রচেষ্টা। কিন্তু আমার প্রচেষ্টা সফল হল না। সেজন্য আমার দুঃখ হয়েছে, কিন্তু অনুতাপ হয় নি। কারণ আমি নিজের স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ওদের

উদ্বাস্তু করবার চেষ্টা করি নি। লক্ষ লক্ষ লোককে গৃহহারা আত্মীয়হারা করে যারা একটা খণ্ডিত স্বাধীনতার নামে আজ আত্মরতিতে উন্মত্ত, তাদের প্রতি লক্ষ কণ্ঠের যে অভিশাপ বর্ষিত হচ্ছে, সে অভিশাপ আমাকে কুড়োতে হয় নি। কিন্তু এটা লিখেই মনে হল, কে বললে হয় নি। তুমি যখন ওই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলে, তাদের ভাল করবার চেষ্টায় নানারকম ফন্দি আঁটছিলে তখন তাদের মা-বাবা আত্মীয়-স্বজনরা চারিদিকে উড়ে উড়ে তারস্বরে যে চীৎকারটা করছিল তাকে আর যাই বল আশীর্বাদ বা বাহবা বলা যাবে কি? মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। সত্যিই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছি না কোথাও।"

সেদিন মাঠ থেকেই ডাক্তারবাবুকে ফিরতে হল ল্যাবরেটরিতে। বেচুকে বললেন, "একটু জোরে চালাও বেচু, সাড়ে পাঁচটার সময় একটি লোককে আসতে বলেছি।"

সেই হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক শুক্র নিয়ে বসেছিলেন। সেটি পরীক্ষা করে ডাক্তার মুখার্জি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

"কি দেখলেন ডাক্তারবাবু?"

"আপনার ছেলে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আপনি যখন বিয়ে করেছিলেন তখন বহু বিবাহের সম্বন্ধে আইন ছিল না সম্ভবত।"

"আজ্ঞে না। একজনেরও ছেলে হবে না?"

"হবে কি করে? আপনিই যে বাঁজা। এক কাজ করুন।"

"হাঁ হাঁ, কি বলুন—"

"ওরা যদি রাজী থাকে ওদের চারজনকেই আইনত মুক্তি দিন আপনি। চেষ্টা করুন যাতে ওদের আবার বিয়ে হয়।"

ভদ্রলোকের মুখটা একটু 'হাঁ' হয়ে গেল।

"কি বলছেন আপনি সার? এই পরামর্শ নেবার জন্য অত দূর থেকে আপনার কাছে এলাম! ওষুধ দেবেন না?"

"এ অবস্থায় যা সবচেয়ে সমীচীন সভ্য উপায় তাই আপনাকে বললাম। আপনাকে এখনি পাঁচ শ' টাকা দামের প্রেস্‌ক্রপশন্‌ লিখে দিতে পারি। পেটেণ্ট ওষুধের অনেক ফর্দ আছে আমার কাছে। সেগুলো টুকে দেওয়া কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু আমি জানি ওসবে কিছু হবে না। তাই আর ওষুধ দেওয়ার চেষ্টা করলাম না।"

"আমার স্ত্রীদের একটু দেখবেন না? নিয়ে আসব তাদের?"

"না, যেখানে seed নেই, সেখানে soil দেখে কি হবে?"

"তা হলে আমার কোন আশা নেই?"

"ভগবান দয়া করলে, আছে। আমাদের হাতে কিছু নেই। ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করুন, আর সংযম করে থাকুন বছরখানেক। হয়তো miracle হয়েও যেতে পারে।"

"আমার অনুরোধ আমার স্ত্রীদের একবার দেখুন। বড়টা অকালে বুড়ো হয়ে গেছে, মেজোটার তলপেটে অসহ্য ব্যথা, সেজোটার ফিট হয়, ছোটটার বুকে ব্যথা—"

"মাপ করবেন। আমি ওদের চিকিৎসা করতে পারব না। ওদের অসুখের কারণ আপনি। আপনার কবল থেকে ওরা যদি মুক্তি পায়, আপনিই ভাল হয়ে যাবে।"

"একবার দেখতে ক্ষতি কি ?"

"না, আমার সময় নেই। আমাকে এখনি ট্রেন ধরতে হবে।"

ডাক্তারবাবু উঠে পড়লেন।

॥ ১৪ ॥

ভাগ্যক্রমে সেদিন চারটে বার্থ-ওলা একটা পুরো ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট পেয়ে গেলেন মুঠাম ডাক্তার। চারটে টিকিট কিনে পুরো কামরাটাই দখল করলেন তিনি। রকেটকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কামরায় অন্য প্যাসেঞ্জার থাকলে অসুবিধা হত। দুর্গার জন্যও তিনি একখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিটই কিনেছিলেন, কিন্তু দুর্গা একটা থার্ড ক্লাস গাড়িতে গিয়েই উঠল। বললে, তার একজন দোস্ত থার্ড ক্লাসে যাচ্ছে। আসল কথা, ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে মুখোমুখি বসে যেতে তার আপত্তি, বিড়ি খেতে পাবে না। রকেটকে নিয়েই ডাক্তারবাবু উঠলেন খালি কামরাটাতে। ঘোঘা বেশী দূর নয়, তিনটে স্টেশন মাত্র। তাই তিনি গাড়ির দরজা আর 'লক্' করলেন না। গাড়িটা ছাড়তেই কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে উঠে পড়ল ডাক্তারবাবুর গাড়িতে। আর তার পিছু পিছু দৌড়তে দৌড়তে এলেন মিস্টার সেন। চীৎকার করে বললেন, "ডাক্তারবাবু, আমার মেয়ে রাগ করে পালাচ্ছে, ওকে পরের স্টেশনে নামিয়ে দেবেন, আমি গাড়ি নিয়ে সেখানে যাচ্ছি।"

ডাক্তার মুখার্জি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। মিস্টার সেন আর তাঁর মেয়েকে তিনি দূর থেকে দুচারবার দেখেছেন, কিন্তু এঁদের কারো সঙ্গে তাঁর ভাল ক'রে আলাপ ছিল না। গণেশ হালদারের চাকরির ব্যাপারে মিস্টার সেন তাঁর উপর একটু অসন্তুষ্ট এ খবরটাও তিনি শুনেছিলেন। তাই আর ওঁদের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টাও করেন নি।

অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি তনিমা সেনের দিকে। সে হাঁপাচ্ছিল। কাপড়-চোপড়ও বিস্রস্ত হয়ে পড়েছিল তার। ডাক্তার মুখার্জির মনে হল তার গা থেকে মদের গন্ধও ছাড়ছে। তনিমা ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই রকেট ঘেউ ঘেউ করে চীৎকার করে উঠেছিল একবার, কিন্তু ডাক্তার মুখার্জির ধমক খেয়ে চুপ করে বসল আবার কোণে গিয়ে। কিন্তু একটু পরেই সে উঠে এসে শুঁকতে লাগল। তনিমা চীৎকার করে উঠল, বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে উঠে বলতে লাগল "ওকে সরে যেতে বলুন। আমার বড্ড ভয় করছে। সরিয়ে নিন, সরিয়ে নিন ওকে।"

আদেশ করতেই রকেট গিয়ে আবার কোণে বসল।

"ও কিছু বলবে না আপনাকে। ওরা অচেনা লোক দেখলেই শোঁকে। আপনি ভাল করে বসুন। ও কিছু বলবে না।"

তনিমা চোখ পাকিয়ে বলল, "আপনি গাড়ির ভিতর একটা বাঘের মতন কুকুর নিয়ে যাচ্ছেন, এটা কি বে-আইনী নয়?"

"এই কম্পার্টমেণ্টের চারটে বার্থই আমার রিজার্ভড্। আপনিই বে-আইনী কাজ করেছেন। আপনি চলন্ত ট্রেনে দৌড়ে উঠেছেন এবং যে বার্থটার উপর বসেছেন সেটা আপনার নয়, রকেটের। সুতরাং রকেটের আপত্তি করবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে।

রকেট কান খাড়া করে বিস্ফারিত চক্ষে সব শুনছিল। মনে হচ্ছিল সে যেন ডাক্তার মুখার্জির প্রতিটি কথা বুঝতে পারছে। তাঁর কথা শেষ হতেই সে জলন্ত দৃষ্টিতে চাইল তনিমার দিকে, তার গলা থেকে গররর্ করে শব্দও বেরুল একটা। সে যেন বুঝতে পারল ডাক্তার মুখার্জি তনিমাকে বকছেন।

"রকেট, বি কোয়ায়েট অ্যাণ্ড সিট ডাউন প্রপারলি।"

রকেট ইংরেজী বেশ বোঝে। সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত থাবা দুটোর উপর মুখটা রেখে বসল। বকুনি খেয়ে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল যেন। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল একটা। ডাক্তার মুখার্জির দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখল একবার। বুকের ভিতর থেকে অন্তর্নিরুদ্ধ একটা ক্ষোভও যেন বাঙ্ময় হতে চাইল। কিন্তু আর সে ঘেউ ঘেউ করল না।

তনিমা রকেটের দিকে চেয়ে বলল, "ও তো আপনার কথা খুব শোনে দেখছি। আমাকে আর কিছু বলবে না?"

"না।"

"ওই বাঘের মতো কুকুরকে কি করে বশ করলেন? খুব ট্রেনিং দিয়েছেন বুঝি? একজনকে দেখেছি কুকুর কথা না শুনলে বেত মারত।'

"হ্যাঁ, ট্রেনিং দিয়েছি। তবে ট্রেনিং-এর আসল কথা বেত নয়, ভালবাসা। ওরা ভাল জাতের কুকুর, ভালবাসার মর্ম বোঝে। যে ভালবাসে তার কথা শোনে।"

"তাই নাকি?"

তনিমা বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রকেটের দিকে। ডাক্তার মুখার্জির মনে হল নিতান্ত ছেলেমানুষ মেয়েটি। রাগ করে বাড়ি থেকে পালাচ্ছে? কেন? কিছুক্ষণ কোন কথা হল না। চলন্ত ট্রেনের দোলানিতে দু'জনেই একটু একটু দুলতে লাগলেন নীরবে।

সুঠাম মুখার্জি তারপর প্রশ্ন করলেন, "আপনি কোথায় যাবেন?"

"কোলকাতা। আপনি?"

"আমি ঘোঘায় নামব। তিনটে স্টেশন পরে।"

"এর জন্যে চারটে বার্থ রিজার্ভ করেছেন?"

"তা না হলে রকেটের কষ্ট হত।"

রকেটের নাম করা মাত্র রকেট কান খাড়া করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল ডাক্তার মুখার্জির দিকে। তারপর আবার থাবায় মুখ রেখে বসল।

"Dog Box-এ অনেকে কুকুর নিয়ে যায়। কিন্তু তাতে কুকুরের কষ্ট হয় খুব।"

এ কথা শুনে তনিমা ঘাড়টি ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতমুখে চেয়ে রইল ডাক্তার মুখার্জির দিকে। তারপর যা বলল তা সাধারণ সভ্য কোনও মেয়ে অত স্বল্প পরিচয়ে বলতে পারত না।

"আপনার অনেক টাকা আছে বুঝি?"

এ কথা শুনে সুঠাম মুকুজ্যে রাগ করলেন না, কৌতূহলী হলেন। এই কথাগুলিতে তিনি যে এই অপ্রকৃতিস্থ মেয়েটির আসল রোগের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর ডাক্তারি মন এতে অপ্রসন্ন হল না, উৎসুক হয়ে উঠল। তাঁর মন যেন বলে উঠল—এই তো রোগ ধরা পড়েছে। একে সারানো যায় না?

হেসে উত্তর দিলেন, "অনেক টাকা কোথায় পাব? তবে মোটামুটি সুখে থাকবার মতো সঙ্গতি আছে।"

এ কথায় তনিমা যেন সন্তুষ্ট হল না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে রইল বাইরের অন্ধকারের দিকে। ট্রেন চলতে লাগল, ডাক্তারবাবুও কয়েক মিনিট কিছু বললেন না। কি বলবেন ভেবে পেলেন না। তারপর তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল মিস্টার সেন ওকে পরের স্টেশনেই নামিয়ে দিতে বলেছেন।

"পরের স্টেশন তো এসে পড়ল, আপনার বাবা বলে গেলেন পরের স্টেশনে আপনাকে নামিয়ে দিতে।"

"আমি কি একটা লগেজ (luggage) যে নামিয়ে দেবেন? আমি কিছুতেই নামব না। আপনি বললেই আমি নেবে যাব? ইস্।"

"আগেই আপনাকে বলেছি, সমস্ত কামরাটা আমি রিজার্ভ করেছি। রাত্রি নটা বেজে গেছে। পরের স্টেশনে গার্ডকে ডেকে বললেই সে আপনাকে নামিয়ে দেবে।"

"আমি কিছুতেই নামব না। আপনি গার্ডকে খবর দিলেই আমি সায়ানাইড খাব। আমার সঙ্গে সায়ানাইড আছে।"

"আপনি সায়ানাইড খেলে পুলিসকেও খবর দিতে হবে। তারা আপনাকে টানাটানি করে নিয়ে যাবে একটা হাসপাতালে। হাসপাতালে আপনার মুখের ভিতর নল চালিয়ে stomach wash করবে, তারপর আপনাকে জেলে নিয়ে যাবে, আপনি আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন বলে আপনার শাস্তি হবে। আমার অনুরোধ, এত হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে আপনি আপনার বাবার সঙ্গে ফিরে যান। এখন রাগ আছে বলে' এ কথা বলছেন, কিন্তু রাগ বেশীক্ষণ থাকবে না।"

"বাবা হলে ফিরে যেতাম। কিন্তু ও বাবা নয়, রাক্ষস। আমি যক্ষপুরী থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। আপনি বাধা দেবেন না, আপনি আমাকে বাঁচান, শুনেছি আপনি খুব ভালো লোক। আমার কেউ নেই—"

হঠাৎ তনিমা কেঁদে ফেললো। চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়তে লাগল তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়বে এটা সে-ও ভাবতে পারে নি। অপ্রস্তুত হয়ে অন্য দিকে ঘাড ফিরিয়ে রইল।

"কাউকে বাঁচাবার সাধ্য কারো নেই। আমি অনেককে বাঁচাবার চেষ্টা করেছি, পারি নি। তবে আমি চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু বাঁচাবই এ স্পর্ধা আমার নেই, এ প্রতিশ্রুতিও আমি দিতে পারি না।"

"আপনি চেষ্টা করবেন?"

ঘাড ফিরিয়ে সাগ্রহে প্রশ্ন করল তনিমা। সুঠাম মুকুজ্যে দেখলেন তার চোখের জলে আশার আলো ঝলমল করছে।

"আগে সব শুনি, তারপর বলতে পারব। কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। আপনার সঙ্গে আগে আমার পরিচয় হয় নি। আমার সম্বন্ধে খুব সম্ভবত আপনি বিশেষ কিছু জানেন না। আমাকে বিশ্বাস করে আপনি আপনার সব কথা বলবেন কি করে? বলবেনই বা কেন?"

"আমি আপনার বিষয়ে অনেক কথা জানি। ঝিনুকদি আমাকে বলেছেন, আর ঝিনুকদি শুনেছেন গণেশবাবুর কাছে, যিনি আপনার বাড়িতে থাকেন।"

"ঝিনুকদি কে?"

"ডাক্তার ঘোষালের রাঁধুনী। গণেশবাবুর সঙ্গে ওঁর বোধ হয় আত্মীয়তা আছে।"

"ও!"

ডাক্তার মুখার্জি চুপ করে গেলেন। ভাবতে লাগলেন এত বড় একটা ঝুঁকি তিনি নেবেন কিনা। কোন কিছুর ভার নিলে সেটা সম্পূর্ণভাবে বহন করবার চেষ্টা করেন তিনি। আর একটি মেয়ের কথা মনে পড়ল, তার ভার নিয়েছিলেন, কিন্তু তার সমস্যার সমাধান এখনও করতে পারেন নি।

গাড়ির গতি ক্রমশ মন্থর হয়ে এল। তারপর হুইস্‌ল শোনা গেল। পরের স্টেশন এসে পড়েছে।

"স্টেশন তো এসে পড়ল। কি করবেন আপনি?"

"আমি বাথরুমে ঢুকে খিল দিয়ে দিচ্ছি। কেউ যদি আসে বলবেন, আমি নেমে গেছি।"

তনিমা ঢুকে পড়ল বাথরুমে।

গাড়ি স্টেশনে থামতেই ডাক্তার মুখার্জি উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেন। কাউকে দেখতে পেলেন না। মিস্টার সেন সম্ভবত এসে পৌঁছতে পারেন নি। স্টেশনে স্টপেজ খুব কম। মিনিট দুই-এর বেশী নয়। ডাক্তার মুখার্জি এদিক-ওদিক দেখলেন। না, মিস্টার সেন আসেন নি। মিনিট দুই পরে গার্ডসাহেবের হুইস্‌ল শোনা গেল। ট্রেন চলতে আরম্ভ করতেই তনিমা বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে।

"স্টেশনে আপনার বাবাকে দেখলাম না।"

"সম্ভবত পৌঁছতে পারেন নি। তবে তিনি যে চেষ্টা করেছেন এতে সন্দেহ নেই। এবার বোধ হয় থানায় যাবেন।"

"বাড়িতে আপনার মা আছেন ?"

"না। আমার আপন মা নেই। ভাই-বোনও নেই। আমার সৎমা আছেন, তিনি পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী।"

"এ অবস্থায় আপনি বাড়ি থেকে চলে এলেন ? ছি, ছি, খুব অন্যায় করেছেন। মিস্টার সেনের খুব কষ্ট হবে।"

"হবে। তবে আমার জন্য ততটা নয় যতটা অন্য কারণে।"

"অন্য আর কি কারণ থাকতে পারে ?"

তনিমা মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। তারপর হঠাৎ কাপড়ের ভিতর থেকে একটা নোটের বাণ্ডিল বার করে বললে, "এই কারণে। এ টাকাটা এবার তাঁকে দিই নি।"

"কোথা পেলেন আপনি এত টাকা ?"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন স্থঠাম মুকুজ্যে। তাঁর একবার সন্দেহ হল, চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে না তো ?

তনিমা ভুরু নাচিয়ে উত্তর দিল, "রোজগার করেছি। আমি যে রোজগারী মেয়ে।" বলেই হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ল সে।

"বরাবর রোজগার করে তাঁর হাতে টাকা তুলে দিয়েছি। এবার দিই নি। এবার টাকাটা নিয়ে পালিয়ে এসেছি। টাকার জন্যেই তিনি ছুটে এসেছিলেন স্টেশনে, আমার জন্যে নয়।"

তনিমা পাগলের মতো হি হি করে হাসতেই লাগল। হাসির বেগে তার সারা দেহটা ঝুঁকে ঝুঁকে পড়তে লাগল সামনের দিকে। হয়তো মদ খেয়েছিল বলেই হাসির বেগ থামাতে পারছিল না সে।

স্থঠাম মুকুজ্যে অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন।

"কোলকাতায় কোথায় উঠবেন ?"

"হোটেলে।"

"এতগুলো টাকা নিয়ে হোটেলে ওঠা কি নিরাপদ ? কোলকাতা যাচ্ছেন কেন ?"

"আর কোথায় যাব ? ওই শহরেই তো সব সমস্যার সমাধান মেলে।"

"সমস্যাটা কি ?"

তনিমা অধোমুখে বসে রইল। তার মুখে যেন বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এল একটু। তার ঠোঁট দুটি দু-একবার নড়ে উঠল, কিন্তু বলি বলি করেও কথাটা সে বলতে পারল না। আড়চোখে ডাক্তার মুখার্জির দিকে চেয়ে দেখল; তিনি একাগ্র দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

"ও কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমি বলতে পারব না।"

ডাক্তার মুখার্জি হেসে বললেন, "শোনবার আগ্রহও আমার নেই। তবে আপনাকে

যদি সাহায্য করতে হয় আপনার সব কথা অকপটে আমাকে বলতে হবে। তা না হলে কিছু করতে পারব না। আপনি তা হলে ভাল করে শুয়ে পড়ুন। রাত্রে একটা স্টেশন, তারপর আমিও নেমে যাব।"

"আপনি রুগী দেখতে যাচ্ছেন বুঝি ?"

"না। শজারু দেখতে যাচ্ছি।"

"শজারু !"

"হ্যাঁ, জন্তু জানোয়ার দেখার শখ আমার আছে। খবর পেয়েছি ঘোঘার কাছে মাঠে এক জায়গায় শজারুর গর্ত আছে। শজারুটা গভীর রাত্রে গর্ত থেকে বেরোয়। তাকেই দেখতে যাচ্ছি।"

"সারা রাত মাঠে মাঠে ঘুরবেন ?"

"দরকার হলে ঘুরব। তবে সেখানে রাত্রে থাকবার মত একটা আস্তানা ঠিক করেছি। আমার এক বন্ধুর বাড়ি খালি পড়ে আছে। শজারু পর্ব শেষ করে সেখানেই যাব।"

উৎসাহে জলজল করে উঠল তনিমার চোখ দুটো। সে যেন অকূলে কূল পেল।

"আমাকে নিয়ে যাবেন ? বুনো শজারু কখনও দেখি নি।"

সুঠাম মুকুজ্যে স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত। তাঁর মনে হল—নিতান্তই ছেলেমানুষ !

"বেশ চল। ভয় পাবে না তো ?"

"না, আমার কিছু ভয় করবে না। আপনি তো সঙ্গে থাকবেন !"

স্নিগ্ধ হাসিতে সুঠাম মুকুজ্যের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। রাস্তায় এরকম সাথী জুটে যাবে তা ডাক্তার মুখার্জি প্রত্যাশা করেন নি। তাঁর নিজের ব্যবহারেও তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন একটু। অজানা অচেনা একটা যুবতী মেয়েকে নিয়ে রাত্রে মাঠে মাঠে ঘোরাফেরা করলে যে অনিবার্য কুৎসা তাঁর নামে রটবে তা জেনেও তিনি বেশ রাজী হয়ে গেলেন তো ! গেলেন, তার কারণ কুৎসাকে তিনি ভয় খান না। তিনি জানেন, কিছু না করলেও লোকে তাঁর নামে কুৎসা রটায়। কুৎসার ভয়ে কোনও সৎ কাজ থেকে তিনি পেছিয়ে যাবেন এত ভীতু তিনি নন। এ মেয়েটিকে দেখে তাঁর শুধু যে অনুকম্পা হয়েছিল তা নয়, তাঁর কৌতূহলী বিজ্ঞানী মন উৎসুকও হয়ে উঠেছিল। এমন একটা সুন্দর ফুল নর্দমায় কি করে পড়ল ? ওকে নর্দমা থেকে তুলে পূজার বেদীতে স্থাপন করা কি একেবারেই অসম্ভব ?

এই সব কথাই বারবার ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাঁর মনে। এই প্রশ্নের উত্তরও খুঁজছিলেন তিনি। শেষে ঠিক করে ফেললেন, চেষ্টা করে দেখতে হবে। হঠাৎ ঝুঁকে বেঞ্চির নীচে থেকে একটা বাক্স বার করে খুলে ফেললেন সেটা। তার থেকে বেরুল একটা লম্বা টর্চ, একটা ক্যামেরা, একটা রিভলবার, কয়েকটা নানা মাপের কৌটো, গগল্‌স্‌, চশমা, ঘড়ি, বাইনাকুলার, কয়েকটা ওষুধের শিশি। তারপর তিনি একটা কাগজের প্যাকেট বার করে বললেন, এই যে আছে। বলেই সেটা ছুঁড়ে দিলেন তনিমার দিকে।

"কি এটা ?"

"রবারের বালিশ। আমার একটা বিছানা আছে, সেটা দু'জনে ভাগ করে নেওয়া যাবে। কিন্তু বালিশ মাত্র একটি আছে বিছানায়। এটা আমার emergency box, ওতে নানারকম জিনিস থাকে। হঠাৎ মনে হল ওতে একটা রবারের বালিশ থাকতে পারে, অনেকদিন আগে কিনে রেখেছিলাম। দেখুন, কেমন কাজে লেগে গেল আজ। রবারের বালিশে শুতে পারবেন তো ? আপনি না পারেন আমি পারব।"

শিশু-সুলভ অকৃত্রিম হাসিতে আলোকিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

"এই টাকাটাও রেখে দিন আপনার বাক্সে।"

"কত টাকা আছে ?"

"পাঁচ হাজার।"

ডাক্তার মুখার্জি ক্ষণকাল কি ভাবলেন। তারপর বললেন, "আচ্ছা দিন।"

ঘোঘার আগের স্টেশনেই দুর্গা এসে গাড়িতে উঠল।

"দুর্গা, আমরা একজন সঙ্গী পেয়ে গেছি। সেন সাহেবের মেয়েও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। খাবারে কুলুবে তো ? না কুলোয় তো ঘোঘা স্টেশনে কিছু কিনে নিস।"

"খানা বহুত ছে।"

(খাবার অনেক আছে)

"বিছানা কি রকম আছে ? দু'জনের হয়ে যাবে ?"

"হাঁ।"

সুঠাম মুকুজ্যে জানতেন হয়ে যাবে। দুর্গা যখন সঙ্গে থাকে তখন সব জিনিসই সে বেশী বেশী নেয়। গ্রীষ্মকালেও লোটা-কম্বলের বোঝা বইতে তার আপত্তি নেই। তার যুক্তি বিদেশে 'বখতপর' (কাজের সময়) কখন কি দরকার হয় বলা যায় কি ? ডাক্তার মুখার্জি যখন বাইরে বেরোন, তখন তাই বিরাট মোটঘাট তাঁর সঙ্গে থাকে।

তাঁর কম্পার্টমেণ্টটা দৈবক্রমে ইনজিনের ঠিক পাশেই ছিল। ঘোঘায় যখন মোটঘাট নামানো হচ্ছিল তখন ইনজিনের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে সুবেদার খাঁ দেখলেন ডাক্তারবাবুকে।

"আদাব ডাক্তার সাহেব।"

"আদাব। ও আপনি ! আপনি ড্রাইভার নাকি ? কতদূর যাবেন ?"

"আমি সাহেবগঞ্জ থেকে ফিরব।"

"ও, তা হলে তো ভালই হল। যদি পারেন মিস্টার সেনকে খবর দিয়ে দেবেন যে, আমি তাঁর মেয়েকে এখানে নামিয়ে নিয়েছি। সাবোরে তাঁকে দেখতে পেলাম না।"

"ও, আচ্ছা।"

সুবেদার খাঁ বক্রদৃষ্টিতে তনিমার দিকে চাইলেন। তার স্বরূপ অজ্ঞাত ছিল না

তাঁর। ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে এ মেয়েকে দেখবেন প্রত্যাশা করেন নি তিনি। বিস্মিত হলেন একটু। ট্রেন ছেড়ে দিল।

ঘোঘা নালার ধারে অন্ধকারে একটা বড গাছের তলায় ডাক্তার বসেছিলেন। গাছতলায় অন্ধকার ছিল বটে, কিন্তু বাইরে জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছিল। কিছু দূরে দুর্গা আর একটা গাছতলায় বসেছিল রকেটকে নিয়ে। তনিমা দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ডাক্তার মুখার্জিকে অকপটে সব খুলে বলেছিল সে। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তার অবিশ্বাস্য কথাগুলো তখনও তাঁর বাজছিল।

"আমাকেই টোপের মতো ব্যবহার করতেন বাবা। আমাকে তাঁর ওপর-ওলার কাছে বলি দিয়েছিলেন বলেই তাঁর চাকরিতে উন্নতি। আমার রোজগারের টাকাতেই তিনি দামী দামী মদ কিনেছেন। আমার টাকাতেই কিনেছেন নিত্যনূতন বিলাস-সঙ্গিনী। মুনাফাখোর লম্পট ধনী দুরাত্মাদের কাছ থেকে টাকা যোগাড় করতে আমি গেছি। তথাকথিত সংস্কৃতি-বৈঠকে নেচে গেয়ে গুলজার করেছি আমি, আর গভীর রাত্রে সেই বৈঠকের পাণ্ডার কাছে গিয়ে ভালবাসার অভিনয় করে টাকা আদায় করে এনেছি। এক আধ টাকা নয়, অনেক টাকা। ডাক্তার ঘোষাল চোরা-বাজার থেকে টাকা রোজগার করেন, বাবা সে কথা জানেন, কিন্তু ডাক্তার ঘোষালকে পুলিসে ধরিয়ে দেন নি তিনি। আমাকে পাঠিয়েছেন ভুলিয়ে তাঁর কাছ থেকে টাকাটা আদায় করে আনতে। বাবার বন্ধুরাই আমাকে মদ খেতে শিখিয়েছেন, মাতাল হলে আমার মুখ থেকে যেসব কথা বেরোয় তা নাকি তাঁদের শুনতে ভারি ভালো লাগে! বাবা এতে আপত্তি করেন নি। কারণ যে সমাজে তিনি মেশেন সে সমাজে মদ না খেলে, খারাপ কথা না বললে "অছ্‌ছুত" হয়ে থাকতে হয়। সে সমাজে মদ খাওয়াটা শুধু ফ্যাশন নয়, প্রয়োজন।

"আমি ধাপে ধাপে নেমে গেছি, বাবাই আমাকে হাত ধরে নামিয়েছেন, আর আমার সৎমা যিনি আজ পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু আমি আর পারলাম না। একটা দৈত্যের মতো লোক সেদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিল, তার ঠোঁটে ধবল, মুখটা সিংহের মতো। সে আমার দিকে এমনভাবে চাইছিল যেন তখুনি আমাকে গিলে খাবে। সে খুব বড় চাকরি করে, বড় ডিগ্রীও নাকি আছে, অনেক টাকা মাইনে পায়। তার নেকনজরে পড়লে বাবার চাকরিরও উন্নতি হবে। সে লোকটা হঠাৎ বলল, তোমার মেয়েকে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি করব। যা মাইনে চায় তাই পাবে। সে চলে যাওয়ার পর থেকে বাবা আমাকে ক্রমাগত তার কাছে যেতে বলছেন। আমি বললাম, ও লোকটা কুষ্ঠে, ওর কাছে আমি যাব না। বাবা কিন্তু না-ছোড়। কাল থেকে জোরজবরদস্তি শুরু হয়েছে। তাই পালিয়ে এসেছি ...."

তনিমার কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। সুঠাম মুকুজ্যের মনে হচ্ছিল তিনি বহু দূর অতীতে ফিরে গেছেন যেন, ইতিহাসের বিস্মৃতপ্রায় এক অধ্যায় যেন মূর্ত হয়েছে তাঁর চোখের সামনে। তিনি যেন এক ধর্ষিতা ক্রীতদাসীর কান্না শুনছেন। তাঁর মনে হচ্ছিল দাস-বিক্রয় প্রথা উঠে যায় নি, তার বাইরের চেহারাটা বদলেছে কেবল। কামের দাস, লোভের দাস, অহঙ্কারের দাস, মানুষ আগে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার উপায়টা শুধু বদলেছে। সেকালকার মানুষের একটা ধর্মভয় ছিল, কুসংস্কারবশত তারা অনেক সময় নিরস্ত হ'ত, এখন ধর্মহীন কুসংস্কারমুক্ত পাষণ্ডেরা যা খুশি করছে। ষড়রিপুর প্রভুত্বটা অনেক বেড়েছে আজকাল, এখন সমাজে ওরাই প্রভু, ওদের ব্যবসাই বৃহত্তম ব্যবসা, সে ব্যবসার বিজ্ঞাপন আজ সিনেমার ছবিতে, শিল্পীর তুলিতে, সাহিত্যিকের লেখায়, বিজ্ঞানের আবিষ্কারে, নেতাদের আস্ফালনে। চারিদিকেই ফাঁদ পাতা। প্রলুব্ধ, কামুক, লোভী, ক্ষুধিত নর-নারীর দল ছুটে চলেছে সেই নিষ্ঠুর ফাঁদে ধরা দেবে বলে। মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শের কথা আজ শুধু কেতাবের পাতায় লেখা আছে, মানুষের জীবনে আর নেই। আজকাল তথাকথিত সভ্য দেশেও ভ্রূণ হত্যার সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, পাগলা গারদের সংখ্যা বাড়িয়েও সব পাগলাদের জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না, ওষুধের বাজারে ট্র্যাংকুইলিজারের চাহিদা সব চেয়ে বেশী। অত ওষুধ গিলেও কারও শান্তি নেই। তবু ওদেরই আমরা নকল করছি। নবযুগের ক্রীত দাস-দাসীদের অন্তর্নিহিত যন্ত্রণার রূপও নবরূপ ধারণ করেছে। ঢাকা পড়ছে না তা বাহ্যিক বিলাসের আড়ম্বরে, ফুটে বেরুচ্ছে রুজ-পাউডার লিপস্টিকের প্রলেপ ভেদ করে। মধ্যবিত্ত বাঙালী আজ বিত্তহীন নিঃস্ব। কেরানীগিরি করা ছাড়া আর কিছু করবার সামর্থ্য তার নেই। সে কেরানীগিরিও আজ তার কাছে দুর্লভ। ক্ষুধার জ্বালায়, লোভে, মোহে তাই আজ সে আত্মবিক্রয় করছে দুরাত্মা ধনীর কাছে। নানাভাবে করছে? না করে তার উপায় নেই। প্রাচীন সমাজ আজ একটা বিরাট পোড়োবাড়ির মতো জীর্ণ হয়ে গেছে, সেখানে এখন চামচিকে বাদুড়ের বাস। যেসব সুন্দর নিয়ম একদা এই সমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, সে-সব নিয়মও আজ জীর্ণ, সে-সবের উপরে আর কারো আস্থা নেই। ব্রাহ্মণের ছেলেদেরও আজকাল সময়ে উপনয়ন হয় না, ঘরে ঘরে অবিবাহিতা কুমারীর দল নানা রঙে সেজে, নানা ঢঙে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারও মুখে আনন্দের আভা নেই, সকলেই বিমর্ষ, সকলেই খুঁজছে উপার্জনের পথ। যেন-তেন প্রকারেণ উপার্জন করতে হবে তাদের। নগদ টাকা না পেলে তারা বাঁচতে পারবে না। তাদের চরিত্রকে সুগঠিত করবার দায়িত্ব কেউ নেই নি। পিতামাতারাও এ বিষয়ে উদাসীন। শিক্ষকরাও। শিক্ষকদের কিছু করবার ক্ষমতা নেই। তাঁরা সামান্য কেরানীর মতো স্কুলে চাকরি করেন মাত্র। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য পয়সা রোজগার করা আর উপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট রাখা। নীতির দণ্ড ধারণ করবার শক্তি তাঁদের বাহুতে নেই, মনেও নেই বোধ হয়। সমাজে তাই অমানুষের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের বাইরের চেহারা যদিও মানুষের মতো, পোশাক যদিও বিচিত্র, কিন্তু

আসলে তারা পশু ছাড়া আর কিছু নয়। যে দু'চারজন আসল মানুষ এখনও আছে, তারা এই পশুদের নখ-দন্ত-শৃঙ্গ-প্রহারে ছিন্ন-ভিন্ন, রক্তাক্ত। তারাও ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। এ যুগের একমাত্র মন্ত্র যা সরবে বা নীরবে সবাই জপ করে যাচ্ছে তা হল টাকা। টাকা, টাকা, টাকা। টাকা এবং প্রতিপত্তি। আত্মসম্মান, সতীত্ব, দেশ-প্রেম, আদর্শ, মনুষ্যত্ব সব বিক্রি করেও যদি এসব পাওয়া যায় তাতেও পশ্চাৎপদ নয় কেউ। যেমন করে হোক টাকা চাই, যেমন করে হোক পাদ-প্রদীপের সামনে লাইমলাইটে আসতে হবে। বেগবান এই পশুত্বের স্রোতে বড় বড় ঐরাবত ভেসে যাচ্ছে, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য সব তলিয়ে গেলেন।

সুঠাম মুকুজ্যে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন তনিমা আর কাঁদছে না। জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছে। বড় করুণ মনে হল দৃশ্যটা। হাঁটুর উপর মুখ রেখে দু'হাত দিয়ে সেই হাঁটুটা জাপটে ধরে বসে আছে চুপ করে মাঠের দিকে চেয়ে। পিঠটা ধনুকের মত বেঁকে আছে। মাথার বিনুনিটা বিস্রস্ত হয়ে পড়ে আছে পিঠের উপর। ডাক্তার মুখার্জির মনে হল মেয়েটি বড় রোগা। কামনাকলুষিত বর্তমান ঝঞ্ঝা যেন বিধ্বস্ত করে দিয়েছে পুষ্পিতা বল্লরীকে। একটি সুন্দর মূর্তি পড়ে গিয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে যেন। আবার চেয়ে দেখলেন তার দিকে—স্থির হয়ে বসে আছে সে। হঠাৎ ডাক্তার মুখার্জির মনে হল ও অপেক্ষা করছে। নিজের সব কথা অকপটে বলার পর ও অপেক্ষা করছে তিনি কি বলেন তাই শোনবার জন্য। কি বলবেন তিনি? ও কি করবে তা তিনি জানেন, কিন্তু ওকে বাঁচাবার কি ব্যবস্থা করতে পারেন তিনি? তিনি নিজে কি ওর ভার নিতে পারেন? সেটা কি সম্ভব, না শোভন? মনে পড়ল কিছুদিন আগে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে চিঠি লিখেছিল যে, আমেরিকায় সে একটা ভাল চাকরি পেয়ে চলে গেছে। বাকী জীবনটা তার ওই দেশেই কাটাবার ইচ্ছে। লিখেছে, আমার কলকাতার বাড়িটা তোমার হেফাজতে রেখে যাচ্ছি। 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি' এই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম। তুমি বাড়িটার যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রো। ভাড়া দিতে পার, বিক্রি করে দিতে পার যা তোমার ইচ্ছে। ছেলেটি ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান, বড় ডাক্তার। তারও তিন কুলে কেউ নেই। ডাক্তার মুখার্জির সহপাঠী ছিল বিলেতে। ভারতীয় গণতন্ত্রের আবহাওয়ায় সে স্বস্তি পাচ্ছিল না। মাস খানেক আগে সে চলে গেছে। বাড়িটার এখনও কোন ব্যবস্থা করতে পারেননি সুঠাম মুকুজ্যে। তাঁর মনে হল মেয়েটি কি ওখানে একা থাকতে পারবে?

জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তোমার বাবার কাছে আর ফিরে যাবে না?"

"না।"

"কোথায় যাবে?"

"কোলকাতায়।"

"সেখানে গিয়ে কি করবে?"

"চাকরি।"

"চাকরি ঠিক করেছ কোনও ?"

"না। পেয়ে যাব কোথাও একটা।"

"যতদিন না পাও ততদিন কোথায় থাকবে ?"

"কোন হোটেলে।"

তারপর মৃদু হেসে বললে—"কিছুদিন কোন নার্সিং হোমেও থাকতে হবে।"

এই ইঙ্গিতটার নিগূঢ় অর্থ শেলের মতো বিঁধল ডাক্তার মুখার্জির বুকে। শুধু যে বেদনা পেলেন তা নয়, লজ্জিতও হলেন। তিনি জানেন, তাঁরই সমব্যবসায়ী এমন অনেকে আছেন যাঁদের একমাত্র কাজ কুমারীদের অবাঞ্ছিত গর্ভ-নাশ করা। বড়লোক বলেও সমাজে খাতির পান তাঁরা। এই রকম কোনও একটা পাষণ্ডের কবলে গিয়ে তনিমা পড়বে এ ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন তিনি।

"আপনি ট্রেনে বললেন আমাকে সাহায্য করবেন। আপনাকে তো সব খুলে বললাম।"

"তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি, কিন্তু একটি শর্তে।"

"কি, বলুন।"

"তোমার পেটের ছেলেকে নষ্ট করতে পারবে না।"

"যে ছেলেকে সমাজ চায় না তাকে নিয়ে আমি কি করব ? তা ছাড়া আমাকে এখন চাকরি করতে হবে।"

"তোমাকে এখন চাকরি করতে হবে না। কোলকাতায় গেলেই চাকরি পাওয়া যাবে না।"

"ধরুন যদি যায়, আমার এক বান্ধবী লিখেছে সে আমাকে একটা চাকরি যোগাড করে দেবে।"

"যদি দেয় করো, এ অবস্থায় তুমি অনায়াসে চাকরি করতে পার অবশ্য। কিন্তু না করলেই ভালো।"

"চাকরি আমাকে করতেই হবে। আমার আসল সমস্যা কি নামে নিজের পরিচয় দেব। দিন কতক পরেই তো লোকে জানতে পারবে।"

"মিসেস ঘোষাল বলেই নিজেকে পরিচিত ক'রো, তুমি যখন বলছ ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গেই তোমার বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—"

"আগেই আপনাকে বলেছি অনেকের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আমার পেটে কার ছেলে আছে তা আমি ঠিক জানি না।"

চুপ করে রইলেন ডাক্তার মুখার্জি। এর পর তনিমা একটা নাটকীয় কাণ্ড করে বসল। ডাক্তার মুখার্জির পা দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমার উপর দয়া করুন। আমাকে মরতে দিন। আমার সঙ্গে সায়ানাইড আছে' খানিকক্ষণের মধ্যেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।"

"কোথায় পেলে তুমি সায়ানাইড ?"

কথাটা বলেই তিনি বিস্মিত হলেন একটু। কখন থেকে তিনি তনিমাকে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করেছেন তা মনে করতে পারলেন না।

"অনেক দিন থেকে এটা আমার কাছে আছে। যখন বি. এস-সি পড়তাম তখন থেকেই যোগাড় করে রেখেছি।"

"ভালো সায়ানাইড ?"

"মার্কের"

"কই, দেখি"

তনিমা শিশিটা বার করে দিতেই সেটা নিজের কোটের ভিতরের পকেটে রেখে ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "এটা আমার কাছে থাক। একটা কথা ভুলে যেও না, আমি ডাক্তার, আমার কাজ বাঁচাবার চেষ্টা করা। না পারতে পারি, কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে চেষ্টা আমি করব। তোমাকে অনুরোধ করছি আমাকে তুমি সাহায্য কর। তুমি নিজে যদি বাঁচতে না চাও, আমার চেষ্টা ব্যর্থ হবে। জীবনে ভুল অনেকেই করে, তুমিও করেছ। তাতে হয়েছে কি ? ভুল শুধরে নেওয়াও যায়। এমন সুন্দর পৃথিবীকে ছেড়ে যাবে কেন ? সুন্দরভাবে তাকে ভোগ কর। ইচ্ছে করলেই তা করা যায়।"

তনিমা চুপ করে রইল।

"উত্তর দিচ্ছ না যে !"

"আপনিই বলুন, কি করে করব।"

"তোমার পেটে যে সন্তান আছে তাকেই ভালোভাবে মানুষ করা তোমার জীবনের লক্ষ্য হোক।"

"জারজ সন্তানের কি সমাজে স্থান আছে ?"

"আছে বই কি।"

ডাক্তার ঘোষাল ঝিনুককে যা বলেছিলেন, ডাক্তার মুখার্জিও তনিমাকে তাই বললেন।

"অনেক বিখ্যাত লোকের পিতৃপরিচয় নেই। তাতে কি কিছু এসে গেছে ? তোমার সন্তান সত্যিই যদি গুণের আকর হয়, সমাজ তাকে মাথায় করে রাখবে।"

"প্রতিভাবান হলে হয়তো রাখবে। আমার ছেলে প্রতিভাবান না-ও হতে পারে, খুব সম্ভব হবে না। তখন ? আমার মতো দুশ্চরিত্রার গর্ভে প্রতিভাবান ছেলে জন্মাবে এ আশা দুরাশা।"

"প্রতিভাবানের জন্ম কখন কোথায় কি ভাবে হয় তা কেউ জানে না। মানুষের সমাজেও কাকের বাসায় কোকিল জন্মায়। নীচকুলে প্রতিভাবান লোক জন্মেছে এরকম উদাহরণ ইতিহাসে বিরল নয়। তোমার সন্তান যদি প্রতিভাবান না-ও হয় তাতেই বা কি। সে যদি ভালো হয় তা হলেই যথেষ্ট। আর সে ভালো হবে কি না সেটা নির্ভর করবে তোমার উপর, তুমি যদি আন্তরিকভাবে চাও সে ভালো হোক, তা হলে সে ভালো হবেই।"

অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল তনিমার মুখে।

"আমার মতো পতিতার ছেলে কি কখনও ভালো হতে পারে! কি যে বলেন!

"ঠিকই বলছি। তুমি যদি ভালো করে তার দেখাশোনা কর, নিশ্চয় সে ভালো হবে। জীবনের পথে যে-সব লুকোনো গর্ত থাকে তাতে পড়েই তো লোকে ক্ষত-বিক্ষত হয়। তুমি সে সবের সন্ধান জানো, তাই তুমি আরও ভালো করে তাকে বাঁচাতে পারবে। তোমাকে শক্ত হতে হবে, তোমাকে একাগ্র হতে হবে, তা যদি হতে পার নিশ্চয় তোমার ছেলে ভালো হবে।"

"আমাকে তা হলে এখন কি করতে বলেন ?

"আমার মতে তোমার বাবার কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। তারপর তাঁকে জানিয়ে তুমি কোলকাতা চলে যেও। সেটা সব দিক দিয়েই ভালো হবে। তা না হলে হয়তো তিনি থানায় খবর দেবেন, আমাকে নিয়ে টানাটানি করবেন, সে এক বিশ্রী কাণ্ড হবে।"

"কিন্তু বাবা যদি আমাকে যেতে না দেন ?"

"তুমি সাবালিকা হয়েছ, পুলিসের সাহায্য নিয়ে তুমি চলে যেতে পার। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক পুলিস ছাড়া আর কেউ তোমাকে আটকাতে পারে না। তোমার বাবাও নয়। আর পুলিস তোমাকে আটকাবে তুমি যদি বে-আইনী কিছু কর। তাই বলছি বে-আইনী কিছু করবার চেষ্টা ক'রো না। এখন বাবার কাছে ফিরে যাও।"

"তারপর ?"

"তারপর কোলকাতা যেও। সেখানে ভদ্রভাবে যদি থাকতে চাও একটা বাসার সন্ধান তোমাকে দিতে পারি। আমার এক ডাক্তার বন্ধুকেও চিঠি লিখে দিতে পারি, তিনি তোমার দেখাশোনা করবেন। তিনি ভালো লোক, ভালো গাইনকোলজিস্ট।"

"কোলকাতার বাসা আপনার নিজের বাড়ি ?"

"ঠিক নিজের নয়, একজন বন্ধুর। সে এখন আমেরিকা চলে গেছে, বাড়িটা এখন আছে আমার হেফাজতে। তুমি কিছুদিন গিয়ে অনায়াসে থাকতে পার।"

ঠিক সেই সময় রকেট ডেকে উঠল আর দুর্গা চীৎকার করে বলল, "বাবু, শিহাই নিকললো ছে।" (বাবু, শজারু বেরিয়েছে)। রকেট ঘেউ ঘেউ করে ছুটল মাঠের দিকে। ডাক্তারবাবুও তাড়াতাড়ি উঠে দ্রুতপদে যেতে লাগলেন তার পিছু-পিছু। তনিমাও চলল।

ডাক্তারবাবু কিছু দেখতে পাননি, তিনি রকেটকে অনুসরণ করছিলেন। রকেট একটা মাঠ পেরিয়ে আর একটা মাঠে পড়ল। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। ডাক্তার মুখার্জি। যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন দেখলেন পুঁটুলির মতো কি একটা পড়ে আছে আর সেটাকে লক্ষ্য করে রকেট ক্রমাগত ডেকে চলেছে, কিন্তু খুব কাছে ঘেঁষতে সাহস করছে না। শজারুটা সর্বাঙ্গে কাঁটা খাড়া করে গোল

হয়ে পড়ে ছিল একটা তাকিয়ার মতো। ডাক্তার মুখার্জি টর্চ ফেলে ফেলে সেটাকে দেখতে লাগলেন ভালো করে। অদ্ভুত দৃশ্য।

"ওই শজারু নাকি?" বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল তনিমা।

"হ্যাঁ।"

"ওর মুখ কই?"

"লুকিয়ে রেখেছে। ওই হচ্ছে ওদের আত্মরক্ষার উপায়। দুর্গা, তুই ছুটে গিয়ে আমার ক্যামেরাটা আনতে পারবি? এর একটা ফটো তুলে ফেলি।"

গাছতলাতেই ডাক্তারবাবুর ব্যাগ ছিল। দুর্গা ছুটল। ডাক্তার বাবু লক্ষ্য করলেন রকেট ক্রমশ সাহস সঞ্চয় করে শজারুটাকে ওলটাবার চেষ্টা করছে থাবা বাড়িয়ে। একবার যদি ওলটাতে পারে তা হলেই গলাটা কামড়ে ধরবে।

ডাক্তারবাবু ধমকালেন, "এই থাবালু, ডোণ্ট ডু দ্যাট। ডোণ্ট···"

সম্প্রতি ডাক্তারবাবু রকেটের নূতন নামকরণ করেছেন থাবালু, তার থাবাগুলো বড় বড় বলে। তনিমা নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। চোখ বড় বড় করে সে শজারুটা দেখছিল খালি। ডাক্তার মুখার্জির মনে একটা উপমা জাগল সহসা। তনিমা যেন ওই শজারু আর রকেট যেন সমাজ। তনিমার সর্বাঙ্গের উদ্যত কাঁটাগুলোও তিনি যেন দেখতে পেলেন।

একটু পরেই দুর্গা ফিরল। শজারু আর রকেটের ফটো তুললেন তিনি ফ্ল্যাশ লাইটে। তারপর দুর্গাকে বললেন রকেটকে নিয়ে যেতে। রকেট কিছুতে যেতে চায় না। দুর্গা শিকলে বেঁধে জোর করে তাকে নিয়ে গেল। তারপর ডাক্তার মুখার্জি তনিমাকে বললেন, "এস, আমরা একটু দূরে সরে দাঁড়াই।"

একটু দূরে সরে দাঁড়াতেই মিনিট কয়েক পরে শজারুর কুণ্ডলীকৃত অবস্থাটা সরল হল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সে। গলা দিয়ে অদ্ভুত ধরনের শব্দ বেরুল একটা। তারপর ছুটে পালাল।

তনিমাকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার মুখার্জি যখন তাঁর বাসায় ফিরে এলেন তখন রাত অনেক হয়েছে। মুখ তুলে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন হংসমণ্ডল (Cpgnus) আর অভিজিৎ (Lyra) প্রায় মধ্যগগনে। একবার তাঁর মনে হল, তনিমাকে নক্ষত্রগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে কেমন হয়? বৃশ্চিক, ধনু, আর ছায়াপথও বেশ চমৎকার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে সে ইচ্ছা বর্জন করতে হল। "চল, এবার শুয়ে পড়া যাক! দেড়টা বেজে গেছে—"

শোবার ঘর দুটি। একটিতে ডাক্তার মুখার্জি শুলেন, আর একটিতে তনিমা। দুর্গা তনিমার ঘরের দুয়ারের কাছে বিছানা পাতল। রকেট শুল ডাক্তার মুখার্জির ঘরে, তাঁর বিছানার পাশে। অত অসুবিধার মধ্যেও ডাক্তার মুখার্জি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে

পড়লেন। তনিমার কিন্তু ঘুম এল না। বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল সে। নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ চিন্তাই তার চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। সে ঠিক করতে পারছিল না কি করবে। সে দৈবক্রমে চলন্ত গাড়িতে ডাক্তার মুখার্জির কামরায় উঠে পড়েছিল। যদি অন্য গাডিতে উঠত, কি হ'ত তা হলে? 'কোলকাতায় পৌঁছেই বা কি করত? তার যে বান্ধবীটি তাকে অনেকদিন আগে চিঠি লিখেছিল, এখানে এলে একটা চাকরি হতে পারে'—সে কি সত্যই তাকে আশ্রয় দিত? সত্যিই সে কি নির্ভরযোগ্য? তা ছাড়া তার পেটের ওই হতভাগ্য সন্তান, কি করবে তাকে নিয়ে! হত্যা করবে? এতদিন সে যা করেছে, তা পাশবিক সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে হত্যার কলঙ্ক স্পর্শ করেনি। কিন্তু একটা পিতৃ-পরিচয়হীন সন্তান নিয়ে সে করবেই বা কি! ডাক্তার মুখার্জি যে-সব বড় বড় কথা বললেন, তা শুনতে বেশ ভালো লাগল, কিন্তু বাস্তব জগতে সে-সবের কি কোনও দাম আছে? ছেলে বা মেয়ে হলেই পাড়াপড়শীরা তার নাম জানতে চাইবে। স্কুলে ভর্তি করতে গেলেও বাবার নাম চাই। নিজেকে বিধবা বলে পরিচিত করবে? কোনও কল্পিত মৃত স্বামীর নামে চালাবে নিজেকে? কিন্তু তা করলে তাকে বিধবার মতোই থাকতে হবে। তা সে পারবে না। নিরাভরণ হ'য়ে থান পরে থাকা অসম্ভব তার পক্ষে। কোনও সদাশয় লোক কি সব জেনে শুনেও তাকে বিবাহ করতে পারে না? ডাক্তার মুখার্জি কি এরকম কোনও ব্যবস্থা করতে পারেন না? ডাক্তার মুখার্জি নিজে কি বিবাহিত? কই, তাঁর স্ত্রীকে সে বাইরে কখনও দেখে নি তো। হঠাৎ সে বিছানায় উঠে বসল। বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। অনেকক্ষণ সে বসে রইল চুপ করে।

রকেট চীৎকার করে উঠতেই ডাক্তার মুখার্জি বিছানায় উঠে বসলেন। ঘরের এক কোণে বিছানার কাছেই একটা লণ্ঠন কমানো ছিল। উঠে সেটা বাড়িয়ে দিতেই তনিমাকে দেখতে পেলেন তিনি। তনিমা ঘরের দরজার সামনে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে ছিল।

"কি হল! এই রকেট, চুপ কর—সিট্ ডাউন।"

রকেট বসতেই তনিমার দিকে চেয়ে বললেন, "ঘুম হচ্ছে না?"

"না। ভিতরে আসতে পারি?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এস, বস।"

তনিমা এসে তাঁর বিছানার এক ধারে বসল।

"ঘুম হচ্ছে না কেন? অচেনা জায়গায় অনেকের ঘুম হয় না। আমার বাক্সে ঘুমের ভাল ওষুধ আছে একটা, দিতে পারি।"

"না থাক।"

তারপর একটু থেমে বললে—"একটা কথা ভেবে কিছুতেই ঘুম আসছে না"

"কি কথা?"

তনিমা কয়েক মিনিট চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আচ্ছা, আমার সব কথা জেনে আমাকে বিয়ে করতে পারে, এরকম সদাশয় লোক কি আপনার জানা-শোনা নেই?"

আপনি নিজেই তো খুব সদাশয় লোক। আপনার মতো ভালো লোক আমি আর দেখিনি। আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? কিছু মনে করবেন না তো?"

"কি, বল।"

"আপনি কি বিবাহিত?"

"একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন!"

বিস্মিত হলেন ডাক্তার মুখার্জি।

তনিমা কিছু না বলে অন্য দিকে চেয়ে কাপড়ের আঁচলটা বুড়ো আঙুলে জড়াতে লাগল।

"এ কথা জানতে চাইছ কেন?"

আবার প্রশ্ন করলেন ডাক্তার মুখার্জি সবিস্ময়ে।

তনিমার ঘাড় একটু হেঁট হল। তারপর প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে সে বললে, "আপনি যদি অবিবাহিত হন, তা হলে—"

হো-হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তার মুখার্জি। হাসির একটা ঝড় বইয়ে দিলেন তিনি। এ হাসি তনিমা আগে শোনেনি। হকচকিয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। হাসি থামিয়ে ডাক্তার মুখার্জি কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফেললেন, "না, তা হলেও আমি তোমার সমস্যার সমাধান করতে পারব না।"

"কেন? এই তো একটু আগে বললেন, সব ভুলই শুধরে নেওয়া যায়, বললেন আমাকে আপনি বাঁচাতে চান। আমাকে যদি বিয়ে করেন, তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।"

"না, তা হয় না।"

"আপনি কি বিবাহিত? কই, স্ত্রীকে কখনও তো আপনার গাড়িতে দেখিনি, কোথাও দেখিনি। আমি তো সব জায়গায় ঘুরে বেড়াই।"

"আমি বিবাহত কিনা, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। আমি তোমাকে যদি বিয়ে করি, তা হলে আমি তোমার জন্য যা করতে চাইছি, তার একটি অর্থ ই লোকে করবে, যা আমি চাই না।"

"কেন চান না? আমাকে বিয়ে করলে কি আপনার সম্মান কমে যাবে? তার মানে আপনি আমাকে মনে মনে ঘৃণা করেন। এতক্ষণ দূর থেকে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে মহত্ত্বের অভিনয় করছিলেন মাত্র। ওরকম শুকনো দয়া আমার কোন কাজে লাগবে না।

তনিমার চোখের দৃষ্টিতে আগুন জ্বলতে লাগল। তার গ্রীবাভঙ্গিতে ফুটে উঠল কুপিতা ফণিনীর হিংস্রতা। ডাক্তার মুখার্জি একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন।

কান দুটো খাড়া ক'রে রকেট চেয়ে ছিল তনিমার দিকে। মনে হল ডাক্তার মুখার্জির কাছ থেকে সামান্য ইঙ্গিত পেলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর। তনিমার উপর ডাক্তার মুখার্জি যে অসন্তুষ্ট হয়েছেন তা তাঁর ভাব-ভঙ্গী থেকে রকেট বুঝেছিল।

ডাক্তার মুখার্জি অনেকক্ষণ কোন কথা বললেন না। বালিশের নীচে থেকে ঘড়িটা বার ক'রে দেখলেন, তারপর রেখে দিলেন। তিনটে বেজেছে। আর ঘণ্টা তিনেক পরেই তাঁর ফেরবার গাড়ি। মুখার্জি বললেন, "আমি তোমাকে যা বলেছি সেটা ভাল করে ভেবে দেখ। তাতে যদি রাজী থাক, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমাকে সাহায্য করতে।"

তনিমা উঠে পড়ল।

"আপনার সাহায্য আমি চাই না। আমার টাকাটা দিন, আমি এখনই চলে যাচ্ছি।"

"কোথা যাবে?"

"তা আমি বলব না।"

"কিন্তু এভাবে তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না। আমার সঙ্গে তুমি যদি ফিরে না যাও তা হলে আমাকে বাধ্য হ'য়ে পুলিসে খবর দিতে হবে।"

"পুলিসে! তা হলে আমার জেল হোক এইটেই আপনার ইচ্ছে? এতক্ষণ যে লম্বা লম্বা লেকচার দিলেন তা অর্থহীন?"

"আমার লেকচার অর্থহীন কিনা সে আলোচনা এখন থাক। তুমি তোমার বাবার কাছে এখন ফিরে চল, তারপর সেখান থেকে যেখানে খুশি যেও।"

"বাবার কাছে ফিরে যাওয়া মানেই তো আবার নরকে ফিরে যাওয়া। সেখান থেকে আর কি আমি ছাড়া পাব? ওখানকার পুলিস আমাকে সাহায্য করবে না, ওরা সবাই বাবার বন্ধু।"

"আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তুমি যদি তোমার বাবার কাছে না থাকতে চাও তা হলে পুলিস প্রোটেকশন্ দিয়ে তোমাকে আমি অন্যত্র পাঠিয়ে দেব। আজকাল যিনি ম্যাজিস্ট্রেট তিনি ভালো লোক, আমার সঙ্গে আলাপ আছে, সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু এখন তোমাকে আমার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে।"

"আপনি কথা দিচ্ছেন?"

"দিচ্ছি।"

তনিমা অবাক হয়ে চেয়ে রইল সুঠাম মুকুজ্যের দিকে। শুধু বিস্ময় নয়, ক্রমশঃ শ্রদ্ধাও ফুটে উঠল তার দৃষ্টিতে। গত তিন চার বছরে তার যে অভিজ্ঞতা তারও রং বদলে দিলেন এই ভদ্রলোক। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে একলা পেয়ে নিজের ভদ্রতা বজায় রাখতে পারেনি। ইনি পেরেছেন। শুধু তাই নয়, অপমানিত হয়েও ইনি বিচলিত হননি, সম্মানে তার ভালো করবার চেষ্টা করছেন। সহসা তনিমার মনে হল এ লোকটির কাছে আত্মসমর্পণ করলে ঠকতে হবে না। এসব কথা মনে হবার পর একটা নাটকীয় কাণ্ড ক'রে বসল সে। হঠাৎ ডাক্তার মুখার্জির পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, "আপনাকে অনেক কটু কথা বলেছি, আমাকে মাপ করুন।"

ডাক্তার মুখার্জি শশব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন—"ছি ছি, ও কি করছ! আমি জানি, রাগ হলে মাথার ঠিক থাকে না। ওতে আমি কিছু মনে করিনি। ওঠ—"

॥ ১৫ ॥

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে আবার একদিন গভীর রাত্রে গণেশ হালদারের বাইরের ঘরের কড়া নড়ল। তিনি জেগেই ছিলেন। শুধু সেদিন নয়, ঝিনুকের চিঠি পাওয়ার পর থেকে রোজই তিনি জেগে থাকেন, রোজই প্রতীক্ষা করেন ঝিনুক আসবে। ঝিনুক যে টাকাটা রেখে গিয়েছিল সেটাও নিয়ে যায়নি। বাণ্ডিল বাঁধা এগারো হাজার টাকার নোট তাঁর ট্রাঙ্কের তলাতেই আছে এখনও। তিনি এজন্য মনে মনে অস্বস্তি ভোগ করছিলেন, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করবার উপায় ছিল না। সেজন্য অস্বস্তিটা আরও পীড়াদায়ক হ'য়ে উঠেছিল। কড়া নাড়ার শব্দ পেয়েই তিনি বেরিয়ে কপাটটা খুলে দিলেন। খুলে দিতেই ঝিনুক এসে ঢুকল। হালদার মশাই কপাটটা ভালো করে বন্ধ ক'রে দিয়ে তারপর এলেন। কেউ যদি তখন তাঁকে দেখতে পেত তা হলে লক্ষ্য করতে পারত যে, তাঁর মুখে একটা দোষীর ভাব ফুটে উঠেছে, যেন তিনি যা করছেন তা তাঁর বিবেক অনুমোদন করছে না।

ঝিনুক ঢুকেই তার অপূর্ব হাসি হেসে বললে, "আমার আগেই আসা উচিত ছিল, কিন্তু আমি এখানে ছিলাম না।"

"ও, ছিলেন না? কোথায় গিয়েছিলেন?"

"কলকাতায়। তেলিপাড়ার মোহিনীকে আর ছবিকে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে এসেছি। মোহিনী গেল লণ্ডনে। ও বি-এ পাস, ওর সঙ্গে কিছু টাকাও দিয়ে দিয়েছি, আশা করি ও ভদ্রভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। ছবি গেল জাপানে। দু'খানা হাতই ওর সম্বল। খুব ভালো মূর্তি গড়তে পারে, ছবিও আঁকতে পারে। কিন্তু এখানে সেসব করবার সুযোগ পায়নি। তাই পিক্-পকেট হয়েছিল। জাপানে শুনেছি শিল্পীর সমাদর আছে। দেখা যাক সেখানে ও কি করতে পারে।"

"এসব করছেন কি ক'রে! বিদেশে যেতে হলে তো অনেক হাঙ্গামা—"

"সুবেদার খাঁ সব করছেন।"

বলেই ঝিনুক থেমে গেল।

"নামটা ব'লে অন্যায় ক'রে ফেললাম। যাক, যখন বলেই ফেললাম তখন ওঁর পরিচয়টা দিয়ে ফেলি। ওঁর মতো লোকও দুর্লভ। উনি বাঙালী, বেহারী কি পাঞ্জাবী তা জানি না। চেহারাটা পাঞ্জাবীর মতো লম্বা-চওড়া, বাংলা হিন্দী দুই-ই চমৎকার বলেন। রায়টের সময় ওঁর আত্মীয়স্বজনরা ছিলেন বিহারে, উনি ছিলেন পাঞ্জাবে। ফিরে এসে দেখেন ওঁর আত্মীয়স্বজনকে কেটে কুয়োয় ফেলে দিয়েছে হিন্দু বিহারীরা। ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। বৃটিশ রাজত্বের সময় উনি বিলেতে গিয়েছিলেন। সেখানে ইন্‌জিন্ ড্রাইভারের ট্রেনিং নিয়েছিলেন কিছুদিন। সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের সুপারিশে

উনি সেই ট্রেনিংটা সম্পূর্ণ করেন এ-দেশে। সেই সময় একজন মেরিন ইন্‌জিনিয়ারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় ওঁর। সেই ঘনিষ্ঠতার ফলে উনি বিদেশগামী জাহাজের খবর-টবর পান, দু-একজন ক্যাপটেনের সঙ্গেও ভাব করেছেন। ওঁরই সাহায্যে মোহিনী আর ছবি চলে গেল। উনি বলেছেন বাকি সবাইকেও পার ক'রে দেবেন।"

"উনি আপনাদের দলের লোক ?"

"হ্যাঁ। ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে ওঁর আগেই পরিচয় ছিল। ডাক্তার ঘোষালকে কেন্দ্র করেই আমাদের দলটা গড়ে উঠেছে। আমার ইচ্ছে আপনিও আমাদের দলে আসুন। আমি দলের কাউকে এ কথা বলিনি রাজী হ'লে বলব। আমার বিশ্বাস সকলেই এতে খুশী হবে।"

"আপনাদের দলের কাজ কি ?"

"আপাতত টাকা সংগ্রহ করা। আমরা সাধারণতঃ বে-আইনি স্মাগলিং ক'রে টাকা সংগ্রহ করি। বার্মায়, চীনে ডাক্তার ঘোষালের পরিচিত লোক কয়েকজন আছেন। তাঁরা সস্তায় নানারকম জিনিস লুকিয়ে পাঠান, আমরা বেশী দামে সেগুলো এখানে বিক্রী করি।"

গনেশ হালদারের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। এরা তা হলে চোর! ঝিনুকও ওই দলে! তাঁর মনে এ কথা জাগল বটে, কিন্তু মুখে তিনি কিছু বললেন না, নত-নেত্রে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। ঝিনুকই অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করল।

"আপনি আমাদের দলে যোগ দিচ্ছেন তো ?"

"না। চোর-ডাকাতদের দলে যোগ দেবার সামর্থ্য বা ইচ্ছে কোনটাই নেই আমার।"

"একার সামর্থ্যে পৃথিবীতে কোনও দলই কখনও গড়ে ওঠে না। অনেকের সম্মিলিত সামর্থ্যই দলকে পুষ্ট করে, চালিত করে। তা ছাড়া আপনার সামর্থ্য যে কতটা তা আপনি নিজেও বোধ হয় জানেন না ভালো করে। কার্যক্ষেত্রে নামলে সেটা বোঝা যায়। কিন্তু ইচ্ছে নেই বলছেন কেন ?"

"চোর ডাকাত গুণ্ডাদের আমি চিরকাল ঘৃণা করেছি। কোন কারণেই তাদের সঙ্গে আমি নিজেকে যুক্ত করতে পারব না।"

"চোর ডাকাত ? আলেকজাণ্ডার আর রবারের গল্পটা কি আপনি তা হলে পড়েননি ? আমাদের দেশে আজকাল যাঁরা ক্ষমতার শিখরে আসীন, আপনাদের কি বিশ্বাস তাঁরা সবাই নিখুঁত ধর্ম-পথে চলে' সে শিখরে পৌঁছেছেন ? অগ্নিযুগে যাঁরা দেশকে উদ্ধার করবার জন্য নিজেদের প্রাণ বিপন্ন ক'রে, নিজেদের সর্বস্ব খুইয়ে, নিজেদের অবলুপ্ত ক'রে দিয়ে, অতি কষ্টে বোমা-রিভলবার সংগ্রহ ক'রে বিদেশী শাসকদের হত্যা করবার আয়োজন করেছিলেন তাঁদের কি আপনি সাধারণ খুনেদের পর্যায়ে ফেলছেন নাকি! খুন করাও অনেক সময় মহান কর্তব্য, স্বয়ং ভগবান অর্জুনকে স্বজননিধনে প্ররোচিত করেছিলেন, তা কি আপনি পড়েন নি ?"

ঝিন্টুকের চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধ'রে গেল। তার মুখের দিকে চেয়ে গণেশ হালদার ভয় পেয়ে গেলেন। একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, "না অগ্নিযুগের বীরদের আমি সাধারণ খুনেদের পর্যায়ে ফেলিনি। তাঁদের আমি সম্মান করি। কিন্তু এ কথাও কি সত্য নয় যে, তাঁরা দলে দলে প্রাণ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য হ'তে পারেন নি ? এ কথাও কি সত্য নয় যে, তাঁদের মধ্যেও বিশ্বাসঘাতক দেখা দিয়েছিল। বে-আইনি পথে চ'লে প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে বেশী দিন দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হয়। তাতে লাভ কি। অগ্নিযুগের অগ্ন্যুৎসবে আমাদেরই ঘরবাড়ি পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেছে, আর কারও কোন ক্ষতি হয়নি। বরং, আমাদের প্রতি ইংরেজের ক্রোধের সুবিধা নিয়ে অনেক সুবিধাবাদী নিজেদের কোলে ঝোল টানবার সুযোগ পেয়েছে। আমার বিশ্বাস ইংরেজ যাওয়ার সময় যে বাংলা আর পাঞ্জাবের বুকে খড়্গ হেনে গেল তা ওই অগ্নিযুগের ক্রিয়াকলাপেরই জবাব।"

"কিন্তু এ জবাব শুনে আমরা কি চুপ ক'রে ব'সে থাকব ? সেইটেই কি মনুষ্যত্বের পরিচয় হবে ?"

"কিন্তু চুপ করেই তো বসে আছি। কোথাও তো কোন প্রতিবাদ শুনি না। কোথাও তো কেউ বলে না যে, ভাঙ্গা দেশকে জোড়া লাগাবার জন্যে আমরা প্রাণ পণ করব। কোথাও তো কেউ রেফিউজিদের আপন লোক ব'লে বুকে টেনে নেয়নি। সবাই তো দেখি কোট-প্যাণ্ট প'রে কলার নেকটাই ঝুলিয়ে নকল সাহেব সেজে নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টাতেই ব্যস্ত। সভায় সভায় নাচগানের বহর আর উপর-ওলা তোষণের ব্যবস্থা দেখে তো মনে হয় না দেশ বিভক্ত হয়েছে ব'লে আমরা খুব মর্মাহত। ক'জন বাঙালী সত্যি সত্যি বাঙালী জাতিকে নিয়ে মাথা ঘামায় ? চায়ের টেবিলে বা আড্ডায়, মজলিসে বাঙালীরা মুখে বাঙালী সম্বন্ধে যতটুকু হা-হুতাশ করে তা নিছক পরচর্চার আনন্দেই ক'রে থাকে। ওর মধ্যে সত্যিকার স্বজাত্য-বোধ নেই, সত্যিকার প্রেম নেই। থাকলে ও নিয়ে তারা গুলতানি করত না, লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে থাকত। বাঙালী মেয়েদের কোথায় কবে কত অপমান কি ভাবে কারা করেছে তার নির্লজ্জ উলঙ্গ বর্ণনা বাঙালীরাই করে। শুধু মুখে নয়, ছাপিয়েও করে। তার আত্মসম্মান থাকলে কখনই সে এ কাজ করত না। ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের লোক নিজেদের নিন্দায় কি এমন পঞ্চমুখ ? মনে হয় না।"

"কিন্তু এটাও তো সত্যি যে, আমাদের উপরই সবচেয়ে বেশী অত্যাচার, সবচেয়ে বেশী অবিচার অতীতেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এটা কি আমরা মুখ বুজে সহ্য ক'রে যাব চিরকাল ?"

"ইতিহাস পড়লে বুঝতে পারবেন অত্যাচার-অবিচারের পরমায়ু কম। কখনই কোন দেশে তা অমরত্ব লাভ করেনি। কলুষিত শাসনপদ্ধতির মধ্যেই তার বিনাশের বীজ নিহিত থাকে। যথাকালে এ মেঘ কেটে যাবে। চুরি ডাকাতি বা খুন করে' এর সত্য প্রতিকার হবে না। আমাদের এখন একমাত্র কর্তব্য আত্মরক্ষা। আপনিও আপনার

চিঠিতে ওই কথা বলেছেন। কিন্তু ওর জন্য যে উপায় আপনি অবলম্বন করতে চান তা আমার মনোমত নয়। দেশের মধ্যে থেকেই দেশকে ভালো করতে হবে, দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে তা হবে না। এর জন্যে তপস্যা চাই, ধৈর্য চাই—"

"ওরকম নপুংসক ধৈর্য আমার নেই। যে দেশে পথেঘাটে দিবালোকে নারীরা অপমানিত হয় আর রাজপুরুষরা চোখ বুজে থাকেন, যে দেশের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করবার ন্যায্য দাবি উপেক্ষিত হয়, সে দেশে আমি থাকতে পারব না। দেশ বলতে আমি শুধু বাংলা দেশই বুঝি না, সমস্ত ভারতবর্ষই আমার দেশ। কিন্তু আজ সে ভারতবর্ষে আমার স্থান কোথাও নেই। বর্তমান শাসনপদ্ধতিতে আজ পাঞ্জাব পাঞ্জাবীর, বিহার বিহারীর, উড়িষ্যা ওড়িয়ার, মহারাষ্ট্র মারাঠীর, বাংলা কিন্তু বাঙালীর নয়, সেখানে সবাই ভিড় করেছে, সবাই সেখানে প্রশ্রয় পাচ্ছে। যে সামান্য ভূখণ্ড আজ বাংলাদেশ বলে চিহ্নিত, সেখানেও আমরা চাকরি পাই না। সর্বভারতীয় উ ারতার প্রকোপ বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশী। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে অপমানের কুশাঙ্কুরে আমাদের চলার পথ ছেয়ে ফেলেছে। আমরা এদেশে থাকতে পারি কুকুরের মতো, হয় রাস্তার ঠোঙা চেটে কিংবা প্রভুর পদলেহন করে। এরকম অনেক কুকুর পথেঘাটে ঘুরছেও দলে দলে। অগ্নিযুগেও এই কুকুরের দল ছিল স্পাই হ'য়ে। এদের সঙ্গে আত্মীয়তা ক'রে আমি থাকতে পারব না।"

"কিন্তু এই অধঃপতিতদের উদ্ধার করবার দায়িত্ব কি তোমার নেই?"

"এ-দেশে থেকে সে দায়িত্ব বহন করবার সামর্থ্য যে আমার নেই। এ-দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে সে সামর্থ্য যদি সংগ্রহ করতে পারি তা হলে নিশ্চয়ই অধঃপতিতদের উদ্ধার করবার চেষ্টা করব। সামর্থ্য মানে, টাকা। টাকা থাকলে এই অমানুষদেরই শিক্ষা দিয়ে, চাকরি দিয়ে, ধর্মবোধ জাগিয়ে আবার হয়তো মানুষ করা যায়। প্রথমেই দরকার খাবার এবং বাসস্থান, তার জন্যে টাকা চাই। কিন্তু সে টাকা এ-দেশে সৎপথে থেকে রোজগার করা যাবে না। বিদেশে নিজের চেষ্টায় যদি কিছু করতে পারি তা হলে দেশকে নিশ্চয়ই ভুলব না। ও-দেশে গুণীর কদর আছে শুনেছি। সেইজন্যে আপনার মত শিক্ষিত লোককে আমাদের দলে নিতে চাইছি।"

"কিন্তু আপনারা এখন যা করছেন আমি তো তার কিছুই করতে পারব না। ইন্‌জিন্‌ড্রাইভার হ'য়ে বে-আইনীভাবে চোরাই মালও আনতে পারব না, আর ডিস্‌টাণ্ট সিগন্যালের নীচে থেকে লুকিয়ে গিয়ে সে মাল পাচারও করতে পারব না। স্বদেশী ডাকাতি করবার যোগ্যতা আমার নেই।

কথাটা শুনে ঝিন্টুকের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল! "আপনি এসব জানলেন কি ক'রে?"

"ডাক্তার মুখার্জির কাছ থেকে। তিনি আপনাদের স্বরূপ চিনতে পেরেছিলেন। আপনার ওই ব্যাগে সেদিন কি ছিল তাও তিনি আন্দাজ করেছেন।"

"আর সে কথা বলেছেন আপনাকে!"

"ঠিক বলেন নি। তিনি রোজ ডায়েরি লেখেন, আর সে ডায়েরি আমি টুকি।

তাতেই লিখেছেন এ কথা, কারও নাম লেখেন নি, কারণ কারও নাম তিনি জানেন না, ঘটনাটা লিখেছেন। কিন্তু আমি সেই ডায়েরি থেকে বুঝতে পেরেছি, যে মেয়েটি ডিস্‌টাণ্ট সিগন্যালের নীচে থেকে ব্যাগটি আনতে গিয়েছিল, সে মেয়েটি কে। ডাক্তার মুখার্জিকে খুন করবার চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভালো যে, গুলিটা তাঁকে ঠিক লাগেনি। অমন একটা ভালো লোক যদি মারা যেতেন তা হলে কি কাণ্ড হ'ত বলুন তো! কথাটা ভাবলে এখনও আমার সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। আমার সবচেয়ে খারাপ লেগেছে আপনার মতো মেয়ে এই জঘন্য ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত আছেন জেনে।"

ঝিনুক স্মিতমুখে চেয়ে রইল হালদারের মুখের দিকে। গণেশ হালদার বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল ঝিনুকের উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন ছুঁচের মতো তাঁর কপালে বিঁধছে।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর ঝিনুক বলল, "একটা অনুরোধ আছে। রাখবেন?"

"কি অনুরোধ, বলুন।"

"আমাকে আর 'আপনি' বলবেন না। 'তুমি' বলুন। তুই বললে আরও সুখী হব। আমরা এক গ্রামেরই ছেলেমেয়ে। আপনার কাছে এটুকু দাবি করবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে। ডাক্তার মুখার্জির ব্যাপারে আমিও খুব দুঃখিত। সেদিন তিনি আমাদের সঙ্গে যে ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন তার তুলনা হয় না, অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন তাঁর ব্যবহারে। সত্যিই মনে হয়েছিল দেব-চরিত্র লোক উনি। কিন্তু সম্প্রতি একটা খটকা লেগেছে—"

"কিসের খটকা?"

"তনিমা সেনের ব্যাপার শোনেন নি কিছু?',

"না। তনিমা সেন কে?"

"মিস্টার সেনের মেয়ে। তাকে আপনি দেখেছেন নিশ্চয় ডাক্তার ঘোষালের বাড়িতে। চোখে পড়বার মতো চেহারা। উগ্র রকম সাজগোজ করে আসত। চোখে কাজল, ঠোঁটে রং, পেটকাটা জামা, ডগমগে রঙের শাড়ি—"

"হ্যাঁ, দেখেছি মনে হচ্ছে। কি হয়েছে তার?"

"সে পালিয়েছে। আর যতদূর খবর পেয়েছি ডাক্তার মুখার্জি তার পলায়নে সাহায্য করেছেন।"

"কি রকম?"

ঝিনুক সব খবরই জানত। ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে তার ঘোরা যাওয়ার খবর সুবেদার খাঁর মুখে শুনেছিল সে। সেখানে সে যে তার সঙ্গে একটা বাড়িতে রাত্রিবাস করেছিল এ খবরও সে সংগ্রহ করেছিল। দুর্গাই সম্ভবত এসে গল্পটা করেছিল পাঁচজনের কাছে। ডাক্তার মুখার্জি তাকে কথাটা গোপন রাখতে বলেন নি, সে কথা মনেও হয়নি তাঁর। সেইটে অতিরঞ্জিত হয়ে পল্লবিত হয়েছিল। ঝিনুক বলল, ডাক্তারবাবু নাকি ফাঁকা মাঠের মাঝখানে তাকে সঙ্গে নিয়ে একটা গাছের অন্ধকারে পাশাপাশি বসেছিলেন

এবং তারপর ফিরে এসে শুয়েছিলেন একটা ঘরে তাকে সঙ্গে নিয়ে। পরদিন সকাল-বেলা তিনি তনিমাকে নিয়ে ফিরে এসেছিলেন বটে, কিন্তু তাকে মিস্টার সেনের বাড়িতে নিয়ে যাননি। নিয়ে গিয়েছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোয়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে তাঁর কি কথা হয়েছিল তা কেউ জানে না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মিস্টার সেনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তনিমা কিছুতেই তার বাবার সঙ্গে ফিরে যেতে চায়নি। সে নাকি বলেছিল তাকে যদি বাবার বাড়িতে জোর ক'রে পাঠানো হয় তাহলে সে আত্মহত্যা করবে (ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্টেনো মিঃ রক্ষিতের দেওয়া খবর এটা)। সে এ-ও বলেছিল যে, সে কলকাতায় একটি বাড়ি ঠিক করেছে, সেই বাড়িতে থেকে সে কোথাও চাকরি করবে। তাকে অনেক বুঝিয়েও কোন ফল হয়নি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অবশেষে দু'জন কনেস্টবল সঙ্গে দিয়ে তাকে নাকি কলকাতাতেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। মিস্টার সেনও তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিলেন, কিন্তু মেয়েকে ফেরাতে পারেননি। তিনি একলা ফিরে এসেছেন। এসে বলেছেন যে, যে বাড়িতে তনিমা উঠেছে সে বাড়িটা নাকি ডাক্তার মুখার্জির। তিনি আস্ফালন ক'রে বেড়াচ্ছেন ডাক্তার মুখার্জির নামে মকদ্দমা করবেন। তনিমাকে তিনিই নাকি নষ্ট করেছেন।

সব বর্ণনা ক'রে ঝিনুক স্মিতমুখে প্রশ্ন করল, "এসব শুনে কি মনে হয় আপনার ?

গণেশ হালদার বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁর সুদূরতম কল্পনাতেও তিনি ডাক্তার মুখার্জিকে তনিমা সেনের সঙ্গে জড়াতে পারলেন না। নির্বাক হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "তুমি যা বলছ তা কি সত্যি ?"

"হলফ করে বলতে পারব না। তবে ওই রকমই শুনেছি, আর যাদের মুখ থেকে শুনেছি তাদের অবিশ্বাস করবার হেতু তো খুঁজে পাই না। আপনি কিছু শোনেন নি ?"

"না, আমি কারও সঙ্গে মিশি না, তাই এসব খবর আমার কানে আসে না। কিন্তু আমি একটা কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, ডাক্তারবাবুর যতটুকু আমি দেখেছি এবং তাঁর ডায়েরি থেকে তাঁর যে পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে বলতে পারি, কোন কারণেই তিনি নিজেকে অবনত করবেন না। করবার সামর্থ্যই বোধ হয় ওঁর নেই। তবে ওঁর পরোপকার করবার বাতিক আছে, আমার মতো নিতান্ত অপরিচিত লোককেও তাই উনি বাড়ির লোক করে রেখেছেন। ওঁর দাইয়ের ছেলেমেয়েরা ওঁর আত্মীয়ের মতো, অসংখ্য গরীব লোকের উনি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন। তনিমা সেনের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ কোনও কারণে যদি ঘটেই থাকে তা হলে এই কথাই আমি ভাবব যে, মেয়েটি বিপন্ন হয়ে তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করেছিল এবং সে সাহায্য তিনি করেছেন। তুমি যেটুকু বললে তার থেকেই এটা বোঝা যায়। তাঁর যদি খারাপ মতলব থাকত তা হলে তাকে নিয়ে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেতেন না। এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট একজন মারাঠী ভদ্রলোক। ডাক্তার মুখার্জিকে খুব খাতির করেন শুনেছি। এ ব্যাপারে কোনও নৈতিক গলদ থাকলে তিনিও তার প্রশ্রয় দিতেন না। তোমার সঙ্গে সেদিন রাত্রে ওই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে তাঁর দেখা হয়েছিল, এজন্য তিনি তোমার

উপর রাগ করেন নি, তোমাকে পুলিসে দেবার চেষ্টাও করেন নি। বরং আমাকে বলেছিলেন মেয়েটিকে আমার ভালো লেগেছে, সুযোগ পেলে ওর সঙ্গে আলাপ করতুম। অদ্ভুত ভালো লোক উনি, আলাপ যদি কখনো হয় দেখবে, ওঁর সম্বন্ধে কোনও খারাপ ধারণা করা শক্ত।"

ঝিনুকের চোখের দৃষ্টি উৎসুক হয়ে উঠল। ওঁর ভদ্র ব্যবহারে আমিও সেদিন শুম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। কি করে ওঁর সঙ্গে আলাপ করা যায় বলুন ত।"

"আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব। তবে বাড়িতে বা ল্যাবরেটরিতে আলাপ করবার সুবিধা হবে না। উনি রোজ বেড়াতে বেরোন, সেই সময় হ'তে পারে। উনি যদি আপত্তি না করেন, তোমাকে খবর দেব।"

গণেশ হালদার উঠে পড়লেন এবং ট্রাঙ্ক খুলে নোটের বাণ্ডিলটা নিয়ে এসে বললেন, "এই নাও তোমার টাকা।"

"থাকনা এখন আপনার কাছে।"

"না, এসব ব্যাপারের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখবার ইচ্ছে নেই। এটা নিয়ে যাও তুমি। আমি গরীব স্কুল-মাস্টার, চোর অপবাদ নেবার সাহস আমার নেই।"

"সাহস আপনার আছে, ইচ্ছা নেই বলুন।"

"না, ইচ্ছাও নেই। এ কথা তো আগেই বলেছি। নাও এটা।"

ঝিনুক নোটের বাণ্ডিলটা নিয়ে কুটিল হাসি হেসে বলল, "আপনি যে মাইনেটা পান সেটাও কি ন্যায়ত আপনার প্রাপ্য? দরিদ্র দেশের রক্ত শোষণ করে গভর্নমেণ্ট যে টাকা সংগ্রহ করছেন আপনি সেই টাকাতেই ভাগ বসিয়েছেন। বসাবার অধিকার আছে কি? গরীব দেশের ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দিয়ে তার জন্য অত মজুরি আপনি নিচ্ছেন কোন যুক্তিতে?"

"আমার বেতন মোটেই বেশী না। যা নিচ্ছি তা না নিলে আমি বাঁচব কি করে?"

"ঠিক ওই যুক্তি দেখিয়ে আপনি তা হলে তৃষিতকে এক গ্লাস জল দিয়ে বা ক্ষুধিতকে এক মুঠো অন্ন দিয়ে তার দাম নেবেন?"

ঝিনুক বুঝতে পারছিল, সে যা বলছে তা যুক্তিহীন, তবু কঠিন কথাগুলো বলে সে যেন তৃপ্তি পেল। তারপর হঠাৎ চুপ করে গেল সে।

নোটের বাণ্ডিলটা নিয়ে ঝিনুক বসে রইল চুপ করে। এতক্ষণ তার চোখ দুটো হাসছিল, কিন্তু ক্রমশ হাসি নিবে এল চোখের। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে এল ক্রমশ। আরও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বলল, "আপনি বিদ্যায় বুদ্ধিতে আমার চেয়ে অনেক বড়। আপনাকে কটু কথা বলবার স্পর্ধা আমার নেই। একটা কথা না ব'লে কিন্তু পারছি না। যদি অনুমতি দেন তা হলে বলি—"

"বল।"

"স্বার্থপর রাজনীতির কুটিল চক্রান্তে আমরা সবাই বিপন্ন। আমাদের বিপদে কেউ

আমাদের সত্যিকার সাহায্য করছে না। আমরা নিজেরাই নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে নিজেদের বাঁচবার পথ সন্ধান করছি। আশা করেছিলাম, আপনি আমাদের সাহায্য করবেন, কিন্তু আমার অনুরোধ আপনি প্রত্যাখ্যান করলেন। আপনার যুক্তি, আমরা বিপথে যাচ্ছি। আমিও সেটা জানি। কিন্তু এ-ও জানি, সুখের দিনে যেটা বিপথ, বিপদে পড়লে অনেক সময় তাই আমাদের রক্ষা করে। গুণ্ডারা যখন আমাদের আক্রমণ করেছিল তখন আমরা রাজপথে চলবার সুযোগ পাইনি, সে পথে চলতে গেলে আমাদের মৃত্যু হত। বিপথে কুপথে চলেই প্রাণ বাঁচাতে হয়েছে আমাদের; দিনে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকেছি, রাত্রে জঙ্গলের ভিতর দিয়েই পথ চলেছি। সুপথ দিয়ে চলবার চেষ্টা করলে আমরা কেউ বাঁচতাম না। এখনও যে আমরা নিরাপদ নই, তার প্রমাণ আসামের হত্যাকাণ্ড। মুসলমানরা জোর করে হিন্দুদের মুসলমান করল, এঁরা জোর করে অহিন্দীভাষীকে হিন্দীভাষী করতে চান। এঁদের মুখের বক্তৃতা অর্থহীন বাগাড়ম্বর মাত্র। কিন্তু তবু আমাদের বাঁচতে হবে, আমাদের আত্মসম্মানকে অক্ষুন্ন রাখতে হবে, পথের শুদ্ধতা নিয়ে খুঁত-খুঁত করলে আমরা মারা যাব। আমার দুঃখ, আপনার মতো বুদ্ধিমান লোকও এই কথাটা বুঝলেন না। অনেক সময় কাপুরুষতা বড় বড় নীতিকথার আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে। হয়তো আপনার সাহসের অভাবই আপনি নীতিকথার বক্তৃতায় ঢাকতে চাইলেন। কারণ যা-ই হোক, আপনার মতো মার্জিতরুচি শিক্ষিত লোককে আমরা কাজে লাগাতে পারলাম না ব'লে দুঃখিত। ডাক্তার ঘোষালের অনেক দোষ আছে। তিনি মাতাল, চরিত্রহীন, কিন্তু আপনার চেয়ে তিনি আমার কাছে ঢের বেশী পূজ্য, কারণ তিনি বিপদের সময় বুক দিয়ে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে আমাদের রক্ষা করেছেন এবং এখনও রক্ষা করতে প্রস্তুত। আপনার মতো নিখুঁত নীতিজ্ঞান তাঁর নেই, কিন্তু তাঁর যা আছে তা-ও এ যুগে দুর্লভ, তাঁর বেপরোয়া বলিষ্ঠ আত্মীয়-বাৎসল্য। তিনি আর যাই করুন, আমাদের বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে গা বাঁচিয়ে নীতির মন্ত্র জপতে জপতে সরে দাঁড়াবেন না। আমি চললুম। যাবার আগে একটা অনুরোধ ক'রে যাচ্ছি, আশা করি সেটা রাখবেন—আমাদের কথা যেন কেউ জানতে না পারে। আমাদের গাঁয়ের ছেলে বিশ্বাসঘাতক অ্যাপ্রুভার হয়েছে এ অপবাদের কালি আমার মুখে মাখিয়ে দেবেন না। আমাদের কথা প্রকাশ পেলে শুধু যে আমাদের বিপদ তা নয়, আপনারও বিপদ আছে। আমাদের দলের লোকেরা নির্মম, বিশ্বাস-ঘাতককে তারা মশা ছারপোকার মত পিষে মেরে ফেলতে ইতস্তত করে না।

ঝিনুক বেরিয়ে চলে গেল। গণেশ হালদার নির্বাক হ'য়ে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর ডায়েরি লিখতে শুরু করলেন।

"ঝিনুক যেন আমার মুখের উপর সপাসপ্ কয়েক ঘা বেত মেরে চলে গেল। তার এ রাগের অর্থ বুঝি, তাই খুব বেশী অপমানিত বোধ করছি না। কিন্তু ও যে পথে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিল সে পথে চলবার সামর্থ্য হয়তো আমার আছে—আমার বুদ্ধি দিয়ে অন্তত ওদের সাহায্য করতে পারতাম—কিন্তু রুচি নেই। ওরা রাগে

অপমানে দুঃখে বেদনায় অন্ধ হয়েছে ব'লে দেখতে পারছে না., যে পথে ওরা চলতে চাইছে সে পথের শেষ কোথায়। আমি কিছুদিন বিদেশ বাস ক'রে এসেছি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের সুষ্ঠু প্রকাশ যে দেশে ভদ্রভাবে ফুটেছে, সেই ইংলণ্ডেই আমি ছিলাম। তারা ভালো, খুব ভালো। তাদের ব্যবহার, আলাপ-আলোচনা, সময়জ্ঞান, কর্তব্যনিষ্ঠা, ভদ্রতা, কোনটাই নিন্দের নয়। দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। কিন্তু সে দেশে যখন ছিলাম তখন একটা উপমা প্রায়ই মনে হ'ত। ওরা যেন ভালো আমের মতো, সুন্দর, সুগন্ধ, মিষ্ট রসে ভরা, কিন্তু ভিতরে আঁটি আছে। কিছুদূর গিয়েই ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বাধা পায়, আর এগোতে চায় না। ওদের বাহ্যিক ব্যবহার-শোভা বাইরেই নিবদ্ধ, প্রথম কিছুদিন ভালো লাগে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে মন ভরে না. যে সীমা পেরুলে আমাদের মন ভরে সে সীমা ওরা কিছুতেই পার হ'তে দেয় না। সে বিষয়ে ওরা অত্যন্ত গোঁড়া। ওদের স্বাজাত্যবোধ অত্যন্ত প্রবল। বাইরের কোন কিছুকেই ওরা অনেকবার না বাজিয়ে আমল দেয় না। এ দেশের অনেক ছেলে ও দেশের অনেক মেয়েকে বিয়ে করেছে জানি, কিন্তু সেই সীমারেখা তারা পার হয়েছে কিনা বলতে পারি না। বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না। বিয়ে করলেও ও দেশে প্রেমের বা একনিষ্ঠতার কোন গ্যারাণ্টি নেই। বিবাহ একটা সামাজিক অনুষ্ঠান, নানা কারণে ওরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ওদের দেশে পছন্দ ক'রে বিবাহ করার প্রথা প্রচলিত। কিন্তু ওদের ডিভোর্স কোর্টে ভিড় দেখে মনে হয়, ওদের পছন্দের মাপকাঠিটা খুবই ঠুন্‌কো। আমাদের দেশের ছেলেদের ওরা বিয়ে করে বা তাদের সঙ্গে প্রণয়-লীলায় মাতে এর থেকে যে সীমারেখার কথা একটু আগে বললাম, তার কোনও খবর পাওয়া যায় না। ওদের বিবাহ বা প্রণয়-লীলা ওদের বাইরের পোশাকের মতোই অনেকটা। বদলাতে দেরি লাগে না। ক্ষণিক মোহে কেনে এবং একটু খুঁত বেরুলেই ফেলে দেয়। আমি যখন ও দেশে ছিলাম তখন দেশের জন্য মন কেমন করত। আমাদের দেশের অনেক দোষ আছে। এখানে হিন্দু-মুসলমানে খুনোখুনি হয়, আমাদের প্রাদেশিকতা আছে, অস্পৃশ্যতার কলঙ্কেও আমাদের ললাট অবলিপ্ত। এ দেশে অনেক অশিক্ষিত, অনেক বেকার, অনেক নিরন্ন। তবু এই দেশের জন্যই প্রাণ কাঁদত ওদেশের সুসজ্জিত পার্কে ব'সে। আধুনিক হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কারণ ইংরেজ। আমাদের বিভিন্ন ধর্ম, সামাজিক নিয়ম এবং সংস্কার সত্ত্বেও ইংরেজ আসবার পূর্বে এ ধরনের দাঙ্গা আমরা করিনি। আগে মুসলমান রাজারা অসহায় হিন্দু প্রজার উপর নৃশংস অত্যাচার করেছে এ কাহিনী পড়েছি, কিন্তু এরকম দাঙ্গা আগে হয় নি। ইংরেজদের দেশেও সাম্প্রদায়িক রেষারেষি ছিল। কিছুদিন পূর্বেও (ভিতরে ভিতরে বোধ হয় এখনও) স্কচ এবং আইরিশদের সঙ্গে ওদের যে সম্পর্ক ছিল তাকে প্রেমের সম্পর্ক বলা যায় না। রাজনৈতিক স্বার্থপরতায় অন্ধ হয়ে ওরাও দাঙ্গা করেছে এরকম নজীর ইতিহাসে আছে। এরকম দাঙ্গা সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু এরকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অপরাধে আমরাই একমাত্র অপরাধী এ কথা সত্য নয়। স্বার্থপর মানুষ সব দেশেই আছে, সব দেশেই তারা স্বার্থের তাড়নায় দাঙ্গা

খুন রাহাজানি ক'রে থাকে। আমরাও করেছি। কিন্তু আমরা করেছি ইংরেজদের প্ররোচনায়, এখনও যে এসব হচ্ছে তার কারণ শক্তিশালী স্বার্থপর লোকদের উস্কানি। পৃথিবীর সর্বত্রই এরকম হচ্ছে। অস্পৃশ্যতা নিয়ে মহাত্মাজী যে আন্দোলন করেছিলেন তার ফলে পৃথিবীর সভ্য সমাজ জেনেছে যে, আমরা উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এত অধঃপতিত যে, হরিজনদের স্পর্শ করতে আমরা ঘৃণা করি। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তথাকথিত হরিজনদের অনেক সময় স্পর্শ করেন না তা ঠিক, কিন্তু তাদের যে তারা ঘৃণা করেন এ কথা ঠিক নয়। আমাদের দেশেই অনেক হরিজনদের সঙ্গে আমাদের প্রেমের সম্পর্ক আছে। আমরা শ্রীচৈতন্যের দেশের লোক, হরিজন হলেই তাকে অস্পৃশ্য ব'লে ঘৃণা করব এতটা নীচ আমরা হ'তে পারি না। তাদের সঙ্গে কাকা দাদা মামা মাসী পিসী সম্পর্ক এখনও আমাদের আছে। কবীর, দাদু, রজ্জব, রবিদাস আজও আমাদের কাছে পূজ্য। মাদ্রাজের কথা আমি বলছি না. প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই, আমি বলছি বাংলা দেশের কথা অস্পৃশ্যকে স্পর্শ না করার যে ঐতিহাসিক কারণ আছে তার কি পুনরাবৃত্তি হচ্ছে না আধুনিক যুগেও? আমরা পুরাতন অস্পৃশ্যকে নিয়ে হুজুগ করছি, কিন্তু এখনও আমাদের দেশে কি নূতন অস্পৃশ্য তৈরি হচ্ছে না? যাঁরা অর্থহীন, যারা বেকার, ক্ষমতাবান রাজনৈতিক নেতারা যাঁদের পৃষ্ঠপোষক নন, বর্তমান যুগে তাঁরা কি নূতন অস্পৃশ্য-গোষ্ঠীতে পড়েন নি? এদের দলের কেউ গিয়ে আমাদের দেশের মহামান্য বড়লোকদের কি স্পর্শ করতে পারে? কোনও বড়লোকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ কি সম্ভব তাদের পক্ষে? আইনত হয়তো বাধা নেই, কিন্তু কার্যত আছে। অনেক পুলিস কর্ডন পার হয়ে, অনেক গুঁতো লাথি খেয়ে, অনেক সেক্রেটারির তোষামোদ করে তবে তাঁদের কাছাকাছি যাওয়ার অনুমতি কচিৎ হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু তা সহজসাধ্য নয়। সব দেশেই এরকম অস্পৃশ্য সৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে আজ সব দেশের বড় বড় নেতারা নিজেদের ঘিরে নানারকম দুর্লঙ্ঘ্য বেড়া তৈরি করেছেন, ঠিক সেই কারণেই একদা উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আত্মরক্ষার জন্যে অস্পৃশ্যতার বেড়া তৈরি করেছিল। মানব-জাতির ইতিহাসে এরকম বেড়া বহুবার নির্মিত হয়েছে। আমাদের দেশে এই অস্পৃশ্যতার বেড়া হয়তো কালক্রমে লোপ পেয়ে যেত, বাংলা দেশে তেমন উগ্রভাবে এটা ছিলও না, কিন্তু এই হরিজন আন্দোলন হওয়াতে হরিজনদের সঙ্গে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল তাতে ক্রমশঃ বিদ্বেষের আমেজ লাগছে। মুসলমানদের মতো হরিজনরাও এখন আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায় হয়েছে, তাদের মনে এই কথাটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের আমরা ঘৃণা করতাম এবং সেই পাপের জন্য আমাদের শাস্তি পেতে হবে। তাই চাকরির ক্ষেত্রে এবং জীবনের অন্যান্য উপার্জনের ক্ষেত্রে হরিজনকে তুলে ধরবার জন্য সরকারের সবল সদয় হস্ত আজ প্রসারিত। উচ্চবর্ণের ভালো ছেলেরা তাই আজ যে চাকরি পায় না, হরিজনদের অতি সাধারণ ছেলেরা সেই চাকরি পায়। এর ফলে হরিজনদের প্রতি আমাদের প্রেম বাড়েনি, বরং যেটুকু প্রেম ছিল তাও লোপ পাবার যোগাড় হয়েছে। ধর্মের পার্থক্য অনুসারে বৃটিশ গভর্নমেন্ট এককালে ইলেকশনের প্রবর্তন করেছিলেন

ব'লে কংগ্রেসের খুব আপত্তি হয়েছিল। হরিজনদের ব্যাপারেও বর্তমান সরকার প্রকারান্তরে তাই করছেন। ভবিষ্যতে এর ফল ভালো হবে বলে মনে হয় না। হরিজন-সমস্যার বা যে কোনও সমস্যার সমাধান পক্ষপাতদুষ্ট অন্যায় পিঠ-চাপড়ানির দ্বারা হবে না। তাতে শুধু তিক্ততা বৃদ্ধি পাবে মাত্র। হরিজনদের উন্নতি হোক এটা সব শুভ-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই চায়, শুধু হরিজন কেন, সমাজের যে কোনও দুর্দশাগ্রস্ত সমাজই উন্নতি করবার ন্যায্য সুযোগ পাক এটা সকলেরই কাম্য, কিন্তু হরিজন বলেই তাকে অপরের মাথার উপর বসিয়ে দিতে হবে, এ নীতির ভবিষ্যৎ ভালো নয়। নিখুঁত ন্যায়ের নীতি অনুসরণ করবেন আশা করেই আমরা শাসক সম্প্রদায়কে শাসনের উচ্চ-সিংহাসনে বসিয়েছি। যেদিন আমাদের ধারণা হবে তাদের নীতি অন্যায়ের নীতি, পক্ষপাতের নীতি, সেইদিনই সে সিংহাসন টলমল ক'রে উঠবে। আমাদের কপালে অস্পৃশ্যতার যে কলঙ্ক লেপে দেওয়া হয়েছে অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে যে, এরকম অস্পৃশ্যতা পৃথিবীর সব দেশেই কোন-না-কোন আকারে বিদ্যমান। ইংলণ্ডে বাস ক'রে আমি বুঝেছি, বাইরে তারা আমাদের সঙ্গে মুখে যত ভদ্রব্যবহারই করুক না কেন, মনে-মনে তারা আমাদের অস্পৃশ্য বলেই মনে করে। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, কিন্তু ওই হল সাধারণ নিয়ম। রবীন্দ্রনাথের মতো লোকের সম্বন্ধেও ওদের সত্য মনোভাব এই কিছুদিন আগেও প্রকাশ পেয়েছে ইয়েট্‌স্‌-এর অপ্রকাশিত পত্রগুলি প্রকাশিত হবার পর। রবীন্দ্রনাথ কেন, আমাদের দেশের আরও অনেক মনীষী সম্বন্ধেও ওদের এই একই মনোভাব। সুতরাং ঘৃণা বা অস্পৃশ্যতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য ও দেশে যাওয়ার কোন মানে হয় না। আমাদের জাতিভেদ নিয়েও ওরা নানারকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। কিন্তু ওদের দেশে কি জাতিভেদ নেই? আমাদের দেশে গুণ এবং কর্মই জাতিভেদের মানদণ্ড ছিল, ওদের দেশে একমাত্র মানদণ্ড টাকা। জাতিভেদ ওঠানো বড় শক্ত। তা রূপ বদলে নানা আকারে নানা বেশে দেখা দেবেই। আমাদের দেশে দেখতে পাচ্ছি সেকালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আর নেই, কিন্তু গুণ আর কর্ম অনুসারে নূতন নূতন জাতি সৃষ্টি হচ্ছে আবার। ডাক্তার, উকিল, রেলের বাবু, পুলিসের কর্মচারী, কেরানী, ব্যবসায়ী, লেখক, সিনেমা-শিল্পী, রাজনীতির কারবারী, থিয়েটারের লোক—এরা এখন প্রত্যেকে আলাদা আলদা জাত। এদের প্রত্যেকের কথাবার্তা, চিন্তাধারা, পোশাক-পরিচ্ছদ নিজস্ব। এদের সঙ্গে অপরের মিল নেই। প্রকৃত ব্রাহ্মণের অভাব ঘটেছে সমাজে, কিন্তু তবু কোথাও যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের আভাস মাত্র দেখা যায়, তা হলে আমরা শ্রদ্ধাভক্তির পসরা নিয়ে ছুটি তাঁর কাছে। বিচার করি না সে ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছে কি না। মহাত্মাজী যে লোকের মনে সাড়া জাগাতে পেরেছিলেন তার প্রধান কারণ এই। সব সমাজেই ভালো মন্দ মানুষ যেমন থাকবে, বিভিন্ন জাতের লোকও তেমনি থাকবে, তাদের বাইরের চেহারাটা বদলাবে কেবল। আর একটু ভেবে দেখলে মনে হয়, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারিভাগেই মনুষ্যজাতি স্বাভাবিকভাবে বিভক্ত। ইতিহাসের নানা পর্যায়ে এদের বাইরের চেহারাটা

বদলেছে বারবার, কিন্তু মূল সত্যটা বরাবর ঠিক আছে। সুতরাং জাতিভেদ আছে ব'লে আমাদের খুব বেশী লজ্জিত হবার কারণ নেই। এইসবের ভয়ে নিজের দেশ ছেড়ে পালানো অর্থহীন। বরং এ দেশে থেকেই আমাদের দোষগুলো সংশোধন করবার চেষ্টা করা উচিত। ঝিন্টুক যে এটা কেন বুঝতে পারছে না, জানি না। আমাদের উপর অবিচার, অত্যাচার অনেক হয়েছে তা সত্য, আমাদের অনেক অভাব আছে তা-ও সত্য, অন্নহীন গৃহহীন বেকার লোকের সংখ্যা এ দেশে অনেক। কিন্তু ও দেশে কি ওদের নেই? ওখানে কি বেকার বিদেশীদের প্রতি সুবিচারই হবে? ও দেশের নিরন্ন অসমর্থ লোক Alms house-এ যে দুর্দশা ভোগ করে, তা পড়েছি। আমাদের দেশের ভিখারীদের অবস্থা তাদের চেয়ে অনেক ভালো। আর কিছু না হোক, তারা অন্তত স্বাধীন। ভিখারীদের ভিক্ষা দেওয়া আমাদের দেশের গৃহস্থেরা এখনও পুণ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। ও দেশের বেকার-সমস্যা আরও নিষ্ঠুর, যদিও ওরা একটা ভাতা পায় শুনেছি। কিন্তু তাতে কেউ সন্তুষ্ট নয়। আকাঁড়া ভিক্ষের চালে কেউ সন্তুষ্ট হয় না। আমাদের সরকার রিফিউজিদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু তাতে কেউ সন্তুষ্ট হয়নি। এখান থেকে পালিয়ে ও দেশে গেলেই যে আমরা সুখে থাকব, এ-আশা দুরাশা। ও দেশে গিয়ে রোজগার করতে না পারলেই মহাবিপদ। ও দেশেও রোজগারের পথ সরল নয়। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, বা বিশেষ বিষয়ে কৃতবিদ্য লোকেরা হয়তো কিছু রোজগার করতে পারেন, কিন্তু সাধারণ লোক ওদেশে গিয়ে কল্কে পাবে বলে মনে হয় না। যদি পেত, তা হলেই কি বিদেশে গিয়ে আমরা আত্মসম্মান অক্ষুন্ন রেখে সুখে থাকতে পারব? যেসব ভারতীয় বিদেশে বাস করছে, তাদের অনেকের মধ্যে স্বাজাত্যবোধের অভাব লক্ষ্য করেছি, যা কিছু ওদেশের, তাই যেন ভালো, এই ধরনের একটা দাস-মনোভাব হয়েছে অনেকের। আগেই বলেছি, ওদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য-বোধও বেশ আছে। ইংলণ্ডের লোকেরা আড়ালে আমাদের সম্বন্ধে যে কথাবর্তা বলে, তা সম্মানজনক নয়। আমেরিকায় তো এই সেইদিনও নিগ্রো-লিনচিং হয়ে গেছে। আমাদের সকলের মন এখন আমেরিকামুখো, কিন্তু সেখানে বাস করে কি আমরা শান্তি পাব? যে ঐতিহ্য, যে সংস্কার, যে সংস্কৃতি আমাদের নিজস্ব এবং যা আমাদের মজ্জাগত, যার অভাবে আমাদের জীবন বিস্বাদ হয়ে যায়, তা ওদেশে নেই। ওদের রুচির সঙ্গে আমাদের রুচি মিলবে না। ওদেশের যে সামাজিক চিত্র ওদের সাহিত্যে প্রতিফলিত দেখি, তা ভয়ঙ্করজনক, তা বীভৎস। সেদিন ওদের দেশের Pulitzer Prize পাওয়া একটা নামী নাটক পড়লাম, বইখানা সিনেমাতেও নাকি হিট্ পিক্চার। পড়ে অবাক্ হয়ে গেলাম। এই কি ওদের সমাজের চিত্র নাকি! ওই নাটকের মিলিয়নেয়ার পাত্র-পাত্রীরা যে ভাষায় কথা বলছে, তা এতই অশ্লীল, এতই কুৎসিত যে, তার জোড়া এ দেশের নিম্নতম স্তরে গিয়ে খুঁজতে হবে। খুঁজলেও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এ দেশের হাড়ি-চামার, বাগদি-মেথর, গাড়োয়ান-কুলিরাও বোধ হয় অত কদর্য ভাষায় কথা কয় না। বাপ মা ছেলে বউ পরস্পর যে

ভাষায় আলাপ করছে, পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে যেসব উক্তি করছে, তার নমুনা আমাদের দেশের নিতান্ত অশিক্ষিত লোকদের মধ্যেও বিরল। বইটা সম্ভবত ওদের দেশের সমাজকে ব্যঙ্গ করেই লিখেছেন লেখক, কিন্তু সে লেখায় সমাজের যে চেহারা ফুটেছে, তা ভয়ঙ্কর। এই সমাজে গিয়ে বিমুকের মতো মেয়ে কি সুখে থাকতে পারবে? আর একটা কথাও মনে হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। আমেরিকার এই প্রভাব আমাদের দেশের সাহিত্যে, সিনেমায় প্রভাব বিস্তার করছে ক্রমশঃ। সেদিন এ দেশের একটা হিট্ পিক্‌চার দেখতে গিয়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত দেখতে পারলাম না। দু একটা হিট্ বইও পড়েছি, ভালো লাগেনি। সাহিত্যের কাজ দেশকে বড় করা, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, সিনেমা এবং সাহিত্যই আজকাল দেশকে নামিয়ে দিচ্ছে, আমাদের মনকে কলুষিত করছে। পশুত্বের ফলাও এবং নিপুণ বর্ণনা করাটাই আজকাল অনেকের কাছে কৃতিত্ব বলে মনে হচ্ছে। এইসব সংস্কার করাই এখন আমাদের প্রধান কাজ হওয়া উচিত। দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলে তা কি হবে? এ নিয়ে আন্দোলন করাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। শুধু এ নিয়ে নয়, আন্দোলন করবার মতো আরও অনেক গুরুতর বিষয় আছে। রাজনৈতিক দাবা খেলার চালে আমাদের দেশকে বিভক্ত করা হয়েছে। ধর্মবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়ার ফলে দ্রৌপদীকেও সভাস্থলে উলঙ্গ করবার চেষ্টা হয়েছিল। চেষ্টা কিন্তু সফল হয়নি। দ্রৌপদী শেষ পর্যন্ত স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আমাদের দেশেও রাজনৈতিক দাবা খেলা শেষ হয়ে যায়নি, এক দানে আমরা হেরেছি, কিন্তু আর এক দানে আমরা জিততে পারি। ভাঙা দেশ আবার জোড়া লেগে যেতে পারে। কংগ্রেসের সেই সনাতন আদর্শকে আমরা ত্যাগ করব কেন? মুসলমান যে আমাদের পর নয়, ভিন্নধর্মী হলেও, তাদের সঙ্গে মতের মিল না থাকলেও, তারা যে আমাদের দেশের লোক, এ কথাটা তারস্বরে প্রকাশ করতে আমরা ছাড়ব না। আমার মা যে গুণ্ডাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছিলেন, যে গুণ্ডাদের অত্যাচারে বুলি আজ নিরুদ্দেশ, যে গুণ্ডাদের দুষ্কৃতির কাহিনী অত্যন্ত রোমাঞ্চকর, তারা যে কতকগুলো মতলববাজ লোকের হস্তচালিত ক্রীড়নক মাত্র, এ কথা আমরা ভুলে যাব কেন? তাদের দুষ্কৃতির বীভৎসতা নিয়ে এখনও যদি আমরা কেবল রোদনই করি, তা হলে তা নিষ্ফল অরণ্যরোদন হবে না? সেই গুণ্ডাগুলো যে একদল পাষণ্ডের হাতের অস্ত্র মাত্র, এ কথা যখন বোঝা গেছে, তখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে সেই পাষণ্ডদেরই দমন করবার জন্য। প্রধান পাষণ্ডের দল এ দেশ থেকে উৎখাত হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের চর-অনুচরেরা এখনও এ দেশের আনাচে-কানাচে, এমন কি, সদরে-অন্দরেও ঘোরাফেরা করছে। আমাদের নিজেদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করাই তাদের কাজ, কারণ আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধলেই তারা কাজ গুছিয়ে নিতে পারবে। এদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করতে হবে। আর তা করতে হবে আইনসঙ্গত উপায়ে। বেআইনী চোরাপথে আমি চলতে চাই না। The end justifies the means, এ নীতিতে আমি বিশ্বাসী নই। গণতন্ত্র আমাদের

দেশে স্থাপিত হয়েছে, গণতন্ত্রসম্মত উপায়েই আমাদের আন্দোলন চালাতে হবে। সুযোগ পেলে আর একবার চেষ্টা করব ঝিনুককে বোঝাতে। ডাক্তার মুখার্জি কি আমার দলে যোগ দিতে চাইবেন? তাঁকে আমার মনের কথা খুলে বলার ইচ্ছে আছে। কিন্তু তাঁর ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হয়, তিনি আমাদের নাগালের বাইরের লোক। এখুনি ঝিনুক তাঁর সম্বন্ধে যে সব কথা বললে, তা অবশ্য অবিশ্বাস্য। এ শহরের অনেক লোকই তাঁর উপরে বিরূপ, কারণ পপুলার হ'তে হ'লে চরিত্রে যে সব খাদ থাকা দরকার, তা তাঁর নেই। তিনি কারো সঙ্গে মেশেন না, কাউকে কেয়ার করেন না, নিজের জগতে তিনি একাই সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করেন, বাস করবার সঙ্গতি তাঁর আছে। এইটেই অনেকের অন্তর্দাহের হেতু; কিছু করতে না পেরে তাঁর নামে মিথ্যা গুজব রটায়। তিনি যদি দাশু খুড়ো বা হরিশ দাদার মতো সবায়ের সঙ্গে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে পরনিন্দা, পরচর্চা এবং তাস-পাশার আড্ডায় যেতে যেতে পারতেন, তা হলে হয়তো তিনি জনপ্রিয় হতেন। ঘোষাল ডাক্তার জনপ্রিয়। তাঁর চারিত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। বরং অনেকে সেগুলো ঢাকতে চেষ্টা করে, সমর্থনও করে কেউ কেউ। ঝিনুকের মতো মেয়েও তাঁর ভক্ত। ডাক্তার মুখার্জি ভিন্ন জাতের লোক। শুনেছি, বড় বড় তপস্বীরা হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে একা-একা থাকেন। মানুষের সঙ্গ তাঁরা পছন্দ করেন না। জনপ্রিয় হবার লোভ নেই তাঁদের। ডাক্তার মুখার্জি অনেকটা সেই জাতের। কিন্তু তিনি হিমালয়ে যাননি, সমাজে বাস করছেন। মানস-সরোবরের রাজহংস কোন্ খেয়ালে জানি না বাস করছেন এসে পাতিহাঁসদের সমাজে। বাস করছেন বটে, কিন্তু মানস-সরোবরবিহারী হংস তাঁর বৈশিষ্ট্য বর্জন করতে পারেননি। এই বিসদৃশতার জন্য কেউ বিস্মিত হয়নি, সবাই চটে গেছে। মানস-সরোবরের কোন রাজহংস সত্যি-সত্যি যদি পাতিহাঁসদের মধ্যে এসে বাস করত, তা হলে তারা নিশ্চয় তাকে ঠুকরে ঠুকরে অস্থির করে দিত। আমাদের সমাজের পাতিহাঁসরাও ডাক্তারবাবুকে ঠোকরাবার চেষ্টা অহরহ করছে, কিন্তু আশ্চর্য কৌশলে তিনি তাদের নাগালের বাইরে সরে থাকছেন নির্বিকার ঔদাসীন্যের ডানা মেলে। তনিমা সেনের ওই ব্যাপারটায় পাতিহাঁসের দল প্যাঁক প্যাঁক করবার অনেক খোরাক পাবে। কিন্তু ডাক্তারবাবু যে এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছেন না, তার প্রমাণ তো আজকে সকালেই পেলাম। তিনি দুর্গাকে দিয়ে বাড়ির কাছে বড় বড় গাছে নানা সাইজের বাক্স হাঁড়ি টাঙাচ্ছিলেন! আমি বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা কি হচ্ছে। জিজ্ঞেস করাতে হেসে বললেন, "পাখিদের জন্যে বাসা টাঙিয়ে দিচ্ছি, যদি কেউ কোনটাতে দয়া করে ডিম পাড়ে। প্রায়ই পাড়ে না। মানুষকে ওরা সন্দেহের চোখে দেখে, হয়তো মনে করে ওগুলো ফাঁদ, তাই এড়িয়ে চলে। তবু আমি প্রতি বছর চেষ্টা করি যদি দৈবাৎ কেউ আমাকে বন্ধু বলে চিনে ফেলে।" তাঁকে দেখে বা তাঁর কথা শুনে মনে হ'ল না যে, তনিমা বা তনিমা সংক্রান্ত ব্যাপার তাঁর মনে ছায়াপাত করেছে। মাঝে মাঝে ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর কথা আমার মনে হয়। এরকম প্রচ্ছন্ন নিঃশব্দ অস্তিত্ব যে সম্ভব, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস

করতুম না। এতদিন এখানে আছি, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনিনি একদিনও। তিনি যে আছেন, তার প্রমাণ পাই শঙ্খধ্বনি শুনে। তারপরই পুজোর প্রসাদ দিয়ে যায় বিজয়। ডাক্তারবাবু এত জায়গায় মোটরে করে ঘোরেন, কিন্তু তাঁকে তাঁর সঙ্গে যেতে একদিনও দেখিনি। অন্তঃপুরের সীমার বাইরে তিনি পা দেন না। অন্তঃপুরেও নাকি বেশী ঘোরাফেরা করেন না। দাই বলছিল, অধিকাংশ সময়ই পুজোর ঘরে কপাট বন্ধ করে বসে থাকেন। সংসারের সমস্ত ভার ওই বুড়ী দাইয়ের উপর। তবে রান্নাঘরে যান রোজ, রোজই কিছু রান্না করেন। ডাক্তারবাবুর খাওয়ার সময় কাছে বসেন, আমার খাবার স্বহস্তে গুছিয়ে দেন। খাবারের মধ্যে দিয়ে তাঁর স্নেহস্পর্শ প্রতিদিন পাই। ওই নেপথ্যবাসিনীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর সম্বন্ধে আরও খবর জানতে কৌতূহল হয়। ডাক্তারবাবুর মতো লোকের কি প্রকৃত সহধর্মিণী হতে পেরেছেন তিনি? যে লোকে ডাক্তারবাবুর বসবাস, সেখানে কি প্রবেশ করতে পেরেছেন? তনিমার ঘটনাটা কি তাঁর কানে পৌঁছেছে? এই সব নানা কথা জানতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে তাঁর সঙ্গে যে অদৃশ্য স্নেহসূত্রে ক্রমশঃ বাঁধা পড়ছি, সেটাকে আরও স্পষ্ট করতে। আশ্চর্য মানুষের মন, আমার রক্তের সম্পর্ক যাদের সঙ্গে, যারা আমার নিতান্ত আপন, তারা কোথায় চলে গেল, তাদের বিয়োগ-ব্যথাটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে ক্রমশঃ। ঘটনাচক্রে কোথায় এসে পড়েছি, যারা নিতান্তই অচেনা ছিল, তারাই ক্রমশঃ চেনা হচ্ছে। শুধু চেনা নয়, প্রতিদিনের পরিচয়ে তাদের আবিষ্কার করছি নূতনরূপে। যে ডাক্তারবাবুকে প্রথমে কত খারাপ লেগেছিল, কত দাম্ভিক মনে হয়েছিল, ক্রমশঃ তাঁর স্বরূপ যা দেখছি, তাতে মুগ্ধ হয়ে গেছি। তনিমার ব্যাপারটা কি, জানতে হবে। ডাক্তারবাবুকেই জিজ্ঞেস করব একদিন সাহস করে। ঝিনুক যে পথে পা বাড়াতে যাচ্ছে, সে পথ থেকে তাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করতে হবে। কেন জানি না, ঝিনুকের সম্বন্ধেও আমার কৌতূহল ক্রমশঃ বাড়ছে। মেয়েটার একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। ও যে খারাপ, এ কথা মন কিছুতেই মানতে চায় না। ওর প্রতি আমার এই ঔৎসুক্য কি শুধু ও আমার গ্রামের মেয়ে বলেই? শুধু এই জন্যই কি ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি? কিছুদিন না গেলে এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না।"

টাওয়ার ক্লকে দুটো বাজল। হালদার মশাই ডায়েরি লেখা বন্ধ করলেন।

॥ ১৬ ॥

কাউকে পুলিসের কবল থেকে রক্ষা করতে বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল ডাক্তার ঘোষালের। কাউ যে তার মাকে খুন করে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল এবং শেষে যে কোনও কারণেই হোক নিজে তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল (পুলিসের ধারণা ধস্তাধস্তি করতে গিয়েই পড়ে গিয়েছিল সে) এ সত্যটা পুলিসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নি। তার মায়ের গলায় যে দাগটা ছিল তার থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছিল যে টুঁটি টিপে তাকে

মারা হয়েছে। কিন্তু ডাক্তার ঘোষাল করিতকর্মা লোক, কোথায় কোথায় কি কি তদ্বির করলে কার্যসিদ্ধি হয় তা তাঁর নখদর্পণে, সুতরাং শেষ পর্যন্ত তিনি কাউকে বাঁচাতে পেরেছিলেন। কিন্তু বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। টাকা খরচ হয়েছিল বলে কিন্তু তাঁর ক্ষোভ হয় নি—টাকার প্রতি প্রগাঢ় মমত্ব-বোধ তাঁর কোনদিনই নেই—তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন প্যাঁচে পড়ে' টাকাটা খরচ করতে হয়েছিল বলে', অর্থাৎ দাবা-খেলায় হেরে গিয়েছিলেন বলে'। কাউ আর কাউয়ের মায়ের সমস্যা তিনি নিজের মতো করেই সমাধান করতেন, প্রায় করেই ফেলেছিলেন, কিন্তু ঝিনুক মাঝখান থেকেই বাহাদুরি করে নিজের গয়নাগুলো কাউয়ের মাকে দিয়ে দেওয়াতেই এই ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হল। আরও মুশকিল ঝিনুক এমন একটা কাণ্ড করতে লাগল যেন দোষটা ষোল আনা তাঁরই এবং ঝিনুক যা করছে সেইটেই সে দোষ-স্খালনের একমাত্র উপায়। খরচ তো যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু ঝিনুক তাতেও সন্তুষ্ট নয়। বলছে, কাউয়ের নামে কিছু টাকা পোস্টাফিসে জমা করে দিতে হবে। ঝিনুক মনে করছে এসব করে সে খুব একটা বাহাদুরি করছে। কিন্তু ওই সব ছোকরা হাতে টাকা পেলে যে কি মূর্তি ধরবে তা তার ধারণা আছে কি? ঝিনুকের এই ঘর-জ্বালানে পর-ভুলানে মনোবৃত্তিতে দিক হয়ে উঠেছেন ডাক্তার ঘোষাল। তাছাড়া আর একটা থাপ্পোড়ও খেয়েছেন তিনি তনিমার ব্যাপারে। তনিমা তাঁকে কলা দেখিয়ে পাঁচটি হাজার টাকা বাগিয়ে নিয়ে কলকাতায় চলে গেছে। তা যাক্, ওরকম অনেক মেয়েমানুষ তিনি পার করেছেন, সে জন্ত তাঁর কোন দুঃখ নেই, কিন্তু বিপদে ফেলেছে ঝিনুক। সুঠাম মুকুজ্যের নামের সঙ্গে তনিমার নাম জড়িয়ে নানারকম গুজব রটছে শহরে। মিস্টার সেন নাকি শাসিয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি ডাক্তারবাবুর নামে কেস করবেন। ঝিনুক বলছে, যদি কেস করেন তাহলে আসল কথাটা ডাক্তার ঘোষালকে কোর্টে গিয়ে বলতে হবে। বলতে হবে তিনি জানেন তনিমা সেন ভ্রষ্টা মেয়ে, দরকার হলে তাঁর সঙ্গে তনিমার যে দৈহিক সম্পর্ক ঘটেছিল সেটাও আদালতে প্রকাশ করতে হবে। এর কোনও মানে হয়? এতে মিস্টার সেনের কেস হয়তো ফেঁসে যাবে, ডাক্তার মুকুজ্যের সুনামও হয়তো রক্ষা পাবে, কিন্তু নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা-ভঙ্গ করা কি হাস্যকর নয়? তা ছাড়া মিস্টার সেনকে চটিয়ে তাঁর ক্ষতি বই লাভ নেই। মিস্টার সেনের সাহায্যে তিনি এখানে অনেক রকম সুবিধা পেয়েছেন, তাঁর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করাটা কি উচিত হবে? উচিত যে হবে না তা তিনি মনে মনে বুঝছেন, তিনি জীবনে যে নীতি এতকাল অনুসরণ করে এসেছেন সে নীতি অনুসারে গর্হিত কাজ হবে এটা। অধর্ম হবে। শয়তানদেরও একটা নীতি-শাস্ত্র থাকে, সে শাস্ত্রেরও মেরুদণ্ড ইমান, এই ইমানের জোরেই তাদের সংহতি টিকে থাকে। সে ইমান বিসর্জন দেওয়ার অর্থ সমস্ত দলটাকেই বিপদের মুখে এগিয়ে দেওয়া। শয়তানদের বিচারে বেইমানের শাস্তি মৃত্যু। মৃত্যু-ভয় ঘোষালের নেই, অনেক আসন্ন মৃত্যুর হাত এড়িয়েছেন তিনি, এ বিশ্বাস তাঁর আছে, মৃত্যু যেদিন আসবে সেদিন কেউ তা ঠেকাতে পারবে না। আগে থাকতে সে ভয়ে ভীত হবার কোন অর্থ খুঁজে পান

না তিনি। আসল কথা তাঁর বিবেকে বাধছিল। যে মিস্টার সেন তাঁর এবং তাঁর সুপারিশে অনেক রেফিউজিদের উপকার করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে পাপ হবে, বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। এই কথাটাই বারবার মনে হচ্ছিল তাঁর। ঝিনুক কিন্তু কিছুতেই কথাটা বুঝতে চাইছে না। তার স্বভাবের মধ্যে এমন একটা একগুঁয়েমি আছে যা অনড়, ডাক্তার ঘোষালের মতে, পশুদের মধ্যে যা কেবল খচ্চরদের মধ্যেই দেখা যায়।

কাল রাত্রেই ঝিনুক তাঁকে বলেছে, তোমার পাপের বোঝা ডাক্তার মুখার্জির ঘাড়ে তুলে দেবে তুমি, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। তুমি যদি নিজে না বল, আমি গিয়ে প্রকাশ করে দেব কথাটা আদালতে সবার সামনে।

এ বিপদ তিনি নিজেই ডেকে এনেছেন। ঝিনুকের কাছে তিনি কিছু লুকোতে পারেন না, এমন কি নিজের দুষ্কৃতির কথাও না। তনিমা সেনকে কি করে তিনি মোরব্বার মতো গ্রাস করেছিলেন তার সালঙ্কার সরস বর্ণনা নিজেই তিনি করেছেন ঝিনুকের কাছে। এখন মুশকিল হয়েছে। অথচ ঝিনুকের বিরুদ্ধে তিনি কিছু করতে পারছেন না। তাকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছেন, চুলের ঝুঁটি ধরে ভূশায়ী করেছেন, কোনও ফল হয় নি। ঝিনুকও তাঁকে মারের পাল্টা জবাব দিয়েছে। তার ঘুষির জোর যে কতখানি তা তিনি অনুভব করেছেন তাঁর ঘাড়ের ব্যথা থেকে। ঝিনুককে যে কিছুতেই নোয়ানো যাবে না এটা তিনি নিঃসংশয়ে বুঝেছেন। ঝিনুক নিজে চোরাই-মাল-পাচারে একজন সহকারিণী। এজন্য তার মনে কোনও গ্লানি নেই, এজন্য তার বিবেক তাকে দংশন করে না, কারণ সে ওই চোরাই টাকার সঙ্গে একটা আদর্শ জড়িয়ে আছে। অনেকে খড়্গের সঙ্গে ধর্ম জড়িয়ে পাঁঠা খাওয়ার লোভটাকে মহনীয় করে তোলে যেমন, অনেকটা তেমনি। একথা ভেবেই কিন্তু ঘোষালের মনে হয়েছিল উপমাটা ঠিক হল না, ও চোরাই টাকার এক আধলাও নিজের জন্য খরচ করে না। টাকাগুলো কোথায় রেখেছে তা-ও বলে না কাউকে। ঝিনুকের সংসার চলে তাঁর টাকায় আর শামুকের টাকায়। ঝিনুকের ঘরটার ভাড়াও তিনি দেন। ঝিনুক যে টাকাটা চোরাবাজার থেকে রোজগার করে তা দিয়ে শেষ পর্যন্ত ও কি করবে, ওর আদর্শ কি, এসব নিয়ে কোনও আলোচনাই সে করতে চায় না ঘোষালের সঙ্গে। বলে, পরে বলব। রাগে ঘোষালের সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। কিন্তু কিছু করবার উপায় নেই। ঝিনুক তাঁর জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সে তাঁর সংসারে নেই, একথা তিনি ভাবতেও পারেন না এখন। তাঁকে দূর করে দেবার সামর্থ অনেক আগেই তিনি হারিয়েছেন। বরং এই ভয় মাঝে মাঝে তাঁর হয়েছে—মেয়েটা ওই মিনমিনে মাস্টারটার সঙ্গে জুটল না তো। কিন্তু ঝিনুক যে ঠিক ও জাতের মেয়ে নয় এ প্রত্যয়ও তাঁর আছে। মহামুশকিলে পড়েছেন তিনি ওকে নিয়ে। ইতিপূর্বে যেসব মেয়েমানুষ নিয়ে তিনি থেকেছেন, তাদের সঙ্গে সোজাসুজি স্ত্রীর মতোই থেকেছেন, পছন্দ না হলে দূর করে দিয়েছেন, কিন্তু এর সঙ্গে অন্য চালে চলতে হচ্ছে। ঝিনুক তাঁকে বিয়ে করতে চায় না, স্ত্রীর মতো তাকে ব্যবহারও করা যায় না, কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আর কিছুতেই এগোচ্ছে

পারেন না ঘোষাল। ঝিন্থুকের কঠিন ব্যক্তিত্বের দেওয়াল উত্তুঙ্গ, তা অনতিক্রম্য মনে হয় তাঁর কাছে।

এইরকম যখন তাঁর মনের অবস্থা তখন গণেশ একদিন রবিবারে এলেন তাঁর বাসায়। গণেশ হালদার এসেছিলেন দুটো উদ্দেশ্যে। প্রথম, ডাক্তার মুকুজ্যের সম্বন্ধে গুজব কতদূর ছড়িয়েছে এবং সে সবের কোনও সত্যি ভিত্তি আছে কিনা তা জানবার জন্য। ডাক্তার মুখার্জি সম্বন্ধে আর একটা গুজবও সম্প্রতি তিনি শুনেছেন এবং শুনে খুব বেদনাবোধ করেছেন। ডাক্তার মুখার্জির স্ত্রী নাকি তাঁর স্ত্রী নন, ওঁকে নাকি তিনি কোথা থেকে 'ভাগিয়ে' এনেছেন এবং সেইজন্যই নাকি ভদ্রমহিলা বাড়ির বার হন না। এসব খবর ডাক্তার মুখার্জির কানে সম্ভবত পৌঁছয় না, কারণ এসব গুজব যে জাতীয় লোকেরা ছড়ায় তাদের সঙ্গে তিনি কোনও যোগাযোগ রক্ষা করতে চান না। বাইরের লোকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় তাঁর ল্যাবরেটরিতে এবং যারা সেখানে আসে তারা প্রায়ই অবাঙালী। তিনি এবিষয়ে নির্বিকার হলেও গণেশ হালদার নির্বিকার থাকতে পারছেন না। তাঁর মন ক্রমাগতই বলছে, এ অন্যায় হচ্ছে, ঘোরতর অন্যায়, এর প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু কোথায় কার কাছে কিভাবে প্রতিবাদ করবেন? ঝিন্থুকের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করে বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন তিনি। তারপর ঝিন্থুকের দেখাও আর তিনি পান নি। তাঁর আসার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—ঝিন্থুকের দেখা যদি পান।

গণেশ হালদারকে দেখে নকল উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ঘোষাল।

"হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। এ কি সৌভাগ্য, What a piece of good luck! পথ ভুলে না কি!"

গণেশ হালদার এখানে আসার একটা ওজুহাত মনে মনে ঠিক করেই এসেছিলেন।

"শুনছি কাউয়ের মা নাকি কুয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। তার জন্যে আপনাকে নাকি খুব বেগ পেতে হয়েছিল?"

"হুঁ, ওই আমার ললাটলিপি। Thats how I have been treated all along—চিরকালই ওই হয়েছে। আমি চরিত্রবান শুকদেব নই, I suffer from the hunger of the flesh এবং সে ক্ষুধা মেটাবার সুযোগ পেলে আমি ছাড়ি না। কিন্তু তার জন্যে ন্যায্য এবং অনেক সময় অন্যায্য মূল্য আমি দিয়েছি। I have cheated বা deprived none, কিন্তু তবু আমাকে দাগা দিতে কেউ ছাড়ে নি। সিংকিং সিংকিং ওয়াটার ড্রিংকিং যারা করে, আমি সে জাতের লোক নই। তাই আমাকে বেশী ভুগতে হচ্ছে। ওই আপনার সুঠাম ডাক্তার পরিচ্ছন্ন হাঁসটির মতো দিব্যি ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছেন। লোকে ভাবে উনি মহাপুরুষ, কিন্তু ওঁর নামে যা-সব শুনছি তাতো ভয়ানক!"

"কি শুনছেন?"

"ন্যাকা সাজছেন কেন মশাই। আপনি কি শোনেন নি কিছু? শহরে ঢি ঢি

পড়ে গেছে, মিস্টার সেন মামলা করবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন, আপনার কানে এ-সব যায় নি ?"

"কিছু কিছু গেছে বই কি। কিন্তু যা শুনেছি,তা বিশ্বাস করতে পারছি না। ডাক্তার মুখার্জির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়েছি বলেই বিশ্বাস করতে পারছি না, মনে হচ্ছে ওসব গুজব মিথ্যা। আপনার কাছে এসেইছি সেইজন্যে। এ-সব গুজবের কোনও ভিত্তি আছে কি সত্যি ?"

"আছে বই কি। আপনিই বলুন না, উনি যা করেছেন বিনা স্বার্থে কেউ কি তা করে ?"

"উনি কি করেছেন তাও তো আমি ঠিক জানি না !"

"উনি তনিমাকে নিয়ে রাত্রে ঘোঘার মাঠে কাটিয়েছেন, তারপর ওকে নিয়ে একটা নির্জন বাড়িতেও নাকি ছিলেন। তারপর তাকে সঙ্গে করে এনে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সাহায্যে পুলিস প্রোটেক্‌শন দিয়ে কলকাতায় পাঠিয়েছেন। যে বাড়িতে তনিমা উঠেছে সেখানে, সেটাও নাকি ওঁর বাড়ি। এত কাণ্ড উনি বে-ফয়দা করে' যাচ্ছেন ? A tiger stalking a deer for nothing ?"

"আমি কিন্তু ওঁর সম্বন্ধে দু-একটা ঘটনা জানি তার থেকে মনে হয় 'ফর নাথিং' উনি অনেক কাজ করেন। এমন সব কাজ করেন, যার অর্থ আমাদের মতো লোকে খুঁজে পায় না। উনি মাঠের বুনো জংলী গাছকে সার দিয়ে সতেজ করবার চেষ্টা করেন, পাখির বাসা থেকে পাখির ছানা পড়ে গেলে সেগুলো শুধু তুলেই দেন না, যাতে তারা নিরাপদে থাকতে পারে. সেজন্য বাজার থেকে খাঁচা কিনে সেটা গাছে টাঙিয়ে দেন। এ-রকম অনেক বাজে কাজ করে আনন্দ পান উনি—"

"তাই না কি ! Is it so ?"

ডাক্তার ঘোষাল দাঁড়িয়ে উঠলেন, চোখ দুটো বিস্ফারিত করে' চেয়ে রইলেন হালদারের দিকে। তারপর আবার বসে পড়লেন হঠাৎ।

"বুনো গাছ আর জংলি পাখির দিকে ঝোঁক আছে নাকি লোকটার ? That's something, শুনে লোকটার উপর শ্রদ্ধা বাড়ল একটু। আমারও ছেলেবেলায় ওই সব বাতিক ছিল। ছেলেবেলায় একবার গাছে চড়ে ধনেশ পাখির বাসায় হাত ঢোকাতে গিয়ে বিরাট এক ঠোক্কর খেয়েছিলাম। হাতে এখনও দাগ আছে, এই দেখুন। অভ্যাসটা এখনও ঠিক ছাড়তে পারি নি। আজকাল মানুষ-ধনেশ-পাখির বাসায় হাত ঢুকিয়ে ঠোক্কর খাচ্ছি।"

ডাক্তার ঘোষাল হলদে দাঁত বার করে' তাঁর সেই আকর্ণ-বিস্তৃত হাসিটি হাসলেন। বললেন, "মাথায় ছিট্‌ থাকলেও লোকটা ডাক্তার হিসাবে পণ্ডিত। আমি গত ছ মাস ধরে একটা লোকের ডিসপেপ্‌সিয়ার চিকিৎসা করছিলাম নানারকম ওষুধ বদলে বদলে। He is a milch cow, বেশ শাঁসালো লোক, বেশ দু'পয়সা হাতাচ্ছিলাম তার কাছ থেকে রোজ। একদিন সে হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে গেল। তিনি ওর পেটে হাত দিয়ে

টিপেটুপে বললেন, মনে হচ্ছে ক্যানসার হয়েছে, X'-Ray করান। X'-Ray করিয়ে দেখা গেল উনি যা বলেছেন তা ঠিক। ওঁর কাছেই চিকিৎসা করাতে গিয়েছিল সে। উনি সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছেন—ও রোগ ভালো করবার বিদ্যে আমার নেই। That's somthing, মন দিয়ে প্র্যাকটিস করলে ওঁর প্রচণ্ড প্র্যাকটিস হ'ত। কিন্তু তা না করে উনি বনে-জঙ্গলে, মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ান। Very funny and very strange: কেন বলুন তো?"

ডাক্তার ঘোষাল একটু ঝুঁকে ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইলেন সামনের দিকে, যেন দুর্নিরীক্ষ্য একটা কিছু দেখছেন।

তারপর বললেন, "ঠিক বুঝতে পারছি না। I may be wrong, হয়তো ভদ্রলোকের সম্বন্ধে ভুল ধারণাই করে বসে' আছি। কিন্তু ভুল শুধরে নিতে আমি সর্বদাই তৈরী—I am always ready for correction—আচ্ছা উনি সমস্ত দিন করেন কি?"

"সমস্ত দিনের খবর জানি না। সকাল বেলা উনি নিজের পোষা জন্তু-জানোয়ারদের নিয়ে খেলা করেন। নিজের বাগানটিতে ঘোরাফেরা করেন। প্রত্যেকটি গোলাপ গাছের কাছেই অনেকক্ষণ থাকেন, দূর থেকে মনে হয় তাদের সঙ্গে যেন আলাপ করছেন। ওঁর চাকর দুর্গা বলছিল গোলাপের কুঁড়িগুলো ফুল হয়ে ফুটতে কত সময় নেয় তার একটা হিসাবও নাকি রাখছেন উনি নিজের নোটবুকে। মাকড়শা, পোকা, প্রজাপতি এদের সম্বন্ধে ওঁর কৌতূহলের অন্ত নেই। আজকাল উনি মেতে আছেন ওঁর গাই মঙ্গলাকে নিয়ে। শিগ্‌গিরই তার বাচ্ছা হবে। তাছাড়া পাখিদের বাসা বাঁধবার জন্যে বাক্স, হাঁড়ি, নারিকেলের মালা, বিস্কুটের টিন টাঙিয়ে বেড়াচ্ছেন চারিদিকে—"

"লোকটা উন্মাদ নাকি!"—বলে উঠলেন ডাক্তার ঘোষাল—"Is he mad? এ লোকের তো পাগলা গারদের বাইরে থাকা উচিত নয়। হোয়াট! সত্যিই এসব করেন?"

"এসব তো করেনই, মাঠে-ঘাঠে জঙ্গলে গিয়ে যে কি করেন তা ঠিক জানি না। ওঁর ড্রাইভার বেচুও জানে না। কারণ তাকেও দূরে বসে থাকতে হয়। তবে আমি আভাস পাই কিছু-কিছু।"

"ফলো' করেন নাকি?"

"না। উনি মাঠে-ঘাটে বসেই রোজ কিছু লেখেন। সেইগুলো আমি টুকি।"

"কি লেখেন? ডায়েরি?"

ঘোষাল উত্তোরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলেন।

"না, ঠিক ডায়েরি নয়। নানা ধরনের কথা থাকে তাতে, অনেক রকম এলোমেলো চিন্তা। সামান্য সামান্য বিষয়, পড়তে কিন্তু বেশ লাগে।"

"অদ্ভুত ক্ষ্যাপাল্ দেখছি। Truth is stranger than fiction। ওঁর বিয়ে হয়েছে?"

"হাঁ।"

"কিন্তু ওঁর স্ত্রীকে তো বাইরে কেউ কখনও দেখেনি। আজকালকার স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে এটা কি ভাবা যায়? স্ত্রীটি কাল্পনিক নয় তো, I mean, fictitious নয়তো?"

না, না। তবে মনে হয় সেকেলে ধরনের। বাড়ির বাইরে যেতে চান না। আমি ওঁর বাড়িতে খাই, রোজ রান্না করে পাঠান উনি। শুনেছি ঠাকুরঘরেই বেশীর ভাগ সময় কাটান, পর্দাটা বেশী মানেন।"

"ছেলেপিলে নেই?"

"না।"

"পরিবারে তার কে আছে? কেবল স্বাবা আর দেবী?"

"পরিবার মস্ত। দাই চাকরদের ছেলেমেয়েরা ওঁর বাড়িতে থাকে। দাইয়ের নাতি বিজয় ওঁর বাড়ীর একজন প্রধান লোক। তাছাড়া গরু, কুকুর, মুর্গী, গিনিপিগ, ভেড়া এরাও পরিবারের পরিজন। আমি আছি। তাছাড়া দু'তিনটি ভিখারীও ওঁর বাড়িতে প্রায় রোজই খেয়ে যায়।"

ডাক্তার ঘোষাল ভ্রূকুঞ্চিত করে নাকের বড় বড় লোমগুলো টানতে লাগলেন। তাঁর চোখ দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর ভিতরে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব তখনও চলছে।

"আর একটা কথা" - গণেশ হালদার বললেন—ঝিনুক কিছুদিন আগে রাত্রে ডিস্ট্যাণ্ট সিগনালের কাছ থেকে যে ব্যাগটা তুলে এনেছিল তা উনি জানেন। কাছেই টিলাটার উপরে বসে' নক্ষত্র দেখছিলেন। ঝিনুকের ব্যাপার সব স্বচক্ষে দেখেছেন। ঝিনুকের একজন সহকর্মী ওঁর দিকে গুলিও চালিয়েছিল, কিন্তু উনি কাউকে কিছু বলেন নি। আমি এটা জেনেছি ওঁর লেখা থেকে। উনি অনায়াসে পুলিসে খবর দিতে পারতেন, কিন্তু কিচ্ছু করেন নি। এর থেকেই বুঝতে পারবেন লোকটি কি চরিত্রের। মনে হয় ঝিনুককে দেখে ওঁর ভালও লেগেছে—"

হঠাৎ ডাক্তার ঘোষাল গর্জন করে উঠলেন, Let Jhinuk alone। ঝিনুককে নিয়ে আপনারা দেখছি সবাই বড্ড বেশী মাথা ঘামাচ্ছেন। You need not।"

বাঘের দৃষ্টির মত হিংস্র হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টি।

"আমরা মাথা ঘামাতে যাব কেন! কি আশ্চর্য!

"ইউ নিড্ নট্।"

অন্য দিকে চেয়ে পা দুটো দোলাতে লাগলেন ডাক্তার ঘোষাল।

এরপর গণেশ হালদারের উঠে আসা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি উঠতে পারলেন না। তিনি এটা বুঝতে পারছিলেন যে সুঠামবাবুর স্বপক্ষে যতটা বলবার তিনি তা বলেছেন, আর কিছু বলবারও নেই, ডাক্তার ঘোষালকে এসব বলে কোনও লাভ আছে কিনা তা-ও অনিশ্চিত, তবু তিনি উঠতে পারছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল তাঁর কাজ এখনও বাকি আছে কিছু। ঝিনুকের সঙ্গে দেখা হয়নি। ঝিনুক কোথায় তা এখন ডাক্তার ঘোষালকে জিজ্ঞাসা করবার সাহসও হচ্ছিল না তাঁর। তবু তিনি বসে রইলেন। আশা

করছিলেন ঝিনুক হয়তো অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়বে। কিন্তু এল না। কাউ এল বাড়ির পিছন দিক থেকে। তার হাতে শানিত একটা খড়্গা। সে কারও দিকে না চেয়ে ভিতরের দিকে চলে গেল।

"কাউয়ের হাতে অত বড় খাঁড়া কেন ?"

"গড্ নোজ (God knows), শুনেছি কোথায় নাকি কালীপুজোর আয়োজন করছে ঝিনুক। পাঁচ ছ'দিন থেকে ওই খাঁড়াটা শানাচ্ছে কাউ, শুনছি ওই নাকি পাঁঠাটা কাটবে। নিজের মাকে খুন করে' এখন কালী মার পুজো হচ্ছে। Damned rascal !"

গণেশ হালদার খবরটা শোনেননি। চমকে উঠলেন।

"ওর মাকে ওই খুন করেছে ? বলেন কি ! শুনলাম কুয়ায় পড়ে—"

"ওসব আই ওয়াশ (eye wash), আসল খবরটা আপনি শোনেন নি বুঝি। তাহলে আর বলব না। ঝিনুক শুনলে তেড়ে আসবে আমাকে। আমার ধারণা ছিল এখবর আপনি অন্তত শুনেছেন। আপনার না শোনবার ক্ষমতা দেখছি অদ্ভুত। I wonder how you manage to keep your ears shut ! কানে তুলো গুঁজে থাকেন নাকি !"

না, তা থাকি না"—হেসে জবাব দিলেন হালদার মশাই—"মিশি না তো কারো সঙ্গে, তাই শুনিনি। খবরটা শুনে আশ্চর্য হলাম।"

ডাক্তার ঘোষাল এদিক-ওদিক চেয়ে চুপি চুপি বললেন, "এই হচ্ছে ফ্যাক্ট। নিজের মায়ের টুঁটি টিপে মেরে তাকে ও কুয়োয় ফেলে দিয়েছিল। ওকে বাঁচাবার জন্যে ঝিনুকও ওকে কুয়োয় ঠেলে ফেলে দেয়। That was a brilliant brain wave she had, তা না হলে ওকে বাঁচানো যেত না। দেখবেন, ঝিনুক যেন জানতে না পারে যে কথাটা আপনি আমার কাছে শুনেছেন। পুলিসে নিয়ে গেলেই আপদ চুকে যেত, কিন্তু ঝিনুক thinks otherwise : তার মতে পিতা হিসেবে ওর প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে। সুতরাং হু হু করে আমার অনেকখানি রুধির বেরিয়ে গেল। I had to bleed through my nose"—তারপর গর্জন করে উঠলেন—"কিন্তু সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে, বেশী জোরে টানলে লোহার শিকলও ছিঁড়ে যায়. ঝিনুক এটা বুঝতে পারছে না।"

"ঝিনুক হয়তো শিকলটা ছিঁড়তেই চায়"—বললেন হালদার।

"তার মানে ? What do you mean by this ? এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কোনও কথা হয়েছে নাকি ! দেখুন মশাই, একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি, ঝিনুককে আমার বিরুদ্ধে নাচাবেন না। ও মেয়ে নানারকম আজগুবি হুজুকে নাচবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছে, আপনি যদি মাদল ঘাড়ে নিয়ে ধিতাং ধিতাং করে' এগিয়ে আসেন তাহলে তো সামলানো যাবে না। And it will have serious consequences—আমার ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে গেলে আমি কি যে করব তা আমি

নিজেই জানি না। রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যেতে পারে। আমাকে ক্ষেপাবেন না প্লীজ, ক্ষেপে গেলে I become a ferocious brute, সাবধান করে দিলুম। আপনাদের মতো মাস্টারদের হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নেই, না বুঝে 'ইনোসেন্টলি' অনেক 'মিসচিফ্' করে বসেন আপনারা। I warn you।'

গণেশ হালদারের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল।

বললেন, "আমি আপনার বিরুদ্ধে ঝিন্টুককে কিছু বলিনি। ওসব প্রবৃত্তি আমার নেই। কিছু বলিনি, বলবও না। তবে আপনাকেও অনুরোধ করছি, আমাকে ভয় দেখাবেন না, আপনার মতো আমিও বাঙাল। রেগে গেলে আমারও জ্ঞান থাকে না। আমি আপনার মতো খিস্তিতে পারদর্শী নই, কিন্তু 'বক্সিং'-এ আমার কিঞ্চিৎ পারদর্শিতা আছে—"

ডাক্তার ঘোষাল তাঁর বলিষ্ঠ ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন 'শেকহ্যাণ্ড' করবার জন্যে, আর বাঁ হাতটা তুলে বললেন, "বাস্ করো রামদাস!"

গণেশ হালদার শেকহ্যাণ্ড করলেন না, গুম হয়ে বসে রইলেন।

ঘোষাল কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন।

বললেন, "Come, shake hands, হাতে হাত মেলান।"

গণেশ হালদারের পক্ষে গাম্ভীর্য বজায় রাখা শক্ত হল। হেসে তিনি শেকহ্যাণ্ড করলেন। তারপর বললেন, "আপনার ওই 'বাস্ করো রামদাস' কথাটার মানে তো বুঝলাম না।"

আকর্ণ-বিস্তৃত হাসিটি হাসলেন ঘোষাল। হাসিমুখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "এর উত্তর দিতে হলে ছেলেবেলায় ফিরে যেতে হয়। ছেলেবেলায় আমার বাতিক ছিল টাইমটেবল পড়া আর স্টেশনে গিয়ে ট্রেন attend করা। এমন কি গভীর রাত্রেও যেসব ট্রেন আসত, তাও attend করে যেতাম। অদ্ভুত ভালো লাগত। একদল অচেনা লোক হু হু করে আসছে, আবার হু হু করে চলে যাচ্ছে। বেশ লাগত। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, অথচ যেন বাইরে নয়। এই থেকেই পরে দেশভ্রমণ করবার নেশা চাপে আমার। রাত দুটোয় একদিন স্টেশনে গেছি। দিল্লি থেকে একটা গাড়ি আসছে। কুলিরা সারি সারি শুয়ে ঘুমুচ্ছে প্ল্যাটফর্মে। এমন সময় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান একটা গার্ড এল খট্‌খট্ করে'। সাদা-সুট-পরা, পায়ে কুচকুচে কালো বুট, ইয়া পাকানো কুচকুচে কালো গোঁফ। ঘুমন্ত একটা কুলিকে লক্ষ্য করে বললে—রামদাস উঠ যাও, ট্রেন আতা হয়। রামদাস তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সাড়া পর্যন্ত দিলে না। তাগড়া জোয়ান অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সাহেব তখন এগিয়ে গিয়ে তার পেটে মারল এক লাথি। তড়াক করে উঠে পড়ল রামদাস এবং সঙ্গে সঙ্গে যা করল তাতে অবাক হয়ে গেলাম। ঠাস্ ঠাস্ করে চড়াতে লাগল সাহেবটাকে। তিনটে প্রচণ্ড চড় খাওয়ার পর সাহেব হাত তুলে বলে উঠল,—বাস্ করো রামদাস। উই আর কুইটস্। আপনার মেজাজ গরম হওয়াতে সেই কথাগুলো মনে পড়ে গেল। রাগ করবেন না, I am also a very

helpless man, আর দয়া করে এমন কিছু করবেন না যাতে ঝিনুক আমার উপর বিগড়ে যায়। I am a sinking man and she is a buoy। হ্যাঁ জীবন-সমুদ্রে ওই আমার ভেলা এখন। ওর জোরেই ভেসে আছি। ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না আপনারা, অবশ্য যদি নিতে চেষ্টা করেন আমি ছাড়ব না, শেষ পর্যন্ত লড়ব, I shall fight tooth and nail to the last, কিন্তু তা সত্ত্বেও ও বেহাত হয়ে যেতে পারে এ-ও জানি। তাই আপনাদের অনুরোধ করছি—"

গণেশ হালদারের হাত দুটো জাপটে ধরলেন ঘোষাল।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গণেশ হালদার বললেন, "কেড়ে নেবার কথা কেন মনে হচ্ছে আপনার ? আমার মনে তো ওরকম কোনও কল্পনাও জাগেনি কোনদিন। এসব কথা আপনার মনে জাগছে কেন ?"

"কারণ আমি নীচ, because I am a mean fellow. আমি নিজে অনেকের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছি, তাই মনে হয় সবাই আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে উদ্যত। পৃথিবীতে ভদ্রলোক আছে শুনেছি, কিন্তু তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারি নি। হয়তো দু-একজন আমার কাছে আসতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমি তাদের বিশ্বাস করি নি, সন্দেহের বল্লম উঁচিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। আমার বিশ্বাস ভদ্রলোক কেউ নেই, সবাই স্বার্থপর পশু। আপনাদের কথা ঠিক জানি না, কারণ আপনাদের পুরো পরিচয় এখনও পাই নি। তবে আপনার মুখে যা শুনল্যম তাতে সুঠাম ডাক্তারকে ভালো লেগেছে—don't know—শেষে কি দাঁড়াবে, ধোপে টিকবে কি না।"

"ঝিনুককেও কি আপনি স্বার্থপর পশু মনে করেন ?"

"আমি লোলুপ পুরুষ আর ঝিনুক রূপসী যুবতী। ওর সম্বন্ধে আমার opinion কি কখনও correct হতে পারে ? আমি রঙীন চশমা পরেছি যে। ওর ভদ্রতা, ওর শুচিতা, ওর আত্মসম্মান রক্ষা করবার চেষ্টা—আমার চোখে সবই ছলনা। তবে এটা বুঝেছি ওর জাত একটু আলাদা। ওকে সহজে পোষ মানানো যাবে না, she is a tough nut to crake—আপনাদের কাছে শুধু অনুরোধ আপনারা এর মধ্যে এসে পড়বেন না, please keep the arena (এরিনা) clear for us—"

"আমার একটা কথা আজ মনে পড়ছে। আপনার সঙ্গে প্রথম যখন দেখা হয়েছিল আপনি বলেছিলেন, ঝিনুক আমার রক্ষিতা।"

"ঠিকই বলেছিলাম, আমার ভুল হয় নি, ওকে রেখেছি তাই রক্ষিতা। ভক্ষিতা তো বলি নি।"

ডাক্তার ঘোষাল পুনরায় হলদে দাঁত বার করে হাসলেন।

ঝিনুক কোথায় এই কথাটা জিজ্ঞাসা করবার আবার ইচ্ছা হল হালদারের। কিন্তু সঙ্কোচ হল, কথাটা মনে এলেও মুখে আনতে পারলেন না তিনি।

বললেন, "আজ তা হলে উঠি এবার। ডাক্তারবাবুর নামে নানারকম কুৎসিত গুজব

শুনে আপনার কাছে ব্যাপারটা জানতে এসেছিলাম। শুনে খুব খারাপ লাগছিল। আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে মনটা হালকা হল।"

"কার কাছ থেকে শুনেছিলেন আপনি ?"

ঝিনুকের কাছ থেকে শুনেছিলেন এ কথাটা বলতে পারলেন না গণেশ হালদার। কিন্তু ঝিনুকের বদলে কার নাম করবেন তা-ও মাথায় এল না। অস্পষ্টতার আশ্রয় নিলেন।

"এমনি নানাজনের মুখে। আচ্ছা, চলি, নমস্কার।"

"ঝিনুকের খবর না নিয়েই চলে যাচ্ছেন বড়।"

একটা দুষ্টুমিভরা হাসি ফুটে উঠল ঘোষালের চোখে।

"হ্যাঁ, ঝিনুককে দেখছি না তো। কোথা গেল সে ?"

"Guess—? আন্দাজ করুন।"

"কালীপুজোর ব্যাপারে কোথাও গেছে নাকি ?"

"আরে না, না। কালীপুজোতে মেতেছে কাউ। ঝিনুক ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে কালীপুজো করলে ওর মাতৃহত্যার পাপ ধুয়ে যাবে। অদ্ভুত এক ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছে ওর মাথায়, she has pumped a funny idea into his silly head—ও চাকরি-বাকরি ছেড়ে এখন ওই নিয়েই মেতে আছে। Needless to say, সব খরচ আমার। ঝিনুক চলে গেছে কলকাতা।"

"কলকাতায় ? কেন ?"

"Don't know, আমাকে যা বলে গেছে তা cock and bull story, বিশ্বাস হয় না।

"কি বলে গেছে ?"

"ওদের গাঁয়ের শাপলাকে নাকি অস্ট্রেলিয়ায় পাঠাবে। মোহিনী আর ছবিকে নাকি আগেই কোথায় পাঠিয়েছে। সব উদ্ভট গল্প, মশাই। আমার মনে হয় আসলে এসব কিছু নয়। ও গেছে তনিমার সঙ্গে দেখা করতে। ওর 'রাইভাল' ছিল তো। তার নাড়িটা পরীক্ষা করতে গেছে। She has gone to feel her pulse! ঝানু মেয়ে তো!

কাউ আবার প্রবেশ করল। তখনও তার হাতে খাঁড়াটা রয়েছে। ডাক্তার ঘোষালের দিকে চেয়ে বলল, "আপনি এবার স্নান করে নিন। রান্না হয়ে গেছে। আমি এটা কামারের ওখানে দিয়ে এখুনি আসছি। এটাতে এখনও ভালো ধার হয় নি।"

"আমাকে আগে হুইস্কির বোতল আর গ্লাস দিয়ে যাও। কাল থেকে এক ফোঁটা পেটে পড়ে নি। দুটো কলেরা রোগী নিয়ে সমস্ত দিন নাস্তানাবুদ হয়েছি। একটা পটলও তুলেছে। রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখি আলমারির চাবিটি নিয়ে তুমি গায়েব হয়েছ।"

"আলমারির চাবি আমার কাছে নেই। মাসীমা নিয়ে গেছেন।"

"দোকান থেকে এক বোতল মদ কিনে নিয়ে এস তা হলে।"

"আমি পারব না। মাসীমা মদ কিনতে বারণ করে গেছেন।"

"হো—য়াট্?"

গর্জন করে' উঠলেন ডাক্তার ঘোষাল।

কোন জবাব না দিয়ে কাউ বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার ঘোষাল হালদারের দিকে চেয়ে বললেন, ওর স্পর্ধাটা দেখুন একবার, look at his cheek—ঝিনুকের আশকারা পেয়ে ও ধরাকে সরা জ্ঞান করছে—a rat posing as a lion—damn it—"

পরমুহূর্তেই লাফিয়ে উঠে পড়লেন তিনি আবৃত্তি করতে করতে—"বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি।" ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন দ্রুতপদে। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দ হল। একটু পরেই ঘোষাল ফিরে এলেন হুইস্কির বোতল ও গ্লাস হাতে সহাস্য মুখে।

"আলমারির কাঁচগুলো ভেঙে ফেললুম। ঝিনুক পরে এসে সারাবে।"

তার পর গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে গান ধরলেন, তাঁরই নিজের তৈরী গান—

বনের হরিণ পালিয়ে গেল বনে
চিতাবাঘের মনের কোণে কোণে
তারই কথা জাগছে ক্ষণে ক্ষণে।

গণেশ হালদার সত্যিই এবার উঠে পড়লেন।

"আমি তা হলে চলি।"

"আপনি এ রসে যখন বঞ্চিত তখন আপনাকে আর বসতে বলি কি করে? আসুন।"

॥ ১৭ ॥

সন্ধ্যার ঠিক পরেই মনুমেণ্টের কাছাকাছি অপেক্ষাকৃত নির্জন একটা জায়গায় সুবেদার খাঁ দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেখছিলেন মোটরের সারি। চোখের সামনে কয়েক কোটি টাকা ছুটোছুটি করছে! তাঁর মনে হচ্ছিল এ টাকাগুলো হাতে পেলে কত গরীব-দুঃখীরই না উপকার করা যেত। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে নজরও রাখছিলেন। ঝিনুকের এখানে আসবার কথা আছে। আজই আবার তাঁকে ফিরতে হবে। ছুটির দিনটাতে তিনি এসেছিলেন শাপলার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। শাপলা আজ অস্ট্রেলিয়া চলে গেল। ক্যাপটেন সাহেব ওকে জাহাজের পরিচারিকা হিসাবে বহাল করে নিজের দায়িত্বে নিয়ে গেলেন। পরে ওর একটা ব্যবস্থাও করে দেবেন বলেছেন। সুবেদার খাঁ শাপলাকে নগদ টাকাও দিয়েছেন কিছু, যাতে ও-দেশে গিয়ে চাকরি পাওয়ার আগে

ভদ্রভাবে থাকতে পারে কিছুদিন। শাপলার সেই কসাই স্বামীটা বখেড়া করেছিল একটু। টাকা দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করতে হয়েছে। ছেলেপিলে হয় নি এইটেই ভগবানের দয়া। কিন্তু ওর চোখমুখের চেহারা দেখে সুবেদার খাঁর সন্দেহ হচ্ছিল বোধ হয় ওর রক্ত দূষিত হয়েছে। হাতের তেলোয় যেসব কালো কালো দাগ ছিল সেগুলো সন্দেহজনক। চোখের দৃষ্টিতে একটা অভব্যতার ছাপও পড়েছে। ক্যাপটেন সাহেব বিচক্ষণ লোক, তিনিও এসব লক্ষ্য করেছেন। হেসে বললেন, এইসব পচা মাল ও-দেশে পাচার করলে কি দেশের সুনাম বাড়বে খাঁ সাহেব ? ভেবে দেখ ভাল করে। সুবেদার খাঁ উত্তর দিয়েছিলেন, এরা পচা মাল নয়। এ দেশের বিষাক্ত হাওয়ায় ওই রকম হয়ে গেছে। বিদেশে গিয়ে দেখুক, যদি সামলাতে পারে। সুবেদার খাঁ এ কথা নিঃসংশয়ে বলতে পেরেছিলেন শাপলাকে দেখে, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। ভদ্রভাবে বাঁচবার জন্য, বিশুদ্ধ হাওয়ায় নিশ্বাস নেবার জন্য সে যেন ছটফট করছিল। একটা নরককুণ্ডে পড়ে দু হাত তুলে সে যেন দাঁড়িয়ে ছিল কে দয়া করে তাকে উদ্ধার করবে। এ কাজে ঝিনুককে সাহায্য করতে পেরে সুবেদার খাঁ কৃতার্থ হয়েছেন। ঝিনুক জানে না এর জন্য প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন তিনি, কিছু ধারও হয়েছে, মাইনে থেকে প্রতি মাসে সে ধার শোধ করতে হচ্ছে। ঝিনুককে এ কথা তিনি বলেন নি। বললে ঝিনুক আর একটি পয়সা নিতে চাইবে না। ঝিনুকের আদর্শ আছে, কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধি কম। কত ধানে কত চাল হয় তা সে ঠিক জানে না। এসব ব্যাপারে প্রতি পদে যে কত টাকা খরচ করতে হয় তা তার ধারণা নেই। জাহাজের খালাসীরা ও অন্যান্য কর্মচারীরা জেনেছে যে ক্যাপটেন সাহেব তাঁর পেয়ারের মেয়েমানুষকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। তারা যাতে বিশ্বাসঘাতকতা না করে সে জন্য তাদেরও নানাভাবে তোয়াজ করতে হয়েছে। তাদের একটা বড় হোটেলে ভাল করে খাওয়াতে হয়েছে, এক কেস মদ কিনে দিতে হয়েছে। চোরাই কারবারে রোজই মোটা টাকা পাওয়া যায় না। সুযোগ আসে না সব সময়ে। আয় অনিশ্চিত, খরচ কিন্তু অনিবার্য। ঝিনুক হয়তো এসব বোঝে না। ঝিনুককে তিনি এসব বোঝাতেও চান না। ঝিনুককে দেখে, তার চরিত্রের অমননীয়তার পরিচয় পেয়ে, বিশেষ করে দেশের লোকের জন্য তার সর্বস্ব পণের পরিচয় পেয়ে, তার সাহস, চরিত্র আর বুদ্ধির অপূর্ব সমন্বয় প্রত্যক্ষ করে সুবেদার খাঁ মুগ্ধ। তিনিও ঝিনুকের জন্য সর্বস্ব পণ করতে প্রস্তুত, সর্বস্ব পণ করেওছেন। কিন্তু তিনি জানেন ঝিনুক তাঁর নাগালের বাইরে বরাবর থাকবে।

আবার তিনি এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। ঝিনুক এখনও আসছে না কেন ? তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, ধীরে ধীরে পদচারণ করতে লাগলেন। এখানে এক জায়গায় বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে লোকের, বিশেষ করে পুলিসের, নজর পড়তে পারে। এমনিতেই তাঁর মতো লম্বা লোক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

একটু পরেই একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। ঝিনুকই নামল মনে হল তার থেকে। ঝিনুকের সঙ্গে আর একটি রঙীন শাড়ি-পরা মেয়েও নামল যেন মনে হল সুবেদার

খাঁর। ঝিনুক তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইতে লাগল। তারপর মেয়েটি চলে গেল আর একটি ট্যাক্সি ডেকে।

ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন সুবেদার খাঁ। এত দূর থেকে ঠিক চিনতে পারলেন না মেয়েটিকে। ঝিনুককে চিনেছিলেন তার চওড়া লাল ডোরা-কাটা শাড়ি আর মাথার লম্বা বিনুনি দেখে। সুবেদার খাঁ ফিরে গেলেন মনুমেণ্টের কাছে। সেইখানেই ঝিনুকের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ছিল। ঝিনুক দ্রুতপদেই মনুমেণ্টের দিকে এগিয়ে এল।

"আপনাকে অনেকক্ষণ দাঁড করিয়ে রেখেছি, না? আমার একটু দেরি হয়ে গেল।"

"সঙ্গে ও মেয়েটি কে ছিল?"

"তনিমা। ওর ঠিকানাটা বার করতেই দেরি হল।"

"তনিমা? মিস্টার সেনের মেয়ে?"

কঠিন হয়ে উঠল সুবেদার খাঁর মুখভাব। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তার পর বললেন, "খবর পেয়েছি, মেয়েটি খারাপ। ওর কাছে গিয়েছিলে কেন?"

"কতদূর খারাপ তাই জানবার জন্য।"

"একটা কথা মনে রেখো। খারাপ সংসর্গ থেকে দূরে থাকাই ভালো। রাস্তায় কত কাদা হয়েছে তা দেখতে গেলে অনেক সময় পা পিছলে নিজেরই কাদা মাখামাখি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।"

"তা জেনেই গিয়েছিলাম।"

ঝিনুকের চোখে মুখে হাসি ঝিকমিক করে উঠল।

বলল, "একটা কথা আপনি ভুলে যান খাঁ সাহেব। এ দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কৃপায় অল্পবিস্তর কাদা আমাদের সবার গায়েই লেগেছে। আমরা পঙ্কিল পথে পা বাড়াতে চাই নি, আমাদের ধাক্কা মেরে সেখানে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, তা কি আপনি জানেন না? কাদা এখন আমাদের সকলের গায়ে। ওই আমাদের অঙ্গের ভূষণ এখন।"

ঝিনুকের প্রদীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধক্‌ধক্ করে উঠল।

"তনিমার কাছে গিয়েছিলে কেন?"

"একটা গোপন খবর জানতে"

"কি গোপন খবর?"

"সেটা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি না-ই শুনলেন"

"বেশ"

গম্ভীর হয়ে গেলেন সুবেদার খাঁ। তারপর তাঁর চোখের দৃষ্টিতে এক ঝিলিক হাসি ফুটে উঠল। বললেন, "তবে তোমাকে একটা খবর দিই। এই কলকাতা শহরে আমাদের তিনজন 'স্পাই' ওর গতিবিধির খবর রাখছে। একজন ওকে বরাবর নজরে রাখবে, ও যদি ভারতবর্ষের বাইরেও চলে যায়, সেও যাবে। একটু বেচাল হলেই ওর প্রাণসংশয়—"

"বেচাল মানে? ও তো বেচালেই চলে চিরকাল—"

"ও আমাদের দলের কথা সম্ভবত জানে। সেটা প্রকাশ করবার চেষ্টা করলেই ও বিপদে পড়বে। ও নিজে জাহান্নামে যাক তাতে আমাদের আপত্তি নেই।"

সুবেদার খাঁর কণ্ঠের দৃঢ়তায় ঝিনুকের বুকটা কেঁপে উঠল। তার পিছনেও 'স্পাই' আছে নাকি? দলের কথা সে-ও বলেছে গণেশ হালদারকে। কথাটা যদি প্রকাশ পায় তা হলে সুবেদার খাঁ তাকেও কি শাস্তি দেবেন? তবে তার বিশ্বাস আছে গণেশ হালদার কখনও তা প্রকাশ করবেন না।

খানিকক্ষণ নীরবতার পর সুবেদার খাঁ বললেন, "প্রত্যাশা করেছিলাম তুমি আজ জাহাজঘাটে যাবে। শাপলা বারবার তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিল।"

"আমি ইচ্ছে করেই যাই নি। আপনিই তো সব করেছেন, আমি গিয়ে আর কি করতাম। মোহিনী আর ছবির বেলাতেও দূরে সরে ছিলাম। আমার বড় কষ্ট হয়, কি যে কষ্ট হয় তা আপনি বুঝবেন না। ওরা আমারই গ্রামের ছেলেমেয়ে, কি সুখের সংসার ছিল ওদের, কোন্ অচেনা দেশে যে ওদের পাঠিয়ে দিচ্ছি, কি ওদের ভবিষ্যৎ, সবই অনিশ্চিত। মাঝে মাঝে ভয় হয়, হয়তো ভুল করছি। কিন্তু যখনই আমাদের অত্যাচারের কথা ভাবি তখনই মনে হয়—না, এ দেশে আর থাকব না। শাপলা কি খুব কাঁদছিল?"

"না, হাসছিল। তাকে দেখলে তুমি চিনতে পারতে না। গাউন পরে মেমসাহেব সেজে এসেছিল। চমৎকার দেখাচ্ছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন আর ডাক্তারবাবু তাকে নার্স হিসেবে বহাল করেছে আপাতত। যিনি পাসপোর্ট পরীক্ষা করেন তাঁকে বেশ মোটা টাকা খাওয়াতে হয়েছে—"

"আপনার টাকা ফুরিয়ে গেলে বলবেন, আমার কাছে কিছু টাকা আছে। আর কোথাও টাকার সন্ধান মিলল?"

কথাটা বলেই ঝিনুকের আত্মসম্মানে যেন আঘাত লাগল। এই সত্যটা তার কাছে সহসা যেন প্রতিভাত হল, নিজের জীবন এবং মানসম্ভ্রম বিপন্ন করে সুবেদার খাঁ যা করছেন আপাতদৃষ্টিতে তার সঙ্গে ওঁর নিজের স্বার্থ জড়িত নেই। মোহিনী, ছবি শাপলা ওঁর কেউ নয়, উনি যা করছেন তার জন্যেই করছেন। কেন করছেন এ কথা ঝিনুক অনেকবার জানতে চেয়েছে, উত্তরে উনি যা বলেন তা বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হয় না, কারণ এ যুগে একেবারে নিঃস্বার্থপর লোক আছে এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। কোন যুগেই ছিল কিনা সন্দেহ। বিষধর গোক্ষুর দেখতে দেখতে ফুলের মালা হয়ে গেল এ ধরনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা রঙ্গমঞ্চেই দেখা যায়। কিন্তু তবু এ পর্যন্ত সুবেদার খাঁর আচরণে কোনও খুঁত সে দেখতে পায় নি। তার নিজের আচরণেই খুঁত বেরিয়ে পড়ল। এতদিন সে মুখ ফুটে টাকার কথা সুবেদার খাঁকে বলে নি। কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়াতে মনে মনে একটু লজ্জিত হল সে।

সুবেদার খাঁ বললেন, "এখান থেকে হংকংয়ে কিছু জুয়েলারি পাঠিয়েছিলাম, দশ

হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে সেখানে। সেখান থেকে একটা চেক এসেছে আমার কাছে। ক্রস্‌ড্‌ চেক। চেকের উপর কারও নাম নেই। ওরা লিখেছে সুবিধা মতো কারও নাম বসিয়ে দেবেন। আমার তো কোন ব্যাংক্‌ অ্যাকাউণ্ট নেই। আমাদের দলের কারও নাম দিয়ে ব্যাংকে জমা করাও বিপজ্জনক। বড়বাজারে একটি লোকের সন্ধান পেয়েছি, তাঁর হংকংয়ে ব্যবসা আছে। আজ তাঁর কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছেন তাঁকে যদি আমরা এক হাজার টাকা বাটা দিই তা হলে তিনি চেকটা নিয়ে বাকি ন' হাজার টাকা আমাদের নগদ দিয়ে দেবেন। যিনি চেকে সই করেছেন তাঁর সঙ্গে এ ভদ্রলোকের টাকা লেন-দেন হয়, সুতরাং তাঁর চেক নিতে অসুবিধা হবে না এঁর। তবে এসব ব্যাপারে একটু 'রিস্‌ক্‌' থাকেই, তাই এক হাজার টাকা চাইছেন।"

"আপনি কি করে এ লোকের সন্ধান পেলেন ?"

"যিনি চেক পাঠিয়েছেন তিনিই ঠিকানা দিয়েছিলেন। আমিই যেতুম, কিন্তু আমাকে ঘণ্টা দুই পরে ডিউটিতে জয়েন করতে হবে। তাঁর কাছে যাওয়ার সময় নেই। তুমি কি তাঁকে চেকটা দিয়ে ন' হাজার টাকা নিয়ে নিতে পারবে ? আমি তাঁকে খবর দিয়েছি, আমি না এলে আর কেউ আসতে পারে।"

"যাকে পাঠিয়েছিলেন তার মারফতই ভাঙিয়ে নিলেন না কেন ?"

"তার হাতেই দিতে বলেছিলুম। কিন্তু তখন অত নগদ টাকা তাঁর কাছে ছিল না। আজ আনিয়ে রাখবেন বলেছেন। আজ যাকে পাঠিয়েছিলাম সেও চলে গেল। রাত্ত দশটা পর্যন্ত ভদ্রলোকের দোকান খোলা থাকবে। তুমি ফিরবে কবে ? আজই সেখানে যাওয়া দরকার। এখন সাড়ে আটটা বেজেছে।"

"আমার কাল ফেরবার কথা। হয়তো দু-একদিন দেরি হতে পারে। আচ্ছা, আমি না গিয়ে যদি তনিমাকে পাঠাই ক্ষতি কি ? অচেনা লোকের কাছে যেতে আমার কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন সুবেদার খাঁ।

"আমাদের দলের কারও যাওয়া অবশ্য নিরাপদও নয়। তাই আমি নিজে যাই নি লোক পাঠিয়েছিলাম। তোমারও না যাওয়াই ভালো। এসব ব্যাপারে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ যত কম হয় ততই নিরাপদ। কিন্তু তনিমা মেয়েটি তো ভালো নয়। একজন অচেনা লোক অত টাকা তোমাকে দিচ্ছে এর কি ব্যাখ্যা দেবে তাকে ?"

"ধরুন যদি বানিয়েই বলি কিছু"

"তোমার নিজের দায়িত্বে যদি করতে পার কর। আমার আর আপত্তি কি। তনিমাকে আমার চেয়ে তুমি ভালো চেন। তবে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে নিস্তার পাবে না, ওর পিছনে লোক আছে।"

ঝিনুক চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর জিজ্ঞেস করল, "জুয়েলারি কোথায় পেয়েছিলেন ?"

"এখানেই কিছুদিন আগে এক বড় লোকের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল। তারই

অংশ আমাদের দলের একটা লোক কিনেছিল জলের দামে। মাত্র পাঁচ শ' টাকায়। যারা বিক্রি করেছিল তারা বুঝতে পারেনি যে ওগুলো অত দামী। তা ছাড়া এসব চোরাই মাল তাড়াতাড়ি বিক্রি করে তো, যাচাই করবার সময় পায় না। তাই তারা অত দরদস্তুর করে নি।"

"আপনি জড়িয়ে পড়বেন না তো—"

"যে লোকটা কিনেছিল সে যদি ধরা পড়ে আর আমার নাম বলে দেয় তা হলে জড়িয়ে পড়া অসম্ভব নয়। এসব ব্যাপারে একটু বিপদ সর্বদাই থাকে।"

তারপর হেসে বললেন, "আজ তোমার হঠাৎ এ কথা মনে হচ্ছে কেন? নাও, চেকটা রাখ।"

"আপনি নিঃস্বার্থভাবে বারবার এইসব ঝুঁকি নিজের মাথায় নিচ্ছেন এতে আমার বড় সঙ্কোচ হয়। মনে হয় আপনার ভালো-মানুষির উপর আমরা অকারণ জুলুম করছি। আপনি কেন যে এসব করছেন, কেন এভাবে নিজেকে আমাদের সঙ্গে জড়িয়েছেন তা কিছুতেই মাথায় আসে না আমার।"

সুবেদার খাঁ মৃদু হাসলেন।

তারপর বললেন. "যদি বলি প্রায়শ্চিত্ত করছি। আমাদের জাত তোমাদের উপর যে পাশবিক অত্যাচার করেছে, তার ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া পরে আসবে, আপাতত আমি আমার জাতের হয়ে যতটা পারি প্রায়শ্চিত্ত করে নিচ্ছি, নিজের বিবেককে গ্লানিমুক্ত করবার জন্য। আমি মোটেই নিঃস্বার্থপর নই। আত্মসম্মান বজায় রাখবার তাড়নায় যা করছি সেটাও স্বার্থপরতা।"

"কিন্তু আপনি তো কোনও পাপ করেন নি।"

"যে শাপলাকে আজ বিদেশে চালান করে দিলাম সে কি কোনও পাপ করেছিল? পাপের পঙ্কে আমরা সবাই ডুবছি। কবিগুরুর ভাষায়—এ আমার, এ তোমার পাপ। তুমিই তো একটু আগে বললে অল্পবিস্তর কাদা আমাদের সকলের গায়েই লেগেছে। আমি যতটা পারি সেই কাদা ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা করছি। হিট্‌লারের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ সমস্ত জার্মান জাতি করছে। একজনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বহু লোককে করতে হয়, এটা ঐতিহাসিক সত্য। এবার কিন্তু যেতে হয়, আমার সময় হয়ে এল, আমি চলি। আজ কিন্তু একটা পুরস্কার পেলুম।"

"কি পুরস্কার?"

"তুমি আমার জন্য ভাবছ, এটা কি কম?"

মৃদু হাসি ফুটে উঠল সুবেদার খাঁর মুখে। তিনি বরাবর মৃদু হাসিই হাসেন।

"আর দাঁড়াতে পারব না। চলি এখন—"

একটু এগিয়ে গিয়েই ট্যাক্সি পেয়ে গেলেন। ঝিনুক দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। তারপর সে-ও গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল।

গেল তনিমার কাছে।

তনিমা যে বাড়িটাতে ছিল, সেটা বেহালা অঞ্চলে। ঝিনুক ঠিকানাটা জোগাড় করেছিল শামুকের কাছ থেকে। মিস্টার সেনও বাড়িটাতে এসেছিলেন কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি তনিমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। ঝিনুক যাওয়াতে সে শঙ্কিত হ'য়ে পড়েছিল। ভেবেছিল ঝিনুকও বুঝি তাকে ফেরাতে এসেছে। কিন্তু ঝিনুক যখন তাকে বললে, "যে পাখি খাঁচা থেকে বেরিয়ে পালিয়ে এসেছে তাকে আবার খাঁচার মধ্যে ঢোকাবার ষড়যন্ত্র আর যেই করুক, আমি করব না। আরও বড় আকাশের সন্ধান তোমাকে দিতে পারি যদি তুমি রাজী হও।"

"কি রকম বড় আকাশ?"

জিগ্যেস করেছিল তনিমা।

"এদেশে পচে মরছ কেন। বিদেশে যাও। পাসপোর্টের জন্য চেষ্টা কর। সেখানে গিয়ে আরও পড়াশোনা কর। এখানে কিছু হবে না, হবার উপায় নেই—"

কথাটা শুনে হিহি করে' হেসে লুটিয়ে পড়েছিল তনিমা।

"আমার ধারণা ছিল ঝিনুকদি বুঝি বুদ্ধিমতী। এখন দেখছি ধারণাটা ভুল ছিল। তা না হলে আমার মতো ফাটা বেলুনকে আকাশের খবর দিচ্ছ?"

আবার হাসতে লাগল। তার এ ধরনের হাসি দেখে ঝিনুকের ভয় হল। পাগল হয়ে যায়নি তো? হাসিটা কেমন যেন অস্বাভাবিক!

"ফাটা বেলুনও সারানো যায়। আর একটা কথা ভুলে যেও না, মানুষ বেলুন নয়। সে অনেক বড়। সে ইচ্ছে করলেই আবার নবজন্ম লাভ করতে পারে।"

"তোমাদের ডাক্তার সুঠাম মুখার্জিও আমাকে এই ধরনের অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। যারা ভালো তাদের ওই একটা রোগ আছে, কথায় কথায় তারা লম্বা লম্বা উপদেশ দেয়। তারা বুঝতে চায় না যে ভাঙা কলসীতে জল ঢালা বৃথা।"

"ওসব বাজে কথা ছাড়। পাসপোর্টের চেষ্টা কর। ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট জোগাড় কর যে তোমার এমন ব্যাধি হয়েছে যা ইংলণ্ডে না গেলে সারবে না। আমার ইচ্ছা শামুককেও পাঠাব। সেই চেষ্টাতেই এসেছিলাম এখানে। তুমি যদি যেতে চাও তোমার জন্যেও চেষ্টা করতে পারি। আমার বিশ্বাস, মিস্টার সেনকে তুমি যদি বল তিনিও রাজী হবেন। তিনি চেষ্টা করলে—"

"বাবা? আমার ভালোর জন্যে বাবা চেষ্টা করবেন? বাবাকে তুমি চেনোনি এখনও?"

মিস্টার সেনকে ঝিনুক খুবই চিনত। তবু না-চেনার ভান করল। তনিমার কাছ থেকে সত্য কথাটা জানবার জন্যেই সে কলকাতা এসেছিল। তার মনে এল একটু অভিনয় না করলে সত্য কথাটা বেরুবে না।

"না না, ও কি বলছ। মিস্টার সেনের বাইরেটা দেখে তাঁকে বিচার করলে ভুল করা হবে। আসলে তিনি খুব ভালো লোক। কত রেফিউজিদের তিনি উপকার করেছেন। আমরা তো বিশেষভাবে তাঁর কাছে ঋণী।"

চোখ মটকে মুখ টিপে হাসতে লাগল তনিমা। তারপর বললে, "কি ভণ্ড তুমি ঝিনুকদি। বাবা রেফিউজিদের উপকার করেছেন? তিনি যা করেছেন সেটা তো তাঁর চাকরি। রেফিউজিদের সুব্যবস্থা করবার জন্যে তিনি মাইনে পান। তোমাদের জন্যে উনি যা করেছেন তা কেন করেছেন তোমার অন্তত জানা উচিত। তুমি শামুকের দিদি। তোমাদের বাড়িতে জুয়াখেলার আড্ডায় কি তুমি ওঁর পরিচয় পাওনি? আমারও কি পরিচয় পাওনি? তোমাকে এত বোকা তো মনে হয় না। না, অন্য কোন মতলবে এইসব ভনিতা করছ?"

ঝিনুক হাসিমুখে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। সে হাসি বহু অর্থবোধক।

তারপর বলল, "মতলব আবার কি থাকবে? তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। তুমি তোমার বাবাকে ছেড়ে আসতে ওখানে নানারকম গুজব সৃষ্টি হয়েছে। নানা লোকে নানা কথা রটাচ্ছে। তুমি যদি বিলেতে চলে যেতে পার, তাহলে তোমাব চলে আসাটার অন্য অর্থ করবে সবাই। ভাববে বিলেত যাওয়ার জন্যেই তুমি চলে এসেছ। তোমার বাবার মর্যাদা-হানি হয়েছে তুমি চলে' আসাতে। অনেক নিরীহ লোকের নামেও কলঙ্ক লাগল"

"কোন্ নিরীহ লোকের নামে আবার কলঙ্ক লাগল?"

"ডাক্তার সুঠাম মুখার্জির নামে। তোমার বাবা শাসিয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁর নামে মকদ্দমা করবেন।"

"করুন না, করলে মজাটি টের পাবেন।"

"ডাক্তার মুখার্জি তাহলে সত্যিই নির্দোষ?"

রহস্যময় হাসি হেসে তনিমা বললে, "তুমি এসব নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছ, ঝিনুকদি?"

"মাথা ঘামাই নি, একটু অবাক লাগছে। ডাক্তার মুখার্জির বাড়িতে যে মাস্টার মশাই থাকেন তিনি আমাদের গ্রামের লোক। তাঁর মুখে শুনেছি ডাক্তার মুখার্জি নাকি খুব ভালো লোক। আমরাও ওঁর কাছে কিছু উপকারের প্রত্যাশা করি। কিন্তু যা শুনছি তা যদি সত্যি হয়—"

"তা সত্যি কি মিথ্যে তাতো জানবার দরকার নেই। উনি যে সবার উপকার করবার জন্যে ব্যগ্র তাতে সন্দেহ নেই। এ কথাটা নির্জলা সত্য। আমি তার প্রমাণ। সেদিন ট্রেনে দৈবাৎ ওঁর কামরায় উঠে পড়েছিলাম বলেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। মহৎ লোক সন্দেহ নেই। অনেক উপদেশ দেন। যিশু খৃস্ট ক্রুসে প্রাণদান করেছিলেন বলে জগৎ-পূজ্য হয়ে আছেন। তোমাদের ডাক্তারবাবুর মহত্ত্বটা ততখানি কি না জানি না। তবে লোক ভালো। কিন্তু অনেকের ভালত্ব শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকে না—"

"হেঁয়ালিটা ভেঙে বল না বাপু। বুঝতে পারছি না ঠিক।"

"এর চেয়ে ভেঙে আর কিছু বলা যাবে না এখন। তুমি কি বসবে? আমাকে বেরুতে হবে একটু। চৌরঙ্গীতে যেতে হবে একবার।"

"আমিও বেরুব।"

"রাতে এখানেই ফিরবে তো?"

"ফিরব। চল না এক সঙ্গে বেরুই দুজনে। আমাকেও ওই অঞ্চলে যেতে হবে।"

"বেশ চল।"

সুবেদার খাঁর কাছ থেকে ফিরে ঝিনুক দেখল তনিমা তার অপেক্ষায় বসে আছে। তাকে দেখেই তনিমা বললে, "তোমার কথাই এতক্ষণ ভাবছিলাম বসে বসে। তোমার মতন আশ্চর্য মানুষ আমি আর দেখি নি।"

ঝিনুক চেয়ারে বসে ঘড়িটা দেখল একবার—ন'টা বেজেছে।

"আমার মধ্যে কি আশ্চর্য দেখলে আবার?"

"অন্য কোন মেয়ে হলে আমার মুখ দেখত না। কিন্তু তুমি আমার ভালোর জন্যে চেষ্টা করছ!"

তারপর ভুরু তুলে গলার স্বর একটু চড়িয়ে বলল, "তুমি মনে করছ এতে আমি খুব খুশী হচ্ছি। তা কিন্তু মোটেই হচ্ছি না। ভিক্ষে নিতে কারু ভালো লাগে না। আমার মধ্যে তোমরা সবাই কি এমন দেখেছ যে ক্রমাগত আমার ভালোর জন্যে চেষ্টা করছ। তোমাদের ভিক্ষা আমি চাই না।"

ঝিনুক মৃদু হেসে বলল—"কিসের ভিক্ষে খুলে না বললে তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক হয়েছিল তা তুমি জান। নিজের চোখেই দেখেছ একদিন। অথচ তুমি আমার উপর রাগ করনি। অতগুলো টাকা হাতে পেয়েও ফিরিয়ে দিয়েছ। এখন বলছ বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া কর তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমার উপর এত দয়া করবার হেতুটা কি বুঝতে পারছি না। ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে তোমার যে সম্পর্কটা কল্পনা করেছিলাম সেটা কি ভুল তাহলে?"

ঝিনুক গম্ভীর হয়ে রইল। তারপর তার মুখে যদিও একটু হাসি ফুটল কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে যে অগ্নি-কণা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তার সঙ্গে সে-হাসির মিল ছিল না খুব।

ঝিনুক বলল, "কেউ যখন হঠাৎ পঙ্ককুণ্ডে পড়ে' যায় তখন সে যা করে আমরা তাই করছি। অঙ্ক কষে হিসেব করে নীতিশাস্ত্রের সব আইন মেনে চলবার উপায় আমাদের নেই। আমরা যেমন করে পারি বাঁচবার চেষ্টা করছি। তুমি যদি আমার আচরণে অসঙ্গতি লক্ষ্য করে থাক তা ওই জন্যেই হয়েছে জেনো। ওসব কথা এখন থাক। তুমি আমার একটা উপকার করতে পারবে?"

"কি বল। সম্ভব হলে নিশ্চয় করব।"

"বড়বাজারের এই ঠিকানায় এই চেকটা নিয়ে গেলে ন' হাজার টাকা পাবে। টাকাটা গিয়ে এনে দিতে পার ? কোন কারণে আমি নিজে যেতে চাই না।"

চেকটা উলটে পালটে দেখে তনিমা বললে, "চেক তো দশ হাজারের। ন' হাজার বলছ কেন ?"

"যিনি ভাঙিয়ে দেবেন তিনি এক হাজার টাকা বাটা নেবেন।"

"এখন কি ট্রাম বাস পাওয়া যাবে ? বড়বাজার তো অনেক দূর।"

"আমি ট্যাক্সিটা ছাড়িনি। ওতেই তুমি চলে যাও। ওতেই ফিরে এস। এখানে ফিরে এলে ওর সব চার্জ মিটিয়ে দেব।"

"রাইট ও।"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল তনিমা। পাশের ঘরে তাড়াতাড়ি গিয়ে পোশাক বদলে ফেললে। পরে এল পাঞ্জাবীর পোশাক। রঙীন দোপাট্টাটা সত্যিই চমৎকার। চোখে সুর্মার টান, ঠোঁটে রং, গালে রং, মাথায় বেণীটা দু'ভাগ করা। কয়েক মিনিটের মধ্যে তনিমার ভোলই বদলে গেল যেন। তার মোহিনী মূর্তির দিকে ঝিনুক অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এ যে মূর্তিমতী অগ্নি-শিখা !

"চলি—"

তনিমা বেরিয়ে যাচ্ছিল।

' এটাও সঙ্গে নিয়ে যাও।"

ঝিনুক একটা মখমলের-খাপে ঢাকা ছোরা বার করে দিলে তাকে নিজের কাপড়ের ভিতর থেকে।

"আমার কাছে দুটো ছোরা আছে।"

"কোথায় ?"

"আমার চোখে। দেখতে পাচ্ছ না ?"

"তবু এটা নিয়েই যাও।"

ছোরাটা না নিয়েই বেরিয়ে গেল তনিমা। পর মুহূর্তেই ফিরে এল আবার।

"যদি খিদে পায়, তুমি খেয়ে নিও ঝিনুকদি। পাশের ঘরে সব খাবার আছে মীটসেফের ভিতর। আমার জন্যে অপেক্ষা করো না।"

চলে গেল।

এই বিপদের মুখে তনিমাকে পাঠিয়ে দিয়ে অস্বস্তি হতে লাগল ঝিনুকের। নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল। তার অস্বস্তি আরও বাড়ল। যখন রাত্রি দুটো পর্যন্ত তনিমা ফিরল না। তনিমা চলে যাওয়ার আধঘণ্টা পরে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসেছিলেন তাঁর খোঁজ নিতে। এসেই জিগ্যেস করেছিলেন, "মিসেস মুখার্জি কি কি বাড়িতে আছেন ?"

"মিসেস মুখার্জি বলে তো এখানে কেউ থাকেন না। যিনি থাকেন তাঁর নাম মিস তনিমা সেন। তাঁর বিয়ে হয়নি।"

বিস্মিত হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

"কিন্তু তিনি তো আমার কাছে পরিচয় দিয়েছেন মিসেস এস. মুখার্জি বলে। ডাক্তার স্থঠাম মুখার্জির একটা চিঠিও এনেছিলেন তিনি। তাঁর জন্যে একটা ভালো নার্সিং হোম ব্যবস্থা করেছি। সেই খবরটাই দিতে এসেছিলাম।"

ঝিনুক বুদ্ধিমতী মেয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে বলল, "ও তা হবে। আমার ঠিক জানা ছিল না। আপনি আপনার নাম ঠিকানা রেখে যান। নার্সিং হোমের ঠিকানাটাও রেখে যেতে পারেন। ও ফিরে এলে বলব।"

"কখন উনি ফিরবেন?"

"তার ঠিক নেই।"

ভদ্রলোক তাঁর কার্ড আর নার্সিং হোমের ঠিকানা রেখে গেলেন। কার্ডে একজন বিলাতী ডিগ্রীধারী ডাক্তারের নাম লেখা। সমস্তই কেমন যেন রহস্যময় মনে হতে লাগল ঝিনুকের।

তনিমা ফিরল রাত তিনটের সময়।

ঝিনুক সোফায় বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। হর্ন শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল, দেখল প্রকাণ্ড একটা দামী মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ট্যাক্সি নয়, প্রাইভেট গাড়ি। গাড়ি থেকে তনিমা নামল টলতে টলতে। ঝিনুক চমকে উঠল। মনে হল তার শরীর থেকে সমস্ত রক্ত কে যেন শুষে নিয়েছে!

ঘরে ঢুকেই তনিমা বলল, "এই নাও তোমার টাকা!"

নোটের তাড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মেজের উপর।

"তোমার চেহারাটা তো ভালো দেখাচ্ছে না। শরীর খারাপ হয়েছে না কি?"

"খুব খারাপ, মদও গিলেছি অনেক।"

সোফার উপর বসে পড়ল ধপ করে; তারপর শরীরটা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল সোফার উপর। ঝিনুক মেজে থেকে নোটের তাড়াটা তুলতেই তনিমা বলল, "গুণে নাও দশ হাজার আছে।"

"এক হাজার টাকা নিলেন না তিনি?"

"না। রসিক লোক যে, টাকাটা আমাকে দিলেন। শুধু রসিক নয়, বিরাট ধনী এবং প্রবল গুণ্ডার। এক হাজার টাকা ওর হাতের ময়লা। সেই ময়লাটা নিয়ে এসেছি।"

খিলখিল করে আবার হেসে উঠল তনিমা। হঠাৎ ঝিনুকের চোখে পড়ল তনিমার পাজামার পায়ে রক্তের দাগ।

"এ কি, তনিমা!"

তনিমা খিলখিল করে হাসতেই লাগল। ডাক্তারবাবুর কার্ডখানা তেপায়ার উপর ছিল। সেটা দেখিয়ে ঝিনুক বলল, "ইনি তোমার যাবার পর এসেছিলেন। আমি এঁকে খবর দিতে চললুম। তোমার চেহারাটা ভালো মনে হচ্ছে না।"

ঝিনুক টাকাগুলো টেবিলের ড্রয়ারে রেখে বেরিয়ে গেল।

"ঝিনুকদি, যেও না, শোন, শোন—" ঝিনুক কিন্তু ফিরল না। ডাক্তারবাবুকে নিয়ে ফিরতে ঝিনুকের বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেল। রেডক্রসের গাড়ি চড়ে একজন নার্স আর ডাক্তার নিয়ে সে যখন ফিরল তখন ভোর হয়ে গেছে।

তনিমা আচ্ছন্নের মতো পড়েছিল সোফায়। ডাক্তারবাবু তখনি তাকে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেলেন। বললেন, "এখানে কিছু করা যাবে না! অবস্থা ভালো নয়।"

ঝিনুক বলল, "চাকরটা এখনও আসেও নি। আমি কি আপনার সঙ্গে যাব।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "আপনি এখন থাকুন। চাকরটা এলে যাবেন। আমি একটু পরে গাড়ি পাঠিয়ে দেব।"

ঝিনুক চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। অনেক কিছু ভাবতে লাগল সে। তনিমার যে কি হয়েছে তা খানিকটা আন্দাজে বুঝেছিল সে। তার এক দূরসম্পর্কের কাকীমা অন্তঃসত্বা ছিলেন। পুকুরঘাটে পা পিছলে পড়ে গিয়ে তাঁর ওই রকম রক্তস্রাব হয়ে পেটের ছেলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তনিমার কি তাহলে—"

হঠাৎ তেপায়ার উপর একটা চিঠি নজরে পড়ল তার। তুলে তখনই পড়তে লাগল সেটা—

ডাক্তার শ্রীসুঠাম মুখোপাধ্যায় সমীপে—

শ্রীচরণেষু,

মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচব না। আপনি বলেছিলেন পেটের সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখাই আমার জীবনের লক্ষ্য হোক। আমি রাক্ষসী, আমার কোলে কি সন্তান আসতে পারে? সে বাঁচল না। তাকে মেরে ফেলেছি আজ। আমিও একটু পরে মরব। ঝিনুকদির কাছে শুনলাম বাবা নাকি আমার সঙ্গে আপনার নাম জড়িয়ে মকদ্দমা করতে চাইছেন। আমি মরবার আগে আজ মুক্তকণ্ঠে বলে যাচ্ছি, আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আপনি মানুষ নন, দেবতা। আপনার মতো দেবতার সংস্পর্শে আমি খানিকক্ষণের জন্ত দৈবাৎ এসেছিলাম। তাইতেই আমার জীবন ধন্ত হয়ে গেছে। আমি পাষাণী অহল্যা হ'লে হয়তো বেঁচে যেতাম। কিন্তু আমি পাষাণী নই, পিশাচী, রাক্ষসী। আমাকে অত সহজে উদ্ধার করা যায় না। তবে একটা কথা মনে হচ্ছে, আপনার মতো লোক আমার জীবনে যদি আগে আসত তাহলে আমাকে অকালে এমনভাবে মরতে হ'ত না। আপনার আদেশ আমি পালন করতে পারিনি, সত্যিই পারলাম না, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার বাবা আপনার বিরুদ্ধে কিছু করবার সাহস পাবেন না, কারণ তিনি পাপী,

সেইজন্যই ভীতু। আমি এখানে এসেই আমার সমস্ত কথা অকপটে ওখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার সেই চিঠি থেকেই প্রমাণিত হবে, আমার দুর্দশার জন্য দায়ী কে। শেষে একটা কথা সসঙ্কোচে আপনাকে জানাচ্ছি। আপনি যে ডাক্তারবাবুর কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে আমি আমার সত্য পরিচয় গোপন করে নিজেকে মিসেস এস. মুখার্জি বলে পরিচিত করেছিলাম। কলঙ্কের কালি মুখে মেখে নিজের সত্য পরিচয় দিতে হ'লে মনের যতটা জোর থাকা দরকার তা আমার নেই। আমার পেটে যে হতভাগ্য সন্তান এসেছিল তার বাবা কে তা আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু আমার লোভ ছিল তার একটা ভদ্র পিতৃ-পরিচয় দেবার। আশা ছিল মিথ্যা-মেকি-মুখোশের যুগে সে পরিচয়টা চলেও যাবে। কিন্তু তার আর দরকার হ'ল না। তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি যে দেশে চললাম সে দেশে সামাজিক ছাপের কোনও প্রয়োজনও নেই। আর লিখতে পারছি না, হাত কাঁপছে। জানি, আপনাকে প্রণাম করবার যোগ্যতা আমার নেই। তবু শত কোটি প্রণাম জানালাম, জানিয়ে ধন্য হলাম। আমি জানি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু সে ক্ষমা আমার কাছে পৌঁছবে কি? ইতি— প্রণতা

তনিমা

চিঠিটা পড়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ঝিনুক। তারপর তার চোখে পড়ল সোফাতেও রক্তের দাগ লেগেছে। নির্নিমেষে চেয়ে রইল দাগটার দিকে। মনে পড়ল সেই দিনের কথা, যেদিন তাদের বাড়িতেও রক্তের স্রোত ব'য়ে গিয়েছিল। বাবার রক্তে ভিজে গিয়েছিল তাঁর বিছানা বালিশ, দাদার রক্ত ভিজিয়ে দিয়েছিল ছিন্নমূল তুলসী গাছটাকে। মনে পড়ল মিস্টার সেনও পূর্ববঙ্গের লোক, তনিমারও জন্ম হয়েছিল তাদের গাঁয়ের কাছেই অন্য একটা গ্রামে। ওরাও পূর্ববঙ্গের অভিশপ্ত হিন্দু। যদিও ওরা আগেই পালিয়ে এসেছিল তবু রক্ত ওদের তাড়া করেছে। রক্তের দাগটার দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে বসে রইল সে। তার হঠাৎ মনে হল এ রক্ত বাংলা-মায়ের বুকের রক্ত। কোনও বিশেষ মানুষের রক্ত নয়। দাগটা ক্রমশঃ বড় হ'তে লাগল। সমস্ত ঘরটা রক্তাক্ত হয়ে গেল। মনে হল জানালা কপাট দিয়ে রক্তের স্রোত এঁকে-বেঁকে ঘরে ঢুকছে, সমস্ত ঘর রক্তে আর ফেনায় ভরে গেল। উঠোনেও রক্ত, যতদূর দেখা যাচ্ছে—রক্ত, রক্ত, কেবল রক্ত। রক্তের সমুদ্রে সে যেন হাবুডুবু খেতে লাগল। তারপরই ছরছর করে একটা শব্দ হতেই চমকে উঠে আত্মস্থ হল সে। কলে জল এসেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বাথরুমে চলে গেল। গিয়ে দেখল চৌবাচ্চায় জল ভরাই আছে। বালতি বালতি জল তুলে মাথায় ঢালতে লাগল সে—যেন তারও সর্বাঙ্গে রক্ত লেগেছে, সেটা ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। উন্মাদের মতো জল ঢালতে লাগল। চৌবাচ্চা প্রায় খালি হয়ে গেল, তবু সে থামল না। বাথরুমের কপাট বন্ধ করে সর্বাঙ্গে সাবান মাখতে লাগল। সাবান মেখে আবার স্নান করল। চৌবাচ্চার জল ফুরিয়ে গেল। কল থেকে জল পড়ছে,

এখনই আবার ভরে যাবে। কলের নলটার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে নির্নিমেষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আর পারল না। বসে পড়ল বাথরুমের মেজের উপর। দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। কার জন্যে কান্না? তনিমার জন্য? তার বাবা-মায়ের জন্য? ডাক্তার ঘোষালের জন্য? শাপলা মোহিনী ছবির জন্য? তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলতে পারত না। কিন্তু কান্না সে রোধ করতে পারল না। অঝোর ঝরে কাঁদতে লাগল।

···বাইরে মোটরের হর্ন শোনা গেল একটা। তারপর কে একজন বাইরে থেকে বলল—"মাইজি আপনার জন্য গাড়ি এনেছি।"

ঝিনুক উঠে দাঁড়াল।

॥ ১৯ ॥

গণেশ হালদার সেদিনও পিওনকে জিগ্যেস করলেন, "আমার নামে কোনও চিঠি আজও আসেনি?"

পিওন বললে, "না। থাকলে তো আমি দিয়েই যেতুম।"

একটু হতাশ এবং বিস্মিত হলেন গণেশ হালদার। তাহলে ওঁরা কি প্রবন্ধটা পান নি। না পাবার কথা নয়, রেজেস্ট্রি করে দিয়েছিলেন। একটা ঠিকানা-লেখা খামও দিয়েছিলেন উত্তর পাওয়ার জন্য। মাসখানেক হয়ে গেল, এতদিন একটা উত্তর আসা উচিত ছিল। তবে কি ··না, যে কথাটা তাঁর মনে হল সেটা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না। নামজাদা একটা কাগজে তিনি প্রাদেশিকতা নিয়ে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। প্রবন্ধে বর্তমান গভর্ণমেণ্টের অনেক সমালোচনা ছিল। তাঁর আশা ছিল এ প্রবন্ধ ছাপা হলে অনেকের চোখ ফুটবে, এ নিয়ে আন্দোলন হবে এবং ভবিষ্যতে গভর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে সচেতন হবেন হয়তো। তাঁর বিশ্বাস গণতন্ত্র-মোটরকারের স্টিয়ারিং হুইল আর ব্রেক হচ্ছে সমালোচনা। শাসন পরিষদে যদি জোরালো বিরুদ্ধপক্ষ না থাকে, জনসাধারণ যদি মুক্তকণ্ঠে শাসন পরিষদের কার্যকলাপের সমালোচনা করবার সুযোগ না পায়, তাহলে সে শাসন-পরিষদে ঘুণ ধরতে বাধ্য, ক্রমশঃ তা ডিক্‌টেটারশিপে রূপান্তরিত হয়ে যায়। গণেশ হালদার প্রাদেশিকতা নিয়ে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে আমাদের বর্তমান গভর্ণমেণ্ট মুখে যাই বলুন, কার্যতঃ তাঁরা প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। আমাদের সংবিধানেই এই প্রশ্রয়ের বীজ নিহিত আছে। ভারতবর্ষকে নানা প্রদেশে ভাগ করার ফলেই প্রাদেশিকতার সৃষ্টি হয়েছে, এই তাঁর বিশ্বাস। শুধু নানা প্রদেশে ভাগ করা হয়নি, প্রত্যেক প্রদেশকে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রদেশ দু'চারটি ব্যাপার ছাড়া নিজেদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যা খুশী করতে পারেন, কাউন্সিলে ভোটে সেটা 'পাস' হলেই হল। আমাদের কোনও প্রদেশের অধিবাসীরা এখনও পর্যন্ত কার্যতঃ এমন উদারতার পরিচয় দেননি যার থেকে বোঝা যায় যে তারা অন্য প্রদেশবাসীকেও

সমদৃষ্টিতে দেখেন এবং সমান সুযোগ দেন। ইংরেজ আসবার পূর্বে ভারতবর্ষ নানা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ রাঢ় বরেন্দ্র সমতট প্রাগজ্যোতিষপুর প্রভৃতি নানা প্রদেশ নানা সময়ে আমাদের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে এবং সে ইতিহাসের প্রধান কাহিনী কলহ আর যুদ্ধ। কনোজ, থানীশ্বর, মৌখরি, ইন্দ্রপ্রস্থ, গুর্জর, চোল—কেউ এর থেকে মুক্ত ছিল না। গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষবর্ধনের এবং আরও অনেকের সঙ্গে অনেকের যেসব যুদ্ধের কথা পড়েছি সেই যুদ্ধই ভিন্ন নামে আজও চলছে। সেকালে প্রায়ই ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ হত। শৈব শাক্ত বৌদ্ধ হিন্দু মুসলমানেরা ধর্মের ওজুহাতেই ঝগড়া করত পরস্পরের সঙ্গে। মাঝে মাঝে নারীও জড়িত থাকতেন, কখনও অলক্ষ্যে, কখনও প্রত্যক্ষে। নারীদের নিয়ে এখন যুদ্ধ হয় না, নারী এখন শস্তা, পথেঘাটে পাওয়া যায়, ঘর থেকে টেনে নিয়ে গেলেও তার কোন প্রতিকার হয় না। আগেকার ধর্মও আর নেই, তার বদলে গজিয়েছে নানা রাজনীতি-তন্ত্র। এখন কেউ কংগ্রেসী, কেউ কম্যুনিস্ট, কেউ জনসংঘ, কেউ স্বতন্ত্র পার্টি, কেউ হিন্দুমহাসভা, কেউ বা মুসলিম লীগ। এর উপর আছে কেউ বাঙালী, কেউ বেহারী, কেউ ওড়িয়া, কেউ মাদ্রাজী, কেউ মারহাঠী, কেউ পাঞ্জাবী। সবাই নিজের নিজের প্রদেশ নিয়ে গর্ব করে। আমি ভারতবাসী, সমস্ত ভারতবর্ষ আমার দেশ, সমস্ত ভারতবর্ষের সুখদুঃখ আমার সুখদুঃখ, সমস্ত ভারতের স্বার্থ আমার স্বার্থ, এ বোধ ক'টা লোকের আছে? আর একটা মুশকিল, যাঁরা বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে সর্বভারতীয় প্রেমের ভারতমহাসাগর সৃষ্টি করেন তাঁরাই দেখি আবার নিজের বাড়ির উঠোনে প্রাদেশিকতার কূপ খননের জন্য বদ্ধপরিকর। এঁরা মুখে যা বলেন, কাজে তা করেন না। এবং আরও মুশকিল ভোটের কৌশলে এঁদের মধ্যে অনেকেই নেতা এবং দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়েছেন। এর ফলে প্রতি প্রদেশেই সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায় নানাভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছেন। রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখে তাঁরা আশ্বস্ত হন, কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁদের ভুল ভাঙে। এই প্রহসন গোড়া থেকেই চলছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি এ-ও লিখেছিলেন যে, প্রাদেশিকতা লোপ করতে হলে প্রদেশ লোপ করতে হবে। শাসনের সুবিধার জন্য ছোট ছোট 'ইউনিট' সৃষ্টি করা যেতে পারে, কিন্তু সে-সবের নাম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ—এসব থাকবে না। সংখ্যা দিয়ে তাদের নামকরণ করা যেতে পারে। তাঁর মতে সে-সব ইউনিট পরিচালিত হবে একটি কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের নির্দেশে। সে নির্দেশে বাঙালী বেহারী ওড়িয়া মাদ্রাজী বা অন্য কোন প্রদেশবাসীর প্রাধান্য থাকবে না। সে কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্যদের একমাত্র পরিচয় হবে তারা ভারতবাসী। সে পরিষদে প্রত্যেক ইউনিট থেকে সমান-সংখ্যক সভ্য নির্বাচিত হবে। প্রত্যেককে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। সর্ব ভারতীয় সুবিধার জন্য হিন্দী বা অন্য কোন ভাষাকে নির্বাচন করা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমানে বেশ কিছুদিন আমাদের ইংরেজীকেই আঁকড়ে থাকতে হবে। কারণ বর্তমানে ওই একমাত্র ভাষা যার মাধ্যমে আমরা নিখিল বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিচয় পেতে পারি। ইংরেজীকে এখন ত্যাগ করলে আমরা পিছিয়ে পড়ব। এই

ধরনের নানা কথা তিনি লিখেছিলেন ওই প্রবন্ধে। আর একটা কথা বিশেষ জোর দিয়ে লিখেছিলেন. গণতন্ত্রকে আদর্শ গণতন্ত্র করতে হলে ভোটদাতাগণকে সুশিক্ষিত হতে হবে। ভালো মন্দ বিচার করবার ক্ষমতা যেন তাদের থাকে। তাদের চরিত্রও সাধু হওয়া দরকার। অশিক্ষিত এবং অসাধু ভোটদাতাদের ভোট যেন-তেন-উপায়ে কুড়িয়ে যে গণতন্ত্র গঠিত হয় তা কখনও আদর্শ গণতন্ত্র হয় না, হতে পারে না। ভোটদাতাদের সুশিক্ষিত এবং সাধু করবার দায়িত্বও গভর্নমেণ্টের। কিন্তু বর্তমানে গভর্নমেণ্টের সুশিক্ষার দিকে মোটেই নজর নেই। আড়ম্বর অনেক আছে, কিন্তু যা করলে সুশিক্ষার প্রসার হয় তার কোনও ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রাদেশিকতা এবং আত্মীয় পোষণের বিষ-বাষ্পে সমাচ্ছন্ন। তাই স্কুলে-কলেজে ভাল শিক্ষকের অভাব হয়েছে। ভাল শিক্ষকের অপ্রাচুর্যের আর একটা কারণ শিক্ষকদের বেতন বড় কম। আমাদের দেশের ভালো ছেলেরা তাই ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার হয়, নামজাদা কলেজের বড প্রফেসার হয়, সরকারী বেসরকারি বড় চাকরির চেষ্টা করে, কিন্তু স্কুলের শিক্ষকতা করতে কেউ চায় না। অথচ ওইখানেই ছাত্র-ছাত্রী-চরিত্রের বনিয়াদ তৈরী হয়। এই বনিয়াদ কাঁচা হয়ে গেলে সব গেল। পূর্বেও শিক্ষকেরা কম বেতন পেতেন, কিন্তু তার বদলে সম্মান পেতেন প্রচুর। এখন তাও পান না। এখন তাঁরা সমাজে হেয় অশ্রদ্ধেয় জীব। ছাত্ররা পর্যন্ত তাঁদের অপমান করছে এবং অপমান করে পার পেয়ে যাচ্ছে। এখন ছাত্রদের লক্ষ্য যেন-তেন-প্রকারেণ পরীক্ষা পাস করা এবং শিক্ষকদের লক্ষ্য যেন-তেন-প্রকারেণ পরীক্ষা পাস করিয়ে দেওয়া। শিক্ষকরা এখন তাই জীবিকা-নির্বাহের জন্য টিউশনি করেন, পরীক্ষার প্রশ্ন বলে দেন. শুনেছি মোটা টাকা দিলে পরীক্ষার খাতা পর্যন্ত বদলে দেন এবং নানাভাবে ওপর-ওলাদের খোশামোদ করে' চেষ্টা করেন যাতে তিনি বারবার পরীক্ষক নিযুক্ত হতে পারেন। অর্থাৎ শিক্ষকরাও ক্রমশঃ চোর আর গুণ্ডা প্রকৃতির লোক হয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই ন্যায়-বিচার হয় না এদেশে. শিক্ষার ক্ষেত্রেও সুনীতির আসনে দুর্নীতি জাঁকিয়ে বসেছে। স্কুল কলেজ থেকে তাই যেসব ছাত্র-ছাত্রী ডিগ্রীর তকমা নিয়ে বেরুচ্ছে, তারা আকৃতিতে মানুষ বটে, কিন্তু অন্তরে পশু। বিদেশী পোশাকে সজ্জিত, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যের বিগ্রহ এক একটি। এরাই ভবিষ্যৎ ভোটদাতা। ইলেকশনের সময় নেতারা এদের সাহায্য গ্রহণ করেন। এসব দেখে মনে হয় ভবিষ্যতেও যে এদেশে আদর্শ গণতন্ত্র স্থাপিত হবে তার কোনও আশা নেই। সে গণতন্ত্রেও প্রাদেশিকতার প্রচুর প্রভাব থাকবে। আমাদের দেশের বড বড নেতারা মুখে বলছেন বটে প্রাদেশিকতা বর্জন কর, কিন্তু তাঁদের হাব-ভাব আর আইন-কানুন দেখে মনে হয় সেটা নিতান্তই মৌখিক এবং রাজমক্ষিক উপদেশ-বর্ষণ মাত্র। বিদেশে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরাও অভিজ্ঞ বিদ্বান মান্য-গণ্য ব্যক্তি হন। এদেশে হন তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা। এদেশেও বিদ্বান মান্যগণ্য অভিজ্ঞ অধ্যাপকের অভাব নেই, কিন্তু তাঁদের মধ্যেও লোভ ঢুকেছে, তাঁরা তাই গদির আশায় পলিটিক্স্ নিয়ে মেতে আছেন অনেকে। তাঁদের যেটা আসল কাজ, যে কাজে তাঁদের যোগ্যতা সবচেয়ে

বেশী, সেদিকে তাঁদের আগ্রহ নেই, বেশী মাইনে দিয়ে সে কাজে তাঁদের নিয়োগ করবার দিকে গভর্ণমেণ্টেরও উৎসাহ নেই। মনে হয় যেদিন শিক্ষকদের বেতন এবং সম্মান উচ্চপদস্থ মিনিস্টারদের মতো হবে সেদিন শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভালো লোক পাওয়া যাবে। কিন্তু তা কি হবে কখনও ?

এই সব কথাই লিখেছিলেন গণেশ হালদার। তাঁর সন্দেহ হল প্রবন্ধটা কি ওঁরা শেষ পর্যন্ত ছাপবেন না ? ভাগ্যে তিনি প্রবন্ধটার নকল রেখেছিলেন একটা। হঠাৎ মনে হলে প্রবন্ধটা ডাক্তার মুখার্জিকে দেখালে কেমন হয় ? হয়তো ওতে এমন অনেক কথা আছে যা ছাপা উচিত নয়। কিন্তু ওঁর কি সময় হবে ?

একদিন প্রবন্ধটা নিয়ে সসঙ্কোচে গেলেন তিনি ডাক্তার মুখার্জির কাছে। ডাক্তার মুখার্জি যথারীতি বাইরে বসেছিলেন। তাঁকে দেখেই অভ্যর্থনা করলেন।

"আসুন মাস্টার মশাই। হাতে ওটা কি ?"

"ওটা একটা প্রবন্ধ। আপনাকে দেখাতে এসেছি।"

"আমাকে ? আচ্ছা দিন কোনও ফাঁকে পড়ে রাখব। আপনি লিখেছেন ?"

"হ্যাঁ"

সসঙ্কোচে মাথা নাড়লেন গণেশ হালদার।

"পড়ব। দু' একদিন দেরি হলে অসুবিধা হবে না তো ? আজ একটু ব্যস্ত আছি। আমার গাই মঙ্গলার ব্যথা ধরেছে। ওর একটা কিছু না হওয়া পর্যন্ত কোন দিকে মন দিতে পারছি না। দেখছেন কি রকম উঠ-বোস করছে।"

রকেট ভুটান জাম্বু সমভিব্যাহারে ডাক্তারবাবু গোয়ালের দিকে গেলেন। গণেশ হালদারও গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর মনে হল কুকুর তিনটিও যেন একটু চিন্তিত হয়েছে মঙ্গলার ব্যাপারে। তিনজনেই আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডাক্তারবাবুর পিছনে। গণেশ হালদারের মনে হল তিনজনই যেন বুঝতে পেরেছে যে, মুংলির কষ্ট হচ্ছে। রকেট ঘাড় নীচু করে সন্তর্পণে মুংলির কাছাকাছি গিয়েছিল, কিন্তু মুংলির তাড়া খেয়ে পালিয়ে এল। ডাক্তার মুখার্জিও বকলেন রকেটকে।

"ওকে এখন বিরক্ত করছ কেন রকেট। That's bad !"

রকেট অপরাধীর মত মুখ ফিরিয়ে রইল।

গণেশ হালদার পিছু ফিরে দেখলেন মুরগীগুলোও গুটি গুটি এসে দাঁড়িয়েছে।

ডাক্তারবাবু দুর্গাকে বললেন, "একটা বড় হাঁড়ি করে গরম জল চড়িয়ে দে। আর খেতে দে মুরগীগুলোকে—"

তারপর তিনি এগিয়ে গিয়ে মঙ্গলাকে আদর করতে লাগলেন। হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন তার মাথায় আর গলায়। মুংলি লম্বা জিব বার করে চেষ্টা করতে লাগল ডাক্তার মুখার্জির হাতটা চেটে দিতে। ডাক্তার মুখার্জি কিন্তু সে সুযোগ দিলেন না তাকে। গালে একটা ছোট চড় মেরে বললেন, "ব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছিস, এখনও দুষ্টুমি !"

বিজয়, পাকিয়া আর শালিয়া দৌড়ে এসে খবর দিলে তাদের বক্‌রির পাঁচটা বাচ্চা হয়েছে।

"পাঁচটা ? বলিস কি ? চল চল দেখে আসি। মাস্টার মশাই যাবে না কি ? একটা বক্‌রির পাঁচটা বাচ্চা সাধারণতঃ দেখা যায় না।"

শিশুসুলভ উৎসাহে ডাক্তার মুখার্জি অগ্রসর হলেন গেটের দিকে। রকেট ভুটানও এই সুযোগে গেটের বাইরে যাওয়ার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু ডাক্তার মুখার্জি যেতে দিলেন না।

"যাও তোমরা। দুর্গা গেট বন্ধ করে দে—"

দাইয়ের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল দাইয়ের মেয়ে রুক্‌মিনিয়া সত্যিই পাঁচটা বক্‌রির বাচ্চা নিয়ে হাসিমুখে বসে আছে। আনন্দে তার সবগুলো দাঁতই বেরিয়ে পড়েছে। বাচ্চাগুলো খুবই ছোট ছোট। ডাক্তার মুখার্জি ঝুঁকে দেখলেন বেঁচে আছে সব কটাই।

"ওগুলোকে বাঁচাবি কি করে। ওর মা কি পাঁচটা বাচ্চাকে দুধ দিতে পারবে ?"

দেখা গেল রুক্‌মিনিয়ার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে।

"ওর মা পারবে না। আমি ওদের বোতলে দুধ খাইয়ে মানুষ করব আর একবার এর পাঁচটা বাচ্চা হয়েছিল, আমি বোতলে পুরে দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে ছিলাম।"

রুক্‌মিনিয়া চমৎকার বাংলা বলে। সে ঘরে ঢুকে একটা ফিডিং বোতল বার করে আনলে।

"এই দেখুন।"

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "ওর টিট্‌টা খাওয়ার পর ভালো করে ধুয়ে রাখিস। তা না হলে পেটের অসুখ করবে।"

"আচ্ছা।"

"মাই দেখ্‌, দেখ্‌।"

পাকিয়ার নির্দেশে সবাই চোখ তুলে দেখল একটা নীলকণ্ঠ পাখী এসে বসেছে ঘরের চালে। রুক্‌মিনিয়া দু'হাত তুলে প্রণাম করল। বলল, "খুব শুভ লক্ষণ। বাচ্চা-গুলো তাহলে বাঁচবে।"

গণেশ হালদার অনুভব করলেন এই পরিবেশে ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে প্রাদেশিকতা নিয়ে আলোচনা জমবে না।

॥ ২০ ॥

যেদিন কালীপুজো হল সেদিনও ঝিন্টুক কলকাতা থেকে ফিরল না। কাউকে একাই করতে হল সব। ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির কাছে যে ফাঁকা মাঠটা ছিল তাতে শামিয়ানা খাটিয়ে পুজোটা নম-নম করে হল কোনক্রমে। ডাক্তার ঘোষাল একবার এসে উঁকিও দেন নি। তিনি নিজের প্র্যাকটিস নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কালীপুজোর রাত্রে

এক টাইফয়েড রোগীকে দেখবার জন্ম বাইরে চলে গিয়েছিলেন, সমস্ত রাত ফেরেন নি। ইচ্ছে করলে অবশ্য ফিরতে পারতেন। কিন্তু সে ইচ্ছে তাঁর হয় নি। রোগীর বাড়িতেই কাটিয়েছিলেন রাতটা। সকালে ফিরে দেখলেন প্রকাণ্ড খাঁড়াটা তখনও ঝোলানো রয়েছে খাবার ঘরের দেওয়ালে টেবিলের সামনে। কাউ চা করছিল।

ডাক্তার ঘোষাল তাকে বললেন, "তোমার কালীপুজো তো হয়ে গেছে। খাঁড়াটা এবার ফিরিয়ে দাও যেখান থেকে এনেছ।"

"ওটা আমি কিনেছি।"

"কিনেছ? খাঁড়া কিনেছ। কেন?"

কাউ চুপ করে রইল। তার নীরবতার মধ্যেও যেন একটা ভাষা ছিল। ডাক্তার ঘোষাল কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে তারপর বোমার মত ফেটে পড়লেন।

"তোমার ওই খাঁড়া ফাঁড়া নিয়ে বেরিয়ে যাও এখান থেকে। I cannot have an impudent pig hanging around me. শূয়োরের সঙ্গে বাস করা যায় না।"

"মাসীমা না এলে আমি কোথাও যাব না। তিনি আমাকে থাকতে বলে গেছেন।"

"মাসীমা কি এ বাড়ির মালিক? বেরোও এখান থেকে।"

কাউ সংক্ষেপে বললে, "আমি যাব না।"

এর পর যা অনিবার্য তাই হল। ডাক্তার ঘোষাল উঠে ঠাস্ করে এক চড় মারলেন তার গালে।

কাউ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মেজের উপর। তারপর ডাক্তার ঘোষাল তাকে লাথাতে লাথাতে বার করে দিলেন রাস্তায়। খাঁড়াটা দেওয়াল থেকে খুলে এনে ছুঁড়ে দিলেন বাইরে। ফিরে এসে কপাটটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে একটা চেয়ারে ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইলেন গুম হয়ে। তারপর পা দোলাতে শুরু করলেন। একটু পরেই উঠে দাঁড়ালেন আবার। হেঁট হয়ে জানলার একটা ফোকর দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন কাউ কি করছে। যতটুকু দেখতে পেলেন সামনের রাস্তায় কেউ নেই। জানলাটা খুললেন আস্তে আস্তে। খট্ করে ছিট্‌কিনির শব্দ হওয়াতে চমকে উঠলেন, যেন কোথাও কুকার্য করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। জানলা খুলে দেখলেন কেউ নেই। কাউ নেই, খাঁড়াটাও নেই।

হঠাৎ তাঁর সমস্ত বুকটা যেন খালি হয়ে গেল। সত্যিই চলে গেল নাকি ছোঁড়াটা। হাজার হোক্ ছেলে তো! রাগের মাথায় মেরেছেন বলে চলে যাবে। আবার ভ্রূকুঞ্চিত হল তাঁর। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন ungrateful wretch! তারপরই স্টোভটার শোঁ শোঁ আওয়াজ সম্বন্ধে সচেতন হলেন তিনি। কাউ স্টোভটা জেলে চায়ের জল করছিল। ভিতরে ঢুকে দেখলেন দুধের কড়াটা মেজেতে বসানো রয়েছে, একটা বেরাল খাচ্ছে দুধটা। মীট সেফের দরজাটা খোলা। তাঁকে দেখে বেড়ালটা পালিয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি কয়েক মুহূর্ত। মীট সেফে পাঁউরুটি রয়েছে, ডিমও আছে কয়েকটা, মাখনও আছে। তিনি কি এখন উবু হয়ে স্টোভের ধারে বসে নিজের জন্তে

চা জলখাবার তৈরি করবেন? কখনও করেন নি তো। বরাবরই কেউ না কেউ করে দিয়েছে। প্রবলভাবে ঝিন্টুকের কথা মনে পড়ল। সে এত দেরি করছে কেন? কি করছে সে কলকাতায়। অদ্ভুত হয়ে উঠল মুখের ভাব। রাগ, ভয়, আক্রোশ, আফসোস একসঙ্গে মূর্ত হয়ে উঠল তাতে। হঠাৎ ঝুঁকে স্টোভটা নিবিয়ে দিলেন তিনি। মীট সেফের কপাটটা বন্ধ করলেন। জানালাটাও বন্ধ করে দিলেন। তারপর নিজের বড় সুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। ঘরের কপাটে ডবল তালা লাগিয়ে মোটরে গিয়ে উঠলেন। তারপর সোজা চলে গেলেন 'ক্ষুধা-হরণ' হোটেলে। হোটেলের মালিক তিনকড়ি বসাক তাঁর রোগী এবং ভক্ত। তাকে গিয়ে বললেন, "এইখানেই থাকব দিনকতক। চাকরবাকর সব পালিয়েছে। আমার জন্যে একটা আলাদা ঘর চাই। আছে? এখুনি খাবারও চাই কিছু। ভয়ঙ্কর খিধে পেয়েছে।"

"এখুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

শশব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল তিনকড়ি।

খাবার খেয়েই তিনি ডিসপেন্সারিতে চলে গেলেন। অনেক রোগী বসেছিল তাঁর অপেক্ষায়। রোগী নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। একটা ছোট মেয়ের নাকে মকাইয়ের দানা ঢুকে গিয়েছিল। তাকে নিয়ে খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করতে হল। বেরুল দানাটা। মেয়েটা তো চেঁচাচ্ছিলই, তার মা-ও তুমুল কলরব করে কাঁদতে লাগল। ডাক্তার ঘোষাল জোর ধমক দিলেন তাকে।

"চোপরাও হারামজাদী। মেয়েকে যেখানে সেখানে ছেড়ে দেবে, আর এখানে এসেছে ন্যাকামি করে কাঁদতে।"

মেয়েটির স্বামীটিও সঙ্গে ছিল। স্ত্রীর এবম্বিধ অপমানে একটুও ক্ষুব্ধ হল না সে। বরং সে ডাক্তার ঘোষালের কথায় সায় দিয়েই বললে, "ঠিকই বলেছেন ডাক্তারবাবু। মেয়েকে ও কিছু দেখে না।"

লোকটি বেশ বলিষ্ঠ গঠন। ডাক্তার ঘোষাল ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর বিস্ফারিত চক্ষুর দৃষ্টি স্থাপন করলেন লোকটার মুখের উপর।

"তুমি ফপরদালালি করছ যে, তুমি দেখতে পার না? চেহারা তো বেশ তাগড়া, কি কর তুমি?"

স্ত্রীটি চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, "কিছু করে না ডাক্তারবাবু, বেকার বসে আছে।"

"তবু মেয়েটাকে দেখতে পার না রাসকেল। তোমার বউকে রাঁধতে হয়, বাসন মাজতে হয়, কাপড় কাচতে হয়—"

বউটি ফর্দ আরও বাড়িয়ে দিল।

"ঢেঁকিতে পাড় দিতে হয়, ছাতু পিষতে হয়, ঘুঁটে দিতে হয়। আমিই সংসার চালাই ডাক্তারবাবু।"

লোকটি অনুভব করল ফোড়ন দিতে গিয়ে বিপদে পড়ে গেছে সে। আর কিছু না বলে সে চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইল বউটার দিকে।

"তোমাদের বাড়ি কি এখানেই?"—জিগ্যেস করলেন ডাক্তার ঘোষাল।

"আজ্ঞে না, আমরা রেফিউজি, সম্প্রতি এসেছি—"

"তোমাদের কথার টান থেকেই সেটা বুঝেছি। কি জাত?"

"জেলে।"

তারপর একটু থেমে বলল—"চিরকাল মাছের কারবার করেছি বাবু। এখানে তার কোন সুবিধে নেই। তাই বেকার হয়ে বসে আছি।"

"রাঁধতে পার?"

"রাঁধা তো অভ্যাস নেই। তবে মোটামুটি পারি।"

"তাহলে আমার বাড়িতে এস। নাম কি তোমার?"

"হরসুন্দর।"

"কি মাইনে নেবে?"

"বিবেচনা করে যা দেবেন।"

"আমার বাড়িতে তাহলে এস কাল থেকে।"

"কোথায় আপনার বাড়ি?"

তার স্ত্রী অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠল, "আমি জানি। ঝিনুক-দি ওঁর বাড়িতে থাকেন।"

"তুমি ঝিনুককে চেন?"

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন ডাক্তার ঘোষাল।

মেয়েটি মাথা হেঁট করে বলল, "চিনি।"

কি করে ঝিনুককে সে চিনলে তা আর সে খুলে বললে না। ভয় হল, শুনলে হয়তো ডাক্তার ঘোষাল চটে যাবেন। ঝিনুক সুযোগ পেলেই রেফিউজিদের বাড়ি বাড়ি ঘোরে, দুঃস্থ রেফিউজি পরিবারকে অর্থ সাহায্যও করে গোপনে। বলা বাহুল্য, সংসার খরচের টাকা বাঁচিয়েই সে এসব করে। ডাক্তার ঘোষাল সংসারের কোন খবরই রাখেন না, এটাও রাখেন নি। খবরটা শুনে তিনি ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে চাইলেন মেয়েটার দিকে। সে আরও ভয় পেয়ে গেল। ভাবল ঝিনুকের সঙ্গে তার পরিচয় আছে এটা যেন তার অপরাধ। ডাক্তার ঘোষাল কিন্তু মনে মনে খুশী হয়েছিলেন, তাঁর মুখ দেখে যদিও অন্তরকম মনে হচ্ছিল।

বললেন, "আচ্ছা, আমার বাড়িতে এস।" তারপর তিনি বাকি রুগীদের দেখতে লাগলেন। নানা রকম রুগী। কারও জ্বর হচ্ছে, কারও হাঁপানি, কারও চোখ উঠেছে, কারও পেটের অসুখ, কারও একজিমা, কারও বাত। কোন রুগীকে মিনিট পাঁচেকের বেশী দেখেন না ডাক্তার ঘোষাল। দেখবার সময় নেই। খুব তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয়ও করতে পারেন। খসখস করে প্রেসক্রপশন লিখছিলেন এমন সময় তাঁর কানে এল, "আমার কথাটা একটু শুনবেন?"

চোখ তুলে দেখলেন ঝিনুকের কাকা যতীশবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। নাদুস-নুদুস চেহারা, মাথায় চুলটি পরিপাটি করে আঁচড়ানো, পোশাক ফিটফাট।

"কি কথা বলুন।"

"ঝিনুক কলকাতা থেকে এখনও ফেরেনি। শামুকও শুনলাম কলকাতায় চলে গেছে। ঘরে চাল ডাল তরিতরকারি কিচ্ছু নেই। চাকরটা পালিয়েছে। আমার চলবে কি করে?"

ডাক্তার ঘোষাল নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর ক্রোধ ঘনিয়ে এল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে।

"চলবে কি করে তা আমি কি করে বলব?"

"আপনারই তো বলবার কথা। আপনিই জোর করে আমাদের দেশ থেকে নিয়ে এসেছেন, আপনিই আমাদের ভরণপোষণ করছেন—"

"একটা ছাগলকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিলাম বলে চিরকাল তাকে পুষতে হবে নাকি? আপনি এবার চরে খান।"

"আমাকে ছাগল বললেন, কিন্তু আমার ভাইঝি ঝিনুককে তো ছাগলী বলে তাড়িয়ে দেননি, তাকে মাথার মণি করে রেখে দিয়েছেন বরং—"

এর একটি উত্তরই ডাক্তার ঘোষালের মতো লোকের কাছে প্রত্যাশিত এবং তা তিনি সঙ্গে সঙ্গে দিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করলেন যতীশবাবুর গালে। যতীশবাবু পড়ে গেলেন। রোগীদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। থানার হাবিলদার রামভরোসা সিং তাঁর পেটের দরদের জন্য ওষুধ নিতে এসেছিলেন। তিনি বরাবরই ডাক্তার ঘোষালের কাছে বিনামূল্যে ওষুধ পান, তাঁর চিকিৎসা-নৈপুণ্যের উপর হাবিলদার সাহেবের বিশ্বাসও অগাধ। তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন ডাক্তার ঘোষালের দিকে। ভাবটা, আমাকে এখন কি করতে হবে বলুন। দেব নাকি আরও দু' চার ঘা?

ডাক্তার ঘোষাল ভালো হিন্দী বলতে পারেন না। বাংলায় বললেন, "লোকটা পাজি বদমায়েশ। আমার নামে একটা মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে আমার কাছ থেকে মোচড় দিয়ে টাকা আদায় করতে এসেছিল।" তারপর শেষে হিন্দীতে যোগ করে দিলেন, "উসকো হিয়াঁসে ভাগা দিজিয়ে।"

যতীশবাবু উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কপালটা কেটে রক্ত পড়ছিল। ডাক্তার ঘোষাল হেঁকে তাঁর অ্যাসিস্টেন্টকে বললেন, "ওহে, এর মাথাটা আইওডিন লাগিয়ে ড্রেস করে দাও।" তারপর পাঁচটা টাকার একটা নোট বার করে বললেন, "এইটে নিয়ে এখন ক্ষুন্নি-বৃত্তি করুন। তারপর দেশে চলে যান। আপনার দেশে যাবার ব্যবস্থা আমি করে দেব।"

যতীশবাবু টাকাটা নিলেন না, ড্রেসও করালেন না। নীরবে বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তার ঘোষাল তাঁর প্রস্থানপথের দিকে চেয়ে রইলেন ভ্রূকুঞ্চিত করে। লোকটার অবস্থা দেখে ভিতরে ভিতরে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর, অস্ফুটকণ্ঠে যা বললেন তা অন্যরকম। বললেন, স্কাউণ্ড্রেল।

হাবিলদার সাহেব আশ্বাস দিলেন, "হম্ উস্‌কো 'টাইট' কর দেঙ্গে; হুজুর। আপ বে-ফিকির রহিয়ে।"

ঘোষাল হাবিলদারের পেটের ব্যথার কারণ নির্ণয় করতে প্রবৃত্ত হলেন।

ঘণ্টা দুই পরে হোটেলে ফিরে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর মোটেরের শব্দ পেয়েই হোটেলের মালিক বসাক মশাই বেরিয়ে এসে বললেন, "আসুন। আপনার খাবার তৈরি করিয়েছিলাম, কিন্তু এখানে আপনার খাওয়া হবে না। আপনি বাড়ি যান। একজন ভদ্রমহিলা এসে আপনার ঘর খুলে আপনার জিনিসপত্র নিয়ে গেছেন। আপনার জন্যে যে পোলাও মাংস করিয়েছিলাম তা-ও নিয়ে গেছেন। আমি দাম নিতে চাইনি, তবু তিনি দশটা টাকা জোর করে দিয়ে গেলেন আমাকে। আপনার সঙ্গে আমার টাকার সম্পর্ক নয়, সে কথা বারবার বললাম, কিন্তু কিনি শুনলেন না।"

"ভদ্রমহিলা আবার কে এল ?"

"মনে হল আপনার স্ত্রী।"

"স্ত্রী ? স্ত্রী তো আমার নেই—"

"ও, তা হলে অন্য কোন আত্মীয়া হবেন। আপনার খুব পরিচিত বলে মনে হল। আপনি আপনার ঘরে যে তালা লাগিয়ে গিয়েছিলেন, সে তালার চাবিও ছিল তাঁর চাবির রিং-এ। তাঁর ভাব-ভঙ্গি দেখে আমিও আর কিছু বলতে সাহস করলাম না।"

"আচ্ছা—"

বসাক মশাই নবাগত রেফিউজি। এসেই অসুখে পড়েছিলেন। ঘোষাল বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে তাঁকে ভাল করেছেন। ঝিনুকের খবরটা তাঁর কানে যায়নি তখনও।

ডাক্তার ঘোষাল মোটরে উঠতে যাচ্ছিলেন, বসাক মশাই এগিয়ে এসে বললেন, "এ টাকাটা ফেরত নিয়ে যান, ডাক্তারবাবু।"

"আমি তো টাকা দিইনি। যে দিয়েচে তাকে ফেরত দেবেন। মনে হচ্ছে রাঁধুনি ছুটি থেকে ফিরেছে।"

"ও—"

মোটর ঘুরিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার ঘোষাল।

ঝিনুক রান্নাঘরে ছিল।

মোটরের শব্দ শুনে বেরিয়ে এল। এমনভাবে এল যেন কিছুই হয়নি।

"কাউ কোথা, তাকে দেখছি না !"

"তাকে দূর করে দিয়েছি। ওরকম বেয়াদব লোকের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা যায় না। ওর ভাব-ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, ওর যেন একটা আক্রোশ আছে আমার উপর, he is nursing a grudge against me."

ঝিনুক শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "আক্রোশ থাকাটাই স্বাভাবিক। এ আক্রোশ যাতে ওর মন থেকে মুছে যায়, আমাদের সেই চেষ্টাই করতে হবে।"

"চেষ্টা কি কম করেছি? I have left no stone unturned; সব রকম করা হয়েছে। জলের মতো অর্থব্যয় করে ওকে ফাঁসি থেকে বাঁচিয়েছি। বারবার ওর চাকরি করে দিয়েছি, ওর ভরণপোষণের সব ভার নিয়েছি। তুমি ওর মাথায় কালীপুজোর হুজুক ঢুকিয়ে দিয়ে সরে পড়লে, তারও সব খরচ আমি দিয়েছি। শ' দুই টাকা লম্বা হয়ে গেছে। আর কি করতে পারি বল! What can I do?"

"আসল জিনিসটাই করেননি। ওকে ভালবাসতে হবে।"

"শূয়োরের বাচ্চাকে ভালবাসা যায় না। I cannot love a pig—আমিও শূয়োর, আমাকেও কেউ ভাল বাসেনি। আমি জীবনে যা সুখসুবিধা ভোগ করেছি, তা আমাকে নগদ পয়সা দিয়ে কিনে ভোগ করতে হয়েছে; I had to pay for everything I enjoyed, I had to fight for every inch of ground I won—আমাকে ভালবেসে কেউ কিছু দেয়নি। দেবে সে আশাও করি না।"

ডাক্তার ঘোষাল চক্ষু বিস্ফারিত করে ঈষৎ ব্যায়ত আননে চেয়ে রইলেন ঝিনুকের দিকে। তাঁর থুতনিটা ঈষৎ কেঁপে উঠল।

"ওসব কথা এখন থাক। রান্না হয়ে গেছে। এখন স্নান করে খেতে বসুন।"

"তুমি কলকাতায় এতদিন কোথায় ছিলে? কি করছিলে?"

"সব বলব, খাওয়া-দাওয়া চুকুক আগে।"

"তোমরা সবাই স্বার্থপর পশু। সবাই নিজের নিজের ধান্দাতে ঘুরছ। আমার দিকে চাইবার অবসর কারও নেই।"

ঝিনুক এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে মৃদু হেসে ভিতরে চলে গেল।

॥ ২১ ॥

মিস্টার সেন অকূলপাথারে হাবুডুবু খেতে লাগলেন শেষ পর্যন্ত। এ যুগের তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারেই তিনি এ যুগের সাধনার আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু গোড়াতেই ভুল ছিল। লোল-জিহ্বা কামনা-রাক্ষসীকে তিনি ভুল করেছিলেন দেবতা বলে। বিপদে পড়তে হল সুতরাং। কামনারাক্ষসীর পূজাতে যে পঞ্চ-মকারের প্রাচুর্য তার সঙ্গে তন্ত্রসাধনার পঞ্চ-মকারের আপাতদৃষ্টিতে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও আসলে দুটো ম-কারের আকাশ-পাতাল তফাৎ। একটা ম-কার সাধককে অনন্ত আনন্দলোকে নিয়ে যায়, আর একটা তাকে টেনে নিয়ে যায় রসাতলে।

এই রসাতলের অন্ধকারেই দিশাহারা হয়ে ঘুরছিলেন মিস্টার সেন। পাপের পথে ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে মানুষ শেষ পর্যন্ত যে রসাতলে পৌঁছে যায়, সে রসাতলের অন্ধকার বড় দুঃসহ, বড় নির্মম, বড় ভয়ঙ্কর। সেখানে শুধু অন্ধকারই থাকে না, প্রতি

পদক্ষেপে সেখানে যে তীক্ষ্ণ কণ্টক, যে বিষাক্ত বৃশ্চিক দংশন করতে উদ্যত হয়, তা সত্যিই ভয়াবহ। এদের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই, কারণ এসব কণ্টকজ্বালা নিজের পাপেরই জ্বালা' এসব দংশন, নিজের বিবেকেরই দংশন।

তনিমা চলে যাওয়ার পর থেকেই মিস্টার সেনের বিপদের শুরু হয়েছে। প্রথমে তিনি সন্দেহ করেছিলেন তনিমার অন্তর্ধানের সঙ্গে ডাক্তার মুখার্জির যোগাযোগ আছে। তাঁর নামে মকদ্দমা করবার জন্যেও প্রস্তুত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর উকিল তাঁকে বললেন, "এ মকদ্দমা টিকবে না। ডাক্তার মুখার্জির বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। যে প্রমাণ আছে, তার থেকে বরং এই কথাই মনে হয় যে, তিনি নির্দোষ এবং আপনার মেয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী। প্রথমত, আপনার মেয়ে চলন্ত ট্রেনে হঠাৎ তাঁর কামরায় উঠেছিল, এটা অনেকেই দেখেছে। আগে থাকতে যে যোগসাজস ছিল এর কোনও প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়তঃ, ঘোঘা স্টেশনে নেমে ড্রাইভার সুবেদার খাঁকে তিনি বলেছেন যে, সাবোরে আপনাকে দেখতে পাননি বলে তনিমাকে সেখানে নামিয়ে দিতে পারেননি, কাল সকালে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। তৃতীয়ত, তাকে সঙ্গে করে উনি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোয় গিয়েছিলেন এবং সব কথা তাঁকে খুলে বলেছিলেন। কুমতলব থাকলে এসব তিনি করতেন না। সব কথা শোনবার পর পুলিস-প্রোটেকশন দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কলকাতায় তনিমাকে যে বাসায় পাঠিয়েছিলেন, তা ডাক্তার মুখার্জির একজন বন্ধুর বাসা বটে, কিন্তু তনিমা সেখানে যাবার পর যে ডাক্তার মুখার্জি একবারও সেখানে গেছেন এর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ঘোঘার মাঠে উনি সজারু দেখতে গিয়েছিলেন। আপনার মেয়ে ওঁর সঙ্গে ছিল বটে, কিন্তু ওঁর চাকর দুর্গাও সর্বক্ষণ ছিল ওঁর সঙ্গে। সুতরাং মনে হয়, ওঁর নামে মকদ্দমা করলে ওঁর কিছু হবে না। বরং উল্টে উনি যদি আপনার নামে মানহানির মকদ্দমা করেন, আপনি বিপদে পড়ে যাবেন। আপনি বলেছেন, ডাক্তার ঘোষাল তনিমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন, সেই টাকা নিয়ে সে চলে গেছে। সেজন্য মনে হচ্ছে ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে ওর চলে যাওয়ার হয়তো কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে। ডাক্তার ঘোষাল ওকে শুধু শুধু পাঁচ হাজার টাকা দিতে গেলেন কেন? আপনি বলছেন ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা ছিল। কি রকম ঘনিষ্ঠতা? সেটা কতদূর গভীর? জেরার মুখে আদালতে এসব স্বীকার করতে হবে আপনাকে। তনিমাও যে জেরার মুখে কি বলবে তা অনিশ্চিত। কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কেউ বলতে পারে না। তাই আমার মনে হয় চেপে যান, মকদ্দমা করবেন না। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে। আপনার নিজের স্লেট যখন পরিষ্কার নয়, তখন সেটা লুকিয়ে রাখাই ভালো আপাতত।"

অভিজ্ঞ উকিলের এ পরামর্শ শুনেছিলেন মিস্টার সেন। আর একটা কারণেও মকদ্দমা করবার আশা বিসর্জন দিতে হয়েছিল তাঁকে। হাতে টাকা ছিল না। তিনি যা মাইনে পান আর যে স্টাইলে থাকেন, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় না। এ অসামঞ্জস্যের

সামঞ্জস্য-বিধান করত তনিমার উপার্জন। সত্যিই সে রোজগারে মেয়ে ছিল তাঁর। তাঁর নিজের উপার্জনেও বাঁ হাতের খেলা ছিল কিছু কিছু। সুযোগ পেলে ঘুস-ঘাস নিতেন। ডাক্তার ঘোষাল প্রতি মাসেই নানা ছুতোয় কিছু টাকা তাঁকে দিতেন। তাঁর জন্মদিন, তনিমার জন্মদিন, দোল-দুর্গোৎসব এসবে তো দিতেনই, তাস খেলায় মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে হেরে গিয়েও টাকা পাইয়ে দিতেন তাঁকে। ঘুষেরই নামান্তর এসব। তনিমা চলে যাওয়ার পর ঘোষালের বাড়িতে তাসের আড্ডাটা ভেঙে গেছে। স্টেশন-মাস্টার পাণ্ডা সাবধানী চতুর লোক। তনিমার আকস্মিক অন্তর্ধানে বিপদের সম্ভাবনা আছে অনুমান করে আড্ডায় আসাই ছেড়ে দিয়েছেন। সুবেদার খাঁ তাসের আড্ডায় ক্বচিৎ আসতেন। এখন একেবারেই আসেন না। মিস্টার সেন তনিমাকে মাঝে মাঝে তাসের আড্ডায় নিয়ে যেতেন এবং যেদিনই নিয়ে যেতেন সেদিনই তনিমা খেলায় জিতে বেশ কিছু রোজগার করত। মিস্টার সেনের ধারণা, তনিমাই ছিল তাসের আড্ডার প্রাণস্বরূপিণী। সে চলে যাওয়াতেই আড্ডাটা মরে গেল। তনিমার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গিয়েছিলেন তার কলকাতার বাসায়। কিন্তু তনিমা কিছুতেই ফিরে এল না। ঘরে খিল বন্ধ করে বসে রইল, দেখাই করল না তাঁর সঙ্গে। বেশী ছুটি নিয়ে যাননি, তাই ফিরে আসতে হয়েছিল তাঁকে। ভেবেছিলেন আরও কিছুদিন পরে আবার একবার যাবেন, তখন ওর রাগটাও পড়বে, হাতের টাকাও ফুরিয়ে আসবে। কিন্তু কিছুদিন পরে গিয়ে দেখলেন, ঘরে তালা বন্ধ। পাড়ার লোকে বললে, প্রায় পনরো দিন বাড়িটা খালি পড়ে আছে। তনিমার খবর কেউ দিতে পারলে না। ফিরে এসেই তিনি গিয়েছিলেন ডাক্তার মুখার্জির কাছে। তিনিও বললেন, তিনি তনিমার কোন খবর জানেন না। সে তাকে কোনও চিঠি লেখেনি, তিনিও লেখেননি। তনিমা সেখানে নেই শুনে বিস্মিত হলেন। বললেন, ওটা তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি, খালি পড়ে ছিল বলে তনিমাকে সেখানে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর আর কোন খবর নেওয়া দরকার মনে করেননি। তিনি মিস্টার সেনকে বললেন পুলিসে খবর দিতে। এ-ও বললেন যে তনিমা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল, তিনি অনেক বুঝিয়ে তার কাছে থেকে সায়ানাইডের শিশিটা নিয়ে নিয়েছিলেন। তনিমা অন্তঃসত্ত্বা এ খবরটাও তিনি জানতেন, কিন্তু সেটা মিস্টার সেনকে খুলে বলা প্রয়োজন মনে করলেন না। কেবল বললেন ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝেছিলাম ও ঠিক সুস্থ নয়। শরীর মন কিছুই ওর ভাল বলে মনে হয়নি। তাই ওকে আমার এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম। চিঠিও দিয়েছিলাম একটা তার নামে। ঠিকানাটা আপনাকে দিচ্ছি। আপনিও সেখানে খোঁজ করে দেখতে পারেন।'

মিস্টার সেন গিয়েছিলেন সে-ডাক্তারের কাছেও। তিনি বললেন 'আপনার মেয়ের **incomplete abortion** হয়ে খুব **bleeding** হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে এনে অপারেশন করে অনেক কষ্টে বাঁচিয়েছিলাম। কিন্তু একটু ভালো হয়েই দিন কতক আগে কাউকে কিছু না বলে হাসপাতাল থেকে চলে গেছেন তিনি। তাঁর বাড়ির ঠিকানায়

ফিরে যাননি। আমরা এখানকার থানায় একটা ডায়েরি করিয়ে দিয়েছি। আজই ভাবছিলাম ডাক্তার মুখার্জিকেও খবরটা দেব। আপনিই তা হলে খবরটা দিয়ে দেবেন তাঁকে। আপনাকে আমাদের হাসপাতালের ফর্মে একটা রিপোর্ট দিয়ে দিচ্ছি।"

রিপোর্ট দেখে চমকে উঠেছিলেন মিঃ সেন।

"মিসেস এস. মুখার্জি কে ?

"ওই নামেই তো তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন।" ভ্রূকুঞ্চিত করে চুপ করে রইলেন মিস্টার সেন। তাঁর উকিল তাঁর মন থেকে যে সন্দেহটা ঘোচাবার চেষ্টা করেছিলেন সেইটেই আবার ছায়াপাত করল তাঁর মনে। কিন্তু তিনি ডাক্তারকে কিছু বললেন না। রিপোর্টটা নিয়ে ফিরে এলেন। শুধু রিপোর্টটা নয়, আর একটা খবরও নিয়ে এলেন। ডাক্তার কথা প্রসঙ্গে তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, যেদিন তনিমা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে সেদিন যে মেয়েটি তাঁকে ডাকতে গিয়েছিল তার নাম ঝিনুক। তনিমার কাছ থেকেই নামটা জেনেছিলেন তিনি। কিন্তু পরে আর ঝিনুককে দেখতে পাননি।

মিস্টার সেন ফিরে এসে ডাক্তারের রিপোর্টটি নিয়ে একবার তাঁর উকিলের সঙ্গে দেখা করলেন। উকিল বললেন, "ওই এস. মুখার্জি থেকে কিছু প্রমাণ হয় না। এস দিয়ে সুরেন, সুধাংশু, সুধীর, সুকুমার, সুশীল, সুশোভন, এবং আরও অনেক নাম হ'তে পারে। এস. মুখার্জি যে সুঠাম মুখার্জি এ কথা আদালতকে বোঝাতে হলে অন্য প্রমাণও চাই। তা ছাড়া, আপনার মেয়ে যে নিজের মিথ্যে পরিচয় দিয়ে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচতে চায়নি তাই বা আপনি কি করে জানলেন ? সুঠাম মুখুজ্যের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই, তিনি শহরের কারও সঙ্গেই বড় মেশেন না একটা, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে এ ধরণের কোনও দুর্নাম কখনও শুনিনি। খামখেয়ালী বলে তাঁর একটা বদনাম আছে ; মহৎ লোকেরা অনেক সময় খামখেয়ালী হন, কিন্তু উনি যে ভালো লোক এ খবরও পেয়েছি অনেকের কাছে। সেদিন দেখলাম এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবই ওঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সুতরাং ওঁর নামে মকদ্দমা করে আপনি সুবিধা করতে পারবেন না। আপনি বরং ডাক্তার ঘোষালের উপর আপনার টর্চটা ফেলুন। লোকটার চাল-চলন ধরন-ধারণ একটু আমিষ-গন্ধী, ইংরেজীতে যাকে বলে fishy, যে ঝিনুকের নাম করলেন সে-ও ওর বাড়িতেই থাকে, in what capacity I dont know : আপনি ওই অঞ্চলেই খোঁজ নিন, কিছু হদিস হয়তো পাবেন।"

মিস্টার সেন তাঁর উকিলের উপর চটলেন, কিন্তু তাঁর উপদেশ অমান্য করতে সাহস করলেন না। উকিলটির দক্ষতার ও আইন-জ্ঞানের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। ডাক্তার ঘোষালকেও ঘাঁটাতে সাহস হল না তাঁর। ডাক্তার ঘোষাল যে তনিমাকে সরিয়েছে এ কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না তিনি। এ কথা বিশ্বাস করতে হ'লে এতদিন তিনি মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে যে জ্ঞান আহরণ করেছেন সেইটেকেই অস্বীকার করতে হয়। তিনিও জীবনে অনেকরকম মানুষ চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন। তাঁর

অভিজ্ঞতাও কম নয়। ডাক্তার ঘোষালের মতো লোক তিনি বেশী দেখেননি। লোকটি বয়স্ক কিন্তু শিশুপ্রকৃতির। লোভী খুব, কিন্তু মোহ নেই। অর্থ, মেয়েমানুষ, খাবার, মদ সবই তিনি সাগ্রহে ভোগ করতে চান, কিন্তু ওর কোনটাই তাঁকে আসক্তির বন্ধনে বাঁধতে পারেনি। বিষয়ে যদি ওঁর আসক্তি থাকত তা হ'লে তিনি ওঁর হাত দিয়ে এত টাকা রোজগার করতে পারতেন না। ঝিনুক, শামুক আর তার কাকাকে উনি যেভাবে উদ্ধার করে এনেছিলেন (গল্পটা শামুকের মুখে শুনেছেন তিনি, ঘোষাল নিজের কৃতিত্বের কথা কারও কাছে বলেননি) তা বিস্ময়কর। সাধারণ স্বার্থপর লোক এসব ঝুঁকি ঘাড়ে নিত না। এখানেও নানারকম বে-আইনী সুযোগ সুবিধা তিনি তাঁর কাছে নিয়েছেন, কিন্তু তার অধিকাংশই গরীব রেফিউজিদের জন্য। নিজের জন্য বিশেষ কিছু নেননি। যতটা নিয়েছেন তার বহুগুণ ফিরিয়ে দিয়েছেন নানাভাবে। তা ছাড়া, তনিমাকে সরিয়ে ওঁর লাভই বা কি হয়েছে? বরং তাঁর মুখের গ্রাস সরে গেছে ব'লে রাগ হওয়ারই কথা। কিন্তু ঝিনুক মেয়েটিকে মিস্টার সেন বরাবরই একটু সন্দেহের চক্ষে দেখেন। মেয়েটির যেমন চোখ-ধাঁধানো রূপ, তেমনি ক্ষুরধার বুদ্ধি। ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির সে-ই সর্বময়ী কর্ত্রী। ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা কত গভীর তা অনুমানসাপেক্ষ হ'লেও খুব অস্পষ্ট নয়। তাঁর বিশ্বাস তনিমার সঙ্গে ডাক্তার ঘোষালের ঘনিষ্ঠতা ঝিনুক ভালো চক্ষে দেখেনি। ঝিনুকই সম্ভবত কোনরকম কল-কাঠি নেড়ে তনিমাকে সরিয়ে দিয়েছে এ কথা আগেও একবার মিস্টার সেনের মনে হয়েছিল। ঝিনুক তনিমার বাসায় গিয়েছিল এ সংবাদে সন্দেহটা দৃঢ় হ'ল। কিন্তু এ সন্দেহ নিরসনের উপায় কি? তাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করা বৃথা। তার বোন শামুক মেয়েটি আরও চতুর। সে আশ্চর্যভাবে তার সঙ্গে প্রেমাভিনয় করত, নানা কৌশলে টাকাও আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু তবু তাঁর অবস্থা গ্রীক পৌরাণিক উপাখ্যানের ট্যান্‌টালাসের মতো। জলে আবক্ষ নিমজ্জিত ট্যান্‌টালাসের মতো তাঁরও তৃষ্ণা মেটেনি। পান করতে গেলেই জল সরে গেছে। শামুক তার দিদির মতো রূপসী নয়, রং শ্যামবর্ণ, কিন্তু তার চোখেমুখে ভাবে-ভঙ্গীতে এমন একটা প্রচ্ছন্ন রূপ আছে যা প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। কিছুদিন আগে শামুককে তিনি খোলাখুলিই বলেছিলেন, এমনভাবে থাকা যায় না। তোমার যদি আপত্তি থাকে তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারি। আমার স্ত্রী অসুস্থ: ডিভোর্স করা অসম্ভব হবে না। উত্তরে শামুক যা বলেছিল তাতে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলেন তিনি। বলেছিল, আপনি বৈদ্য না কায়স্থ, মুচি না মেথর, তা আমি জানি না। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে তা আমি জানি। আর কিছু বলেনি। এ কথা বলার পর থেকে সে যেন আরও নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল, একা কখনও তাঁর কাছাকাছি আসত না। মিস্টার সেন মনে মনে জ্বলছিলেন, ছটফট করছিলেন, এক কথায় ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন; কিন্তু তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন যখন শামুকও একদিন অন্তর্ধান করল। শামুকের বাড়িতে লোক পাঠিয়ে জানলেন, বাড়িতেও সে নেই। তার বাড়িতে তখন কেউ ছিল না, যতীশবাবু বাইরে গিয়েছিলেন।

শামুকের ভাইপো স্কুল-বোর্ডিং-এ থাকত। সেখানে খবর নিয়ে জানলেন, দু'দিন আগে তাকেও বোর্ডিং থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে শামুক। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন মিস্টার সেন। তাঁর মৈথিল্ চাপরাসী রান্নার ভার নিলেন বটে, কিন্তু তাঁর পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্ত্রী ? তার সেবা কে করবে ? হাসপাতালের নার্স রাখতে গেলে দৈনিক অন্তত দশ টাকা খরচ। তা-ও তারা সব সময় থাকবে না। ছুটি পাবে না। শামুকের উপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি। কি করবেন এখন ? পরামর্শ করবার জন্য গেলেন ডাক্তার ঘোষালের কাছে।

ডাক্তার ঘোষালের কাছে গিয়ে তিনি যেন অকূলে কূল পেলেন। ঝিনুকের দেখা পেয়ে গেলেন। শুনলেন ডাক্তার ঘোষাল নেই, তিনি কলে বেরিয়ে গেছেন।

"আপনি কবে কলকাতা থেকে ফিরলেন ?"

"আজই সকালে ফিরেছি।"

"আমি যে বিপদে পড়েছি তা জানেন নিশ্চয়।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ঝিনুক তাঁর মুখের দিকে, যেন কিছুই জানে না।

"তনিমা তো আগেই চলে গেছে, আজ শামুকও আসেনি। সে বাড়িতেও নেই। তোমার কাকাও নেই বাড়িতে। শুনলাম শামুক স্কুল থেকে সোনারও নাম কাটিয়ে তাকেও নিয়ে গেছে। কি যে ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না।"

তিনি তাঁর অবস্থাটাকে লঘু করবার চেষ্টা করলেন তাঁর সেই হেঁচকি-কুলকুচো হাসি হেসে।

ঝিনুকের মুখ পাথরের মতো ভাবলেশহীন।

"তুমি কোনও খবর জান ?"

"আমি এখনও বাড়ী যাইনি। ওদের কোন খবর আমি জানি না।"

"তনিমার কোনও খবর—?"

"তনিমা যেদিন খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে আমি সেদিন তার বাসায় গিয়েছিলাম তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। হেমারেজ হয়ে সে যখন খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়ল তখন আমিই ডাক্তার ডেকে তাকে নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দি। তারপর আর কোনও খবর জানি না। কারণ তারপর দিনই আমাকে কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল।"

"তনিমা নার্সিং হোম থেকেও পালিয়েছে"

ঝিনুক চুপ করে রইল।

"এখন কি করি বলুন তো ? আমার স্ত্রীর ব্যবস্থা কি করে হবে ?"

"আপনি হাসপাতালে খবর দিন, সেখানে কোনও নার্স পেতে পারেন। রেফিউজি কলোনীতে আমার একটি চেনা মেয়ে আছে, সে নার্সের কাজ জানে, আমি বললে সে আসবে। কিন্তু তার সঙ্গে ভদ্রব্যবহারের একটা গ্যারান্টি দিতে হবে। এক জায়গায় নার্সিং করতে গিয়ে সে অপমানিত হয়ে ফিরেছে—"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, গ্যারান্টি দেব বইকি। আপনি তাহলে সে-ই ব্যবস্থাই করুন।"

"আচ্ছা। আজ খবর দেব তাকে।"

মিস্টার সেন তবু দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, "আপনি যেতে পারেন কি? একশ' টাকা করে মাইনে দেব। শামুককেও তাই দিতাম।"

"ডাক্তার ঘোষালকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।"

"আমি যদি ডাক্তার ঘোষালকে বলি—

"না, তিনি রাজী হলেও আমি যাব না।"

মিস্টার সেন কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে শেষে বললেন, "আচ্ছা, তাহলে চলি এখন। ডাক্তার ঘোষালকে আমার কথা বলবেন—"

মিস্টার সেন বাড়ি ফিরে এসে একখানি চিঠি পেলেন। শামুকের চিঠি।

সবিনয় নিবেদন,

আমি চলে এসেছি। কেন এসেছি তা আপনি জানেন। রাজনীতির কুটিল চক্রান্তে পড়ে আমরা গৃহহীন, সর্বস্বান্ত হয়েছি, আত্মীয়-স্বজন সব হারিয়েছি। বেড়াজালে যেমন মাছ ধরে তেমনি করে আমাদের ধরে এনে যে সব খাল বিল নালা পুষ্করিণীতে দয়ার অবতার কর্তৃপক্ষেরা ছেড়ে দিয়েছেন, সেখানেও হয়তো আমরা কোন রকমে টিকে থাকতে পারতাম কিন্তু আপনাদের মত হাঙ্গর-কুমীরের উপদ্রবের জ্বালায় তা-ও আর সম্ভবপর হল না। আপনি শুনেছি আমাদের দেশের লোক, কিন্তু আপনার সরকারী মুখোশের আড়ালে যে মূর্তি দেখলাম তা ভয়ঙ্কর। আশ্চর্য, দাঙ্গার সময় যে গুণ্ডারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছিল তাদের সঙ্গে আপনাদের কোনও তফাত দেখতে পেলাম না শেষ পর্যন্ত। গুণ্ডাদের মুখোস ছিল না, আপনাদের আছে, এইটুকুই যা তফাত। আপনি হয়তো ভেবেছিলেন যেহেতু আমরা অসহায় এবং সর্বতোভাবে আপনার কৃপার অধীন তাই আমাদের মনুষ্যত্ব নেই, আমরা আপনার পশু-প্রবৃত্তির কাছে আত্মবিসর্জন করে কৃতার্থ হয়ে যাব। শুনেছি আমাদের দেশের অনেক মেয়ে এ রকম আত্মবিসর্জন করেওছে। আশ্চর্য নয়, প্রবল বানের সময় অনেক কাঁচা মাটির বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে। আপনি আমাকেও সেই ধরনের বাঁধ ভেবেছিলেন বোধ হয়। আপনি আমাদের বংশ পরিচয় জানতেন না, তাই মনে হয় আমাকে প্রলুব্ধ করবার সাহস আপনার হয়েছিল। হেলে সাপ ধরতে অভ্যস্ত, কেউটে চিনতে পারেন নি। আমি গিরিশ বিদ্যার্ণবের মেয়ে। আমার পিতামহী, মাতামহী দুজনেই স্বেচ্ছায় সতী হয়েছিলেন। চরিত্রবান শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতদের বংশে আমরা জন্মেছি। আপনি না জেনে আগুনে হাত দিয়েছিলেন। আগুনকে নিবিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু অপবিত্র করা যায় না। তবে আপনার বাড়ীতে গিয়ে আমার একটা পরম লাভ হয়েছে, আপনার স্ত্রীকে সেবা করবার সুযোগ আমি পেয়েছি। তিনি সতীলক্ষ্মী দেবী, আপনার পাপেই তিনি আজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছি, তাই আমার অক্ষয় কবচ, তাই আমাকে নির্ভয় করেছে। আপনার বাড়িতে থেকে আমার দ্বিতীয় লাভ আপনার মেয়ে তনিমা।

তাকেও আপনি নষ্ট করেছেন। সে ওই পঙ্ককুণ্ড থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে তার উজ্জ্বল তীক্ষ্ণবুদ্ধি আছে বলে। তার দেহ কলঙ্কিত হয়েছে, মন হয় নি। তাই সে বেঁচে গেছে। পাপকে পাপ বলে চিনতে পারার ক্ষমতা তার ছিল বলেই সে পালিয়ে গেছে আপনার কবল থেকে। আর তারই সহায়তায় আমিও আজ নিরাপদে আপনার এলাকা পার হ'য়ে চলে আসতে পেরেছি। আপনি যখন এ চিঠি পাবেন তখন আমি অনেক দূরে। আপনি বা আপনার সরকার আর আমাকে আপনাদের লংগরখানায় পুরতে পারবেন না।

আপনার মেয়ে তনিমার সম্বন্ধে আপনি হয়তো নানারকম ভাবছেন তাই আপনাকে খবরটা জানিয়ে দিলাম, সে ভালো আছে। এর বেশী আর কিছু জানাব না। কারণ সে এখন কোথায় তা আমিও ঠিক জানি না। আপনাকে চিঠি লেখবার আর একটা কারণও আছে। গত দশ মাস আপনার কাছে আমি বেতন নিই নি। বকশিশের ছুতো করে মাঝে মাঝে আপনি আমাকে টাকা দিয়েছেন বটে আমার সর্বনাশ করবার উদ্দেশে। কিন্তু সেটা মাইনে নয়। টাকা দিয়ে আমাকে কেনাও যায় না। আমাকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন বলেও টাকাটা আপনার জরিমানা হওয়া উচিত। কিন্তু আপনার টাকা আমি নেব না। আপনি সবসুদ্ধ দু'শ টাকা দিয়েছেন আমাকে। আমার মাইনে থেকে সে টাকাটা কেটে রেখে বাকী আটশ' টাকা আমার দিদি ঝিনুককে দিয়ে দেবেন। ইতি— শামুক

চিঠিটা পড়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন মিস্টার সেন।

কান্নার শব্দ শুনে তাঁর চমক ভাঙল। বারান্দায় বেরিয়ে দেখলেন যতীশবাবু বেঞ্চের উপর বসে হু হু করে কাঁদছেন। মিস্টার সেনকে দেখে তাঁর কান্না আরও বেড়ে গেল।

"আমার কি গতি হবে হুজুর। মেয়ে দুটো আমাকে ফেলে চলে গেছে। ডাক্তার ঘোষালের কাছে গিয়েছিলাম তিনি আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিলেন। আপনি হাকিম তাই আপনার কাছে এসেছি, আমি কি করব তা বলে দিন।"

মিস্টার সেন তার কপালের ক্ষতচিহ্ন তার কাপড় জামায় রক্ত দেখে বিব্রত হয়ে পড়লেন। তারপরে চটে গেলেন হঠাৎ।

"এখানে আপনি এসেছেন কেন, আমি ডাক্তারও নই, দারোগাও নই। আমি কি করব।"

"আপনি হুজুর হাকিম, আমাদের মতো অভাগাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। যা করবার আপনিই করুন, আমি আর কোথাও যাব না। আমি আর হাঁটতেও পারছি না, কাল থেকে খাইনি।"

"খাননি কেন? আপনাদের বাসায় তো একটা রাঁধুনি আছে শুনেছিলাম।"

"সে যা রাঁধে, তা আর খাওয়া যায় না। ওর রান্না খেয়েই শরীরটা আমার ভেঙে গেল।"

আর একবার হু হু করে কেঁদে চোখের জল মুছলেন। তারপর বললেন, "তাছাডা আমার হাতে নগদ পয়সাও নেই, তরি-তরকারি কেনা হয়নি। শুধু আধসিদ্ধ ডাল ভাত কি খাব। ঝিনুকই রোজ বাজার খরচের পয়সা দিয়ে যেত; কিন্তু সে এখনও ফেরেনি।"

"সে ফিরেছে আপনি তার কাছেই যান।"

এ সংবাদে যতীশবাবু খুব প্রফুল্ল হলেন না। তিনি যা চান—নগদ কিছু টাকা—তা ঝিনুকের কাছে পাওয়া যাবে না। খাওয়া-দাওয়ার কথা যা তিনি বললেন, তা মিথ্যে। রাঁধুনীটি ভালই রাঁধে, দৈনন্দিন বাজার খরচের টাকাও ঝিনুক তাকে দিয়ে গিয়েছিল। ঝিনুক-শামুকের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে যতীশ ঘোষালের কাছে গিয়েছিলেন মোচড দিয়ে যদি কিছু আদায় করতে পারেন। কিন্তু সেখানে সুবিধা হ'ল না, তাই তিনি এসেছিলেন মিস্টার সেনের কাছে। অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্য, তাঁর দুই ভাই-ঝির দুই প্রণয়ীর কাছ থেকে নেপথ্যে কিছু টাকা আদায় করে নেওয়া। মিস্টার সেনের কথা শুনে তিনি বললেন, "শামুককে আপনার কাছে দিয়েছিলাম, আপনি তাকে রাখতে পারলেন না। সে কোথায় গেল সে ঠিকানাটাও অন্তত আমাকে বলে দিন। আমি ওকে নিয়েই দেশে চলে যাই। সেখানেই দুঃখ-ধান্দা করে থাকব কোনরকমে। এখানে নানা অসুবিধা। শামুক কোথায় গেছে ?"

"শামুক পালিয়ে গেছে। কোথা গেছে তা জানি না।"

"পালিয়ে গেছে ? জোয়ান মেয়েকে আপনার কাছে দিলাম, আপনি এখন বলছেন পালিয়ে গেছে ? এ কথা কি আপনার মুখে শোভা পাচ্ছে ?"

খেঁকিয়ে উঠলেন মিস্টার সেন।

শোভা না পেলেও ওই হচ্ছে সত্যিকথা। আপনার ভাইঝিটি মানুষ নয়, শয়তান।"

"ও কত বড় বংশের মেয়ে তা জানেন ?"

"তা জানবার আমার দরকার নেই। ও নিমকহারাম, পাজি, আমার সঙ্গে ছোট-লোকের মতো ব্যবহার করে গেছে—এইটুকু জানি—"

কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন যতীশবাবু।

তারপর বললেন, "ও যখন পালিয়ে গেছে তখন ওর প্রাপ্য বেতন নিশ্চয় নিয়ে যায়নি। সে টাকাটা আমাকে তাহলে দিয়ে দিন, আমি তাকে খুঁজবার চেষ্টা করি।"

"মাইনে ছাড়া অনেক বেশী টাকা নিয়ে গেছে সে।

"তবু আমাকে কিছু দিন, তাকে খুঁজে বার করতে হবে তো।"

"আমি আর কিছু দেব না।"

"তাহলে আমি কি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ওখানে যাব ? এর একটা ব্যবস্থা করা তো দরকার।"

"যেখানে খুশি যান।"

ঘরে ঢুকে দড়াম করে কপাটটা বন্ধ করে দিলেন মিস্টার সেন।

মিস্টার সেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যতীশবাবু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোয় যাওয়ার সাহস হচ্ছিল না তাঁর। শুনেছিলেন লোকটি কড়া। বাড়িতে বদমেজাজী একটা বুলটেরিয়র কুকুরও নাকি আছে। তাছাড়া ঝিনুক বা শামুক সম্বন্ধে খুব একটা দুশ্চিন্তাও তাঁর হয়নি। তাঁর আসল লক্ষ্য টাকা। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে সে লক্ষ্য ভেদ করতে পারবেন এ ভরসা তাঁর ছিল না। তিনি মিস্টার সেনকে একটু ভয় দেখিয়েছিলেন মাত্র। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রাস্তায় ঘুরছিলেন।

"আরে যতীশবাবু নাকি! ও কি, মাথায় চোট্ লাগল কোথা?"

যতীশবাবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন একটা খোলার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কাউ তাঁকে ডাকছে। একটা নোংরা বস্তির মধ্যে খোলার ঘরটা। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে কোন গলি দিয়ে যে এখানে এসে পেঁছিলেন, তা খেয়াল ছিল না। যতীশবাবু ঘরে ঢুকে দেখলেন; সেটা একটা হোটেল। একটা নোংরা ঘরের মধ্যে দুধারে দুটো টেবিল আর টিনের চেয়ার কয়েকটা। একটাতে বসে একটা ভীষণদর্শন মজুর রুটি খাচ্ছে। টেবিলের উপর ইতস্তত চায়ের কাপ পড়ে রয়েছে কয়েকটা। মাছি ভন্‌ভন্ করছে।

যতীশবাবু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—"আরে, তুমি! তুমি এখানে কি করছ! তুমি ডাক্তার ঘোষালের বাড়িতে ছিলে না?"

"ছিলাম। কিন্তু ওই পিশাচের কাছে কেউ বেশী দিন থাকতে পারে না—"

"ঠিক বলেছ, ও পিশাচই। ওদের চক্রান্তে আমার ভাইঝি দুটো কোথায় উধাও হয়েছে। আজ খোঁজ নেবার জন্যে ডাক্তার ঘোষালের কাছে গিয়েছিলাম, আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিলে। পড়ে গিয়ে কপালটা কেটে গেল।"

যে ভীষণ-দর্শন লোকটা খাচ্ছিল, সে হো হো করে হেসে উঠল। মনে হ'ল একটা ঘোড়া ডেকে উঠল যেন। হলদে হলদে দাঁত বের করে সে বললে, "সব পিশাচ মশাই। এ পিশাচের দেশ। ভালো লোক পাবেন কোথা! এদের শাসন করা দরকার। হবে, হবে, সময়ে সব হবে।"

লোকটা যে বাঙালী, তা যতীশবাবু বুঝতে পারেননি। কথার টান থেকে মনে হ'ল পূর্ববঙ্গের। কাউয়ের চোখ দুটোও দপদপ করছিল।

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সে জিজ্ঞাসা করল, "মাসীমা নেই ওখানে?"

"না।" শুনেছি কলকাতা গেছে। শামুকও কোথায় পালিয়েছে। ওরা আমার সর্বনাশ করে দিয়েছে। ঘরে খাবার পর্যন্ত নেই। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি—"

যতীশ দেশে থিয়েটারে ভালো অভিনয় করতেন। বেশ নাটকীয়ভাবে গলাটা কাঁপাতে পারলেন।

"এখানেই থাকুন স্যার, যত অভাগাদের এইখানেই আড্ডা।'

সেই ভীষণ-দর্শন লোকটা খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল। কাউকে পয়সা দিয়ে বেরিয়ে গেল। যতীশবাবুকে বলে গেল, "যদি এখানে থাকেন, আবার দেখা হবে।"

কাউ বললে, "এ-হোটেলটা আমার। আপনি এখানেই চলে আসুন।"

"কিন্তু আমার হাতে যে পয়সা নেই ভাই। হোটেল-চার্জ দেব কি করে।"

"একটি পয়সা দিতে হবে না আপনাকে। আপনি মাসীমার কাকা, আমার দাদু। আপনার আশীর্বাদে ভালই চলে যাচ্ছে আমার। মিলের অনেক কুলি-মজুরের সঙ্গে আলাপ আছে আমার, তারা অনেকেই এখানে খায়। রোজগার ভালই হচ্ছে। পয়সার অভাব নেই। আপনাকে খাওয়াতে পারব। আপনি এখানেই চলে আসুন।"

যতীশ জিজ্ঞাসা করল, "যে লোকটি এখন খেয়ে গেল, ও লোকটি কে—"

"ওর নাম রমেশ। ট্রাক চালায়।"

তারপর নিম্নকণ্ঠে বললে, "আসলে একটি বড় গুণ্ডা।"

যতীশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন, "চলে আসব তোমার কাছে?"

"নিশ্চয়।"

যতীশ নাটকীয় কায়দায় আলিঙ্গন করলেন কাউকে।

"এ দেশে আর একদণ্ড থাকবার ইচ্ছে নেই ভাই। কিছু টাকা হাতে পেলেই আমি দেশে ফিরে যাব। সেখানে যদি মৃত্যুও হয়, তাহলেও একটা সান্ত্বনা থাকবে, যে-দেশে জন্মেছিলাম সেই দেশেই মরলাম।"

কাউ বললে, "আপনি এখানে আসুন। আমি যতটা পারি সাহায্য করব। আপনি এলে আমার সুবিধাও হবে একটা। সেবার কালীপুজোতে একটা বিঘ্ন হ'য়ে গিয়েছিল। আর একবার খুব ভালোভাবে কালীপুজো করতে চাই। আপনি বড়বংশের সদ্‌ব্রাহ্মণ, আপনার উপদেশ পেলে আমার অনেক কাজ হবে। আমার দ্বিতীয় আর-একটা উদ্দেশ্যও আছে, তাতে আপনার সাহায্য দরকার।"

"সেটা আবার কি?"

"আমি মাসীমাকে ওই পিশাচটার হাত থেকে উদ্ধার করতে চাই। মাসীমাকে আমি দেবীর মতো ভক্তি করি। তিনি সীতার মতো পবিত্র! ওই রাবণটার হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করতেই হবে। এর জন্যে আমি প্রাণ দিতেও রাজী—"

কাউয়ের গলার স্বরও কেঁপে গেল। কিন্তু সে-কম্পন থিয়েটারী নয়। যতীশবাবু এতখানি প্রত্যাশা করেননি। তাঁর মনে হ'ল—এ আবার কি ব্যাপার। মুখে কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। শুধু অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে।

॥ ২২ ॥

সুঠাম মুখুজ্যে তন্ময় হ'য়ে মঙ্গলার বাছুরটাকে দেখছিলেন। এই তো সেদিন হ'ল, এরই মধ্যে প্রতাপ কি! ল্যাজ তুলে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। মঙ্গলার জন্ম মঙ্গলবার হয়েছিল বলে তার নাম হয়েছিল মঙ্গলা। মঙ্গলার বাছুরও মঙ্গলবারে হ'ল। ডাক্তারবাবু ইংরেজী Tuesday কথাটার সুবিধে নিয়ে ওর নাম রেখেছেন টুসি। টুসী মহানন্দে

ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল মুর্গিগুলোকে ভয় দেখিয়ে। সে কাছে এলেই ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করে ছুটে পালাচ্ছিল তারা। পৃথিবীর সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা নেই, তাই সে অকুতোভয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। অমন যে বাঘের মতো কুকুর রকেট, তার কাছেও নির্ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রকেটও তার সঙ্গে ভাব করবার জন্যে উৎসুক, মুখ নীচু আর ঘাড় লম্বা করে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে যাচ্ছে বারবার, যেন ওর ইচ্ছে ওকে একটা চুমু খায়। টুসিরও আপত্তি নেই এতে বিশেষ। সে-ও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মুখটা। কিন্তু ঘোর আপত্তি মঙ্গলার। রকেট টুসির কাছে এলেই সে দড়ি ছেঁড়াছেড়ি করছে; হাম্বা রবে মুখরিত করে তুলছে চতুর্দিক। টুসির কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই এতে। "শুধু অকারণ পুলকে" ল্যাজ তুলে সানন্দে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে সে। ডাক্তারবাবু স্মিতমুখে বসে উপভোগ করছেন দৃশ্যটা। তাঁরও মুখমণ্ডল থেকে একটা অদ্ভুত প্রসন্নতা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ভুটান তাঁর পায়ের কাছে গুটিসুটি হ'য়ে শুয়ে আছে। এ সব প্রগলভতায় তার এখন তাদৃশ উৎসাহ নেই। কাল সমস্ত রাত ঘুম হয়নি তার। ক্যানাগাছের ঝোপের ভিতর একটা ছুঁচো তাকে সমস্ত রাত জ্বালিয়েছে। সেটার পিছনে ছুটোছুটি করতে হয়েছে অনেকক্ষণ। স্থবির জাম্বুবান আরও উদাসীন। একটু আগে তার পিঠ চুলকোচ্ছিল বলে ধুলোয় গড়িয়েছে খুব। গা-ময় ধুলো মেখে থাবার উপর মুখ রেখে শুয়ে আছে সে বারান্দার উপর।

সেদিন রবিবার ছিল। গণেশ হালদার দরজা খুলে আস্তে আস্তে বেরুলেন। ডাক্তারবাবুর দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। ইচ্ছেটা তাঁর সঙ্গে গিয়ে একটু আলাপ করেন। কিন্তু তিনি নিজে না ডাকলে তাঁর কাছে যাওয়ার সাহস নেই তাঁর। দূরে দাঁড়িয়েই এদিক-ওদিক চাইতে লাগলেন।

ডাক্তারবাবু দেখতে পেয়েই ডাকলেন তাঁকে। "মাস্টার মশাই, মা-বেটির কাণ্ড দেখেছেন! দুজনেই দাপাদাপি করছে, একজন বাঁধা, আর একজন ছাড়া।"

এগিয়ে এলেন গণেশ হালদার।

হেসে বললেন, "একজন স্বাধীনতার আনন্দে ছটফট করছে, আর একজন পরাধীনতার দুঃখে।"

"ঠিক বলেছেন। বসুন। আপনার সেই প্রবন্ধটি পড়েছি। খুব ভালো লেগেছে। যদিও আমার মতের সঙ্গে মেলেনি, কিন্তু আপনার যুক্তি খুব জোরালো, তা মানতেই হবে। আর আপনাদের দিক থেকে ভেবে দেখলে ঠিকই বলেছেন।"

"আপনার মতের সঙ্গে আমার মতের অমিল কোথায়, সেটা জানতে পারলে—"

"আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীই আলাদা। আপনারা মনে করেন, আপনারাই কেবল উদ্বাস্তু এবং উদ্বাস্তু বলে নানারকম সুখসুবিধা দাবি করবার অধিকার একমাত্র আপনাদেরই আছে। কিন্তু আমি জানি, আমিও উদ্বাস্তু, যদিও আমার দেশ পূর্ববঙ্গ, পাঞ্জাব বা সিন্ধু নয়। আমি জানি, যেখানে আমি জন্মেছি, সেখানে কিছুদিন আগে

ছিলাম না। সেখানে আমার সম্মতিক্রমে আমাকে আনা হয়নি। কোন্ অজানা থেকে কেন আমি পৃথিবীতে এসে জন্মালাম তা আমার অজ্ঞাত। কোথায় যাব তা-ও জানি না। কিন্তু এই পৃথিবীতে এসে থেকেই নানারকম দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে। এর জন্যে মানবজাতি সেই অনাদিকাল থেকে হা-হুতাশ করে আসছে নানারকম। এই দুঃখ দূর করবার জন্যে নানারকম ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে, এই দুঃখ নিবারণ করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা লড়ছেন, কবিরা কাব্য লিখছেন, সংস্কারকরা বিধান দিচ্ছেন। রাজনৈতিক নেতারা নূতন নূতন শাসনবিধি প্রবর্তন করছেন। দুঃখ কিন্তু কমছে না। শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত বাড়ি করেছি, কিন্তু তবু শীততাপের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই, কারণ সে-বাড়িতে একনাগাড়ে বসে থাকা যায় না, বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। বাইরে বেরুতেই হয় এবং বেরুলেই চড় খেতে হয় প্রকৃতির হাতে—"

নিজের রসিকতায় হা-হা করে হেসে উঠলেন সুঠাম ডাক্তার।

গণেশ হালদার এরকম উত্তর শুনবেন বলে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি সবিস্ময়ে একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন।

"আপনার মতে তাহলে পৃথিবীসুদ্ধ লোকই উদ্বাস্তু ?"

"হ্যাঁ, আমার মতে তাই। কিন্তু সকলে সেটা মনে করে না। অধিকাংশ লোকই নিজের নিজের দেশের বা গ্রামের বা বাড়ির একটা চৌহদ্দি ঠিক করে বসে আছে এবং তা নিয়ে ক্রমাগত মারামারি করছে। চলতি ভাষায় যা ইতিহাস বলে পরিচিত তা এই মারামারির ইতিহাস। উগ্র স্বাদেশিকতা বা স্বাজাত্যবোধ মানুষকে সুখী করেনি ' ভারতবর্ষের প্রাচীন পুঁথিতে ও দুটো নিয়ে কারো বিশেষ মাথা ব্যথা নেই। আমারও মনে হয়, ওগুলো নিয়ে খুব বেশী মাতামাতি করাটা শোভন নয়।"

"আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক গুরুরাও ওই কথা বলেছেন। আপনিও কি তাই বলছেন ?"

"আত্মার খবর জানি না, তাই নিজেকে আধ্যাত্মিক পথের পথিক বললে ছোটমুখে বড় কথার মতো শুনাবে। পরম ব্রহ্মের খোঁজও আমি করিনি কখনও। তিনি আছেন কি নেই, তা-ও আমার অজানা। তাঁকে জানবার আগ্রহ আমার হয়নি। তৃষ্ণার্ত হ'লে লোকে জলের সন্ধান করে, আমার তৃষ্ণাই জাগেনি, তাই আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতির খোঁজ করিনি। তবে ওসব খোঁজ না করেও আমি বুঝেছি যে পৃথিবীতে আমি প্রবাসী, আপনাদের ভাষায় উদ্বাস্তু। যেখানে আছি, সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চেষ্টা করি, সেখানকার গাছ-পালা, পশু-পক্ষী, আকাশ-বাতাসের খবর নি, এবং তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করবার চেষ্টা করি, কিন্তু প্রায়ই আমাকে ব্যর্থকাম হ'তে হয়। আমি জানি, ওটা উদ্বাস্তুদের প্রাপ্য অনিবার্য দুঃখ। তাই ওটাকে মেনে নিয়েছি।"

"আপনি কিন্তু মানুষের সঙ্গে মেশেন না তো।"

"না, মিশতে পারি না। মানুষ বড় বিচিত্র জীব। নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রত্যেকে

একটা অস্বাভাবিক বোরখার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। সে-বোরখা ভেদ করে আসল মানুষটাকে চেনা শক্ত। মাঝে মাঝে দু-একবার বোরখা খোলবার চেষ্টা করেছি, যা দেখেছি, তাতে শিউরে উঠেছি। তাই ও চেষ্টা আর পারতপক্ষে করি না। যাঁরা আমার কাছে নিজের গরজে আসেন, তাঁদের সঙ্গে কাজের কথাটুকু শেষ করে বিদায় করে দি। অন্তরঙ্গতা করবার দুঃসাহস আমার নেই।"

ডাক্তার মুখার্জি একটা ম্লান হাসি হাসলেন।

গণেশ হালদার ডাক্তারবাবুর ম্লান হাসির অর্থ বুঝলেন। তবু প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু মানুষের প্রতি আপনার একটা কর্তব্য আছে তো ?"

"সেটা যতটা পারি করি। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু আর গৃহহারাদের সম্বন্ধেও আমি উদাসীন নই। যতটা পেরেছি করেছি।"

"তার প্রমাণ তো আমিই। আপনার জন্যই আমার চাকরি—"

"না, ঠিক আমার জন্য নয়। আপনার যোগ্যতা ছিল, আরও একটা কারণ ছিল। কিন্তু ও আলোচনা এখন থাক। আপনার প্রবন্ধটি পড়ে আপনার চিন্তাশীল মনের পরিচয় পেয়েছি। আপনি আরও প্রবন্ধ লিখুন।"

এবার গণেশ হালদারকেও ম্লান হাসি হাসতে হ'ল।

বললেন, "লিখে লাভ কি যদি তা প্রকাশিতই না হয়। আমি কাগজে প্রবন্ধটা ছাপতে দিয়েছিলাম, কাল ফেরত এসেছে। এ দেশের নামজাদা কাগজগুলো গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমালোচনা ছাপতে চায় না।

"না চাওয়াই স্বাভাবিক। ওটা ওদের ব্যবসা। সরকারের সঙ্গে ঝগড়া করে ব্যবসা চালানো যায় না। আমাদের দেশে স্বদেশী আমলে দেশকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য যেসব কাগজ বেরিয়েছিল, সরকারের আইন সেগুলোর কণ্ঠরোধ করতে ইতস্তত করেনি। স্বদেশী সরকারের হাতেও সেসব আইন আছে। সুতরাং ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক।"

"ইংরেজদের রাজত্ব হলে স্বাভাবিক মনে করতুম। এখন আমাদের স্বদেশী গণতন্ত্র হয়েছে। এ গণতন্ত্রের যাঁরা নেতা, তাঁরা শুনেছি দেবতুল্য লোক। এ-ও শুনেছি, বিপক্ষ দলের অনুরোধ শুনতে তাঁরা সর্বদাই প্রস্তুত।"

"পৌরাণিক উপাখ্যানে কিন্তু পড়া গেছে যে, দেবতারাও অপ্রিয় সত্য বরদাস্ত করতে পারতেন না। মুনিঋষিরাও না। প্রায়ই রেগেমেগে অভিশাপ দিয়ে ফেলতেন।"

হা হা করে হেসে উঠলেন সুঠাম মুখুজ্যে। তারপর বললেন, "এবার উঠতে হবে। মাথানিয়ার মাঠে যাব। সেখানে একটা গাছে হলদে পাখিদের আড্ডা আছে। তাদের সাহচর্য অনেক দিন উপভোগ করিনি। আজ করবার ইচ্ছে আছে। দুর্গা, রকেটকে বেঁধে দে। টুসির সঙ্গে বড্ড বাড়াবাড়ি করছে—"

রকেট লাফাতে লাফাতে তাঁর কাছে ছুটে এল। ভাবটা, কই, এমন কিছুই করিনি তো। দুর্গা কিন্তু তাকে নিয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু উঠে পড়লেন।

গণেশ হালদারকেও উঠতে হল।

মাথানিয়ার মাঠে ডাক্তারবাবু যেখানে গেলেন সেখানে চার পাঁচটা বড় বড় ঝাঁকড়া গাছ এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল যে, দূর থেকে দেখলে হঠাৎ মনে হয় ওরা কি যেন একটা গোপন পরামর্শ করছে। সব ক'টাই পরস্পরের দিকে ঝুঁকে আছে। দুটো বটগাছ, একটা অশ্বত্থ, একটা গাম্‌হার আর একটা বেশ বড় প্রাচীন ঝাওড়া। জনশ্রুতি, এখানে নাকি ভূত আছে। এ দেশের লোকেরা বলে দেও-বাবা। সেজন্য এখানে দিনেও বড় একটা কেউ আসে না। প্রতি অমাবস্যায় নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা দেও-বাবাকে শান্ত রাখবার জন্য এখানে পূজো দিয়ে যায়। তাই পাঁচটা গাছের গোড়াতেই সিঁদুর লেপা। ডাক্তার মুখার্জির এটি খুব প্রিয় স্থান। সময় পেলেই চলে আসেন। স্থানটির প্রধান আকর্ষণ নির্জনতা। অমাবস্যার দিন ছাড়া অন্য দিন এর ত্রিসীমানাতেও কেউ আসে না। কতকগুলো রাখাল এ মাঠে গরু চরাতে আসে বটে, কিন্তু তারা এই পাঁচটি গাছের পঞ্চায়েত থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকে। ডাক্তারবাবু একটু দূরে মোটর থামিয়ে বাইনকুলার গলায় ঝুলিয়ে গাছগুলো প্রদক্ষিণ করলেন কয়েকবার। ছিল হলদে পাখি। তিন চারটে ছিল। দেখে খুব পুলকিত হ'য়ে উঠলেন। হলদে পাখি চোখে দেখবার আগেই তার ডাক শোনা যায়। তারপর পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে দ্রুত আবার অন্য ডালে অন্য আড়ালে চলে যায়। অনেক রকম ডাক আছে ওদের। অপূর্ব অনন্য অবর্ণনীয় ডাক। তরল সুমিষ্ট আর কোমল। এমন মিষ্টি স্বর অন্য পাখির নেই। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে আর একটি পাখি দেখলেন তিনি। ফুলো পাখি। ছোট্ট পাখিটি কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে ল্যাজটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচছে। সাদায় কালোয় চিত্রিত ছোট ল্যাজটি পিঠের উপর ঘুরিয়ে তুললেই ফুলোর মতো দেখায়। বড্ড ছটফটে। ডাক্তার মুখার্জির বাইনকুলার তুলতে না তুলতেই ফুড়ুৎ করে পালিয়ে গেল। ডাক্তারবাবু গাছের পঞ্চায়েতের মধ্যে ঢুকে পড়লেন শেষে। ভিতরটা বেশ পরিষ্কার। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে লিখতে শুরু করলেন।

"মাস্টার মশাই, এখানে এসে ঘুরে ঘুরে পাখি দেখছিলাম, কিন্তু আপনার সঙ্গে একটু আগে যে আলোচনাটা শুরু হয়েছিল তার রেশটা মন থেকে এখনও মিলিয়ে যায়নি। উদ্বাস্তুদের কথাই মনে হচ্ছে নানাভাবে। হঠাৎ একটা কথা মনে জাগল। উদ্বাস্তু সম্বন্ধে আপনার ও আমার দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। আপনি নবযৌবনের আবেগে আইনসম্মত উপায়ে উদ্বাস্তুদের প্রতি অবিচারের যে প্রতিকার সন্ধান করেছেন, আমাদের সংবিধানের যে-সব দোষ-ত্রুটির সংশোধন কামনা করেছেন, প্রাদেশিকতা ও অন্যায় পক্ষপাত অবলুপ্ত করার যে যে কল্পনা করেছেন, তা নবোদ্গত অঙ্কুরের মতো আপনার প্রাণবন্ত জীবনী-শক্তির পরিচায়ক। সবুজ রঙের সঙ্গে তার মিল আছে, তা চিরনবীন, তা সুন্দর। আমার যে দৃষ্টিভঙ্গী তাতে বিশেষ কোনও রঙের প্রাধান্য নেই, অথচ সব রঙই তাতে আছে। তাকে সাদা বলতে পারেন। কিন্তু ভেবে দেখছি, এ ছাড়া

তৃতীয় ভাবেরও ভাবুক একদল আছেন। তাঁদের রং লাল। তাঁরা ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে, যেন-তেন প্রকারেণ নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে চান। মিথ্যা-ভাষণ, জাল-জুয়াচুরি, কালোবাজার, ঘুষ, জবরদস্তি, খোশামোদ, খুন-জখম—কোন কিছুতেই পিছপা নন তাঁরা। লাল বলছি, কিন্তু আমি কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করছি না। আমি ইঙ্গিত করছি সেই জাতের লোকদের যারা উগ্র রকম বেপরোয়া। উদ্বাস্তুদের মধ্যে এরকম অনেক লোক আছেন। এ জাতের অনেক উদ্বাস্তুদের খবর আপনিও পান নিশ্চয়। এদেরও স্বপক্ষে বলবার অনেক কথা আছে, যুক্তির জোর তো আছেই। বস্তুত জোরই এদের সবচেয়ে বড় যুক্তি। কোন রঙটা ভালো তা আমি জানি না। আমার দলেও আমার মতাবলম্বী লোক আছেন নিশ্চয়, কিন্তু আমি তাঁদের নাগাল বা খবর পাই না। তাই মাঝে মাঝে নিজেকে একক মনে হয়। উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে এই তিন জাতের ত্রিবর্ণ, একই সমস্যাকে নিয়ে তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী, তিন রকমের মনোভাব আবিষ্কার করে আমি যেন একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আনন্দ উপভোগ করছি। তিন সংখ্যাটি মানবসভ্যতাকে বহুদিন থেকেই প্রভাবিত করেছে। আমাদের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তো আছেনই, খৃস্টানদের ট্রিনিটি আছে, বৌদ্ধদের আছে বুদ্ধ, ধর্ম আর সংঘ। আমরা স্বর্গের নাম দিয়েছি ত্রিদিব, আর সমস্ত লোককে অভিহিত করেছি ত্রিলোক নামে। এরকম অনেক 'ত্রি' বিভিন্ন দেশের পুরাণে আছে। উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করেও যে তিনটে বিভিন্ন রঙ ফুটে উঠেছে এ ভেবে ভারি ভালো লাগছে। আমার এ-ও মনে হচ্ছে, পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যাকে কেন্দ্র করেই বোধ হয় মোটামুটি এই তিন ধরনের মনোভাব ফুটে ওঠে। একদল থাকেন উদার সমন্বয়-পন্থী, একদল নবীন সংশোধন-পন্থী আর তৃতীয় দল বে-পরোয়া উগ্রপন্থী, যে-কোনও উপায়ে স্বকার্যসাধন করাই এঁদের উদ্দেশ্য। এঁদের মধ্যে কে ভালো কে মন্দ, মানব-সভ্যতা কাদের সাহায্যে বেশী অগ্রসর হয়েছে, তা নির্ণয় করবার মতো বিদ্যা-বুদ্ধি আমার নেই। তবে একটা জিনিস জানি, প্রথম দলের লোকেরা, যাঁরা উদার সমন্বয়-পন্থী, যাঁদের রং আমি সাদা বলেছি, তাঁরা সাধারণতঃ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না। তার কারণ, মানব-জাতির বা নিজেদের স্বার্থে তাঁরা কিছুই করেন না। না করেন পলিটিকাল হৈচৈ, না করেন যুদ্ধের আয়োজন, না দেন ধর্মের উপদেশ। তাঁরা প্রায় একা একা আপন মনে থাকেন। তাঁরা জানেন, দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায় না। তাঁরা জানেন, একটা দুঃখকে দূর করতে যে উপায় উদ্ভাবন করি সেই উপায়ই শেষে অন্য নানা দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হাঁটার দুঃখ দূর করতে মোটর চড়ি, মোটর শেষে আবার নানা দুঃখ সৃষ্টি করে। এঁরা মনে করেন, দৈবক্রমে যে পরিবেশে এসে জন্মগ্রহণ করেছি, সেই পরিবেশের দুঃখকে মোটামুটি মেনে নেওয়াই সে দুঃখের হাত এড়ানোর সহজ উপায়। সব দুঃখই কালক্রমে সহ্য হয়ে যায়, লোকে পুত্রশোকও ভুলে যায়। এই সহ্য করবার শক্তির নাম শান্ত ধৈর্য, ইংরেজীতে একেই বোধ হয় 'টলারেন্স' বলে। এই শক্তি দাঁতে দাঁত চেপে ভ্রূকুঞ্চিত রুদ্ধশ্বাসে সহ্য করার শক্তি নয়, এ হচ্ছে অনিবার্য কষ্টকে হাসিমুখে

মেনে নেবার চরিত্রবল। এ শক্তি যে আমি অর্জন করেছি তা আমি বলছি না, তবে আমি এই পথেরই পথিক। আকাশ নীল বলে যদি আমার কষ্ট হয়, আমি যদি ইচ্ছা করি আকাশকে লাল বা সবুজ করব, তা হ'লে আমার সে ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হবে না। এর জন্যে আমার যদি দুঃখ হয়, সে দুঃখকে সহ্য করা ছাড়া আমার উপায় নেই। অনিবার্যকে হাসিমুখে মেনে নিতে হবে। ওই হাসিমুখে মেনে নেওয়াটাই শক্ত ব্যাপার। কিন্তু ওই শক্ত জিনিসও সহজ হয়ে যায় যদি অন্তরে প্রেম থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ অনিবার্য ব্যাপারকেই আমরা প্রেমের স্পর্শ দিয়ে মধুর করে নিয়েছি, যা আছে তাকেই ভালোবাসতে শিখেছি। আমরা কেউ নীল আকাশকে লাল করতে চাই না, মেনে নিয়েছি ব'লে নীল আকাশই আমাদের কাছে এখন সুন্দর। মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর ব্যাপারও প্রেমের স্পর্শে আমাদের কাছে মনোহর হয়েছে। 'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান'—রবীন্দ্রনাথের এ গান নিশ্চয়ই শুনেছেন। কিন্তু মজা হচ্ছে, অনেক ব্যাপারে আমরা আবার নিতান্ত অসহিষ্ণু। ধর্মের ব্যাপারে, রাজনীতির ব্যাপারে পৃথিবীতে বহু রক্তারক্তি হয়েছে। সমাজেও দেখি স্ত্রীলোকের একবার পদস্খলন হ'লে আর রক্ষা নেই, ক্ষমা নেই। যাঁরা সাদা দলের লোক তাঁদের কাছে সবই ক্ষমার্হ। তাঁরা জানেন, সৎ এবং অসৎ আমাদেরই সৃষ্টি এবং এই দুই মিলিয়েই জীবন। জীবনকে স্বীকার করতে হ'লে অসৎকেও স্বীকার করতে হবে। জলের তরলতা বাদ দিয়ে জলকে কল্পনা করা যায় না। আর একটা মজাও আছে। আজ যেটা অন্যায় বলে গণ্য হচ্ছে, ইতিহাস ওলটালে দেখা যাবে, অতীতে সেটা অন্যায় ছিল না। এই সেদিন পর্যন্ত সভ্য মানব-সমাজেও দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল। এখন একটি স্ত্রীলোকের একটি স্বামী থাকবে এইটেই সুনীতি, কিন্তু বহুপূর্বে এক স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী থাকাটাই রেওয়াজ ছিল। অনেক সমাজে এখনও আছে। সুতরাং অসতী স্ত্রীলোক নিয়ে খুব বেশী দাপাদাপি করাটা সাদা দলের লোকেরা অশোভন মনে করেন। হঠাৎ একটা কথা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমি যেন নিজের প্রশংসাপত্র নিজেই লিখে যাচ্ছি। তা ঠিক নয়। আমি সাদাদের আদর্শের কথাই লিখছি, আমি নিজে সে আদর্শের অনুরূপ হতে পারিনি। অনেক পিছিয়ে আছি। এই সেদিন যখন মঙ্গলা গাইটা প্রসবব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিল, আমি নির্বিকার থাকতে পারিনি। রকেটও মাঝে মাঝে খাওয়া বন্ধ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন আমিও অস্থির হয়ে পড়ি। সুখে বিগতস্পৃহ এবং দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা হতে গীতা উপদেশ দিয়েছেন। সেই উপদেশ সর্বথা পালন করাই সাদাদের আদর্শ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করবার জন্যে যেসব কথা বলেছেন তার সঙ্গে সাদাদের ততটা মতের মিল নেই। আপনার হয়তো মনে হবে, এ আদর্শ অনুসরণ করা মানে তা হ'লে তো বিনা প্রতিবাদে জীবন-স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া। আপাত-দৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু ঠিক তা নয়। এই সাদা মনোভাব বজায় রাখতে গেলে প্রায়ই নানারকম বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়তে হয়। এই লড়াটা কম শক্তিসাপেক্ষ নয়। আপাতদৃষ্টিতে এঁদের সংসার সম্বন্ধে উদাসীন মনে হ'লেও, এঁরা মোটেই উদাসীন

নন। এঁদের দৃষ্টি সর্বদা সজাগ, এঁরা জীবনের বৃহত্তর এবং পূর্ণতর সত্যের সন্ধানী, এঁদের মন হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, চীন, রাশিয়া বা আমেরিকায় নিবদ্ধ নয়, তা নিখিল বিশ্বে সঞ্চরণশীল। শেষ পর্যন্ত এঁরা যে কি নিধি পাবেন তা অবশ্য এঁরাও জানেন না। সহসা মনে হবে, এঁদের অবস্থা বুঝি রবীন্দ্রনাথের সেই ক্ষ্যাপাটার মতো যে সারাজীবন পরশ-পাথর খুঁজে বেড়াত। যদি তাই হয় তা হলে বলব, এঁরা যে পরশ-পাথর খুঁজজেন, তার নাম প্রেম, এক নিমেষে যা লোহাকে সোনা করতে পারে। তবে একটু তফাত আছে। তাঁদের মনে এ কথাও মাঝে মাঝে জাগে, লোহাকে সোনা করে দরকার কি? লোহা তার নিজের গৌরবেই কি যথেষ্ট বড় নয়? লোহাকে সোনা করবার জন্যে তাঁরা ব্যস্ত নন, তাঁরা দেখতে চান, যেটা আপাতদৃষ্টিতে লোহা বলে মনে হচ্ছে সেটা কি কেবল লোহাই? আর কিছু নয়? অর্থাৎ তাঁরা সাংখ্য-কথিত মায়ার আবরণটা ভেদ করতে চেষ্টা করছেন। পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধময় আচ্ছাদনের অন্তরালে তাঁরা সেই প্রচ্ছন্ন সত্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন যা আপাতদৃষ্টির অস্পষ্টতায় সহজে ধরা পড়ে না। এই সন্ধানই ওঁদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, এতেই ওঁরা আনন্দিত, কিন্তু এ সন্ধানের পথ সব সময় সুগম নয়। এই ধরনের প্রেরণাই হয়তো মানুষকে মহাকাশ যাত্রায় প্রবুদ্ধ করেছে। আমি সামান্য লোক, মহাকাশ যাত্রার মহাসুযোগ কখনও পাব না। কিন্তু আমি আমার চারপাশে মহাকাশ আবিষ্কার করে তন্ময় হয়ে আছি। হঠাৎ আমার মনে হচ্ছে, আকাশ শুধু আকাশেই নেই, সর্বত্র আছে। সামান্য একটা উদাহরণ দিই। আপনি জানেন, আমার ভ্রমণ অতি সীমাবদ্ধ কিন্তু ওর মধ্যেই আমি অসীমের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করি, আর সে চেষ্টাতে কি আনন্দ! সেদিন একটা ভ্রমণ-কাহিনী পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, ভ্রমণের পুরো রসটা লেখক ঠিক পরিবেশন করতে পারেননি। কেমন যেন পল্লবগ্রাহী ছাড়া-ছাড়া আলতো-আলতো ভাব। ইতিহাসের কথা আছে, কিন্তু তা সব প্রচলিত ইতিহাস থেকে টোকা। কোন্ হোটেলে খেলুম, কার সঙ্গে হাসি-তামাশা করলুম, কি কি দৃশ্য দেখলুম—এইসব সাধারণ কথাতেই প্রবন্ধ পরিপূর্ণ। ভ্রমণকারীর অনুসন্ধিৎসা, পর্যবেক্ষণ ও নিজস্ব দৃষ্টির কোন পরিচয় নেই। যে প্রকৃতি ও পরিবেশ একটা বিশেষ দেশের মানুষকে একটা বিশেষ রঙে রাঙিয়েছে, তার সরল পরিচয় না থাকলে ভ্রমণ-কাহিনী ব্যর্থ হয়। যদি লিখতে পারা যায়, তা হলে আমাদের বাড়ির পাশের যে ছোট গলিটা আছে সেই গলি-ভ্রমণ-কাহিনীও সুখপাঠ্য হবে, যদি আমরা সেই গলিটার অতীত ও বর্তমানকে সম্পূর্ণ মূর্ত করে তার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে পারি। যে লোকটির নামে গলির নাম—বিধু পাল লেন—তাঁর পরিচয় ঘষাপয়সার মতো। কিন্তু যাদের কথা কেউ জানে না তাদের খবর চিত্তাকর্ষক। বিধু পালের যে পরিচয় আমি পেয়েছি তা মনোরম? তাঁর দান ছিল অজস্র। কোনও লোক কখনও তাঁর কাছ থেকে শুধু হাতে ফেরেনি। তাঁর এই গুণের-ছটায় তাঁর মস্ত দুটো দোষ ঢেকে গেছে। তিনি গাঁজা খেতেন এবং বিধবা ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে সহবাস করতেন। কিন্তু এ কথা কেউ মনে রাখেনি। তাঁর একজন অন্তরঙ্গের মুখে কথাটা শুনেছিলাম আমি। লোকে মনে করে রেখেছে

তাঁর উদার হৃদয়ের কথাটা। এ গলির আরও পরিচয় আছে। গলিটার সমস্ত দক্ষিণ-দিকটা জুড়ে প্রকাণ্ড স্কুল কম্পাউণ্ড, সেই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা একজন বাঙালী। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে তিনি গড়ে গেছেন বিরাট স্কুলটা। মিস্ত্রীদের সঙ্গে বসে নিজেও ইঁট গেঁথেছেন দেওয়ালের। ওই স্কুল গড়ার কাজে ব্যয় করেছেন তাঁর সমস্ত জীবন। এই গড়ার ইতিহাস একটা মহাকাব্যের খোরাক যোগাতে পারে। তারপর গলিটার দুপাশে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে যে ক'খানা বাড়ি আছে তাদের ভিতরকার খবর এমন চমকপ্রদ, এমন রসালো, এমন বীভৎস, অথচ এমন সুন্দর, তাতে হাসি-অশ্রুর, ভালবাসা-ঘৃণার, ঈর্ষা-কুৎসার, প্রতিভা-পাগলামির, উদারতা-নীচতার, উত্থান-পতনের এতো আলো-ছায়া যে, যে-কোনোও কথাশিল্পী তার থেকে সারা জীবনের শিল্প-উপাদান সংগ্রহ করতে পারবে, অপূর্ব চিত্র-সম্পদে অলঙ্কৃত করতে পারবে বাণী-মন্দিরকে। দুটো বড বড় গাছ আছে গলিটার ভিতর, আর আছে ইউকালিপ্‌টাসের সারি, আর একটা আমবাগান। এদের কেন্দ্র করে প্রতি মুহূর্তে যে মহোৎসব হয়, সে খবর কি আমরা রাখি? গলি-ভ্রমণের কাহিনী লিখলে এ মহোৎসবের কাহিনীও লিখতে হবে। শুধু ওইসব বড গাছগুলোকে কেন্দ্র করেই নয়, গলির দুপাশে নামহীন অসংখ্য যেসব গাছ-গাছড়া, লতা-গুল্ম, অজস্র প্রাণ-প্রাচুর্যে নিত্য জন্মাচ্ছে তাদের কেন্দ্র করেও যে উৎসবের মহিমা সর্বদা স্বতঃস্ফূর্ত হচ্ছে—তাও লিখতে হবে। আমাদের গলিটা যে কত রকম পাখির ডাকে মুখরিত হয় তার খবর কটা লোকে রাখে? 'চোখ গেল' পাখিরা এ-পাডা ছেডে ভিন্ন পাডায় চলে যাচ্ছে কেন এ নিয়ে কেউ গবেষণা করেছে কি? আমাদের গলিতে দিনের বেলা কত সুন্দর প্রজাপতি ঘোরাফেরা করে জানেন? রাত্রে কত সুন্দর সুন্দর 'মথ্‌' (moth) আর আলোর পোকা আসে লক্ষ করেছেন? ওরা ছাডাও আরও নানা জীবের গতিবিধি আছে আমাদের গলিতে। এখানে অনেক ছুঁচো, অনেক ইঁদুর, অনেক নেউল, অনেক সাপও বাস করে। গভীর রাত্রে একদিন দেখেছিলাম, গলির মাঝখানে একটি বিরাট গোক্ষুর ফণা তুলে বসে আছে। আমাদের গলিতে ব্যাঙও বাস করে দু'জাতের। টিকটিকি গিরগিটি তো অনেক। কাঠবিডালীও। আমি আর একদিন গভীর রাত্রে একটি অদ্ভুত প্রাণীকে দেখছিলাম আমার চৌহদ্দির দেওয়ালের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে সন্তর্পণে। আকারে নেউলের প্রায় দ্বিগুণ হবে। লম্বা মোটা লেজটা ছুঁচলো হ'য়ে গেছে শেষের দিকে। দুর্গা বললে, এ দেশে ওর নাম মুচুব্‌ভা। ওর গায়ে গন্ধ আছে। গন্ধ-গোকুল কি? ঠিক বুঝতে পারি নি। গলির ইতিহাসে এদের ইতিহাসও থাকবে। তা ছাড়া থাকবে (আসল কথাটাই ভুলেছিলাম!) হনুমানদের কথা, যারা এই গলিটার আসল মালিক। এরা কত রকম ফন্দী-ফিকির করে' যে বেঁচে আছে তা লক্ষ্য করলে অবাক হতে হয়। এই গলির আশেপাশে আগে কেবল বাঙালীদেরই বাস ছিল। এখন বিহারীরাও এসেছেন। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো পাঞ্জাবী, সিন্ধীরাও আসবেন। মাদ্রাজীরাও আসতে পারেন। কারণ বর্তমান যুগে দেখছি এই

তিনটি জাত জীবন-যুদ্ধে অপর প্রদেশবাসীদের হটিয়ে দিচ্ছে। গলি-ভ্রমণ-কাহিনীতে এসব কথাও থাকবে। এত সব লিখেও মনে হবে অনেক কিছু বাকি রয়ে গেল—ওই যে শিব-মন্দিরের পাতলা পাতলা ইটগুলো কোথাকার তৈরী, গঙ্গার ধারে ওই বিরাট কারখানায় যে সাতজন পীরের কবর আছে—তাঁরা কোথাকার লোক! শেষকালে মনে হবে, কিছুই লেখা হ'ল না। প্রতিটি জিনিসের নিত্যনূতন সম্ভাবনায় মন আকুল হয়ে থাকবে। মনে হবে, যা দেখলাম তার অন্তরালে অদেখা যেন কিছু থেকে গেল। এই আজই আমার নূতন অভিজ্ঞতা হয়েছে হলদে পাখির সম্বন্ধে। হলদে পাখি দেখেছেন কি? ওর ইংরেজী নাম ওরিওল (Oriole), বাংলা নাম অনেক আছে। তিনটে মনে পড়ছে, হলদে পাখি, বেনে বউ, ইস্টিকুটুম। মাথাটি কালো, ডানার নিচে দুপাশে কালো, আর বাকি দেহটা হলদে। অদ্ভুত হলদে সোনার মতো। ওদের ডাকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডাকটির সুমিষ্ট তরলতা। এক রকম ডাক ওরা ডাকে না। নানা স্বরে ডাক দেয়, যখন যেটা খুশি। ওদের 'ইস্টিকুটুম' নামটা বোধ হয় ওদের একটা বিশেষ ডাকের জন্যই হয়েছে। অনেকে ওদের 'খোকা হোক' বলে। তা-ও বোধ হয় ওই ডাকের জন্য। আজ মনে হল 'ইস্টিকুটুম না বলে ডাকটাকে 'মিষ্টি-কুটুম' বললেই বা ক্ষতি কি ছিল। কুটুমরা নানা কারণে সাধারণতঃ মিষ্টি হয় না, কিন্তু এই পাখিটা বারবার তা অস্বীকার করে বলছে—মিষ্টি-কুটুম। তারপরই আর একটা যে মিষ্টি শব্দ করছে মাঝে মাঝে, সেটা শোনাচ্ছে যেন, 'তলিয়ে দেখ'। অর্থাৎ মিষ্টি-কুটুম, তলিয়ে দেখ। এর পর আর একটা ডাকের অর্থও সহসা প্রতিভাত হ'ল আমার কাছে আজ। এ ডাকটা আগে অনেকবার শুনেছি, কিন্তু আজ ওই ডাকটার সরল বাংলা যেন শুনতে পেলাম। যেন বলল—'ওগো শুনছ, খিল খোল।' অদ্ভুত ব্যাপার। বারবার শুনলাম—ওগো শুনছ খিল খোল! খিল খোলাই তো পৃথিবীর আসল সমস্যা। আমরা সবাই তো নানা বদ্ধদ্বারে করাঘাত করে অহরহ বলছি, ওগো শুনছ, খিল খোল। ওই পাখিটার জীবনেও সেই সমস্যা আছে নাকি? কাছেই ওর সঙ্গিনী পাখিটা চুপ করে বসে ছিল। কোন জবাব না দিয়ে উড়ে গেল সে। এটাও উড়ল ওর পিছু-পিছু। আবার শোনা গেল, ওগো শুনছ, খিল খোল। আশ্চর্য ব্যাপার! এই সব তুচ্ছ জিনিস নিয়েই আমার জগৎ। এই জগতেই আমি আনন্দ পাই। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান সমস্যা, প্রাদেশিকতা বা উদ্বাস্তুদের নিয়ে দাপাদাপি করতে তেমন উৎসাহ পাই না যেন।"

এই পর্যন্ত লিখে চুপ করে বসে ছিলেন ডাক্তারবাবু। মনের মধ্যে ওই একটা কথাই ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছিল—ওগো শুনছ, খিল খোল। এমন সময় ঝড়ঝড় করে ডাক্তার ঘোষালের মোটরটা এসে থামল একটু দূরে। ঝিনুক নামল তার থেকে। মোটরে আর কেউ ছিল না। ঝিনুক ড্রাইভ করে এনেছিল গাড়িটা। ডাক্তার মুখার্জি ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। কে মেয়েটি? ডাক্তার মুখার্জি যে এখানে আছেন এ খবর ঝিনুক পেয়েছিল গণেশ হালদারের কাছে। ডাক্তারবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার পরই ঝিনুক তাঁর কাছে গিয়েছিল। তাঁর দেখা পায় নি, দেখা পেয়েছিল

গণেশ হালদারের। তিনিই তাঁকে মাখানিয়া মাঠের খবরটা দিয়েছিলেন। মাখানিয়া মাঠ ঝিনুকেরও অপরিচিত স্থান নয়। ওই মাঠেই ওই কুখ্যাত পাঁচটি গাছের কাছেই সে কিছু টাকা পুঁতে রেখে গিয়েছিল। সে টাকা এখনও সেখানে আছে।

ঝিনুক এগিয়ে এসে প্রণাম করল।

ডাক্তার মুখার্জি সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন।

তারপর মৃদু হেসে বললেন, "চিনতে পারছি না তো ঠিক।"

"আমাকে আপনি একবার দেখেছিলেন কিন্তু।"

"কোথায় ?"

"এখানকার রেল লাইনের ধারে ডিসট্যাণ্ট সিগনালের কাছে। আমি সেদিন সন্ধ্যার পর সেখানে একটা ব্যাগ কুড়োতে গিয়েছিলাম—"

"ও, মনে পড়েছে।"

খুশীতে ঝলমল করে উঠল তাঁর মুখখানা।

বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলটা তুলে বললেন—"এই যে, স্মৃতি-চিহ্ন এখনও রয়েছে। তারপর, এখানে এখন কি মনে করে ?"

"হালদার মশাইয়ের কাছে শুনেছিলাম, আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলেন। এতদিন সুযোগ হয়নি, আজ একটু সময় পেয়েছি।"

"বস। মাটিতেই বসবে ? এখানে তো বসতে দেবার কিছু নেই। তোমার শাড়িখানা নষ্ট হয়ে না যায়।"

সুঠাম মুকুজ্যে একটু যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি নিজে মাটিতেই বসেছিলেন গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে. কিন্তু ঝিনুকও যে তাই করবে, এটা তিনি প্রত্যাশা করতে পারছিলেন না।

"আমি মাটিতেই বসছি—"

"তাহলে ওইখানে ওই দূর্বাঘাসগুলোর উপর বস।"

ঝিনুক বসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কোথায় থাক ?"

"এখানে কলুচকে আমাদের একটা বাসা আছে। তবে আমি বেশীর ভাগ ডাক্তার ঘোষালের বাসাতেই থাকি। কাজ করি তাঁর বাড়িতে।"

"ও। এখানেই কি তোমাদের দেশ ?"

"না। আমরা পূর্ববঙ্গের লোক।"

"রেফিউজি বুঝি ?"

ঝিনুকের চোখের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে শানিত হয়ে উঠল।

"হ্যাঁ। ওই নামেই আপনারা আমাদের অভিহিত করেছেন। কিন্তু আমরা এই ভারতবর্ষেরই লোক, ভারতের বাইরে থেকে আসিনি। বিদেশী র‍্যাডক্লিফ সাহেব দেশের উপর একটা লাইন টেনে দিয়েছেন বলে, আর আমাদের তথাকথিত নেতারা সেটা মেনে নিয়েছেন বলে আমরা পর হয়ে যাইনি। জোর করে ঘর থেকে তাড়িয়ে

দিয়ে তারপর আমাদের রেফিউজি বলে অনুকম্পা করবার রেওয়াজই হয়েছে আজকাল। এদেশের লোকদের যদি ভদ্রতাবোধ থাকত, তাহলে তারা আমাদের রেফিউজি না বলে অতিথি বলতেন এবং সেইভাবেই আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন।"

মুঠাম মুকুজ্যে চমৎকৃত হ'য়ে গেলেন। একটু চুপ করে তিনি বললেন, "অতিথিও তো পর। উচিত ছিল আত্মীয়ের মত ব্যবহার করা। কিন্তু যা উচিত, তা তো সব সময় হয় না। শুধু এখানে নয়, পৃথিবীর কোথাও হয় না। যা পাওয়া যায়, সেইটেই যথালাভ, তাই নিয়েই সুখী হ'তে হয়।"

"যাদের আত্মসম্মান বোধ আছে, তারা সব সময়ে সব জিনিস মেনে নিতে পারে না। দুবেলা দুমুঠো খেতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু প্রতি গ্রাসে অপমানের বালি কিচকিচ করছে। প্রতি মুহূর্তে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছে। রেফিউজি শব্দটা যোগরূঢ় শব্দের মতো আজকাল একটা বিশেষ অর্থ বহন করে, যার অর্থ ঘৃণ্য, কিন্তু কৃপার পাত্র। আপনার মুখ থেকে ও কথাটা শুনব আশা করিনি।"

ডাক্তার মুখার্জি হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তার দিকে। রোদে আর রাগে লাল হয়ে উঠেছে মুখটা। অনুভব করলেন, তপ্ত লোহায় হাত দিলে হাতে ছেঁকা লাগবে এখন। ও প্রসঙ্গ এখন চাপা দেওয়াই ভালো। কিন্তু ঠিক চাপা দিতেও পারলেন না।

বললেন, "তোমাকে রেফিউজি বললে তুমি কষ্ট পাবে, একথা জানলে ও কথা উচ্চারণ করতুম না। আমার কাছে কেউ ঘৃণ্য বা কৃপার পাত্র নয়। বিশ্বাস কর, তোমাদের কষ্ট দেখে আমারও খুব কষ্ট হয়। কি করব ? একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, পৃথিবীতে সবাই কোন-না-কোন ভাবে কষ্ট পাচ্ছে। দুঃখের বিরাট সমুদ্রে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। তা সত্ত্বেও যারা হাসিমুখে সাঁতার কাটতে পারছে, সমুদ্রটাকে নিয়ে দিনরাত হা-হুতাশ করছে না, তারাই কতকটা সুখী।"

ঝিনুকের মুখে হাসির সামান্য আভা ফুটল।

"আমরাও সাহস করে সাঁতার কেটে চলেছি। কিন্তু মুখে হাসি এখনও ফোটাতে পারিনি। জানি না, তা কবে ফুটবে। হয়তো ফুটবেই না।"

"ফুটবে বইকি। মানুষের মন বড় অদ্ভুত জিনিস। অনিবার্য দুঃখের সঙ্গে ভাব করে সে শেষকালে হাসে। শোক ভুলে যায়, দুর্ভাগ্য ভুলে যায়, ক্ষয়ক্ষতি সব ভুলে যায় সে। খাপ খাইয়ে নেওয়াই জীবনের ধর্ম।"

"তাই কি ? আমার তো মনে হয়, সবচেয়ে নির্বিকার প্রাণহীন তো পাথর। সে-ই সব সময়ে সকলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। তার উপর যত অত্যাচারই হোক, সে প্রতিবাদ করে না। যাদের প্রাণ আছে, তারাই প্রতিবাদ করে।"

"ঠিক বলেছ। প্রতিবাদ করাও জীবনের লক্ষণ। খুব বড় লক্ষণ। কিন্তু প্রতিবাদেরও একটা সীমা আছে। নিষ্ফল প্রতিবাদ অর্থহীন। জীবনে এমন অনেক দুঃখ আছে, যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কোনও লাভ নেই। এই ধর না, গ্রীষ্মের, বর্ষার বা শীতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ওদের নিবারণ করা যায় না। বড়লোকেরা এয়ার-কণ্ডিশনড্

(air-conditioned) বাড়িতে থাকতে পারেন, দার্জিলিং সিমলা যেতে পারেন, বর্ষাকালে বর্ষাতি গায়ে দিতে পারেন, শীতকালে আগুন জ্বালাতে পারেন, কিন্তু সব লোক তা পারে না। তারা কষ্ট পায় এবং শেষ পর্যন্ত সেটা মেনে নেয়। কষ্টের সঙ্গেই তারা তখন আপোস করে এবং আপোস করে' সুখে থাকে তখন। ওই কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতাও তখন তাদের মধ্যে জাগে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে adaptability বলে। অনিবার্য বিরুদ্ধ পরিবেশে সব প্রাণীই নিজেকে adapt করে নেয়। এই adapt করবার শক্তি মানুষেরই সবচেয়ে বেশী। আফ্রিকার দারুন গরমে, হিমালয়ের হাড়-কাঁপানো শীতে, অরণ্যে, মরুভূমিতে, শহরে, গ্রামে, সর্বত্রই মানুষ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে এবং অধিকাংশ লোকই সুখে আছে। অনেকে আবার দুঃখকেই সুখের চেয়ে বড় স্থান দিয়েছে। কুন্তীর কথা নিশ্চয় পড়েছ। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁকে বর দিতে চাইলেন, তিনি বললেন, আমাকে দুঃখ দাও। আমিও অনেক লোক দেখেছি, যারা দুঃখকেই পছন্দ করে, সুখের চেয়ে দুঃখই তাদের কাম্য। আর এটাও ঠিক কথা, বাইরের দুঃখকে মেনে নিলে মনের ঐশ্বর্য বাড়ে। সেটা পরম লাভ।"

ঝিনুক বলল, "আপনি যেসব কথা বললেন, তা খুবই জ্ঞানগর্ভ। কিন্তু দুঃখের তীব্র কশাঘাতে, অপমানের মর্মান্তিক জ্বালায়, অবিচারের নিষ্ঠুর পীড়নে যারা অহরহ ক্ষতবিক্ষত, আপনার ওসব কথায় তারা মোটেই সান্ত্বনা পাবে না। নিজেদের স্বার্থের তাড়নায় যে বেপরোয়া ড্রাইভার অসহায় পথিকদের চাপা দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয়—দুঃখের সৃষ্টিকর্তা বলে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হবার বা তাকে ঘিরে বাহবা বাহবা করবার প্রেরণা আর যেই পাক, সেই হতভাগ্য পথিকরা পাবে না। দুঃখের মহামূল্য রত্ন তাদের উপহার দিয়েছে বলে সে ড্রাইভারের পুজোও তারা করবে না। আমরা যে রকম দুঃখে পড়েছি, আপনি যদি সে রকম দুঃখের মুখোমুখি হতেন, তাহলে হয়তো আপনার গলা দিয়ে অন্য সুর বেরুত। যাঁরা আরামে বিলাসের কোলে লালিত হন, যাঁরা চর্বচুষ্যলেহ্যপেয় সব রকম খাবার খেয়ে, সুসজ্জিত বৈঠকখানায় পাখার তলায় আরাম-কেদারায় শুয়ে থাকেন, তাঁরাই সাধারণতঃ দুঃখের জয়-গান করেন, আপনি এখন যেমন করলেন। ওসব জ্ঞানগর্ভ কথা আমাদের কাছে অর্থহীন।"

ঝিনুকের নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হ'তে লাগল।

ডাক্তার মুখার্জি একটু অপ্রস্তুত হয়ে চেয়ে রইলেন মাটির দিকে। তাঁর পায়ের কাছে যে দুর্বাঘাসগুলো ছিল, তাদের কাছেই তাঁর মন যেন আশ্রয় ভিক্ষা করতে লাগল।

তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, "আমি খেয়ে পরে সুখে থাকি, এটা আমার অপরাধ নয়। সুখে থাকি বলেই দুঃখ সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল, এটা মনে করলে আমার উপর সুবিচার করা হবে না। মানুষের দুঃখ নিয়ে সত্য চিন্তা করেছেন, এরকম অন্তত দুটি লোকের খবর আমি জানি, যাঁরা ধনীর সন্তান ছিলেন। একজন গৌতম বুদ্ধ, আর একজন কার্ল মার্কস। এঁরা ধনীর সন্তান ছিলেন বলে এঁদের চিন্তাধারা অপাংক্তেয়

হয়ে যায়নি। আমি অবশ্য ওঁদের মতো অত বড় নই, ওঁদের ধারে-কাছেও যেতে পারি না, আমি নতুন কথাও কিছু বলছি না, কিন্তু আমি খেতে পরতে পাই বলে এবং আমার বাড়ি পূর্ববঙ্গে নয় বলে কি আমার চিন্তা করবারও অধিকার নেই। বিশ্বাস করবে কি না জানি না তোমাদের দুঃখ যে কি তা সত্যিই আমি বুঝতে পারি, যে চক্রান্তের ফলে তোমরা আজ বিপন্ন তারও স্বরূপ কিছু কিছু জানি, যতটা পারি তোমাদের সাহায্যও করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানি দুর্ভাগ্যকে সহ্য করবার কৌশল অর্জন করতে না পারলে দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। বেশী লম্ফ ঝম্ফ করলে উত্তপ্ত কটাহ থেকে জলন্ত উনুনে পড়ে যাবারও ভয় থাকে। কথাটা উঠল বলেই যা আমি বিশ্বাস করি তাই তোমায় বললাম। আমার কথা না মানবার সম্পূর্ণ অধিকার তোমার আছে। তর্ক করে কাউকে স্বমতে আনবার আগ্রহও আমার নেই। আগে ছিল। এখন বুঝেছি ও চেষ্টা বৃথা। জবাকে অপরাজিতা করা যায় না। যাক্‌ ওসব কথা—তোমার সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যায় যে ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর সঙ্গে কিছুদিন আগে ঘোষা স্টেশনে দেখা হয়েছিল। তিনি যে রেলওয়ে ড্রাইভার তা জানতাম না। তিনি কি এখানেই থাকেন? তাঁর কি খবর?

"এখানে তাঁর একটা বাসা আছে শুনেছি। কিন্তু সেখানে শুনেছি তিনি প্রায় থাকেনই না। আমার সঙ্গে হঠাৎ মাঝে মাঝে দেখা হয়। তাঁর ঠিক খবর আমি জানি না। তিনি ভবঘুরে লোক।"

ডাক্তার মুখার্জি হাসিমুখে চেয়ে রইলেন ঝিনুকের দিকে। তারপর একটু থেমে বললেন, "সেদিন কেন জানি না, মনে হয়েছিল লোকটির সঙ্গে তোমার ভাব আছে। আর তা মনে হওয়াতে সমস্ত মন এমন মাধুর্যে ভরে গিয়েছিল যে রিভলভারের গুলী খেয়েও তার রেশ কাটেনি। তোমার সেই ভবঘুরে বন্ধুটির সঙ্গেও আলাপ করবার ইচ্ছে আছে। তাকেও এনো একদিন।"

ঝিনুক আনতচক্ষে মৃদুকণ্ঠে বলল, "সুযোগ পাই তো আনব।"

তারপর বলল, "আমি কথায় কথায় বড় রেগে যাই। আপনাকে এখন যেসব কটুকথা বললাম তার জন্য আমায় মাপ করুন। আমি জানি আপনি মাপ করবেন। কিন্তু আমি—"

হঠাৎ ঝিনুকের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেল, সে আর কিছু বলতে পারলে না। তার চোখ দিয়ে বোধ হয় জলও বেরিয়ে পড়ল একটু।

"ছি, ছি, কি ছেলেমানুষ তুমি"—শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন ডাক্তার মুখার্জি। "তুমি যা-বললে তাতে আমার একটুও রাগ বা দুঃখ হয়নি। বরং আমি খুশী হয়েছি। অবশ্য অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম একটু, কিন্তু চমকে গেছি তোমার কথা শুনে। মনে হচ্ছিল একটা খাঁটি হীরে যেন ঝলমল করে উঠল রোদের ঝলক লেগে। তুমি যদি মতের অমিল সত্ত্বেও আমার কথায় ক্রমাগত 'হাঁ' দিয়ে যেতে তাহলেই বরং খারাপ হত, যা দেখলাম তা দেখতে পেতাম না। তোমার অনন্যতার পরিচয় দিয়েছ এতে রাগ বা দুঃখ করব কেন?"

ঝিনুক কয়েক মুহূর্ত নতমুখে বসে রইল তবু। তারপর বলল, "আমি যেজন্য আপনার কাছে এসেছি সেইটেই বলা হয়নি এখনও।"

"সেটা আবার কি!"

ঝিনুক ব্লাউসের ভেতর থেকে তনিমার চিঠিটা বার করে দিলে, যে চিঠিটা সে হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে পেয়েছিল তেপায়ার উপর। হাসপাতাল যাওয়ার আগে চিঠিটা ডাক্তারবাবুকেই লিখেছিল তনিমা।

"এই চিঠিটা আপনাকে দিতে এসেছি। এটা আপনারই চিঠি। তনিমা হাসপাতাল যাওয়ার আগে এটা লিখে রেখে গিয়েছিল।"

স্ঠাম মুকুজ্যে চিঠিটা পড়ে খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন।

"সে কি! তনিমা মারা গেছে!"

"না মারা যায়নি। আপনি তাকে যে ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেন তিনি অতি বিচক্ষণ লোক। অপারেশন করে তিনি বাঁচিয়ে তুলেছিলেন তনিমাকে। সে হাসপাতালে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছিল। গায়ে একটু জোর পেয়েই কিন্তু সে হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে—"

"পালিয়েছে? বল কি! কোথায় গেছে খবর পেয়েছ কি—"

"ঠিক খবর পাই নি। তবে মনে হয় এদেশে নেই, ইয়োরোপে গেছে।"

তারপর একটু থেমে বললে, "আমি ভেবেছিলাম আপনাকে হয়তো জানিয়েছে কিছু।"

"আমাকে? না, কিছু জানায় নি। তাকে কলকাতা পাঠাবার পর তার আর কোনও খবর আমি জানি না। এ তো বড় অদ্ভুত হ'ল। ইয়োরোপে গেছে কি করে জানলে?"

"কোথা গেছে তা ঠিক জানি না। আমার বোন শামুক মিস্টার সেনের বাড়িতে চাকরি করত। সে-ও পালিয়েছে। আজ তার একটা ছোট চিঠি পেয়েছি লণ্ডন থেকে। এই যে—"

আর একটা চিঠি সে বার করে দিলে ডাক্তারবাবুকে।

ডাক্তারবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে পড়লেন:

শ্রীচরণেষু,

দিদি, শিকল কেটে আকাশে উড়েছি। বিরাট আকাশ। তুমি আমার জন্যে ভেবো না। তনুদি আমার সঙ্গে আছেন। তিনি যে লোকটির সঙ্গে এখানে এসেছেন তিনি অসাধারণ লোক। বড় ব্যাংকার একজন। অনেক রকম ব্যবসাও আছে তাঁর এদেশে। তিনি আমাকে কোথাও ঢুকিয়ে দেবেন আশ্বাস দিয়েছেন। ওরা বোধ হয় কিছুদিন পরেই ইয়োরোপে টুরে বেরুবে। আনন্দে এবং সসম্মানে আছি। একটুও ভেবো না তুমি। কাকাকে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে তুমিও চলে এস এখানে। খোকনও আমার সঙ্গে এসেছে। তাকে এখানেই স্কুলে ভরতি করবার চেষ্টা করছি। আমাদের

নিয়ে যাবার ব্যবস্থা তন্নুদিই করেছেন। তুমিও এস। এখানেই ঘর বাঁধব আমরা। এদেশের অনেক দোষ আছে, কিন্তু এদের প্রধান গুণ এরা জীবন্ত। আর ভিতরে যা-ই থাক, বাইরে খুব ভদ্র। আমাদের দেশের ইতিহাস পড়ে আশা হয়েছিল যে এমন মহিমময় যাদের ইতিহাস সে দেশে নিশ্চয়ই মানুষের মতো মানুষ আছে। কিন্তু বিপদে পড়ে এক ডাক্তার ঘোষাল ছাড়া আর জীবন্ত মানুষ চোখে পড়ল না। অধিকাংশই প্রেত, পিশাচ আর শয়তান। মরা ইতিহাসের শুকনো পাতার ভাষ্য করে আর ভণ্ডামির ধ্বজা উড়িয়ে সবাই নিজেদের মতলব হাসিল করবার তালে আছে। তন্নুদি তোমাদের ডাক্তার মুখার্জির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। বললেন তাঁকে চিঠি লিখবেন। তোমাকেও লিখবেন। তুমি ও কাকা আমার প্রণাম জেনো। ইতি— শামুক

চিঠি পড়া শেষ করে ডাক্তারবাবু বললেন, কই, আমি তার কোন চিঠি পাইনি তো!"

"আমিও পাইনি। আশা করে এসেছিলাম আপনার কাছে কিছু খবর পাব।"

"ভেব না। খবর আসবেই একটা।"

ঝিনুক ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

"আপনি এখানে এসে কি করছিলেন?"

"কিছুই করছিলাম না। নিজেকে নিয়ে ছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল এখানকার হলদে পাখিগুলোর সঙ্গে একটু আড্ডা দেওয়া। কিন্তু তারাও বিশেষ আমল দিল না। শুনলাম একটা পাখি তার সঙ্গিনীকে বলল, 'ওগো শুনছ, খিল খোল' বলেই দুজনে উড়ে গেল। তারপরই তুমি এলে।"

" 'ওগো শুনছ, খিল খোল' বললে পাখিটা?"

"হঠাৎ আজ আমার তাই মনে হ'ল। এতদিন ওদের ডাক শুনেছি, আগে এ রকম মনে হয়নি। আজ যেন স্পষ্ট শুনলাম, বলছে 'ওগো শুনছ, খিল খোল'। মনে হ'ল সবার অন্তরের এই আকুল প্রার্থনাটা হলদে পাখির কণ্ঠেও আজ শোনা গেল। বলতে পারি না, হয়ত ভুল শুনেছি।"

ডাক্তারবাবুর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এমন সময় গাছের উপর থেকে শব্দ হল, 'টিউ'। "হলদে পাখি এখনও আছে গাছে, পালায়নি। এই বটগাছটাকে খুব ভালবাসে ওরা। ওইখানেই ওদের আড্ডা।"

ঝিনুক উৎসুক দৃষ্টি তুলে বটগাছটার দিকে চাইতে লাগল।

"কই দেখতে পাচ্ছি না তো?"

"চট্ করে দেখা যাবে না। ঘুরে ঘুরে একটু কষ্ট করতে হবে। খুব দুষ্টু পাখি, প্রায়ই পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে, কাকের মতো 'ফরোয়ার্ড' নয়। দেখতে চাও তো ওঠ।"

"চলুন।"

ঝিনুককে নিয়ে বাইনকুলার গলায় ঝুলিয়ে সুঠাম মুকুজ্যে সোৎসাহে বটগাছটা প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন।

॥ ২৩ ॥

ভাগলপুরের একটা হোটেলে স্থবেদার খাঁ বই পড়ছিলেন একা একটা ঘরে বসে। স্থবেদার খাঁ এক ঠিকানায় বেশী দিন থাকেন না। অধিকাংশ সময়ে নানা হোটেলেই থাকেন তিনি। যে হোটেলে সিংগ্‌ল সিটেড রুম পান সেই হোটেলেই যান। হোটেলের আভিজাত্য বা খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ কোন বাছবিচার নেই। তবে একা একটা ঘর পাওয়া চাই। সেদিন তাঁর সাহেবগঞ্জে থাকার কথা, কিন্তু সেখানে ডিউটির চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে তিনি চলে এসেছেন ভাগলপুরে। সাহেবগঞ্জের হোটেলে সিংগ্‌ল সীটেড্‌ রুম সেদিন পাননি। তাই ভাগলপুরে এসেছেন। তাঁর পড়ার নেশা খুব প্রবল। নির্জন ঘরে একা বসে তিনি পডতে ভালবাসেন। উপন্যাস পড়েন না, ইতিহাসের বই পডেন। বিশেষ করে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বই। চারটে ভাষা জানা আছে—হিন্দী, উর্দু, বাংলা এবং ইংরেজী—সুতরাং নানারকম বইও পান। দেশের ইতিহাসের ভেতর দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করতে চান দেশের ভবিষ্যৎ। এইটাই তাঁর অবসর-বিনোদনের প্রধান অবলম্বন। আর একটা অবলম্বন ঝিনুকের চিন্তা। ঝিনুককে তিনি যদি জীবনে পেতেন তাহলে তাঁর জীবন ধন্য হয়ে যেত। কিন্তু তিনি জানেন, ঝিনুককে তিনি পাবেন না। তিনি মুসলমান—একথা ঝিনুকের মর্মে রক্তের রঙে আঁকা আছে। এ রং কখনও উঠবে না। নিষ্ঠুরতার নির্মম তুলি দিয়ে এই রক্তের নিষেধ আঁকা হয়েছে বহু যুগ ধরে, সেই সোমনাথ লুণ্ঠনের সময় থেকে। থানেশ্বরের ভয়াবহ অত্যাচার, জহরব্রতের অগ্নিশিখা, সহস্র সহস্র সতীর আর্তনাদ, সহস্র সহস্র ছিন্নমুণ্ড রক্তাক্ত হিন্দুর অভিশাপ, জিজিয়া কর, কমুন্যাল অ্যাওয়ার্ড, কলকাতার ডাইরেক্ট্‌ অ্যাকশন, নোয়াখালির হত্যাকাণ্ড, পূর্ববঙ্গের ভীষণ অত্যাচার—এই স্তূপীকৃত নৃশংসতার হিমালয় উত্তুঙ্গ হ'য়ে আছে তাঁর ঝিনুকের মধ্যে। তিনি জানেন ঝিনুক এ হিমালয় পার হ'তে পারবে না, পার হ'তে চাইবে না। তিনি পার হ'তে পারেন, পার হ'তে চান, কিন্তু তাঁর এই দুঃসাহসের একটি অর্থ-ই ঝিনুক করবে—কামুকতা। কিন্তু এ কলঙ্ক তিনি নিজের ললাটে মাখতে চান না। তিনি যে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য ঝিনুককে চাইছেন না, তাকে জীবনের যোগ্য সঙ্গিনীরূপেই চাইছেন, একথা তিনি ঝিনুককে বোঝাতে পারবেন না বলেই ঝিনুককে পাওয়ার আশা বিসর্জন দিয়েছেন। পাওয়ার আশা বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু ঝিনুকের সংস্রব ত্যাগ করতে পারছেন না। সে যাতে সুখে থাকে, সে যাতে তার জীবনের আদর্শ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে, এই চেষ্টা করে তিনি তির্যকভাবে আনন্দ পেতে চান আর তা স্বার্থলেশহীন ভাবে পান বলে সেটা আরও মধুর, আরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনে। বস্তুত, ঝিনুককে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবন আবর্তিত হচ্ছে এখন। তিনি জানেন ঝিনুক ডাক্তার ঘোষালের খুব

অনুরক্ত, যদিও তাঁকে বিয়ে করেনি, কিন্তু তাঁকে ছেড়ে ও যে কোথাও যাবে তা মনে হয় না। ডাক্তার ঘোষালের প্রতি ঝিনুকের পক্ষপাতের কারণ তিনি নাকি প্রাণ তুচ্ছ করে গুণ্ডাদের হাত থেকে ওদের বাঁচিয়েছিলেন। ব্যাপারটাকে বারবার বিশ্লেষণ করেছেন স্থবেদার খাঁ। ওইটেই কি অনুরক্তির একমাত্র কারণ? তিনিও উদ্বাস্তদের জন্য কম করেননি, তিনি বারবার নিজের জীবন বিপন্ন করে টাকা যোগাড় করেছেন ওদের জন্য, এখনও করছেন। ঝিনুক এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তার ব্যবহারও খুব ভদ্র, কিন্তু যার জন্য তিনি মনে মনে উৎসুক তার আভাসমাত্রও পাননি কখনও। তাঁর মহত্বকে ঝিনুক স্বীকার করেছে, কিন্তু তাঁর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করতে সে দ্বিধা করেনি। এর কারণ কি? এর কারণ ওই মামুদ শা, মহম্মদ ঘোরী, আলাউদ্দিন খিলিজি আর আওরঙ্গজেবের নিষ্ঠুর ইতিহাস। এ কলিমা কি কোনদিন ধুয়ে ফেলা যাবে না? কত চোখের জল লাগবে এজন্য? রাজপুত জাতির ইতিহাস পড়তে পড়তে এইসব কথাই ভাবছিলেন তিনি। রাজপুত জাতির ইতিহাসে মুসলমানদের কলঙ্ক ঘনমসিরেখায় আঁকা আছে। মুসলমান বাদশাহদের প্রতিপত্তি আজ নেই, হয়তো তাঁরা ভালো কাজও কিছু করেছিলেন, কিন্তু সে-সব কথা আজ কারও মনে নেই। কেবল মনে আছে তাঁরা ছিলেন কামুক, লোভী, পরস্ত্রী-লোলুপ, অমানুষ। বিচারশালায় আসামীর কাঠগড়ায় যারা চিরকাল দাঁড়িয়ে আছে, চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবে, ওরা তাদের দলে। মাঝে মাঝে স্থবেদার খাঁর মনে হচ্ছিল এসব ইতিহাস কি সত্য? মিথ্যা ইতিহাসও তো ছাপার অক্ষরে লেখা আছে অনেক। অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাসটা যে মিথ্যা তাতো প্রমাণ করে দিয়েছেন অক্ষয় মৈত্রেয়। হঠাৎ একটা অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা হল তাঁর, তিনি যদি ইনজিন ড্রাইভার না হয়ে ঐতিহাসিক হতেন, বিরাট গবেষণা করে যদি মুসলমান সম্রাটদের কলঙ্ক স্খালন করতে পারতেন, যদি তাঁর সেই নির্ভুল গবেষণা ঝিনুকের চোখে পড়ত, যদি সে একবারও মনে ভাবত, না, আমি ভুল করেছিলাম……।

হঠাৎ স্থবেদার খাঁর কল্পনা-জাল ছিন্ন হয়ে গেল। তাঁর ঘরের বন্ধদ্বারে কে যেন টুক্ টুক্ করে টোকা দিতে লাগল। খুলে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। একটা বাঁদর। কপাট খোলা পেয়েই বাঁদরটা টপ্ করে তাঁর ঘরে ঢুকে তড়াক করে টেবিলে লাফিয়ে উঠল। রাত্রে খাবেন বলে একটা আপেল কিনেছিলেন স্থবেদার খাঁ, সেইটে তুলে নিয়ে টপ্ করে বেরিয়ে গেল আবার। স্থবেদার তার পিছুপিছু গিয়ে দেখলেন, কিছু দূরে গিয়ে একটা ঘরে ঢুকে পড়ল সে। বিস্মিত হ'য়ে তিনিও দ্রুতপদে গেলেন সেখানে। গিয়ে দেখেন, ঘরের মধ্যে একটি ভদ্রলোক রয়েছেন। বাঁদরটা টেবিলের উপর আপেলটা রেখে দিয়েছে আর চেয়ারে বসে মিটিমিটি চাইছে ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোক মৃদু হেসে তার দিকে চেয়ে বলছেন, গুড্, গুড্, ভেরি গুড্। অবাক হয়ে গেলেন স্থবেদার খাঁ।

একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "কিছু যদি মনে না করেন—"

ভদ্রলোক ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন তাঁর দিকে।

"কে আপনি? কি চান?"

ভদ্রলোক দেখতে সুন্দর। পাতলা ছিপছিপে চেহারা। মুখে সুচালো ফ্রেঞ্চকাট কাটা দাড়ি, চঞ্চল চোখ দুটি নীলাভ। পরনে ফুলদার আদ্দির পাঞ্জাবি, ঢিলে পায়জামা, মখমলের চটি। মাথায় গোল টুপিটিও মখমলের। বাঁ হাতে খুব লম্বা সাদা সিগারেট হোল্ডারে কালো ইজিপ্‌শিয়ান সিগারেট। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কিন্তু চমকে উঠলেন সুবেদার খাঁ। তাঁর মনে হ'ল একটা নেকড়ে যেন মনুষ্যমূর্তি ধরেছে। সিগারেটে খুব সন্তর্পণে একটি টান দিয়ে তিনি আবার বললেন, "কি চান আপনি?"

সুবেদার খাঁ তাঁর স্বভাবসুলভ ভদ্রতাবশত বললেন, "আদাব। ওই বাঁদরটা কি আপনার পোষা? ও আমার ঘর থেকে আপেলটা নিয়ে এসেছে এখুনি।"

ভদ্রলোক একটু মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন। আর একবার টান দিলেন সিগারেটে। তারপর বাঁদরটাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মংকু, অন্যায় করেছ। এঁর মুখের গ্রাস কেড়ে এনেছ তুমি। দুঃখিত হয়েছেন ভদ্রলোক। যাও, দিয়ে এস ওটা ওঁর ঘরে।"

বাঁদরটা টপ্‌ করে চেয়ার থেকে নেমে আপেলটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ভদ্রলোক বললেন, "ও আপনার ঘরে গিয়ে ঠিক রেখে আসবে বসুন।"

সুবেদার খাঁ ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসলেন।

"আপনার পোষা বাঁদর?"

"ও আমার ছেলে। ওর মা ওকে প্রসব করেই মারা যায়। আমি ওকে মানুষ করেছি।"

"এ কি করে সম্ভব হ'ল?"

"আমি সার্কাসে animal trainer ছিলাম, পশুদের শিক্ষা দিতাম। তখনই ওকে মানুষ করেছিলাম। তারপর থেকেই ও বরাবর সঙ্গে আছে। ওর মা-ও আমাকে খুব ভালবাসত।

"ও আপনার সব কথা শোনে?"

"সমস্ত। নিজের ছেলে হ'লে এত বাধ্য হ'ত না।"

"বলেন কি! আপনি এখনও সার্কাসে চাকরি করেন?"

"অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি। মংকুই এখন রোজগার করে খাওয়ায় আমাকে।"

বলতে বলতেই মংকু ঘরে এসে ঢুকল, তার বগলে একটা পাঁউরুটি।

"ওই দেখুন। এটা সরিয়ে রাখা যাক। পাঁউরুটির মালিক যদি এসে হাজির হয়, তা হলে আজ রাত্রে উপবাস করতে হবে।"

মংকুর হাত থেকে পাঁউরুটিটি নিয়ে তিনি তাঁর স্যুটকেসে পুরে রাখলেন এবং সুবেদার খাঁর দিকে চেয়ে হাসলেন একটু।

"মংকু অতি-আধুনিক পদ্ধতিতে রোজগার করে। মানুষের অসাবধানতার সুযোগ নেয় ও। ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ীরাও তাই করে।"

সন্তর্পণে সিগারেটে টান দিতে লাগলেন। কোথায় যেন একটা ঘড়িতে বারোটা বাজল। "এবারে খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক্। আপনার খাওয়া হয়েছে? না হ'য়ে থাকে তো আমার সঙ্গে খেতে পারেন। মংকু আজ মন্দ রোজগার করেনি—"

"আমার খাওয়া হ'য়ে গেছে। আপনার বাড়ি কোথায়? বাংলা দেশে?"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "আমি world citizen : আমার নাম পৃথিবী-নন্দন। অন্য কোন পরিচয় এ যুগে অচল।"

মুচকি মুচকি ব্যঙ্গ হাসি ফুটে উঠল মুখে। সুবেদার খাঁর বিস্ময়ের ঘোর কেটে গিয়েছিল। তিনি এই অদ্ভুত লোকটির কথাবার্তায় কৌতুক অনুভব করছিলেন, লোকটির প্রতি আকর্ষণও অনুভব করছিলেন একটা অপূর্ব ব্যঙ্গরসের চমক ভদ্রলোকের চোখে-মুখে, কথাবার্তায়। তাঁর কথা আরও শোনবার জন্যে তাই প্রশ্ন করলেন, "অচল? কি রকম?"

"অচল নয়? আপনি অতি সেকেলে লোক মনে হচ্ছে। এখনও অবশ্য আমরা যথেষ্ট উদার হতে পারিনি। এখনও নারকেল গাছে যে ফল ফলে তাকে আমরা নারকেলই বলি, কিন্তু বাংলা দেশে যে জন্মেছে সে নিজের পরিচয় বাঙলী বলে দিলেই আধুনিক উন্নত সমাজ, বিশেষ করে রাজনৈতিক সমাজ, নাক সিঁটকে ছ্যা ছ্যা করে। তাকে প্রাদেশিক বলে গালাগালিও দেয়। তাই আমি ও ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে দিয়েছি, তাই আমি পৃথিবী-নন্দন। আপনি কি বসবেন?"

"আপনার যদি আপত্তি না থাকে—"

"কিছুমাত্র আপত্তি নেই। তাহলে দাঁড়ান, কপাটটা ভেজিয়ে দিই। খিদে পেয়েছে, খেতে হবে। মংকুও অনেকক্ষণ কিছু খায়নি।"

পৃথিবী-নন্দন ঘরের কপাট বন্ধ করে বাক্স খুলে খাবার বের করলেন। একটি গোটা পাঁউরুটি, গোটা দুই কাটলেট, একটা সিদ্ধ ডিম, একটা পেয়ারা আর কয়েকটা কলা।

সুবেদার খাঁর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি হেসে বললেন, "সব মংকু রোজগার করেছে—"

তিনি দুটি কলা, পেয়ারাটা আর আধখানা পাঁউরুটি মংকুকে দিলেন।

"মংকু মাংস খায় না। মনুষ্য সমাজেও অনেকে মংকুর আদর্শ অনুসরণ করছে। ধড়িবাজ, বদমায়েসরা আর দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকেরা প্রায় দেখবেন নিরামিষাশী। মংকু খাও—"

মংকু আদেশের জন্য অপেক্ষা করছিল। "খাও" বলতেই খাওয়া শুরু করে দিল।

সুবেদার খাঁ বললেন, "যদি একটা অনুরোধ করি, রাখবেন?"

"কি বলুন, অসম্ভব না হলে নিশ্চয়ই রাখব।"

"আমার আপেলটা এনে দি। আপনি আর মংকু খান। খেলে সত্যিই আমি খুশী হব।" পৃথিবী-নন্দন স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "তাহলে মস্ত বড় একটা ঝুঁকি নিতে হয়।"

"কিসের ঝুঁকি?"

"বন্ধুত্বের। আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হয় তাহলে। অচেনা লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা, অচেনা লোকের কাছ থেকে "চেক" নেওয়ার মতো অনেকটা। প্রায়ই দেখেছি dishonoured হয়, ধোপে টেকে না। ভুয়ো চেক আর ভুয়ো বন্ধুত্বের আজকাল ছড়াছড়ি। আমার মংকু যখন আপেলটা এনেছিল, তখন সেটা ছিল তার স্বোপার্জিত সম্পত্তি। তখন তাতে আমার দাবি ছিল। এখন আপনার কাছ থেকে যদি ওটা নিই তাহলে হয় দাম দিতে হবে, না হয় প্রতিদানে কিছু একটা করতে হবে। হৃদয় ছাড়া এখন আমার দেবার মতো আর কিছু নেই। সে হৃদয়ও ভগ্ন-হৃদয়। নেবেন কি সেটা? বিনিময়ে কি আপনারটাও পাব?"

"নিশ্চয় পাবেন।"

"আপনারটা আশা করি গোটা আছে।"

"না। চিড় খেয়েছে।

"তাহলে মিলবে ভালো। আসুন আপেল।"

সুবেদার খাঁ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে আপেলটি নিয়ে এলেন। পৃথিবী-নন্দন সমান তিন ভাগে ভাগ করলেন সেটি। একটি সুবেদার খাঁকে দিলেন,

"আসুন, আপনাকে একেবারে বঞ্চিত করব না"

তারপর একটি মংকুকে দিয়ে তৃতীয় টুকরোটি নিজে খেলেন।

আহারাদি শেষ হলে পৃথিবী-নন্দন তাঁর লম্বা সিগারেট হোল্ডারে আর একটি ইজিপ্‌শিয়ান সিগারেট পরিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে ধরালেন সেটি। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "দেখুন মশাই, আপনার সঙ্গে বন্ধুত্বই যখন হ'ল তখন প্রথমেই আপনাকে প্রাণের একটি মর্মস্পর্শী গোপন কথা নিবেদন করি। আশা করি সে অধিকার আমি অর্জন করেছি।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। কি কথা বলুন।

"আমি এখন কপর্দকশূন্য। আপনার কাছে কিছু অর্থ-সাহায্য চাই। মংকু আমার খাবারটা যোগাড় করে এনে দেয় বটে, মাঝে মাঝে টাকা-কড়িও এনে দেয়, কিন্তু ও এখনও expert pick-pocket হ'য়ে উঠতে পারেনি। আজ ভোরেই আমাকে এ হোটেল ছাড়তে হবে। অথচ পকেটে পয়সা নেই। হোটেল চার্জ পাঁচ টাকা। তা ছাড়া কিছু ট্রেনভাড়া—"

সুবেদার খাঁ আবার অবাক হলেন। ভদ্রলোকের পকেটে পয়সা নেই, অথচ হোটেলে এসে উঠেছেন! বললেন, "আমার কাছে কিছু আছে, দেব আপনাকে। তবে একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে—"

"বলুন। অকপটে বলুন। আপনি আমার বন্ধু—"

"আপনি কপর্দকশূন্য কিন্তু হোটেলে এসে উঠলেন কেন? আমার সঙ্গে যদি দেখা না হ'ত?"

"আর কারও সঙ্গে হ'ত। কিংবা আজ যাওয়া হ'ত না, অপেক্ষা করতে হ'ত,

মংকুই হয়তো কোন ফাঁকে হোটেল ম্যানেজারের টাকার থলিটা এনে দিত আমাকে, কিংবা আরও অপ্রত্যাশিত রকম কিছু হ'ত। মোটকথা কিছু একটা হ'ত।"

তারপর মৃদু হেসে বললেন, "জীবনে কোথাও আটকাইনি।"

হাসিমুখেই চেয়ে রইলেন তিনি সুবেদার খাঁর দিকে। সুবেদার খাঁ সবিস্ময়ে দেখলেন তাঁর মুখে চিন্তার লেশমাত্র নেই।

পৃথিবী-নন্দন বললেন, "ঘৃণা হচ্ছে? বইয়ে পড়েছি এ দেশে আগে একরকম সাধু ছিলেন তাঁরা রোজগার করতেন না, ভিক্ষা করতেন না, রাস্তায় যখন যা পেতেন তাই কুড়িয়ে নিতেন। তাতেই তাঁদের চলে যেত। তাঁদের নাম ছিল উঞ্ছবৃত্তিধারী। সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব খাতির ছিল তাঁদের। আমিও অনেকটা সেই ধাঁচের লোক, রাস্তা থেকে যখন যা পাই তা কুড়িয়ে নিই। কিন্তু যুগ বদলেছে, ভদ্রলোক নেই, উদার লোক নেই, রাস্তায় আজকাল বড় একটা কিছু পড়ে থাকে না, তাই আমাকেও একটু বদলাতে হয়েছে। আপনার কাছে যে টাকাটা নিচ্ছি সেটা ধার নিচ্ছি না, ভিক্ষাও নয়, ওটা নিচ্ছি বন্ধুত্বের দাবিতে। এতে যদি আপনি রাজী না থাকেন, দেবেন না"

"না, না, বন্ধুত্বের দাবিতেই দিচ্ছি এটা, ধার বা ভিক্ষা নয়। আপনার মতো লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়াতে খুবই আনন্দিত হয়েছি, আপনার মতো লোক আমি দেখিনি।"

ব্যাগ থেকে দশটি টাকা বার করে দিলেন তাঁকে।

"আর একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। আপনি কি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ান?"

"না। একটা উদ্দেশ্য আছে বইকি, কিন্তু সেটা এখন বলা যাবে না। আর একটা উদ্দেশ্য আছে—ফোটো তোলা। অনেক অচেনা লোকের ফোটো তুলি আমি। দেবেন আপনার একটা ফোটো তুলতে?"

"আমার ফোটো? বেশ তুলুন।"

পৃথিবী-নন্দন সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্যামেরা বার করে ফ্ল্যাশ-লাইটে একটা ফোটো তুলে ফেললেন সুবেদার খাঁর।

তারপর হেসে বললেন—"আপনার স্মৃতি-চিহ্ন রইল একটা আমার কাছে। কিন্তু আপনার পরিচয় তো কিছু পেলাম না, যদিও আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললাম।"

"আমার নাম সুবেদার খাঁ। সামান্য লোক আমি। ইনজিন ড্রাইভার। রেলগাড়ি চালাই।"

"মুসলমান?"

সহসা পৃথিবী-নন্দনের মুখের নেকড়েভাবটা আরও প্রখর হয়ে উঠল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "রেলের ইনজিন ড্রাইভার? তাহলে তো মস্ত লোক আপনি। কখন ডিউটি আপনার?"

"চব্বিশ ঘণ্টা পরে। সাহেবগঞ্জ থেকে আমি ডিউটিতে জয়েন করব।"

"ও। আমি তো একটু পরেই চলে যাব। আবার দেখা হবে। পৃথিবী গোল। আমি সার্কাস-ওলা আর ভবঘুরে। এখন প্রেয়সীর কণ্ঠহারের সন্ধানে ঘুরছি!"

"কি রকম?"

"সব কথা এখন বলা যাবে না। আর আধ ঘণ্টা পরে আমার ট্রেন। আসুন।"

হাত বাড়িয়ে দিলেন পৃথিবী-নন্দন। সোচ্ছ্বাসে করমর্দন করলেন।

"মংকু, তুমিও স্যালিউট্ কর।"

মংকুও মিলিটারি কায়দায় স্যালিউট্ করল। তারপর পৃথিবী-নন্দন আর একবার অভিবাদন করে স্যুটকেসটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মংকুও লাফাতে লাফাতে তার পিছু-পিছু চলে গেল। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সুবেদার খাঁ। এরকম অদ্ভুত লোক তিনি দেখেননি। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল—লোকটা আমার ফোটো তুললে কেন?

॥ ২৪ ॥

কিছুদিন পরে গণেশ হালদারও খুব অবাক হলেন। একদিন স্থানীয় একটা ছাপাখানা থেকে একটা কুলি প্রকাণ্ড একটা প্যাকেট নিয়ে এসে হাজির হ'ল। কুলির হাতে একটি চিঠিও ছিল। ছাপাখানার ম্যানেজার লিখেছেন—"ডাক্তার সুঠাম মুখার্জির নির্দেশে এগুলি আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। দশ হাজার কপি আছে। প্রেসের বিল ডাক্তার মুখার্জি চুকিয়ে দিয়েছেন। অনুগ্রহ করে প্রাপ্তি-সংবাদ দেবেন।"

"কিসের কপি?"

যে ছোকরাটি সঙ্গে এসেছিল সে বলল, "ডাক্তার মুখার্জি একটা প্যামফ্লেট ছাপতে দিয়েছিলেন।"

প্যাকেট নামিয়ে একটা প্যামফ্লেট বার করেও দিল সে। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন গণেশ হালদার। প্রাদেশিকতা নিয়ে যে প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন, যেটি কাগজে ছাপা হয়নি, ফেরত এসেছিল, সেইটি এমন সুন্দর করে ছাপিয়ে দিয়েছেন তিনি! আনন্দে কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন ভরে উঠল। তিনি প্রেসের ম্যানেজারকে তাড়াতাড়ি একটা প্রাপ্তি-সংবাদ দিয়ে প্যামফ্লেটের প্যাকেটটা নিয়ে ছুটলেন ডাক্তারবাবুর কাছে।

ডাক্তারবাবু তখন বিজয়কে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বিজয়ের নামে তার পিসতুতো বোন পাকিয়া নালিশ করেছে। মাইজি যখন পুজোর ঘরে পুজো করছিলেন তখন বিজয় নাকি মুরগির ডিম নিয়ে সেখানে ঢুকে মাইজিকে বিরক্ত করেছিল। বিজয় বলছে, সে পুজোর ঘরে ঢুকেছিল বটে কিন্তু মাইজিকে বিরক্ত করেনি; ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেছে, ডিমটা কোথায় রাখবে। এতে মাইজি বিরক্ত হননি। পাকিয়ার নামেও বিজয় পালটা নালিশ রুজু করেছে একটা। পাড়ার দরজীর দোকানে যে পোষা বাঁদরীটা বসে থাকে, পাকিয়া বলছে বিজয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেবে, বাঁদরীটা নাকি বিজয়কে রোজ ডাকছে। এ খবরে ডাক্তারবাবু বেশ উৎসাহ বোধ করতে লাগলেন।

বললেন, ভালোই তো, বিয়ের সময় বিজয়কে তিনি লাল মখমলের টুপি, মখমলের কোট আর মখমলের প্যাণ্ট করিয়ে দেবেন। আর বাঁদরীটাকে দেবেন একটা বেনারসীর ঘাগরা।

বিজয় চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, "হম্ ওকরা৽পাস নেই যাম্।" (আমি ওর কাছে যাব না)

"কেন যাবি না ? পাত্রী তো ভালো।"

"ওকরা বডা বড়া 'ন' ছে।" (ওর বড় বড নখ আছে।)

"সে বৈজু নাপিতকে ডেকে কাটিয়ে নিলেই হবে "

"আংমে লম্বা লম্বা রেঁায়া ছে।" (গায়ে বড বড লোম আছে।)

"সে-ও বৈজু কেটে দেবে।"

"নেই, হম্ নেই যাম্। ওকরা পুছডি ছে।" (না আমি যাব না, ওর ল্যাজ আছে।)

"ভালোই তো। তোকেও আমি একটা চামড়ার ল্যাজ বানিয়ে দেব। প্যাণ্টের বেল্ট থেকে ঝুলবে। বেশ ভালো হবে। দুজনেই পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা খাবি। উঁচু ডাল থেকে তোকে পাকা পাকা পেয়ারা পেডে দেবে। তুই তো উঁচুতে উঠতে পারিস না।"

"উ আপনে গবর গবর খাইতে।" (ও নিজেই গব গব করে খেয়ে ফেলবে।)

"না, না, তা কি হয়! তোকে দেবে—"

পাকিয়া ফোডন দিলে—"দরজীকে উ আম দেইছে। চল না, আপনা আঁখ সে দেখবি।" (দরজীকে আম দেয়। চল না, নিজের চোখেই দেখবি।)

"হম্ নেই যাম্। উ কাটাহা ছে।" (আমি যাব না। ও কামড়ায়।) এমন সময় রকেট আর ভুটান ছুটোছুটি করতে করতে এসে হাজির হ'ল। রকেট যথারীতি ভুটানের কান কামড়াচ্ছিল, আর ভুটান খ্যাঁক খ্যাঁক করে বকছিল তাকে। রকেট ভুটানের সঙ্গে খেলা করতে চায় কিন্তু ভুটান কিছুতেই রাজী হয় না। হয় না, কারণ এই বেমানান বপ্রক্রীড়ায় ভুটান বেচারা সত্যিই বিব্রত হ'য়ে পডে। রকেট তার সমস্ত মুণ্ডটাই মুখের ভিতর ঢুকিয়ে ফেলে, কখনও ল্যাজটা ধরে দোলায়। এতটা ভুটানের পক্ষে সহ্য করা শক্ত। বিজয় ভুটানের দুঃখ বোঝে, রকেট তার হাতটাও মাঝে মাঝে মুখে ঢুকিয়ে আলতোভাবে কামডে রাখে। বিজয় এগিয়ে গিয়ে রকেটকে ধমক দিয়ে কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল।

"নো, নো, কাম হিয়াল, কাম হিয়াল।"

রকেট কোন আপত্তি করল না, ঘাড় নীচু করে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বিজয়ের সঙ্গে গেল।

"ছিট ডাউন।"

রকেট সামনের থাবা জুটোর উপর মুখ রেখে বসল। এরকম বসার মানে, এরা একটু অন্যমনস্ক হলেই ও উঠে পালাবে।

ঠিক এই সময় প্যামক্রেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে মাস্টার মশাই এলেন।

আসুন মাস্টার মশাই, কি খবর ? হাতে ওটা কি ?"

"আপনাকেই তো জিজ্ঞেস করতে এসেছি, এ কি করেছেন আপনি ?"

ডাক্তারবাবু প্যামফ্লেটটা দেখে বললেন, "ও, ওটা বুঝি ছেপে দিয়ে গেছে। আমার মনেই ছিল না। ভালো ছেপেছে তো ?"

উল্টেপাল্টে দেখলেন।

"ভালোই ছেপেছে। ব্যস, আর কি। এবার বিতরণ করুন। আপনার বক্তব্য পাঁচজনকে জানানোই তো আপনার উদ্দেশ্য—"

"আপনি হঠাৎ ছাপতে দিলেন কেন ?" কুণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন গণেশ হালদার।

"প্রবন্ধটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। যদিও অনেক জায়গায় আপনার মতের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই, কিন্তু প্রবন্ধটা আপনি লিখেছেন ভালো। আপনার বক্তব্যটা বেশ জোরালোভাবে ফোটাতে পেরেছেন তাই, ভাবলাম ছাপিয়ে দিই—"

কিন্তু আসল কথাটা ডাক্তার মুখার্জি বললেন না। প্রবন্ধটা কাগজে ছাপেনি, ফেরত দিয়েছে, এই কথাটা যখন গণেশ হালদার বলেছিলেন সেদিন, তখন তাঁর মুখে যে বেদনার ছাপ ফুটে উঠেছিল তা বড়ই ব্যথা দিয়েছিল ডাক্তার মুখার্জিকে। তিনি তখনই ঠিক করেছিলেন ছাপিয়ে দেবেন প্রবন্ধটাকে। কতই বা খরচ !

"এতগুলো নিয়ে আমি এখন কি করব !"

"ওই যে বললাম। বিতরণ করুন। গণতন্ত্রে সবারই নিজের নিজের মত আইনতঃ প্রচার করবার অধিকার আছে। কাগজওয়ালারা ভয়ে যখন আপনার মত ছাপতে চাইছে না, তখন আসুন আমরাই ছাপি। প্রবন্ধটাতে অনেক সত্য কথা বলেছেন আপনি ."

"স্কুলে বিতরণ করব ?"

"ক্ষতি কি। এক কাজ করুন। একটা লোক বহাল করুন। সে স্টেশনে গিয়ে প্রতি ট্রেনে ট্রেনে কিছু বিলি করে আসুক। আপনার বন্ধুবান্ধবদেরও দিন কিছু-কিছু। এই দুর্গা, তোর ভাইটা আজকাল কি করছে ?'

"ঘর মে বৈঠলো ছে।" (ঘরে বসে আছে।)

"ওকে তাহলে ডেকে নিয়ে আয়। এ রোজ বাবুর কাছ থেকে বই নিয়ে স্টেশনে প্রত্যেক ট্রেনের প্যাসেঞ্জারদের দিয়ে আসবে। মজুরি যা চায় আমি দিয়ে দেব।"

গণেশ হালদারের আত্মসম্মান এতে যেন আহত হ'ল একটু।

"না, না, মজুরি আপনি দেবেন কেন ? আপনি যা ঠিক করে দেবেন তা আমিই দিয়ে দেব। সব বিষয়ে আপনার উপর দাবি করাটা কি ভালো দেখায় ? আপনি আমার জন্যে যা করছেন—"

গণেশ হালদার আর কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর চোখে জল এসে পড়ল।

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তারপর বললেন, "বেশ, আপনার যা ইচ্ছে। এর থেকে একটা কথা কিন্তু বেশ বোঝা গেল।"

উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলেন গণেশ হালদার।

"এতদিনেও আমি আপনাকে আপনার লোক করতে পারিনি। পারলে এসব কথা আপনার মনে জাগত না। আমার মতো উদ্বাস্তুদের এইটেই ট্র্যাজিডি। আমরা জোর গলায় কিছু দাবি করতে পারি না, কিন্তু মনে মনে আকাঙ্ক্ষা, আশপাশের সকলকে আপন করি। কিন্তু পারি না। দৃশ্য এবং অদৃশ্য নানারকম বাধা এসে হাজির হয়। নানা রকম সংস্কার এসে দুর্লঙ্ঘ্য দেওয়াল খাড়া করে।

তারপর একটু থেমে বললেন, "আপনি আপনার পথে চলে সুখী হোন এইটেই চাই। কোন বিষয়ে জোর-জবরদস্তি করা আমার স্বভাব নয়।"

গণেশ হালদার অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "আমার স্কুলের সময় হয়েছে, এবার আমি যাই।"

"আমাকেও উঠতে হবে। স্কুলেও আপনার প্যামফ্লেট কিছু বিলি করবেন। আমাকেও খান কয়েক দিন, ল্যাবরেটরিতে রেখে দেব। শিক্ষিত রোগী এলে দেব।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

গণেশ হালদার তাড়াতাড়ি চলে গেলেন এবং এক গোছা প্যামফ্লেট ডাক্তারবাবুর মোটরে রেখে দিলেন।

রেস-কোর্সের মাঠে পীরবাবার সমাধির চারপাশে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে সেখানে গিয়েই বসেছিলেন ডাক্তার মুখার্জি। দূর্বাঘাসে ছেয়ে গিয়েছিল জায়গাটা। প্রথমে গিয়েই তাঁর মনে হয়েছিল পুরাতন বন্ধুরা যেন ভিড় করেছে এসে। অহেতুকভাবে মনে হয়েছিল কাছে গেলেই সোল্লাসে সম্বর্ধনা জানাবে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলেন, কিছুই হ'ল না। তিনি কাছে এলেন বলে একটুও শিহরণ জাগল না দূর্বাদলের আস্তরণে। আগেও তিনি বারবার অনুভব করেছেন, সেদিনও আবার করলেন, প্রকৃতিকে আপন করা যায় না। তার কাছে যাওয়া যায়। খুব কাছে যাওয়া যায়, কিন্তু সে কখনও আপন হয় না। মাঠের ঘাস আর আকাশের মেঘ, একটা খুব কাছে, আর একটা খুব দূরে, কিন্তু দুইই সমান নাগালের বাইরে। সমান উদাসীন। কেউ অন্তরঙ্গভাবে ধরা দেয় না। এই যে আশেপাশে রোজ এত জিনিস দেখেন, ওই যে নীলকণ্ঠ পাখিরা চতুর্দিক সচকিত করে প্রেয়সী-বন্দনা করছে—ওদের তিনি কখনও আপন করতে পারবেন না। খাঁচায় বন্ধ করেও না। ওই যে অত কাছে শালিকগুলো চরছে, তারা কি কখনও আপন হবে? দেখা হলে আপনা থেকে কাছে আসবে? কখনও না। ওদের খাবার দিয়ে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করেছেন, ওরা নাগালের বাইরে থেকে খাবারটি খেয়ে যায়, কিন্তু ধরা দেয় না। তাঁর মনে হ'ল এই বোধহয় কবি-কল্পিত অধরা। কাছাকাছি আছে, কিন্তু ধরা যায় না। চুপ করে বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর পকেট থেকে খাবারের ঠোঙা বার করলেন। পাখিদের জন্য খাবার এনেছিলেন। ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিলেন। শালিকগুলো উড়ে উড়ে পালাল। তিনি একটু দূরে গিয়ে বসলেন। তিনি জানেন কাছে থাকলে ওরা

আসবে না। ওদের দিকে পিছন ফিরে বসে রইলেন। একটু পরে ঘুরে দেখলেন শালিক-গুলো পালিয়েছে, কাকেরা এসে খাচ্ছে খাবারগুলো। মুচকি হাসলেন একটু। কাকেরা শত্রু নয় তাঁর, কিন্তু ওদের মধ্যে তিনি বাংলা প্রবচনের ধূর্ত 'নেপো'দের যেন প্রত্যক্ষ করলেন। একটা কথা মনে হ'ল, পক্ষীজগতে ওরা বোধ হয় রাজনীতিবিদ। বিষ্ণুশর্মার সাহিত্যে ওদের বেশ একটা বড় স্থান আছে।···হঠাৎ মনে পড়ল গণেশ হালদারের জন্য কিছু লিখতে হবে। দেখলেন রেল-লাইনের ওপারে মাঠের মধ্যে সেই পাথরটা রয়েছে এখনও। মানুষে না সরালে পাথর সরে না। পাথরটার চারদিকে গজিয়েছে সবুজ ভুট্টার ফসল। শ্যাম শোভায় পাথরের রুক্ষকান্তি প্রায় ঢেকে গেছে। সেই দিকেই গেলেন সুঠাম মুকুজ্যে। গিয়ে একটি নূতন জিনিসও দেখতে পেলেন। পাতার একটি ছোট কুঁড়েও রয়েছে ক্ষেতের মধ্যে। এক ক্ষুদে পাহারাদারও বসে আছে সেখানে। তাকে গিয়ে বললেন, "আমি এখানে বসে লিখতে চাই। কোথা বসি বলতো।"

সে তৎক্ষণাৎ তার খড়ের ছোট্ট বিছানাটি দেখিয়ে বললে—"এইখানেই বসুন না!"

"তুমি কোথা বসবে ?"

"আমি এধার ওধার ঘুরব।"

"তুমি খেয়ে এসেছ ?"

"না। আমার মা রোজ খাবার দিয়ে যায়। আজ মায়ের কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে। এমনিই কাটিয়ে দেব দিনটা।"

"ক্ষিধে পাবে না ?"

"ক্ষিধে পেলে পেয়ারা খাব। ওই যে একটা গাছ রয়েছে—"

এক মুখ দাঁত বার করে হাসলে। গাছটা একটু দূরে ছিল। পাছে তিনি অন্য কিছু মনে করেন এই ভেবে ছেলেটি বললে—

"গাছটাও এই ক্ষেতের মালিকের। তিনি আমাকে পেয়ারা খেতে বলেছেন।"

ডাক্তারবাবু লক্ষ্য করলেন যদিও ছেলেটি এদেশের ভাষায় কথা বলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কথায় পূর্ববঙ্গের টান রয়েছে। বোধহয় রেফিউজি।

ডাক্তারবাবু বললেন—"শুধু পেয়ারা খেয়েই থাকবে ? তার চেয়ে এক কাজ কর না। আমি দুটো টাকা আর তোমার মায়ের জ্বরের জন্য একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছি। তুমি ওষুধ নিয়ে মায়ের কাছে চলে যাও। মাকে দেখে খাবার খেয়ে চলে এস। আমি ততক্ষণ তোমার ক্ষেত পাহারা দিচ্ছি।"

"ওষুধ কোথায় পাব ?"

"ওষুধের দোকানে। ও, আচ্ছা দাঁড়াও—"

পকেট থেকে হুইস্‌ল বার করে বাজালেন ডাক্তারবাবু।

ছেলেটা বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়েছিল তাঁর মুখের দিকে।

ডাক্তারবাবু বললেন, "আমার মোটর আসছে। তাতে চড়ে তুমি চলে যাও।

ড্রাইভার তোমাকে ওষুধ কিনে বাড়ি পৌঁছে দেবে। তারপর তোমার খাওয়া হয়ে গেলে নিয়ে আসবে।"

বেচু এসে পড়ল।

ছেলেটার মুখ দেখে মনে হ'ল ও যেন স্বপ্ন দেখছে। বিস্ময়ে আনন্দে নির্বাক হ'য়ে গিয়েছিল সে। তার দাঁত আর ঢাকছিল না।

"আমি যাব? ওই মোটরে!"

"হ্যাঁ, আমি বেচুকে বলে দিচ্ছি। আমার ড্রাইভারের নাম বেচু।"

ডাক্তারবাবু বেচুকে ডেকে সব বুঝিয়ে বলে দিলেন। একটা প্রেসক্রপশন আর দুটো টাকাও দিয়ে দিলেন তাকে। ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেল বেচু।

ডাক্তারবাবু তন্ময় হ'য়ে লিখছিলেন:

"একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি মনে হচ্ছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সিদ্ধান্তকে প্রমাণের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে আমি এখন বিহার করছি সেখানে অনুভূতিই প্রমাণ. উপলব্ধিই শেষ কথা। আপনাকে কাজ দিতে হবে বলেই এটা লিখছি, তা না হলে লিখতুম না। প্রমাণের তখনই দরকার যখন সেটা বাইরের লোকের স্বীকৃতির ছাপ চায়। এখন যা মনে হচ্ছে তাতে বাইরের লোকের স্বীকৃতির প্রয়োজনই নেই। একটু আগেই মনে ক্ষোভ জাগছিল—জীবনে কাউকে আপন করতে পারলাম না। এখন মনে হচ্ছে জীবনে কাউকে আপন করা যায় না, যদি যেত তাহলে ভগবানের সৃষ্টি এক-রঙা হ'য়ে যেত। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের (এমন কি এক যমজ ভাইয়ের সঙ্গে আর এক যমজ ভাইয়েরও) কিছু-না-কিছু পার্থক্য আছে বলেই সৃষ্টি এত মনোহর. এত বিচিত্র, বিস্ময়ের আধার। আর এই পার্থক্যের জন্যই প্রত্যেকের এত স্বাতন্ত্র্য। একটা স্বাতন্ত্র্য আর একটা স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে পুরোপুরি মিলতে পারে না। তাই কেউ কারো আপনার হয় না। আপনার হতে হ'লে নিজের সত্তাকে অপরের সত্তার সঙ্গে পুরোপুরি মিলিয়ে দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সবার রঙে রঙ মেলাতে হবে। এইটেই আমাদের কামনা—ইংরেজীতে বলতে হয় wishful thinking: কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে জীবজগতে একটা রঙ আর একটা রঙের সঙ্গে মিলতে চায় না, মিলতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজের বৈশিষ্ট্যের দুর্গে বন্দী হয়ে আছে. সম্ভবত নিজের অজ্ঞাতসারেই। ছবির জগতে, মানুষ-চিত্রকরেরা, অনেক সময় প্রকৃতিও, একটা রঙের সঙ্গে আর একটা রঙ মেলায়। যখন সত্যি মিলে যায় তখন দুটো রঙের একটারও অস্তিত্ব থাকে না, তৃতীয় রঙের জন্ম হয়। ছবির জগতে এসব হয়, কিন্তু প্রাণীর জগতে হতে দেখি নি। প্রাণীর জগতে স্বাতন্ত্র্যের দুর্গ দুর্ভেদ্য। হরিহর-আত্মা বলে একটা কথা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু আসলে হরির সঙ্গে হরের মিলের চেয়ে অমিলই বেশী। একজন আকাশ-বিহারী গরুড়-বাহন, আর একজন হিমালয়-বিহারী ষণ্ড-বাহন। দু'জনে দু'লোকে বাস করেন। প্রাণী-জগতে কেউ কারও আপন হয় না, তার আর একটা

কারণও আছে। একজন প্রাণী আর একজন প্রাণীকে খেয়ে তবে বাঁচে। বাঁচবার জন্যে জীব-হিংসা প্রত্যেক প্রাণীর মজ্জাগত স্বভাব। যাদের পরস্পরের সঙ্গে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক তারা কি পরস্পরের আপন হতে পারে? মানুষ এককালে সব জানোয়ারই খেয়ে দেখেছে, এখন হয়তো সে কাকে খাবে সেটা নির্বাচন করে ফেলেছে, কিন্তু সকলেরই অবচেতনলোকে ভয়টা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে এখনও আছে। সবাই সবাইকে প্রচ্ছন্ন শত্রু মনে করে। হয়তো গাছেরাও আমাদের শত্রু মনে করে (জানি না মস্তিষ্ক জাতীয় কোনও যন্ত্র গাছেদের মধ্যে নেপথ্যে লীন হয়ে আছে কি না)—কিন্তু তারা পালাতে পারে না, তাদের ভাষাও আমরা বুঝি না, তাই তাদের বন্ধু মনে করি। গাছেরা নিজেরা কিন্তু সর্বগ্রাসী, সকলকে খেয়ে বেঁচে থাকে তারা। মাটির শরীর যবে মাটিতে মিশায় তখনই গাছ তার থেকে রস আহরণ করে পুষ্ট হয়ে ওঠে। তবু ওদের শত্রু বলে মনে হয় না, কারণ ওদের এই আহরণ বা শোষণটা প্রত্যক্ষ নয়, গোপন। বাঘের হরিণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার মতো, অথবা অন্তরীক্ষ থেকে বোমা নিক্ষেপ করে শত শত লোককে হনন করার মতো বীভৎস নয়। তাই বোধ হয় গাছকে আমরা বন্ধু ভাবি। গাছ অবশ্য আমাদের অনেক উপকারও করে। গাছকেও আমরা খাই—কেটে কুঁচিয়ে সিদ্ধ করে ভেজে পুড়িয়ে—নানা রকম করে খাই। গাছেরা আপত্তি করে না, তাদের চীৎকার বা আর্তনাদ আমরা শুনতে পাই না। এই কারণেই সম্ভবত অনেক নিরামিষাশী লোক নিজেদের অহিংস-পন্থী মনে করেন। বাছুরের মুখ থেকে মাতৃদুগ্ধ কেড়ে খেয়েও নিজেদের অহিংস মনে করতে বাধে না তাঁদের! কিন্তু পরমাণু-বিজ্ঞানের যেরকম দ্রুত উন্নতি হচ্ছে তাতে মনে হয় অনেক অসম্ভবই হয়তো সম্ভব হবে, হয়তো এমন এক যন্ত্র আবিষ্কৃত হবে যার সাহায্যে আমরা শত শত গাছের আর্তনাদ আর হাহাকার শুনতে পাব। উঠোনের লাউ কুমড়ো শশা-গাছের আকুল রোদন যদি কর্ণগোচর হয় কোনদিন, তাহলে 'কিচেন গার্ডেন'কেও কশাইখানার মতো শহরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। এখন গাছ মূক, মৌন নীরব। আমাদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করে না। বোবার শত্রু নেই বলেই আমরা গাছের বন্ধু। গাছকে বড় ভালো মনে করি, কবিতাও রচনা করি তাকে নিয়ে। কিন্তু গাছেদের একটা অদৃশ্য দিক আছে সেটা অনেকের জানা নেই। বিজ্ঞানীরাই শুধু জানে সেটা। আমাদের অধিকাংশ অসুখের কারণ যে ব্যাক্‌টিরিয়া, তারাও উদ্ভিদ্। উদ্ভিদ্-বংশের তারাই আদিম জীব, কিন্তু তারা দুর্ধর্ষ, প্রবল, আমাদের ঘোর শত্রু। এদের কথা ভাবলে, উদ্ভিদ্দের কি আপন লোক ভাবা যায়? কিন্তু যে কথা বলতে শুরু করেছিলাম কথায় কথায় তার থেকে অনেক দূর সরে এসেছি। আমার কথাটা ছিল, পৃথিবীতে কাউকে আপনজন করা যায় না যতক্ষণ নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেওয়া সহজ নয়। কিন্তু অসম্ভব কি? মনে হয় অসম্ভবও নয়। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়েছেন পৃথিবীতে এমন লোকও আছেন। যে মহা-উৎস থেকে নিখিল জগতের এত বৈচিত্র্য নিত্য উৎসারিত হচ্ছে সেই উৎসের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারলেই সকলের সঙ্গে মেলা যায়, সবাইকে আপন-করা সহজ

হ'য়ে পড়ে। কিন্তু সেই মহা-উৎসটা কি ? ভগবান ? প্রকৃতি ? এর উত্তর আমার জানা নেই। আমাদের জ্ঞানের পরিধি বহু-বিস্তৃত, তবু ওই উত্তরটুকু এখনও অজানা রয়ে গেছে। যাঁরা সবজান্তা, তাঁরা হয়তো অবজ্ঞার হাসি হাসবেন (এ হাসি হাসাটা খুবই সোজা!) কিন্তু এই কথাটা এখন প্রবলভাবে মনে হচ্ছে সেই অজানাকে জানতে পারলেই সব বিরোধের অবসান ঘটবে। সবাই তখন হয়ে যাবে আপন লোক। সিংহের সঙ্গে জেব্রার, পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের, শাসিতের সঙ্গে শাসকের, বস্তুত সকলের সঙ্গে সকলের মিল হয়ে যাবে তখন। এই কথাটা এখন মনে হচ্ছে, পরে হয়তো আবার অন্য রকম মনে হবে। মনের তো কোনও মতিস্থির নেই, যখন যেটা পায় তখন সেটাকে সত্য বলে আঁকড়ে ধরে। ধ্রুবলোক থেকে অনেক দূরে আছি তো!..."

ডাক্তারবাবু আরও হয়তো লিখতেন খানিকটা। বসে বসে ভাবছিলেন। এইটুকু লিখতেই তাঁর এক ঘণ্টার বেশী লেগে গিয়েছিল, টের পাননি। মোটরটা ফিরতেই ঘড়িটা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। আরও অবাক হলেন মোটরে সেই ছেলেটার সঙ্গে ঝিনুককে দেখে।

ঝিনুক নেমে এসে প্রণাম করল।

"তুমি কি করে এলে!"

"আপনার গাড়ি যখন গেল তখন আমি মন্টুদের বাড়িতে ছিলাম। মন্টুর মায়ের অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলাম তাঁকে। ওঁরা আমাদের দেশেরই লোক তো। প্রায়ই আমি যাই ওঁদের বাড়ি।"

"ও, এর নামই বুঝি মন্টু।"

"হ্যাঁ, ওরা সদ্‌ব্রাহ্মণ। ওর বাবা পুরোহিত ছিলেন। রায়টের সময় মুসলমানেরা ওঁকে কেটে ফেলে। ওর মা এখানে এসে গভর্নমেণ্টের দাক্ষিণ্যপ্রার্থী হয়ে আছেন। মিস্টার সেনের দয়ায় একখানা থাকবার ঘর পেয়েছেন।"

ঝিনুক চুপ করল।

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনিয়ে এল। তারপর সসঙ্কোচে ঝিনুক বলল, "একটা কথা যদি বলি রাগ করবেন না তো।"

"কি কথা?"

"মন্টুর মা আপনার টাকা আর প্রেসক্রিপশন ফেরত পাঠিয়েছেন। ডাক্তার ঘোষাল তাঁকে সকালেই ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাই—"

ঝিনুক সসঙ্কোচে টাকা দুটো আর প্রেসক্রিপশনটা রেখে দিলে ডাক্তার মুখার্জির সামনে।

"ও, ডাক্তার ঘোষাল ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন বুঝি। তা বেশ।"

হাসবার চেষ্টা করলেন ডাক্তার মুখার্জি।

"টাকা দুটো ফেরত দিচ্ছ কেন ? ও টাকা তো মনুকে দিয়েছি।"

"না, মনু টাকা নেবে না। বাঙালী রেফিউজিদের বদনাম রটেছে তারা নাকি ভিখারী। তাই আমাদের চেনা-শোনা কাউকে আমরা ভিক্ষা করতে দিই না। সবাইকে রোজগার করেই খেতে হবে। ডাক্তার ঘোষাল ওকে এই ক্ষেত পাহারার কাজটা জুটিয়ে দিয়েছেন। ও ভিক্ষে নেবে কেন ?"

এ শুনে ডাক্তার মুখার্জির মুখভাব যা হ'ল তা অবর্ণনীয়। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। চুপ করে রইলেন। তাঁর মুখের অপ্রস্তুত ভাব দেখে ঝিনুকেরও কষ্ট হ'ল। এমন একটা ভালো লোকের মনে আঘাত করে অনুতপ্ত হ'ল সে মনে মনে। তিনি যে এতটা আঘাত পাবেন সে ভাবে নি। তাছাড়া, শুধু টাকা ফিরিয়ে দিতেই সে আসে নি। ডাক্তার মুখার্জির কাছে তার আর একটা দরকারও ছিল। আইন-সঙ্গতভাবে আজকাল বিলাত যাওয়ার পথ বহু-কণ্টকাকীর্ণ। কর্তৃপক্ষ সহজে অনুমতি দিতে চান না। ঝিনুক খবর পেয়েছিল দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য বা এ-দেশে অলভ্য উচ্চশিক্ষা লাভ করবার জন্য আবেদন নাকি সহজে মঞ্জুর হয়। দুরারোগ্য অসুখের জন্য একজন বড ডাক্তারের সার্টিফিকেট প্রয়োজন। ডাক্তার মুখার্জি কি তাকে একখানা সার্টিফিকেট দিতে পারেন না ? ঝিনুক শুনেছে তাঁর বড বিলাতী ডিগ্রী আছে। কর্তৃপক্ষদের কাছে এখনও বিলাতী ডিগ্রীর কদর অনেক বেশী। সাব-অ্যাসিস্টেণ্ট সার্জন ডাক্তার ঘোষাল সেখানে কল্কে পাবেন না।

সুমিষ্ট হেসে ঝিনুক বলল, "আপনি রাগ করলেন না তো ? কারো কাছ থেকে ভিক্ষা নেওয়া কি ভালো ? এমনি তো আমরা চরম দুর্দশায় পডেছি, অনেক বদনাম রটেছে আমাদের নামে, অনেক বদনাম সত্বেও তাই আমরা একটা নীতির আদর্শ খাডা করেছি। আপনি তাতে সাহায্য করুন।"

ডাক্তার মুখার্জি হেসে বললেন, "আমি তো ঠিক ভিক্ষে দিই নি। মানে, আমি ওই ছেলেটির ঘরটা দখল করে এসে বসলাম কি না—তাই মানে—"

নিজেকে ঠিক প্রকাশ করতে না পেরে আবার থেমে গেলেন ডাক্তার মুখার্জি। তারপর হঠাৎ একটু জোর করে হেসে বললেন, "না, আমি রাগ করি নি, কিছু মনেও করি নি।"

হাসির আভায় ঝলমল করতে লাগল ঝিনুকের দৃষ্টি। তারপর চোখ নামিয়ে মৃদু-কণ্ঠে বলল, "আমি জানতুম আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনাদের মতো উদার লোকই তো আমাদের ভরসা"—তারপর হঠাৎ যেন মনে পডে গেল কথাটা—"আপনি কিন্তু আমার একটা সত্যিকারের উপকার করতে পারেন। করবেন ?"

"কি বল।"

কতকগুলো মিথ্যে কথা বলে গেল ঝিনুক।

"আমার একটা চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। ডাক্তার ঘোষালের চিকিৎসায় কিছু হয় নি। উনি বলছেন জর্মনীতে নাকি এ ব্যায়রামের চিকিৎসা হয়। আমি যাবার

টাকা জোগাড় করেছি। কিন্তু পাসপোর্ট পেতে হলে একজন বড় ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাই। ডাক্তার ঘোষালের সার্টিফিকেটে কাজ হবে না। ইচ্ছা আছে ডাক্তার ঘোষালকেও নিয়ে যাব, সঙ্গী হিসেবে। আপনি একটা সার্টিফিকেট দেবেন ?"

"আমি কি বড ডাক্তার ? না তো।"

ব্যঙ্গের মৃদু হাসি ফুটে উঠল ডাক্তার মুখার্জির মুখে।

"আপনার চেয়ে বড় ডাক্তার এ শহরে আর কে আছে! আপনার কত বিলাতী ডিগ্রী!"

চুপ করে রইলেন ডাক্তার মুখার্জি।

তারপর বললেন, "ডিগ্রী থাকলেই সরকারের দপ্তরে সেটা গ্রাহ্য হবে ?"

"শুনেছি, হবে। আপরার ডিগ্রী তো লণ্ডনের ?"

"হ্যাঁ।"

তারপর ইতস্তত করে চুপ করে গেলেন। চোখের সম্বন্ধেই তাঁর বার্লিনেরও যে একটা বড় ডিগ্রী আছে একথা আর বললেন না।

"দেবেন একটা সার্টিফিকেট ?"

"সেটা চোখে না দেখে বলতে পারছি না। এস একদিন আমার ক্লিনিকে। চোখটা আগে দেখি।"

"আমি কলকাতায় একজন বড ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম, তিনি কোনও দোষ দেখতে পাননি। আমি কিন্তু বাঁ-চোখে ক্রমশঃই বেশী ঝাপসা দেখছি।"

বলা বাহুল্য, কথাটা নির্জলা মিথ্যে। ঝিন্টুকের চোখের দৃষ্টি এত ভালো যে রাতের অন্ধকারেও সে বেশ দেখতে পায়।

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "আচ্ছা, তুমি আমার ক্লিনিকে একদিন সন্ধ্যার পর এসো। আমি ভাল করে দেখব।"

বেচু মৃদুকণ্ঠে বলল, "গাড়িটা কি এখানেই থাকবে ? না সরিয়ে রেখে দেব ?"

"না, চল এবার যাই।"

তারপর ঝিন্টুকের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি কোথা যাবে এখন—"

"বাড়ি যাব।"

"কোথায় তোমার বাড়ি ? চল, আমি পৌঁছে দি—"

"ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির কাছেই আমার বাড়ি। আপনার অসুবিধা হবে না তো।"

"না, না, কিছুমাত্র না। চল তোমাকে নাবিয়ে দি। রাস্তাতেই তো পড়বে।"

"চলুন।"

॥ ২৫ ॥

কাউ যে পল্লীতে আড্ডা গেড়েছিল তা ভদ্রপল্লী নয়, তার ঠিকানাও ভদ্র রাস্তায় ঠিকানা নয়। বড় রাস্তা থেকে গলির গলি তস্য গলি পার হ'য়ে সেখানে পৌঁছতে হয়। ছোটলোকদের বস্তি। এক-একটা খোলার ঘরে চার-পাঁচটা করে পরিবার বাস করে সেখানে একটা উঠোনকে কেন্দ্র করে। এখানে ভিড় করেছে সমাজের অতিনিম্নস্তরের লোকেরা। এদের দেখলে মনে হয় আমরা যে সভ্যতার গর্ব করি তা নিতান্তই ভুয়ো, অসার, অর্থহীন। যে সভ্যতা একদল নরনারীকে পঙ্ককুণ্ডে ঠেলে দিয়ে তাদের অস্তিত্ব সহ্য করতে পারে তা সভ্যতা নয়, তা ভয়ঙ্কর স্বার্থপরতা। এখানে কত রকম লোকই যে আছে! চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত যে মানুষ এমন হ'তে পারে। নুলো, খোঁড়া, অন্ধ, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত একদল ভিখারী তো এখানে থাকেই, আরও থাকে অনেক রকম লোক। তাড়কা রাক্ষসীর মতো মেয়ে আছে, নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা সুশ্রী মুখেরও অভাব নেই, মূর্তিমান শয়তানের মতো একদল গুণ্ডারও আড্ডা এখানে। কারও মুখ কুড়ুলের মতো, কারও মুখ ঘোড়ার মতো, কারও বা ঢালের মতো। প্রেতের মতো জরাজীর্ণ রোগীও এখানে কম নয়। কারো হাঁপানি, কারও যক্ষ্মা, কারও উদরাময়। প্রত্যেক ঘরে কিলবিল করছে শিশুর দল। মানুষ নয়, যেন পোকা। কেউ জারজ, কারো মা আছে বাপ নেই, কারও বাপ আছে মা নেই, কারো বা কেউ নেই। বেঁচে আছে সকলের দাক্ষিণ্যে। বেঁচে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। শুধু রোগের নির্যাতন নয়, মানুষের হাতেও নির্যাতন। চড়-চাপড়, ঝাঁটা-লাথি, ছোট ছেলেদেরও মারছে সবাই নিষ্ঠুরভাবে। পশুকেও লোকে বোধ হয় অত মারে না। সর্বদাই আর্তরোল চারিদিকে। সব বয়সের লোক আছে এখানে। কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, নানা চেহারার, নানা আকারের। সবারই মুখে একটা হিংস্র ভাব। ভোরে বেরিয়ে যায় সবাই রোজগারের চেষ্টায়। কেউ মুটে, কেউ গাড়োয়ান, কেউ কশাই, কেউ গুণ্ডা, কেউ চোর, কেউ দোকানদার, কেউ পকেটমার, কেউ ফিরিওলা, কেউ রিক্‌শা টানে, কেউ ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। মোটর ড্রাইভারও আছে। মেয়েরাও কাজ করে নানারকম। অধিকাংশই ঠিকে ঝি। বেশ্যাবৃত্তিও করে কেউ কেউ। এদেরই কারো কারো জন্যে ঘোড়ার গাড়ি, এমন কি মোটর-গাড়িও দাঁড়ায় বড় রাস্তায় গভীর রাত্রে। কোন কোন যুবতী মেয়ে সেজেগুজে গিয়ে ওঠে তাতে। ভোরবেলা ফিরে আসে টাকা রোজগার করে। এসব নিয়ে অনেক মন কষাকষি, হিংসা-দ্বেষ, এমন কি খুন-জখম পর্যন্ত হয়। পুলিস আসে, নির্যাতন করে কিছু লোককে, হৈ হৈ পড়ে যায়, আবার থেমে যায় সব। আবার যেমন চলছিল তেমনি চলতে থাকে। মানব-সমাজের মরা-আধমরা বিগলিত বিকৃত অংশ নিয়ে এই সমাজ। কিন্তু আশ্চর্যরকম সজীব এরা। মরেও মরতে চায় না। অদ্ভুত জীবনীশক্তি। গাছপালা মরে গিয়ে যেমন সার হয়, আর

সেই সার থেকে যেমন প্রাণপ্রাচুর্যে জীবন্ত নতুন গাছপালা আবার জন্মগ্রহণ করে. এদের অবস্থাও অনেকটা তেমনি। মৃত্যু আর জীবন এখানে পাশাপাশি বাস করছে। এই সমাজের গুণ্ডা আর যুবতী মেয়েদের স্বাস্থ্য দেখলে অবাক হতে হয়, ভাবাই যায় না যে ওদের চারিপাশে প্রত্যক্ষ মৃত্যু করাল ছায়া বিস্তার করে ওৎ পেতে বসে আছে। জীবন-মৃত্যুর নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব অহরহ চলছে এই সমাজে। এরা জীবনের উচ্চ-আদর্শের কথা শুনেছে কিন্তু এদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে বাঁচবার আগ্রহ। যেমন করে হোক বাঁচতে হবে।

কাউ এই বস্তিতে এসে হোটেল খুলেছিল। তার মাও ছিল এই বস্তিরই মেয়ে। যৌবনে কলকাতায় গিয়ে ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। এখানকার অনেকেই কাউ-এর চেনা। সে যখন এখানে ফিরে এল তখন সকলের আন্তরিক সম্বর্ধনা তো পেলোই, বন্ধুও পেয়ে গেল কয়েকজন। ভান্না, বিঠু, কাটরা, রমেশ, ঝাবরা এবং আরও অনেকে সোৎসাহে ডেকে নিল তাকে নিজেদের মধ্যে। এরা কেউ কোচোয়ান. কেউ ফেরিওলা, কেউ ফ্যাক্টরির কুলি, কেউ ট্রাক চালায়, কেউ বা আর কিছু, কিন্তু সকলেই আসলে গুণ্ডা। সুবিধা পেলেই বে-পরোয়া লুঠতরাজ করে। জনশ্রুতি, রমেশ, কাটরা আর ঝাবরা প্রত্যেকে নাকি খুনও করেছে। এই রমেশকে যতীশবাবু দেখে গিয়েছিলেন। এদেরই সাহচর্যে বাস করছিল কাউ। এদের সঙ্গে সে গোপনে গোপনে একটা চক্রান্তও করছিল। যতীশবাবু কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউয়ের সঙ্গে থাকতে পারেন নি। যে পরিবেশে কাউ অভ্যস্ত, সে পরিবেশ তিনি সহ্য করতে পারলেন না। এদের দেখে তাঁর ভয় করছিল। দম আটকে আসছিল যেন। তিনি তার পরদিনই চলে এলেন নিজের বাসায়। সেখানে রাঁধুনী ছিল। রাঁধুনীর কাছে যে ঝিনুক বাজারের পয়সা দিয়ে গেছে যতীশবাবু তা জানতেন। তাঁর মনে হল, কেবল খাওয়া-দাওয়ার জন্যে কাউয়ের ওই নরক-কুণ্ডে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। তিনি কিছু টাকার চেষ্টায় বেরিয়েছিলেন, সে চেষ্টা যখন সফল হল না তখন অন্য উপায়ে আবার চেষ্টা করতে হবে। হাল ছেড়ে দিলে চলবে না, হাল ছেড়ে দেবার লোক তিনি নন। এবং সে চেষ্টা ঝিনুকের বাসায় থেকেই করতে হবে। ঝিনুকের হাতে যে টাকা আছে এ বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছিল। ঝিনুকের চালচলন যেন রাজরানীর মতো, যখন খুশি কলকাতায় চলে যাচ্ছে। টাকা না থাকলে এসব পারে কেউ? কলকাতা যাবার আগে রাঁধুনীর হাতে সে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গিয়েছিল বাজার খরচের জন্য, তাঁকেও হাত-খরচের জন্য দশ টাকা দিয়ে গিয়েছিল। কলকাতায় গেলে নিশ্চয়ই টাকা বেশ খরচ হয়. সেখানে প্রতি পদক্ষেপেই তো খরচ! এখানে চায়ের দোকানের সব ধার শোধ করে দিয়েছে। এতো টাকা ও পাচ্ছে কোথায়। টাকা নিশ্চয় আছে ওর হাতে। ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাকলে সে টাকা পাওয়ার আশা থাকবে না। শামুকটা তো নাগালের বাইরে চলে গেল। মিস্টার সেনের কাছ থেকে ও অনেক টাকা কামিয়েছে নিশ্চয়। এমন অকৃতজ্ঞ নিমকহারাম মেয়ে, তাঁকে একটি পয়সাও দিয়ে গেল না। তিনি কি তার

কাকা নন? তিনি কি ছেলেবেলায় তাকে কোলে করেন নি। বাচ্ খেলা দেখতে নিয়ে যান নি? গ্রামে গণেশ অপেরার যাত্রা হচ্ছিল যেবার, দাদা শামুককে যেতে দিতে চান নি। ঝিনুক কলকাতায় ছিল। দাদা ঘুমোবার পর তিনিই কি লুকিয়ে শামুককে যাত্রা দেখিয়ে আনেন নি? কি করে মানুষ সব ভুলে যায়, আশ্চর্য? ওরা হাজার হাজার টাকা রোজগার করছে অথচ তাঁকে দেশে ফেরবার মত টাকাটা দেবে না! কিছু টাকা পেলে এখন সেখানে মাছের ফলাও ব্যবসা করতে পারেন তিনি। অনেক মুসলমান জেলে এখনও তাঁকে খাতির করে। চিঠিও লিখেছে। এই ঘটিদের দেশে পড়ে থেকে কি হবে? এখানে কি মানুষ থাকতে পারে? ঝিনুক শামুক কি মানুষের জীবনযাপন করছে? পশুদের সংস্রবে এসে ওরাও পশু হয়েছে। ওই কু-চক্রী মতলববাজ ডাক্তার ঘোষালের পাল্লায় পড়ে ব্যভিচারিণীর জীবনযাপন করছে এরা। ব্যভিচারই যদি করতে হয় তা হ'লে ও দেশেই তো করা যেতে পারত। তার জন্যে পদ্মার এপারে আসবার দরকারটা কি?

এ ধরনের নানা চিন্তাজালে আচ্ছন্ন হয়ে যতীশ বাড়ি ফিরলেন।

ফিরে দেখলেন, বারান্দায় ঝিনুক দাঁড়িয়ে আছে।

"তুমি কোথা গিয়েছিলে, কাকা? আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান চারদিকে। ও কি, তোমার মাথায় কি হ'ল?"

"তোমার বাবু মেরেছে।"

"আমার বাবু! আমার বাবু আবার কে!"

"বাবু না বল, কর্তা বল, মালিক বল, যা খুশি বল—ওই ডাক্তার ঘোষাল—"

হু হু করে কেঁদে ফেললেন যতীশবাবু। কান্নার অভিনয় চমৎকার হ'ল।

"তাই নাকি? তুমি ডাক্তার ঘোষালের কাছে গিয়েছিলে কেন?"

"তুমি চলে গেলে, শামুক চলে গেল, আমি কাকে নিয়ে থাকব! এ দেশে থাকতে আমার ভাল লাগছে না। আমি দেশে ফিরে যেতে চাই, সেই কথাই ওঁকে বলতে গিয়েছিলাম—"

যতীশবাবু এলোপাথাড়ি মিথ্যে কথা বলেন। যখন বলেন তখন হুঁশ থাকে না, মিথ্যে কথাটা অচিরেই ধরা পড়ে যাবে। সামনের বিপদটা কাটিয়ে উঠতে পারলেই তিনি সন্তুষ্ট। মিথ্যে কথা ধরা পড়ে গিয়ে নূতন বিপদ সৃষ্টি হয় তখন দেখা যাবে—এই তাঁর মনোভাব। ঝিনুক কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়।

"এই কথা বলতে ডাক্তার ঘোষাল তোমাকে মারলেন?"

"হ্যাঁ। আমি কি মিছে কথা বলছি? উনি মানুষ নন, মহিষ। তুমি যে কি দেখেছ ওঁর মধ্যে তা তুমিই জান।"

"তুমি এসব কথা ওঁকে বলতেই বা গিয়েছিলে কেন! তুমি নিতান্তই যদি এখানে থাকতে না চাও, দেশে ফিরে যাও। ভিসাপাসপোর্টের ব্যবস্থা আমি করে দেব। ডাক্তার ঘোষালকে বলতে গেলে কেন, উনি কি করবেন?"

"ওঁর কথাতেই আমরা এ দেশে এসেছিলাম' ওঁকে বলব না তো কাকে বলব !"

ওঁর কথাতে আমরা এদেশে আসিনি। আমরা প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম, উনি সাহায্য করেছিলেন মাত্র। যাই হোক, তুমি ওঁকে আর এ বিষয়ে কিছু বলতে যেও না। দেশে ফেরবার ব্যবস্থা আমিই করতে পারব। ডাক্তার ঘোষালের কাছে যাবার দরকার নেই।"

"দেশে কিন্তু আমি খালি হাতে ফিরতে পারব না। সেখানে গিয়ে আমি মাছের ব্যবসা করব, আবার ঘর বাঁধব।"

"বেশ, তাই হবে। আমি ডাক্তার ঘোষালের কাছে যাচ্ছি। এখানে রান্না হ'য়ে গেছে, তুমি স্নান করে খেয়ে নাও। কোথা ছিলে তুমি ?"

কাউ তাঁকে মানা করে দিয়েছিল, তার ঠিকানাটা ঝিনুককে যেন জানানো না হয়।

যতীশবাবু বললেন, "কোথায় আবার যাব ! রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিলাম।"

"বেশ, এখন স্নান করে খেয়ে বিশ্রাম কর। আমি চললাম।"

ঝিনুকের প্রস্থানপথের দিকে চেয়ে যতীশবাবু বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। ঝিনুক তাঁর দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে, এ সংবাদ পেয়ে কি তিনি পুলকিত হলেন ? তাঁর মুখ দেখে কিন্তু তা মনে হ'ল না। বরং মনে হ'ল, রেসে হেরে গিয়ে তিনি যেন সর্বস্বান্ত হয়েছেন।

ঝিনুক যখন ডাক্তার ঘোষালের বাড়ি পৌঁছল তখন ডাক্তার ঘোষাল খাওয়া-দাওয়া সেরে বাইরে বেরুচ্ছেন। কাউ-এর জায়গায় হরসুন্দরই কাজ করছিল। লোকটি ভালো। উপকৃত বলে কাজকর্ম আরও নিখুঁত। ফাঁকি দেবার চেষ্টা কোথাও নেই। ঝিনুক ডাক্তার ঘোষালের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে দিয়ে এক ফাঁকে বাড়ি গিয়েছিল যতীশবাবু ফিরেছেন কিনা দেখবার জন্য। তাঁর সহসা অন্তর্ধানে সত্যিই সে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। তাঁর কপালের কাটা দাগটা চাবুকের মতো আঘাত করেছিল তাকে। তার কাকার অনেক দোষ আছে সে জানে। তার কাকা অবুঝ, লোভী, ভীতু, স্বার্থপর —সবই ঠিক। কিন্তু এও ঠিক যে তিনি বড় বংশের ছেলে, সারা জীবন সসম্মানে সুখে জীবন কাটিয়েছেন দেশে। রাজনৈতিক পাশা খেলার চক্রান্তেই আজ তিনি বিতাড়িত, অবহেলিত, অপমানিত। আজ ডাক্তার ঘোষাল মেরে তাঁর কপাল ফাটিয়ে দিয়েছেন ! দুরদৃষ্টের ঝড়ে যে লোকটা মুখ থুবড়ে মাটির উপর পড়ে গেছে, তারও মুখের উপর পদাঘাত ! ঝিনুকের সর্বাঙ্গ রি রি করছিল।

বেরুবার মুখেই ঝিনুককে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন ডাক্তার ঘোষাল। বললেন, "আজ খানিকটা ভেড়ার মাংস দিয়ে গেছে রসুল। তুমি নিজে রান্না করো ওটা। হরসুন্দরের হাতে পড়লে ভেড়া কাঁচকলা হয়ে যাবে।"

"বেশ রাঁধব। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই"

ঝিনুকের ভাব-ভঙ্গী দেখে ঘোষাল বুঝলেন গতিক সুবিধার নয়। কিছু একটা হয়েছে।

"কর"

"বাড়ি গিয়ে দেখলাম, কাকা ফিরেছেন। তাঁর কপালে একটা ঘা দগদগ করছে। কাকা বললেন আপনি তাঁকে মেরেছেন। সত্যি ?"

"সত্যি। মেরেছি, কিন্তু কম মেরেছি। আরও মারা উচিত ছিল।"

"কেন ? তাঁর অপরাধ ?"

"তিনি একঘর রুগীর সামনে বলেছিলেন, আমি তোমাকে মাথার মণি করে রেখেছি, সুতরাং তাঁকে টাকা দিতে হবে। এর উত্তরে আমি তাঁকে মাত্র একটি চড় মেরেছি। আরও মারা উচিত ছিল।"

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঝিনুক।

তারপর বলল, "একটা কথা ভুলে যাবেন না, উনি এ দেশে বড় কষ্টেই আছেন। ওঁর মাথার ঠিক নেই। তা ছাড়া এটাও তো ঠিক, উনি যা বলেছেন নিতান্ত মিছে কথাও নয়। ভিতরে যাই থাক, বাইরে সবাই জানে আমিই আপনার বাড়ির কর্ত্রী। যাক সে কথা, উনি দেশে ফিরে যেতে চাইছেন সেই ব্যবস্থা করে দিন তা হলে।"

"দেব। মিস্টার সেনকে বলতে হবে। এখন চলি।"

বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার ঘোষাল। ঝিনুক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

॥ ২৬ ॥

ডাক্তার ঘোষাল একটা দূরের কলে বেরিয়ে গেছেন রাত্রেই। কখন ফিরবেন স্থিরতা নেই। ঝিনুক ভাবল, এই ফাঁকে ডাক্তার মুখার্জির ক্লিনিকে গিয়ে চোখটা পরীক্ষা করানো যাক। তার চোখে যে কিছু হয়নি তা সে ভাল করেই জানে, তবু সে ভাবছিল, যদি ফাঁকি দিয়ে একটা সার্টিফিকেট আদায় করা যায়। সবাই বিলেত চলে গেছে, এইবার তাকে যেতে হবে। সুবেদার খাঁর চেনা ক্যাপ্টেন সাহেব বলে দিয়েছেন, লুকিয়ে-চুরিয়ে আর নিয়ে যাওয়া চলবে না। চারিদিকে বড়ই কড়াকড়ি। সুতরাং আইন-সম্মত উপায়ে পাসপোর্ট একটা জোগাড় করতেই হবে। এজন্যে যদি দুটো মিছে কথা বলতে হয়, তাও সে বলতে পিছপা নয়। এজন্যে তার অন্তরে বা বিবেকে বিন্দুমাত্র গ্লানি নেই। সে জানে, এসব পুজোর এই মন্ত্র।

একটা রিক্শায় চড়ে গেল সে ডাক্তার মুখার্জির ক্লিনিকে।

ডাক্তার মুখার্জি একটা রোগী দেখছিলেন তখন। ঝিনুককে দেখে বললেন, "ও, তুমি এসেছ! পাশের ঘরটায় গিয়ে ব'সো। আমি এই কেসটা শেষ করে তোমার চোখ দেখব।"

তারপর তাঁর ড্রাইভার বেচুকে ডেকে বললেন, "হাসপাতাল থেকে একজন নার্সকে ডেকে নিয়ে এস তো। এই চিঠিটা নিয়ে যাও।"

হাসপাতালের ডাক্তারের নামে একটা চিঠি দিয়ে দিলেন। বেচু গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

মেয়েদের বসবার যে ঘরটায় ঝিনুক গিয়ে ঢুকল সেখানে আর কেউ ছিল না। কয়েকটা মাসিকপত্র ছিল টেবিলের উপর। সেইগুলোই ওল্টাতে লাগল সে বসে বসে। হঠাৎ তার কানে গেল, ডাক্তারবাবু তাঁর রোগীটিকে বলছেন, "আপনাকে যে পথ্য লিখে দিলাম, তাই আগে মাসখানেক খেয়ে দেখুন। তাতে যদি উপকার না হয় তা হলে এই ওষুধগুলো কিনবেন। আমার মনে হয়, খাদ্যাভাবেই আপনার শরীরটা খারাপ হচ্ছে।"

"আমি তো মাছ মাংস ঘি দুধ প্রচুর খাই।"

"ফলও খেতে হবে।"

"বেদানা, পেস্তা, কিসমিস—এইসব ?

"না। শশা, কলা, বেল, লেবু, তরমুজ, পেয়ারা—এইসব। আমি সব লিখে দিয়েছি—"

"ওষুধ এখন কিছুই খাব না ?"

লোকটা যেন বুঝেও বুঝতে চাইছে না, ঝিনুকের মনে হল।

"না। যেসব খাবার লিখে দিলাম তা খেয়ে যদি ফল না হয় তা হলে ওষুধ খাবেন —এক মাস পরেই।"

"ও, আচ্ছা—"

লোকটা যেন অনিচ্ছাভরে উঠে গেল।

"তুমি এবার এই ঘরে এস"

ঝিনুক ওঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই বললেন, "একটু ব'সো। নার্সটা এসে পড়লেই তোমার চোখটা দেখব"

"নার্স কেন ?"

"ওটা আমাদের এটিকেট। রক্ষা কবচও বলতে পার। কোন স্ত্রীলোককে নির্জন একা পরীক্ষা করা আমাদের শাস্ত্রে মানা। বিশেষত তোমার চোখটা ডার্ক রুমে নিয়ে গিয়ে দেখতে হবে ভালো করে।"

কথাটা খুবই সঙ্গত। কিন্তু তবু এতে যেন ঝিনুকের মনে ঘা লাগল একটু। তার নিজের আত্মসম্মান সে নিজে বাঁচাতে পারবে না ? তার জন্যে একজন ভাড়া-করা নার্স চাই !

ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে, "আপনাদের শাস্ত্র আমাদের এত ঠুনকো মনে করে ?"

"হয়তো আমাদেরই ঠুনকো মনে করে। তাছাড়া অনেক মেয়েরোগী নানারকম দুরভিসন্ধি নিয়ে অনেক সময় আসে আমাদের কাছে। তাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেও এই ব্যবস্থার প্রয়োজন। তুমি ততক্ষণ এক কাজ কর না। এখানে বসে বসেই ওই দেয়ালের টাঙানো অক্ষরগুলো পড়বার চেষ্টা কর।"

ঝিনুক সবগুলোই পড়তে পারছিল। কিন্তু খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সে বলল, "তৃতীয় লাইন পর্যন্ত বেশ পড়তে পারছি, তারপর সব ঝাপসা।"

ডাক্তারবাবু তাঁর ব্যাগ খুলে দু ফোঁটা ওষুধ দিয়ে দিলেন ঝিনুকের চোখে।

"একটু পরে আবার দেখব। ততক্ষণে নার্স টাও এসে পড়বে—"

একটু ইতস্তত করে ঝিনুক অবশেষে বলেই ফেললে কথাটা—"আপনার ফি কত ?"

"আমি ষোল টাকা নি। তোমার কাছ থেকে নেব না কিছু।"

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনিয়ে এল। ঝিনুক মাথা হেঁট করে বললে, "সেদিন তো আপনাকে বলেছি, কারও কাছ থেকে ভিক্ষা নেব না এইটে আমার নীতি।"

ডাক্তার মুখার্জি হেসে বললেন, "তোমাদের যেমন নীতি আছে, আমারও তেমনি নীতি আছে একটা। আমি সবাইয়ের কাছ থেকে ফি নিই না। কার কাছে নেব, কার কাছে নেব না, সেটা আমিই ঠিক করি। আমার এ অধিকারে আজ পর্যন্ত কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দিই নি, তোমাকেও দেব না। ফি না নিলে তুমি যদি চোখ পরীক্ষা করাতে না চাও তা হলে অন্য ডাক্তারের কাছে যাও। এখানে ডাক্তার মিত্র ভালো চোখের ডাক্তার। সেখানে যেতে পার।"

ঝিনুকের চোখের অসুখ হয়নি, তার দরকার একখানা সার্টিফিকেট। ডাক্তার মুখার্জির বিলাতী এবং জার্মান ডিগ্রী আছে, সুতরাং গভর্নমেণ্টের দপ্তরে যে তাঁর সার্টিফিকেটটি বেশী জোরাল হবে এ কথা ঝিনুকের অবিদিত নেই। কথাটা শুনে সে একটু মুশকিলে পড়ে গেল। একটু ইতস্তত করে বলল, "আপনার এতটা সময় নষ্ট হবে, আপনি যদি ফি না নেন—"

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "চলতি ভাষায় যাকে সময় নষ্ট করা বলে, তাই করেই আমি বেশী আনন্দ পাই। মাঠে-ঘাটে গিয়ে বসে থাকি, সেখানে তো ফি পাই না। আমার একটা 'থিয়রি' আছে, সময় নষ্ট হয় না, সব জিনিসের মতো তারও রূপ-রূপান্তর আছে। জল জমে বরফ হয়, বর্তমান রূপান্তরিত হয় অতীতে, স্মৃতিতে; নষ্ট হয় না। বর্তমানকে যদি নির্দোষ আনন্দে উপভোগ করা যায় তা হলে স্মৃতির রূপান্তরে তা অপরূপ হ'য়ে ওঠে। নষ্ট হয় না।"

"তা হ'লে কারো কাছেই ফি না নিলে পারেন।"

"সব রোগী সমান হয় না। অনেকের আত্মসম্মান খুব প্রবল। তোমার যেমন। অনেকে ফি ফাঁকি দিতে চায়, তাদের কাছে আমি শাইলক। আবার এমন অনেক রোগী আছে যাদের কাছে ফি নিতে বিবেকে বাধে। তাদের কাছে নিই না। আবার এমন অনেক রোগী আছে বিনা ফি-য়ে যাদের চিকিৎসা করলে আনন্দ পাই, তাদের কাছ থেকেও নিই না। আমার নিজের মনের মধ্যে একটা মাপকাঠি আছে তাই দিয়ে ওটা আমি ঠিক করি।"

"আমাকে কোন্ পর্যায়ে ফেললেন ?"

হেসে জিজ্ঞেস করলে ঝিনুক।

"তা আর না-ই শুনলে।

"কিছুতেই ফি নেবেন না?"

ডাক্তার মুখার্জি মাথা নেড়ে হাসিমুখে চেয়ে রইলেন।

"এ অন্যায়। আমি বউদিকে গিয়ে দিয়ে আসব। বউদির সঙ্গে একদিন আলাপ করবার ইচ্ছে আছে। কখন গেলে সুবিধা হয় বলুন তো।"

"সে কারও সঙ্গে দেখা করতে চায় না।"

"ও মা, কেন!"

"তার মনে একটা অদ্ভুত কম্‌প্লেক্স হয়েছে। জটিল একটা মনস্তত্ত্বের প্যাঁচে পড়েছে সে।"

"তাই নাকি!"

"হ্যাঁ।"

"কি করেন?"

"পুজোর ঘরে খিল দিয়ে অধিকাংশ সময় বসে থাকে।"

ঝিনুক ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। ব্যাপারটার ভিতরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করল।

"রান্নাবান্না করেন না?"

"তা রোজই করে দু-একটা তরকারি। কিন্তু সর্বদাই কেমন যেন বিমর্ষ, অন্যমনস্ক হয়ে থাকে।"

"এর কোন চিকিৎসা করছেন না কেন?"

"আমার বিশ্বাস, চিকিৎসা করতে গেলে আরও খারাপ হবে। মনে হয়, সময়ে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আমি অপেক্ষা করছি—"

শেষের কথাটা বড় করুণ ঠেকল ঝিনুকের কাছে। ঝিনুক কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হল না। হাসপাতাল থেকে নার্সকে নিয়ে বেচু ফিরে এল।

একটু পরে ঝিনুকের চোখ পরীক্ষা করে ডার্ক রুম থেকে ডাক্তার মুখার্জি বেরুলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। নার্স'টি চলে গেল। ঝিনুক তাঁর সামনে এসে বসল চেয়ারে।

"কি দেখলেন?"

"কোন দোষ তো দেখতে পেলাম না। এতো ভালো নর্মাল চোখ বহুকাল দেখি নি।"

"তাহলে আমি ঝাপসা দেখছি কেন?"

"ঝাপসা দেখা তো উচিত নয়। তবে দুটো কারণ হতে পারে যার জন্য ঝাপসা দেখছ। একটা কারণ হতে পারে হিস্টিরিয়া গোছের কোনও কম্‌প্লেক্স। দেখবার যন্ত্রপাতি সব ঠিক আছে, তোমার মনে হচ্ছে তুমি দেখতে পাচ্ছ না। আর একটা কারণ—"

বলেই থেমে গেলেন ডাক্তার মুখার্জি। মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

ঝিনুক উৎসুক হয়ে উঠেছিল, বলল—"আর একটা কারণ কি ? বলতে বলতে থেমে গেলেন যে—"

"সেটা তোমার মুখের সামনে বলা উচিত হবে না। ভদ্রমহিলাদের অপমান করতে নেই—"

"আমার কিছু অপমান হবে না। বলুন আপনি, দ্বিতীয় কারণ কি হতে পারে।"

"দ্বিতীয় কারণ তুমি হয়তো মিথ্যে কথা বলছ। দেখতে পেয়েও বলছ দেখতে পাচ্ছি না।"

ঝিনুকের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

মিনিট খানেক চুপ করে থেকে বললে—"আমার সার্টিফিকেটের তা হলে কি হবে ? দেবেন না ?"

"দেব কি করে ? চোখে কোনও দোষ দেখতে পেলুম না যে। মিছে কথা তো লিখতে পারব না।"

"মিছে কথা লিখলে আমার যদি একটা উপকার হয়—"

"কি উপকার হবে ! চোখের চিকিৎসার জন্যে তোমার কোথাও যাবার দরকার নেই। চোখ তোমার ঠিক আছে। এতো ভালো চোখ সাধারণতঃ দেখা যায় না। চমৎকার চোখ।"

ঝিনুক লজ্জায় আনত করলে চোখের দৃষ্টি। তারপর বলল, "আসল কথা, আমি বিলেত যেতে চাই। চোখের অসুখ ছুতো। কোনও শক্ত অসুখের চিকিৎসার ওজুহাত দেখালে সহজে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।"

"তুমি বিলেত যেতে চাইছ কেন ?"

"ওই দেশেই বাস করতে চাই। এ দেশে আমাদের স্থান নেই এটা বুঝেছি। বাঙালীর ছেলেমেয়েদের এখন নূতন দেশে নূতন দিগ্বিজয়ের আশায় বেরুতে হবে। এ দেশে ভোটের জোরে যারা রাজত্ব করছে, আদর্শকে বলি দিয়ে যারা দেশ-ভাগ করেছে, ভোটাধিক্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পূর্ববঙ্গ ভাগ করেও exchange of population করে নি, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বাঙালীকে দাবিয়ে রাখা। তাদের জুতোর টিপুনির তলা থেকে আমরা পালাতে চাই। অন্য দেশে গিয়েও হয়তো আমরা বাঁচব না। তবু এদেশে আর নয়।"

"আমি বলছিলাম—"

"আপনি কি বলবেন তা আমি জানি। অনেক ভালো ভালো কথা বলবেন, adaptability-র উপদেশ দেবেন, কিন্তু—"

"না, সে কথা বলব না। আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, তোমরাও কি এদেশের লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেছ ? তোমরা কি জবরদস্তি করে এ দেশের লোকের ঘরবাড়ি জমি দখল কর নি ?"

"দেখুন একটা গাছে অসংখ্য পাখি সুখে বাসা বেঁধে ছিল, সেই গাছটি কেটে ফেলা

হয়েছে। সেই গাছের পাখিগুলি যদি এখন আপনাদের ইমারতের কার্নিসে এসে আশ্রয় নেয়, কিংবা আপনাদের বাগানের গাছে বাসা খোঁজে, সেটা কি খুব দোষের? আপনাদের দিক থেকে কি কোনও সহানুভূতি পেয়েছি আমরা? শিয়ালদহ স্টেশনে কখনও গিয়েছিলেন? নিতান্ত পেটের দায়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে যেসব ভদ্রঘরের মেয়েরা দেহ বিক্রি করছে দেখেছেন তাদের?"

সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠল ঝিনুকের।

ডাক্তার মুখার্জি তার আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর একটু স-সঙ্কোচে বললেন, "পাঞ্জাবী রেফিউজিরাও তো এদেশে এসেছে, তারা তো—"

"তারা আমাদের মত নিঃস্ব হয়ে কেউ আসেনি। এক্সচেঞ্জ অব পপুলেশন (Exchange of population) ওদেশে হয়েছিল, তাই আমাদের মতো দুরবস্থায় কেউ পড়েনি। তাছাড়া এদেশের পাঞ্জাবী সমাজ ওদের দূর-ছাই করেনি, যাতে ওরা ভদ্রভাবে বসবাস করতে পারে তার চেষ্টা সমবেতভাবে করেছে। আর একটা কারণও আছে। ওরা দেশে যে পরিবেশে যে-সব কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল, এদেসে এসেও ওরা সেই পরিবেশ, সেই সব কাজই পেয়েছে। কিন্তু আমরা যে পরিবেশে যে-সব কাজ করতাম, সে-পরিবেশে সে-সব কাজ আমরা পাচ্ছি না। আমরা যা পাচ্ছি, তা ভিক্ষের আকাঁড়া চাল আর অর্থহীন সদুপদেশ।

ঝিনুক আবার থেমে গেল। তার গলার স্বর যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। ডাক্তার মুখার্জি, ভেবে পেলেন না, কি বলবেন। এ নিয়ে আর কোনও আলোচনা করা সমীচীন মনে হল না তাঁর, তিনি চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তার পর অন্য কথা পাড়লেন।

"তুমি লেখাপড়া কতদূর করেছ?"

"আমি বি-এ পাশ করেছি। ইকনমিক্সে অনার্স ছিল।"

"কোন্ ক্লাস পেয়েছিলে?"

"ফার্স্ট ক্লাস"

"তাহলে এক কাজ কর না। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে পড়বার জন্যে দরখাস্ত করে দাও। আমি সে বিষয়ে তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারি। লণ্ডনে আর দিল্লিতে দু' জায়গাতেই আমার চেনা লোক আছে। তাঁদের অনুরোধ করলে হয়তো কিছু কাজ হতে পারে।"

আগ্রহে জলজল করে উঠল ঝিনুকের চোখ দুটো।

"আপনি পারবেন?"

"পারতে পারি। কিন্তু প্রথমেই তোমাকে একটা বিষয়ে মনস্থির করতে হবে। যাদের বিরুদ্ধে তোমার এত রাগ, সে-রাগটা কমাতে হবে। এখন যাঁরা দেশের শাসনকর্তা, তারা যে তোমার শত্রু নন, হিতৈষী, এটা স্বীকার না করলে তাঁদের সহানুভূতি পাবে না। আর তাঁদের সহানুভূতি না থাকলে বিলেত যাওয়ার অনুমতি পাওয়া শক্ত।"

ঝিনুকের চোখের দৃষ্টির রং বদলে গেল। "আপনি নিজে মিথ্যে সার্টিফিকেট দিলেন না, আর আমাকে মিথ্যাচার করতে বলছেন?"

ডাক্তার মুখার্জি এ উত্তর প্রত্যাশা করেননি। একটু চুপ করে থেকে বললেন, "এটাকে যদি মিথ্যাচার মনে কর, কোরো না!"

"আপনি কি সত্যিই মনে করেন, ওরা আমাদের হিতৈষী?"

"ওদের মনের কথা আমি জানি না, তাই তোমার কথার ঠিক উত্তর দিতে পারব না। কিন্তু একটা কথা জানি, হিতৈষী হলেই সব সময় উপকার করা যায় না। বাইরের অনেক রকম অপ্রত্যাশিত ঘটনা বাধার সৃষ্টি করে। ওরা হয়তো তোমাদের ভাল করতে চায়, কিন্তু পারছে না"

"আমি তাহলে উঠি এবার।"

ঝিনুক উঠে দাঁড়াল। তার ছোট ব্যাগ খুলে ষোলটি টাকা বার করে টেবিলের উপর রেখে বলল, "আপনার ফি রেখে যাচ্ছি। যদি নিতে না চান ফেলে দেবেন।"

বলেই বেরিয়ে গেল সে।

ডাক্তার মুখার্জি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন। তারপর একটা চিঠি লিখলেন ডাক্তার ঘোষালকে।

নমস্কারান্তে নিবেদন,

ডাক্তারবাবু, শ্রীমতী ঝিনুক একটু আগে আমার কাছে চোখ পরীক্ষা করাতে এসেছিল। আমি তার চোখে কোনও দোষ দেখতে পেলাম না। আমি তার কাছে ফি নিতে চাইনি, তবু সে জোর করে ষোলটা টাকা রেখে গেল। আমি তার কাছে ফি নেব না। টাকটা তাই আপনার কাছে ফেরত পাঠাচ্ছি। শুনেছি সে আপনার ওখানে কাজ করে। আপনি বুঝিয়ে সুজিয়ে এটা তাকে দিয়ে দেবেন। আশা করি ভাল আছেন। আমার আন্তরিক প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীসুঠাম মুখোপাধ্যায়

॥ ২৭ ॥

গণেশ হালদার ভেবেছিলেন, তাঁর ছাপা পুস্তিকাটি বিতরিত হলে হয়তো জনসাধারণের মধ্যে ঈষৎ চাঞ্চল্য দেখা দেবে। হয়তো কেউ তাঁকে উৎসাহিত করবে তাঁর স্বাধীন চিন্তা এবং স্পষ্ট উক্তির জন্যে। হয়তো বাইরে থেকে দু'-একখানা চিঠিও আসবে। কিন্তু তিনি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এ বিষয়ে কেউ উচ্চবাচ্যই করলে না। স্কুলে তাঁর সহকর্মীদের প্রত্যেককেই তিনি এক কপি করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের মুখভাব দেখে মনে হল না যে তাঁরা সেটি পড়েছেন। দু'-একজন তাঁকে দেখে

মুচকি হেসেছিলেন একটু,—ব্যস্‌, ওই পর্যন্ত। তিনি দেশের জন্ত যে চিন্তা করছেন, সে চিন্তায় কেউ প্রভাবিত হয়েছে, এর সামান্যতম প্রমাণ পাবার জন্ত তিনি উৎসুক হয়েছিলেন, কিন্তু সে প্রমাণ তিনি পেলেন না। স্টেশনের প্রতি ট্রেনে গিয়ে তাঁর লোক পুস্তিকা বিতরণ করছিল। সে বললে, ভদ্রলোক দেখে দেখেই সে দিয়েছে। কিন্তু কই কারও তো সাড়া পাওয়া গেল না কোন। আমাদের দেশের বাঙালী সমাজ তাহলে কি মৃত? যারা ফরসা জামা কাপড় পরে' দেঁতো হাসি হেসে গাল-গল্প করে, যারা আপিসে যায়, বাজার করে, সিনেমা দেখে, বংশবৃদ্ধি করে, যারা পাড়া-প্রতিবেশীর নিন্দায় পঞ্চমুখ, নিজেদের বৈঠকখানায় বা ক্লাবে বসে যারা রাজা-উজির মেরে নেতাদের নিন্দায় ক্ষণে ক্ষণে গরম হয়ে ওঠে, তারা কি আসলে তাহলে প্রাণহীন শব? তাদের এইসব উল্লাস বা আক্ষেপ কি মৃতদেহ-নিঃসৃত বাষ্প মাত্র? গণেশ হালদার লজ্জায় ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে দেখা করেননি। সকলের এই ঔদাসীন্যে তাঁর নিজেরই যেন লজ্জায় মাথা-কাটা যাচ্ছিল। দেখা হলেই তিনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, কই মশাই কি হ'ল? আপনার ডাকে কেউ সাড়া দিলে কি? তখন তিনি কি বলবেন।

একদিন কিন্তু তাঁকে ডাক্তার মুখার্জির কাছে যেতে হ'লই। গল্পের একচক্ষু হরিণ যেমন আশা করেনি যে, অপ্রত্যাশিত দিক থেকে আততায়ী এসে মৃত্যুবাণ হানবে, তেমনি তিনিও প্রত্যাশা করেননি যে তাঁর স্কুল কমিটির সভ্যরা তাঁর প্রবন্ধ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এমন একটা চিঠি লিখবেন। হঠাৎ একদিন স্কুলের পিওন পিওন-বুকে এক চিঠি নিয়ে এসে হাজির হ'ল সেক্রেটারির কাছ থেকে। সেই চিঠির মর্ম এই :

"আপনি সম্প্রতি প্রাদেশিকতা নিয়ে যে প্রবন্ধটি ছাপিয়ে বিতরণ করেছেন, আমাদের স্কুল কমিটির বিচারে তাতে বর্তমান উদার গভর্নমেণ্টকে, সংবিধানের নিয়মাবলীকে এবং আমাদের দেশের মহামান্ত নেতাদের এবং শিক্ষক-সমাজকে অপমান করা হয়েছে। আপনি গভর্নমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের বেতনভোগী শিক্ষক। আপনার এই দুর্মতি ও স্পর্ধা দেখে আমরা অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করছি। অদ্য মিটিংয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণ সকলেই একবাক্যে আপনার এই আচরণকে অত্যন্ত অশোভন এবং গর্হিত বলে নিন্দা করেছেন। তাঁদের সম্মতিক্রমে তাই আপনাকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, ভবিষ্যতে যদি আপনার আচরণে এরূপ গভর্নমেণ্টবিরোধী মনোভাব প্রকাশ পায়, তাহলে আপনাকে আমরা স্কুলের শিক্ষকরূপে আর রাখতে পারব না। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানাচ্ছি যে, অবিলম্বে আপনাকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, আপনি ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ কার্য করবেন না। এ-প্রতিশ্রুতি যদি না দিতে চান, তাহলে আমার এই চিঠিকে নোটিশস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এক মাস পরে আপনার স্থানে আমরা নূতন লোক বহাল করব।"

চিঠিখানির দিকে বিমূঢ়ভাবে চেয়ে রইলেন গণেশ হালদার। কিছুক্ষণের জন্ত স্থিরই করতে পারলেন না, এ অবস্থায় কি করা উচিত।

শেষে ডাক্তারবাবুর কাছেই গেলেন তিনি।

ডাক্তারবাবু যথারীতি তাঁর কুকুর আর গরু-বাছুর নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সেদিন ব্যস্ত ছিলেন তাঁর ভেড়াটাকে নিয়ে। ভেটুকের ক্ষুরে ঘা হয়েছিল। দুর্গাকে দিয়ে ঘা পরিষ্কার করিয়ে ফিনাইল দেওয়াচ্ছিলেন তিনি। তাঁকে ঘিরে রকেট, জাম্বু, ভুটান আর মুর্গিগুলোও দাঁড়িয়েছিল, যেন তারাও ব্যাপারটা তদারক করতে এসেছে। সকলেরই মুখে একটা চিন্তিত ভাব। কি হ'ল ভেটুকের!

গণেশ হালদারকে দেখে ডাক্তারবাবু সহাস্যে সম্বর্ধনা জানালেন।

"আসুন মাস্টার মশাই, কি খবর?"

মাস্টার মশাই সেক্রেটারির চিঠিটা তাঁকে দিলেন।

চিঠিটা পড়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে রইলেন ডাক্তারবাবু কয়েক মুহূর্ত। সেক্রেটারি তুলসী বাগচীর মুখটা তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল। ধার্মিক লোক, ত্রিসন্ধ্যা করেন। কিছুদিন আগে তাঁর কাছে এসে ক্ষুদিরামের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। আমাদের প্রধান মন্ত্রী যে মজঃফরপুরে গিয়ে ক্ষুদিরামের মর্মর মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানান নি, এজন্যে তাঁর ক্ষোভের অন্ত ছিল না। তাঁর এই চিঠি! অনেকক্ষণ চিঠিখানার দিকে নীরবে চেয়ে রইলেন তিনি, তারপর বললেন, "আমি হ'লে স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিতাম।"

গণেশ হালদার বললেন, "আমিও তাই ঠিক করেছি। আমার যথেষ্ট টাকা থাকলে আমি আর-একটা কাজও করতাম, কিন্তু টাকা নেই বলে সাহস পাচ্ছি না।"

'কি সেটা?'

"ওয়ার্কিং কমিটির নামে নালিশ করতাম। আমার আইনসঙ্গত স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার আছে কি না, আদালতের মারফত জেনে নিতাম সেটা। কিন্তু তা করতে গেলে যত টাকার দরকার, তত টাকা আমার কাছে নেই।"

ডাক্তারবাবু প্রথমে মৃদু হাসলেন। তারপর হো-হো করে হেসে উঠলেন।

"আপনি দেখছি ক্রোধ-পর্বতের তুঙ্গে আরোহণ করে বসে আছেন। চলুন ওদিকে গিয়ে বসা যাক্। দুর্গা, তুই ফিনাইল জল দিয়ে ধুয়ে ক্ষুরটা ভাল করে ব্যাণ্ডেজ করে দে। মাছি না বসে। অন্য ক্ষুরগুলোও ধুয়ে দিস।"

•

মাঠেই চেয়ার ছিল কয়েকটা। সেইখানে গিয়েই বসলেন দু'জনে। রকেট আর ভুটান তাঁদের সঙ্গে এসে দু' পাশে থাবার উপর মুখ রেখে বসল, যেন তারাও এই আলোচনায় অংশ নেবে। জাম্বু কিন্তু বসে রইল অসুস্থ ভেটুকের কাছে।

কথাবার্তা আরম্ভ হবার আগেই উত্তেজিত বিজয় ছুটে এল একটা নালিশ নিয়ে।

"বাবু, বাবু, রকেট গোবল খাইলো ছে—" (বাবু, বাবু, রকেট গোবর খেয়েছে)

রকেট থাবা থেকে মুখ তুলে চাইলে বিজয়ের দিকে। ডাক্তারবাবু কিন্তু তখন এ-ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব আরোপ না করে বললেন, "আচ্ছা এখন তুই যা—এ-বিচার পরে হবে। এখন গোলমাল করিস না।"

বিজয় তখন ডাক্তারবাবুর দিকে চেয়ে সলজ্জে মুচকি হেসে বলল—"আমলুদ খাইবি ? একঠো পাক্‌কা আমলুদ ছে গাছো পল্‌। পাড়িও।"

(পেয়ারা খাবে ? গাছে একটা পাকা পেয়ারা আছে। পেড়ে আনি ?)

"না, এখন থাক। পেড়ে রাখ, পরে খাব।"

বিজয় একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ল। বিশেষ করে আরও হ'ল রকেটের দিকে চেয়ে। রকেটের মুখে একটা ব্যাঙ্গের ভাব ফুটে উঠেছিল। ভাবটা যেন, কেমন হল তো ? ভারী যে নালিশ করতে এসেছিলে।

ডাক্তারবাবু মাস্টার মশাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "চাকরিটা আপনি ছেড়ে দিন, মোকদ্দমা করবেন না। ওদের ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। মোকদ্দমা করবার টাকা আমি আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু কি হবে মোকদ্দমা করে ? ওরাও তো পতিত, যদিও ওরা সেটা নিজেরা জানে না, সেই জন্যে অবস্থাটা আরও করুণ, আরও শোচনীয়। কি লাভ মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে ?"

গণেশ হালদার চুপ করে রইলেন।

ডাক্তার মুখার্জি মুচকি হেসে বললেন, "মোকদ্দমা করলেও শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখবেন সর্ষের মধ্যেই ভূত আছে। আদালতের বিচারও সব সময়ে ন্যায়নিষ্ঠ হয় কি ? আইন এমন একটা জিনিস যে তাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে নানারকম করা যায়।"

গণেশ হালদার চুপ করেই রইলেন।

তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "বেশ তাই হবে। আজই আমি কাজে ইস্তফা দিয়ে দিচ্ছি।

"সেই ভালো।"

ইতস্তত করতে লাগলেন হালদার মশাই। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ডাক্তার মুখার্জি তাঁর মুখের দিকে।

"কালই তাহলে এখান থেকে চলে যাব আমি। এখানে যখন চাকরি রইল না তখন এখানে থাকব কি নিয়ে, অন্যত্র চাকরির সন্ধান করতে হবে। আপনার সঙ্গে স্নেহের যে বন্ধনে—"

আর বলতে পারলেন না তিনি। কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এল।

ডাক্তার মুখার্জি সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "আপনি যাবেন কেন ! আপনি চাকরির সূত্রে এসেছিলেন বটে, কিন্তু অন্য আর-একটা সূত্রে যে বাঁধা পড়েছেন। সে-সূত্র তো কোনও পলিটিক্যাল খড়্গে ছিন্ন হবে না। আপনি এখন কি করবেন, কি করা উচিত, সে ভারটা আমার উপর ছেড়ে দিন।"

গণেশ হালদার এই ধরনেরই কিছু একটা প্রত্যাশা করছিলেন। তবু বললেন, "যখন এখানে চাকরিই থাকবে না—"

হেসে বললেন মুঠোয় মুকুজ্যে। 'আপনি' কথাটার উপর জোর দিলেন। তারপর আর-একটু হেসে বললেন, "আমার এখানেও তো আপনি একটা চাকরি নিয়েছেন,

আমার আবোল-তাবোল টোকার। সে চাকরি তো আপনার যায় নি। আমি যতদিন থাকব সে চাকরি আপনার যাবেও না।

এর উত্তরে গণেশ হালদার কি বলবেন ভেবে পেলেন না। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন ভাষা দিয়ে মনের ভাব ব্যক্ত করা যায় না। গণেশ হালদার নীরব হ'য়ে রইলেন। ডাক্তার মুখার্জিও কয়েক মুহূর্ত কিছু বললেন না। কিন্তু তাঁর চোখ মুখের ভাব দেখে মনে হ'ল তিনি কি একটা যেন বলতে চাইছেন, কিন্তু বলতে সাহস হচ্ছে না।

গণেশ হালদার বললেন, "কিন্তু আমার সময় কাটবে কি করে। আপনি রোজ যা লেখেন সেটুকু টুকতে আমার এক ঘণ্টার বেশী কোনদিন লাগে নি। বাকি সময়টা আমি কি করব?"

"আপনাকে কাজ দেব। আমি প্রতি মাসে নানারকম বই কিনি, কিন্তু সেগুলো আমার লাইব্রেরিতে এলোমেলো অগোছালো হ'য়ে পড়ে থাকে। আমি গোছাতে পারি না। আপনি সেটার ভার নিন। আমার অবসরও কম। সব বই পড়বারও সময় পাই না, কেনবার নেশায় কিনে ফেলি। আপনি সে-সব বই পড়ে ভালো ভালো অংশগুলো যদি আমাকে সন্ধ্যের পর শোনান, তা হলে ভারি উপকার হবে আমার। এর জন্যে—"

আবার থেমে গেলেন সুঠাম মুকুজ্যে। তারপর যেন মরিয়া হয়েই বলে ফেললেন কথাটা।

"এর জন্যে আপনি স্কুলে যা পেতেন তাই আমি দেব। টাকাটা বাহুল্য, আসল কথা আপনাকে আত্মীয় করে নিতে চাই। আপনার সঙ্গে কোন-কালেই আমার প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক হবে না এটা গোড়াতেই বলে রাখছি। আমি আপনার বন্ধুত্ব কামনা করি। সত্যিই আমি বড় একা—"

চুপ করে গেলেন সুঠাম মুকুজ্যে। গণেশ হালদারও চুপ করে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর গণেশ হালদার বললেন, "আপনি যা বললেন, যা দিলেন তা আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। কিন্তু তবু একটা কথা না বলে পারছি না। এভাবে আপনার মহত্ত্বের উপর দাবি করবার সত্যিকার কোন অধিকার আছে কি? হয়তো দয়ার বশবর্তী হ'য়ে আপনি—"

ডাক্তার মুখার্জি থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

"আপনিই আমার উপর দয়া করুন। আমার উপর আপনার সত্যিকার কোনও অধিকার আছে কিনা এর জবাব আর একদিন দেব। আমার লেখার মধ্যেই পাবেন সেটা। সেটা হয়তো আপনি মানবেন। সে কথা কিন্তু এখন বলবার সময় হয় নি। সামনাসামনি বলাও যাবে না। কিন্তু তার চেয়েও যে বড় অধিকারে আমি আপনার সাহচর্য কামনা করছি তার নাম ভালবাসা। এর সঙ্গে দয়া, অনুকম্পা বা সহানুভূতির কোন সম্পর্ক নেই। প্রয়োজনটা আমার। সঙ্গী হিসাবে মনের মতো লোক পাওয়া যায় না। পয়সা খরচ করলে চাটুকার পাওয়া যায়, কিন্তু বন্ধু পাওয়া যায়-না। ভাগ্যক্রমে

আপনার দেখা পেয়ে গেছি। আপনাকে আমি সহজে ছেড়ে দেব না। আপনি মনে কোনও গ্লানি না রেখে যেমন আছেন তেমনি থাকুন। আপনার টাকা-কড়ির যখন যা প্রয়োজন হবে অসঙ্কোচে আমাকে বলবেন। আজই আপনাকে আমার লাইব্রেরি ঘরের চাবি দিয়ে দেব। আপনি ইচ্ছা করলে থীসিসের একটা খসড়াও করতে পারেন। সেদিন D. H. Lawrence-এর একটা প্রবন্ধে দেখলাম, তিনি গলস্‌ওয়ার্দির 'ফরসাইট সাগা'কে (Forsyte Saga) খুব গালাগালি দিয়েছেন। আমার মনে হয়েছিল গালাগালিটা ঈর্ষাপ্রসূত, আপনি পড়ে দেখুন না। সম্ভব হলে প্রবন্ধও লিখুন ও নিয়ে। সমসাময়িক সাহিত্যিকেরা যখন পরস্পরের নিন্দা-প্রশংসা করেন তা অধিকাংশ সময়েই যে নিরপেক্ষ সমালোচনা হয় না, ওই প্রবন্ধটা তার প্রমাণ। কীটস আজ ইংরাজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর কবিখ্যাতি পেয়েছেন, কিন্তু অনেকে সন্দেহ করেন যে, Blackwood Magaxine-এর কঠোর সমালোচনাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। এ দেশেও ওরকম হচ্ছে। লিখুন আপনি ওসব নিয়ে। আমার মতে ফরসাইট সাগা প্রথম শ্রেণীর বই।"

গণেশ হালদার স্তম্ভিত হ'য়ে শুনছিলেন। সহসা তিনি হেঁট হয়ে ডাক্তার মুখার্জিকে প্রণাম করলেন।

॥ ২৮ ॥

ডাক্তার ঘোষাল ভুরু কুঁচকে স্থঠাম মুকুজ্যের চিঠিখানা আবার পড়ছিলেন। একটু আগেই বেচু তাঁকে চিঠি আর ষোলটা টাকা দিয়ে গিয়েছিল। ঝিনুক বাড়িতে ছিল না। সে গিয়েছিল মিস্টার সেনের কাছে তার কাকার দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে।

ডাক্তার ঘোষাল নাকের লম্বা চুলগুলো টানতে লাগলেন, তারপর শুরু হ'ল হাঁটুর দোলানি। ভিতর থেকে মশলা পেষার আওয়াজ আসছিল।

"হরসুন্দর—"

নব-নিযুক্ত সেই চাকরটি বেরিয়ে এল।

"ঝিনুক কখন ফিরবে তা বলে গেছে ?"

"আজ্ঞে না। তিনি সেন সাহেবের বাসা থেকে বাজারে যাবেন। সেখান থেকে আপনার জন্তে মাংস আনবেন। আমাকে বলে গেছেন মশলা ঠিক করে রাখতে। উনি নিজেই এসে রান্না করবেন।"

তারপর একটু সান্ত্বনার স্বরে বলল, "বেশী দেরি হবে না, ফিরলেন বলে।"

হরসুন্দরের ওইটুকুই বৈশিষ্ট্য। যখন দেখে কোনও কারণে কেউ কষ্ট পাচ্ছে বা চিন্তিত হয়েছে তখন আর কিছু না পারুক, সে সান্ত্বনা দেয়।

"আচ্ছা, যাও।"

হরসুন্দর আবার ভিতরে গিয়ে মশলা বাটতে লাগল। ডাক্তার ঘোষালের মনে হতে লাগল তাঁর বুকের উপরই যেন মশলাটা বাটা হচ্ছে। তাঁর অজ্ঞাতসারেই একটা আর্ত অসহায় ভাব ফুটে উঠেছিল তাঁর মুখে। গাড়িটা থাকলে তিনি ডিসপেন্‌সারি চলে যেতেন। কিন্তু ঝিনুক গাড়িটা নিয়েই বেরিয়ে গেছে। বলে গিয়েছিল, এখুনি আসছি। কিন্তু এক ঘণ্টা হ'য়ে গেল এখনও তার পাত্তা নেই। ডাক্তার মুখার্জির কাছে সে চোখ দেখাতে গিয়েছিল কেন? এই প্রশ্নটাই ঘুরে ফিরে মনে হচ্ছিল তাঁর। ঝিনুকের চোখের যে কোনও অসুখ আছে তা তো তিনি কখনও শোনেন নি। ঝিনুককে দেখেও এ সন্দেহ হয় নি তাঁর, ঝিনুক তাঁকে বলেও নি। তিনি জানেন ঝিনুকের চোখের দৃষ্টি শ্বাপদের দৃষ্টির চেয়েও প্রখর। অন্ধকারেও সে দেখতে পায়। সুঠাম মুকুজ্যের কাছে ফি দিয়ে ও চোখ দেখাতে গিয়েছিল কেন তবে? সুঠাম মুকুজ্যেও চোখে কোনও দোষ পান নি। তিনি খবর পেয়েছিলেন ও লোকটি এফ. আর· সি. এস এবং এম. আর. সি পি.। তা ছাডা চোখের বিষয়েও একজন বিশেষজ্ঞ। জার্মানীর একটা ডিগ্রী আছে নাকি। তিনি যখন চোখের কোনও দোষ দেখতে পান নি, তখন দোষ নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু ঝিনুক গিয়েছিল কেন? ও ঘুজ্‌ঘুজ্‌ করে গণেশ হালদারের কাছেও যায় মাঝে মাঝে। এখন সুঠাম ডাক্তারের কাছেও টোপ ফেলতে আরম্ভ করেছে নাকি। নাক মুখ কুঁচকে মুখের বীভৎস একটা চেহারা করে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।···

হঠাৎ দেখতে পেলেন গণেশ হালদার আসছে।

"আসুন, আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম। I was just thinking of you. বদন অমন প্রসন্ন কেন?"

"স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলাম।"

"তাই নাকি! হঠাৎ?"

"আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলুম। সেটাতে গভর্নমেন্টের সমালোচনা ছিল। ছাপা প্যামফ্লেট তো আপনাকে একটা পাঠিয়েছিলাম। পান নি?"

"পেয়েছি। কিন্তু এখনও পডা হয় নি। ডিসপেন্‌সারির টেবিলেই পড়ে আছে সেটা। কি লিখেছিলেন?"

"আমাদের উপর যে-সব অত্যাচার অবিচার হচ্ছে তাই নিয়ে লিখেছিলাম। মুখে এঁরা বক্তৃতা দিচ্ছেন প্রাদেশিকতা উঠিয়ে দাও, কিন্তু কাজের বেলায় দেখছি প্রাদেশিকতারই চডাছডি। এ দেশের বাঙালী আর উর্দু'ভাষী ছেলেমেয়েদের জোর করে হিন্দীতে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করছে! অথচ বক্তৃতা শুনুন—"

"আপনারও যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, ভীমরুলের চাকে খোঁচা মারতে গেছেন। চোরা কি ধর্মের কাহিনী শোনে? Thieves have their own logic and own religion! এর জন্যই চাকরিটা গেল?"

"স্কুলের সেক্রেটারি তুলসীবাবু আমার প্রবন্ধ পড়ে আমাকে ধমকে চিঠি লিখেছিলেন, যেন ভবিষ্যতে আমি ওরকম প্রবন্ধ না লিখি। আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম।"

"হট্‌ করে ছেড়ে দিলেন ? এখন করবেন কি ?"

"সুঠামবাবু আমাকে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি করে বহাল করে নিয়েছেন। আমার কোনও অসুবিধা হয় নি। ওঁর মতো মহৎ লোক আমি আর দেখি নি।"

ডাক্তার ঘোষালের মুখটা ঈষৎ ব্যাদিত হ'য়ে গেল। তিনি নির্বাক বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন গণেশ হালদারের মুখের দিকে।

ব্যাপারটা সত্যিই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল ডাক্তার ঘোষালের। হঠাৎ সুঠাম মুকুজ্যে একটা মাস্টারকে বহাল করতে গেল কেন! তাঁর তো ছেলেমেয়ে কেউ নেই যে পড়াবে।

"কি করতে হবে আপনাকে ?"

"তাঁর লাইব্রেরির ভারটা নিতে হবে। রোজ ঘণ্টা দুই কাজ করলেই যথেষ্ট। ও কাজ করেও আমার হাতে প্রচুর সময় থাকবে। তাই আপনার কাছে এসেছি একটা পরামর্শ করবার জন্য। এখানে যদি রেফিউজি ছেলেমেয়েদের জন্যে অবৈতনিক স্কুল করি, কেমন হয় ?"

"অবৈতনিক স্কুল ? ছাত্রের অভাব হবে না। ভাত ছড়ালে প্রচুর কাক জুটবে। আমাকে কি করতে বলছেন ?"

"হরিহর মোক্তারের একটা বাড়ি খালি আছে, শুনেছি আপনার সঙ্গে তার খুব ভাব, সে বাড়িটা আমাকে জোগাড় করে দিতে পারেন ? ভাড়া দেব।"

ডাক্তার ঘোষাল এমন একটা মুখ-ভাব করে চেয়ে রইলেন, যেন তিনি কোনও কিছুর থই পাচ্ছেন না।

"দেবেন জোগাড় করে ? মাসে পঞ্চাশ টাকা করে ভাড়া আমি দিতে পারব। শুনলাম এর আগের ভাড়াটে ওই ভাড়াই দিত।"

ডাক্তার ঘোষালের মুখ দিয়ে এবার কথা ফুটল। 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার আয়োজন কেন করছেন বলুন তো। It is no good running after wild buffaloes ঃ ওসব করতে গিয়ে আবার একটা বিপদে পড়বেন। রেফিউজি ছেলেমেয়ে কি একটা-আধটা ? শ' দুই-তিন ছেলেমেয়েকে আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন ? যাকে 'না' বলবেন সে-ই আপনার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।"

"তা ঠিক। একা ম্যানেজ করা কঠিন। আমি আর একটা কথাও ভেবেছি। ঝিনুক বি-এ পাশ শুনেছি। সে-ও যদি পড়ায়—"

লাফিয়ে উঠলেন ডাক্তার ঘোষাল। তারপর বোমার মতো ফেটে পড়লেন।

"না, না, না, ঝিনুক পড়াবে না। Do you understand, ঝিনুক আর আপনাদের সংস্রবে যাবে না।—I shall see that she does not। আপনার আসল মতলব এতক্ষণে বুঝেছি। আপনি ধূর্ত শৃগাল, but you are no match for a tiger।"

থতমত খেয়ে গেলেন গণেশ হালদার। তারপর একটু সামলে বললেন, "বেশ না পড়ান, না পড়াবেন। কিন্তু আপনি অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন!"

"উত্তেজিত হচ্ছি, কারণ I have smelled a rat—ছুঁচোর গন্ধ পেয়েছি। একটা

দুরভিসন্ধির আঁচ পেয়েছি। ঝিনুক মিছিমিছি সুঠাম ডাক্তারের কাছে চোখ দেখাতে গিয়েছিল জানেন? চোখের কোনও অসুখ নেই, তবু চোখ দেখাতে যাবার মানে? চোখটা ছুতো, আসল উদ্দেশ্য যাওয়া, shoulder rubbing? আমি কি কচি খোকা যে একটা ধাপ্পার মোয়া হাতে দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে দেবেন?"

এ আলোচনাটা কতদূর পর্যন্ত গড়াতো তা বলা যায় না, কিন্তু অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনায় থেমে গেল সব। একটা বাঁদর লাফাতে লাফাতে এসে ঘরে ঢুকল এবং ঘোষালের খাবার ঘরে যে পাঁউরুটি ছিল সেটা বগল-দাবা করে বেরিয়ে গেল সটান। হরসুন্দর হৈ হৈ করে তেড়ে গেল।

ঘোষালও তড়াক করে সরে দাঁড়ালেন একধারে।

"বাঁদর? মংকি? এ অঞ্চলে তো দেখিনি কখনও।"

তারপর তাঁদের দৃষ্টি পড়ল পৃথিবীনন্দনের দিকে। তিনি মাঠের আর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে চেয়ে ছিলেন ডাক্তার ঘোষালের দিকে। তারপর হঠাৎ একটা ছোট ক্যামেরা বার করে ক্লিক করে একটা ফোটো তুলে নিলেন ডাক্তার ঘোষালের।

হনহন করে এগিয়ে গেলেন ডাক্তর ঘোষাল তাঁর দিকে। তারপর প্রায় ছুটে গিয়ে ধরলেন তাঁকে।

"কে মশাই আপনি? আমার ফোটো তুললেন কেন?"

"আপনার ফোটো তুলিনি। আপনার পিছনে ওই পেয়ারা গাছে ল্যাজ-ঝোলা পাখি বসেছিল তারই ফোঠো তুলেছি। আমি একজন বার্ড ফোটোগ্রাফার। চিড়িয়া দেখলেই ফোটো তুলি। আচ্ছা চলি, টা টা—"

বাঁ হাতটা তুলে মৃদু হেসে চলে গেলেন পৃথিবীনন্দন। একটু দূরেই বাঁদরটি তাঁর অপেক্ষায় একটি ডালে বসেছিল। দেখেই নেবে এল। পৃথিবীনন্দন তার হাত থেকে পাঁউরুটিটি নিয়ে নিজের ব্যাগে পুরে ফেললেন।

ডাক্তার ঘোযাল আর গণেশ হালদার দুজনেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

"কত রকম আজব চিজই যে আছে সংসারে"—

ডাক্তার ঘোষালের মুখ দিয়েই প্রথম কথা বেরুল।

গণেশ হালদার বললেন, "এ লোকটা শুধু আজব নয়, একটু সন্দেহজনকও"

"কি রকম?"

"ও পাখির ছবি তোলে নি, আপনারই ছবি তুলল। কেন; তা জানি না।"

দুজনেই চুপ করেই রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর গণেশ হালদার বললেন, "আমি এখন যাই তাহ'লে। ওই বাড়িটা যদি ঠিক করে দিতে পারেন, উপকৃত হব। কাছে-পিঠে অন্য কোন বাড়ি পাচ্ছি না। আপনার যদি অমত থাকে তাহলে ঝিনুক ওখানে পড়াবে কেন? এসব কথা আপনার মনে উদয় হয় কেন তা-ও বুঝতে পারি না। ঝিনুক আমাদের গ্রামের মেয়ে, আমার ছোট বোনের মতো।"

"ছোট বোনদেরও সর্বনাশ করেছে এ রকম লোক আমি দেখেছি। যুগটা যে খারাপ। আমিও খারাপ। I am also a bad man—তাই কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না।"

"বেশ, ঝিনুক তাহলে পড়াবে না ওখানে। আমি একাই যতটা পারি পড়াব। বাড়িটা আপনি জোগাড় করে দিন।"

"চেষ্টা করব।"

"আচ্ছা, চলি তাহলে।"

নমস্কার করে গণেশ হালদার চলে গেলেন।

একটু পরেই ঝিনুক ফিরল।

মোটর থেকে নেবেই সে সহাস্যমুখে এগিয়ে এল।

"কাকার দেশে ফেরবার একটা ব্যবস্থা করে এলাম। প্রথমে সেন সাহেবের ওখানে গিয়েছিলাম। তিনি কেমন যেন বাঁকা ধরনের কথাবার্তা বলতে লাগলেন। মনে হ'ল কিছু করতে চান না, অথচ সেটা বলতে পারছেন না। আমি তখন সোজা চলে গেলাম ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।"

ঝিনুককে দেখেই ডাক্তার ঘোষালের রাগ জল হয়ে গিয়েছিল। তিনি বেশ শান্ত-কণ্ঠে বললেন, "তোমার কাকাকে দেশেই পাঠাবে ঠিক করলে শেষ পর্যন্ত? সেটা কি সুবুদ্ধির কাজ হবে?"

"উনি এখানে আপনাদের জুতো লাথি খেয়ে আর পড়ে থাকতে চান না। আমারও সেটা আত্মসম্মানে লাগে। ওঁর কপালের কাটা দাগটা আমাকে রোজ যেন চাবুক মারছে। উনি এখানে নগণ্য হতে পারেন কিন্তু আমাদের গাঁয়ে সবাই ওঁকে মান্য করত। এখনও এক ডাকে সবাই ওঁকে চিনবে। উনি সব জেনে শুনে যখন সেখানে ফিরে যেতে চাইছেন, তাই যান। অনেকে তো ফিরে যাচ্ছে। আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় সেখানে ঘর-বাড়ি বেঁধে বসবাস করছেন আবার। উনি তাঁর কাছেই থাকবেন।"

"কিন্তু শুনেছি উনি যাবার সময় বেশ কিছু নগদ টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছেন। অত টাকা কোথা পাব এখন?"

"আমি কি আপনার কাছে চেয়েছি এক পয়সাও?"

ঝিনুকের চোখ বাঘিনীর মতো দপ্ করে জ্বলে উঠল। ডাক্তার ঘোষাল অনুভব করলেন তিনি চালে ভুল করে ফেলেছেন। যতীশবাবু দেশে চলে গেলে যে একটা আপদ বিদায় হবে এ তিনি জানেন! কিন্তু তাঁর মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে একটা আশঙ্কাও জেগে ছিল, যতীশবাবুর পিছনে পিছনে ঝিনুকও না চলে যায় শেষে। ডাক্তার ঘোষাল দেখলেন এ নিয়ে কোনও আলোচণা করা সমীচীন নয়।

বললেন, "বেশ, যা ভাল বোঝ কর। আমি এখন ডিসপেন্সারিতে চললাম।

ডাক্তার ঘোষাল সোজা গিয়ে মোটরে উঠলেন এবং আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন সবেগে।

ঝিনুক দাঁড়িয়ে রইল মোটরটার দিকে চেয়ে। তারপর তার মুখে অতি সুমিষ্ট হাসি ফুটল একটি। হাসিমুখেই দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, এমন সময় পিয়ন এসে দু'খানি চিঠি দিয়ে গেল। একখানি চিঠি লণ্ডন থেকে এসেছে এয়ার মেলে। মনে হ'ল তনিমার চিঠি। ভ্রূ কুঞ্চিত করে চেয়ে রইল ঝিনুক চিঠিটার দিকে। দ্বিতীয় চিঠিখানি মনে হ'ল সুবেদার খাঁর। টাইপ-করা ইংরেজী চিঠি। তিনি যখনই চিঠি লেখেন (খুব কমই লেখেন যদিও) তখনই টাইপ করে লেখেন। চিঠির নীচে নামও সই করেন না। ঝিনুককে তিনি বলেই দিয়েছিলেন যে যদি কখনও তিনি চিঠি লেখেন, এই রকমভাবেই লিখবেন। ঝিনুক চিঠি দু'টি ব্লাউজের মধ্যে পুরে ভিতরে চলে গেল। এখন চিঠি পড়ার অবসর নেই, মাংসটা আগে রাঁধতে হবে।

২৯

সুবেদার খাঁর চিঠি খুব সংক্ষিপ্ত। I shall take one jackfruit for you. Please attend Down Upper India Express on July, 25. (তোমার জন্ত একটি কাঁঠাল নিয়ে যাব। ২৫শে জুলাই ডাউন আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসে এসো।)

ঝিনুক বুঝতে পারল কাঁঠালের ভিতর কাঁঠালের কোয়া ছাড়াও অন্ত মালও নিশ্চয় থাকবে। পঁচিশে জুলাইয়ের এখনও অনেক দেরি। ট্রেনটা আসে প্রায় একটা নাগাদ। সে সময় কাঁঠালটা নিয়ে কি করবে সে ? কোথায় লুকিয়ে রাখবে ? ডাক্তার ঘোষালকে কথাটা এখনই বলা উচিত কি ? এই সব চিন্তায় একটু অন্তমনস্ক হয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। তার পর ঠিক করল সুবেদার খাঁ যেমন বলবেন তেমনি করা যাবে।

তনিমার চিঠি পড়ে সে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়ল। এ যে কল্পনাতীত !

তনিমা লিখেছে :

ভাই ঝিনুকদি,

না জানি তোমরা আমার সম্বন্ধে কত কি ভাবছ ! হাসপাতাল-পালানো চরিত্রহীনা মেয়েটার মুণ্ডপাত করছ নিশ্চয়। আমি কিন্তু যা করেছি তা খুব বেশী নিন্দনীয় নয়, যে সুযোগ হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আমার জীবনে এসেছিল সে সুযোগ আমি অবহেলা করিনি। এটা নিশ্চয় খুব গুরুতর অপরাধ নয়। যে চরিত্র আমি হারিয়েছি তা আর ফিরে পাব না। কাঁচের যে ফুলদানিটা ফেটে গেছে, তাকে ফাটার কলঙ্ক সারাজীবন বহন করতে হয়। আমাদের সমাজে ফাটা ফুলদানিকে কেউ সম্মানের আসন দেয় না। হয় ডাস্টবিনে ফেলে দেয়, নয় লুকিয়ে সরিয়ে চোখের আড়ালে রাখে। একমাত্র ডাক্তার সুঠাম মুকুজ্জেই আমার সব কথা শুনেও আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখেছিলেন,

আমার সত্যিকারের ভালো করবার চেষ্টা করেছিলেন, আমার পেটের সেই হতভাগ্য সন্তান যদি বাঁচত তাহলে তারও হয়তো একটা ভালো ব্যবস্থা উনি করে দিতেন। ওঁর মতো মহৎ লোক আমি আর দেখিনি। শামুকের চিঠি হয়তো পেয়েছ। সে এখানে আমার কাছে আছে। সে কি আমার সব কথা তোমাকে লিখেছে? ও কাজের মেয়ে, কাজের কথা ছাড়া আর কিছু লেখেনি বোধ হয়। ও সব কথা জানেও না। যে নূতন জীবন এখন আমি যাপন করছি, তার সূত্রপাত কে করেছিল জানো? তুমি। তোমার নিশ্চয় মনে আছে তুমি আমাকে দশ হাজার টাকার একটা চেক ভাঙাবার জন্যে বড-বাজারের একটি লোকের কাছে পাঠিয়েছিলে একদিন রাত্রে। ঝোলাগুড়ে মাছি পডলে যে অবস্থা হয়, আমাকে দেখে লোকটিরও সেই অবস্থা হ'ল। আমি সত্যিই ঝোলাগুড়, কিন্তু তাঁর চক্ষে হ'য়ে গেলাম দুর্লভ পদ্মমধু। লোকটিকে মাছি বলছি বটে কিন্তু সাধারণ মাছি নয়—মৌ-মাছি; কিন্তু আসলে সে হিপোপটেমাস। হিপোপটেমাস রূপে নয়, টাকার দিক দিয়ে। রূপে কন্দর্পকান্তি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই তাঁর ব্যবসা আছে, কোটি কোটি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন। এ হেন লোক আমার রূপের আগুনে ঝাঁপিয়ে পডে পাখা দুটি পুড়িয়ে বসল। তুমি বলেছিলে চেকটা ভাঙাতে হলে এক হাজার টাকা বাটা লাগবে। আমাকে দেখে উনি বললেন, আমাকে ও টাকা দিতে হবে না। আপনাকেই আমি দিলাম ওটা। তারপর আমাকে খাওয়ালেন খুব, শুধু খাবার নয়, ভাল মদও। অমন ভাল মদ আমি জীবনে কখনও খাই নি। এরপর যা ঘটল তাও অবিশ্বাস্য। অনেকটা আরব্য-উপন্যাসের গল্পের মতো। কথাবার্তায় যেই বেরিয়ে পডল যে আমার এখনও বিয়ে হয় নি এবং আমি সাবালিকা (অর্থাৎ বিয়ের জন্য বাবা-মায়ের অনুমতির প্রয়োজন নেই) তখুনই তিনি বিয়ের প্রস্তাব করে বসলেন। লোকটি অকপট। বললেন, জীবনে অনেক মেয়েমানুষ ঘেঁটেছি, কিন্তু জীবন-সঙ্গিনী করতে পারি এমন কাউকে পাই নি এখনও। তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে তুমি আমার শূন্য জীবন পূর্ণ করতে পারবে। তোমার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, কিন্তু তবু কেন জানি না তোমার মধ্যেই আমি আমার মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছি। আমার সামনে হাঁটু গেডে আমার হাত দুটি ধরে চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। সত্যি বলছি ঝিনুকদি, রূপসী বলে সেদিন আমার একটু গর্ব হয়েছিল। আমিও তখন আমার জীবনের সব কথা অকপটে খুলে বললাম তাঁকে। বললাম, আমি কুমারী বটে কিন্তু নিষ্কলঙ্ক নই। এ সব জেনেও যদি—। উনি উত্তরে কি বললেন জানো? বললেন, আগুনে অসংখ্য পতঙ্গ ঝাঁপিয়ে পডবে, এইটেই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু তার জন্যে আগুন কখনও অপবিত্র হয় কি? আগুনকে কেউ কখনও কলঙ্কিত করতে পারে নি। তুমি যে এ-সব কথা অসঙ্কোচে বললে, বলতে পারলে, এইটেই প্রমাণ যে তুমি অপবিত্র হও নি। এরপর কি আর থাকা যায়? আমি আত্মসমর্পণ করলুম তাঁর কাছে। তিনি বললেন, মাসখানেক পরে তিনি বিলেত যাবেন। তার আগেই আমাকে বিয়ে করতে চান। বিয়ে করে আমাকেও নিয়ে যাবেন বিলেতে। আমি যেন যতশীঘ্র সম্ভব তাঁর কাছে ফিরে আসি। তিনি

আমার অপেক্ষায় থাকবেন। বললেন, কাল আমি বম্বে যাব। ওই এক হাজার টাকা ছাড়াও আরও এক হাজার টাকা তুমি রেখে দাও। দিন সাতেক পরে বম্বে থেকে ফিরে তোমাকে যেন পাই। সেদিন রাত্রে ফিরেই যে রক্তারক্তি কাণ্ড হ'য়ে গেল, তাতো তুমি জানই। তুমি জোর করে নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিলে আমাকে। দিয়ে ভালই করেছিলে। না দিলে হয়তো আমি মরেই যেতাম। যে সুখ এখন ভোগ করছি তা আর ভোগ করা হত না। তারপর নার্সিং হোমে ক'দিন থেকে একটু জোর পেলাম, দেখি সেদিনই ওঁর বম্বে থেকে আসবার তারিখ। যদিও একটু দুর্বল মনে হচ্ছিল, তবু আমি বেরিয়ে পড়লাম হাসপাতাল থেকে। গিয়ে দেখি তিনি আমার অপেক্ষায় রয়েছেন। বললুম, আমি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছি। কেন হাসপাতালে গিয়েছিলাম তাও বললাম। উনি হেসে বললেন, ঠিক আছে। ভালই হ'ল, তোমার জীবনের অতীতটা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেল। আমারও মুছে গেছে। তার দুদিন পরে বিয়ে হ'য়ে গেল। উনি আবার বম্বে গেলেন, সেখানেই বিয়ে হ'ল। সেখান থেকেই বিলেতে চলে এসেছি। প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করার যে আরাম সে আরাম এখন আমাকে ঘিরে আছে। আমি কিন্তু তোমাদের ভুলিনি ঝিনুকদি। তোমাদের জন্যে ব্যবস্থাও করেছি কিছু। তোমার মুখে শুনেছিলাম তুমি বিদেশে চলে আসতে চাও। স্বদেশের স্বাধীনতার আবহাওয়ায় স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস নিতে পারছ না, একদিন বলেছিলে আমাকে। না পারবারই কথা। যেখানে আমার বাবার মতো পাষণ্ড তোমাদের রক্ষাকর্তা, সেখানে ভগবানও বোধ হয় কল্কে পান না সব সময়ে। ওদেশ থেকে এদেশে আসবার পথেও নানা রকম আইনের পাহারা বসিয়েছেন কর্তারা। খুবই কড়াকড়ি। অন্যায়-অবিচার-অপমান-পক্ষপাতের খাঁচায় বন্দী করে রাখতে চান তোমাদের। পাসপোর্ট-ভিসা পাওয়া খুবই শক্ত। আমি একটা ব্যবস্থা করেছি। আমার স্বামীর এখানে আপিস আছে। বেশ বড় আপিস। তাঁর ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকাতেও ব্যবসা আছে। ইউরোপের কাজকর্ম লণ্ডন আপিস থেকেই হয়। আমেরিকায় নিউ-ইয়র্কে আপিস আছে। অস্ট্রেলিয়ায় আর জাপানেও আপিস খোলবার কথা হচ্ছে। লণ্ডন আপিসে কয়েকজন লোক নেওয়া হবে। আমার অনুরোধে আমার স্বামী তোমাকে আর শামুককে তাঁর আপিসে বহাল করেছেন। শামুককে আর তোমার ভাইপোকে আসবার জন্যে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভিসা-পাসপোর্টের ব্যবস্থাও এখান থেকে হ'য়ে গেছে। তারা এসে পৌঁছেও গেছে এখানে। এবার তুমিও চলে এস। এখানে আপিসের কাজ কেরানীগিরি। মাইনে যা পাবে তাতে স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। জর্মন আর ফরাসী ভাষা যদি শিখতে পার তাহলে মাইনে অনেক বেশী পাবে। ওসব দেশে যাবারও সুযোগ মিলবে। তোমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে দুটো ভাষা আয়ত্ত করা মোটেই শক্ত হবে না। আমার আর একটা কথাও মনে হয়েছে। জানি না, তুমি রাগ করবে কিনা। মনে হয়েছে, ডাক্তার ঘোষালকে ছেড়ে, তুমি বোধ হয় আসতে পারবে না। তাই তাঁর জন্যেও একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছি। গরীবদের নার্সিং হোম করবার জন্যে উনি অনেক টাকা

দিয়েছেন। সেখানে ডাক্তার ঘোষালকে উনি কাজ দিতে পারবেন বললেন। আমি এই সঙ্গে তোমার ও ডাক্তার ঘোষালের নিয়োগপত্র পাঠালাম। এই দুটো দেখালে ওখানে পাসপোর্ট পাওয়া সহজ হবে। তোমরা যদি না পার উনি ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছেন। শামুক আর তোমার ভাইপোর ব্যবস্থা উনিই করেছিলেন। টাকার জোরে সব হয় ঝিনুকদি। যাই হোক, তুমি চলে এস এখানে। উনি বাঙালী নন, কিন্তু বাঙালীদের উপর ওঁর শ্রদ্ধা খুব বেশী। ওঁর হংকংয়ে যে আপিস আছে, সে আপিসের চার্জে যিনি আছেন তিনি বাঙালী। এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি লণ্ডনেও বাঙালী অনেক। সব রকম বাঙালী খাবার পাওয়া যায়। সেদিন একজন বাঙালী আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি দেখলাম স্বক্তো আর তিতার ডাল করেছেন। খুব ভালো লাগল। আর একটা কথা। যদিও আমি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছি, তবু তোমাকে গোপনে বলছি, তাঁর জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়। তুমি তাঁর একটু খবর নিও। যদি তাঁর টাকার দরকার হয় আমাকে জানিও, আমি তার ব্যবস্থা করব। টাকার আমার অভাব নেই এখন। আমাদের বড়বাজারের আপিস থেকেই টাকার ব্যবস্থা করতে পারব। চিঠির উত্তর দিতে দেরি করো না। আমার অনেক অনেক ভালবাসা জেনো। তোমার ঋণ জন্মে শোধ করতে পারব না, ঝিনুকদি। তুমি না থাকলে সেদিন আমি মরেই যেতাম। ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়? আলাপ আছে? যদি সম্ভব হয় ওঁকেও আমার খবরটা দিও। আর আমার শতকোটি প্রণাম তাঁর পায়ে। ইতি—

তনিমা

চিঠিখানার সঙ্গে দুটো নিয়োগপত্রও ছিল। ঝিনুক নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। হারুণ-অল-রশিদের প্রাসাদে নীত আবুহোসেনও বোধ হয় এত বিস্মিত হয়নি। কয়েক মুহূর্ত বসে থাকবার পর অদ্ভুত একটা প্রতিক্রিয়া হ'ল তার মনে। সে হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, ছেলেবেলায় ঠাকুর-ঘরে প্রণাম করেছে, শিবপূজাও করেছে। কিন্তু তারপর কলেজ-জীবনে আর ভগবানের কথা বড় একটা ভাবেনি সে। তারপর নিদারুণ নিষ্ঠুর বীভৎস অত্যাচারের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে এদেশে অন্যায়, অবিচার আর স্বার্থপরতার নিরঙ্কুশ মূর্তি দেখে, ভগবানের কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। সম্ভবত তার অবচেতনলোকে এ ধারণাও হয়েছিল—ভগবান নেই, ওটা একটা মিথ্যা সংস্কারমাত্র। তনিমার চিঠিটা পেয়ে কিন্তু সব মেঘ যেন সহসা কেটে গেল। সে দুহাত জোড় করে প্রণাম করতে লাগল। তার মুদিত চোখের সামনে ফুটে উঠল সেই বিষ্ণু-মূর্তির ছবিটা যেটাকে তার মা রোজ সকাল-সন্ধ্যা প্রণাম করতেন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে স্থির করে ফেলল ডাক্তার ঘোষালকে এখন কিছু বলবে না। যে রকম খাম-খেয়ালী মানুষ, বিলেতে যেতে রাজী হবেন কি হঠাৎ? কথাটা তাঁকে সইয়ে সইয়ে বলতে হবে। একথা ভাবতে গিয়ে ঝিনুকের আর একটা কথাও মনে হ'ল। এত স্পষ্ট করে একথাটা এতদিন তার মনে হয় নি। ঘোষাল যদি বিলেত যেতে না চান তাহলে

তাঁকে ফেলে সে কি যেতে পারবে? যে লোকটা প্রাণ তুচ্ছ করে তাদের বাঁচিয়েছে, এতকাল সমস্ত বিপদে আপদে নিজের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জোরে তাদের রক্ষা করেছে, তাকে ছেড়ে যাওয়া কি উচিত, ছেড়ে যাওয়া কি সহজ? এসব ছাড়াও তাঁর আর একটা যে পরিচয় সে পেয়েছে, ওই দুর্ধর্ষ লোকটার অনাবৃত যে রূপ সে দেখেছে, তা মুগ্ধ করেছে তার মাতৃ-হৃদয়কে যা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে প্রত্যেক নারীর মধ্যেই। দুর্দান্ত দামাল উলঙ্গ বলিষ্ঠ শিশু, যে অনিবার্য আকর্ষণে টানে প্রত্যেক নারীকে, সে আকর্ষণের প্রভাব ঝিনুকও এড়াতে পারে নি। সে এটাও অনুভব করতে লাগল—সে যদি আজ ডাক্তার ঘোষালকে ফেলে চলে যায় তাহলে উনি নোঙর-বিহীন নৌকার মতো তলিয়ে যাবেন। ওঁর টাকা লোটবার লোভে লোক অনেক জুটবে, কিন্তু সত্যিকার দরদ দিয়ে রক্ষা করবার লোক জুটবে কি? সারা জীবন উনি এরকম লোক খুঁজেছেন কিন্তু পাননি। সহসা ঝিনুক ঠিক করে ফেলল ডাক্তার ঘোষালকে সঙ্গে নিয়েই যেতে হবে। যেমন করে হোক রাজী করাতেই হবে ওঁকে। এই সিদ্ধান্তে এসে হঠাৎ পুলকিত হয়ে উঠল সে।
হঠাৎ মনে পড়ল মাংসটা এখনও চড়ানো হয়নি। ত্বরিতপদে ভিতরে চলে গেল।

॥ ৩০ ॥

যতীশবাবু যদিও নিজের বাসাতেই ছিলেন কিন্তু কাউ-এর বাড়িতে রোজই একবার করে যেতেন। তার দোকানে চা খেতেন আর আড্ডা দিতেন খানিকক্ষণ। অশ্ব-প্রতিম রমেশের সঙ্গে তাঁর ভাব হয়েছিল খুব। রমেশ লোকটি মূর্খ নয়। সবাই তাকে গুণ্ডা বলে, সে গুণ্ডামিও করে. নৃশংসভাবে লোকও খুন করেছে একবার, কিন্তু তার প্রকৃতিটা ষোল-আনা গুণ্ডা-প্রকৃতি নয়। কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি তার কার্যকলাপ চিত্রিত হ'ত, তাহলে বিদ্রোহী বীর আখ্যা পেতে পারত সে। অনেকে তাকে কম্যুনিস্ট বলে। কিন্তু ঠিক কমিউনিস্টও নয় সে। তার ভগবানে বিশ্বাস আছে, মা কালীর গোঁড়া ভক্ত সে, প্রতি বৎসর পিতামাতার শ্রাদ্ধ করে, কিছুদিন আগে গয়ায় পিণ্ডও দিয়ে এসেছে। কিন্তু সে গোঁয়ার, কাঠ-গোঁয়ার। কোনরকম অন্যায়, বিশেষ করে গরীবদের উপর অন্যায় সে কিছুতেই সহ্য করবে না। সে নিজেই তার বিচার করবে এবং সাজা দেবে। যাকে সে খুন করেছিল, সে লোকটা মুসলমান। লোকটা ধর্ষণ করেছিল একটা ভিখারী মেয়েকে। রমেশের দল তাকে নিয়ে এসেছিল কিড্ন্যাপ করে মুখ বেঁধে, তারপর তাকে হত্যা করেছিল। এজন্য তার বিন্দুমাত্র অনুতাপ তো নেই-ই, বরং একটা সৎকার্য করতে পেরেছে বলে মনে মনে গর্বিত সে। মশা, মাছি, ছারপোকা, সাপকে মেরে যেমন আমাদের দুঃখ হয় না, বরং মনে হয় একটা উচিত কর্মই করলাম, শয়তানদের মেরে তেমনি আনন্দ হয় রমেশের এবং রমেশের বন্ধু কাটরা আর কাবরার।
যতীশবাবু এদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেননি। তিনি প্রায়ই আসতেন এবং

নিজের দুঃখের কাহিনী ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতেন। সে কাহিনীর প্রধান "ভিলেন" ডাক্তার ঘোষাল। ডাক্তার ঘোষালের জন্যই যে তাঁর দু'দুটো জোয়ান ভাইঝি নষ্ট হ'য়ে গেল, ডাক্তার ঘোষালের জন্যই তাঁকে যে দেশ ছেড়ে আসতে হ'ল, তাঁকে কোন কথা বলতে গেলে যে তিনি মেরে তাড়িয়ে দেন—এই সব কথাই নানা রং দিয়ে ক্রমাগত বলেন তিনি। ডাক্তার ঘোষাল যে অতি পাজি লোক, এখানে তার মূর্তিমন্ত প্রমাণ কাউ নিজে। কাউ-এর মা যে সাধারণ শ্রেণীর পতিতা ছিল, ডাক্তার ঘোষাল যে আর পাঁচজন খদ্দেরের মতোই তার কাছে এসেছিলেন, এ কথার উপর জোর দেয় না কেউ। ডাক্তার ঘোষাল যে কাউকে বাল্যকাল থেকে মানুষ করেছেন, তার জন্যেও এখানকার কেউ ডাক্তার ঘোষালের প্রশংসা করে না। এখানে যে কথা চালু হয়েছে সেটা হচ্ছে ডাক্তার ঘোষালই কাউ-এর মার সর্বনাশ করেছে, তারপর বুড়ো বয়সে তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, অন্ধকারে মাঠ পেরোতে গিয়ে কুয়োয় পড়ে মারা গেছে বেচারা। তারপর পাষণ্ডটা কাউকেও মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে একটি পয়সা না দিয়ে। এর মধ্যে যে খানিকটা মিথ্যা ছিল তা কাউ জানত। কিন্তু সেটা সে চেপে গিয়েছিল। চেপে গিয়েছিল, কারণ অপমানে তার বুক জলছিল। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যেমন করেই হোক এ অপমানের সে প্রতিশোধ নেবেই। শুধু তার নিজের অপমান নয়, তার মাসীমা ঝিনুকের অপমান। তার বদ্ধ ধারণা ঝিনুককে ডাক্তার ঘোষাল যাদু করে রেখেছে। প্রখ্যাত শয়তানদের একটা যাদু করবার শক্তি আছে। সেই শক্তির জোরে লোকটা বেঁধে রেখেছে ঝিনুককে। তা না হ'লে অত অপমানসত্ত্বেও ঝিনুক তার কাছে আছে কেন? সে স্বচক্ষে দেখেছে লোকটা চুলের ঝুঁটি ধরে মারে ওকে। চড় মারে, লাথি মারে, তবু ঝিনুক আছে কেন ওখানে? নিশ্চয়ই যাদু করেছে। এই যাদু-পাশ ছিন্ন করতেই হবে যেমন করে হোক। উদ্ধার করতেই হবে ঝিনুককে ওখান থেকে। কিন্তু কি করে তা করা যায়? রমেশ, কাটরা আর ঝাবরা তাকে বলছিল, তুই কি করতে চাস, জানাস আমাদের। আমরা ব্যবস্থা করে দেব। কাউ জানত সে কি করবে, কিন্তু ঠিক কেমন করে তা সম্ভব হবে, কবে সম্ভব হবে, তা ঠিক করতে পারেনি তখনও। কিন্তু মনের মধ্যে তার তুষানল জলছিল দিবারাত্রি। সে তুষানলে যতীশবাবু এসে ইন্ধন জোগাতেন। তাঁর একটু স্বার্থও ছিল। একদিন কাউ তাঁকে বলেছিল, "আমি যদি হাতে হঠাৎ কিছু টাকা পেয়ে যাই তাহলে সে টাকা আপনাকেই দেব যতীশবাবু। পাওয়া অসম্ভব নয়, ঝাবরা মাঝে মাঝে আমাকে টাকা এনে দেয়।"

যতীশবাবু আশায় আশায় ছিলেন।

॥ ৩১ ॥

গণেশ হালদার স্কুলের জন্য যে ঘরটি চেয়েছিলেন সেটি পেলেন না। শৃগাল-বিষ্ঠার প্রয়োজন হ'লে শৃগাল পর্বত-শিখরে গিয়ে মল-ত্যাগ করে, এইরকম একটা জনশ্রুতি আছে। হরিবাবু শৃগালেরও উপর টেক্কা দিলেন। মিথ্যা কথা বললেন তিনি। বললেন, তাঁর ভায়রাভাইয়ের শালা আসবে, তার জন্যই বাড়িটা তিনি রেখেছেন। বাড়িটা বাড়ি হিসেবে জঘন্য। ছাত ফাটা, কল, আলো, কিছুই নেই। চারিপাশে প্রতিবেশী নেই, আছে বন-জঙ্গল। ও বাড়িতে কেউ বাস করতে পারে না বলেই বাড়ি খালি পড়ে আছে। বহুকাল আগে মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিয়ে একজন ভাড়াটে ছিল, কিন্তু সে ছিল মাত্র একমাস। তারপর থেকে বাড়িটা খালিই পড়ে আছে। ইচ্ছে করলেই তিনি বাড়িটা অনায়াসে দিতে পারতেন। কিন্তু যেই শুনলেন রিফিউজি ছেলে-মেয়েদের জন্য এখানে স্কুল করবেন স্কুল-বিতাড়িত বাঙাল মাস্টার গণেশ হালদার, অমনি ভড়কে গেলেন তিনি। রিফিউজিদের তিনি বিদ্বেষের চোখে দেখেন। অহেতুক একটা রাগ আছে তাদের উপর। তাঁর প্রাণের বন্ধু উকিল নবগোপালবাবু বললেন, খবরদার, দেবেন না মশাই, দিলে ও বাড়ি আর ফেরত পাবেন না। সুতরাং হরিহর ডাক্তার ঘোষালকে হাত কচলে কচলে মিথ্যে কথাটি বললেন, "আপনার কথা ফেলতাম না ডাক্তারবাবু। কিন্তু কি করব, আমার ভায়রাভাইয়ের শালা বটু চিঠি লিখেছে এখানে আসবে, তার জন্যে বাড়িটা যেন রেখে দি। আত্মীয় স্বজন, রাখতেই হয়েছে কি করব।"

সব শুনে ডাক্তার মুখার্জি প্রশ্ন করলেন, "আপনি দুপুরে ঘণ্টা দুয়েক পড়াবেন তো? তার জন্যে বাড়ির দরকার কি। আমাদের বাড়ির সামনের মাঠে যে বিরাট বটগাছটা আছে তার তলাতেই শুরু করে দিন না স্কুল। রবিবার আর বুধবার ওখানে হাট বসে, সে দু'দিন স্কুলের ছুটি থাকবে। বনস্পতি বিদ্যালয় নাম দিয়ে ওইখানেই শুরু করে দিন আপাতত। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ওই গাছ তলাতেই আরম্ভ হয়েছিল। আজ তা বিশ্বভারতী হয়েছে।"

গণেশ হালদার বললেন "বেশ।"

ব্যাপারটা নতুন ধরনের হওয়াতে তিনি আরও বেশী উৎসাহিত হলেন। কিন্তু তাঁর উৎসাহ সীমা ছাড়িয়ে গেল যখন ডাক্তারবাবু বললেন, "আমি আপনার স্কুলের ছেলে-মেয়েদের বই স্লেট কেনবার জন্য একশ টাকা চাঁদাও দিচ্ছি। আপনি দরকার মতো কিনে দেবেন ওদের। পরশু বৃহস্পতিবার, পরশু দিনই আরম্ভ করে দিন স্কুল। আজ সোমবার, তিনদিন হাতে পাচ্ছেন। রিফিউজি পাড়ায় খবরটা চাউর করে দিন।"

"বেশ।"

সোৎসাহে বেরিয়ে গেলেন গণেশ হালদার।

বৃহস্পতিবার মাত্র বারোজন ছাত্রছাত্রী জুটল। তাদের সঙ্গে তাদের বয়স্ক আত্মীয়রাও এসেছিল। গণেশ হালদার প্রত্যেককে একখানি করে বর্ণ পরিচয়, ধারাপাত এবং স্লেট দিলেন। বারোটা স্লেটের উপর বারোটি ছেলে-মেয়ের হাতেখড়িও দিয়ে দিলেন তিনি। বারোটি "অ" লেখা হ'ল, তাতে দাগা বুলোতে লাগল তারা। খানিকক্ষণ দাগা বুলাবার পর শর্তকিয়া বোঝালেন নিজে। তারপর নিজে "বন্দে মাতরম্" গানটি গেয়ে শোনালেন। বললেন, "কাল থেকে এ গান স্কুল বসবার আগেই গাওয়া হবে। তোমরা সবাই মিলে আমার সঙ্গে গাইবে। সবাই মুখস্থ করে ফেল গানটা।" তিনি যে এত সুন্দর গান গাইতে পারেন তা আগে কেউ জানত না। যে সব বয়স্ক আত্মীয়েরা এসেছিলেন গান শুনে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন তাঁরা। তাঁদের মনে হ'ল, এ গান নয়, এ যেন হৃদয় থেকে স্বতোৎসারিত ভক্তি-প্রস্রবণ।

গানের পর বক্তৃতা দিলেন একটি। বক্তৃতায় যা বললেন তা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারল না হয়তো, কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিরা বুঝল এবং রুদ্ধশ্বাসে শুনতে লাগল।

গণেশ হালদার বললেন—'তোমরা আমার আপনার লোক। তোমাদের যাতে ভালো হয় তার জন্যে যতটা আমার সাধ্যে কুলোয় তা আমি করব। কিন্তু তার আগে গোটাকতক কথা শুনে নাও। রাজনীতির চক্রান্তে আমরা পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হয়ে এদেশে এসেছি। আবার যদি সুদিন আসে, আবার যদি ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়, আমরা হয়তো নিজেদের দেশে ফিরে যাব। কিন্তু একটা কথা তোমাদের মনে রাখতে হবে। যে দেশে আমরা এসেছি তা-ও আমাদের দেশ। আমাদের ভারত-মাতার এক রূপ নয়, অনেক রূপ। তিনি এক ভাষায় কথা বলেন না, অনেক ভাষায় কথা বলেন। একরকম খাবার এক মুখ দিয়ে খান না, বহুরকম খাবার বহু মুখ দিয়ে খান। কিন্তু যেখানেই যে রূপেই তিনি থাকুন, তিনি আমাদের মা, আমাদেরই আপন লোক। হিমালয় থেকে কুমারিকা এবং পাঞ্জাব থেকে আসাম সবই আমাদের দেশ। এক কথায় ভারতবর্ষের মধ্যে কোন দেশই আমাদের বিদেশ নয়, সবই স্বদেশ। সব জায়গাতেই বাস করবার ন্যায্য অধিকার আমাদের আছে, সংবিধান অনুসারে সব জায়গাতেই আমাদের সমান অধিকার। সুতরাং তোমরা এদেশকে বিদেশ বলে মনে করো না। এদেশে তোমাদের উপর নানারকম অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে তা জানি। নিজের মাতৃ-ভাষায় যাতে তোমরা লেখাপড়া করতে পার তার কোন সুবন্দোবস্ত নেই। তোমরা যে কাজে পটু সে কাজ করবার ব্যবস্থা নেই। তোমাদের প্রতিবেশীরা তোমাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, অনেক সময় বিদ্বেষের চোখে দেখে। এ সবই সত্য। এর জন্য লড়তে হবে। সেই লড়াইয়ের প্রধান উপকরণ—মনের জোর আর মনুষ্যত্ব। দেশে যখন ছিলে তখন কি তোমাদের উপর অত্যাচার হয়নি? বড়লোক জমিদার আর সুদ-খোর মহাজনদের অত্যাচারে কি বিপদে পড়নি? তখন যারা মানুষের মতো লড়তে পেরেছিল

তারা জিতেছে, এ রকম নজির অনেক আছে। এখানেও সরকারের দপ্তরে অসাধু কর্মচারীর অভাব নেই, প্রতিবেশীদের মধ্যে পাজি লোক অনেক। এদের সঙ্গে লড়তে হবে, আইনত লড়তে হবে। কিন্তু এ যুদ্ধে তোমরা সকলের সহানুভূতি পাবে। তোমরা সত্যিই যদি ভালো লোক হও। এইটেই আসল কথা এবং সবচেয়ে বড় কথা। ওরা পাজি বলে তোমরাও পাজি হবে এটা কোনও কাজের কথা নয়। তোমাদের ভালো হতে হবে। ভালো থাকবার একটা প্রধান উপায় কাজ করা। তোমরা মনের মতো কাজ পাচ্ছ না বলে কুঁড়ে হয়ে বসে থাকবে সরকারের দয়ায় যতটুকু ভাতা পাচ্ছ—তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে, আর অলস হয়ে বসে পর-নিন্দা পর-চর্চা করবে, এ মনোভাব মোটেই ভালো নয়। কাজ অনেক আছে, করবার ইচ্ছে থাকলেই তা করা যায়। কাজের অভাব নেই। কিন্তু যে কাজই কর সৎ এবং ভদ্র থাকতে হবে, সবাই যাতে তোমাদের শ্রদ্ধা করতে পারে। নিজের মনুষ্যত্ব মর্যাদা হারিয়ে ফেললে চলবে না, আর তা যদি না ফেল তাহলেই দেখবে সবাই তোমাদের খাতির করবে, চেষ্টা করবে কিসে তোমাদের ভালো হয়। আর একটা অনুরোধও তোমাদের করছি, অন্যায় কখনও সহ্য করবে না। তোমরা নিজেদের একটা পঞ্চায়েত তৈরি কর। ইংরাজীতে এর নাম ইউনিয়ন। এই পঞ্চায়েতের কাজ হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। গোড়াতেই বলেছি, ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই তোমাদের সব রকম সুবিধা পাওয়ার ন্যায্য অধিকার আছে, সেই অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হ'তে হবে। দেশের সরকার এবং দেশের আইন তোমাদের পক্ষে। কতকগুলি নীচমনা স্বার্থপর রাজকর্মচারীর ষড়যন্ত্রে আমরা সে অধিকার থেকে যদি বঞ্চিত হই, তাহলে আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে। আজ আর বেশী কিছু বলব না। সর্বশেষে আবার তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা যে মানুষ, তোমরা যে ভদ্র, তোমরা যে স্বাধীন দেশের নাগরিক, তোমরাও যে এই বিশাল দেশের যোগ্য অধিবাসী, এই বোধটা কখনও হারিও না। এই বোধটা যদি অন্তরে সদাসর্বদা জাগ্রত রাখ, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

প্রথম দিনই স্কুলের খবর এবং গণেশ মাস্টারের আচরণের কথা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে, শুধু রিফিউজি মহল নয়, অন্যান্য মহলেও।

॥ ৩২ ॥

সব শুনে বিস্ময়ে ডাক্তার ঘোষালের চোখ দুটো চলকে বেরিয়ে আসবার মতো হ'ল। তিনি এই অবিশ্বাস্য প্রস্তাব শুনে ঝিনুকের মুখের দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

"বিলেত যাব ? তোমার সঙ্গে ? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি ? Have you gone mad ?"

"আমি পাসপোর্ট ভিসার সব ব্যবস্থা করছি। সেজন্য আপনি ভাববেন না। কিন্তু আপনাকে যেতেই হবে। ও দেশেও ডাক্তারি করতে পারবেন শামুক লিখেছে।"

"আমি ওদেশে যাব কেন ! What's the reason ?"

ঝিনুক গম্ভীর হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর যা বলল তা অপ্রত্যাশিত। অন্য কোন সময়ে সে বোধ হয় এ কথা বলত না।

বলল, "আপনাকে যেতে হবে, কারণ আমি যাব।"

ডাক্তার ঘোষাল ঈষৎ হাঁ করে রইলেন খানিকক্ষণ।

"তুমিই বা যাবে কেন। এখানে কি এমন জলে পড়েছ ?"

"তা আপনাকে পরে বোঝাব। তবে এটা জেনে রাখুন, আমি যাবই। এখন চলুন "চিত্রশালা"য় গিয়ে দুটো ফোটো তোলাই। তারপর ইনকমট্যাক্স অফিসার আর পুলিশ সাহেবের কাছে যেতে হবে।"

"কেন ?"

"পাসপোর্টের জন্য এসব দরকার। তারপর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ওখানে যাব।"

ডাক্তার ঘোষাল ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

"শুকনো ঘরে জল ঢেলে কাদা করছ কেন ! বেশ তো আছি আমরা।"

"আপনি সুখে আছেন হয়তো, কিন্তু আমি নেই। কেন নেই সে আলোচনা পরে করব। এখন চলুন। পাসপোর্ট করিয়ে রাখলে তো কোনও ক্ষতি নেই। ইচ্ছে করলে না-ও যেতে পারেন। যাবেন কি না সেটি পরে ঠিক করবেন। এ-বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।"

ডাক্তার ঘোষাল বললেন, "ফোটো তোলার কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। কয়েকদিন আগে একটা লোক এসে আমার ফোটো তুলে নিয়ে গেছে। কোন্ দিন জান ? যেদিন বাঁদরটা এসে পাঁউরুটি নিয়ে যায়। বাঁদরটার সঙ্গে লোকটার যোগাযোগ আছে কি না জানি না, কিন্তু এটা ঠিক, লোকটা আমার ফোটো তুলেছে। হালদার মশাইও দেখেছেন। তাকে ধরলুম গিয়ে, সে বললে সে একটা পাখির ছবি তুলেছে—"

"তাই নাকি !"

ঝিনুক ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। বুকটা কেঁপে উঠল তার। তারা যে চোরাই মালের কারবার করে এটা জানাজানি হয়ে যায় নি তো ! লোকটা পুলিশের গোয়েন্দা নয় তো ? ডাক্তার ঘোষালকে কেন্দ্র করেই এ চলছে। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিই এর প্রধান মূলধন। অজানা একটা লোক এসে ফোটো তুলে নিয়ে গেল কেন ? সে বিস্মিত হল বটে, কিন্তু সামলে নিতেও দেরি হ'ল না তার।

"যাকগে সে যা হবার হবে। ও নিয়ে এখন আর ভেবে লাভ নেই। এখন চলুন "চিত্রশালায়।"

"কেন ওসব ফ্যাচাং তুলছ, আমি যাব না কোথাও—"

"চলুন লক্ষ্মীটি—"

ডাক্তার ঘোষালের বাহু ধরে মৃদু আকর্ষণ করল ঝিনুক। যদিও ডাক্তার ঘোষালের কপালে ভ্রূকুটি দেখা গেল, কিন্তু তিনি গলে গেলেন ভিতরে ভিতরে। এই বোধ হয় প্রথম তিনি ঝিনুকের কাছে একটু আদরের আস্বাদ পেলেন।

"কি যে হাঙ্গামা কর তুমি ফর নাথিং।"

একরকম জোর করেই ঝিনুক তাঁকে "চিত্রশালা"য় নিয়ে গেল।

॥ ৩৩ ॥

একজন ইংরেজ মনীষী মানুষের সংজ্ঞা দিয়েছেন—Man is a building animal: মানুষ স্রষ্টা, সে গড়ে। সে ঘর গড়ে, সমাজ গড়ে, সভ্যতা গড়ে, সাহিত্য গড়ে, রং দিয়ে পাথর দিয়ে মাটি দিয়ে কাগজ দিয়ে গড়ে অনবদ্য শিল্প। কত কিছুই না সে গড়েছে। কিন্তু এর আর একটা দিকও সমান সত্য। সে গড়ে কিন্তু রক্ষা করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সব ভেঙ্গে যায়, লুপ্ত হয়। কত সভ্যতা, কত সাহিত্য, কত শিল্প-সম্ভার, মনুষ্য নামক জীবের কত অপরূপ সৃষ্টি সমাহিত হয়েছে বিস্মৃতির তলায়। মাঝে মাঝে সে সব হঠাৎ আবিষ্কৃত হ'য়ে আমাদের চমকে দেয়। অধিকাংশই কিন্তু অনাবিষ্কৃতই থেকে যায়।

মিস্টার সেন স্ত্রীকে পুড়িয়ে এসে এই সব দার্শনিক চিন্তায় সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছিলেন। ভাঙ্গা-গড়াই পৃথিবীর অমোঘ নিয়ম। তিনি এর ব্যতিক্রম হবেন কি করে। দু'দিন আগে আর দু'দিন পরে।

শামুক চলে যাওয়ার পর তিনি কোনও নার্স পাননি। ঝিনুক যে মেয়েটির কথা বলেছিল সে আসেনি। বলেছিল, যেখানে শামুকদি থাকতে পারেন নি সেখানে সে যাবে না। সুতরাং তিনি বাধ্য হ'য়ে স্ত্রীকে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন। হাসপাতালে কেবিনের দৈনিক যা খরচ তা বহন করবার ক্ষমতা সম্ভবত তাঁর ছিল না। তাই তাঁকে সাধারণ ওয়ার্ডে ভর্তি করতে হয়েছিল তাঁর স্ত্রীকে।

আজকাল অনেক হাসপাতালে সাধারণ ওয়ার্ড মানে নরক। ইংরেজরা চলে গিয়ে আমরা যে কি স্বরাজ পেয়েছি তা বোঝা যায় ওই হাসপাতালগুলোর অবস্থা দেখলে। যে ওয়ার্ডে মিসেস সেন ভর্তি হয়েছিলেন সে ওয়ার্ডে কয়েকদিন আগে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। একটি বৃদ্ধা রোগিণী বার বার জল চাইছিল নার্সের কাছে, তাঁর নিজের কাছে জলের কুঁজো ছিল না। নার্সটি তার কাছে সম্ভবত কোন পয়সা পায়নি। (এসব

হাসপাতালে কাছারির মতো প্রতি পদক্ষেপে পয়সা দিতে হয়)—তাই বারবার চাওয়া সত্ত্বেও সে জল দিচ্ছিল না। তার এক ছেলে অসুস্থ মাকে দেখতে এসেছিল। ছ'ফুট লম্বা বলিষ্ঠ-গঠন আহির গোয়ালা সে। বারবার চেয়েও তার মা যখন জল পেল না, তখন রক্ত গরম হয়ে উঠল গোয়ালার। সে হঠাৎ ছুটে গিয়ে সুঁটকো নার্সটির (দেশী নার্স) চুলের ঝুঁটি ধরে দিল এক আছাড় মেঝের উপর। তারপর তাকে চড়িয়ে লাথিয়ে যে কাণ্ড করতে লাগল তা ভযাবহ। ছুটে এলেন হাসপাতালের ঘুষ-খোর কর্তৃপক্ষরা, ফোন করতে গেলেন থানায়। সে এক লাথিতে চুরমার করে ফেললে ফোনের যন্ত্রটা. তারপর হুঙ্কার দিয়ে উঠল—সব শালে কো মারকে শুতা দেংগে হিঁয়া। (সব শালাকে মেরে শুইয়ে দেব এখানে।) ভয়ঙ্কর ব্যাপার, হুলুস্থূল কাণ্ড! তার বুড়ি মা-ই থামাল শেষকালে তাকে।

"মারপিট নেই কর বেটা। হিঁয়া অব নেই রৈব। ঘর চল।"

(মারামারি কোরো না বাবা। এখানে আর থাকব না। বাড়ি চল।)

মাকে পাঁজা-কোলা করে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে। আর আশ্চর্যের বিষয়, এ নিয়ে আর বিশেষ কোন হৈ চৈ হল না। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষরাও চেপে গেলেন ব্যাপারটা। কি জানি, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে যদি সাপ বেরিয়ে পড়ে।

এই হাসপাতালের সাধারণ ওয়ার্ডে মিস্টার সেন তাঁর স্ত্রীকে ভরতি করেছিলেন। এর জন্যও নানারকম 'পৈরবী' করতে হয়েছিল তাঁকে।

বেশীদিন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি ভদ্রমহিলাকে। কয়েকদিন পরেই মারা গেলেন তিনি।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে চুপ করে বসে ছিলেন মিস্টার সেন। নানারকম দার্শনিক চিন্তা মনে উদয় হচ্ছিল। শ্মশান-বৈরাগ্যের উদাস বিসন্ন ছায়ায় অভিভূত হয়ে বসেছিলেন তিনি।

অনেকক্ষণ পরে তাঁর মনে হ'ল—এবার কি করব! পৃথিবীতে আর তো কোনও অবলম্বন রইল না। বাকি জীবনটা কি নিয়ে, কাকে নিয়ে কাটানো যাবে? তনিমা আর ফিরবে বলে মনে হয় না। তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ হয়েছে, তার সবগুলোর সদুত্তর দিতে পারেন নি তিনি। সুতরাং চাকরিও আর বেশিদিন নেই। এমনিই তো পেন্সনের সময় হয়ে এসেছে। একস্টেনশন আর পাওয়া যাবে না। বিমূঢ়ের মতো বসে রইলেন তিনি। কি করা যায় এখন।

তারপর মিস্টার সেনের হঠাৎ মনে পড়ল রঞ্জানন্দ স্বামীর কথা। লোকটি বেশ নামজাদা সাধু। তাঁর চেনা-শোনা অনেকেই মন্ত্র নিয়েছে তাঁর কাছে। ভারত-বিখ্যাত লোক। বড় বড় লোকদের তিনি গুরু এবং সংসার-সমুদ্রে অনেক মহারথীরই কর্ণধার। মিস্টার সেনের মনে হল, এঁর কাছে মন্ত্র নিলে কেমন হয়? অনেকদিন আগে তাঁর কাছে প্রস্তাবটা করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন আরও কিছুদিন যাক, এখনও

তোমার সময় হয়নি। এখন আর একবার প্রস্তাবটা করলে কেমন হয়। মিস্টার সেনের স্বভাব যখন যেটা করবেন ঠিক করেন তখনই সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলেন সেটা। তখনি চিঠি লিখতে বসে গেলেন। সেন মহাশয় কলেজ জীবনে বাংলায় ভাল ছাত্র ছিলেন। সুমার্জিত ভাষায় তিনি নিম্নলিখিত চিঠিটি লিখলেন।

শ্রীশ্রীচরণে শতকোটি প্রণামান্তে নিবেদন.

মহারাজজী, আশা করি সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। অনেকদিন আপনার খবর লইবার অবসর পাই নাই। সংসারের অনিত্য মায়ায় জড়িত-বিজড়িত হইয়া আপনার নিত্যবাণীর কথা বিস্মৃত হইতেছিলাম। বিস্মৃত হইতেছিলাম বলিলে ভুল হইবে, প্রায় প্রত্যহই আপনার সৌম্য মূর্তি মানসচক্ষে প্রতিভাত হইত, কিন্তু আপনাকে চিঠি লিখিবার মতো অবসর পাইতেছিলাম না। আমি যে কাজে এখন নিযুক্ত আছি তাহা বড়ই দায়িত্বপূর্ণ। অসহায় রিফিউজিদের ভার গভর্নমেণ্ট আমার স্কন্ধেই অর্পণ করিয়াছেন। সে দায়িত্ব কত বড়, কত মহান, কত গভীর, কত তাৎপর্যপূর্ণ, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। আপনার আশীর্বাদে সে কর্তব্য আমি যথাসাধ্য প্রতিপালন করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু ভগবান আমার উপর আশানুরূপ দয়া করেন নাই। আমার স্ত্রী বহুকালাবধি দুরারোগ্য পক্ষাঘাত ব্যধিতে শয্যাগত ছিলেন। কাল রাত্রে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আমার একমাত্র কন্যা তনিমা পড়িবার জন্য লণ্ডনে চলিয়া গিয়াছে। তাহার স্বামীই তাহাকে লইয়া গিয়াছে। আমি বিদেশী ডিগ্রীর, বিদেশী সভ্যতার মোহে মুগ্ধ নহি। আমি তাহাদের বারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা আমার বারণ শোনে নাই। পরিবর্তিত যুগের আবহাওয়া ভয়ঙ্কর, তাহার গতিও প্রলয়ঙ্করী। স্বীকার করিতেছি আমি তাহাদের কাছে হার মানিয়াছি। সংসারে আমি এখন সম্পূর্ণ একা। দূর সম্পর্কের যে দুই একজন আত্মীয় আছেন, তাঁহারাও আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। ত্যাগ করিবার কারণ আমি নাকি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সনাতন হিন্দুধর্মকেই আমি এই তথাকথিত প্রগতির যুগে আঁকড়াইয়া আছি। স্ত্রী-বিয়োগের পর তাই আজ অত্যন্ত অসহায়চিত্তে আপনাকেই স্মরণ করিতেছি। আপনি ছাড়া আজ আর আমার প্রকৃত আত্মীয় কেহ নাই। আমি কিছুকাল পূর্বে আপনার নিকট দীক্ষা চাহিয়াছিলাম; কেন জানি না, বহুকাল পূর্বেই আপনার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলাম, এখনও সে আকর্ষণ তেমনি আছে। সম্প্রতি আমার আত্মাও আধ্যাত্মিক পিপাসায় কাতর হইয়াছে। পার্থিব সুখে সে তৃষ্ণা মিটিবে না জানি। ইহাও জানি আপনি ছাড়া সে তৃষ্ণার বারি আমাকে কেহ দিতে পারিবে না। তাই আপনার নিকট গললগ্নীকৃত-বাসে সানুনয়ে আবার কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি—আমাকে রক্ষা করুন। আমি একা, আমি শোকাহত, আমি অবলম্বনহীন। আপনি ছাড়া আমাকে সান্ত্বনা দিবার, আমাকে পথ দেখাইবার, আমার অন্ধকার জীবনে আলোক-সম্পাত করিবার দ্বিতীয় লোক আর কেহ নাই। এবার আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না, শ্রীশ্রীচরণে স্থান দিয়া কৃতার্থ করুন।

আপনার উত্তরের আশায় উন্মুখ প্রতীক্ষায় রহিলাম। আমার শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি—সেবক
শ্রীনিতাইগোপাল সেন

চিঠি পাঠাবার দু'দিন পরেই রঙ্গানন্দ স্বামীর উত্তর এল। চিঠিতে নয়, টেলিগ্রামে। Come at once—অবিলম্বে চলে এস। রঙ্গানন্দ তখন দেরাদুনে এক হোমরা-চোমরা বড়লোক শিষ্যের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সাতদিনের ছুটি নিয়ে মিস্টার সেনও সেখানে চলে গেলেন। তিনি যখন কালেক্টার সাহেবের কাছে ছুটি নেবার জন্য গেলেন, তখন তিনি বললেন, 'ছুটি আপনাকে দিচ্ছি। কিন্তু ফিরে এসে আপনাকে ঝামেলার সম্মুখীন হ'তে হ'বে। আপনার নামে কিছু কম্‌প্লেন এসেছে।'

॥ ৩৪ ॥

ছোট কাঁচপোকা যেমন প্রকাণ্ড আরশোলাকে অনায়াসে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি করে ঝিনুক ডাক্তার ঘোষালকে নিয়ে টেনে টেনে বেড়াতে লাগল চারদিকে। তার দৃঢ় সঙ্কল্প পাসপোর্ট আর ভিসার ব্যবস্থা সে করবেই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সাহায্য করলেন তাকে। পুলিস সাহেব আর ইনকামট্যাক্স অফিসারের সঙ্গে ডাক্তার ঘোষালের আলাপ ছিল। তাঁরাও কোনও বাধা দিলেন না, বাধা ছিলও না তেমন কিছু। তারপর সে একদিনের জন্য ডাক্তার ঘোষালকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল। সেখানেও তেমন কোনও বাধা হ'ল না। বিলেতে যাঁর আপিসে ওরা চাকরি পেয়েছে তিনি মস্ত ধনী লোক। এক ডাকে সবাই চেনে তাঁকে। ঝিনুক গিয়ে আবিষ্কার করল এখানকার আপিসেও তিনি চিঠি লিখেছেন এবং তাঁর চিঠির সঙ্গে ভারত গভর্নমেণ্টের বড় একজন অফিসারেরও চিঠি আছে! সুতরাং দুজনের পাসপোর্টই হয়ে গেল সহজে। ডাক্তার ঘোষাল সবই যন্ত্রচালিতবৎ করে যাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু কেমন যেন স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন তিনি। ইদানীং রগের শির দুটো বেশী ফুলে উঠেছিল, চোখ দুটোও যেন বাইরে ঠেলে আসছিল। মনে হচ্ছিল যেন দম-বন্ধ করে আছেন। ঝিনুকও এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা করা নিরাপদ মনে করেনি। সে বুঝতে পারছিল আলোচনার সুযোগ দিলেই ডাক্তার ঘোষাল আবার ক্ষেপে উঠবেন, হয়তো বেঁকে দাঁড়াবেন। তাই সে চুপচাপ ছিল। তারপর আর এ নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগও হ'ল না। কারণ কলকাতা থেকে ফিরে ডাক্তার ঘোষাল নিজের কাজকর্মে আরও বেশী করে মেতে উঠলেন যেন। তাঁর রোগীর সংখ্যা আরও বাড়তে লাগল। ঝিনুকের মনে হ'ল বিলেত যেতে তো এখনও অন্তত দেড়মাস দেরি আছে। হয়তো বেশী দেরিও হতে পারে, কারণ প্লেনে সীট পাওয়া মুশকিল। অনিশ্চিতও খানিকটা। ততদিনে সে ডাক্তার ঘোষালকে

রাজী করে নেবেই। প্রেমে পড়লে স্ত্রীলোকেরা হয়তো বুঝতে পারে প্রেমাস্পদের উপর তার কতখানি জোর আছে। ঝিনুকের বিশ্বাস ছিল ডাক্তার ঘোষাল শেষ পর্যন্ত রাজী হবেনই। প্লেনে সীট বুক করে তারপর এ নিয়ে আলোচনা করলেই হবে। ঝিনুক বাইরের কোন লোককে এ বিষয় কিছু বলেনি কিন্তু। সে এখন ঘোরাফেরা করছিল তার কাকার একটা ব্যবস্থা করবার জন্য। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আশ্বাস দিয়েছিলেন এটাও হ'য়ে যাবে। এজন্য কাকারও একটা ফোটোর প্রয়োজন হওয়াতে ঝিনুক একদিন তাঁকে বললেন, "তোমার দেশে ফিরে যাবার জন্যে পাসপোর্ট ভিসার ব্যবস্থা করছি। তোমার একটা ফোটো তোলাতে হবে।"

বিস্মিত যতীশ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যাবে না ?"

"আমি যাব না। তুমি দেশে ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছ. এখানে তোমার ভাল লাগছে না, তুমি একাই চলে যাও।"

"সেখানে কোথায় থাকব ! আমাদের ঘর তো পুড়ে গেছে।"

"নিধুকাকারা সেখানে এসে বসবাস করছেন খবর পেয়েছি। তাদের কাছেই থেক, মাসে মাসে কিছু খরচ পাঠাব তোমাকে।"

যতীশ স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হ'ল তাঁর পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। ইংরেজীতে যাকে 'কর্নার' করা বলে, ঝিনুক তাঁকে যেন তাই করেছে তাঁর মনে হ'ল। তিনি প্রতিদিন বারবার বলে এসেছেন দেশে না গেলে তার শরীর টিকছে না, দেশে গেলেই তিনি শান্তিতে থাকবেন, দেশে গিয়ে মাছের ফলাও ব্যবসা করবেন, দেশে তাঁকে যেতেই হবে—কিন্তু এখন, যখন ঝিনুক দেশে যাবার সমস্ত বন্দোবস্ত করে ফেলেছে—তখন তাঁর প্রাণটা কেবল যেন হু হু করে উঠল। সে দেশে কি আর আছে ? যে দাদার স্নেহচ্ছায়ায় এতদিন স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্তমনে স-প্রতাপে যা খুশি করে বেড়াতেন, সে দাদা তো আর নেই। সেখানে পর্বতের আড়ালে ছিলেন, পর্বত সরে গেছে। দাদা নেই, বাড়িও নেই। ঝিনুক, শামুক, সোনা কেউ সেখানে যাবে না, তিনি কি একা থাকতে পারবেন সেখানে ? তাঁর হিন্দু বন্ধুরা কি কেউ বেঁচে আছে ? মুসলমান বন্ধুরা কি তাঁকে ঠিক আগের মতো স্নেহভরে তাদের পাশে স্থান দেবে ? তারা কি আগের মতোই আছে ? বদলে যায় নি ? এই ধরণের নানা চিন্তা তাঁর মাথায় ভিড করে এল। তিনি দেশে যাবার কথা বলতেন নানা ছুতোয় টাকা আদায় করবার জন্য। হাতে কিছু টাকা না থাকলে তিনি স্বস্তি পান না। দেশে থাকতে কত আমোদ প্রমোদ করতেন। এখানে সে সব কিছুই নেই। দশজনকে যখন তখন খাওয়ানো তাঁর একটা বাতিক ছিল। গ্রামের মহেশ ময়রার দোকানে খাওয়াতেন অনেককে। দাদা তাঁর দেনা শোধ করতেন। এখানেও অনেককে খাওয়াতে ইচ্ছে করে, দল-বেঁধে সিনেমায় যেতে ইচ্ছা করে—কিন্তু টাকা কই ? ঝিনুক হাতখরচ হিসাবে যে টাকা দেয় তাতে তাঁর নিজেরই কুলায় না।

সুতরাং টাকার কথাই পাড়লেন।

"দেশে নিঃস্ব হ'য়ে থাকা যাবে না। বিশ ত্রিশ টাকা হাতখরচ নিয়ে সেখানে স্টাইলে থাকা অসম্ভব। যে স্টাইলে সেখানে বরাবর থেকেছি সে স্টাইলে না থাকতে পারলে দেশে কেউ আমাকে মানবে না। তাছাড়া সেখানে মাছের ব্যবসা যদি আরম্ভ করি—কিছু একটা নিয়ে থাকতেই হবে—তার জন্তেও টাকার দরকার—"

"আমি আপনাকে প্রতি মাসে আপনার নিজের খরচের জন্ম পঞ্চাশ টাকা করে পাঠাব। তাছাডা দেশে আমাদের বাগান, জমি পুকুর আছে, তা-ও আপনি ভোগ করবেন। নিধুকাকার ওখানেই থাকবেন, আদর করে রাখবেন তিনি। তিনি লোক খুব ভালো আমার বাবাই তাঁকে মানুষ করেছিলেন এককালে, অভাবে পডলে তাঁর সাহায্য আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। মাছের টাকার জন্য এখুনি কত টাকা চাই আপনার?"

"অন্তত হাজার দুই না হ'লে তো আরম্ভই করা যাবে না। হাজার পাঁচেক যদি দিতে পারিস আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারি।"

লোভে যতীশবাবুর চোখ দুটো জলজল করে উঠল। ঝিনুক চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। মাথানিয়ার মাঠে তার চোরাই টাকা পোঁতা আছে হাজার কয়েক। টাকাটা সে রেখেছিল রিফিউজিদের বিদেশে পাঠাবার জন্যে। সুবেদার খাঁর কৃপায় তার জানাশোনা অনেকেই চলে গেছে, কিছুদিন পরে সে-ও চলে যাবে!

বলল, "বেশ, পাঁচ হাজার টাকাই আপনাকে দেব। টাকাটা কিন্তু লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পারবেন তো?"

"খুব পারবো।"

যতীশ বাবুর চেহারাটা বদলে গেল যেন। নাকের ডগাটা কাঁপতে লাগল।

"তাহ'লে চলুন ফোটোটা তোলাই গিয়ে।" যেতে যেতে মনে পডল সেইদিন রাত্রেই সুবেদার খাঁর সঙ্গে স্টেশনে দেখা করবার কথা আছে। টাইপ-করা চিঠিটা আবার বের ক'রে পডল সে।

॥ ৩৫ ॥

রাত্রি দ্বিপ্রহর অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। স্টেশনের ঘডিতে প্রায় দুটো বাজে। মেয়েদের ওয়েটিং-রুমে কোন লোক ছিল না বলে ঝিনুক সেইখানে বসেই অপেক্ষা করছিল। ট্রেন 'লেট' আসছিল সেদিন। প্রায় দু'ঘণ্টা লেট। স্টেশন মাস্টার পাণ্ডা এসে গল্প করছিলেন তার সঙ্গে বসে। পাণ্ডা ইদানিং ডাক্তার ঘোষালের আড্ডায় যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি চতুর লোক। তিনি যে নীতির অনুসরণ করেন, সে-নীতির নাম ধরি-মাছ না-ছুঁই-পানি নীতি। প্রচুর ঘুষ খান, কিন্তু গোঁফে, ঠোঁটে বা হাতে সামান্য দাগ পর্যন্ত লাগে না। প্রায় আলগোছে গিলে যান। তাঁকে যারা ঘুষ দেয় তারা জানতে পারে না যে কাকে ঘুষ দিচ্ছে। ঘুষ নেবার অন্য বেসরকারী লোক আছে। তারাই

টাকা নেয় এবং সে টাকা লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করে। এজন্য ঘুষেরই একটা অংশ পায় তারা। সুবেদার খাঁর চোরা ব্যবসাতেও একজন অংশীদার তিনি। তাঁর কাজ সুবেদার খাঁকে আড়াল করা। তিনি আর কিছু করেন না। তাঁর সহযোগিতা না থাকলে সুবেদার খাঁ নির্ভয়ে মাল পাচার করতে পারতেন না। অনেকদিন তিনি টাকাকড়ির অংশ পান নি। তনিমার অন্তর্ধানের পর ভয়ে ভয়ে তিনি আর ডাক্তার ঘোষালের আড্ডায় যান নি। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—শেষে তিনিও যদি জড়িয়ে পড়েন—এই ধরনের একটা ভয় হওয়াতে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন তিনি।

অনেকদিন পরে ঝিনুককে হঠাৎ স্টেশনে দেখে তাই তিনি সাগ্রহে এগিয়ে এলেন। ওয়েটিং-রুমে আর কেউ না থাকাতে তাঁর সুবিধাই হ'ল।

"এই যে! অনেকদিন পরে দেখা হ'ল। কোথাও যাবেন না কি?"

"না, যাব না কোথাও। সুবেদার খাঁ এই ট্রেন নিয়ে আসছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

পাণ্ডা মুখ ফিরিয়ে অন্য দেওয়ালের দিকে চেয়ে বললেন, "সুবেদার খাঁ সৌভাগ্য-বান লোক, ডাক্তার ঘোষাল তো সৌভাগ্যবান বটেই। আমিই অভাগা।"

মুচকি হেসে ঝিনুক বললে, "ঠিক বুঝতে পারলুম না। আপনার মতো সৌভাগ্যবান লোক ক'টা আছে এ শহরে। কাশীতে বাড়ি করেছেন, কলকাতায় করেছেন, এখানেও এক বিঘে জমি কিনেছেন শুনছি। আপনার ছেলে বিলেত গেছে, মেয়েদের ভালো বিয়ে দিয়েছেন—"

"ঠিক, সবই ঠিক। কিন্তু ওসব হচ্ছে বাইরের সৌভাগ্য, ওইটেই লোকে দেখতে পায়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি অভাগা, চিরবঞ্চিত, চিরভিখারী। মুখ ফুটে এসব বলা যায় না, বললেও বোঝান যায় না। মন দিয়ে তা বুঝতে হয়, মনের কথা মনই জানতে পারে, যদি দরদী মন হয়—"

আবার দেওয়ালের দিকে চাইলেন।

বহুদিন আগে আর একবার তিনি ঝিনুককে একলা পেয়েছিলেন, তখনও এই রকম আবছা-আবছা রহস্যময় ভাষায় প্রণয় নিবেদন করবার চেষ্টা করেছিলেন। এবারও করলেন। কিন্তু ঝিনুকের তরফ থেকে কোনও সাড়াশব্দ এল না। সে চুপ করে রইল। পাণ্ডা বুঝলেন সুবিধা হ'ল না। অন্য প্রসঙ্গে উপনীত হলেন।

"সুবেদার খাঁর আজ আসবার খবর কি করে পেলেন? চিঠি লিখেছিল না কি?"

"হ্যাঁ। দেখা করতেই লিখেছিলেন।"

"তার কারবারের খবর কি? বন্ধ হ'য়ে গেল নাকি! আমি তো ইদানীং কোন খবরই পাই নি।"

"প্রায় বন্ধই। আজকাল আর বিশেষ কিছু হয় না। হ'লে আপনি নিশ্চয়ই খবর পাবেন।"

"অ—"

পাণ্ডা গলা চুলকুতে চুলকুতে আবার দেওয়ালের দিকে চাইলেন। তারপর সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বললেন, "ওকে একটু সাবধান করে দেবেন। পুলিস থেকে দু'একটা এন্‌কোয়ারি এসেছিল ওর নামে। আমি অবশ্য চেপে দিয়েছি—"

"কি রকম এন্‌কোয়ারি?"

"তা বলা চলবে না, অফিশিয়াল সিক্রেট। আপনাকে একটু হিণ্ট দিয়ে দিলাম শুধু।"

"আচ্ছা বলব। আপনার কি আজ নাইট ডিউটি?"

"না। আমি এসেছি আমাদের ডি, এস, আজ এই ট্রেনে যাচ্ছেন ব'লে। তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে হবে, তোয়াজ তদ্বিরও করতে হবে। চাকরি তো—"

একজন কুলী এসে বললে—"হুজুর, একঠো ফোন আয়া"

পাণ্ডাকে উঠতে হ'ল।

"দেখি কোথা থেকে ফোন এল আবার। ট্রেনের দেরি আছে, আপনি ওই ইজি-চেয়ারটায় লম্বা হ'য়ে শুযে পড়ুন। ঘুমে আপনার চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু করছে—"

মুচকি হেসে পাণ্ডা বেরিয়ে গেলেন। ঝিনুকের সত্যিই ঘুম পাচ্ছিল। সে ইজি-চেয়ারে লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়ল। তার প্ল্যান (Plan) ছিল স্টেশনের কাজ সেরে মাথা-নিয়ার মাঠে যাবে তার সেই টাকাটা তুলে আনতে। তার মনে হয়েছিল মাথানিয়ার টাকাটা এনে এখন কাছে রাখাই ভালো। কাকাকে সে পাঁচ হাজার টাকা দেবে ঠিক করে ফেলেছিল।

নানাকথা ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে প'ড়ল। হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙল দেখল একটি পায়জামাপরা ফরসা ছিপছিপে লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা ক্যামেরা। ঝিনুক উঠে বসতেই লোকটি বেরিয়ে গেল। ঝিনুকও সঙ্গে সঙ্গে উঠে অনুসরণ ক'রল তাকে। প্ল্যাটফর্মে বেরিয়েই কিন্তু দেখতে পেল না কাউকে। এদিক ওদিক চাইতে চাইতে এগিয়ে গিয়েই পেল পুরুষদের ওয়েটিং-রুমে লোকটি বসে সাদা লম্বা একটি সিগারেট হোল্ডারে কালো একটি সিগারেট পরিয়ে নিবিষ্ট মনে ধরাচ্ছে। ঝিনুক ঢুকে পড়ল সেখানে। সবিস্ময়ে গিয়ে প্রশ্ন করল, "আপনিই কি একটু আগে আমার কাছে এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ, ভুল করে ফিমেল ওয়েটিং-রুমে ঢুকে পড়েছিলাম। ক্ষমা করবেন। আপনি ঘুমুচ্ছেন দেখে চলে এলাম।"

এরপর আর বলবার কি থাকতে পারে। ঝিনুক বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসেই নজরে পড়ল একটু দূরে একটা বাঁদরও বসে আছে চুপ করে। তাকে ঘিরে একদল প্যাসেঞ্জারও ভিড় করেছে। বাঁদরটা ঝিনুকের দিকে মিটিমিটি চাইতে লাগল, মনে হ'ল যেন রহস্যের সমাধান সে জানে। ঝিনুকের হঠাৎ মনে হ'ল এই লোকটাই কি ডাক্তার ঘোষালের ফোটো তুলেছিল? তার সঙ্গেও বাঁদর ছিল একটা। কিন্তু এ-নিয়ে বেশীক্ষণ মাথা ঘামাবার সময় আর সে পেল না, কারণ ঢং ঢং ঢং ঢং করে ট্রেন আসবার ঘণ্টা পড়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে ইঞ্জিনের মাথার বড় আলোটাও দেখতে পেল সে।

ট্রেন এসে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল, কারণ সুবেদার খাঁ ইন্‌জিনে থাকবেন। সুবেদার খাঁ ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলেন ঝিনুক এসেছে কিনা। ঝিনুককে দেখতে পেয়েই তিনি বড় একটা কাঁঠাল বার করে প্ল্যাটফর্মের উপর রাখলেন। কাঁঠালটা সম্ভবত ফেটে গিয়েছিল, কারণ একটা দড়ি তার চারপাশে জড়ানো ছিল। ঝিনুক কাছে আসতেই বললেন, "কাঁঠালটা ওই-খানেই নাবিয়ে দিয়েছি। সাবধানে নিয়ে যেও। বাড়ি গিয়ে আড়ালে খুলো ওটা। কোয়া ছাড়া অন্য জিনিসও আছে।"

তারপর নিম্নকণ্ঠে বললেন, "সোনার বাট আছে গোটা দুই। তারপর এখানকার খবর কি—"

"এখানে আমাদের বাসা বোধ হয় আর থাকবে না। কাকাকে দেশে পাঠিয়ে দেব। কালেক্টার সাহেব সুপারিশ করেছেন। পাসপোর্ট-ভিসার কোনও অসুবিধা হবে না। আমি আর ডাক্তার ঘোষালও লণ্ডন চলে যাচ্ছি।"

"লণ্ডন ? কেন !"

"সেখানে আমরা দু'জনেই ভাল চাকরি পেয়েছি। ওখান থেকেই যতটা পারি রিফিউজিদের সাহায্য ক'রব। এসব হীন কাজ আর ভাল লাগছে না। এদেশে আর থাকতেও পারছি না।"

সুবেদার খাঁর মুখটা বিবর্ণ হ'য়ে গেল।

"পাসপোর্টের কি হবে ?"

"যাঁরা আমাদের চাকরি দিয়েছেন তাঁরাই সে ব্যবস্থা করবেন। আমরাও দরখাস্ত করেছি। মনে হয় ওর জন্যে আটকাবে না।"

"ডাক্তার ঘোষাল রাজী হয়েছেন ?"

ঝিনুক মুচকি হেসে বললেন, "এখনও পুরো হন নি, তবে মনে হয় শেষ পর্যন্ত হবেন।"

ঝিনুক আবার সুমিষ্ট হাসি হেসে অন্য দিকে মুখ ফেরাল। মুখ ফিরিয়েই চীৎকার করে উঠল সে। দেখল সেই বাঁদরটা এসে কাঁঠালটাকে ভেঙে ফেলেছে আর গপ্‌ গপ্‌ করে কোয়াগুলো খাচ্ছে। ছত্রাকার হয়ে পড়েছে সব চারদিকে। ভিড় জমে গেছে। সুবেদার খাঁ তড়াক করে নেবে এলেন ইন্‌জিন্‌ থেকে, উবু হয়ে কি যেন খুঁজতে লাগলেন কাঁঠালের কোয়াগুলো সরিয়ে সরিয়ে।

"নমস্কার। সুবেদার সাহেব যে। ও আর ঘাঁটবেন না। মাল আমি নিয়েছি—"

কাগজে মোড়া বাট দুটো খুলে দেখালেন। সুবেদার খাঁ সবিস্ময়ে দেখলেন পৃথিবী-নন্দন।

পৃথিবীনন্দন সহাস্য মুখে এগিয়ে এলেন।

"আপনি তো সাহেবগঞ্জে যাচ্ছেন ? চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে। দরকারী কথা।"

প্রায় সেই সময়েই গার্ডের হুইস্‌ল শোনা গেল। সুবেদার খাঁ ইন্‌জিনে চড়ে বসলেন। পাশেই একটা খালি ফার্স্ট ক্লাস ছিল, সেইটেতে পৃথিবীনন্দন উঠে বসলেন তাঁর বাঁদর নিয়ে।

ঝিন্নুক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সাহেবগঞ্জে গঙ্গার ধারে যে ফাঁকা মাঠটা ছিল সেইখানে গিয়ে বসেছিলেন সুবেদার খাঁ আর পৃথিবীনন্দন। বাঁদরটা কাছেই একটা পেয়ারা গাছে উঠে বসেছিল। স্টেশনে বা হোটেলে নির্জন জায়গা পাওয়া যায় নি বলেই তাঁরা এতদূর এসেছিলেন।

পৃথিবীনন্দন বললেন, "আমার ইতিহাসটা তাহ'লে শুনুন। আপনার সঙ্গে যখন হোটেলে প্রথম দেখা হয় তখন আপনাকে বলেছিলাম আমি সার্কাসের লোক। ছেলে-বেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে সার্কাসে যোগ দিয়েছিলাম। সেই থেকে সার্কাসে সার্কাসেই ঘুরছি। হয়তো সারাজীবনটাই সার্কাসে কেটে যেত, কিন্তু জীবনের বন্ধন হঠাৎ ছিন্ন হ'য়ে গেল। ফুল্লরা বলে একটি মেয়ে আমার সঙ্গে সিংহের খেলা দেখাত। আমিই শিখিয়েছিলাম তাকে। আমার বাড়ি পূর্ববঙ্গে, ফুল্লরাও পূর্ববঙ্গের মেয়ে। পূর্ববঙ্গে ঐতিহাসিক 'রায়ট্' হবার অনেক আগেই ফুল্লরার বিধবা মা ফুল্লরাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়। কারণ একজন মুসলমান 'রইস' নজর দিয়েছিলেন ফুল্লরার উপর। দেশের লোক বলে আমার অনেক আগে থেকেই আলাপ ছিল ওদের সঙ্গে। ফুল্লরার মা কলকাতায় এক জায়গায় রাঁধুনী ছিল। আমিও তাদের কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করতাম। ফুল্লরার মা হঠাৎ একদিন মারা গেল। তখন আমি এলাহাবাদে সার্কাস করছি। ফুল্লরা আমাকে চিঠি লিখল, 'আমি এখানে মায়ের চাকরিটা পেয়েছি। কিন্তু একা থাকতে ভয় করে। কারণ আমাদের গাঁয়ের সেই মুসল-মান লোকটা এখানেও আমাদের বাড়ির আশে-পাশে ঘোরা-ফেরা করছে।' আমি তখন তাকে আমার কাছেই নিয়ে এলুম। সার্কাসের খেলা শেখাতে লাগলুম। খুব ভালো খেলোয়াড় হয়েছিল সে। ওর মতো সিংহের খেলা আর কেউ দেখাতে পারত না। কিন্তু সে-ই সিংহের হাতেই একদিন ওর প্রাণ গেল। একটা নতুন সিংহ এসেছিল, এক থাবায় ফুল্লরার ঘাড়টা বেঁকিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে মরে নি সে, দু'দিন বেঁচে ছিল। মৃত্যুকালে আমাকে বলে গিয়েছিল, আপনি আমাকে যে হারটা দিয়েছিলেন সেটা, আর মায়ের কিছু গয়না, আমার ছোট ক্যাশবাক্সে আছে। সে সব বিক্রি করে আপনি কোনও ভাল কাজে দান ক'রে দেবেন। এই ব'লে সে মরে গেল। আমি তার ঘরে গিয়ে দেখি ক্যাশবাক্স নেই, চাকরটাও উধাও হয়েছে! আপনি আশা করি হাই-ব্রাও মরালিস্ট নন।"

সুবেদার খাঁ নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন। আচমকা প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠলেন। তারপর হেসে বললেন, "না আমি কোন ব্যাপারেই হাই-ব্রাও নই।"

"গুড্। তাহলে শুনুন। ওই ফুল্লরা ছিল আমাদের চোখের আলো, মাথার মণি, জীবনের একমাত্র অবলম্বন। ফুল্লরা মারা যাওয়াতে আমার আর সার্কাসে থাকতে ইচ্ছে

হ'ল না। যে সিংহটা ফুল্লরাকে মেরেছিল তাকে গুলি করে আর ওই বাঁদর ছানাটাকে নিয়ে আমি সার্কাস পার্টি ছেড়ে দিলাম। ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম। বাড়ির কোন খবর নিই নি। ইচ্ছে হ'ল বাড়ি ফিরে যাই। খোঁজ করতে গিয়ে দেখি বাড়ি নেই, ভিটেতে মুরগী চরছে। আমার বুড়ো বাবা মা কলমা পড়ে মুসলমান হতে রাজী হয় নি ব'লে তাদের খুন করে গাজিরা নিজেদের বেহেস্ত যাওয়ার পথ প্রশস্ততর করেছেন। সুতরাং আমি কলকাতায় আবার ফিরে এলাম এবং অবলম্বনহীন হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এক মাত্র সঙ্গী ওই মংকু। ওকেই নানারকম খেলা শেখাতুম। ও এখন মানুষ হ'য়ে গেছে। এই ভাবেই চলছিল, এমন সময় একদিন বেণ্টিংক ষ্ট্রীটে সেই চাকরটাকে দেখতে পেলাম, যে ফুল্লরার ক্যাশবাক্সটা নিয়ে সরেছিল। দৌড়ে গিয়ে কঁ্যাক করে ধরলাম তাকে। তার অঙ্গে খাকি পোশাক, মাথায় লাল পাগড়ি, বললে সে এখন কনেস্টবলগিরি করছে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বললাম 'তুমি ক্যাশবাক্স চুরি করে পালিয়েছিলে, তোমাদের উপরওলা সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, ক্যাশবাক্স আর তার মধ্যে যে সব গয়না ছিল তা যদি ফেরত না দাও আমি এখনই তোমাকে সেই সাহেবের কাছে নিয়ে যাব। তিনি আমার দোস্ত। লোকটা দেখল বেগতিক। বলল, ক্যাশবাক্স হুজুর আমি লোভে পড়ে নিযেছিলাম তা ঠিক, কিন্তু তা আমি বিক্রি করে দিয়েছিলাম চোরা-বাজারে একটা লোকের কাছে। বললাম, বেশ, আমাকে নিয়ে চল তার কাছে। সেও বললে, মাল তার কাছে নেই, পাচার ক'রে দিয়েছে। কোথায় পাচার করেছে সে খবরও বার করলুম তার কাছ থেকে। পুলিসের কোন বড় সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না, কনস্টেবলটাকে ধাপ্পা দিয়েছিলাম। কিন্তু চোরা-বাজারের কারবারীদের সে কথা বললাম না। তাদের অন্য গল্প বললাম এবং টাকার লোভ দেখালাম। বললাম, ওই ক্যাশবাক্সের ভিতর গয়না ছাড়া একটা লোহার মন্ত্র-সিদ্ধ মাদুলী ছিল, সেইটেই আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। সেটা যদি তোমরা কেউ উদ্ধার ক'রে দিতে পার তোমাদের বকৃশিশ দেব। টাকার লোভে তারা আমাকে এক চোরের আড়ত থেকে আর এক চোরের আড়তে নিয়ে যেতে লাগল। চোর হ'লেই সব সময় খারাপ লোক হয় না, ক্রমশ বন্ধুত্ব হ'য়ে গেল ওদের দু'একজনের সঙ্গে। তারা আমাকে নানা সন্ধান দিত। ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরছিলাম, জীবনে একটা নতুন অবলম্বন পেয়ে গেলাম। এইভাবে খোঁজ করতে করতেই শেষকালে আপনার নাগাল পাই। যে লোকটি আপনার সন্ধান দিয়েছিল সেই লোকটিই বলেছিল আপনি পাইকারী দরে চোরাই মাল কিনে হংকংয়ে বিক্রি করেন। সেই থেকে আমি আপনার পিছু নিয়েছি। তারপর ভাগলপুরের একটা হোটেলে মংকুর সহায়তায় আপনার সঙ্গে একদিন দেখা হ'য়ে গেল। তারপর—থাক্ 'ডিটেলস্, শুনে লাভ নেই —এইটুকু শুধু জেনে রাখুন, আপনার এবং আপনার দলের সমস্ত খবর আমি জোগাড় করেছি প্রমাণ সমেত। আপনি যাদের সঙ্গে কারবার করেছেন তারা অনেকে আপনার বিরুদ্ধে লিখিত বিবরণ দিয়েছে আমার কাছে। আপনাদের প্রত্যেকের ফোটো, এমন

কি ওই যে মেয়েটি কাল স্টেশনে এসেছিল তার ফোটো, ডাক্তার ঘোষালের ফোটো, স্টেশন মাস্টার পাণ্ডার ফোটো, এমন কি আপনার সেই হংকং কারবারীর ফোটোও—সব আমার কাছে আছে। আপনি তো আজ বমালসুদ্ধই ধরা পড়ে গেছেন। এই সব যদি পুলিশের কাছে ধরে দিই আপনি মহা বিপদে পড়ে যাবেন। আমি কিন্তু সেদিন আপনাকে বন্ধু বলে স্বীকার করেছিলাম, তাই আপনাদের কথা আমি পুলিসকে বলব না। কিন্তু দুটি শর্ত আছে: প্রথম আপনি ফুল্লরার যে গয়না নিয়েছেন তার দাম পাঁচ হাজার টাকা আমার চাই। সেটা কোন হাসপাতালে দেব। ফুল্লরার শেষ ইচ্ছা আমাকে পূর্ণ করতেই হবে। আমার দ্বিতীয় শর্ত: আপনি যদি শুদ্ধি করে হিন্দু হতে না চান তাহলে আপনাকে পাকিস্তানে ফিরে যেতে হবে।"

সুবেদার খাঁ বিস্মিত হলেন।

"এ কথা বলছেন কেন!"

"কারণ আমি মনে করি প্রত্যেকটি মুসলমান হিন্দুস্থানের প্রচ্ছন্ন শত্রু।"

"আপনার এ রকম কুসংস্কার কেন? এটা প্রত্যাশা করি নি।"

আপনি আমাকে চেনেন না, তাই প্রত্যাশা করেন নি। আমার অনেক রকম কুসংস্কার আছে। আমি শনি-মঙ্গলবার মানি, ত্র্যহস্পর্শ মানি, গঙ্গা মানি, গয়া মানি---এটাও মানি। বাইরে যত ভালই হোক এটা আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেক মুসলমান ভিতরে ভিতরে মুসলমানেরই ভালো চায়, হিন্দুর নয়। ওদের দিক থেকে বিচার করলে, এটা মহৎ গুণ, কিন্তু আমাদের দিক থেকে এ মনোভাব সাংঘাতিক বিপজ্জনক। মৌখিক প্রেম-বিনিময়ের দ্বারা এ মনোভাব বদলানো যায় না। গান্ধীজীর মতো লোকও হিন্দু-মোসলেম প্যাক্‌ট্ করে কিছু করতে পারেন নি। রাজনৈতিক দাবা খেলায় জিন্না সাহেবেরই জয় হয়েছে শেষকালে। দেশ যখন আলাদা হয়েই গেছে তখন যে যার দেশে থাকবে এইটেই বাঞ্ছনীয়। মুসলমানরা পাকিস্তানে গিয়েই থাক। আমি মশাই আপনার কাছে সরলভাবে স্বীকারই করছি আমার জীবনের ব্রত হচ্ছে এদেশ থেকে মুসলমান তাড়ানো। আমি পুলিসে গোয়েন্দাগিরির চাকরিও করি। অনেক মুসলনান গুণ্ডাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করেছি। আপনাকেও করব, কিন্তু আপনি যদি পাকিস্তানে চলে যেতে রাজী হন, তাহলে কিছু করব না।"

সুবেদার খাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চোখ দুটো জ্বলছিল জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো।

"আপনি যখন আমার সম্বন্ধে এত খোঁজ নিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই এ কথা জানেন যে হিন্দুরা আমার পরিবারবর্গকেও নিঃশেষ করে দিয়েছে। এ-ও নিশ্চয় জানেন যে আজ পর্যন্ত সৎ অসৎ যে কোনও উপায়ে আমি যত টাকা রোজগার করেছি তা খরচ করেছি হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য—"

"জানি। কিন্তু এ-ও জানি যে আপনার চেতন লোকে কিংবা অবচেতন লোকে এর একটা কারণও আছে।"

"কি কারণ ?"

"শ্রীমতী ঝিমুক"

হঠাৎ সুবেদার খাঁ তাঁর প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফেললেন। পৃথিবীনন্দন এ বিষয়ে সতর্ক ছিলেন সম্ভবত। তিনি মার্জারের মতো ক্ষিপ্রগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুবেদার খাঁর উপর এবং বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলেন তাঁর প্যান্টের পকেটে ঢোকানো হাতটা। একটু ধস্তাধস্তির পরেই প্যান্টের পকেটের ভিতর থেকে লোডেড রিভলভারটা বেরিয়ে পড়ল। পৃথিবীনন্দন ত্বরিত হস্তে সেটাকে তুলে নিয়ে লাফিয়ে দূরে সরে গেলেন। তারপর হেসে বললেন, "আমি সার্কাসের লোক খাঁ সাহেব। আমাকে অত সহজে ঘায়েল করতে পারবেন না। হ্যাণ্ডস্ আপ্—"

সুবেদার খাঁ হাত তুললেন না। চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলেন। রিভলভারটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে তাঁর মনে হ'ল তিনি যেন সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া এখন আর কিছু করবার নেই।

"কোথায় যাব ? থানায় ?"

'না। আপনাকে যখন একদিন বন্ধু বলে স্বীকার করেছি তখন আপনাকে পুলিসের হাতে দেব না। এই সোনার বাট দুটোও আপনাকে ফেরত দেব, কারণ ওই হয়তো আপনার শেষ সম্বল। কিন্তু আমার ওই দুটি শর্ত : আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে আর আপনাকে পাকিস্তানে চলে যেতে হবে। আমি আপনাকে নিজে গিয়ে বর্ডার পার করে দিয়ে আসব। এদেশে আপনার স্থান নেই।"

"কেন সংবিধানে তো আছে—"

পৃথিবীনন্দন থামিয়ে দিলেন তাঁকে—"আমি জানি, সংবিধানে নানারকম উচ্চাঙ্গের উদারনীতি আছে। কিন্তু আমি উদার নই। আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বদমাশ পাজি লোক। এখন আপনি আমার পাল্লায় পড়েছেন, এখন আপনাকে আমার সঙ্গেই থানা খেতে হবে, আমার হুকুমেই চলতে হবে। হিন্দুস্থানে থাকা আপনার চলবে না, যদি থাকতে চান শুদ্ধি করে হিন্দু হয়ে থাকতে হবে, কিংবা জেলে থাকতে হবে। আশা করি আপনি আমাকে থানায় যেতে বাধ্য করবেন না। আসুন—"

সুবেদার খাঁ তবু দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি ভাবছিলেন কি করবেন। শেষে ঠিক করলেন রাবণের উপদেশ পালন করা ছাড়া উপায় নেই। অশুভস্য কালহরণং।

বললেন, "আপনি যখন এদেশ ছেড়ে যেতে বলছেন, অগত্যা তাই ছাড়ব। কিন্তু আমাকে সময় দিতে হবে। আমি চাকরি করি, চাকরি ছাড়বার আগে তাদের নোটিস দিতে হবে। এখানে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে যে টাকা পাওনা আছে সেটা তুলতে হবে। ওই সোনার বাট দুটো ঝিমুককে দেব বলেছিলাম, আপনি যখন মেহেরবানি করে' ও দুটো ফেরত দিচ্ছেন, তাহলে, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তার সঙ্গে দেখা করে ও দুটো দিয়ে আসব তাকে—"

"আর আমার পাঁচ হাজার টাকা ?"

"সেটা আপনাকে এখুনি দিয়ে দিচ্ছি—"

কোটের ভিতরকার পকেট থেকে পাঁচখানি হাজার টাকার 'নোট' বার করে দিলেন সুবেদার খাঁ।

"এত টাকা আপনি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেড়ান ?"

"তিনটে সোনার বাট পেয়েছিলাম। একটা বিক্রি করেছি।"

পৃথিবীনন্দন বললেন, "বেশ। সময় দিচ্ছি আপনাকে। কিন্তু এটা ঠিক জানবেন, যতক্ষণ আপনি এদেশে আছেন ততক্ষণ আমি আপনাকে চোখে চোখে রাখব, ততক্ষণ আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরব, এটা জেনে রাখবেন।" সুবেদার খাঁ আর একবার শেষ চেষ্টা করলেন। পৃথিবীনন্দনের হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বললেন, "আমার উপর দয়া করুন। এ দেশ ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। এই আমার দেশ। আমার আপনার লোক এই দেশেই আছে। পাকিস্তানে কেউ নেই। সেখানে পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেহারী মুসলমানে ভরে গেছে। তাদের আমি চিনি না। আমি এই দেশে থেকে হিন্দুদের সেবা করতে চাই। সেই সুযোগ আমাকে দিন। আপনিও আসুন আমার সঙ্গে। এই সোনার বাট দুটো থাকুক আপনার কাছে। ওইটে নিয়েই কাজ শুরু করি আমরা। সত্যি আমি এদেশের হিন্দুদের সেবা করতে চাই। আমাকে এর থেকে বঞ্চিত করবেন না।"

সুবেদার খাঁর গলার স্বর কাঁপতে লাগল। পৃথিবীনন্দন মুচকি হেসে বললেন, "আপনি যা বলছেন তা অতি উচ্চাঙ্গের কথা। আমাদের দেশের বড় বড় নেতারাও ওই ধরণের কথা বলেছেন। কিন্তু আমি ও টোপ গিলছি না। ওইটেই হয়তো আদর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু আপনাকে আগেই বলেছি,—আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অবুঝ, এক-বগ্‌গা লোক। আমার যেটা বিশ্বাস তার থেকে আমি একচুল নড়ি না। স্বকর্ণে ভূতের মুখে রামনাম শুনলেও আমার মনে হবে ভুল শুনছি, ওটা ইল্যুশন। আপনাকে এ দেশ ত্যাগ করিয়ে আমি ছাড়ব। সোনার বাট আমি চাই না। ঘুষ আমি নিই না।"

সুবেদার খাঁর চোখ দুটো জলজল করে' উঠল, কিন্তু তিনি কিছু বলতে পারলেন না।

"চলুন, স্টেশনের দিকেই যাওয়া যাক্। মংকু এস।"

বাঁদরটা পেয়ারা গাছ থেকে নেমে এল লাফাতে লাফাতে। পৃথিবীনন্দন সুবেদার খাঁকে নিয়ে স্টেশনের দিকেই গেলেন।

॥ ৩৬ ॥

গণেশ হালদারের বনস্পতি বিদ্যালয় খুব জমে উঠেছিল। জমে ওঠবারই কথা। কারণ এরকম স্কুল ও-প্রদেশে ছিল না। ওখানে শুধু পড়ানোই হ'ত না। হাতের কাজও

শেখান হ'ত। একজন ছুতোর, একজন কামার, একজন কুমোর এবং একজন দর্জীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলেন তিনি। একজন ছাত্রকে তাদের কাছে প্রতিমাসে গিয়ে শিখে আসতে হ'ত এবং এজন্য তিনি তাদের শেখাবার মজুরিরূপে মাসে দশ টাকা করে দিতেন। সুঠাম মুকুজ্যেও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে জমিটাতে মাস্টার মশাই স্কুল করেছেন, যার উপর ওই বড় গাছটা আছে, সেই জমিটা তিনি তার মালিকের কাছ থেকে কিনে নেবার চেষ্টায় আছেন। জমিটা পরিমাণে দশ বিঘা। একটু বেশী টাকা দিলে জমির মালিক রাজী হয়ে যাবেন সম্ভবত। জমিটা নিজেদের দখলে এসে গেলে তখন তার একধারে তিনি একটা কারিগরি বিদ্যালয় করিয়ে দেবেন, একথাও বলেছেন। আর একধারে একটা ব্যায়ামশালা। সেখানে কুস্তি, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা প্রভৃতি শেখান হবে। সেকালে বাংলা দেশে একদা যে আদর্শে অনুশীলন সমিতি গড়ে উঠেছিল, সেই আদর্শেই বনস্পতি বিদ্যালয়কেও গড়ে তোলবার ইচ্ছা ছিল হালদার মশায়ের। তিনি ছেলেদের পড়াতেনও সেই আদর্শে। স্কুলের পড়াশোনা হয়ে গেলে তিনি ইতিহাসের গল্প করতেন নানারকম। দেশ-বিদেশের ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতেন। গ্যারিবল্‌ডি, মাৎসিনি, রাণা প্রতাপ সিং, শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিং, রাণী লক্ষ্মীবাঈ, চাঁদ সুলতানা, অগ্নিযুগের বীরদের জীবন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন সেনগুপ্ত—এদের কারো না কারো কাহিনী রোজ বলতেন ছেলেদের। গান্ধিজী আর পণ্ডিত নেহরুর কথাও বলতেন। আমরা স্বাধীনতা পেয়েও কেন পেলাম না, আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেশ ভাগ করে' কেন খণ্ডিত হয়ে গেল, আমাদের চরিত্রের কি কি দোষ আমাদের স্বাধীনতাকে পরাধীনতার নিগড়ের চেয়েও দুঃসহ করেছে, এসব তিনি সহজ ভাষায় বিশদ করে' বলতেন। এখানকার রিফিউজিদের সুখ-দুঃখ নিয়েও আলোচনা হ'ত এই বৈঠকে।

একদিন ব্যবসার প্রসঙ্গ ওঠাতে একজন রিফিউজি জেলেকে তিনি বললেন, "তোমরা তো ইলিশ মাছ ধরতে পার। এখানে ধর না কেন। এখানকার গঙ্গাতেও প্রচুর ইলিশ।"

সে বলল, 'মাস্টারবাবু, ইলিশ মাছ ধরতে জানি। ইলিশ মাছ ধরব বলে ধার করে' নৌকো আর জালও তৈরি করেছিলাম। কিন্তু পারলাম না। যাঁর জলকর তিনি মুসলমান। তিনি বললেন, তোমাদের লাভের অর্ধেক আমাকে দিতে হবে। আমরা তাঁর দাবি মিটিয়ে খরচে কুলোতে পারলাম না। বাধ্য হয়ে ও ব্যবসা ছাড়তে হ'ল। এখন মাছ কিনে ফেরি করি। এদেশে এসেও মুসলমানের হাত থেকে আমাদের পরিত্রাণ নেই, মাস্টার মশাই।"

গণেশ হালদর অনেক জেলেদের কাছ থেকে সই করিয়ে উপরে একটি দরখাস্ত করেছিলেন যে, জলকরের মালিকেরা নির্মমভাবে জেলেদের শোষণ করছে, তাতে মাছের দাম অসম্ভব বেড়ে যাচ্ছে, যাদের পুঁজি কম তারা এ-ব্যবসায়ে নামতে পাচ্ছে না। কাগজে দেখা যাচ্ছে গভর্নমেন্ট নাকি নানারকম হোম ইন্‌ডাস্ট্রির উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হয়েছেন, এই অত্যাবশ্যকীয় ব্যবসাটির সম্মুখে যেসব অন্যায় বাধা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে

সেগুলিকে গভর্নমেণ্ট যদি দয়া করে' অপসারণ করেন, তাহলে অনেক গরীব লোকের উপকার করা হবে।

এ দরখাস্তের কোনও উত্তর পর্যন্ত আসেনি। এ সরকারের এটাও একটা বৈশিষ্ট্য। কোন দপ্তরে চিঠি লিখলে উত্তর পাওয়া যায় না। কয়েকদিন পূর্বে এই বিভাগের কোন মন্ত্রী এ-অঞ্চলে এসেছিলেন। শোনা গেল তিনি নাকি উক্ত জলকর ইজারাদারের বাড়িতে খানা-পিনা করেছেন। তা সত্ত্বেও গণেশ হালদার আর একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছেন ওপরওলার কাছে রেজেস্ট্রি করে'। সেটারও কোন জবাব আসেনি।

এই প্রসঙ্গে সেদিন তিনি বলছিলেন, "এইসব ছোটখাটো স্ফুলিঙ্গই শেষকালে বিদ্রোহের বিরাট অগ্নিকাণ্ডে জলে ওঠে। দেশ পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এইসব বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে সিভিল-ওয়ারও শুরু হয়ে যায় অনেক সময়।"

"সিভিল-ওয়ার কি সার?"—জিজ্ঞেস করল একটি ছাত্র।

"সিভিল-ওয়ার মানে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ। আত্মকলহ।"

"আত্মকলহ করা কি ভাল সার?"

"মোটেই ভালো নয়। কিন্তু অনেক সময় ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য তা করতে হয়। একজন বিদেশী বড লেখক বলেছেন—পৃথিবীতে সিভিল-ওয়ার বা ফরেন-ওয়ার বলে কিছু নেই। পৃথিবীর সব যুদ্ধই ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ। তিনি যুদ্ধকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ, আর অন্যায়ের জন্য যুদ্ধ। তাঁর মতে যুদ্ধ যদি লাগেই তাহ'লে ন্যায়ের পক্ষেই থাকা উচিত। তোমরা মহাভারতেও ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধের কথা পড়েছ। পাণ্ডবরা ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন, তাই তাঁদের জয় হ'ল। আমাদেরও সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে থাকতে হবে। প্রয়োজন হ'লে তার জন্য লড়তে হবে। যুদ্ধে জয় যে হবেই এমন কোন কথা নেই। অনেক সময় ন্যায়-যুদ্ধেও পরাজয় ঘটে। পারসীরা যখন গ্রীকদের আক্রমণ করেছিল, গ্রীকদের পরাজয় ঘটেছিল, কিন্তু যুদ্ধ থামেনি। যখন বড হ'য়ে তাদের ইতিহাস পড়বে তখন জানতে পারবে, কিরকম সর্বস্বপণ করে যুদ্ধ করেছিল গ্রীকরা। তারপর রোমানরাও এসে গ্রীস আক্রমণ করে। সে-ও প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। অনেক ভালো ভালো গ্রীক প্রাণ দিয়েছিলেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস মারা গিয়েছিলেন, একটা অসভ্য রোমান সৈন্য তাঁকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হত্যা করে' এসেছিল। আমাদের দেশেও বাইরের অত্যাচরী লুণ্ঠনকারী কম আসে নি। তৈমুর, নাদির প্রভৃতির কথা তোমরা বড় হয়ে পড়বে। আমরা তখন অসহায় ছিলাম। এখনও অসহায় আছি। কিন্তু মানুষ যখন সব দিক থেকে অসহায় হয়ে পড়ে তখনও তাদের ভিতরকার শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। এর প্রমাণ ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন। তারা দরিদ্র অসহায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তবু তাদের মধ্যেই এমন সব লোক জন্মেছিল যাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশনের বিদ্রোহ-অগ্নিকে জ্বালিয়ে রাখা। তারা তাদের রাজা-রানীকে আর দেশের শোষক-সম্প্রদায়কে কেটে নিঃশেষ করে' দিয়েছিল। সেদিন রুশ দেশেও ঠিক এই কারণেই সারা দেশব্যাপী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে

উঠেছিল। আমাদের দেশেও ইংরেজরা যখন ন্যায়ের পথ ত্যাগ করলেন, তাঁরা যে কিভাবে আমাদের শোষণ করে' চলেছেন এটা যখন ধরা পড়ল, তখন দেশে জেগে উঠল শহীদের দল। মারাঠায়, বাংলায়, পাঞ্জাবে। বাংলা দেশেই বেশী। তারা প্রাণ তুচ্ছ করে' ইংরেজদের উপর গুলী বোমা চালিয়ে দলে দলে ফাঁসি-কাঠে উঠেছিল। ন্যায়-সঙ্গত স্বাধীনতার জন্য তারা মরতে ভয় পায়নি। সারা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছে তারা। আজ যা আমরা পেয়েছি তার জন্যে ওই শহীদের দলই প্রথম আন্দোলন করেছিল। বাংলা দেশে যারা করেছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল পূর্ববঙ্গের ছেলে। কিন্তু বিধাতার কি পরিহাস, স্বাধীন ভারতে আজ পূর্ববঙ্গ নেই। তাদের আত্মীয়-স্বজনরা কুকুর বিড়ালের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসও এই। অকথ্য অত্যাচারই মানুষকে যুগে যুগে উদ্বুদ্ধ করেছে স্বাধীনতালাভের জন্য। সব দেশে সব যুগে, মানুষ ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য, সাম্যের জন্য প্রাণ দিয়েছে। সেই সব দধীচির অস্থিই বজ্র তৈরি করেছে অন্যায়-দৈত্যকে মারবার জন্য, অন্যায় অসাম্যকে ধ্বংস করবার জন্য।"

একজন জিগ্যেস করল—"সাম্য মানে কি? আমরা সবাই সমান হয়ে যাব?"

"ঠিক তা নয়। দুবাঘাস কখনও তাল গাছ হতে পারবে না। সাম্যের মানে হচ্ছে সবাই সমান সুযোগ পাবে। দুর্বাঘাস তাল গাছ দু'জনেই সমান সুযোগ পাবে আত্মোন্নতি করবার। নিজের নিজের যোগ্যতা অনুসারে সবাই বাড়বে। এরই নাম সাম্য। আমাদের সকলেরই সমান শিক্ষা পাওয়ার অধিকার থাকবে, রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের সকলের ভোটের দাম সমান হবে, ধর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের ধর্মমতকে সমান শ্রদ্ধা জানাতে হবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষার পূর্ণ অধিকার পাবে। অন্য ভাষা কেউ যদি শিখতে চায় সে ব্যবস্থাও থাকবে। স্টেট সমানভাবে সকলের অন্ন-বস্ত্র শিক্ষার জন্য দায়ী থাকবে। জলকরের ইজারাদার কোনো পরিশ্রম না করে' লাভের অর্ধাংশ গ্রাস করবে, এ অন্যায় ব্যবস্থা আদর্শ সাম্যবাদী স্টেটে থাকবে না। একটা কথা মনে রাখতে হবে কিন্তু। পরশ্রীকাতরতার উপর সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত নয়। যে সাম্যবাদে ধূর্ত মূষিক বা শৃগালের দল সিংহকে বিব্রত বা নির্বীর্য করবার চেষ্টা করে সে সাম্যবাদ আমাদের আদর্শ নয়। আমরা প্রত্যেককেই সমান সুযোগ দিতে চাই। সাম্যই সভ্যতার আদর্শ। কিন্তু সে সাম্যের মহিমা কি, তার আসল তাৎপর্য কি তা শিক্ষিত না হলে বোঝা যায় না। তাই সবচেয়ে আগে দরকার শিক্ষা, সুশিক্ষা। এখন আমরা মূর্খতার অন্ধকারে আর স্বার্থপরতার পঙ্কে ডুবে আছি। তার থেকেই আমাদের সর্বপ্রথমে মুক্তি পেতে হবে। তাই আমাদের দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন অগ্নিযুগের নেতারা, যার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন, সর্বাগ্রে কর্মীদের শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। কারণ মূর্খের দ্বারা কোন অগ্রগতিই সম্ভব নয়। ফরাসী দেশেও ফরাসী বিদ্রোহের আগে একদল শক্তিমান লেখক আবির্ভূত হয়েছিলেন—তাঁদের সবাই এন্‌সাইক্লোপিডিস্ট বলত। তাঁরা নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে

সকলের মনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে, অন্যায় ট্যাক্সের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগাবার চেষ্টা করতেন। তাঁরা দেশের, সমাজের, রাষ্ট্রের সম্বন্ধে যে উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখতেন তা সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছিলেন সকলের মনে। তাঁরা দেশের জনসাধারণকে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন বলেই ফরাসী বিদ্রোহ সম্ভব হয়েছিল। আমাদের দেশে স্বাধীনতালাভের পর যে সংবিধান রচিত হয়েছে তা খুবই উচ্চাদর্শমূলক। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সব উচ্চাদর্শ কার্যক্ষেত্রে আর উচ্চ থাকছে না। প্রাদেশিকতার হলাহলে সব বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। সবাই সমান সুযোগ পাচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে সবাইকে আবার লড়তে হবে। কিন্তু এ লড়াই জিততে হ'লে নিজেদের চরিত্রকে গড়তে হবে সকলের আগে। অপরের দোষ অনুসন্ধান করবার আগে নিজেদের নির্দোষ হতে হবে—"

এইসব বক্তৃতা শুনতে অনেক লোক আসত। শহরময় গণেশ হালদারের খ্যাতি বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। খ্যাতি বিস্তৃত হলেই হিংসুটে লোকদের টনক নড়ে। যে স্কুল হালদার মশাই ছেড়ে এসেছিলেন সে স্কুলের কর্তৃপক্ষেরা কেউ সন্তুষ্ট ছিলেন না তাঁর উপর। তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হওয়াতে আরও অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁদের বুকে তুষানল জ্বলতে লাগল। তাঁদেরই প্ররোচনায় পুলিসের স্পাইও এসে বসতে লাগল তাঁর বক্তৃতা-সভায়। গণেশ হালদার অনেককেই চিনতেন না, স্পাইদেরও চিনতে পারলেন না।

॥ ৩৭ ॥

ইতিমধ্যে ঝিনুক, তনিমার আর একটা চিঠি পেল।

ঝিনুকদি,

অনেক বেড়িয়ে এলাম। সত্যি, পৃথিবী কত বড় আর মানুষ কত বিচিত্র! তুমি ঠিকই লিখেছ, বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের পরিচিত হ'তে হবে। এরা অন্য গ্রহে যাবার তোড়জোড় করছে আর আমরা পৃথিবীরই খবর রাখি না। বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর বৃহত্তর জীবনদর্শনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাঁধতে হবে আমাদের বীণা। তবেই আমরা বিশ্বরঙ্গমঞ্চে জমাতে পারব ভারতবর্ষের চিরন্তন সুর। আমাদের দেশে বিশ্বপ্রেমের নলচে আড়াল দিয়ে প্রাদেশিকতা আর নেপটিজমের চর্চা করতে করতে অজ্ঞ দেশবাসীর ভক্তিগদগদ বা স্বার্থক্রীত ভোট-বাহুল্যের জোরে, যে নকল স্বাধীনতার পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে আমরা পোকামাকড় জড়ো করেছি, তা যে কত ভুয়ো, তা এদেশে কিছুদিন বাস করলেই বোঝা যায়। বাঙালী একদিন উপার্জনের তাগিদে নিজের মাতৃভূমি বাংলা-দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ইংরাজ আমলের প্রবাসী বাঙালীদের কীর্তিকথা আজও স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। স্বামী বিবেকানন্দ বাংলার বাইরেই বেশী সমাদৃত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধেও

একথা সত্য। কিন্তু এখন আমাদের মেকি স্বাধীনতার আবহাওয়ায় প্রাদেশিকতারই বাড়বাড়ন্ত। সুতরাং বাঙালী আর ভারতবর্ষে আত্মবিস্তার করবার সুযোগ পাবে বলে মনে হয় না। তাকে এবার ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশে বেরুতে হবে। বাইরেই তাদের যোগ্যতার পরীক্ষা হবে, সুবিচার হবে। প্রাচীনকালেও তো বাঙালী ভারতবর্ষের বাইরে বেরিয়ে অনেক কীর্তি স্থাপন করেছিল, স্বদেশী বিদেশী অনেকের মুখেই এ কথা প্রচারিত হয়েছে। আবার তাকে বেরুতে হবে। আমার সাধ্যে যতটুকু কুলোয় আমি নিশ্চয় তাদের সাহায্য ক'রব। আমার সাধ্য অবশ্য আমার রূপ আর যৌবন। জানি না এর জলুস কতদিন থাকবে। তবে সেদিন আর একটা জিনিস আবিষ্কার করে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি ঝিনুকদি। আবিষ্কার করেছি উনি আমার রূপ-যৌবন দেখেই শুধু মুগ্ধ হননি বোধ হয়, আমার মধ্যে এমন একটা কিছু দেখেছেন যা আমার দেহেই নিবদ্ধ নয়। এদেশে টাকার গন্ধ পেলে অভিসারিকা-উপযাচিকারা এসে ছেঁকে ধরে পিঁপড়ের মতো। যারা এসেছিল, তাদের আমি দেখেছি। তাদের তুলনায় আমি সাধারণ বগি বা বিন্দি। কিন্তু আমি দেখলাম উনি সুকৌশলে তাদের এড়িয়ে গেছেন। আর একটা ঘটনা ঘটেছে। আমাকে উনি পাঁচ হাজার পাউণ্ড দিয়ে একটি হীরের হার কিনে দিতে চেয়েছিলেন। আমি বললাম, অত টাকা খরচ করে' হার কেনবার শখ আমার নেই। ও টাকা দিয়ে বরং আমাদের মধ্যে যারা এদেশে চলে আসতে চায়, তাদের আনবার ব্যবস্থা কর। তাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করে দাও এখানে। উনি বললেন, তা আমি দেব, কিন্তু হারটা তোমায় নিতে হবে। বললাম, তুমি যখন অত করে' বলছ, নিতে আর আপত্তি করব না। কিন্তু আমার সত্যিকার একটা অদ্ভুত শখ আছে সেটা মেটাবে? কি শখ, জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, দেশে ফিরে গিয়ে যত মাতাল আর চরিত্রহীন অফিসার আছে তাদের নিমন্ত্রণ করে' বড় পার্টি দেব একটা। আর সে পার্টিতে থাকবে যত ভ্রষ্টা মেয়েমানুষের দল। ওদের নাচিয়ে একটু মজা দেখতে চাই। উনি রাজী হয়েছেন এতেও। একবার দেশে ফিরে গিয়ে কোনও নামজাদা শহরে এই পার্টি দেবার ইচ্ছে আছে। উনি তোমাদের পাসপোর্টের আর ভিসার ব্যবস্থা করেছেন। তোমরা কবে আসবে তা যদি আগে থাকতে জানতে পারি তাহলে এয়ারপোর্টে থাকব তোমাদের অভ্যর্থনা করে নেবার জন্য। তবে তোমাদের যদি দেরি হয় তাহলে আমরা থাকব না। আমাদের আপিসের ম্যানেজার যাবেন তোমাদের এরোড্রোম থেকে আনবার জন্য। তোমাদের আসবার তারিখটা তাঁকে জানিয়ে দিও। আলাপ হলে দেখবে উঁচুদরের ভদ্রলোক তিনি। আমাদের বাড়ী আছে এখানে একটা। সেইখানেই তোমরা এসে উঠবে। কোন অসুবিধা হবে না। আমাদের কোম্পানীতে তোমার এবং ডাক্তার ঘোষালের চাকরি হয়ে গেছে। যেদিন আসবে সেইদিনই জয়েন করতে পারবে। আমরা রাশিয়ার একটা পাসপোর্ট জোগাড় করেছি। সেখান থেকে দেশে ফিরব। দেশে ফেরবার আগে তোমাকে একটা চিঠি দেব। এত সুখে আছি, তবু আমার দুঃখ কি জানো ঝিনুকদি? আমার বাবা। লোকে পিতৃ-পরিচয় দিয়ে গর্ব অনুভব করে। কিন্তু আমার

মাথা নুয়ে যায় লজ্জায়। তবু ওঁকে সব কথা বলেছি। উনি বললেন, ভাঙা জিনিসকে জোড়া যায়, কিন্তু পচা জিনিস মেরামতের বাইরে। তোমার বাবার কথা যা শুনছি তাতে মনে হচ্ছে তিনি পচে গেছেন। তাঁকে যদি কিছু অর্থ সাহায্য করতে চাও, আমি আপত্তি করব না। বাবার খবর কি আমাকে জানিও একটু। শামুক এখানে এসে কাজ করছে। এর মধ্যেই আপিসে তার সুনাম হয়েছে। তোমার ভাইপোকে একটা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। তোমরা আমাদের ভালবাসা জেনো। মিস্টার পাণ্ডা আর সুবেদার খাঁর খবর কি ? তোমাদের বাড়িতে কি এখনও তাদের আড্ডা বসছে ? সব খবর দিয়ে উপরের ঠিকানায় চিঠি দিও। ইতি— তনিমা

ডাক্তার ঘোষাল অনেক আগেই কলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ঝিনুক বাইরের ঘরে একা বসে চিঠিটা পড়ছিল। চিঠি থেকে চোখ তুলেই দেখল সুবেদার খাঁ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কখন যে নিঃশব্দচরণে এসেছিলেন তা ঝিনুক বুঝতে পারেনি।

"আপনি কখন এলেন ? বসুন।"

ঝিনুক তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠল। সুবেদার খাঁ কিন্তু বসলেন না, দাঁড়িয়েই রইলেন।

"না, আমি বসব না। এখুনি চলে যাব।"

"আচ্ছা সেদিন রাত্রে সে ব্যাপারটা কি হ'ল বলুন তো। কাঁঠালের ভিতর কি ছিল ?"

"সোনার বাট।"

"আর ওই লোকটা কে ! সঙ্গে বাঁদর—

"পুলিস স্পাই। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমরা ধরা পড়েছি।"

"সে কি !"

"আমি পাকিস্তানে চলে যাচ্ছি। ও লোকটা আমাকে এখানে থাকতে দেবে না।"

"সে কি ! এখানকার চাকরি ?"

"ছেড়ে দিচ্ছি। ইস্তফা দিয়ে দিয়েছি। তবে এখনও অন্তত মাসখানেক কাজ করতে হবে। তোমাকে একটা বিষয়ে সাবধান করতে এলাম। তুমি বলেছিলে বিলেত যাবার জন্য পাসপোর্টের দরখাস্ত করেছ। পাসপোর্ট পেয়েছ কি ? স্পাইটা বাগড়া লাগাতে পারে। তার কাছে তোমার ফোটো আর ডাক্তার ঘোষালের ফোটো আছে দেখছি। আমাদের সমস্ত খবর জোগাড় করেছে লোকটা। আমাকে বলেছে আপনি যদি পাকিস্তান চলে যান আপনার নামে রিপোর্ট করব না। আমাদের বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ আছে তাও আমাকে দিয়ে দেবে বলেছে।"

"আমরা তো পাসপোর্ট পেয়েছি। এ মাসের শেষ সপ্তাহের সোমবার রাত্রের ট্রেনে আমাদের কলকাতা যাওয়ার কথা।"

"কথাটা বেশী প্রকাশ ক'রো না। ট্রেনে চড়বার সময়েই যদি কোন গোলমাল করে,

যদিও সে কথা দিয়েছে তোমার কোন অনিষ্ট করবে না। কিন্তু পুলিসের লোককে বিশ্বাস নেই।"

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে মনে মনে মুষড়ে পড়ল ঝিনুক। কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ হ'ল না তেমন কিছু। দৃঢ় নিবদ্ধ ওষ্ঠে চুপ করে' রইল সে। কেবল চোখ দুটো জ্বলতে লাগল।

ক্ষণকাল পরে বলল, "খবরটা দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।"

সুবেদার খাঁ বললেন, "যেদিন তোমরা যাবে ব'লছ সেদিন আমারই ডিউটি। তোমরা যে ট্রেনে যাবে সে ট্রেন আমিই নিয়ে যাব। যদি বল গাড়ি ডিস্ট্যাণ্ট সিগনালের কাছে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি। স্টেশনে না উঠে সেইখানে ওঠাই নিরাপদ। একটু আগে গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকো তাহলে—"

ঝিনুক যেন অকূলে কূল পেল।

"সে তো খুব ভালো হয়। কেউ আবার রিপোর্ট করবে না তো আপনার নামে।"

ম্লান হেসে সুবেদার খাঁ বললেন, 'সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়! চাকরি ছেড়েই যখন চলে যেতে হচ্ছে তখন রিপোর্টে আর কি ভয়।"

"আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? ও কি আপনাকে চলে যেতে বাধ্য করতে পারে?"

"ও বলেছে আমি যদি পাকিস্তানে চলে যাই তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে যত প্রমাণ আছে সব আমার হাতে দিয়ে দেবে। আমি এ ব্যাপারে একা জড়িত হ'লে পাকিস্তানে যেতাম না, মকদ্দমা লড়তাম। হেরে গিয়ে জেল হ'লেও জেল খাটতাম। কিন্তু এর সঙ্গে তুমিও জড়িয়ে আছ যে। তোমাকে নিয়ে আদালতে বা জেলে টানাটানি করবে এ আমি সহ্য করতে পারব না। তোমাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই আমাকে পাকিস্তানে যেতে হচ্ছে। এটা ঠিক জেনো যখন যেখানে থাকব—"

সুবেদার খাঁ আর বলতে পারলেন না, বাষ্পরুদ্ধ হ'য়ে এল তাঁর কণ্ঠস্বর। পর-মুহূর্তেই সামলে নিলেন নিজেকে।

"আচ্ছা, পরে আবার দেখা হবে। তোমার বিলেতের ঠিকানাটা কি—"

"এই যে দিচ্ছি—"

একটা কাগজে সে ঠিকানাটা টুকে দিল।

"চিঠি লিখবেন মাঝে মাঝে। আমার কাকাও পাকিস্তানে যাচ্ছেন। তাঁর ঠিকানাটা দিয়ে দিচ্ছি, যদি সুবিধে হয় তাঁর সঙ্গেও দেখা করবেন।"

"দাও, নিশ্চয় দেখা করব।"

ঝিনুক আর একটা কাগজে তার কাকার ঠিকানাটাও লিখে দিলে। সে অনুভব করতে লাগল সুবেদার খাঁর কাছে সে অসীম ঋণে ঋণী, কিন্তু সে ঋণ শোধ করবার উপায় নেই। উনি যা চাইছেন তা সে কিছুতেই দিতে পারবে না।

ঠিকানা পকেটে পুরে একটা ছোট চামড়ার থলি বার করলেন তিনি প্যান্টের পকেট থেকে।

"এই নাও, এই বোধহয় তোমাকে আমার শেষ উপহার।"

"কি আছে ওতে?"

"সেই সোনার বাট দুটো। পৃথিবীনন্দন ফিরিয়ে দিয়েছেন।"

"পৃথিবীনন্দন কে?"

"সেই স্পাই। স্পাই বটে, কিন্তু অসাধারণ লোক। আচ্ছা চলি এবার তবে।"

সুবেদার খাঁ চলে গেলেন।

সুবেদার খাঁ বেরিয়েই দেখতে পেলেন মংকু পাশের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। একটু দূরে পৃথিবীনন্দনও দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেদিনের পর থেকে তিনি সুবেদার খাঁকে একমুহূর্ত চোখের আড়াল করেন নি।

॥ ৩৮ ॥

ডাক্তার মুখার্জি সেদিন যেখানে বসেছিলেন সে জায়গাটা অদ্ভুত। ফাঁকা অথচ ঘেরা। নানারকম গাছ দিয়ে ঘেরা একটা বড় উঠোনের মতো জায়গা। সামনে বেশ খানিকটা আকাশ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটা লতা-তোরণের ভিতর দিয়ে। দুটো গাছের ডাল যেন বাহু বাড়িয়ে পরস্পরকে সম্ভাষণ করছে আর তাদের উপর উঠেছে ঘনশ্যাম ত্যালাকুচো লতা, লাল লাল অনেক ফলও ধরেছে তাতে। সুন্দর একটা তোরণের মত হয়েছে। নীচে দিয়ে দূরে আকাশ দেখা যাচ্ছে। সেইখানে দূর্বাঘাসের উপর বসেছিলেন সুঠাম মুকুজ্যে। সামনে একটা উঁচু ঘাসে-ঢাকা ঢিবির মতো ছিল, তার উপর নিজের ফাইলটা রেখে লিখছিলেন :

"আমি যেখানে আজ এসেছি সে জায়গাটা অতি পুরাতন। কিন্তু নাম নতুন ডাঙ্গা। কবে কে এর নাম নতুন ডাঙ্গা (এদেশের ভাষায় নঈ ময়দান) রেখেছিল তা জানি না, কিন্তু এটা জানি, এখানে এসে যখনই বসেছি তখনই নূতন একটা প্রেরণা পেয়েছি। আজ আপনাকে যে কথা বলতে যাচ্ছি তার জন্যে একটা নূতন প্রেরণাই দরকার। সত্য কথাও অনেক সময় অসঙ্কোচে বলা যায় না। বিশেষত সে সত্যটা যদি ভয়ানক সত্য হয়। আর একটা কথাও আপনি ন্যায়ত জিজ্ঞাসা করতে পারেন—একথা আপনাকে এতদিন বলি নি কেন। এর কারণ প্রথমে অনেকদিন আমি কথাটা জানতেই পারিনি। তারপর যখন জানলুম তখন যার সম্বন্ধে কথাটা সে-ই সেটা প্রকাশ করতে বারণ করে দিলে। মাত্র কাল তার অনুমতি পেয়েছি।

গোড়া থেকেই শুনুন। আমি বিলেতে অনেকদিন কাটিয়ে যখন দেশে ফিরলুম তখন

কোথায় বসব ঠিক করতে না পেরে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। দেশ তখন পাকিস্তান হিন্দুস্থানে ভাগাভাগি হয়ে গেছে, রায়ট্ চলছে চারিদিকে। তখন পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত, ধর্ষিত, লুণ্ঠিত হিন্দু বাঙ্গালীর দল পিলপিল করে' পালিয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গে। আমি তখন হিন্দুস্থান পাকিস্তান বর্ডারে এক হাসপাতালে আমার এক বাল্যবন্ধুর বাসায় ছিলাম। হাসপাতালটা হিন্দুস্থানে আর আমার বন্ধু সেই হাসপাতালের মেডিকাল অফিসার। একদিন গভীর রাত্রে একদল লোক হৈ হৈ করে' একটি রক্তাক্ত মেয়েকে নিয়ে হাজির হ'ল এসে। মেয়েটিকে পাকিস্তানে ধর্ষণ করে' তার স্তন দুটি কেটে তাকে পাকিস্তান বর্ডার পার করে হিন্দুস্থানে ফেলে দিয়ে গেছে গুণ্ডারা। দেখে শিউরে উঠলাম। পাশবিকতার এরকম চেহারা আর দেখি নি। মেয়েটি রূপসী এবং যুবতী। ধর্ষণের চিহ্ন তখনও তার সর্বাঙ্গে। কিন্তু তখনও সে মরে নি। আমরা দুই ডাক্তারে তখন লেগে পড়লুম। মেয়েটির জীবনীশক্তি প্রচুর ছিল, আমরাও চেষ্টার ত্রুটি করি নি, কোলকাতা থেকে ব্লাড এনে ট্রান্সফিউশনও করেছিলাম। আজকাল অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ, মেয়েটি শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল। তারপরই হ'ল সমস্যা। শুনলাম মেয়েটি ভদ্র ব্রাহ্মণ-ঘরের কন্যা। এতেই আরও মুশকিল হ'ল। চারদিকে যেসব উদ্বাস্তু-কলোনী হয়েছিল, তার একটাতেও সে থাকতে পারল না। তার অঙ্গহীনতার জন্য সবাই তাকে নিয়ে ঠাট্টা করত। একদিন আমাকে সে বলল, "আপনারা আমাকে না বাঁচালেই পারতেন। নরক-কুণ্ডে পচে মরার চেয়ে মৃত্যুই ভালো ছিল।" আমার স্বভাবের মধ্যে একটা একগুঁয়েমি আছে, আপনি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন। আপনি একাধিকবার আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে চেয়েছেন, কিন্তু আমি যেতে দিই নি। এই মেয়েটির সম্বন্ধেও আমার তেমনি একটা মনোভাব জেগে উঠল। জিদ চড়ে গেল। মনে হ'তে লাগল—একে যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে সত্যিই কি লাভ হ'ল যদি একে মানুষের মতো বাঁচবার সুযোগ না দিতে পারি? একে কোন উদ্বাস্তু-কলোনীতে রেখে গেলে সত্যিই তো এর আরও শোচনীয় মৃত্যু হবে। ওর অতীত লুপ্ত হয়ে গেছে, দেশে ফেরবার উপায় নেই, ওর মা-বাবাকে গুণ্ডারা হত্যা করেছে, ওদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। ও যাবে কোথায়? ওর ভবিষ্যৎ কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? কে এগিয়ে এসে বলবে ওর দায়িত্ব আমি নিলাম? তারপরই মনে হ'ল এসব প্রশ্ন কাকে করছ তুমি। নদীতে একটা লোক ডুবে যাচ্ছে, অসহায় হাত দুটো তুলে সাহায্য প্রার্থনা করছে, আর তুমি তীরে দাঁড়িয়ে ভাবছ কে ওকে গিয়ে তুলবে? তুমি তো গিয়ে তুলতে পারো। মনস্থির করে ফেললাম একদিন। তাকে বললাম, "এ নরককুণ্ড থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে পারি, যদি তুমি রাজী থাক।"

"কি করে উদ্ধার করবেন আপনি"—বিস্মিত দৃষ্টি তুলে প্রশ্ন করল সে।

বললাম, "তোমাকে বিয়ে করব। আমিও ব্রাহ্মণের ছেলে। আমার এখনও বিয়ে হয় নি। তোমার আপত্তি না থাকলে তোমাকেই বিয়ে করতে পারি আইন অনুসারে।"

খানিকক্ষণ হতভম্ব হ'য়ে রইল সে। তারপর বলল, "আমার আপত্তি নেই। কিন্তু

আমার মতো একটা মেয়েকে বিয়ে করতে আপনার ঘৃণা হচ্ছে না? আপনার আত্মীয়-স্বজন নেই? তাঁরা কি আমাকে ঘৃণা করবে না?"

বললাম, "না, আমার কেউ নেই। ঘরও কোথাও বাঁধি নি এখনও। তোমাকে সত্যি আমার খুব ভাল লেগেছে। তুমি যদি আপত্তি না কর, তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধি।"

কয়েকদিন পরেই রেজিস্টার্ড বিবাহ হয়ে গেল। তখন এখানে আমি বাড়িটা কিনেছি বটে কিন্তু গৃহস্থালী স্থাপন করি নি। ওকে এখানে নিয়ে এলাম। তারপরই সমস্যা শুরু হ'ল। দেখলাম ও কিছুতেই যেন নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না, আলাদা আলাদা থাকতে চায়। রাত্রে আলাদা ঘরে, আলাদা বিছানায় শোয়। দিনের বেলা বেশীর ভাগই ঠাকুর-ঘরে বসে থাকে আর কাঁদে। মুখে হাসি নেই, সর্বদাই কেমন যেন একটা বিমর্ষ বিষণ্ণ ভাব। তখন আমি এখানকার স্কুল কমিটিতে ছিলাম। সেই সময় একজন শিক্ষক নিযুক্ত করবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। দরখাস্তগুলো যখন এল তখন স্কুল কমিটি আমার উপর ভার দিলেন কাকে নেওয়া হবে তা ঠিক করবার। আমি দরখাস্তগুলো বাড়ি এনে আমার স্ত্রীকে দিলাম। বললাম, তুমি ঠিক কর, কে যোগ্যতম লোক। তাকে একটা কাজ দিয়ে একটু অন্যমনস্ক করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সে আপনাকেই যোগ্যতম লোক বলে নির্বাচন করল। আমিও পরে দরখাস্তগুলো পড়ে দেখলাম নির্বাচন ঠিক হয়েছে। তারপর আপনি এলেন। আপনি যখন আমার বাড়িতে এলেন তখন আমার স্ত্রীই আমাকে অনুরোধ করল,, ওঁকে এখানেই থাকতে বল, এখানেই উনি খাওয়া দাওয়া করবেন। ওঁকে আলাদা বাসা করতে দিও না। তাই হ'ল, আপনি আমাদের বাসায় থেকে গেলেন। আপনার সঙ্গে ক্রমশ আমার একটা ভালবাসার বন্ধন গড়ে উঠল। আমিও আপনার সঙ্গে ক্রমশ যেন একটা একাত্মতা অনুভব করতে লাগলাম। আপনি যে বাইরের লোক, আমার কেউ নন—এ-কথা আমার মন থেকে তিরোহিত হ'ল ক্রমশ। এইভাবে চলছিল, তার পর আপনার সঙ্গে স্কুল কমিটির বিরোধ বাধল। আপনি এখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন। ঠিক তার আগের দিন আমি সত্য ঘটনাটা শুনেছি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে। কথাটা আমার কাছে এতদিন প্রকাশ করতে ইতস্তত করেছে সে, কিন্তু মনে মনে এজন্য সে-ও কম অস্বস্তি ভোগ করে নি। আমাকে বলল, "একটা কথা তোমাকে আজ বলব, রাগ করবে না তো?"

আমি বিস্মিত হলাম। এভাবে সে আমার সঙ্গে আর কোনদিন কথা বলে নি।

বললাম, "না, রাগ করব কেন। কি কথা?" সে একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, "যে মাস্টার-মশাই আমাদের বাড়িতে আছেন, তিনি আমার দাদা। রায়টের সময় উনি বিলেতে ছিলেন। দরখাস্তগুলোর মধ্যে ওঁর নাম দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল ইনি আমার দাদা। তারপর যখন এলেন তখন আর সন্দেহ রইল না। ওঁকে তুমি বলো একদিন সব কথা খুলে। বলো তোমার বোন বুলিই আমার স্ত্রী।

আমি একথা সেদিন আপনাকে বলতে পারি নি। কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকছিল। আপনার সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা আত্মীয়তা বেরিয়ে পড়ল এটা খুবই সুখের

কথা, আপনার উপর আমার আর একটা দাবি বাড়ল। এটাও খুবই আনন্দের, কিন্তু মাত্র এই দাবিটার উপরই আমি জোর দিতে চাই না, আপনাকে আমার ভাল লেগেছে, এই জোরেই আমি আপনাকে আমার সঙ্গে রাখতে চাই। আপনি যা করছেন তা নিশ্চিন্ত মনে করুন। আপনার সঙ্গে এ-আত্মীয়তা যদি না-ও বেরুত, তাহ'লেও আমি আপনাকে ছাড়তুম না। এসব কথা সেদিন মুখে আপনার সামনে আমি বলতে পারি নি, কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল, ভয় হচ্ছিল প্রকাশ পেলে একটা মেলোড্রামাটিক গোছের কাণ্ড না হ'য়ে পড়ে। কিন্তু বলতে না পেরে অস্বস্তিও ভোগ করছিলাম। এখন তার অবসান হ'ল। একটা লতা-তোরণের ভিতর দিয়ে সামনে খানিকটা নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে, উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা বাঁশপাতি পাখি। ঝিরঝির করে সুন্দর হাওয়া বইছে। দূরে কোকিল ডাকছে। আশেপাশের ঘাসে সবুজ শোভা। আমাদের জীবনও এমনি সহজ ও সুন্দর হোক। আপনাদের যে পারিবারিক জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল তা আবার নব নব শোভায় সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠুক নূতন পরিবেশে—এই এখন আমার অন্তরের কামনা।"

গণেশ হালদার এ চিঠিটা পড়ে যখন শেষ করলেন তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা। ডাক্তারবাবু তাঁকে রোজ যে লেখা টুকতে দিতেন তা তিনি শোওয়ার আগে টুকে তবে শুতেন। সেদিন লেখাটা পড়ে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন। তারপর ছুটে বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তারবাবুর বাড়িটা অন্ধকারে বিরাট একটা দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে যেন। ছুটে বেরিয়ে গিয়ে গণেশ হালদার বাড়িটার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। ওই বাড়ির মধ্যে বুলি আছে? এতদিন ছিল? এ যে বিশ্বাস করা শক্ত। তবু এ সত্যি। নিশ্চয় সত্যি, ডাক্তার মুখার্জি যখন লিখেছেন তখন এ মিথ্যা নয়। হতবাক আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। রকেটের চীৎকারে তাঁর আচ্ছন্ন-ভাবটা কেটে গেল। রকেট সর্বদা সজাগ প্রহরী। রকেটের সঙ্গে তাঁরও ভাব হয়ে গিয়েছিল। তিনি ডাকলেন, রকেট, রকেট, কাম হিয়ার। রকেট তবু ডাকতে লাগল। চেনা-লোককেও এ রকম সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে সে সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

কপাট খুলে ডাক্তার মুখার্জি বেরিয়ে এলেন, "কে, কে, ওখানে···"

"আমি।"

এগিয়ে এলেন গণেশ হালদার।

"ও, আসুন।"

"এখুনি আপনার লেখাটা পড়লাম। বুলি কই?"

"আসুন, ভিতরে আসুন, সে জেগেই আছে।"

গণেশ হালদার অনুভব করলেন, তাঁর পা দুটো থরথর করে কাঁপছে।

বুলি বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়েছিল।

গণেশ হালদার ঘরে ঢুকতেই সে 'দাদা' বলে প্রণাম করবার জন্য ঝুঁকল, কিন্তু হ'য়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

॥ ৩৯ ॥

সন্ধ্যার পর ঝিনুক দুটো নূতন বড় স্যুটকেস নিয়ে ঢুকল।

ডাক্তার ঘোষাল সবিস্ময়ে বললেন, "হঠাৎ দুটো স্যুটকেস কিনলে যে ?"

"এই দুটোতেই আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাব।"

"কোথায় যাবে ?"

"বিলেত। বাঃ সব ভুলে গেলেন। প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে।"

"আমি যাব না।"

"আপনাকে যেতেই হবে। আমার একটা অনুরোধ আপনি রাখবেন না ?"

"এ অনুরোধ রাখা যাবে না। আমি জীবনে টো টো করে অনেক ঘুরেছি। আর ঘোরবার ইচ্ছে নেই। ইউলিসিস্ শেষকালে বাড়ি ফিরে এসেছিল। I too want to settle down, আমিও শান্তিতে থাকতে চাই কোথাও।"

"বিলেতেই ঘর বাঁধব আমরা।"

"না, বিদেশে যেতে চাই না।"

"একবার ঘুরে বেড়িয়ে আসতে ক্ষতি কি। ভাল না লাগে চলে আসবেন।"

ডাক্তার ঘোষাল কোন জবাব দিলেন না। ফস্ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলেন।

তারপর বললেন, "না, আর experiment করার সময় নেই।"

আবার সিগারেটে টান দিতে লাগলেন। ঝিনুক তখন এ-নিয়ে আর আলোচনা করা সমীচীন মনে করল না।

বলল, "আপনি কি রাত্রে কোথাও বেরুবেন ?"

"না।"

"তাহলে গাড়িটা নিয়ে বেরুব আমি একটু পরে।"

"কোথা যাবে ?"

"পরে বলব, জরুরী দরকার আছে একটা।"

ঝিনুক মাঝে মাঝে এরকম বেরিয়ে যায়। ডাক্তার ঘোষাল পছন্দ করেন না এটা। কিন্তু আজকাল এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও সাহস হয় না তাঁর। তিনি জানেন প্রতিবাদ করলে ফল হবে না, ঝিনুক নিজের পথে নিজের মতে চলবেই। সুতো বেশী টেনে ধরলে সুতো ছিঁড়ে মাছ পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অভিজ্ঞ মৎস্য-শিকারীর মতো তাই তিনি আজকাল সুতোটা ঢিলে করে দেন যখনই দরকার হয়।

সেদিন রাত্রে ঝিনুক মাখানিয়ার মাঠে গিয়েছিল তার পোঁতা টাকা তুলে আনতে। দুটো বড বড ফাঁক-মুখো শিশির মধ্যে টাকাগুলো পুরে শিল করে সে দুটো একটা চিহ্নিত জায়গায় পুঁতে রেখে এসেছিল। সবসুদ্ধ কুড়ি হাজার টাকা ছিল। হাজার টাকার কুডিখানা নোট। আগে ন'হাজার ছিল, পরে গণেশ হালদারের কাছ থেকে যে এগারো হাজার টাকা এনেছিল সেটাও এখানে রেখে গিয়েছিল। টাকা নিয়ে কি করবে তার হিসাবও ঠিক করে ফেলেছিল সে। পাঁচ হাজার টাকা যতীশবাবুকে দেবে, আর পাঁচ হাজার টাকা কাউকে। কাউ সম্বন্ধে একটা দুর্বলতা তার বরাবরই ছিল। সে যে ডাক্তার ঘোষালের ছেলে, স্থাবর ডাক্তার ঘোষালের সমস্ত সম্পত্তির এবং মনোযোগের সে-ই যে একমাত্র উত্তরাধিকারী এ কথাটা ঝিনুক একদিনও ভোলেনি। তাই সে কাউকে বরাবরই পুত্রবৎ স্নেহ করত। ডাক্তার ঘোষাল তাকে তাডিয়ে দিয়ে যে অন্যায় করেছেন, এটা সে ডাক্তার ঘোষালকে বরাবরই বলেছিল। বলেছিল তাকে খুঁজে-পেতে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু ডাক্তার ঘোষাল একরোখা লোক, একবার বেঁকে বসলে সোজা করা শক্ত। ঝিনুক তবু মনে মনে আশা করেছিল শেষ পর্যন্ত তাঁকে সোজা করবে। কিন্তু কাউয়ের কোন ঠিকানা সে খুঁজে পাচ্ছিল না। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ বিলেত যাওয়ার সুযোগ এসে গেল। কাউকে খুঁজে নিয়ে আসার প্রশ্ন আর রইল না। এখন সে ঠিক করেছে যাবার আগে কাউকে যতটা পারে নগদ টাকাই দিয়ে যাবে আর বিলেত গিয়ে যদি সুবিধা করতে পারে তো কাউকেও নিয়ে যাবে সেখানে। মনে মনে ঠিক করল কাউকে খুঁজে বার করতে হবে যেমন করে হোক। হরসুন্দর কি খুঁজে আনতে পারবে তাকে?

ঝিনুক জানত না যতীশবাবু কাউয়ের ঠিকানায় যাতায়াত করেন। কথায় কথায় সেদিন রাত্রেই কিন্তু কথাটা বেরিয়ে পড়ল।

ঝিনুক প্রথমেই ফিরল ডাক্তার ঘোষালের বাসায়। সেখানে গিয়ে শুনল ডাক্তার ঘোষাল পাশের বাড়িতে তাস খেলতে গেছেন। ডাক্তার ঘোষালের বাসায় তাসের আড্ডা ভেঙে যাবার পর থেকে তিনি প্রায়ই পাশের বাড়িতে তাস খেলতে যান। পাশের বাড়িটি একটি মেস। নানারকম লোক থাকে সেখানে।

ঝিনুক টাকাগুলি বার করে লুকিয়ে রেখে দিলে আলমারির মধ্যে। তারপর বাড়ি গেল। যতীশবাবু জেগে বসেছিলেন। ঝিনুককে দেখেই তিনি বললেন, "দেশে ফিরবার সরকারী অনুমতি আজ এসে গেছে। টাকার যোগাড করেছ? টাকা না পেলে কিন্তু আমি কোথাও যাব না।"

"টাকার যোগাড় হয়ে গেছে। কাল তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব।"

"কাল?"

"হ্যাঁ, কারণ তারপরই আমাদের বিলেত যাওয়ার আয়োজন করতে হবে। এসময় কাউ থাকলে ভাল হ'ত। সে সব গুছিয়ে টুছিয়ে দিত। তাকেও কিছু টাকা দিয়ে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু কোথায় সে যে আছে—"

'তাকেও কিছু টাকা দিয়ে যাব'—এ-কথায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন যতীশ। কাউ তাঁকে বলেছিল, সে যদি কোথাও থেকে হঠাৎ কিছু টাকা পায় সে টাকাটা তাকেই দেবে।

"কাউ কোথা আছে আমি জানি। টাকাটা তুমি আমাকেই দিতে পার, আমি গিয়ে দিয়ে আসব।"

"না, আমি তার হাতেই টাকাটা দিতে চাই। ঠিকানাটা আমায় বলুন।"

"সে কি তুমি যেতে পারবে ? মনস্থরগঞ্জের এক জঘন্য বস্তির মধ্যে। রহমতুল্লা লেন দিয়ে ঢুকতে হয়।"

"আপনি একটা কাগজে এঁকে দিন—"

কাগজ পেন্সিল এগিয়ে দিলে ঝিনুক। নিরুপায় হয়ে যতীশবাবুকে রাস্তার ছকটা এঁকে দিতে হ'ল। কাউ তাঁকে তার ঠিকানা কারও কাছে প্রকাশ করতে বারণ করেছিল। যতীশবাবু কিন্তু ঝিনুকের কথা অমান্য করতে সাহস করলেন না।

এঁকে দিয়ে বললেন, "মনস্থরগঞ্জের বড় মসজিদটা পার হয়ে পশ্চিম দিকে মিনিট পনেরো হাঁটলেই ডান দিকে রহমতুল্লা লেন পাবে। লেনে নাম লেখা নেই। ভাঙ্গা একটা ডাস্টবিন আছে তার সামনে। ওখানে গিয়ে দু'একজনকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে কোন্‌টা রহমতুল্লা লেন। সেই লেনে ঢুকে কিছুদূর গেলেই কালুর চায়ের দোকান দেখতে পাবে।"

"আচ্ছা, সে আমি খুঁজে নেব'খন।"

"তুমি টাকাটা কখন দেবে তাকে ?"

"তুমি চলে যাওয়ার পর।"

যতীশবাবু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

॥ ৪০ ॥

গণেশ হালদার সেদিন বনস্পতি বিদ্যালয়ে স্কুলের পড়াশোনার পর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁর জীবনের সুর বদলে গিয়েছিল এবং তা আভাসিত হচ্ছিল তাঁর আচরণে, মুখমণ্ডলে এবং তেজোদ্দীপ্ত বক্তৃতায়।

তিনি বলছিলেন : আমরা যেন না মনে করি যে যেন-তেন প্রকারেণ ইংরেজকে দূর করে' আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। আমরা একথা যেন মুহূর্তের জন্য না ভাবি যে এখন আমাদের আর কিছু করবার নেই। একথাও আমরা যেন ভুলে না যাই যে এ স্বাধীনতা আমরা বুকের রক্ত দিয়ে অর্জন করিনি। নেতাজীর আই-এন-এ সৈন্য যখন এদেশে ফিরে এল, নৌবহরের জঙ্গী সৈন্যরা যখন বিদ্রোহ ক'রল, এখানকার সৈন্যদের মধ্যেও যখন বিদ্রোহের আভাস দেখা দিল তখন চতুর ইংরেজ বুঝল এদেশে আর তারা রাজত্ব করতে পারবে না ; যুদ্ধে তারা হীনবল হ'য়ে পড়েছিল, মিলিটারির জোরে এ-দেশ

শাসন করবার শক্তি আর তাদের ছিল না। তাই চতুর ইংরেজ দেশটাকে ভাগ করে', স্বদেশসেবী বাঙালীদের আর মিলিটারি পাঞ্জাবীদের সর্বনাশ করে' স্বাধীনতা নামক একটা ভুয়ো মাল আমাদের নেতাদের হাতে তুলে দিয়ে চলে গেল। ইংরেজ যায় নি, সে দেশে বসে আমাদের কাছে চড়া দামে জিনিস বেচে আগেকার মতোই আমাদের শোষণ করছে আর মজা দেখছে। ইংরেজ যখন এদেশে ছিল, তখন আমরা বরং কিছু স্বদেশী ছিলাম, ইংরেজ চলে যাওয়ার পর সে পাট একেবারে চুকিয়ে দিয়েছি। রাস্তার দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়। আগে এত সাহেবী-পোশাক-পরা লোক রাস্তাঘাটে দেখা যেত না। এখন সবাই আমরা সাহেব সেজেছি। এখনও আমরা বিদেশের দুয়ারে হাত পেতে আছি টাকার জন্যে, কলকব্জার জন্যে, জ্ঞানের জন্যে। আমরা স্বাধীন হয়েছি একথা বলবার সময় এখনও আসে নি। বরং আমাদের পরাধীনতা যেন আরও বেড়েছে মনে হয়। মনে হয়, আমাদের ভবিষ্যৎও যেন ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। কারণ যে-শিক্ষা পেলে আমাদের বুদ্ধি ও মনুষ্যত্ব সংগঠিত হবে, সে-রকম শিক্ষা আমরা পাচ্ছি না। বাইরে যা দেখছি বা শুনছি তা লোক-দেখান আড়ম্বর মাত্র। দেশে আর মানুষ তৈরি হচ্ছে না। স্বাধীন ভারতের বলিষ্ঠ নাগরিক হ'তে হ'লে চরিত্রে যে-সব গুণাবলী থাকা দরকার সে-সব গুণাবলী অর্জন করবার সুযোগ আমাদের ছেলেমেয়েদের নেই। অনেক পয়সা খরচ করে' তারা যে ডিগ্রী পাচ্ছে তা' একেবারে মূল্যহীন, কারণ ডিগ্রীর পিছনে যে বিদ্যা থাকলে তা সার্থক হয়, সে বিদ্যা তাদের নেই। মিথ্যা মুখোশ-পরা কতকগুলো গণ্ডমূর্খ তৈরি হচ্ছে কেবল। আমরা ক্রমশ ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছি। ইংরেজ আমলের পূজনীয় নেতারা, স্বামী বিবেকানন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, সকলেই ব'লে গেছেন মানুষ হওয়াই সবচেয়ে আগে দরকার। আত্মসম্মান-ভূষিত শিক্ষিত ধার্মিক মানুষ চাই। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধতঃ, এ বাণীর মর্ম আমাদের এবার বুঝতে হবে। মিথ্যা স্বাধীনতার মোহে মুগ্ধ থেকে আসল জিনিস আমরা হারিয়ে ফেলছি। আজকাল অবশ্য অনেকের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিকতার ভড়ং দেখা যায়। কুকুর-পোষার মতো গুরু-পোষাও অনেক বড়লোকদের আজকাল ফ্যাশন হয়েছে। কিন্তু সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশুত্বকে ঢেকে রাখবার মুখোশ মাত্র। আমাদের সত্যবাদী হ'তে হবে, নির্ভীক হ'তে হবে, সৎকর্মে সোৎসাহে এগিয়ে যেতে হবে, তা'হলেই ভগবানকে পাওয়া যাবে। এইগুলিই আধ্যাত্মিকতালাভের প্রথম সোপান। আমরা এখানে যারা সমবেত হয়েছি, আমরা যদি আজ থেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই যে, মিথ্যা কথা বলব না, কোনও অলীক ভয়ে ভীত হব না, অলস জীবন যাপন করব না, তা'হলেই দেখবে আমাদের চারপাশে একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হচ্ছে। সেই বিদ্যুৎ কালক্রমে জ্যোতির্ময়লোকে নিয়ে যাবে আমাদের। যে আধ্যাত্মিকতা মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য, সেই আধ্যাত্মিকতার প্রধান অবলম্বন সত্য,—মিথ্যা নয়, অকপটতা—ভণ্ডামি নয়। আমরা যে-জীবন যাপন করছি তা পশু-জীবনের চেয়েও খারাপ। পশুরা অন্তত নিজেদের চেষ্টায় আহার সংগ্রহ করে, জীবনধারণের অনিবার্য আবেগে জীবনটা অন্তত ভোগ

করে। আমরা কি তা-ও পারি? আমরা অলস, নির্বীর্য, পরমুখাপেক্ষী, তামসিকতার জড়পিণ্ড মাত্র। এই তামসিকতার কবল থেকে উদ্ধার পাও আগে। জীবনকে ভোগ করতে শেখ, রাজসিক হও, আধ্যাত্মিকতার কথা তার পর ভেবো। স্বামী বিবেকানন্দ এই কথাই বার বার বলে গেছেন। বরফ গলে আগে জল হয়, তারপর তা বাষ্প হ'য়ে আকাশে যাওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। আমরা এখন বরফ হ'য়ে আছি, তামসিকতার জড় বরফ। কিন্তু আমাদের জাগতে হবে। এত বড একটা জাত তামসিকতার অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে না। আমরা সত্য কথা বলব, আমরা ভয় পাব না, আমরা কাজ করব—এই তিনটেই আমাদের মূলমন্ত্র হোক। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এই আশ্বাসে অলস হ'য়ে বসে থাকলে চলবে না। আমাদের মনে রাখতে হ'বে আমরা আজও পরমুখাপেক্ষী ভিক্ষুক, আমাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই। আমরা কতকগুলো লুণ্ঠনকারী ব্যবসায়ীর হাতে ক্রীড়নক মাত্র, তারা আমাদের লুটছে, শুষছে। ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে যে ধরনের শোষণ আর অত্যাচারের কথা আমরা ইতিহাসে পড়েছি, তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে আবার। নূতন ধরনের ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এসে গেছে আবার দেশে। এখন আমাদের কর্তব্য কি? আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতেই হবে—এ কলঙ্ক আমরা মোচন ক'রব। তা করতে হ'লে আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হ'বে আমরা চরিত্রবান হ'ব, সত্য কথা ব'লব, ভীরু হ'ব না, কাজ ক'রব, যা হাতের কাছে পাব তাই ক'রব।"

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলল, "কাজ তো আমরা করতে চাই মাস্টার-মশাই। কিন্তু কাজ পাই কোথায়?"

"কাজ সর্বত্র আছে। কুলির কাজ কর, মজুরের কাজ—"

"তাও মেলে না সব সময়। যে কাজ করতে পারি সে কাজ পাই না। সে কাজের কোনও ব্যবস্থা নেই, সুযোগ নেই—"

"তা'হলেই চুপ করে বসে থাকবে? তোমরা কি পাথর? কিছু না পাও তো বিদ্রোহ কর, সেটাও একটা কাজ, কিন্তু তা করতে হ'লে যে চরিত্রবল দরকার তা কি তোমাদের আছে?"

গণেশ হালদার দেখতে পান নি, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে একজন পুলিস অফিসার সাধারণ পোশাকে বসে ছিলেন। তিনি উঠে এসে বললেন, "মাস্টারমশাই, এ বক্তৃতা আপনাকে আমি দিতে দেব না। আপনি আমার সঙ্গে থানায় চলুন।"

"থানায়?"

গণেশ হালদার যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

"হ্যাঁ, আপনি জনতাকে অকারণে ক্ষেপিয়ে তুলছেন। এরকম আরও রিপোর্ট আমাদের কাছে আগে এসেছে, তাই আজ আমি নিজে এসেছিলাম। স্বকর্ণে শুনলাম আপনি এদের বিদ্রোহ করতে বলছেন। আমি এখানকার থানার অফিসার-ইন-চার্জ। আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করলাম। চলুন আমার সঙ্গে।"

ক্ষুব্ধ জনতা হৈ হৈ করে উঠল। সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল গণেশ হালদারকে।

দু'চারজন যুবক এগিয়ে এসে বলল, "ওঁকে থানায় নিয়ে যেতে দেব না। ছেড়ে দিন ওকে—" মারপিট হবার উপক্রম।

গণেশ হালদার তখন বললেন, "তোমরা স্থির হও। এরকম বে-আইনী কাজ করতে যেও না। আমি এঁর সঙ্গে থানায় যাচ্ছি। আমাদের স্বাধীন দেশের গণতন্ত্রে স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার দেওয়া আছে। দেখা যাক্ সে অধিকার মেকি না সত্য।"

গণেশ হালদার পুলিস অফিসারের সঙ্গে থানায় চলে গেলেন।

॥ ৪১ ॥

যতীশবাবুকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ঝিনুক ভেবেছিল কাউয়ের খোঁজে বেরুবে। কিন্তু বাড়ি ফিরেই সে তনিমার একটা টেলিগ্রাম পেল যে সে কলকাতায় এসেছে, ঝিনুকও যেন অবিলম্বে কলকাতায় চলে আসে। সুতরাং কাউকে খুঁজে বার করবার আর অবসর সে পেল না সেদিন।

ডাক্তার ঘোষালকে গিয়ে বলল, "আমি আজ কলকাতা যাচ্ছি।"

"কলকাতা! কেন?"

"একটু দরকার আছে।"

তনিমা এসেছে এ কথাটা ইচ্ছা করেই চেপে গেল সে। কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে মিস্টার সেন যদি এ নিয়ে কিছু গোলমাল করেন, এই ভয়ে তনিমার আসার সংবাদটা সে গোপন করাই শ্রেয়ঃ মনে করল।

"দরকার? কিসের দরকার?"

"কিছু জিনিসপত্র কিনব। আমার ভালো গরম জামা নেই। আপনার জন্যেও অন্তত গোটা চারেক ভাল স্যুট করান দরকার। এখানে ভালো হবে না।"

"আমি বিলেত যাব না।"

"কি যে এক কথা বলেন বার বার। প্লেনে সীট বুক করা হয়ে গেছে। ভাল না লাগে, ফিরে আসবেন।"

ডাক্তার ঘোষাল মুখ গোঁজ করে' চেয়ে রইলেন ঝিনুকের দিকে খানিকক্ষণ। তাঁর চোখের দৃষ্টি দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুতে লাগল। তারপর হঠাৎ তিনি চীৎকার করে উঠলেন—"আমাকে কি মনে করেছ তুমি—What do you take me for? আমি কি তোমার হাতের পুতুল? Am I puppet in your hands? I am not."

Not কথাটির উপর জোর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ঝিনুক মুচকি হেসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সেইদিনই সন্ধ্যের ট্রেনে কলকাতায় চলে গেল ঝিনুক। তনিমার সঙ্গে দেখা হতেই তাকে জড়িয়ে ধরল সে। সত্যিকার আবেগভরে জড়িয়ে ধরল। ঝিনুক দেখল তনিমা আরও রূপসী হয়েছে। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে রূপের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন।

"অমন করে কি দেখছ ঝিনুক-দি!"

"তোমাকে। এক সঙ্গে এত রূপ আগে কখনও দেখি নি।"

"এই রূপই আমাকে নরকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, আবার এই রূপই আমাকে স্বর্গে নিয়ে এসেছে। বাবার খবর শুনেছ?"

"না। আসবার আগে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখলাম তাঁর ঘর বন্ধ। চাকরটা বললে ছুটিতে গেছেন।"

"তাঁর চাকরি গেছে। তাঁর নামে এত রকম কমপ্লেন এসেছিল যে গভর্নমেণ্ট তাঁকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি আছেন এখন তাঁর গুরুর কাছে হরিদ্বারে। আমি তাঁকে চিঠি লিখেছি যে মাসে মাসে তাঁকে দু'শ টাকা করে দেব। চিঠিতে ঠিকানা দিয়েছি লণ্ডনের। সেখানে ফিরে গিয়ে উত্তর পাব আশা করি।"

"তুমি এখানে এসেছ কেন?"

"মজা করতে। তোমাকে যে পার্টির কথা লিখেছিলাম সেই পার্টি দেব এখানে আজ। একটা বড় হোটেলে এলাহি ব্যবস্থা হচ্ছে।"

"তোমার স্বামী কই?"

"তিনি এসেই বম্বে চলে গেছেন। কাল আমাকেও ফিরে যেতে হবে। তুমি কবে যাবে?"

"এ মাসের শেষে। প্লেনে সীট বুক করা হয়েছে।"

"তখন আমরা বোধহয় লণ্ডনেই থাকব। আজ পার্টিতে এস কিন্তু। এই নাও কার্ড।"

"কি উপলক্ষে পার্টি?"

"উপলক্ষ অবশ্য আমাদের বিয়ে। কিন্তু ওটা বাইরের উপলক্ষ, সেইজন্য উনি এখানে রইলেননা। কারণ, আমারই খেয়ালে পার্টি দেওয়া হচ্ছে, আমিই পার্টির প্রোগ্রাম ঠিক করেছি। এসো তুমি।"

"কি হবে পার্টিতে?"

"নাচ গান, খানা পিনা। হোমরা-চোমরা লোক সব আসবে। আমার স্বামীর নামে নিমন্ত্রণ-পত্র গেছে, না এসে কেউ পারবে না। ওই নামটা নাকে দড়ি দিয়ে টেনে আনবে সবাইকে। এঁরা মুখে যদিও বলেন জনতাই গভর্নমেণ্ট চালাচ্ছে, কিন্তু মনে মনে জানেন গভর্নমেণ্ট চালাচ্ছে এদেশের এবং বিদেশের ধনকুবেররা। সুতরাং কোনও ধনকুবের 'তু' করে ডাকলেই ছুটে আসবে সবাই। তুমি এস, মজা দেখতে পাবে।"

যে বিখ্যাত হোটেলে পার্টিটা হয়েছিল এবং যাঁরা যাঁরা সেই পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন তাঁদের পরিচয় ইচ্ছে করেই গোপন রাখলাম। গোপন রাখাই সমীচীন।

খবরের কাগজের পাতায়, সভায়, জলসায় এঁদের নাম প্রায়ই চোখে পড়ে আপনাদের। বাজারে এঁরা বিদগ্ধ-সমাজের অলঙ্কাররূপে গণ্য। সুতরাং এঁদের নাম প্রকাশ করে এঁদের খেলো করবার ইচ্ছে নেই।

যা হয়েছিল তা সংক্ষেপে বলছি।

সাধারণ খাবার তো ছিলই নানারকমের, কিন্তু মদ এবং মাংসের আয়োজন হয়েছিল প্রচুর। রাঁধা মাংস ছাড়া, কাঁচা মাংসও ছিল। এত বিভিন্ন রকমের নারী-সমাবেশ এবং এতরকম উলঙ্গ-ধর্মী নারীসজ্জার রঙীন প্রদর্শনী সাধারণতঃ দেখা যায় না। বহুমূল্য মদ এসেছিল বহু প্রকারের এবং তা পরিবেশিত হচ্ছিল দরাজ দাক্ষিণ্যে। সুতরাং একটু পরেই মাতাল হয়ে পড়লেন সবাই।

তনিমা এবং ঝিনুকই কিছু খায়নি। মদ তো নয়ই, খাবার পর্যন্ত নয়।

সবাই যখন খুব মাতাল হয়ে টলছে তখন তনিমা টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে বলল, "আমার ইচ্ছে এবার নাচ হোক। আমি আপনাদের জন্য ভালো মুখোশ আনিয়েছি, তাই পরে' আপনারা নাচুন এই আমার অনুরোধ। একজন পুরুষের সঙ্গে একজন মেয়ে নাচবে। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।"

টেবিল থেকে নেমে একগাদা মুখোশ নিয়ে এলো। ভালুকের মুখোশ। প্রত্যেক পুরুষের মুখে তাই পরিয়ে দিলে। বাঁদরের মুখোশও ছিল, সেগুলো পরিয়ে দিলে মেয়েদের মুখে। মুখোশ পরে সবাই কৃতার্থ হয়ে গেল যেন। মুখোশ পরার জন্যে সে কি হুড়োহুড়ি। একটু পরেই মাতাল বাঁদরদের গলা জড়িয়ে মাতাল ভালুকদের নাচ শুরু হ'ল।

তনিমা আবার পাশের ঘরে চলে গেল। বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড একটা চাবুক নিয়ে। সার্কসে রিং মাস্টারদের হাতে যেমন চাবুক থাকে তেমনি চাবুক। তনিমা সেই চাবুকে চটাং করে একটা শব্দ করে কলকণ্ঠে বলে উঠল—Go on darlings, don't stop (বন্ধুরা থেমো না চালিয়ে যাও)।

অবর্ণনীয় এই নাচ চলল খানিকক্ষণ ধরে। তারপর সবাই শুয়ে পড়ল। বমি করতে লাগল কেউ কেউ। ঝিনুক 'হলে' ঢোকে নি। সে উপরের ঘরের একটা জানালা দিয়ে সব দেখছিল। হঠাৎ একটা উচ্চ তীক্ষ্ণ হাসি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল বিরাট 'হলে'। ঝিনুক উঁকি দিয়ে দেখল তনিমা কোমরে হাত দিয়ে হাসছে। তার মনে হ'ল হাসির বেগে একটা তলোয়ার কাঁপছে যেন।

॥ ৪২ ॥

গণেশ হালদারকে পুলিস আটকাতে পারে নি বেশিক্ষণ। সুঠাম মুকুজ্যে খবর পেয়েই চলে গিয়েছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেকালের উচ্চশিক্ষিত আই. সি. এস.। তিনি সব শুনে গণেশ হালদারকে ছেড়ে দিলেন। শুধু

তাই নয়, তিনি পুলিস অফিসারটিকে ডেকে বললেন, স্বাধীন ভারতে বক্তৃতা দেওয়া অপরাধ নয়। সে অধিকার সকলেরই আছে। গণেশবাবুর বক্তৃতার যে সব সারাংশ আপনারা আমার কাছে দাখিল করেছেন তাতে এমন কিছুই দেখলাম না যার জন্যে ওঁকে শাস্তি দেওয়া যায়। উনি গভর্নমেণ্টের সমালোচনা করেছেন. সমালোচনা করবার অধিকার প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিকেরই আছে. আর উনি যা বলেছেন তা নিতান্ত শূন্য-গর্ভ কথা নয়। সুতরাং ওঁকে ছেড়ে দেওয়া হোক। ওঁর বক্তৃতা শুনে কোথাও যদি বিশৃঙ্খলা বা বে-আইনী হট্টগোল হয় তাহলেই পুলিস তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তা যখন হয়নি তখন পুলিসের হস্তক্ষেপ অনাবশ্যক।

গণেশ হালদার কিন্তু আর একটা সমস্যায় পড়েছিলেন, যার সমাধান ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বা সুঠামবাবু দ্বারা সম্ভব ছিল না। তিনি যেদিন আবিষ্কার করেছিলেন যে সুঠামবাবু তাঁর বোনকে বিয়ে করেছে এবং বুলি এই বাড়িতেই আছে, সেদিন তিনি যতটা উল্লসিত হয়েছিলেন, বুলির কাছে যে আবেগে ছুটে এসেছিলেন. তা যেন অনেকটা কমে গেছে। তাঁর মাঝে মাঝে এ কথাও মনে হয়েছে বুলিকে এভাবে ফিরে না পেলেই যেন ভাল হ'ত। এ বুলি যেন সে বুলি নয়। হাঁসিখুশিতে যার সর্বাঙ্গ ঝলমল করত সে এখন বিষাদের প্রতিমা। জীবন্ত মাছরাঙার মৃত্যু হয়েছে, তার জায়গায় বসে আছে একটা শোলার প্রাণহীন পাখি। এই যে শোচনীয় রূপান্তর, রাজনৈতিক দাবাখেলার এই যে বীভৎস পরিণতি, এর কি কোন চারা আছে? নেহরুর বক্তৃতাবলী পড়লে কি এ দুঃখের উপশম হবে? কোন বিধানসভায়, কোন লোকসভায়, কোন বিচারশালায় আবেদন করে কি এর প্রতিকার হবে? কে ফিরিয়ে দেবে সেই বুলিকে?

গণেশ হালদার আজকাল বুলির কাছে খানিকটা সময় রোজ কাটান। ছেলেবেলার সব গল্প করে' তাকে প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বুলির প্রফুল্লতা ফিরে আসে না। তার মুখটা যেন মুখোশের মতো হয়ে গেছে। তাতে ভাবের কোন তরঙ্গ ওঠে না। গণেশ হালদার নানারকম বই থেকে নানারকম গল্প পড়ে শোনান তাকে মাঝে মাঝে। তিনি যতক্ষণ পড়েন বুলি চুপ করে' বসে থাকে। তার পর একটু ফাঁক পেলেই উঠে চলে যায়, ঠাকুরঘরে গিয়ে খিল দেয়। কথা প্রায় বলেই না। প্রশ্ন করলে 'হাঁ' কিংবা 'না' বলে। এ যেন সে বুলি নয়. এ যেন অন্য লোক। কোন অদৃশ্য দৈত্য যেন এর ভিতরকার প্রাণরস শুষে নিয়েছে। বাইরে পড়ে আছে ছিবড়েটা। এই প্রাণহীন বুলিকে নিয়ে কি করা যাবে, এই সমস্যার সমাধান কে করবে? গণেশ হালদারও ক্রমশ যেন বিমর্ষ হয়ে পড়ছিলেন।

সুঠাম মুকুজ্যে বাড়িতে ছিলেন না। গত রাত্রে বুড়ো জাম্বু কুকুরটা মারা গিয়েছিল। তিনি তাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়েছিলেন। যখন ফিরলেন তখন বেলা একটা। মুখে কোনও বিষাদ বা শোকের চিহ্ন নেই। হাসিমুখে গণেশ হালদারকে বললেন, "জাম্বুকে

মা গঙ্গার কোলে দিয়ে এলাম। বাঁচল বেচারা। ইদানীং বড়ই কষ্ট পাচ্ছিল। আজ তো আপনার ছুটি? চলুন তা'হলে দোরাবগঞ্জে যাওয়া যাক। সেখানে একটা নূতন ধরনের কৃষ্ণচূড়া গাছ আছে জমিদারদের বাগানে। খবর পেলাম তাতে ফুল ধরেছে। অপূর্ব ফুল। সাদা আর গোলাপী মেশানো। মনে হয় এক ঝাঁক পরী নেবেছে। আর একটা জিনিসও দেখাব। লজ্জাবতী লতা। দেখেছেন কখনও? ওখানে প্রচুর আছে। আর আছে কেষ্ট পাগলা। তাকে বললেই সে নাচ দেখায়। অদ্ভুত নাচ। আপনার বোনকেও রাজী করুন না, কেষ্টর নাচ তার ভালই লাগবে।"

স্যুঠাম ডাক্তার বালকের মতো উৎসাহে কেষ্ট পাগলার নাচের বর্ণনা করতে লাগলেন। সে তো হাত পা দিয়ে নাচেই, মাথা দিয়েও নাচতে পারে!

।

একটু পরে দোরাবগঞ্জের বাগানে গিয়ে হাজির হলেন তাঁরা। বুলিও সঙ্গে ছিল। গণেশ হালদার লক্ষ্য করছিলেন সে যেন ঠিক সুরে সুর মেলাতে পারছে না। কেমন যেন সশঙ্কিত হ'য়ে আছে। স্যুঠাম মুকুজ্যে কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। এক অদৃশ্য আনন্দের হিল্লোল যেন চঞ্চল করে তুলছিল তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে। সেই অভিনব কৃষ্ণচূড়ার ডাল নুইয়ে নুইয়ে দেখাতে লাগলেন ফুলগুলো। সাদার সঙ্গে গোলাপী যে কি অপরূপ হয়ে মিশেছে তা দেখিয়ে বললেন, "গোলাপী গোলাপীই আছে, সাদাও সাদা আছে। কেউ কারও স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে নি, তবু দুজনে মিলে কি চমৎকার শোভার সৃষ্টি করেছে, না? সমাজেও আমাদের ওইটেই বোধহয় আদর্শ হওয়া উচিত। কেউ রং বদলাতে পারে না, কিন্তু ভদ্রভাবে পাশাপাশি থাকতে পারে। কি বল?"

বুলির দিকে সহসা দৃষ্টি মেলে চাইলেন তিনি। বুলি সসঙ্কোচে একটু হাসল শুধু।

ঠিক সেই সময় একটা সুরের পিচ্‌কিরি যেন ছুঁড়ে দিলে কে পাশের একটা ঝোপ থেকে।

"কে বলুন তো?"

ডাক্তার মুখার্জি হেসে জিগ্যেস করলেন গণেশ হালদারকে।

"আমি ঠিক বলতে পারছি না।"

বুলি একধারে ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি হেসে বললে, "টুনটুনি—"

গণেশ হালদার বললেন, "ও অনেক পাখি চেনে। ছেলেবেলায় বাগানে বাগানে ঘুরত যে।"

"তাই না কি!"

আরও উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন ডাক্তার মুখার্জি। "ওটা কি বল তো?"

"ছাতারে।"

"ওই তারের উপর!"

"নীলকণ্ঠ।"

"বাঃ! বল তোমাকে আরও পাখি চিনিয়ে দেব। বাঁশপাতি চেন? দোয়েল? কুলো পাখি?"

ডাক্তার মুখার্জি সত্যিই শিশুর মতো প্রগল্‌ভ হয়ে উঠলেন।

একটু পরেই কিন্তু বুলির মুখে আবার সেই মুখোশ নেবে এল। আবার গম্ভীর হ'য়ে গেল সে। মানুষটা বদলে গেল যেন।

তারপর স্থঠাম মুকুজ্যে গেলেন লজ্জাবতী লতার খোঁজে। একটু দূরে একটা মাঠে দু'চারটে লজ্জাবতী খুঁজেও বার করলেন। তাদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখালেন কেমন ছোঁওয়া মাত্র পাতাগুলো মুড়ে মুড়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলেন এ-দেখে বুলি হয়তো কৌতুক বোধ করবে। হয়তো সে-ও ছুঁয়ে দেখবে পাতাগুলো। কিন্তু সে কিছুই করল না. সে যেন আরও গম্ভীর হয়ে পড়তে লাগল।

কেষ্ট পাগলার নাচও দেখা হ'ল। সত্যিই নানারকম নাচ দেখাল সে। শীর্ষাসন করে লাট্টুর মতো ঘুরতে লাগল। নাচের শেষে বগল বাজিয়ে গানও ধরল। সে গানের ধুয়া: এই দুনিয়ার মরণ বাঁচন, জানি না ভাই কাহার নাচন, নেচে গেয়ে আমি দাদা সেই কথাটাই বুঝতে চাই। তোমরা কেন হাসছ ভাই!

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছিল।

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "চল, ওই উঁচু টিলাটায় গিয়ে বসা যাক। ওখানে অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ দেখা যায়।"

পশ্চিম আকাশে মেঘ ছিল না। দেখা গেল সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডল অস্ত যাচ্ছে। ডাক্তার মুখার্জি বশিষ্ঠ নক্ষত্রটাকে দেখিয়ে বললেন, "সপ্তর্ষির ল্যাজের ওই মাঝের নক্ষত্রটার নাম বশিষ্ঠ, আর তার ঠিক পাশেই দেখ ছোট্ট অরুন্ধতী। ওই যে খুব ছোট্ট, টিপ টিপ করছে, ঠিক বশিষ্ঠের পাশেই—"

তারপর একটু হেসে বললেন, "আমাদের অবশ্য মনে হচ্ছে বটে ঠিক পাশে, কিন্তু আসলে ওদের মধ্যে ব্যবধান অনেক।"

এব পরই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। বুলি হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

"কি হ'ল হঠাৎ!"

ডাক্তার মুখার্জি ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু বুলি কোন উত্তর দিল না। হালদারমশাই অনেক জিজ্ঞাসা করবার পর সে অশ্রুসজল কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, "আমি উচ্ছিষ্ট, আমি উচ্ছিষ্ট, আমি দেবতার ভোগে স্থান পাবার যোগ্য নই। আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা, দূর করে দাও, আমি আর পাচ্ছি না।"

এ কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন স্থঠাম মুকুজ্যে।

"আমরা কেউ দেবতা নই। সবাই মানুষ। আর মানুষ কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না। কোনও জীবন্ত জিনিসই হয় না। প্রকৃতির স্পর্শে আমরা নিত্য-নূতন হই। যে বিরাট

স্রোতে আমরা ভাসছি তাতে কোথাও কোন ময়লা জমতে পায় না। ও-সব কথা ভাবছ কেন! ছি, ছি, তুমি কখনও উচ্ছিষ্ট হতে পার?"

গণেশ হালদার যদিও পাশে বসেছিলেন তবু তিনি স-স্নেহে বাঁ-হাত দিয়ে বুলিকে জড়িয়ে ধরলেন। বুলি তাঁর কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

॥ ৪৩ ॥

ঝিনুক জিনিসপত্র গুছিয়ে বসে ছিল। আজ রাত্রের ট্রেনেই তাদের কলকাতা যাওয়ার কথা। তারপর সেখান থেকে প্লেন ধরবে। ডাক্তার ঘোষাল কিন্তু সমানে 'না' বলে যাচ্ছেন। তবু ঝিনুক আশা করে' আছে শেষ মুহূর্তে হয়তো রাজী হ'য়ে যাবেন। ট্রেন রাত বারোটার পর। সকালে দশটার সময়ই তিনি একটা দূরের কলে বেরিয়ে গেছেন। বলে গেছেন সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরবেন। ঝিনুক ভাবল এই সুযোগে কাউয়ের খোঁজটা নেওয়া যাক। তাকে টাকাটা দিতে হবে। এতদিন এত বিবিধ গোলমালের মধ্যে ছিল সে, যে কাউয়ের খোঁজ নিতে পারে নি।

বেরিয়ে পড়ল ঝিনুক। অনেক খুঁজে খুঁজে অনেকক্ষণ পরে সে কাউয়ের ঠিকানাটা বার করল বটে, কিন্তু কাউয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল না। অন্য কোনও লোকেরও দেখা পেল না যে তার খবর বলতে পারে। সবাই তখন বেরিয়ে গেছে। সামনে দেখল একটা বড় ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সিতে কেউ নেই। দূরে একটা বারান্দায় এক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত বুড়ি বসে বসে চাল বাছছিল। মুখটা সিংহের মতো, চোখে ডাইনির দৃষ্টি। তার কাছে যেতে ভয় করে। তবু ঝিনুক গেল। সে বলল, "ট্যাক্সিটা রমেশের। রাত্রে সে ট্যাক্সি চালায়। কাউ বাজার করতে বেরিয়েছে, ফিরবে সন্ধ্যের পর। কালীপুজোর বাজার করতে গেছে। সে আজ কালীপুজো করবে এখানে!"

ঝিনুক তাকে বলে এল—'কাউ এলে তাকে বোলো তোমার মাসিমা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি আজ রাত্রের গাড়িতে কলকাতা চলে যাবেন। যদি সময় করতে পারে যেন সন্ধ্যার সময় আমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করে, একটা জরুরী দরকার আছে। আমার ঠিকনা সে জানে।'

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। ঘর-বার করছে ঝিনুক। ডাক্তার ঘোষাল তখনও ফেরেন নি। কাউও আসে নি। ঘড়িতে যখন আটটা বাজল তখন রীতিমত চঞ্চল হ'য়ে উঠল সে। ডাক্তার ঘোষাল রোহিণীপুর গেছেন। এখান থেকে ষোল মাইল। যেতে-আসতে দু'ঘন্টার বেশী লাগা উচিত নয়। মাঝে খানিকটা অসমতল জঙ্গলে রাস্তা আছে। সবসুদ্ধ তিন ঘণ্টাই লাগুক। রোগীর বাড়িতে একঘণ্টা। বেরিয়েছেন দশটার সময়, তিনটে নাগাদ তাঁর নিশ্চয় ফেরা উচিত ছিল। এত দেরি হবার মানে কি? কঠিন

রোগী ? রাত্রে সেখানে থেকে যাবেন না তো ! অনেক সময় কঠিন রোগী হ'লে থেকে যান তিনি রোগীর বাড়িতে। ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবল খানিকক্ষণ সে। তারপর তার আর একটা কথাও মনে হ'ল। রাস্তায় মোটর খারাপ হয়ে যায় নি তো। মোটরটা মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়। এক্সিডেন্ট হয় নি তো ? কাউও ত এখনও এল না। শহরের পূর্ব দিক দিয়ে যে রাস্তাটা মফস্বলের দিকে চলে গেছে সেইটেই রোহিণীপুর যাওয়ার রাস্তা, এইটুকু শুধু ঝিনুক জানে। কাউ এসে পড়লে সাইকেল করে' তাকে পাঠানো যেত সেখানে। কেউ আসছে না, কি আশ্চর্য ! খানিকক্ষণ ঘর-বার করে ঝিনুক শেষে ঠিক করে ফেলল ন'টার মধ্যে কাউ যদি না এসে পড়ে তাহলে নিজেই সে বেরিয়ে পড়বে। ততক্ষণ কি করা যায় ? গ্রামোফোনটা পেড়ে রেকর্ড বাজাতে লাগল। ন'টা বেজে গেল। একটা মোটরের শব্দ শোনা যাচ্ছে, না ? উৎকর্ণ হয়ে রইল। বেরিয়ে চলে গেল মোটরটা। কাউও এল না। আসবে না বোধহয়। উঠে পড়ল ঝিনুক। একটা কথা তার মনে পড়ল। কাউয়ের বাড়ির কাছে সে একটা ট্যাক্সি দেখেছিল। কাউকে নিয়ে সেই ট্যাক্সিটা ভাড়া ক'রে ডাক্তার ঘোষালের খোঁজে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয় ? এ ছাড়া তো অন্য কোন উপায় নেই। ট্যাক্সিটা পাওয়া যাবে কি ? না পাওয়া গেলেই মুশকিল। এই মফস্বল শহরে ট্যাক্সি বেশী নেই, যা দু'একটা আছে তা প্রায়ই পাওয়া যায় না। ওই ট্যাক্সিটা যদি পাওয়া যায়। তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল ঝিনুক। কাউ যে বস্তিতে থাকে তা-ও কাছে নয়। হেঁটে গেলে এক ঘণ্টার উপর লাগবে। ঝিনুক রিক্‌শা খুঁজতে লাগল। অনেক রিক্‌শাওলাই রাত্রে ও-অঞ্চলে যেতে রাজী হ'ল না। বলল, ও পাড়ায় এত রাত্রে যাওয়া নিরাপদ নয়। অনেকক্ষণ পরে একটা রিক্‌শাওলাকে পয়সার লোভ দেখাতে রাজী হ'ল সে। তাতেই চড়ে বসল ঝিনুক। রিক্‌শায় চড়ল বটে, কিন্তু রিকশাটা ভাল নয়, কিছুদূর গিয়েই থামে, চাকাটা মেরামত করে নিয়ে আবার এগোয়। অনেকক্ষণ পরে অনেক দেরিতে সেটা অবশেষে পৌঁছাল কাউয়ের বস্তির কাছে। রিক্‌শাওলা আর যেতে চাইলো না, বলল, ও বস্তিতে আমি ঢুকব না মাইজি। তার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে হেঁটেই গেল ঝিনুক। তার মনে হ'ল যদি ট্যাক্সিটা না পাওয়া যায় তা' হলে আর যাওয়াই হবে না আজ। সুবেদার খাঁ অনর্থক দাঁড়িয়ে থাকবেন ডিসট্যাণ্ট সিগনালের কাছে। কাউ কি কিছু ব্যবস্থা করতে পারবে না ? কাউকে দেবার জন্যে টাকাটাও সে এনেছিল সঙ্গে করে'। যতীশবাবুকে দেবার পর যা বেঁচেছিল তা সবই সঙ্গে ছিল তার। সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে বেড়াচ্ছিল টাকাটা। সোনার বাট দুটো বাক্সে রেখে দিয়েছিল। তনিমা তাকে বলে গিয়েছিল যা-কিছু টাকা বাঁচবে তা কলকাতায় তার স্বামীর দোকানে যেন জমা দিয়ে যায়, তাহলেই বিলেতে গেলে সে টাকাটা তাকে দিতে পারবে। বেশী টাকা সঙ্গে থাকাটা বে-আইনী। তাই করবে ঠিক করেছিল ঝিনুক। আত্মরক্ষার জন্য সে একটা ছোরাও কিনেছিল। ছোরাটাও সঙ্গে ছিল তার। কিছুক্ষণ পরে সে যখন বস্তির ভিতর ঢুকল তখন পাড়া নিস্তব্ধ। একটা ভয়াবহ নীরবতা থমথম করছে চতুর্দিকে। আর একটু ঢুকেই সে অবাক হ'য়ে গেল

ডাক্তার ঘোষালের মোটরটা দেখে। ডাক্তার ঘোষালও এখানে এসেছেন না কি? কেন? আরও ভিতরে ঢুকে পেট্রোম্যাক্সের আলো দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে প্রকাণ্ড এক কালীমূর্তি। তার সামনে বলি দেবার হাড়-কাঠ। পাশেই কাউয়ের সেই প্রকাণ্ড খাঁড়া চক্‌চক্‌ করছে। আশেপাশে কেউ নেই।

"কাউ—"

ঝিনুকের নিজের কণ্ঠস্বরই অদ্ভুত শোনাল নিজের কানে। কাউয়ের সাড়া পাওয়া গেল না। পাশের একটা ঘর থেকে গোঁ গোঁ শব্দ শোনা গেল একটা। সেই দিকে এগিয়ে গেল ঝিনুক। গিয়ে যা দেখল, তাতে চক্ষু স্থির হ'য়ে গেল তার। ডাক্তার ঘোষালের হাত-পা-মুখ বেঁধে একটা বস্তার মতো ফেলে রেখেছে তাঁকে এক কোণে। এ কি! তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে তাঁর কাছে বসে পড়ল ঝিনুক বাঁধন খুলে দেবে বলে।

"কে—"

কর্কশ কণ্ঠের চীৎকারে চমকে ঘাড় ফিরিয়ে রমেশকে দেখতে পেল সে।

"কে আপনি? ওর গায়ে হাত দেবেন না।"

"আমি কাউয়ের মাসিমা। এঁকে এমন করে বেঁধে রেখেছেন কেন।"

"ওকে মা-কালীর কাছে বলিদান দেওয়া হবে। ও মানুষ না, পশু।"

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুল ঝিনুকের দৃষ্টি থেকে।

"কি যা-তা বলছেন আপনি! উনি যে কত বড় মানুষ, তা আপনার ধারণা নেই। উনি পশু নন, দেবতা। পূর্ববঙ্গে রায়টের সময়, যখন সবাই আমাদের ফেলে পালাচ্ছিল, তখন উনি নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে আমাদের বাঁচিয়েছিলেন। উনি পশু? ওঁকে বলিদান দেবেন? আমার প্রাণ থাকতে তা হবে না"

হঠাৎ সে শাণিত ছোরাটা বার করে বসল ডাক্তার ঘোষালের কাছে। তার তেজোদীপ্ত মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেল রমেশ।

"কাউ কোথা?"

"ভিতরে আছে।"

"তাকে গিয়ে বলুন, তার মাসিমা এসেছে দেখা করতে। আমরা আজ চলে যাচ্ছি এখান থেকে, যাবার আগে তাকে কিছু টাকা দিয়ে যেতে চাই।"

রমেশ ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইল তবু।

"সত্যি, ইনি রায়টের সময় আপনাদের বাঁচিয়েছিলেন?"

"উনি না থাকলে আমরা কেউ বাঁচতুম না। আমাকে না মেরে ওঁর গায়ে আপনারা কেউ হাত দিতে পারবেন না। এঁর বাঁধন খুলে দিন, আর কাউকে খবর দিন।"

রমেশ বুঝল তারা ভুল করেছে। ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই কাউ এল।

"এ কি করেছ তুমি! পিতৃহত্যার আয়োজন করেছ? এতে কি মা-কালী সন্তুষ্ট হবেন? তুমি তোমার মাকে টুঁটি টিপে মেরেছিলে, কত টাকা খরচ করে উনি তোমাকে ফাঁসি থেকে বাঁচিয়েছিলেন, তার এই প্রতিদান? ছি, ছি, ছি—"

কাউ গুম হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বলল, "উনি আমাকে অপমান করে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। উনি আপনাকে যাদু করে রেখেছেন, আপনাকে আমি উদ্ধার করতে চাই।"

"আমাকে উদ্ধার করতে তুমি পারবে না। আমরা আজই এ দেশ থেকে চলে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে আমাদের আর দেখা হবে কি না সন্দেহ। যাবার সময় তাই তোমাকে কিছু টাকা দিতে এসেছি, যাতে তুমি ভালোভাবে সৎপথে থাকতে পার—"

ঝিনুক ব্লাউসের ভিতর থেকে নোটের বাণ্ডিলটা বার করে ছুঁড়ে দিলে কাউয়ের দিকে।

"গুণে নাও, পাঁচ হাজার টাকা আছে। আর এঁকে ছেড়ে দাও এখুনি। আমি আশ্চর্য হচ্ছি এঁকে এভাবে ধরলে কি করে তোমরা!"

রমেশ আবার এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, "আমরাই ওঁকে কল দিয়েছিলাম রোহিণীপুরে। একটা সাজানো রোগীও অবশ্য ছিল। আমরা লুকিয়ে বসেছিলাম রোহিণীপুরের জঙ্গলে। রাস্তার উপর দু-তিনটে গরুর গাড়ি কাত করে রেখেছিলাম। ফেরবার সময় যখন গাড়ি সরাবার জন্য হর্ন দিচ্ছিলেন, তখন আমরা বেরিয়ে এসে ধরে ফেললাম ওঁকে। সহজে হয় নি ব্যাপারটা। আমাদের দু'জনকে ঘায়েল করেছেন উনি। তবে আমাদের লোকবল বেশী ছিল, উনি পারলেন না শেষ পর্যন্ত। ওঁকে বেধে ওঁর মোটরে করেই এনেছি এখানে।"

"ওঁকে দয়া করে ছেড়ে দিন এখন।"

রমেশ মাথা চুলকে বলল. "কাউ না বললে আমরা ছাড়তে পাচ্ছি না। আমরা কাউয়ের কথাতেই এ-কাজ করেছি। তবে আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ভুলই করেছি। কাউ কি বল তুমি?"

কাউ হঠাৎ ভেঙে পড়ল। ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগল সে। ঝিনুকের পায়ের উপর উপুড় হয়ে বলল, আমায় ক্ষমা করুন মাসিমা। আপনি দেশ ছেড়ে যাবেন না। আমি সারাজীবন আপনার সেবা করব।"

এই বলে কাঁদতে কাঁদতে সে ভিতরে চলে গেল। রমেশও গেল তার পিছু পিছু। একটু পরেই ফিরে এল রমেশ।

"কাউ বলছে ওঁকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু আমরা এখানে ওঁর বাঁধন খুলতে চাই না। খুললেই উনি তেড়ে আসবেন। ওঁর গায়ে সাংঘাতিক জোর। ঝাবরা এক ঘুঁষিতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। কাটরার পেটে এক লাথি মেরেছিলেন, সে এখনও কথা কইতে পারছে না। তাই এখানে ওঁর বাঁধন খুলব না। যেমন বাঁধা আছে,, তেমনি অবস্থাতেই নিয়ে যান ওঁকে।"

ঝিনুকেরও মনে হ'ল, বাঁধন খুলে দিলে উনি এখানে সত্যিই হয়তো মারপিট করতে লেগে যাবেন। তার চেয়ে ওঁকে এমনি নিয়ে যাওয়াই ভালো। আর-একটা কথাও মনে হ'ল। উনি বিলেত যেতে এখনও রাজী হন নি। ওঁকে বাঁধা অবস্থাতেই

ট্রেনের কাছ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাক। একবার টেনে ট্রেনে তুলতে পারলে, অন্তত কলকাতা পর্যন্ত গেলে, হয়তো ওঁর মত বদলাবে।

"বেশ তা'হলে তুলে দাও ওঁকে।"

গাড়ির পিছনের সীটে শুইয়ে দেওয়া হ'ল ডাক্তার ঘোষালকে। তাঁকে নিয়ে ঝিনুক সোজা বাড়ি চলে গেল।

ট্রেনের আর বেশী দেরি ছিল না। ঝিনুক বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি নতুন স্যুটকেস দু'টো আর টিফিন কেরিয়ারটা তুলে নিলে গাড়ির পিছনে। আর হরসুন্দরকে বলে গেল—"কম্পাউণ্ডারবাবু এখানকার যা ব্যবস্থা করার করবেন। তাঁকে আমি টাকা দিয়ে দিয়েছি।"

ঝিনুক সোজা চলে গেল ডিস্টাণ্ট সিগন্যালের দিকে।

সুবেদার খাঁ ট্রেন দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। ট্রেনের হুইশল্ দীর্ণ করে দিচ্ছিল নৈশ অন্ধকারকে। ঝিনুক ট্রেনের কাছে এসে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ঘোষালের বাঁধনগুলো কেটে দিলে।

"উঠুন চলুন,—"

ডাক্তার ঘোষাল ছাড়া পেয়েই তড়াক করে নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে, তারপর মাঠামাঠি ছুটতে লাগলেন। ঝিনুক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর একবার খুব জোরে হুইশল্ বাজল। ঝিনুক জিনিসপত্র নিয়ে উঠে পড়ল ট্রেনে। সুবেদার খাঁ ইনজিন থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলেন। ঝিনুক উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দিলেন তিনি।

গভীর রাত্রী। কাউদের বস্তি নিঝ্ঝুম হয়ে গেছে। কালীপুজো হয় নি। প্রতিমা একা দাঁড়িয়ে আছে। ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করলেন ডাক্তার ঘোষাল।

"কাউ, কাউ, কাউ—"

হাঁপাতে হাঁপাতে চীৎকার করতে লাগলেন তিনি। কাউ বেরিয়ে এল।

"এ কি আপনি ফিরে এলেন? মাসিমা কোথা?"

"সে চলে গেল। আমি ফিরে এলুম তোমার কাছে। আমাকে মারতে হয় মার, কাটতে হয় কাট। যা তোমার খুশী।"

বলেই অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন।

পৃথিবীনন্দনের জীবনেও একটা বিপর্যয় ঘটল। তিনি পুলিসে চাকরি করতেন, তাঁর উপর-ওলা একজন পদস্থ মুসলমান পুলিস অফিসার তাঁকে ডেকে পাঠালেন একদিন।

বললেন, "শুনছি, আপনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানারকম অপ-প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। আপনার রেকর্ড দেখলাম, আপনি যতগুলি লোককে জেলে পচিয়েছেন সবগুলিই মুসলমান। হিন্দু ক্রিমিনাল আপনার চোখে পড়ে নি?"

"আমি মুসলমান ক্রিমিনাল খুঁজে বেড়াই।"

"আপনার কি মুসলমান-বিদ্বেষ আছে না কি ?"

"অস্বীকার করব না, আছে।"

"আপনার এরকম মনোভাব কিন্তু আইনসঙ্গত নয়, তা আপনি জানেন ?"

"জানি। আইনের প্যাঁচেই ওদের কাবু করবার চেষ্টা করি।"

পুলিস অফিসারটি সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। তারপর বললেন, "আমার মনে হচ্ছে আপনার মস্তিষ্কে কোনও গোলমাল হয়েছে। আপনাকে আমি সাস্‌পেণ্ড করলাম। আপনি আমার এই চিঠি নিয়ে সিভিল সার্জনের কাছে যান। তিনি যদি আপনাকে সুস্থ বলে মনে করেন তা'হলে ভেবে দেখব আপনাকে চাকরিতে রাখা যাবে কি না। আমার মনে হচ্ছে আপনি পাগল, মনো-ম্যানিয়াক্ (mono-maniac)। আমি সিভিল সার্জনকে ফোন করছি। আপনি এই চিঠি নিয়ে তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন।

ঝিনুক নির্বিঘ্নে বিলেত পৌঁছল গিয়ে।

পৌঁছবার মাসখানেক পরে নিম্নলিখিত চিঠিটিও পৌঁছল তার হাতে।

সবিনয় নিবেদন,

পাগলা গারদ থেকে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আপনার চিঠিটা পেয়েছিলাম সুবেদার খাঁর কাছ থেকে। আপনি আমাকে চেনেন না। মাত্র এক মুহূর্তের জন্য আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল এক স্টেশন প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু আপনার সব খবর আমি জানি। একটি সংবাদ দিচ্ছি। পাকিস্তানে আবার একবার রায়ট হ'য়ে গেছে। সেই রায়টে আপনার কাকা যতীশবাবু মারা গেছেন। আর তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন সুবেদার খাঁ। হয়তো খবরটা আপনার কাজে লাগতে পারে তাই জানিয়ে দিলাম। সঙ্গে খবরের কাগজের কাটিং (cutting) পাঠালাম। দেখবেন খবরটা মিথ্যা নয়। নমস্কার জানবেন। ইতি—

পৃথিবীনন্দন

॥ ৪৪ ॥

সুঠাম মুকুজ্যে ঠিক গঙ্গার ধারে একটা নির্জন জায়গায় বসে লিখছিলেন :

"যাঁদের দূরদৃষ্টি আছে, যারা ভবিষ্যতের বিবিধ সুখদুঃখ আগে থাকতে কল্পনা করে' সেই রকম ব্যবস্থা করতে পারেন তাঁদের আমরা প্রশংসা করি। তাঁরা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাঁরা কতদূর দেখতে পান ? কতদূর দেখতে পাওয়া সম্ভব ? তা'ছাড়া সুখদুঃখও কি এমন অপরিবর্তনীয় যে তাদের স্বাদ চিরকাল একরকম থাকে ? আজ যেটাকে সুখের হেতু বলে মনে হয় দু'দিন পরেই বিস্বাদ হয়ে যায় তা।

ছেলেবেলায় একটা সামান্য ঘুড়ি বা পুতুলের জন্য প্রাণ দিতাম, ওইগুলোকেই চরম সুখের হেতু বলে মনে হ'ত। এখন কি হয়? নীতি বা প্রিন্সিপল (Principle) সম্বন্ধে ওই একই কথা খাটে। আজ যেটা সুনীতি কাল সেটা দুর্নীতি হয়ে যেতে বাধা নেই। এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হ'তে পারে যখন সত্য কথাও অসঙ্কোচে বলা যায় না। যুধিষ্ঠিরের মতো ধার্মিক লোককেও 'হত ইতি গজ' করতে হয়েছিল। পরিস্থিতির সঙ্গে আমরাও বদলাচ্ছি, বদলানোটাই নিয়ম। আজকে যে টাকাটা বাজারে চলছে, কাল তা চলবে না। তার চেহারা বদলে যাবে। মিউজিয়মে ওরকম কত অচল টাকার নমুনা আছে। ইতিহাসে আছে, অচল নিয়মের আর নীতির। ভবিষ্যতে কি হবে তা বলা বড শক্ত। কঠিন জমাট বরফকে (Iceberg) যদি শিলা বলতে আপত্তি না থাকে তা'হলে শিলার জলে ভাসাও অসম্ভব ব্যাপার নয় কিছু। দক্ষিণ মেরু, উত্তর মেরুতে স্বাভাবিক ব্যাপার ওটা……"

প্রায় তিনমাস কেটেছে। ডাক্তার ঘোষালের উদ্দাম স্বভাব আরও উদ্দাম হয়ে উঠেছে। দিবারাত্রি মদ খান আজকাল। কাউ ফিরে এসেছে তাঁর কাছে। সে যতটা সম্ভব তাঁকে সামলে রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

সেদিন ডাক্তার ঘোষাল অত্যন্ত বেশী মদ খেয়েছিলেন। তার উপর জ্বর হয়েছিল। খুব বমি করে' শুয়ে হাঁপাচ্ছিলেন। কাউ হাওয়া করছিল শিয়রে বসে। ভাবছিল কোন ডাক্তার ডাকবে কি না, এত রাত্রে পাওয়া যাবে কি কাউকে? হঠাৎ একটা প্যাঁচা ডাকতে ডাকতে উডে গেল। হু হু করে হাওয়া উঠল একটা। হঠাৎ ডাক্তার ঘোষাল চেঁচিয়ে উঠলেন—"ভগবান আমাকে নিচ্ছ না কেন! নচ্ছার কোথাকার, damned swine, নরকে ঠেলে দাও না বাবা, আর যে পারা যায় না।"

বলেই চুপ করে গেলেন। কাউ বডই অসহায় বোধ করতে লাগল। এমন সময় একটি ছায়ামূর্তি ঘরে ঢুকল।

"কে—" জিজ্ঞাসা করলে কাউ।

"আমি ঝিনুক।"

তডাক করে উঠে বসলেন ডাক্তার ঘোষাল।

"Get out, get out, get out—বেরিয়ে যাও এখান থেকে।"

ঝিনুক নড়ল না, দাঁড়িয়ে রইলো।